মপাসাঁ রচনাবলী

[চতুর্থ খণ্ড]

অনুবাদক

সুনীলকুমার ঘোষ

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯



তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬১

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত

॥ তুলি-কলম ॥

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক : সুমঙ্গল রায় ॥ আদর্শ প্রেস ॥

৭, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, কলকাতা-১১

বাঁধাই : দত্ত এণ্ড পাল

প্রচ্ছদ : তরুণ দত্ত

সূচীপত্র

থিয়োডুল স্যাবোতের স্বীকারোক্তি

[Theodule Sabot's Confession]

মার্টিনভাইলের হোটেলে যখনই স্যাবোত এসে হাজির হোত তখনই তার কাছ থেকে মজাদার কিছু শোনার আশায় সবাই হো-হো করে হেসে উঠত। মজাদার মানুষ ছিল স্যাবোত। পাদরীদের সে মোটেই পছন্দ করত না; না, না, মোটেই না, কায়দামত পেলে সে নাকি তাদের ধরে-ধরে আস্তো গিলে ফেলত।

মার্টিনভাইলের র‍্যাডিক্যাল দলের লোক ছিল স্যাবোত—লম্বা, রোগা চেহারার মানুষ; মাথার চুলগুলি চাঁদি পর্যন্ত ব্রাশ করা, চোখ দুটো ধূসর রঙের; কিঞ্চিৎ চতুর বলেই মনে হোত তাকে। কোন পাদরীকে দেখে সে যখন মন্তব্য করত—ওই যে আমাদের অপদার্থ পাদরী বাবা আসছেন—তখন তার বলার চঙে এমন হাবভাব প্রকাশ পেত যে সবাই একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ত, অট্টহাসিতে ঘর ফেটে যেত। রবিবার দিন গির্জায় যখন প্রার্থনা বসত তখন সে ইচ্ছে করে কাজ করত। হোলি উইক-এর সোমবার সে একটা শুয়োর জবাই করে কালো পুডিং তৈরী করে রাখত। সেই পুডিং সে 'ইস্টার' পর্যন্ত চালাত। কোন পাদরী তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে সে খুশি হয়ে বলত—ওই লোকটা মদের সঙ্গে ভগবানকে গিলছে।

এই বিদ্রূপের জন্যে স্যাবোতকে অনেকেই সমর্থন করত; দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবান পাদরী এইজন্যে তাকে একটু ভয় করতেন। পাদরীর নাম রেভারেণ্ড মেরিটাইম। চরিত্রের দিক থেকে তিনি কূটনীতিজ্ঞ; মার্জিত কলাকৌশলই তিনি পছন্দ করতেন বেশী। দীর্ঘ দশ বছর ধরে দু'জনের মধ্যে এই ধরনের তিক্ত, গোপন, এবং অবিরাম সংগ্রাম চলেছিল। শহরের পৌর প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিল মিস্ত্রী স্যাবোত; অনেকেই ভেবেছিল সে মেয়রের পদে নির্বাচিত হবে। সেটা সম্ভব হলে গির্জার কাছে নিঃসন্দেহে তা পরাজয় ছাড়া আর কিছু হবে না।

কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচন সুরু হওয়ার কথা ছিল। মার্টিনভাইলের যাজক সম্প্রদায় তাদের নিরাপত্তার জন্যে কাঁপতে লাগল। একদিন সকালে পাদরী রাওয়েনের দিকে যাত্রা করলেন; চাকরকে বলে গেলেন তিনি আর্চ-বিশপের বাড়ি যাচ্ছেন।

দু'দিন পরে তিনি ফিরে এলেন। তাঁর মেজাজটা বেশ শরীফ। মনে হল যে-কাজের জন্য গিয়েছিলেন তাতে তিনি সাফল্যলাভ করেছেন। পরেরদিনই সবাই জেনে গেল যে যাজকদের জন্যে সংরক্ষিত গির্জার পূর্বদিকের অংশটিকে সংস্কার করা হবে। বিশপ তাঁর নিজের তহবিল থেকে এর জন্যে ছ'শ ফ্রাঁ দিয়েছেন। আচার্যদের জন্যে পুরানো পাইন গাছের তৈরী গির্জায় যেসব পুরানো বসার চেয়ার রয়েছে সেগুলি বাতিল করে ওক গাছের তকতা দিয়ে নতুন

চেয়ার বানানো হবে। এই কাজের জন্যে অভিজ্ঞ ছুতোর মিস্ত্রী দরকার। সন্ধ্যের মধ্যে সকলের মুখে ওই একই কথা।

থিয়োডুল স্যাবোতের মুখে হাসি নেই।

পরের দিন গাঁয়ের পথ দিয়ে সে যখন যাচ্ছিল তখন তার প্রতিবেশী, বন্ধু, আর শত্রু সকলেই ঠাট্টা করে তাকে জিজ্ঞাসা করল—কাজটা তো তুমিই করছ হে?

উত্তর দেওয়ার মত কিছুই ছিল না তার; ভেতরে-ভেতরে রাগে ফুলতে লাগল সে। তারা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই মন্তব্য করল: কাজটা বেশ বড়। দু'তিনশ ফ্রাঁর ব্যাপার। দিন দুই পরে জানা গেল সারানোর কাজটা পার্চিভিলার ছুতোর গিলেসটিঁ চেমবারলঁাকে দেওয়া হবে। তারপরে জানা গেল গুজবটি মিথ্যা; এবং তারপরে আরও জানা গেল যে গির্জায় বসার জন্যে যে ঘেরা আসন-গুলি রয়েছে সেগুলিও সারানো হবে। এইসব কাজের জন্যে খরচ হবে প্রায় দু'হাজার ফ্রাঁ; এই টাকার কিছুটা অংশ অনুদানের জন্যে সরকারের কাছে গির্জার কর্তৃপক্ষ নাকি আবেদন করেছে। উত্তেজনায় ফেটে পড়ল চারপাশ।

স্যাবোত তা শুনেছিল। রাত্রিতে সে রেকটরের বাড়িতে হাজির হল। চাকরের কাছে শুনল যে তিনি গির্জায় গিয়েছেন। এই শুনে সে-ও গির্জার পথ ধরল।

যাজকের তদারকীতে দুটি বৃদ্ধা অবিবাহিতা দেবদাসী সেণ্ট মেরীর উৎসবের জন্য বেদী সাজাচ্ছিল। গির্জায় গায়কদের জন্যে যে নির্দিষ্ট স্থান থাকে সেইখানে বিরাট ভুঁড়ি নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাজের নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

খুব অস্বস্তি লাগছিল স্যাবোতের। মনে হল সে যেন তার পরম শত্রুর ঘরে এসে ঢুকেছে। কিন্তু লোভ তাকে খোঁচাতে লাগল। দেবদাসীদের ভ্রূক্ষেপ না করে হাতে টুপিটি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এল। দেবদাসীরা তাকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ারের ওপরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সে আমতা আমতা করে বলল: নমস্কার, যাজক মশাই।

যাজকের চোখ দুটো তখন বেদীর দিকে নিবদ্ধ ছিল। মুখ না ঘুরিয়ে তিনি বললেন—নমস্কার, মিস্ত্রী।

ঘাবড়িয়ে গিয়ে স্যাবোত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; তারপরে বলল: উৎসবের আয়োজন হচ্ছে বুঝি?

যাজক মেরিটাইম বললেন: হ্যাঁ। সেণ্ট মেরীর উৎসব-মাস এগিয়ে আসছে।

ঠিক, ঠিক—চুপ করে গেল স্যাবোত।

আর কোন কথা না বলেই সে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল; কিন্তু গায়কদের পুরানো আসনগুলি তাকে বাধা দিল। সে লক্ষ্য করল ডান দিক আর বাঁ দিক ক'রে মোট ষোলটা স্টল মেরামত হবে। বাইরের দিকের এই ষোলটা ওক কাঠের স্টল তৈরী করতে তিনশ' ফ্রাঁর কাছাকাছি লাগবে। একটু

বুদ্ধি করে কাজ চালাতে পারলে যে-কোন চতুর ছুতোর মিস্ত্রী এতে যশ' শ্রী লাভ করতে পারবে। এই ভেবে সে আমতা-আমতা করে বলল: আমি কাজটার জন্যে এসেছিলাম।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন যাজক—কোন্ কাজ?

মরীয়া হয়ে স্যাবোত কোনরকমে বলে ফেলল: যে কাজটা এখানে সুরু হবে।

এই কথা শুনে যাজক ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন—অর্থাৎ, আমার গির্জায় যে সারানোর কাজ হবে সেই কাজের কথা তুমি বলছ?

যাজকের কথার স্বরে মনে হল স্যাবোতের শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা ঝলক বয়ে গেল। সেখান থেকে নিঃশব্দে কেটে পড়ার একটা উদগ্র কামনা আর একবার তাকে ঠেলা দিল। কিন্তু সে বেশ শান্তভাবেই বলল: হ্যাঁ।

তাঁর সেই বিস্তৃত উদরের ওপরে এড়োএড়িভাবে দুটি হাত রেখে বজ্রাহতের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন যাজক; বিস্ময়ে মুখ থেকে তাঁর কথা বেরোল না। তারপরে তিনি বললেন: ··তুমি, তুমি···স্যাবোত···এখানে আমার কাছে এসেছ কাজের জন্যে···। তুমি···আমার গির্জায় একমাত্র নাস্তিক তুমি। আরে না, না—তোমাকে একাজ দিলে চারিপাশে একেবারে ঢি ঢি পড়ে যাবে, বিরূপ সমালোচনায় জেরবার হয়ে যাব আমি। আর্চবিশপ আমাকে বকাবকি করবেন। চাই কি চাকরিও খোওয়াব আমি।

দম নেওয়ার জন্যে একটু থামলেন তিনি; তারপর একটু ধীরভাবে সুরু করলেন আবার: এইরকম উন্নতমানের একটা কাজ পাশের গ্রামের ছুতোর মিস্ত্রীকে দেওয়া হবে এটা শুনে যে তোমার কষ্ট হওয়ার কথা সেটাও আমি অহেতুক বলে মনে করছিনে; কিন্তু এছাড়া অন্য কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব না—যদি না অবশ্য···কিন্তু না···সে-ও অসম্ভব। তুমি কিছুতেই রাজি হবে না···অথচ সেটা ছাড়া···এ কাজ তোমাকে দেওয়া কিছুতেই চলবে না।

ডান দিকে পশ্চিমের দরজা পর্যন্ত যে দীর্ঘ আসনের সারি রয়েছে সেইদিকে স্যাবোত একবার তাকিয়ে দেখল। হায় ভগবান, এগুলিও সব সারানো হবে নাকি?

সে জিজ্ঞাসা করল: কী চাই আপনার? বলতে দোষ নেই কোন।

যাজক বেশ শক্ত গলায়ই বললেন: তোমার যে সৎ বাসনা রয়েছে সেবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ চাই।

আমতা-আমতা করল স্যাবোত: তা আমি বলছি—তবে এমন কি রয়েছে যাতে আমরা একটা বোঝাপড়ার মধ্যে আসতে পারিনে?

যাজক বললেন: পরের রবিবার এখানে যে উচ্চ পর্যায়ের প্রার্থনা সভা বসবে সেখানে প্রকাশ্যে তোমাকে গির্জার কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

বিবর্ণ হয়ে গেল মিস্ত্রী; সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল: এই আসনগুলিও সারানো হবে?

যাজক জোর দিয়ে বললেন: হবে; তবে পরে।

স্যাবোত বলল: অবশ্য আমি বলছিনে—মানে—আমি নাস্তিক নই—উহু—না। ধর্মের সঙ্গে কোন বিরোধ আমার নেই। ধর্মের আচারটাই আমাকে তিতিবিরক্ত করে তোলে। কিন্তু এরকম ব্যাপারে, ধর্মাবিষয়ে আমার যে কোন গোঁড়ামি নেই তা আপনি দেখতে পাবেন।

জয়লাভ করেছেন বুঝতে পেরে যাজক ঘরোয়া হয়ে এলেন; তারপর বেশ খুশিমনেই বললেন: চমৎকার! চমৎকার! এবারে তুমি বিজ্ঞের মত কথা বলেছ। দাঁড়াও, দেখি কী করা যায়।

বেশ অস্বস্তির সঙ্গে হাসল স্যাবোত; তারপরে জিজ্ঞাসা করল: এই স্বীকারোক্তি ব্যাপারটা কয়েকটা দিন পিছিয়ে দিলে হয় না?

কিন্তু যাজক আবার তাঁর রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন।

"যেমুহূর্ত থেকে তোমাকে এই কাজটা দেওয়া হবে সেইমুহূর্ত থেকে আমি নিশ্চিত হতে চাই যে তোমার চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে"—তারপরেই তিনি শান্তভাবে বললেন: দেরী ক'রে লাভ নেই। তুমি বরং কালকেই চলে এসে আনুগত্য নাও; কারণ, তোমাকে অন্তত দু'বার পরীক্ষা করতে হবে আমায়।

দু'বার?

একটু হেসে বললেন যাজক: হ্যাঁ তোমাকে ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার ঝরঝরে করে তুলতে হবে। তোমাকে কাল আশা করছি আমি।

বেশ কষ্টের সঙ্গেই মিস্ত্রী জিজ্ঞাসা করল: কোথায় যাব?

কেন···গির্জায়, যেখানে আনুগত্যের শপথ নেওয়া হয়।

কী বললেন?···কোণে যে বাক্স রয়েছে ওইখানে? শুনুন, শুনুন···ওই বাক্সটা মোটেই আমার পছন্দমত নয়।

কেন?

কেন···মানে···ওতে চড়ার অভ্যাস আমার নেই। তাছাড়া কানেও একটু কম শুনি আমি।

যাজক ভেবে দেখলেন কথাটা; বললেন: ঠিক আছে, তাহলে আমার বাড়িতেই এস, সেখানেই সবার চোখের বাইরে কাজটা আমরা সেরে নেব। এতে তোমার আপত্তি নেই তো?

হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়; কিন্তু ওই বাক্সটা কিছুতেই নয়। উহু—না।

ঠিক আছে। তাহলে কাল এস; সন্ধ্যে ছ'টার সময়—দিনের কাজ শেষ হওয়ার পরে।

বেশ। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। কথা পাকা রইল। কাল আপনার সঙ্গে দেখা করব। কথার নড়চড় হলে জাহান্নামে যাব আমি।

স্যাবোত তার বিরাট হাতটা বাড়িয়ে দিল। যাজক তার হাতটা ধরে বিরাট একটা ঝাঁকানি দিলেন। ঝাঁকানির শব্দ গির্জার ভেতরে ঝঙ্কৃত হয়ে গম্বুজের ওপাশে মিলিয়ে গেল।

পরের সারাটা দিনই স্যাবোতের মনটা বেশ অস্বস্তির ভেতর দিয়ে কাটলো। দাঁত তুলতে যাওয়ার মানুষের মনে যেরকম একটা আশঙ্কা জাগে এটাও ঠিক সেইধরনের একটা আশঙ্কা। প্রতিটি মুহূর্ত তার মনে হ'তে লাগল—আজ সন্ধ্যের সময় আমাকে আনুগত্য জানাতে হবে। তার সেই সংশয়সঙ্কুল আত্মা—নাস্তিক তাকে যে একেবারে বিশ্বাস করে উঠতে পারে নি—স্বর্গীয় রহস্যের নাম-না-জানা ক্ষমতার শাসনে দাঁড়াতে হবে এই কথা ভেবে বার-বার কাঁপতে লাগল।

পরের দিন কাজ শেষ হওয়ার পরে সে যাজকের বাড়িতে হাজির হল। যাজক তখন বাগানে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন; প্রার্থনা পুস্তক পড়তে-পড়তে সরু রাস্তার ওপরে পায়চারি করছিলেন। স্যাবোতকে দেখে তিনি বেশ খুশিই হলেন; একমুখ হেসে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে।

আরে—এস, এস, মঁসিয়ে স্যাবোত—কেউ তোমাকে গিলে ফেলবে না।

স্যাবোতই তাঁর ঘরে প্রথমে ঢুকল; বলল: আপনার কোন অসুবিধে না হলে আমার এই ছোট ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি মিটে যায় ততই ভাল। পোশাক বার করাই রয়েছে।

এক মিনিট—তারপরেই আমি তোমার সব কথা শুনব।

যাজক তাঁর সাদা পোশাকটি পরলেন, গভীরভাবে শূন্য মনে স্যাবোত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

যাজক ইঙ্গিত করে বললেন: ওই গদীর ওপরে হাঁটু মুড়ে বোস।

হাঁটু মুড়ে বসতে লজ্জা করল স্যাবোতের; সে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর আমতা-আমতা করে বলল: হাঁটু মুড়ে বসে কোন লাভ হবে?

হাঁটু মুড়ে বোস; অনুতাপের বিচার সুরু হোক।

হাঁটু মুড়ে বসল স্যাবোত।

প্রার্থনা কর।

কী করব?

আমি বলে যাই—তুমি আমার কথাগুলি উচ্চারণ করে যাও।

উচ্চারণ শেষ হলে যাজক বললেন: এবারে পাপ স্বীকার কর তোমার।

কী বলতে হবে, কোথায় সুরু করতে হবে বুঝতে না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল স্যাবোত।

রেভারেণ্ড মেরিটাইম তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন: প্রিয় বৎস, এদিক থেকে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই বলেই আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি। একটি একটি

করে ভগবানের নির্দেশ গ্রহণ করবে তুমি। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার কথা মন দিয়ে শোন। খোলাখুলিভাবে কথা বল, বেশী বলতে ভয় পেয়ো না।

'তুমি একটিমাত্র দেবতাকে পূজা করবে; এবং সারা হৃদয় দিয়ে তাঁকেই কেবল শ্রদ্ধা জানাবে'—ভগবানের মত আর কোন মানুষ বা জিনিসকে কি তুমি ভালবাস? তোমার সমস্ত আত্মা, হৃদয় আর ভালবাসা দিয়ে কি ভগবান-কে তুমি ভালবাস?

বিষয়টা নিয়ে ভাবতে গিয়েই স্যাবোত ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল; তারপর বলল: না, না—ভগবানকে যতদূর সম্ভব আমি ভালবাসি। হ্যাঁ; নিশ্চয় তাঁকে আমি ভালবাসি। তবে তার অর্থ এই নয় যে আমার ছেলেদের আমি ভালবাসিনে। না—না, সে সত্যি নয়। তার মানে এই নয় যে এদের মধ্যে কাকে আমি ভালবাসব সে-কথাটা আমাকে ভেবে দেখতে হবে। কেউ যদি বলে ভগবানকে ভালবাসার জন্যে আমাকে একশ ফ্রাঁ হারাতে হবে—তাতেও আমি রাজি নই। তবে, কথাটা ঠিক যে ভগবানকে আমি ভালবাসি।

যাজক বেশ গম্ভীর গলায় বললেন: সকলের চেয়ে ভগবানকে ভাল তোমাকে অবশ্যই বাসতে হবে।

স্যাবোতের মন সদিচ্ছায় বোঝাই ছিল; সে বলল: সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি।

যাজক বললেন: ভগবান বা আর কারও নাম ক'রে শপথ করবে না কোন দিন। মাঝে-মাঝে কি তুমি দিব্যি দিয়ে কথা বল?

না, না—তা নয়। আমি কোনদিন দিব্যি করি নি, না—কখনও না। মাঝে মাঝে মেজাজ খারাপ হলে অবশ্য করি নি যে তা নয়। কিন্তু দিব্যি হিসাবে কোনদিনই আমি তা করিনে।

কিন্তু সেটাও দিব্যি। যাক গে; ভবিষ্যতে আর কোরো না। পরের নির্দেশ হল—ভগবানের পূজা আরাধনায় রবিবার দিনটি তুমি কাটাবে। রবিবার দিন তুমি কি কর?

স্যাবোত তার কান চুলকোতে লাগল।

সাধ্যমত আমি ভগবানের পুজো করি, পাদরী বাবা। বাড়িতেই আরাধনা করি তাঁর। রবিবারে আমি কাজ করি।···

যাজক দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাকে বাধা দিয়ে বললেন: আমি জানি ভবিষ্যতে তুমি ভালভাবে চলবে। পরবর্তী তিনটি নির্দেশ এবারে আমি বলছি, কারণ, আমার ধারণা, আগের দুটি নির্দেশ না মেনে তুমি কোন পাপ কর নি। এবারে আমরা ছ' নম্বর আর ন' নম্বর নির্দেশ একসঙ্গে পড়ব।—"অন্য লোকের জিনিসে হাত দেবে না তুমি; এবং জ্ঞানতঃ, অন্য লোকের জিনিস নিজের কাছে রাখবে না।" তোমার নয় এমন কিছু জিনিস কি তুমি কখনও নিয়েছ?

এবারে বেশ চটে উঠল খিয়োফুল স্যাবোত; বলল: নিশ্চয় না। আমি যে

সৎ মানুষ সে-কথা আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি। অবশ্য, কাজ করার সময় দু' একটা ঘণ্টা বেশী সময় যে আমি নিই নি সেকথা আমি বলছিনে। মাঝে মাঝে পাওনা টাকার ওপরে কয়েকটা সেনটাইম যে আমি কখনও চড়াই নি, সেকথাও বলছিনে আমি। কিন্তু আমি চোর নই, না—না কিছুতেই নয়।

যাজক বেশ রূঢ়ভাবেই বললেন: একটা সেনটাইম নিলেও তা চুরি করা হয়। যা করেছ করেছ; আর কোনদিন ওকাজ করো না—এর পরে হচ্ছে—'কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেবে না।'—তুমি কি মিথ্যে কথা বলেছ কোনদিন?

না; বলি নি। আমি মিথ্যেবাদী নই। সেকথা আমি গর্ব করেই বলতে পারি। তবে একথা আমি বলছিনে যে, আমি কোনদিন লম্বা-লম্বা কথা বলি নি। প্রয়োজনমত অন্য কারও কাছে যে মিথ্যে কথা আমি বলি নি সে কথাও সত্যি নয়। কিন্তু মিথ্যেবাদী বলতে যা বোঝা যায় আমি তা নই।

যাজক সহজভাবে বললেন: নিজের ওপরে অবশ্যই তুমি লক্ষ্য রাখবে।

তারপরে তিনি বললেন: 'বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মহিলার দেহ তুমি কামনা করবে না।' নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মহিলাকে তুমি কামনা বা ভোগ করেছ কি?

স্যাবোত বলল: না। নিশ্চয় না। স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করা? না, না। কাজে বা চিন্তায় এমন কাজ কখনও আমি করি নি।

একটু থেমে গলা নিচু করে সে আবার বলল; হঠাৎ মনে হ'ল, এবিষয়ে কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে তার।

অবশ্য একথাও সত্যি নয় যে শহরে গিয়ে আমি নিছক ফূর্তি করতে কোন জায়গায়—কোন্ জায়গার কথা বলছি তা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—যাই নি বা কোন নারীর সঙ্গে মিশি নি। কিন্তু তার জন্যে আমি তাদের পয়সা দিয়েছি। টাকা দিলে আর দোষ থাকে না: তাই না?

যাজক আর জের না টেনে তাকে দীক্ষা দিলেন।

স্যাবোত এখন গির্জার কাজটা করছে—আর প্রত্যেক রবিবার উপাসনা সভায় যাচ্ছে।

পরিত্যক্ত

[The Castaway]

সত্যি বলছি পাঠক, এই আবহাওয়ায় গ্রামেরপথে বেড়াতে যাওয়াটা আমার মতে পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয়। গত দু'টি মাস ধরে তোমার এই পাগলামো সুরু হয়েছে। ইচ্ছাতেই হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক তুমি

আমাকে সমুদ্রের ধারে টেনে নিয়ে যাও; আমাদের বিবাহিত জীবনের পঁয়ত্রিশটি বছর কিন্তু তোমার এরকম কোন বাসনা হয় নি। ফি-ক্যাম্পের মত বিশ্রী জায়গায় যাওয়ার জন্তে তুমি অস্থির হয়ে ওঠ, তোমাকে আগে বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর ছিল; কিন্তু বর্তমানে বাইরে ছোটাছুটি করার এমন একটি উদগ্র কামনা তোমার জেগেছে যে বছরের এই সবচেয়ে গরমের দিনগুলিতেও তুমি বাইরে ঘুরে বেড়াতে চাও। দ্য অ্যাপ্রিভেল-এর সঙ্গে তোমার মেলে ভাল; তোমার সঙ্গী হ'তে তাকেই বরং বল। আমি এখন বিশ্রাম নিতে চললাম।

মাদাম দ্য কড়োর তার পুরানো বন্ধুর দিকে ঘুরে বললেন: আমার সঙ্গে তুমি আসছ দ্য অ্যাপ্রিভেল?

পুরানো আমলের শৌর্যের সঙ্গে একটু হেসে তিনি ঘাড়টা নোয়ালেন।

তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।

ঠিক আছে; তাহলে যাও, আর রোদে মাথা ঘুরে পড়।—এই বলে মঁসিয়ে দ্য কড়োর বিছানায় দু'এক ঘণ্টা শুয়ে থাকার জন্তে হোটেলের ঘরটিতে ঢুকলেন।

দু'জনে একা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাটি একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। মাদাম তাঁর বন্ধুর একটি হাত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বেশ মিষ্টি করেই বললেন: এতদিন পরে, এতদিন পরে!

দ্য অ্যাপ্রিভেল বিড়বিড় করে বললেন: পাগল হলে নাকি! না, পাগলই হয়েছ। এর বিপদ কত সেটা একবার চিন্তা কর। যদি সেই লোকটা···

চমকে উঠলেন মাদাম—হেনরীর কথা বলছ? ওকে মানুষ বলে ডেকো না।

অ্যাপ্রিভেল অশিষ্টভাবেই বললেন —আমাদের ছেলে যদি কোন সন্দেহ করে তাহলে তোমাকে আমাকে দু'জনকেই সে ঝামেলায় ফেলবে। চল্লিশটি বছর ধরে তাকে না দেখেই তুমি কাটিয়েছ; আজ তোমার হঠাৎ কী হল?

সমুদ্র থেকে যে দীর্ঘ পথটি সোজা শহরের দিকে এগিয়ে গিয়েছে সেই পথে তাঁরা এগোতে লাগলেন। তাঁদের সামনের পথটি প্রচণ্ড রোদের তাতে ঝলসে-ঝলসে উঠছিল। ধীর পায়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন। বন্ধুর হাত ধরে ধরে মাদাম অভিভূতের মত সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

মাদাম জিজ্ঞাসা করলেন: তুমিও তাকে দেখ নি?

না, না। কোনদিন না।

এও কি সম্ভব?

প্রিয় বান্ধবী, এ-আলোচনায় শেষ হবে না কোনদিন। সুতরাং তা আবার নতুন করে সুরু করার দরকার নেই। তোমার যেমন স্বামী আছে; আমারও তেমনি স্ত্রী রয়েছে, রয়েছে সন্তান। সেইজন্তেই বাইরে যাতে আমাদের কেলেঙ্কারি ছড়াতে না পারে তারজন্তে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

কোন উত্তর দিলেন না মাদাম। তিনি তাঁর পুরোনো দিনগুলির কথা ভাবছিলেন—ভাবছিলেন তাঁর বিনষ্ট যৌবন আর বিগত দিনগুলির কথা।

সব সংসারে যেমন হয় সেইরকম যৌবনেই তাঁর একদিন বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ডিপ্লোম্যাট স্বামীকে তিনি একরকম চিনতেনই না। পরে তাঁর সঙ্গে সৌখীন রমণীর মতই দিন কাটিয়েছিলেন।

তারপরে ওই যুবক মঁসিয়ে দ্য অ্যাপ্রিভেল। তিনিও তাঁরই মত আর একজনকে বিয়ে করেছিলেন। সেই যুবকটি তাঁর সঙ্গে একদিন গভীর প্রেমে পড়ে গেলেন। একবার মঁসিয়ে দ্য কভোর রাজনৈতিক কাজে বেশ কিছুদিনের জন্মে ভারতে এলেন। সেই সময় যুবকটির কাছে ধরা দিলেন।

বাধা দেওয়ার সামর্থ্য ছিল কি তাঁর? নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখা কি সম্ভব হোত তাঁর পক্ষে? আত্মসমর্পণ না করার মত শক্তি আর সাহস ছিল কি তাঁর? কারণ, যুবকটিকে তিনিও তো খুব ভালবাসতেন। না, নিশ্চয় না। খুব কষ্ট হোত তাঁর। তাঁরও খুব কষ্ট হোত। জীবন কী ছলাকলাতেই না পূর্ণ; কী নিষ্ঠুর এই জীবন! প্রলোভন কি আমরা এড়াতে পারি? অথবা অনিবার্য পরিণতিকে রাখতে পারি ঠেকিয়ে? অথচ সেই দিনগুলি কত মধুর, কত স্বপ্নিল!

তারপর একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন তিনি অন্তঃসত্ত্বা। কী ভয়ানক পরিস্থিতি! হায়রে, দক্ষিণদিকে তাঁর সেই ভয়ানক যাত্রার কথা কি তিনি ভুলে গিয়েছেন? তাঁর দুঃখ, তাঁর অবিরাম ভীতি; ভূমধ্যসাগরের একটি নির্জন কুটিরে অজ্ঞাতবাস। বাড়ির বাগানের বাইরে তিনি বেরোতেও সাহস করতেন না। কমলালেবুর গাছের তলায় শুয়ে শুয়ে তিনি গভীর আশঙ্কায় যে দীর্ঘ দিনগুলি কাটাতেন তা কি ভুলে যাওয়া এতটা সহজ? বাইরে বেরিয়ে সমুদ্রের হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানোর জন্মে তাঁর হৃদয় কতই না আকুলি বিকুলি করত। কিন্তু ফটকের বাইরে বেরোতে তিনি সাহস করতেন না। যদি এই অবস্থায় কেউ তাঁকে দেখতে পায়? কী লজ্জা!

আর সেই অপেক্ষার দিনগুলি? সেই শেষ ক'টি যন্ত্রণায় ভরা দিন! সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি। কী দুঃখই না তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে?

সত্যি সেই রাত্রিটি কী ভয়ঙ্করই না ছিল? গোঙানি আর চীৎকারের স্বর এখনও যেন তাঁর কানে এসে বাজছে। তাঁর প্রেমিকের সেই বিবর্ণ মুখের চেহারা এখনও তাঁর চোখের ওপরে ভাসছে। সেই সঙ্গে ভাসছে ডাক্তারের নিরুদ্বেগ মুখ আর নার্সদের টুপী।

শিশুর মৃদু চীৎকারে কী ভীষণভাবেই না তিনি কাঁপতে সুরু করেছিলেন।

আর তার পরের দিন। পরের দিনটি কি বেদনাময়। ওই দিনই তিনি তাঁর ছেলেটিকে চুমু খেয়েছিলেন। সেই প্রথম আর সেই শেষ। তারপর থেকে আর তাকে দেখেন নি তিনি।

তারপর থেকে একটি দীর্ঘ শূন্যতা—সন্তানের চিন্তা সব সময় তাঁর মনের গহ্বরে ভেসে-ভেসে বেড়াত। সেই ছোট শিশুটিকে—যেটি তাঁর নিজের রক্ত-মাংসের—নিজের অস্থিমজ্জা দিয়ে গড়া—তাকে আর কোনদিনই তিনি দেখেন নি। ছেলেটিকে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি কেবল জানতেন যে নরম্যান চাষীদের বাড়িতে সে মানুষ হয়েছে; সেই ছেলেটি নিজেই চাষী হয়েছে—যে বাবার নাম সে জানে না সেই বাবার কাছ থেকে অনেক টাকা যৌতুক নিয়ে বিয়ে করেছে।

এই চল্লিশ বছরের মধ্যে কতবারই না সেই ছেলেটিকে দেখার জন্যে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। কতবারই না তিনি তাকে চুমু খেতে চেয়েছিলেন। কোন সময়েই তাঁর মনে হয় নি যে ছেলেটি বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর বার-বার মনে হয়েছে ছেলেটি সেইরকমই রয়েছে—সেই প্রথম দিন তাকে যেমন তিনি দেখেছিলেন।

কতবারই তিনি তাঁর প্রেমিককে বলেছেন: আর আমি পারছিনে; তাকে একবার দেখতেই হবে। আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি।

প্রতিবারই তাঁর প্রেমিক তাঁকে বাধা দিয়েছেন। অস্থির হয়ে উঠেছেন মাদাম।

মাদাম জিজ্ঞাসা করেছেন: কেমন আছে সে?

আমি জানিনে। আমিও তাকে আর দেখিনি।

এও কি সম্ভব? ছেলে রয়েছে, অথচ তাকে না-জানাটা কি সম্ভব? তাকে ভয় করা—অসম্মানের বোঝা হিসাবে তাকে পরিত্যাগ করাটা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব?

ভাবতেও ভয়ে শরীর হিম হয়ে যায়।

রোদে-পোড়া তামাটে পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মাদাম বলে চললেন: একেই বলে ভগবানের বিচার। আমার কোন সন্তান হয় নি। তাকে একবার চোখে দেখার ইচ্ছেটাকে আর আমি দাবিয়ে রাখতে পারছিনে। চল্লিশটি বছর ধরে ও আমাকে কশাঘাতে জর্জরিত করছে। এসব জিনিস পুরুষ মানুষে বুঝতে পারে না। মনে রেখ, পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার সময় এসেছে আমার। আর কখনও হয়ত তাকে আমি দেখতে পাব না।…কী করে এটা সম্ভব হল? এতদিন তাকে আমি না দেখে থাকলাম কেমন করে? সারা জীবন ধরেই তার কথা আমি ভেবেছি। ফলে, কী দুঃখেই না জীবন কেটেছে আমার! তুমি কি জান, এমন একটা দিনও আমার যায় নি যেদিন ঘুম থেকে জেগে উঠেই তার কথা মনে হয় নি আমার। হায়রে, তার কাছে আমি কত অপরাধিনী! এইরকম ক্ষেত্রে লোকে কী বলবে সেই ভয়ে কি চুপ করে বসে থাকা সম্ভব? আমার উচিত ছিল সবকিছু ছেড়ে, সব ভয় পরিত্যাগ ক'রে

তার সঙ্গে চলে যাওয়া, তাকে মানুষ করা, তাকে ভালবাসা। তাহলে নিশ্চয় আমি খুশি হতাম। কিন্তু আমি তা সাহস করি নি। আমি কাপুরুষ ছিলাম। হায়রে, আমি কত সহ্য করেছি। এইসব পরিত্যক্ত শিশুরা নিশ্চয় তাদের মায়েদের কত ঘৃণাই না করে।

কান্নায় ভেঙে পড়ে হঠাৎ চুপ করে গেলেন মাদাম।

দ্য অ্যাপ্রিভেল বললেন: এখানে বস—বিশ্রাম কর একটু।

তাঁর সঙ্গে মাদাম একটি ছোট জলার ধারে হাতের চেটোয় মুখ ঢেকে ঘাসের ওপরে বসে পড়লেন। তাঁর মাথার সাদা চুলগুলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় দু'পাশে ঝুলতে লাগল। গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি ফোঁপাতে লাগলেন।

মঁসিয়ে চুপচাপ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কী যে করবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

তারপরে মাদামকে তিনি বললেন: এস; সাহস সঞ্চয় কর।

দাঁড়িয়ে উঠলেন মাদাম; বললেন: হ্যাঁ; সাহস সঞ্চয়ই করতে হবে।—তারপরে বৃদ্ধার স্খলিত পদক্ষেপে তিনি টলতে-টলতে এগোতে লাগলেন।

কিছুটা দূরে রাস্তার ওপরে মাঝে-মাঝে গাছের ঝাড় উঠেছে। তাদেরই ধারে কিছু ঘর সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানকার কামারশালা থেকে হাতুড়ি পেটার যে শব্দ হচ্ছিল সেই শব্দ তাঁরা শুনতে পাচ্ছিলেন। অনতিবিলম্বেই তাঁরা দেখতে পেলেন ডানদিকে একটা নিচু ঘরের সামনে একটা শকট এসে থামল; আর দেখলেন দু'টি লোক একটা চালার নীচে ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাচ্ছে।

মঁসিয়ে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কি পেইরি বেনিভিক্ট-এর গোলা?

একজন বলল: বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যান সরাইখানার পাশ দিয়ে; তারপর সোজা। পোরেট-এর বাড়ির পরে তৃতীয় বাড়িটা। বেড়ার ধারে একটা ছোট পাইন গাছ রয়েছে। চিনতে ভুল হবে না আপনাদের।

বাঁ দিকের পথ দিয়ে ঘুরে গেলেন তাঁরা। মাদাম ধীরে-ধীরে এগোচ্ছেন। প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি কেঁপে-কেঁপে উঠছেন; তাঁর বুক এত জোরে-জোরে কাঁপতে সুরু করল যে মনে হল তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে। প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি বিড়-বিড় ক'রে প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন—হে ভগবান, হায় ভগবান।

মঁসিয়েও বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন; মুখের রঙ-ও কিছুটা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর; তবু তিনি বেশ তীক্ষ্ণ স্বরেই বললেন: নিজেকে সংযত করতে না পারলে তুমি কিন্তু সব গোলমাল করে দেবে। ধরা পড়ে যাব আমরা। নিজেকে সংযত কর।

এক গোলা ঘর থেকে আর একটি গোলা ঘরের মধ্যে দিয়ে ছোট-ছোট সরু

পথগুলি এগিয়ে গিয়েছে। সেই পথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে শেষ পর্যন্ত একটা বাচ্চা পাইন গাছের সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা।

মঁসিয়ে বললেন: বাড়িটা এইখানেই।

থমকে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন মাদাম।

সামনে বিরাট জায়গা—সেই গোলাঘর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেইখানে আপেল গাছের সারি। এদের দিকে মুখ ক'রে আস্তাবল, মরাই, গোয়ালঘর, আর মোরগ চরার জায়গা। শ্লেটের ছাউনির তলায় কোম্পানীর গাড়ি, একটা দু'চাকার শকট, একটা ওয়াগন, আর দু'চাকার ঘোড়ায় টানা একটা হালকা গাড়িও দেখা গেল। গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাস খাচ্ছে চারটে বাছুর। কালো মুরগীগুলো চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কোথাও কোন শব্দ নেই। ঘরের দরজা খোলা; কিন্তু কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না।

ভেতরে ঢুকলেন তাঁরা। সঙ্গে-সঙ্গে বিরাট একটা নাসপাতি গাছের তলা থেকে একটা কালো কুকুর দৌড়ে এসে ভীষণ চীৎকার করতে লাগল।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মঁসিয়ে দ্য অ্যাপ্রিভেল চীৎকার করলেন: ভেতরে কেউ আছেন?

বছর দশেক বয়সের একটি মেয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পরনে তার কেবল একটি বক্ষ-আবরণী আর উলের পেটিকোট; পা দুটো খোলা আর অপরিষ্কার। মনে হল, মেয়েটি যেন ভয় পেয়েছে; আর সেইজন্যেই হয়ত বা সে দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল: কী চান?

তোমার বাবা বাড়িতে আছেন?

না।

কোথায় তিনি?

জানি না।

তোমার মা?

গরু নিয়ে মাঠে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি ফিরবেন?

জানি না।

বৃদ্ধ মহিলাটি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন; মনে হল, কেউ যেন তাঁকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—তাকে না দেখে আমি কিছুতেই যাব না।

আমরা অপেক্ষা করব, মাই ডিয়ার।

ঘুরে দাঁড়াতেই তাঁরা একটি মহিলাকে সেইদিকে আসতে দেখলেন। তার কাঁধে দুটো টিনের পাত্র। দেখে মনে হল বেশ ভারি। তাঁদের ধারণা হল রমণীটি একটি দরিদ্র চাকরানী—অপরিচ্ছন্ন, আর হতভাগ্য।

মেয়েটি বলল: ওই মা আসছে।

ঘরের সামনে এসে রমণীটি এই দুটি আগন্তুকের দিকে একটু বিরক্তিকর তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপরে তাঁদের যেন দেখে নি এইরকম একটা ভঙ্গি ক'রে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

মনে হল রমণীটির বেশ বয়স হয়েছে ; তার মুখটা শুকিয়ে চিপসে গিয়েছে ; একজন দেহাতি রমণীর মুখের মত তার ভেতরে কোন কমনীয়তা নেই।

মঁসিয়ে হাঁক দিয়ে বললেন : তোমার কাছ থেকে দু'গ্লাস দুধ কিনতে চাই আমরা।

টিনের পাত্র দুটি নামিয়ে রেখে ফিরে এল রমণীটি ; বলল : আমি দুধ বিক্রি করিনে।

আমাদের বড় তেষ্টা পেয়েছে। এই মহিলাটি বৃদ্ধা এবং পরিশ্রান্ত ; তেষ্টা মেটানোর মত কিছু পাওয়া যাবে কি ?

দেহাতি রমণীটি তাঁদের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে একবার তাকাল ; তারপর হঠাৎ মনস্থির করে বলল : আপনারা যখন এসেছেন তখন কিছু দুধ আপনাদের আমি দেব।

এই বলে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর দুটি চেয়ার নিয়ে এল বাচ্চা মেয়েটা ; আপেল গাছের তলায় পেতে দিল ; তারপরে ধূমায়িত দু'কাপ দুধ নিয়ে ফিরে এল তার মা ; আগন্তুকদের হাতে কাপ দুটি দিল।

রমণীটি তাদের সামনে এসে দাঁড়াল ; মনে হল, আগন্তুকদের আসল ইচ্ছেটা কী তাই সে জানতে চায়।

আপনারা কি ফি-ক্যাম্প থেকে আসছেন ?—জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি।

মঁসিয়ে বললেন : হ্যাঁ। গ্রীষ্মটা এখানে কাটানোর জন্যে এসেছি।

তারপরে একটু থেমে বললেন : প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের তুমি মুরগী বিক্রী করতে পারবে ?

একটু ইতস্তত করে মেয়েটি বলল : তা পারি। আপনাদের কি বাচ্চা মুরগী দরকার ?

হ্যাঁ—বাচ্চা।

বাজার থেকে কী দামে কেনেন ?

দ্য অ্যাপ্রিভেল-এর তা জানা ছিল না ; সঙ্গিনীর দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করলেন—কত দাম বলত ?

চার থেকে সাড়ে চার ক্রাঁ—আমতা-আমতা করে বললেন মাদাম। চোখ দুটি তাঁর জলে ভরে গেল।

বিশেষ আশ্চর্য হয়ে রমণীটি তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল : উনি কি অসুস্থ ? কাঁদছেন যেন···

কী উত্তর দেবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না মঁসিয়ে ; আমতা-আমতা করে বললেন : না, না। তা নয়। মানে, আসার পথে উনি ওঁর সুন্দর হাতঘড়িটা

হারিয়ে ফেলেছেন। সেইজন্তেই বড় দুঃখ পেয়েছেন, কেউ কুড়িয়ে পেলে আমাদের জানিও।

উত্তরটা মাদাম বেনিডিক্ট-এর কেমন অদ্ভুত লাগল ; কিন্তু কোন উত্তর দিল না সে। হঠাৎ সে বলে উঠল : ওই আমার স্বামী আসছে।

কথাটা শুনেই দ্য অ্যাপ্রিভেল ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। চেয়ার থেকে ঘুরে ব্যাকুলভাবে দেখার চেষ্টায় আর একটু হলে মাদাম হুমড়ি খেয়ে মাটির ওপরে পড়ে যেতেন।

দশ পা দূরে দাঁড়িয়েছিল একটি লোক ; তার হাতে ছিল একটা দড়ি ; সেই দড়ি দিয়ে একটা গরু বাঁধা। বেশ কুব্জ ; পরিশ্রান্ত হওয়ার ফলে বেশ কষ্টে নিঃশ্বাস ফেলতে হচ্ছিল তাকে। আগন্তুকদের দিকে লক্ষ্য না করেই লোকটি গালাগালি দিল একটা—বদমাস জানোয়ার কোথাকার!

তাঁদের পাশ দিয়ে গোয়ালঘরের দিকে এগিয়ে গেল লোকটি ; তারপরে সেখানে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বৃদ্ধাটির চোখের জল হঠাৎ শুকিয়ে গেল। কেমন যেন হতভম্ব হওয়ার ফলে বাকশক্তিরহিত আর চিন্তাশক্তিরহিত হয়ে গেলেন তিনি। এই তাঁর পুত্র—এই!

একই চিন্তায় মুহ্যমান হয়ে গেলেন দ্য অ্যাপ্রিভেল ; ক্লিষ্ট স্বরে বললেন : ইনিই মঁসিয়ে বেনিডিক্ট, তাই না?

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে রমণীটি জিজ্ঞাসা করল : ওর নামটা আপনাদের কে বলল?

বড় রাস্তার ধারে যে কামার রয়েছে সে-ই।

তারপরে সব চুপচাপ। সবাই তাকিয়ে রইল সেই গোয়ালঘরের দিকে। দেখে মনে হল বাড়ির গায়ে সেটা একটা কালো গর্তের মত। ভেতরে কী রয়েছে কিছুই চোখে পড়ল না তাঁদের ; গোয়ালঘরের ভেতরে যে শব্দ উঠছিল তাই তাঁদের কানে এল।

শেষ পর্যন্ত কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে লম্বা-লম্বা অপ্রকৃতিস্থ পা ফেলে গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে লোকটি বসতবাটির দিকে এগোতে লাগল। পথে আবার সে আগন্তুকদের কাছাকাছি এসে পড়ল ; কিন্তু আগন্তুকদের উপস্থিতি লক্ষ্য না করেই সে তার স্ত্রীকে বলল : আমার জন্য এক গ্লাস আপেলের রস নিয়ে এস। আমার বড় পিপাসা পেয়েছে।

এই কথা বলে সে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল ; তার স্ত্রী চলে গেল মদের বোতল যে-ঘরে পোঁতা থাকে সেই ঘরের দিকে। কেবল দুটি বিদেশীই চুপচাপ বসে রইল।

কী করা উচিত বুঝতে না পেরে মাদাম আমতা-আমতা করে বললেন : হেনরি, আমরা যাই চল।

দ্য অ্যাপ্রিভেল তাঁর হাত ধরে তাঁকে ওঠালেন ; সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে

ধরলেন ; মনে হল, মাদাম এখনই পড়ে যাবেন। তারপরে, একটা চেয়ারের ওপরে পাঁচটা ফ্রাঁ ছুঁড়ে দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

ফটক থেকে বেরোনোর সঙ্গে-সঙ্গে মাদাম ফোঁপাতে লাগলেন—হায়রে হায়, তুমি ওর এই হাল করেছ ?

দ্য অ্যাপ্রিভেল কেমন বিবর্ণ হয়ে গেলেন ; তারপরে বেশ রূঢ়ভাবেই তিনি বললেন : আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তাই আমি করেছি। ওর এই সম্পত্তির দাম আশী হাজার ফ্রাঁ। অনেক মধ্যবিত্তই বিয়ের যৌতুক হিসাবে এত টাকা পায় না।

আর কোন কথা না বলে তাঁরা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। মাদাম তখনও ফোঁপাচ্ছেন। চোখের জল অবিরাম গতিতে বেরিয়ে তাঁর দুটি গাল বেয়ে তখন গড়িয়ে পড়ছে।

মোহাম্মেদ ফ্রিপুইল

[Mohammed Fripouille]

ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলেন—ছাদের ওপারে বসে কি আমরা কফি খাব ?

আমি বললাম—নিশ্চয় ; সে কথা আর বলতে !

তিনি উঠলেন। ঘরের মধ্যে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। মুরদের বাড়ির প্রথা অনুযায়ী ভেতরের দালানে যে আলো জ্বলছিল তারই ছিটেফোঁটা এসে পড়েছিল ঘরের ভেতরে, টেবিলের ওপরে বেশ বড়-বড় আফ্রিকার ফল ছাড়া আর কিছুই পড়ে ছিল না। কুলের মত বড়-বড় আঙুর ফল, লাল রঙের ডুমুর, হলদে আপেল, লম্বা পুরুষ্ট কলা ; আর যে-সব ঘাস দিয়ে কাগজ তৈরী হয় সেই ঘাসের ঝুড়িতে টোগোর্ট-এর খেজুর।

মুরদেশীয় চাকর দরজা খুলে দিলে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সুরু করলাম। শেষ অপরাহ্নের মৃদু আলোতে আকাশ-রঙা দেওয়ালগুলি আলোকিত হয়ে উঠেছিল। খোলা বারান্দার ওপরে এসে আমি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললাম। এখান থেকে অ্যালজিয়ার্স দেখা যায়, দেখা যায় বন্দর, রাজপথ আর দূরের সমুদ্রতীর।

ক্যাপ্টেন যে বাড়িটি কিনেছেন সেটি হল প্রাচীন একটি আরব বসতির মধ্যে। এখানকার পথঘাটগুলি আঁকাবাঁকা—গলি-ঘুজিতে বোঝাই। এদের ভেতর দিয়ে আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলের বাসিন্দারা গিজ-গিজ করছে। নীচে চওড়া চৌকো ছাদগুলি অতিকায় সিঁড়ির মত য়েরোপীয়ান বসতি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। আর ওপাশে নোঙর-বাঁধা জাহাজের মাস্তুল, আর নিস্তব্ধ নীল আকাশের নীচে উন্মুক্ত সমুদ্র।

বালিশের ওপরে মাথা দিয়ে আমরা মাদুরের ওপরে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে

শুয়ে বেশ মিষ্টি স্বাদের দেহাতি কফি একটু-একটু করে খেতে লাগলাম। অন্ধকারে ঢাকা নীল আকাশের ভেতর থেকে প্রথম নক্ষত্রগুলিকে ফুটে উঠতে দেখতে পেলাম। একটি হালকা ধরনের উষ্ণতা আমাদের আদর করে গেল। মাঝে-মাঝে আফ্রিকার ফুলের গন্ধ নিয়ে জোরাল বাতাস-ও গেল বয়ে। মনে হল অ্যাটলাস পাহাড়ের ওপর দিয়ে মরুভূমির গন্ধ মেখে সেই বাতাস দৌড়ে আসছে। ক্যাপটেন ওপর দিকে মুখ করে শুয়ে মন্তব্য করলেন: কী সুন্দর দেশ বন্ধু! জীবন এখানে কী মধুর! এখানে বিশ্রামের আয়োজনটি কী মিষ্টি। স্বপ্ন দেখার জন্যেই এইরকম রাত্রির সৃষ্টি হয়েছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে নক্ষত্রের আবির্ভাব দেখতে-দেখতে অলসভাবে সুখের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে বললাম: দক্ষিণে তোমার জীবন কেমন করে কেটেছিল সেবিষয়ে কিছু বলা নিশ্চয় তোমার উচিৎ।

ক্যাপটেন ম্যারেট ছিলেন আফ্রিকান আর্মির একটি বেশ পুরানো অফিসার। ছিলেন সিপাই; পরে তরোয়ালের মুখে তিনি তাঁর উন্নতির পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন। এদিক থেকে তাঁকে সৌভাগ্যবান বলা যেতে পারে, তাঁর পরিচিত আর তাঁর বন্ধুবান্ধবদের ধন্যবাদ; তাঁদের সাহায্যেই মরুভূমির ওপরে এমন সুন্দর অভিযানটি আমার সার্থক হয়েছে। ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার আগে সেই রাত্রিতে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কী রকম গল্প তুমি শুনতে চাও? এই মরুভূমিতে আমি বিশ বছর চাকরি করেছি; সেই বিশ বছরের চাকরি-জীবনে এতরকমের ঘটনা আর দুর্ঘটনা ঘটেছে যে তাদের পৃথক-পৃথক করে দেখার মত সামর্থ্য আমার নেই।

আরব দেশের মেয়েদের কথা বল।

ক্যাপটেন কোন কথা বললেন না। মাথার নীচে দুটি হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মাদুরের ওপরে চুপচাপ শুয়ে রইলেন। মাঝে-মাঝে তাঁর পোড়া সিগারেটের গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল; আর সেই গন্ধ গুমোট রাত্রির আকাশে পড়ছিল ছড়িয়ে।

হঠাৎ তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন: বেশ। অ্যালজিরিয়াতে প্রথম চাকরি জীবনে যে একটা হাসির ঘটনা ঘটেছিল সেই কাহিনীই তোমাকে আজ বলব। সেই সময় আফ্রিকার সেনাবাহিনীতে অদ্ভুত ধরনের কিছু অফিসার ছিলেন। সেই সব মানুষও আজকাল নেই; সেই সব অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনাও আজকাল আর ঘটতে দেখা যায় না। ঘটলে সারা জীবনই তুমি মহাস্ফূর্তিতে এদেশে কাটিয়ে দিতে পারতে।

আমার বয়স তখন কুড়ি। মাথায় সুন্দর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। খুব কর্মঠ—যাকে বলে একেবারে দুর্দান্ত—সাধারণ সৈনিক ছিলাম তখন; কিন্তু অ্যালজিরিয়ার সৈন্য বলতে যা বোঝা যায় ঠিক সেইরকম। বোমারের সামরিক

ঘাঁটির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম আমি। তুমি জান, বোঘারকে সবাই বলত দক্ষিণ দিকের বারান্দা। বস্তুত, এখান থেকেই মরুভূমি সুরু। প্রচণ্ড সূর্যের তাপে গনগনে বালির দাবানল সেখান থেকে বেশ স্পষ্টই দেখা যেত।

'একদিন সংবাদ এল যে আউলড বাখি যাযাবরের দল একজন ইংরাজ ভ্রমণকারীকে হত্যা করেছে। খবর যখন পৌছলো তখন বোঘারে সিপাই ছিলাম আমরা চল্লিশজন, একদল কয়েদী সেনাবাহিনী, আর এক কোয়াড্রন বর্শাধারী আফ্রিকান সেনা। ভগবান জানেন, ইংরাজ ভ্রমণকারীটি কেমন করে এদেশে এসে পড়লেন। তবে ইংরাজদের মাথায় মাঝে-মাঝে শয়তান ভর ক'রে তাদের যত সব অকুতোস্থানে ঘুরিয়ে মারে।

'য়েরোপীয়ানকে হত্যা করা পাপ ; এবং হত্যাকরীদের তার জন্তে শাস্তি পেতেই হবে। এই শাস্তি দেওয়ার জন্তে একদল সেনাবাহিনী পাঠানো উচিৎ কিনা সেবিষয়ে আমাদের সেনাপতি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে একজন ইংরাজকে হত্যা করার জন্তে খুব বেশী একটা হইচই না করাই ভাল।

'তুমি জান, গ্যারিশন শহরের চেয়ে দক্ষিণে সামরিক বাহিনীর স্বাধীনতা অনেক বেশী। এদিকে অফিসার আর তাঁর অধস্তন সেনানীদের মধ্যে বেশ একটা প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে। এ জিনিসটা তুমি অন্ত কোথাও দেখতে পাবে না। ব্যাপারটা নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি এমন সময় একজন অশ্বারোহী সার্জেন্ট বলে উঠলেন—আমাকে ছ'জন সৈন্ত দিলে আমি শয়তান-দের শায়েস্তা করে আসব।

ক্যাপটেন হো-হো করে হেসে বললেন—বৎস, তুমি ?

'হ্যাঁ ক্যাপটেন। চান তো সমস্ত দলটাকেই আমি বন্দী করে আনব।'

অফিসারটি ছিলেন খেয়ালী। তিনি সার্জেন্টের মুখের কথাতেই বিশ্বাস করে বললেন : তোমার খুশিমত ছ'জন বেছে নিয়ে কাল সকালেই তুমি বেরিয়ে পড়বে। যদি প্রতিজ্ঞা রাখতে না পার তাহলে বিপদে পড়তে হবে।

'গোঁফের তলায় হেসে সার্জেন্ট বললেন : ভয় নেই কর্নেল, খুব দেরী হলে বুধবার দুপুরের মধ্যে আমার বন্দীরা এখানে এসে হাজির হবে।

এই সার্জেন্টের নাম সার্জেন্ট মোহাম্মেদ ক্রিপুইল, মানুষটা একেবারে খাঁটি তুর্কী—অদ্ভুত—আশ্চর্য ধরনের। অনেক ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে সে ফরাসী সেনাবাহিনীতে চাকরি নেয়। গ্রীস, এশিয়া মাইনর, ইজিপ্ট, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি নানান দেশে সে ঘুরে বেড়ায় ; এই সব জায়গায় অনেক খারাপ কাজ নিশ্চয় সে করে এসেছে। সত্যিকার শক্ত বলতে যা বোঝায় লোকটি সেইরকম ; হনুমানের মত চতুর, আর সেই সঙ্গে দক্ষ অশ্বারোহী। তার গোঁফ জোড়াটি দীর্ঘায়ত— এত দীর্ঘ যে চোখে না দেখলে মানুষের বিশ্বাস হবে না ; আর যমকালো। আরবদের সে সত্যিকার ঘৃণা করত ; আর তাদের জব্দ করার জন্তে

সব সময় সে নিষ্ঠুর মতলব ভাজতো। তার গায়ে শক্তি ছিল অসীম; আর লোকটা ছিল অসম্ভব রকমের দুর্ধর্ষ।

আমাকে নির্বাচিত করল মোহাম্মেদ। আমার ওপরে বীরপুঙ্গবটির আস্থা ছিল অগাধ, আমাকে নির্বাচন করার জন্যে দেহ আর মনে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে আমি যে সম্মানসূচক ক্রশ পেয়েছিলাম তার জন্যে আমি যতটা আনন্দ পেয়েছিলাম—সেদিন তার সঙ্গী হতে পেরেও ঠিক ততটা আনন্দই পেয়েছিলাম।

'মোহাম্মেদ আমাদের প্রত্যেককে দশটা করে দড়ির টুকরো দিল; প্রতিটি টুকরোর দৈর্ঘ্য এক গজ ক'রে, আমিই ছিলাম বয়সে সকলের ছোট; আর দেহের ওজন ছিল আমার সবচেয়ে কম। ফলে আমার ওপরেই ভার পড়ল ওই একশ গজ দড়ি বওয়ার। এই সব দড়ি দিয়ে কী হবে জিজ্ঞাসা করায় সে ঠাণ্ডা মাথায় তির্যক ভঙ্গীতে বলল: আরবদের বঁড়শীতে গেঁথে তোলার জন্যে।

আমাদের দলের পুরোভাগে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। মাথার ওপরে একটা লাল পাগড়ী বাঁধা; মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর সময় সে ওইভাবেই পাগড়ী বেঁধে নিত। বিরাট গোঁফের আড়ালে সে হাসতে লাগল। দেখতে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। বিরাট দশাসুর চেহারার তুর্কী; বিরাট ভুঁড়ি, সুবিরাট কাঁধের পরিধি; ধীর স্থির। মাঝামাঝি দোহারা চেহারা একটা সাদা ঘোড়ার ওপরে চেপেছিল সে; কিন্তু বড় শক্ত, বড় তেজী সেই ঘোড়া। তবে আরোহীটি তার চেয়ে দশগুণ বিরাট। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে ছিল একজন স্প্যানিয়ার্ড, দুজন গ্রীক, একজন অ্যামেরিকান, তিনজন ফ্রেঞ্চ। বিভিন্ন ঢঙে তারা সব কথাবার্তা বলছিল। আর মোহাম্মেদ ক্রিপুইলের কথা স্বতন্ত্র। কথা বলার সময় সে অদ্ভুতভাবে তোতলামি করত।

'দক্ষিণ দিকের সূর্য ভয়ঙ্কর; দাবানলের মত; ভূমধ্যসাগরের অপরদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে এ-সূর্যের পরিচয় নেই। সেই রোদের মধ্যে দিয়ে আমরা ধীর গতিতে এগোতে লাগলাম। সারাদিনই আমাদের এইভাবে কাটলো; না পড়ল একটা গাছের ছায়া; না দেখলাম কোন আরবের অধিবাসীকে। দুপুরের দিকে একটা ঝরনার ধারে বসে শুকনো মাটন আর রুটি চিবিয়ে মিনিট কুড়ির মত বিশ্রাম নিলাম আমরা। তারপর আবার চলতে সুরু করলাম।

অনেক ঘোরাঘুরির পর অবশেষে সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ মোচার মত একটা ছোট পাহাড়ের তলায় আমরা একদল দেহাতি লোকের সন্ধান পেলাম। হলদে মাটির ওপরে তাদের সেই নীচু খয়েরি তাঁবুগুলিকে দেখে মনে হল কালো-কালো বিন্দুর মত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ওগুলো মরুভূমিতে গজিয়েওঠা বিরাট বিরাট লতানে গুল্ম ছাড়া আর কিছু নয়।

'ওই লোকগুলোকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। একটু দূরে

ঘাসের ঘন সবুজ মাঠের ধারে দড়ি দিয়ে বাঁধা ঘোড়াগুলি ঘাস খাচ্ছে।

'মোহাম্মেদের নির্দেশ এল—'জলদি চল।' ঝড়ের মত আমরা তাঁবুর মাঝখানে এসে হাজির হলাম। ভয়ে হতভম্ব হয়ে সাদা ন্যাকড়া জড়ানো মেয়েরা ঝটিতি ক্যানভাসের তৈরী তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাড়ানো পশুর মত সেইখানে শুয়ে-শুয়ে ভয়ে চীৎকার করতে লাগল। আর পুরুষেরা পাহাড়ের চারপাশ থেকে নেমে এল সম্ভবতঃ আত্মরক্ষা করার জন্যে। ওখানকার সবচেয়ে উঁচু তাঁবুটা সম্ভবতঃ ওদের সর্দারের। আমরা সোজা সেইদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

মোহাম্মেদের অনুকরণে আমাদের তরোয়াল খাপেই পোরা ছিল, একটা অদ্ভুতভাবে সে ঘোড়া ছোটালো। ছোট ঘোড়াটার ওপরে খাড়া হয়ে সে চুপচাপ বসে রইল। তার ভারে ঘোড়াটা ছটফট করতে লাগল। লম্বা গোঁফধারী অশ্বারোহীর শান্ত সমাহিত ভাবের সঙ্গে জানোয়ারটির অস্থিরতা বেশ একটা বৈষম্যের সৃষ্টি করেছিল।

'তাঁবুর সামনে যেতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সর্দার। লম্বা রোগাটে চেহারার মানুষ এই সর্দার; কালো, চোখ দুটো তীক্ষ্ণ, মেজাজী; ঝুলেপড়া কপাল; ভুরু দুটি অর্দ্ধ বৃত্তের মত বাঁকানো।

'আরবী ভাষায় সে চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করল: কী চাই?

'বলগায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে মোহাম্মেদ তার ঘোড়াটা থামাল; একই ভাষায় বলল: তুমিই কি একজন ইংরেজ পথিককে মেরেছ?

'সর্দার বেশ চীৎকার করেই উত্তর দিল: ও প্রশ্ন করার কোন অধিকার তোমার নেই।

'আমাদের চারপাশে তখন আরবরা ঘিরে ফেলেছে; গর্জন করছে—মনে হচ্ছে ওটা হল ঝড়ের পূর্বাভাষ। তারস্বরে চীৎকার করতে সুরু করেছে তাঁরা। তীক্ষ্ণচঞ্চু শিকারী পাখির মত মনে হল তাদের। তাদের হাড়-বার-করা রোগা মুখ আর ঢিলে জামা সেই উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

'মোহাম্মেদের চোখে উত্তেজনা; মাথার পাগড়িটা একপাশে সরানো। সে তখন হাসছিল। সকলের স্বর-ছাপিয়ে বজ্রনির্ঘোষে সে বলল: যে হত্যা করেছে তাকে আমরা তাকে হত্যা করব।

এই বলেই সর্দারের তামাটে মুখের ওপরে সে রিভলবারটা উঁচিয়ে ধরল। নলের মুখ থেকে একটু ধোঁয়া বেরোতেও দেখতে পেলাম। তারপরেই সর্দারের মাথার খিলুটা ছিটকে পড়ল, তার কপালের ওপরে রক্তের ফোয়ারা ছুটল। মনে হল যেন বিদ্যুতের স্পর্শে সে আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে গেল— হাত দুটো তার লুটিয়ে পড়ল দু'পাশে।

'চারপাশ প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়ল; মনে হল আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। মোহাম্মেদ তার তরোয়াল খুলে প্রস্তুত হয় দাঁড়াল; আমরাও তার

দেখাদেখি তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যাঁরা তার কাছাকাছি এগিয়ে এল তরোয়ালের কোপ আকাশের বুকে বসাতে-বসাতে তাদের দূরে সরিয়ে দিল; তারপর চীৎকার করে বলল: যারা বশ্যতা স্বীকার করবে তাদের আমরা কিছু বলব না; যারা তা না করবে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।

'এই কথা বলে সবচেয়ে কাছের লোকটাকে তার সেই শক্তিমান মুঠোর মধ্যে ধরে সে তাকে নিজের ওপরে এড়োএড়ি শুইয়ে দিল; তারপরে তার দুটো হাত বাঁধতে-বাঁধতে চীৎকার করে বলল—তোমরাও এইরকম কর; যে বাধা দেবে তাকে তরোয়াল দিয়ে কুঁচিয়ে ফেল।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে এইভাবে আমরা কুড়িজন আরবকে বন্দী করে তাদের হাতগুলো শক্ত করে বেঁধে ফেললাম। তারপরে আমরা পলায়মান লোকদের পিছু ধাওয়া করলাম। আমাদের সেই খোলা তরোয়াল দেখে অনেকেই তখন দৌড় দিয়েছে। আরও প্রায় তিরিশজন লোককে আমরা বন্দী করলাম।

'সারা অঞ্চলটাই তখন সাদা পোশাক-পরা দেহাতি লোকদের ভয়ার্ত চীৎকার আর ছোটাছুটিতে সরগরম হয়ে উঠেছে। মেয়েরা চীৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে তাদের বাচ্চাগুলিকে টেনে তাঁবুর মধ্যে ঢোকাতে লাগল। শেয়ালের মত হলদে কুকুরগুলো তাদের সাদা-সাদা দাঁত বার করে আমাদের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

'আনন্দে আত্মহারা হয়ে মোহাম্মেদ ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে মাটির ওপরে নেমে পড়ল; তারপরে আমি যে দড়ির গোছা নিয়ে এসেছিলাম সেগু'ল আমার থেকে নিয়ে বলল: বৎসগণ, এখন সাবধান। তোমাদের মধ্যে দু'জন নেমে পড়।

'তারপর সে এমন একটি কাজ করল যেটি যেমন বীভৎস তেমনি হাস্যকর। বন্দীদের বা ঝুলন্ত লোকদের নিয়ে সে একটা লম্বা হার গেঁথে ফেলল। প্রথম বন্দীটার হাতের কব্জী দুটো শক্ত করে বাঁধলো; তারপরে সেই দড়ির বাকি অংশটা নিয়ে সে তার গলায় ফাঁস বেধে দিল। সেই দড়ির বাকিটুকু দিয়ে দ্বিতীয় বন্দীটির কব্জী বেঁধে তাই দিয়ে তার গলায় লাগাল ফাঁস, আমাদের পঞ্চাশজন বন্দীর অবস্থা দাঁড়াল বিপজ্জনক। কেউ পালানোর চেষ্টা করলেই তার নিজের গলায় তো ফাঁস শক্ত হয়ে বসে যাবেই, পরন্তু আর দু'জনেরও ফাঁস শক্ত হওয়ার ফলে দম আটকে মরে যাবে তারা, এইভাবে তাদের সমান তালে হাঁটতে বাধ্য করলাম আমরা। পদক্ষেপের একটু ইতরবিশেষ হলেই তাদের দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তাদের পক্ষে সে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি।

'কাজ শেষ হওয়ার পরে মোহাম্মেদ হাসতে লাগল—সে হাসি নিঃশব্দ—মুখের ওপরে প্রকাশ পেল না বটে; কিন্তু সেই হাসির গমকে পেটটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। "একেই বলে আরব-শৃঙ্খল।" ভয়ার্ত বন্দীদের করুণ মুখের

দিকে তাকিয়ে আমরাও সব হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম।'

আমাদের নেতা নির্দেশ দিলেন—এখন বৎসগণ, একটা-একটা খুঁটো পুঁতে দড়ির সঙ্গে বাঁধ।

সেই ভূতুড়ে গতিহীন স্থবির বন্দীরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; আমরা যথারীতি খুঁটো পুঁতে দিলাম।

'নেতা হুকুম দিলেন—এবার ডিনার তৈরী কর।

'আগুন জ্বালানো হল; একটা মেড়াকে ছাড়িয়ে আস্তো ঝলসানো হল সেই আগুনে. সেইটাই শুধু হাতে আমরা ভাগ করে নিলাম। তাঁবুর ভেতর থেকে কিছু খেজুর আর দুধ সংগ্রহ করেছিলাম; সেগুলিও উদরস্থ করলাম আমরা। পলাতক আসামীরা যে সামান্য কিছু হীরের গহনা তাঁবুর মধ্যে ফেলে গিয়েছিল সেগুলিও কুড়িয়ে নিলাম আমরা।

'আমরা যখন নিরুপদ্রবে বসে-বসে খানা খাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ আমার চোখে পড়ল সামনের পাহাড়ের ওপরে একটি অদ্ভুত জনসমাবেশ হয়েছে। এরা সেই পলাতক নারীদের দল, এখন তারা আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। মোহাম্মেদের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করলাম আমি। সে হেসে বলল—ওরাই আমাদের শেষ ভোজনের অনুপান। তাই বটে।

'ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাগলের মত তারা আমাদের দিকে দৌড়ে এল; সেই ভাবে ছুটে আসতে-আসতে আমাদের ওপরে ঝুড়ি-ঝুড়ি পাথর ছুঁড়তে লাগল। লক্ষ্য করলাম তাদের কাছে ছোরাও রয়েছে। আর রয়েছে তাঁবু পোঁতার বড় বড় পেরেক আর ভাঙা মাটির পাত্র।

'মোহাম্মেদ এবারে ভয় পেয়েছে বোঝা গেল; সে চীৎকার করে বলল: ঘোড়ায় ওঠ।

'এবারে পালাতেই হবে; কারণ সে-আক্রমণ ভয়ঙ্কর। বন্দীদের মুক্ত করার জন্যে তারা দড়ি কাটার চেষ্টা করতে লাগল, বিপদটা কোথায় বুঝতে পেরে আমাদের নেতা তো ভীষণ ক্ষেপে উঠে হুকুম জারি করল—ওদের কেটে কুঁচিয়ে ফেল, কেটে কুঁচিয়ে ফেল।

এই নতুন ধরনের আক্রমণে হতচকিত হয়ে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাছাড়া মেয়েদের হত্যা করতেও কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল আমাদের। এই দেখে মোহাম্মেদ একাই তরোয়াল বাগিয়ে তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'সেই ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা নারীদের বিরুদ্ধে একাই সে লড়ে গেল। সেই জানোয়ারটা হত্যার বিপুল আনন্দে এমনভাবে বেপরোয়া তার তরোয়াল ঘোরাতে লাগল যে একটার পর একটা নারী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

'এত ভয়ঙ্করভাবে সে নিধন-যজ্ঞ শুরু করল যে নারীরা যেমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসেছিল ভীত-চকিত হয়ে তেমনি দ্রুতগতিতেই তারা চারপাশে

পালাতে লাগল। পেছনে ফেলে গেল এক ডজনের মত মৃত অথবা আহত নারীদের। তাদের রক্তে পলায়মানাদের সাদা পোশাক লাল হয়ে গেল।

মোহাম্মেদ বিকৃত মুখে আমাদের দিকে ঘুরে বলল: বৎসগণ, এবার আমরা পালিয়ে যাই চল। ওরা আবার আসছে।

'নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পিছু হটতে শুরু করলাম আমরা—বন্দীদের নিয়ে এগোতে লাগলাম ধীরে-ধীরে। দম বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার ভয়ে তারা কেমন চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে গেল।

'পরের দিন আমরা যখন গলায় দড়ি-বাঁধা বন্দীদের নিয়ে বোঘার-এ হাজির হলাম তখন বেলা বারটা বাজে। পথে মারা গিয়েছিল মাত্র ছ'জন। কিন্তু পথে প্রায়ই আমাদের নেমে বন্দীদের গলার দড়িগুলিকে কিছু শিথিল করতে হয়েছিল; অন্যথায় প্রতিটি হেঁকচায় অন্তত দশ থেকে বারজন একসঙ্গে মারা যেত।'

থামল ক্যাপটেন। আমি কোন উত্তর দিলাম না। যেসব দেশে এই সব ঘটনা ঘটে সেই অদ্ভুত দেশের কথা আমি ভাবতে লাগলাম। কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি; সেই সঙ্গে অসংখ্য চকচকে নক্ষত্রের দিকে।

বার্থা

[Berthe]

ডঃ বোনেট আমার একটি বয়স্ক বন্ধু। মাঝে-মাঝে মানুষের এমন কিছু বন্ধু থাকে যারা বয়সে অনেক বড়। রায়োমে তাঁর সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর জন্যে তিনি প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন। ১৮৭৬ সালে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি একটা সময়ে ঠিক করলাম এবার সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করব।

সকালের ট্রেনে নির্ধারিত স্টেশনে হাজির হলাম। হাজির হয়ে প্লাটফর্মের ওপরে প্রথমে যিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি হচ্ছেন ডঃ বোনেট। তাঁর পোশাক ছিল ধূসর রঙের। মাথায় চাপিয়েছিলেন নরম ফেল্ট-এর একটা টুপী—গোল আর কালো; ধোঁয়াহীন চুল্লীর মত তার মাথাটা সুঁচোলো। এইভাবে সজ্জিত হওয়ার ফলে ডঃ বোনেটকে একটি যুবক-বৃদ্ধ বলেই মনে হল আমার—রোগা শরীরের ওপরে হালকা রঙের কোট; বিরাট মাথার ওপরে সাদা ধপধপে চুলের স্তবক।

অনেক দিনের প্রত্যাশিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে মফঃস্বল শহরের মানুষেরা যে অকৃত্রিম আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানান তিনি আমাকে ঠিক সেইভাবে জড়িয়ে ধরলেন, তারপরে তাঁর দুটি হাত দু'দিকে প্রসারিত করে বেশ গর্বের সঙ্গেই বললেন: এই হচ্ছে আমাদের অভরজিঁ শহর।

আমার চোখে কিন্তু চারপাশে পাহাড় ছাড়া আর কিছুই পড়ল না। পাহাড়ের চূড়াগুলি সব ছাঁটাই করা। দেখে মনে হল ওগুলি একদিন আগ্নেয়গিরি ছিল—বর্তমানে নির্বাপিত।

স্টেশনটির ওপরে শহরের নাম লেখা প্লেট একটা ছিল। একটা আঙুল তুলে সেইদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তিনি বললেন: এই সেই রায়োম —ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্মভূমি—আদালতের গর্ব। শহরটিকে আমরা প্রখ্যাত ডাক্তারদের জন্মভূমি বলেও অভিহিত করতে পারি।

কেন? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

তিনি হেসে বললেন: কেন? শহরের নামটা উলটিয়ে পড়—হয়ে যাবে 'মোরি'—যার অর্থ হচ্ছে 'মরা'। সেইজন্যেই তো আমি এরই কাছাকাছি একটা জায়গায় আস্তানা নিয়েছি বৎস।

নিজের রসিকতায় খুশি হ'য়ে হাত কচলাতে-কচলাতে তিনি আমাকে নিয়ে এগিয়ে এলেন।

এক কাপ কফি গলাধঃকরণ করার সঙ্গে-সঙ্গে পুরানো শহরটি দেখার জন্যে বেরোতে হল আমাকে। ডাক্তারের বাড়ি আর অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাড়িগুলি—রঙ তাদের সব ক'টিরই কালো—আমার ভালই লাগল। সেগুলির সামনেটা খোদাই করা পাথর দিয়ে তৈরী। কসাইদের সেন্ট ভার্জিনের মূর্তিটির আমি বেশ প্রশংসা করলাম: আর এই সম্পর্কে আমি এমন একটা হাসির অভিযানের গল্প শুনলাম যে-বিষয়ে আর একদিন আপনাদের আমি কিছু বলব; এমন সময় ডঃ বোনেট বললেন পাঁচ মিনিটের মত ছুটি দাও আমাকে। একটা রোগী দেখতে যাব। ফিরে এসে লাঞ্চের আগেই তোমাকে আমি চ্যাটেল গুয়েঁা পাহাড়ের ওপরে নিয়ে যাব। সেখান থেকে সারা শহরের দৃশ্যটা তুমি দেখতে পাবে; সেই সঙ্গে দেখতে পাবে পুই-দ্য-ডোম-এর সারা পার্বত্য অঞ্চল। তুমি এই ফুটপাতের ওপরে দাঁড়াও; আমি যাব আর আসব।

মফঃস্বল শহরের পুরানো বিরাট একটি বাড়ির ঠিক উলটো দিকে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি চলে গেলেন। বাড়িটি অন্ধকার, বন্ধ, নিস্তব্ধ এবং নিরানন্দ। বাড়িটার চেহারা দেখে তাকে আমার বেশ অলুক্ষণে বলেই মনে হল। এরকম মনে হওয়ার কারণটা কী তা-ও আমি বুঝতে পারলাম। শক্ত কাঠের জাফরী দিয়ে একতলার সব বড় জানালার নীচের অর্দ্ধেকটাই ঢাকা, খোলা কেবল ওপরের অর্দ্ধেকটুকু, মনে হল এই ঘরে কাউকে বন্দী করে রাখা হয়েছে; এবং সে যাতে বাইরের কিছু দেখতে না পায় তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। ডাক্তার ফিরে এলে তাঁকে আমি ওই কথাটাই বললাম।

তিনি বললেন: ভুল হয় নি তোমার। যে হতভাগ্য প্রাণীটি ওইখানে বন্দী হ'য়ে রয়েছে বাইরের জিনিস কিছুতেই তার দেখা চলবে না। প্রাণীটি একটি উন্মাদিনী নারী, মূর্খ অথবা পঙ্গুও বলতে পার তাকে। সত্যিই কাহিনীটি

বড় করুণ, আর সেই সঙ্গে রোগ নিরূপণবিদ্যার একটি অত্যাশ্চর্য নিদর্শনও বটে। সে-কাহিনী তুমি শুনবে ?

বলুন।

তিনি বললেন : আমার মনিব—ওই বাড়ির যাঁরা মালিক—আজ থেকে কুড়ি বছর আগে তাঁদের একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি আর দশটা মেয়েরই মত। কিন্তু আমি শীঘ্রই দেখলাম যদিও বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটির শরীর অদ্ভুতভাবে পুষ্ট হয়ে উঠেছে ; তবু তার বুদ্ধির বিকাশ একেবারে হচ্ছে না। অতি অল্প বয়স থেকে সে হাঁটতে পারত ; কিন্তু কথা বলতে সে আদৌ চাইত না। প্রথমে ভেবেছিলাম মেয়েটা কানে শুনতে পায় না, পরে বুঝলাম—শুনতে সে পায় ঠিকই ; কিন্তু বুঝতে পারে না কিছুই। ভয়ঙ্কর শব্দে সে কাঁপতে থাকে, কিন্তু সেই সব হট্টগোলের উৎস কোথায় তা সে বুঝতে পারে না।

বেড়ে উঠল মেয়েটি ; শারীরিক গঠন তার অপূর্ব হয়ে দেখা দিল ; কিন্তু কথা সে বলতে পারল না—বুদ্ধির দরজা এতটুকু খুলল না। তার মগজের মধ্যে বুদ্ধির রশ্মি ঢোকানোর কত চেষ্টাই না আমি করলাম, আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। মনে হল, সে তার নার্সকে চিনতে পারে ; কিন্তু দুধ ছাড়ার পর মাকে সে আর চিনতে পারে না। যে শব্দটা শিশুরা প্রথম উচ্চারণ করে, মরার সময় সৈন্যরা যে-শব্দটা একেবারে শেষে উচ্চারণ করে—সেই শব্দটা বলতে সে কোনদিনই জানত না। মাঝে-মাঝে জড়িয়ে-জড়িয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করত সে ; কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই মুখ থেকে বেরোত না তার।

আবহাওয়া ভাল থাকলে পাখির কাকলির মত সে হাসত ; বৃষ্টি পড়লে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর কুকুরের মত সে আর্তনাদ করত। বাচ্চা পশুর মত সে ঘাসের ওপরে গড়াগড়ি দিতে ভালবাসত ; সূর্যের আলো তার ঘরে ঢুকলে আনন্দে সে হাততালি দিত। জানালা খোলা হলেই তাকে পোশাক পরিয়ে দেওয়ার জন্যে সে হাততালি দিত। তার মা বা চাকরাণী, তার বাবা অথবা আমি, কোচয়ান অথবা বাবুর্চি—এদের মধ্যে কোন পার্থক্যই তার নজরে পড়ত না।

তার অসুখী বাপ-মাকে আমার বেশ ভাল লাগত ; আমি প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের দেখতে যেতাম, প্রায়ই আমি তাঁদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতাম ; আর সেই সময়েই দেখতাম বিশেষ কয়েকটি খাবারের ওপরে বার্থার [মেয়েটির নাম বার্থা] বিশেষ ঝোঁক ছিল।

সেই সময় তার বয়স বারো ; অথচ দেখতে ছিল আঠারোর মত ; আমার চেয়েও সে ছিল লম্বা। হঠাৎ আমার মনে হল ওর মগজের শিরায় কম্পন জাগানোর জন্যে খাবারের ওপরে ওর যে কিছুটা লোভ রয়েছে সেটাকে বাড়িয়ে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়। বিভিন্ন স্বাদ আর গন্ধের খাবার ওর সামনে ধরলে পার্থক্য কিছু ও বুঝতে পারে কি না। তার পরে তার

অনুভূতির দরজায় আঘাত ক'রে এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এইরকম কিছু শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তার সুপ্ত বুদ্ধিকে জাগানো যায় কি না সেই সব চেষ্টাই আমি করলাম।

সেই জন্যে একদিন তার সামনে আমি রাখলাম এক প্লেট স্যুপ আর এক প্লেট মিষ্টি ভ্যানিলা কাস্টার্ড। পরপর দুটি প্লেটের খাবারই তাকে চাখালাম। তারপরে নির্বাচনের ভারটা ছেড়ে দিলাম তারই ওপরে। সে নির্বাচন করল ভ্যানিলা কাস্টার্ড। এইভাবে অনতিবিলম্বেই আমি তাকে অত্যন্ত লোভী করে তুললাম। যে খাবার সে পছন্দ করত সেই প্লেটটা সে আঁকড়ে ধরে থাকত; জোর ক'রে সেটা সরিয়ে নিয়ে গেলেই চীৎকার করতে সুরু করত সে।

তারপরে বেল বাজিয়ে খাবার ঘরে যাতে তাকে ডেকে আনা যায় সে-চেষ্টা আমি করলাম, সময় অবশ্য বেশ লেগেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলাম আমি। পরিচ্ছন্নভাবে কিছু বুঝতে না পারলেও শব্দ আর স্বাদের মধ্যে সে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিল।

আমার এই পরীক্ষার ক্ষেত্র আরও একটু প্রসারিত করলাম। বেশ কষ্টই হয়েছিল আমার; তবে শেষ পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা দেখে খাবার সময় ঠিক করতে সে পেরেছিল। যে-পদ্ধতিটি এবিষয়ে আমি কাজে লাগিয়েছিলাম সেটা খুব সহজ। বেল বাজার রীতিটি বন্ধ ক'রে দিলাম; ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সবাই খাবার ঘরে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু ঘণ্টা বাজার শব্দ গোণা শিক্ষার চেষ্টাটা আমার ব্যর্থ হয়েছিল। ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার শব্দ হলেই সে দরজার কাছে দৌড়ে যেতে। কিন্তু একটু-একটু করে সে হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে খাবারের সঙ্গে সব ঘণ্টাধ্বনির মূল্য এক নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার চোখ দুটো ঘড়ির ডায়ালের ওপরে নিবদ্ধ থাকত।

এই দেখে প্রতিদিনই দুপুর বারোটা আর বিকাল ছ'টায় আমি তাদের বাড়ি যেতাম; আর যে মুহূর্তটির জন্যে সে অপেক্ষা করে বসে থাকত সেই মুহূর্তটি এলেই বারোটা আর ছ'টার ঘরে আমার আঙুলগুলি চেপে ধরতাম। তারই সামনে ব্রাশের তৈরী ঘড়ির কাঁটা আমি একটু ক'রে এগিয়ে দিয়ে দেখলাম কাঁটার এই অগ্রগতিকে সে বেশ গভীরভাবেই লক্ষ্য করছে।

তাহলে সে বুঝতে পারছে! অথবা, ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকছে, এটা বললেই বোধহয় ঠিক বলা হবে। ঘড়ির কাঁটার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ঠিক সময়ে খাবার দেওয়ার ফলে মাছদের যেমন সময়ের জ্ঞান জন্মায় আমিও সেইরকম তার মগজে সময়ের একটা জ্ঞান অথবা অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়েছিলাম।

এরপরে সব ছেড়ে বাড়ির সমস্ত টাইম-পিসগুলির ওপরে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। এদের দিকে তাকিয়ে এদের শব্দ শুনে সে জীবন কাটাতে লাগল—

অপেক্ষা করতে লাগল উপযুক্ত সময়ের জন্যে। এই সময়েই একটা মজার ঘটনা ঘটলো। ষোড়শ লুই-এর সময়কার একটি সুন্দর ঘড়ির ঘণ্টা বাজার ঘণ্টা-যন্ত্রটি বিকল হওয়ার ফলে ঘণ্টাজ্ঞাপক ধ্বনি আর হচ্ছিল না। দশটা বাজার শব্দ শোনার অপেক্ষায় মিনিট কুড়ি সে কাঁটা ছুটোর দিকে তাকিয়ে রইল। দশটার ঘর কাঁটাগুলি পেরিয়ে যাওয়ার পরেও যখন কোন শব্দ হল না তখন কেমন যেন হতভম্ব হয়ে সে চুপচাপ বসে রইল: বিরাট একটা বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমরা যেমন চুপচাপ হয়ে ভাবতে থাকি। দেখে মনে হল সে-ও যেন তেমনি ভাবছে। কী হয় দেখার জন্যে সেই ঘড়িটার কাছে সে অদ্ভুত একটা ধৈর্য নিয়ে চুপচাপ বসে রইল এগারটা পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই তখনও তার কানে কোন শব্দ ঢুকল না। তারপরে হঠাৎ সে রেগে উঠল। প্রতারিত বা প্রবঞ্চিত কোন জানোয়ারের মত, অথবা কোন একটা ভীষণ রহস্যের সামনে পড়ে অতিরিক্ত ভয় পেয়েছে এইভাবে রাগে গরগর করতে করতে চুল্লীর কাছ থেকে মোটা সাঁড়াশীটি নিয়ে তখনই ঘড়িটাকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে ফেলল।

বোঝা গেল তার মগজ কাজ করছে, হিসাব করতে শিখেছে; অবশ্য স্বাভাবিক বলতে আমরা যা বুঝি সেভাবে নয়; সীমিতভাবে; কারণ সময়ের হেরফেরটা যেমন সে বুঝতে পারত লোকের হেরফের ততটা পারত না। মনের মধ্যে বুদ্ধির শিখা জ্বালাতে গেলে সাধারণ অর্থে দেহের উত্তেজনা বলতে যা বোঝা যায় সেই উত্তেজনা তার মধ্যে জাগাতে হবে।

এদিক থেকে আর একটা প্রমাণও শীঘ্রিই আমরা পেয়েছিলাম—যদিও সেই প্রমাণ হচ্ছে ভয়ানক। চেহারার দিক থেকে বার্থা অপরূপ সুন্দরী নারীতে পরিণত হয়েছে। বয়স এখন তার ষোল। অপরূপা বোধশক্তিহীনা ভেনাসের প্রতিমূর্তিতে রূপায়িত হয়েছে সে। এমন নিখুঁৎ চেহারার ষোড়শী আমার চোখে আজ পর্যন্ত পড়ে নি। সুন্দরী, পরিপুষ্ট তনুধারিণী, শক্তিময়ী, চোখ ছুটি বড়-বড়, পরিচ্ছন্ন, কিন্তু ফাঁকা; ফুলের মত নীলাভ, গোলাকার মুখ, লুব্ধ কামনার্ত ওষ্ঠ; চুম্বন খাওয়ার জন্যে যারা সদা উদগ্রীব।

একদিন সকালে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গী ক'রে তার বাবা আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন; তাঁকে এতই চিন্তিত দেখা গেল যে আমার প্রভাতী অভ্যর্থনার কোন উত্তর দিলেন না তিনি।

তিনি বললেন: আপনার সঙ্গে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে এসেছি। বার্থা···বার্থা কি বিয়ে করতে পারে?

অবাক হয়ে চীৎকার করে উঠলাম আমি: বার্থা?···বিয়ে···অসম্ভব।

তিনি বললেন: হ্যাঁ; তা আমিও জানি···কিন্তু ডাক্তারবাবু ভেবে দেখুন ···মানে মনে হয়···যদি ওর ছেলেমেয়ে হোত···এটা তাকে বেশ বড়রকমেরই একটা নাড়া দেবে···কষ্টও পাবে হয়ত···আনন্দও পাবে অনেক···আর মাতৃত্ব

তার বুদ্ধিবৃত্তিকে যে জাগাবে না একথা কে বলতে পারে?

আমি বড় গোলমালে পড়ে গেলাম। কথাটা সত্যি। অভিজ্ঞতার নতুনত্ব, সেই অত্যাশ্চর্য মাতৃত্ববোধ—যা নারীর মত পশুদের বুকেও সমানভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, যার ফলে বাচ্চাদের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে মা মুরগীরা কুকুরের মুখের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই বোধটা হয়ত তারও বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটা আলোড়ণের সৃষ্টি ক'রে সেই সুপ্ত বুদ্ধিযন্ত্রটিকে চালিয়ে দেবে।

এইরকম একটি অভিজ্ঞতার কথা আমারও হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কিছু-দিন আগে আমার ছোট একটা কুকুর ছিল; সেটা এত বোকা যে তাকে দিয়ে আমি কিছু করাতে পারতাম না। তার বাচ্চা হল; তারপরেই একদিন—ঠিক বুদ্ধি নয়, তবে অনেক অল্পবুদ্ধি কুকুরের মতই সে মোড় নিল।

বর্তমান ক্ষেত্রে সেরকম কোন সম্ভাবনা রয়েছে কিনা সেদিকে ভালভাবে বিচার বিবেচনা না ক'রেই বার্থার বিয়ে দেওয়ার জন্যে আমার মনে প্রবল আগ্রহ জাগল। তার জন্যে বা তার হতভাগ্য বাবা-মার সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার জন্যেই কেবল এ আগ্রহ আমার জন্মায় নি, জেগেছিল নিছক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার জন্যে। এর পরিণাম কী দাঁড়াবে? সমস্যাটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হল।

সেইজন্যে তার বাবাকে আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন···আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি···যতটা সম্ভব চেষ্টা করা উচিৎ···কিন্তু···কিন্তু···ওকে বিয়ে করবে এমন পাত্র আপনি পাবেন না।

তিনি একটু নীচু গলায় বললেন: একজন পেয়েছি।

আমি অবাক হয়ে গেলাম—ভদ্র ছেলে? আপনার সমাজের?

হ্যাঁ; নিঃসন্দেহে।

তার নাম আমি জানতে পারি?

সেই কথাটাই আপনাকে বলে আপনার উপদেশ জানতে এসেছি। পাত্রটির নাম মঁসিয়ে গসটন···

প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলাম—ওই শুয়োরটা! কিন্তু নিজেকে সংযত ক'রে নিলাম আমি; একটু চুপ ক'রে থেকে আমতা-আমতা করে বললাম: হ্যাঁ ঠিক আছে। কোন বাধা দেখছিনে।

হতভাগ্য মানুষটি আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন; বললেন: আগামী মাসেই ওদের বিয়ে হবে।

মঁসিয়ে গসটন যুবক এবং সদ্বংশজাত; কিন্তু বদমাস, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে অশেষ নোংরা কাজ ক'রে ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছে। অর্থ রোজগারের এখন সে নতুন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে; এবং সে-পথটি সে খুঁজে বার করেছে।

ছোকরাটির চেহারা ভাল; কিন্তু হতচ্ছাড়া। মফঃস্বল শহরের ঘৃণ্য অসামাজিক দলের লোক। বাইরে থেকে দেখলে মনে হোত স্বামী হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা তার রয়েছে; কিন্তু ভেতরে সে একেবারে খাজা। এই প্রস্তাব নিয়ে এই বাড়িতে সে এসেছিল; এবং মূর্খ সুন্দরীটির সামনে এমন সব হাবভাব দেখিয়েছিল যে মনে হবে সে তাকে পছন্দ করে। সে তার জন্যে ফুল কিনে আনত, তার হাতে চুমু খেত, তার পায়ের কাছে বসে প্রেমের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু তার কোন কিছুর দিকেই মেয়েটির কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না; অন্য সকলের থেকে ছেলেটির কোন পার্থক্য সে দেখতে পায় নি।

বিয়ে হয়ে গেল।

তার ভেতরের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না মুখ দেখে তা বোঝার জন্যে বার্থাকে পরের দিনই আমি দেখতে গেলাম। দেখলাম, কোন পরিবর্তনই তার হয় নি। আগের মতই ঘড়ি আর ডিনার নিয়েই সে ব্যস্ত। কিন্তু তার স্বামীকে দেখে মনে হল স্ত্রীকে খুব পছন্দ হয়েছে তার। বিড়ালছানার সঙ্গে মানুষ যেমন খেলা করে সেও তেমনি নানারকম ছোট-খাট জিনিসের মাধ্যমে তাকে বিরক্ত করে তার আনন্দবর্দ্ধন করতে চেয়েছিল।

এ-ছাড়া আর কিছু করার ছিল না তার।

এরপরে প্রায়ই আমি নবদম্পতির বাড়িতে যেতাম। আমি শীঘ্রিই লক্ষ্য করলাম যুবতীটি তার স্বামীকে চিনতে পেরেছে; এবং মিষ্টি খাবারের ওপরে সে এতদিন যে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত তার স্বামীর ওপরেও সেই রকম-ভাবে তাকিয়ে রয়েছে।

বার্থা তার স্বামীর চলাফেরা অনুসরণ করত, সিঁড়িতে তার পদশব্দ বুঝতে পারত, সে ঘরে ঢুকলে সে হাততালি দিত; একটি আনন্দে আর কামনায় তার চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত। সমস্ত দেহ, আত্মা আর হৃদয় নিয়ে—কৃতজ্ঞ জানোয়ারের হৃদয় দিয়ে—বার্থা তাকে ভালবাসলো।

লোকটি কিন্তু এই সুন্দরী কামনাময়ী, মূক প্রাণীটিকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়িই ক্লান্ত হ'য়ে উঠল। প্রতিদিন কয়েকটি ঘণ্টা ছাড়া বার্থার কাছে আর সে রইল না—রাত্রির কয়েকটি ঘণ্টাই তার কাছে যথেষ্ট বলে মনে হল।

বার্থার কষ্ট বাড়তে লাগল। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে তার স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করত; তার চোখ দুটি নিবদ্ধ থাকত ঘড়ির ওপরে; খাবার দিকেও তার কোন লক্ষ্য থাকত না; কারণ, বাড়িতে যাতে আসতে না হয় এই জন্যে স্বামীটি বাইরের হোটেল-রেস্তোরায় মধ্যাহ্নভোজন সারতো।

রোগা হ'য়ে যেতে লাগল মেয়েটি। তার মন থেকে আর সব চিন্তা—ভাবনা—আশা—আকাঙ্খা নষ্ট হয়ে গেল। যে ক'ঘণ্টা স্বামীর সঙ্গে তার দেখা হোত না সেই ঘণ্টাগুলি তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক হ'য়ে উঠেছিল। তারপর অনতি-বিলম্বেই স্বামীটি তার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল—ক্যাসিনোতে

রাত কাটাতে লাগল মেয়েদের নিয়ে—বাড়িতে ফিরতে লাগল ভোর হওয়ার সামান্য কিছু আগে।

স্বামী না ফেরা পর্যন্ত কিছুতেই বার্থা শুতে যেতে চাইত না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চেয়ারের ওপরে সে চুপচাপ বসে থাকত। দূর থেকে স্বামীর ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে যাওয়া মাত্র সে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠত ; ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে কিম্ভূতকিমাকারভাবে ঘড়ির দিকে আঙুল তুলে যেন বলতে চাইত—'দেখ কত দেরী করলে আসতে।' সে তার মূর্খ হিংস্রুটে প্রেমময়ী স্ত্রীটির সামনে দাঁড়াতে ভয় পেত কিন্তু মনে-মনে সে তাকে সহ্য করতে পারত না। এক রাত্রিতে বার্থাকে সে আঘাত করল।

আমাকে ডেকে পাঠানো হল। প্রচণ্ড ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধ—আমি জানিনে আর কী কী কারণ ছিল—বার্থা তখন ভয়ঙ্কর চীৎকারে ফেটে পড়েছে। কে বলবে সেই অপরিণত মগজের মধ্যে কী ঘটছে।

মরফিন ইনজেকশন দিয়ে আমি তাকে শান্ত করলাম ; ওই লোকটার সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ করতে তাকে আমি নিষেধ করলাম ; কারণ আমি ভাবলাম এই বিয়েই নিঃসন্দেহে তার মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে।

তারপরেই বার্থা পাগল হ'য়ে গেল। হ্যাঁ, প্রিয় বন্ধু, সেই মূর্খ মেয়েটা পাগলা হ'য়ে গেল। মেয়েটি সব সময় তার কথা ভাবত, এবং তার জন্তে অপেক্ষা করে বসে থাকত। সারা দিন আর রাত, প্রতিটি মুহূর্তে, নিদ্রায় এবং জাগরণে বার্থা তার স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকত। তাকে দিন-দিন রোগা হতে দেখে, আর ঘড়ি থেকে তার চোখকে কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না দেখে, সময় মাপার সব কিছু যন্ত্রকে আমি বাড়ি থেকে সরিয়ে দিলাম। এইভাবে সময় পরিমাপ করার সমস্ত সম্ভাবনা দূর করে দেওয়ার ফলে যাতে আর স্বামীর আগমনের পূর্বতন মুহূর্তগুলি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণাও তার না থাকে সে চেষ্টা আমি করেছিলাম। যে জ্ঞানের শিখা জ্বালাতে একদিন আমি চেষ্টা করেছিলাম আশা ছিল অবশেষে একদিন সেই জ্ঞান তার চিরতরে লুপ্ত হ'য়ে যাবে।

এখন সে রোগা হ'য়ে গিয়েছে ; তাকে দেখলে মায়া হয় ; তার দুটি চোখ জ্বল-জ্বল করছে ; সেগুলি কোটরগত এখন। বন্দী জানোয়ারের মত এখন ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

তার ঘরের জানালার ওপরে দুটো তক্তা বসানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমি ; ঝুলিয়ে দিয়েছি উঁচু পর্দা ; মেঝের সঙ্গে আঁটিয়ে দিয়েছি চেয়ার—সে আসছে কিনা এটা দেখার জন্যে বার্থা যাতে কিছুতেই রাস্তা দেখতে না পায় এই জন্যে।

তার বাবা-মার কথা ভাবলে কষ্ট হয়। কী দুঃখই না তাঁরা ভোগ করছেন।

এরই মধ্যে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি। ডাক্তার আমার দিকে ঘুরে

বললেন : এখান থেকে রায়োমের দিকে তাকিয়ে দেখ।

শহরটিকে দেখে মনে হল প্রাচীন কালের দেওয়ালঘেরা একটি শহর। ডাক্তার শহরটির সম্বন্ধে নানা কথা আমাকে বলতে লাগলেন। কিন্তু সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না। আমি কেবল মেয়েটির কথা ভাবছিলাম।

হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, স্বামীটির কি হল ?

অবাক হ'য়ে একটু থেমে আমার বন্ধুটি বললেন : তাকে একটি মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই নিয়ে সে রোয়াতে থাকে। সে বেশ সুখেই রয়েছে। সে স্ফূর্তি করেই দিন কাটাচ্ছে।

ওই শুয়োরের বাচ্চা, মোরিঁ

[That pig, Morin]

এক

ল্যাবার্বকে আমি বললাম: আবার তুমি সেই কথাটা বললে—'ওই শুয়োরের বাচ্চা, মোরিঁ।' আচ্ছা, বলতে পার—"শুয়োরেরর বাচ্চা" যোগ না ক'রে মোরিঁর নাম কেউ উচ্চারণ করে না কেন ?

সম্প্রতি ডেপুটি হয়েছে ল্যাবার্ব। আমার কথা শুনে প্যাঁচার মত চোখ দুটো কুঁচকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল: লা রোচেলি থেকে আসছ, অথচ, মোরিঁর কাহিনী তুমি জান না, এই কথাই কি তুমি আমাকে বলতে চাও ?

না ; মোরিঁর কোন কাহিনী আমি শুনি নি।

তাহলে শোন।

মোরিঁকে তুমি চেন। কয় দ্য লা রোচেলিতে ওই যে বড় কাপড়ের দোকান হে—ওটা তো তারই।

খুব ভাল করেই চিনি।

১৮৬২ কি ৬৩ সালে স্ফূর্তি করার জন্যে মোরিঁ দিন পনের প্যারিতে কাটায়। তবে উদ্দেশ্যটা সে কাউকে বলে নি ; বলেছিল পুরানো মাল বদল দিয়ে নতুন মাল কেনার জন্যে যাচ্ছে। গ্রাম্য দোকানদারদের কাছে প্যারিতে পনের দিন কাটানোটা যে কি বস্তু তা তুমি জান। রক্ত তাদের উত্তাল হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেক রাত্রিতে এখানে থিয়েটার চলে ; মেয়েরা তোমার গা ঘেঁষে চলাফেরা করে—প্রতি মুহূর্তে এখানে উত্তেজনা। এরাই পাগল করে দেয় মানুষকে। খাটো পোশাক-পরা অভিনেত্রী ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ে না। তাদের নগ্ন পা দুটি গোলাকার, মাংস কাঁধ—অর্দ্ধ উলঙ্গ। হাতের কাছেই তারা ঘুরে বেড়ায় ; অথচ, তাদের গায়ে হাত দিতে কেউ সাহস করে না। অতি সাধারণ অভিনেত্রীদের সঙ্গেও সামান্য আলাপ-পরিচয় হয়েছে এরকম ঘটনাও বড় দুর্লভ। শুধু তাদের চুমু খাওয়ার জন্যে মানুষের ঠোঁটগুলি কেমন যেন কিলবিল ক'রে ওঠে।

লা রোচেলিতে ফেরার জন্যে রাত্রি ৮-৪০ এর ট্রেণের অপেক্ষায় সে যখন বিরাট প্লাটফর্মের ওপরে পায়চারি করছিল তখন-ও মোরি॑র মনের অবস্থা ছিল ওইরকম! হঠাৎ সে একটি যুবতীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। যুবতীটি তখন একটি বৃদ্ধাকে চুমু খাচ্ছিল। মেয়েটির মুখের ঘোমটা তোলা ছিল। তাকে দেখেই মোরি॑ আনন্দে নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বলল: সুন্দরী মেয়ে একখানা বটে, মাইরি।

বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়েটি বিশ্রামাগারের দিকে এগিয়ে যেতেই মোরি॑ও তার পিছু নিল। মেয়েটি প্লাটফর্মে গেল; পেছনে গেল মোরি॑। মেয়েটি একটা খালি কামরায় উঠল; মোরি॑ও উঠল সেই কামরায়। সেই ট্রেণে যাত্রীর সংখ্যা খুব কমই ছিল। হুইসিল বাজিয়ে ট্রেণ ছাড়ল। কামরার মধ্যে তখন তারা দু'জন। মেয়েটিকে সে চোখ দিয়ে গিলতে লাগল। মেয়েটির বয়স উনিশ কুড়ির মত—দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরী—চুলগুলি তার বিবর্ণ। একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে মেয়েটি ঘুমানোর জন্যে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

মেয়েটি কে সেই কথাটাই অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগল মোরি॑। হাজার রকমের চিন্তা আর অনুমান তাকে গ্রাস করে ফেলল। সে ভাবল—ট্রেনের পথে কত রকমেরই তো রোমান্টিক ঘটনার কথা শোনা যায়। সেইরকমের একটা রোমান্স হয়ত আমার ভাগ্যেও জুটবে! কে জানে। এ রকম ঘটনা অতি দ্রুত ঘটে যায়। সম্ভবতঃ, আমার একটু সাহসের দরকার। দাঁতন না কে যেন বলেছেন—সাহস, সাহস আরও সাহস।' দাঁতন যদি নাও বলে থাকেন, তাহলে মিরাবু নিশ্চয় বলেছেন। কে বলেছে তাতে কি আসে যায়? কিন্তু বিপদ হচ্ছে আমার সাহস নেই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি না জেনেই প্রতিটি মানুষ প্রতিদিনই অদ্ভুত-অদ্ভুত সুযোগ হারায়। মেয়েটি যে তাকে পছন্দ করে তার সামান্য একটু লক্ষণ চোখে পড়লেই।......

কিন্তু এগোনোর কোন পথ পেল না সে। একটা ছলছুতো করে যে এগোবে সে-রকম কিছুও নজরে পড়ল না তার। বুকটা তার ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল, ওলট-পালট হ'য়ে গেল তার মন। একটা কোন সুযোগের অপেক্ষায় সে অপেক্ষা ক'রে বসে রইল। রাত কেটে গেল। সেই বিদেশিনীটি তখনও ঘুমোচ্ছে। বসে-বসে মোরি॑ মেয়েটি কখন চলে পড়বে সেই কথা ভাবছিল। সকাল হল। প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়ল কামরার ভেতরে। ঘুম ভেঙে গেল মেয়েটির। উঠে বসে বাইরের দিকে তাকাল সে। তারপরে তাকাল মোরি॑র দিকে; তাকিয়ে একটু হাসল। মনে হল এই ইঙ্গিতটুকুর জন্যেই যেন সে অপেক্ষা করে বসেছিল। সেই হাসিটি যেন তাকে তিরস্কার করে বলছে—তুমি কী মূর্খ, গর্দভ। সারা রাত ধরে এইভাবে চুপচাপ বসে রয়েছ। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি কি সুন্দরী নই। আমার মত সুন্দরী নারীকে সামনে রেখে সারা রাত তুমি চুপচাপ বসে রয়েছ? তুমি একটি বলিবর্দ ছাড়া আর কী?

মেয়েটির দিকে সে তাকিয়ে দেখল। মেয়েটি তার দিকে চেয়ে হাসছিল। চোখাচোখি হতেই দেখল কৌতুকে মেয়েটির চোখ দুটি নাচানাচি করছে। সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তার মাথা বন-বন করে ঘুরতে লাগল। 'না; আর সহ্য করা যায় না—যা থাকে কপালে'—এই বলে সে উঠে পড়ল; তারপর দুটি হাত প্রসারিত করে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে…তারপর মেয়েটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।

চট করে দাঁড়িয়ে উঠল মেয়েটি—"রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলে চীৎকার করতে করতে মেয়েটি গাড়ীর দরজা খুলে বাইরের দিকে হাত নাড়তে লাগল। আতঙ্কে তার মাথা বিকৃত হয়েছে বলে মনে হল—মনে হল, এখনই সে বোধহয় লাফিয়ে পড়বে নীচে। এই দেখে মোরিঁও কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, পাছে মেয়েটি লাফিয়ে পড়ে এই ভয়ে মোরিঁ মেয়েটির স্কার্টটা পেছন থেকে টেনে ধরল—আর তাকে সাহস দেওয়ার জন্যে বলতে লাগল—ও মাদাম, ও মাদাম…

গাড়ীর গতি কমতে-কমতে থেমে গেল। যুবতীটিকে ওইভাবে ডাকাডাকি করতে দেখে দু'জন শান্ত্রী সেই কামরাতে উঠে এল—মেয়েটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল—এই লোকটা…এই লোকটা আমার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিল…

এই কথা বলেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

শান্ত্রীরা মোরিঁকে গ্রেপ্তার করল—তারপরে পুলিশ চার্জশিট তৈরী করল তার বিরুদ্ধে। অনেক রাত ক'রে হতভাগ্য বস্ত্র ব্যবসায়িটি বাড়ি ফিরল—প্রকাশ্যে নারী ধর্ষণ করার অভিযোগ তখন তার গলায় ঝুলছে।

দুই

সেই সময় আমি ক্যানাল দ্য ক্যারেনটিস পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। ক্যাফে দ্য কমার্সে মোরিঁর সঙ্গে আমার তখন প্রায়ই দেখা হোত। তার করণীয় কী রয়েছে তা বুঝতে না পেরে এই ঘটনার পরের দিনই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সব শুনে তার সম্বন্ধে আমার ধারণাটা কী তা প্রকাশ্যে বলতে আমি দ্বিধা করি নি। "তুমি একটা শুয়োর ছাড়া আর কিছু নও।" কোন ভদ্রলোক প্রকাশ্যে ও কাজ করে না।

সে কাঁদতে লাগল; তার স্ত্রী তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়েছে! সে বেশ বুঝতে পারল—এই দুর্নাম ছড়ালে তার ব্যবসা নষ্ট হবে, চারপাশে ছি-ছি করবে লোক, রাস্তায়-ঘাটে দেখা হলে, বন্ধুবান্ধবরা সব মুখ ঘুরিয়ে নেবে। তার অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত মায়া হল আমার। আমি আমার বন্ধু রিভেতকে ডেকে পাঠালাম। বেঁটে খাটো মানুষ রিভেত কিন্তু বুদ্ধিমান। পরামর্শ ক'রে দেখা যাক সে কী বলে।

পাবলিক প্রসিকিউটর আমার বন্ধুলোক। রিভেত তাঁর সঙ্গে দেখা করার

জন্যে আমাকে উপদেশ দিলে। মোরিঁকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম যাঁর শ্লীলতা-হানির চেষ্টা করা হয়েছিল তিনি একটি যুবতী—কুমারী হেনরিয়েত্ত বার্নেল। প্যারিস থেকে সম্প্রতি তিনি শিক্ষয়িত্রীর পরিচয়পত্র নিয়েছেন, তাঁর বাবা-মা নেই। তিনি তাঁর কাকার বাড়ি মজ-এ গিয়েছিলেন ছুটিতে। তাঁর কাকা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, এবং সম্মানিত। বিপদ হয়েছে অভিযোগ করেছেন তাঁর কাকা। তবে তিনি যদি তাঁর অভিযোগ তুলে নেন তাহলে পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোবে না।

মোরিঁর বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখলাম বেচারা শুয়ে রয়েছে; উত্তেজনা আর মনোবেদনায় সে মর্মাহত হ'য়ে পড়েছে। তার স্ত্রীর—দীর্ঘাঙ্গিনী—আসুরিক চেহারা—একটু দাড়ির ছায়া পড়েছে গালের ওপর; তাকে ক্রমাগত গালাগালি দিচ্ছিল। ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে সে আমাকে চীৎকার ক'রে বলল: 'আপনি ওই শুয়োর মোরিঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বুঝি! ওই যে—ওই সোনার-টুকরো শুয়ে রয়েছে।'

এই কথা বলে সে নিজের হাঁটুর ওপরে একটা হাত চাপিয়ে বলদৃপ্ত ভঙ্গীতে বিছানার পাশে এসে বসল। সমস্ত ঘটনাটা তাকে আমি খুলে বললাম। সব শুনে মেয়েটির কাকার সঙ্গে দেখা করে একটা ফয়সালা করতে সে আমাকে অনুরোধ করল। কাজটা দুরূহ সন্দেহ নেই। তবু দায়িত্বটা না নিয়ে আমি পারলাম না। হতভাগাটা বার-বার আমাকে বলতে লাগল—বিশ্বাস করুন, আমি তাকে চুমু খাই নি—মানে খাওয়ারও চেষ্টা করি নি—যদি দিব্যি করতে বলেন তাতেও আমি রাজি।

আমি বললাম—দিব্যি করতে হবে না। তুমি একটি শুয়োর ছাড়া আর কিছু নও।

উঠে আসার সময় প্রয়োজনমত খরচ করার জন্যে সে আমাকে এক হাজার ক্রাঁ দিল। একা যাওয়া নিরাপদ নয় জেনে বন্ধু রিভেতকে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করলাম। পরের দিনই তার একটা জরুরী কাজ ছিল। সেইজন্যে সেইদিনই আমরা যাত্রা করলাম দু' ঘণ্টা পরে, আমরা একটা সুন্দর গ্রাম্য বাড়ির কলিং বেল টিপলাম। একটি সুন্দর চেহারার মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। ওই মেয়েটিই যে সেই মেয়ে সেবিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। আমি রিভেতকে নীচু গলায় বললাম—সাবাস! মোরিঁকে এবারে আমি বুঝতে পারছি।

কাকার নাম মঁসিয়ে টোনেলেট। তিনি ক্যানাল পত্রিকার একজন পাঠক; এবং আমাদের রাজনৈতিক মতবাদের একজন গোড়া সমর্থক। আনন্দে হাত দুটি প্রসারিত ক'রে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের শুভ কামনা করলেন। তাঁর প্রিয় সংবাদপত্রের দু'জন সম্পাদককে তাঁর ঘরে আসতে দেখে

খুব খুশি হলেন তিনি। রিভেত আমাকে ফিস-ফিস করে বলল—মনে হচ্ছে, শুয়োর মোরিঁর সমস্যাটা আমরা সহজেই মিটিয়ে ফেলতে পারব।

মেয়েটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরে অতি সন্তর্পণে আমরা কথাটা পাড়লাম। ঘটনাটা বাইরে ছড়িয়ে পড়লে তাঁদের যে দুর্নাম রটার সম্ভাবনা রয়েছে সে-কথাও তাঁকে আমরা জানালাম—তার ফলে যুবতীটির মর্যাদা যে ক্ষুণ্ণ হবে সেকথাও জানাতে দ্বিধা করলাম না আমরা—কারণ কেউ বিশ্বাস করবে না যে ওই পরিস্থিতিতে লোকটি তাঁকে সামান্য একটা চুমু খেয়েই ছেড়ে দিয়েছিল। ভদ্রলোকটিও আমাদের আশংকাকে একেবারে নাকচ ক'রে দিতে পারলেন না। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করার আগে এবিষয়ে কিছু স্থির করতে পারলেন না তিনি। তাঁর স্ত্রী তখন বাড়ি ছিলেন না। সন্ধ্যের আগেও তাঁর বাড়ি ফেরার কোন সম্ভাবনা ছিল না। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে উঠলেন: বহুৎ আচ্ছা; আপনারা আজ এখানে থেকে যান—খাওয়া দাওয়া করুন। আমার স্ত্রী ফিরে এলে এবিষয়ে সন্তোষজনক একটা মীমাংসায় আসার পথে কোন অসুবিধে হবে না বলে আমার মনে হয়।

এ-প্রস্তাবে প্রথমে রাজি হয় নি রিভেত; কিন্তু শুয়োর মোরিঁকে হয়ত বাঁচানো যাবে এই আশায় সে শেষ পর্যন্ত থাকতে রাজী হয়ে গেল। কাকা উঠে পড়লেন খুশি হ'য়ে; তারপর ভাইঝিকে ডেকে বললেন: সিরিয়াস কথাবার্তা সব সন্ধ্যের পরে হবে। এখন বাগানে বেড়াতে যাই চল;

সবাই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। রিভেত তাঁর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। আমরা পড়লাম কিছুটা পিছিয়ে। অদ্ভুত চমৎকার মেয়েটি। অতি সন্তর্পণে সেদিনের ঘটনার উত্থাপনা ক'রে তার ওপরে সহানুভূতি জানিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা করলাম আমি। দেখে মনে হল, সেদিনের ঘটনায় মেয়েটি মোটেই বিভ্রান্ত হয় নি, আমার কাহিনীটি সে বেশ খুশি হ'য়েই শুনল।

আমি তাকে বললাম: ব্যাপারটা কী বিশ্রী একবার ভেবে দেখুন, মিস। আপনাকে আদালতে হাজির হ'তে হবে; সে রাত্রির ঘটনাটিকে আনুপূর্বিক বর্ণনা করতে হবে; উৎসুক জনতা আপনার কথাগুলি রসিয়ে-রসিয়ে গিলবে। আচ্ছা বলুন তো ওইভাবে চীৎকার করে পুলিশের সাহায্য না নিয়ে আপনি কি জানোয়ারটার সঙ্গ ছেড়ে অন্য কোন কামরায় যেতে পারতেন না?

মেয়েটি হাসতে-হাসতে বলল: আপনার কথা সত্যি। কিন্তু কি করব বলুন? ভয়ে বিভ্রান্ত হলে মানুষ তার জ্ঞানগম্যি সব হারিয়ে ফেলে। ব্যাপারটা বুঝতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশ ডাকার জন্যে আমি বেশ দুঃখিত হয়েছিলাম। কিন্তু তখন দেরী হ'য়ে গিয়েছে। মনে রাখবেন, লোকটা কিছু না বলেই উন্মাদের মত আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; সে যে কী চাইছিল তাও আমি বুঝতে পারি নি।

কোনরকম ভয় বা সঙ্কোচ না করেই মেয়েটি আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকাল। নিজের মনেই আমি বললাম—মেয়েটি বড় সপ্রতিভ। শুয়োর মোরিঁ যে কেন ভুল করে বসল তা আমি বুঝতে পারছি।

আমি তাকে ঠাট্টা ক'রে বললাম: শুনুন মিস; আপনি স্বীকার করুন, লোকটা নিরপরাধ; কারণ আপনার মত অপরূপ সুন্দরীর মুখোমুখী বসে আপনাকে চুম্বন করার নীতিগত বাসনা কোন পুরুষের জন্মাবে না একথা নিশ্চয় আপনি অস্বীকার করবেন।

কথাটা শুনে মেয়েটি আরও জোরে হাসতে লাগল; কচি-কচি দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল তার। সে বলল: বাসনা আর কাজ করার মধ্যে একটা সম্ভ্রম-বোধ থাকা উচিৎ মঁসিয়ে।

তার বলার ধরনটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগল। হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ধরুন, আমি যদি এখনই আপনাকে চুমু খাই আপনি কী করবেন?

মেয়েটি থমকে দাঁড়াল, আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার তাকাল, তারপরে শান্তভাবে বলল: আপনি! সে অন্য কথা।

বাজি রেখে বলতে পারি, আমাদের দু'জনের মধ্যে তফাৎ ছিল। আমার চেহারা সুন্দর—সবাই আমাকে ডাকত 'কার্তিক' ল্যাবার্ব ব'লে। তখন আমার বয়সও ছিল তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু তবু আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বলুন তো?

মেয়েটি কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল: কারণ আপনি, আপনি তার মত বোকা নন।

তারপরে পাশে তাকিয়ে বললেন: তার মত কদাকার-ও নন।

আমাকে এড়ানোর জন্যে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করার আগেই আমি তার গালে একটা চুমু খেলাম। সে চমকে লাফিয়ে সরে গেল; কিন্তু যা হওয়ার তখন হ'য়ে গিয়েছে। মেয়েটি বলল: আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিশেষ লজ্জিতও হন নি। কিন্তু ওকাজ আর করবেন না।

নিরপরাধ দৃষ্টি মেলে দিয়ে নীচু গলায় আমি বললাম: হায়রে কপাল; আমি যদি আর কারও চেয়ে আপনার কাছে বেশী কিছু চাই তাহলে ওই মোরিঁর মত আমাকেও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

কেন?

তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিলাম আমি: কারণ, আপনার সৌন্দর্য অপরূপ। কারণ, আপনার কাছ থেকে জোর করে কিছু আদায় করতে পারলে সেটা আমার কাছে গৌরবজনকই হবে। সবাই বলবে ল্যাবার্ব সত্যিকারের সৌভাগ্যবান।

মেয়েটি আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বলল: আপনি বেশ মজার

মানুষ দেখছি।

কথাটা তার শেষ হওয়ার আগেই আমি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম ; তারপর তার সারা দেহে, কপালে, গালে, চোখে, মাথায়, মাঝে-মাঝে ঠোঁটে চুমুতে-চুমুতে ভরিয়ে দিলাম। শরীরের কিছু-কিছু অংশ বাঁচানোর জন্যে যেসব অংশ তার উন্মুক্ত হল সেগুলিতেও চুমু খেতে আমি দ্বিধা করলাম না। অবশেষে মেয়েটি আমাকে ছাড়িয়ে নিল। মুখ তখন তার লজ্জায় আর উত্তেজনায় লাল হ'য়ে উঠেছে। সে রেগে বলল : মঁসিয়ে, আপনি ভব্যতা জানেন না। আপনার কথা এতক্ষণ আমি শুনেছি বলে দুঃখ হচ্ছে আমার।

কিছুটা বিভ্রান্ত হ'য়ে আমি তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমতা-আমতা করে বললাম : ম্যাদময়জেল, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে বিরক্ত করছি। আমি পশুর মত ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গে। যা করেছি তার জন্যে আমার ওপরে আপনি রাগ করবেন না। আমি যদি জানতাম—

জুৎসই একটা কৈফিয়ৎ খোঁজার চেষ্টা ক'রেও কিছু যোগাল না। কয়েক সেকেণ্ড পরে মেয়েটি বলল : জানার কিছু দরকার আমার নেই, মঁসিয়ে।

কিন্তু ততক্ষণে আমার মুখে কথা জুগিয়েছে ; আমি বললাম : ম্যাদময়জেল, গত একটি বছর ধরে আমি আপনাকে ভালবাসছি।

আমার কথা শুনে সত্যিই অবাক হ'য়ে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম : আমার কথা সত্যি। মোরিঁকে আমি চিনিনে ; তার কী হবে বা না হবে তা নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই। সে হাজতে গেলেও আমার কিছু যাবে আসবে না। গত বছর এই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে আমি আপনাকে দেখেছিলাম। বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, সেই থেকে আপনি আমার মন এবং প্রাণ অধিকার ক'রে ফেলেছেন। আপনাকে দেখার জন্যে, পরিচিত হওয়ার জন্যে আমি ছটফট করছিলাম। মূর্খ মোরিঁ সেই সুযোগটা আমাকে দিয়েছে। অবশ্য ঘটনার পরিস্থিতিতে আমি কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি ; সেইজন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আমার মুখের দিকে তাকাল মেয়েটি। সত্যি বলছি কিনা সেটাই হয়ত সে যাচাই করতে চাইছিল ; ঠোঁটের ওপরে হাসির রেখা দেখা গেল। তারপরে সে বিড়-বিড় করে বলল : হামবাগ কোথাকার!

আমি হাত তুলে গাঢ় স্বরে বললাম : শপথ করে বলছি, আমার কথা সত্যি।

বলেন কী ?···সহজভাবে মন্তব্য করল মেয়েটি।

রিভেত আর মেয়েটির কাকা দূরের পথে অদৃশ্য হওয়ার ফলে আমরা দু'জনে একা হ'য়ে গেলাম। মেয়েটিকে আমি যে কত ভালবাসি সেকথা তাকে আমি বললাম—বললাম অনেক মিষ্টি-মিষ্টি কথা—সে সব শুনল—কতটা বিশ্বাস

করল তা আমি জানিনে। অবশেষে আমার উন্মাদনা জাগলো ; আমার নিজেরই যেন মনে হল আমি যা বলেছি সব সত্যি। আমার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল ; কাঁপতে লাগলাম আমি। ধীরে-ধীরে আলতোভাবে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে ফিস-ফিস ক'রে অনেক কথা বললাম। ধীরে-ধীরে এক-সময় আমার হাতের ওপরে তার একটি হাত নেমে এল ; আমার আঙুলে চাপ দিল সে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম—সে নড়লো না ; একভাবে বসে রইল। তারপরে আবার চুমুতে-চুমুতে ভরিয়ে দিলাম তার সর্বাঙ্গ। শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম জানিনে, হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমার ঠিক পেছনে কে যেন গলা খাঁকারি দিল। সে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঝোপের মধ্যে তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ঘুরে দেখি রিভেত আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মাঝপথে থেমে সে একটুও না হেসে বলল : এইভাবেই তুমি শুয়োর মোরি'র সমস্যার সমাধান করছ নাকি ?

বললাম : বন্ধু, মানুষ যেটুকু পারে তাই সে করে। কিন্তু কাকাটির সংবাদ কী ? তাঁকে তুমি বোঝাতে পেরেছ ? ভাইঝির ব্যবস্থা আমি করব।

সে বলল : বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না।

তিন

ডিনারের পরে চাঁদের আলোতে আবার আমরা বেড়াতে গেলাম। এবারেও মেয়েটিকে অনেক প্রেমের কথা আমি শুনালাম। বার বার তাকে কাছে টেনে আলিঙ্গন করলাম—চুম্বন করলাম বার-বার। তার কাকা আর রিভেত গল্প করতে-করতে আগে-আগে চলছিলেন। পেছনে বালির রাস্তায় তাদের ছায়া পড়ছিল। আমরা বাসায় ফিরে আসার পরে একটি টেলিগ্রাম এল—মেয়েটির কাকিমা পরের দিন সকাল সাতটায় প্রথম ট্রেণে ফিরছেন।

কাকা বললেন : হেনরিয়েত, তুমি ওঁদের শোওয়ার ব্যবস্থা কর।

প্রথমেই সে রিভেতকে ঘরে নিয়ে গেল ; তারপর আমাকে সঙ্গে ক'রে আর একটা ঘরে এসে হাজির হল। ঘরের মধ্যে ঢুকেই আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম—চুমু খেলাম—তার উত্তেজনা বাড়ানোর চেষ্টা করলাম। প্রতিরোধ করার শক্তি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে বুঝতে পেরেই একসময় আমার আলিঙ্গন ছাড়িয়ে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে। শুয়ে পড়লাম আমি। ঘুম না আসায় আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। এমন সময় টোকা পড়ল দরজায় !

কে ?

আমি।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকে এল মেয়েটি।

কাল সকালে কী খাবেন আপনি—চকোলেট, চা, না কফি ? জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছলাম আমি।

আবার তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে-খেতে বললাম—আমি···আমি···

কিন্তু সে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। যাওয়ার সময় ঘরের বাতিটা দিয়ে গেল নিবিয়ে। সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি দেশলাই কাঠি খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। শেষকালে অনেক কষ্টের পরে একটা দেশলাই সংগ্রহ করে অর্দ্ধোন্মাদের মত বাতিটা জ্বালিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

কী করতে যাচ্ছি সেকথা ভাববার মত সময় তখন আমার ছিল না। মেয়েটিকে খুঁজে বার করার জন্তে আমি হন্তে হয়ে উঠেছিলাম। কোন কিছু চিন্তা না ক'রেই কয়েক পা আমি এগিয়ে গেলাম; তারপরেই থমকে দাঁড়ালাম। যদি কাকার ঘরে ঢুকে পড়ি? ধরা পড়ে গেলে কী বলব? কয়েক সেকেণ্ড ভাবলাম। তারপরেই যুৎসই একটা কৈফিয়ৎ খুঁজে পেলাম। ধরা পড়ে গেলে বলব একটা প্রয়োজনীয় কাজে রিভেত-এর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। এগিয়ে গেলাম আমি—প্রতি ঘর আর জানালায় টোকা দিলাম। শেষ পর্যন্ত একটি ঘরের দরজা খুলে দেখি মেয়েটি বসে রয়েছে। আমাকে দেখেই তার চোখের ওপরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ঘরের দরজা নিঃশব্দে বন্ধ করে আমি ভেতরে ঢুকে গিয়ে বললাম: একটা বই পড়ার কথা বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

মেয়েটি অস্বস্তিতে নড়ে-চড়ে বসল। যে-বইটা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম সেই বইটা আমি শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম। কী বই সেকথা আমি তোমাকে বলব না। কিন্তু বইটা বড় রোমান্টিক—সুন্দর-সুন্দর কবিতায় একেবারে ঠাসা। একটা খুলে তাকে দেখালাম। তারপরে পাতার পর পাতা উলটে যেতে সে আমাকে ইঙ্গিত করল। এইভাবে পরিচ্ছেদ ওলটাতে-ওলটাতে একসময় বাতিটি পুড়ে নিঃশেষ হ'য়ে গেল।

তাকে ধন্তবাদ জানিয়ে নিঃশব্দে আমি ঘরে ফিরে আসছিলাম এমন সময় একটা শক্ত হাত আমাকে ধরে ফেলল; গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলাম আততায়ী রিভেত ছাড়া আর কেউ নয়। সে আমাকে ফিস-ফিস করে জিজ্ঞাসা করল: তুমি এখনও সেই মোরিঁ শুয়োরের সমস্যাটার সমাধান করতে ব্যস্ত রয়েছ?

পরের দিন সকাল সাতটায় মেয়েটি নিজেই এক কাপ চকোলেট নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলো। এমন সুন্দর মোলায়েম, ভেলভেট রঙের সুগন্ধী আর মেজাজী চকোলেট আমি আর কখনও খাই নি। মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতেই রিভেত ভেতরে এসে ঢুকলো। দেখে মনে হল সে কেমন যেন ভয় পেয়েছে—মেজাজটা তার তিরিক্ষি হ'য়ে উঠেছে। সে বেশ চটেই বলল: তুমি যদি এইভাবে চল তাহলে সেই মোরিঁ শুয়োরটার 'কেস' বানচাল হ'য়ে যাবে।

বেলা আটটায় কাকিমা এসে পৌছলেন। আমাদের আলোচনা সামান্তই হল। তাঁরা তাঁদের অভিযোগ তুলে নিলেন; আর শহরের দরিদ্র সেবার জন্তে আমি তাঁদের হাতে পাঁচশ ফ্রাঁ দিয়ে এলাম। দিনের বেলাটা সেইখানে থেকে শহরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলি দেখার জন্যে তাঁরা আমাদের অনুরোধ করলেন।

হেনরিয়েতও কাকার পেছন থেকে থেকে যাওয়ার জন্তে আমাকে ইঙ্গিত করল। আমি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম : কিন্তু রিভেত কিছুতেই রাজি হয় নি॑। অনেক অনুরোধ করলাম তাকে। সে চটে বলল : মোরি॑ শুয়োরের কেসটা নিয়ে আমার অনেক হয়েছে, বুঝেছ ?

আমাকেও ফিরতে হল ; কিন্তু জীবনে বোধ হয় এত কষ্ট আর কখনও আমার হয় নি। এই সমস্তা সমাধান করার জন্তে সারাটা জীবনও যদি আমাকে কাটাতে হোত তাহলেও আমার কোন দুঃখ থাকত না। ট্রেণের কামরায় ওঠার আগে হেনরিয়েতের সঙ্গে নিঃশব্দে করমর্দন করে রিভেতকে আমি বললাম : 'তুমি একটি পশু'। রিভেত বলল : বন্ধু, তুমি আমাকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলেছিলে।

ফ্যানালের অফিসে ফিরে এলাম আমরা। বিরাট একটি জনতা আমাদের জন্তে অপেক্ষা করছিল। আমাদের দেখেই তারা চীৎকার করে উঠল : মোরি॑ শুয়োরের ব্যাপারটার ফয়সালা করে এসেছেন ?

ট্রেণেই রিভেতের মেজাজটা শরীফ হ'য়ে এসেছিল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে সে বলল : হয়েছে। ল্যাবার্বকে ধন্যবাদ।

মোরি॑র বাড়িতে গিয়ে দেখি পায়ে সরষের প্রলেপ দিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দুঃখে প্রায় মরার মত হয়ে বেচারা একটা আরাম কেদারায় শুয়ে রয়েছে। কী করে ঠাণ্ডা লাগল ভগবান জানেন ; কিন্তু মরণোন্মুখ মানুষের মত সে তখন অনবরত কাশছিল। তার স্ত্রীকে দেখে মনে হচ্ছিল বাঘিনী বলে— তাকে ছিঁড়ে মেরে ফেলার জন্তে সে যেন তৈরী হ'য়ে বসে রয়েছে। আমাদের দেখেই সে এমন কাঁপতে লাগল যে তার হাত পা অবশ হ'য়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি কালক্ষেপ না করেই বললাম—নোংরা ইতর কোথাকার—তোমার ব্যাপারটা মিটিয়ে এসেছি। আর কোন দিন ওকাজ করো না।

আবেগে রুদ্ধকণ্ঠ হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে উঠল ; আমার হাত ধরে গভীর সম্ভ্রমে চুম্বন করল ; এমন কি আনন্দের আতিশয্যে মাদামকেও একটা চুমু খেল। মাদাম তাকে ঠেলে ফেলে দিলে। বেচারা আরাম কেদারার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু এই ধাক্কা কোনদিনই সে সামলে উঠতে পারে নি। তার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। চারপাশে সবাই তাকে লক্ষ্য করে বলত—ওই মোরি॑ শুয়োর! কথাটা তরোয়ালের ফলার মত তার বুকে গিয়ে আঘাত করত। তার বন্ধুরাও তাকে নিয়ে এইরকম নিষ্ঠুর তামাশা করত ; শুয়োরের মাংস খেতে-খেতে তারা বলত—'এটা কি তোমারই মাংস নাকি হে ?'

দু'বছর পরে সে মারা গেল।

১৮৭৫ সালের 'চেম্বার অফ ডেপুটি' নির্বাচনে আমি একজন প্রার্থী ছিলাম। টৌসারির নতুন নোটারি ম॑সিয়ে বেলোনকোলের বাড়িতে গিয়েছিলাম ভোট

ভিক্ষা করার জন্যে। সেইখানে দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরী, বেশ দামী পোশাক-পরা একটি মহিলা আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

জিজ্ঞাসা করলেন—আমাকে চিনতে পারছেন ?

না—না তো মাদাম—

হেনরিয়েত্ত বোর্নেল ?

আরে তাইত, তাইত! কেমন যেন বিবর্ণ হ'য়ে গেলাম আমি। তার কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই; আমার দিকে চেয়ে সে একটু হাসলো মাত্র।

স্বামীর জিম্মায় আমাকে রেখে হেনরিয়েত্ত চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মঁসিয়ে আমার দুটি হাত বেশ জোরেই মর্দন করে বললেন : অনেক দিনই ভেবেছি আপনার বাড়ি গিয়ে আলাপ করে আসব। আমার স্ত্রী আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে বলেছে। আমি জানি কী রকম একটি যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে আপনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন—আমি এটাও জানি কী ভদ্র, সঙ্কোচ আর সম্ভ্রমের সঙ্গে আপনি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন—তারপরেই একটু দ্বিধা করে যেন একটা ঘৃণ্য কথা বলছেন, এইভাবে স্বর নীচু করে বললেন : আমি ওই শুয়োর মোরিঁর কথা বলছি।

একটি নরম্যান

(A Norman)

রাওয়েন ছেড়ে জুমিয়েজের পথে জোর কদমে আমরা এগিয়ে চলেছি। দু'-পাশে মাঠ; মাঝখান দিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তার ওপর দিয়ে আমাদের হালকা গাড়ীটা ছুটছিল। এক জায়গায় এসে ঘোড়াটা থেমে গেল। এবার আমাদের ক্যানটেলুর পাহাড়ে উঠতে হবে।

মরি মরি—কী অপরূপ দৃশ্য! আমাদের পেছনে রাওয়েন। গির্জার শহর এই রাওয়েন। গোথিক আমলের ঘণ্টা ঘর এই সব গির্জায় আপনারা দেখতে পাবেন। হাতির দাঁতের অলঙ্কারের মত কারুকার্য করা তাদের দেহ। সামনে আমাদের কারখানার শহরতলি সেন্ট-সেভার। প্রাচীন শহরের ঠিক উলটো দিকে হাজার হাজার ধোঁয়া উদগীরণকারী চিমনি আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদিকে মানুষের হাতে-গড়া বিরাট গির্জার চূড়া; আর এক দিকে তারই প্রতিদ্বন্দ্বী লা কোডারের "ফায়ার পাম্প," উচ্চতায় ইজিপ্ট-এর সব চেয়ে উঁচু পিরামিডের চেয়ে কিছু বেশী।

আমার বন্ধুটি শহরতলীর মানুষ। আমার চোখ দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার কথা তাঁর নয়। কিন্তু ক্রমাগতই তিনি হাসতে লাগলেন। মনে হল যেন নিজের মনে-মনেই তিনি হাসলেন। হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—আ, এবারে

তুমি একটা মজার জিনিস দেখতে পাবে জিনিসটা হল ফাদার ম্যাথুর গির্জা। দেখার মত জিনিস।

বলার ধরন দেখে আমি তাঁর দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম। তিনি নিজের আবেগেই বলে গেলেন: নরম্যানভির একটি মিষ্টি সুবাস তোমাকে আমি সোঁকাব। এই সুবাসটি তোমার নাকে লেগে থাকবে। এই অঞ্চলে ফাদার ম্যাথু হচ্ছেন সবচেয়ে সুপুরুষ নরম্যান। তাঁর গির্জাটিও হচ্ছে বিশ্বের একটি পরম আশ্চর্য বস্তু। যাকে বলে সত্যিকার আশ্চর্য! কিন্তু ভূমিকা হিসাবে এখানে তোমাকে আমি কিছু বলব। ফাদার ম্যাথু একজন ভূতপূর্ব সার্জেণ্ট-মেজর। লোকে তাঁকে ফাদার বুজ বলেই ডাকে। অবসর নিয়ে তিনি গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর চরিত্রে গুণ ছিল দুটি; একটি হচ্ছে তাঁর সামরিক দম্ভ; আর একটি হচ্ছে নরম্যানদের চাতুরী। তাঁর মুরুব্বি ছিল অসংখ্য; ছলাকলাও ছিল তাঁর অবিশ্বাস্য রকমের বহুমুখী। এই দুটি গুণের জোরে এই অঞ্চলের একটি অলৌকিক গির্জার প্রধান যাজকের পদটা তিনি পান। অলৌকিক বলছি এই জন্যে যে এই গির্জার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন স্বয়ং ভার্জিন; আর এখানে যারা নিয়মিত আনাগোনা করে তাদের মধ্যে গর্ভবতী অল্পবয়সী মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। এই গির্জায় যে অদ্ভুত সুন্দর বিগ্রহটি রয়েছে তিনি তার নাম দিয়েছেন "নতারদাম দু গ্রস-ভেনতার।" এই বিগ্রহটির সঙ্গে তিনি বেশ ঘরোয়াভাবেই মেলামেশা করেন। এই মেলামেশার রীতি দেখে লোকে তাঁকে বিদ্রূপ করলেও শ্রদ্ধার কিন্তু এতটুকু অভাব ছিল না তাঁর। তাঁর ইষ্টদেবী "গুড ভার্জিনের" স্তবের জন্যে তিনি নিজেই বিশেষ কয়েকটি প্রার্থনার পদ রচনা করে সেগুলি ছাপিয়ে রেখেছেন। অনিচ্ছাকৃত ব্যঙ্গ আর নরম্যানদের জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তি—এ-দুটির অদ্ভুত মিশ্রণ এগুলির মধ্যে দেখা যাবে। সেণ্টদের মানুষ স্বভাবতই ভয় করে। কোন একটি রহস্যময়ী গোপন শক্তির প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকেই এই ভীতির উৎপত্তি। ইষ্টদেবীর ওপরে তাঁর নিজের কিন্তু খুব একটা আস্থা নেই। তবু, যেটুকু রয়েছে সেটুকুকে তিনি নীতি হিসাবেই ব্যবহার করেন। এই অনবদ্য প্রার্থনার প্রথম ছত্রটি কী দেখ:

"এই অঞ্চল, তথা সারা বিশ্বের অল্প বয়সী মা-মেয়েদের অবিতর্কিতা পেট্রন আমাদের 'গুড লেডি ভার্জিন মেরী,' মুহূর্তের ভ্রান্তিতে তোমার যে-সেবিকা অপরাধ করেছে, তাকে তুমি ক্ষমা কর।"

প্রার্থনার শেষ হচ্ছে এইভাবে:

"বিশেষ ক'রে তোমার দেবদূত স্বামীর কাছে আমার হ'য়ে কিছু বলতে তুমি ভুলে যেয়ো না· তোমার স্বামীর মত আমি একটি সৎ স্বামী পাইয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি যেন পরম পিতা ভগবানের কাছে আর্জী পেশ করেন।"

এই প্রার্থনা স্থানীয় যাজক সম্প্রদায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই এগুলিকে তিনি গোপনে বিক্রী করেন। যারা কপটচারী এগুলি তাদের কাছে সত্যিই

বড় উপাদেয়। আসলে একটি প্রথিতযশা মহামহিমান্বিত রাজকুমারের পরিচারক যে তার প্রভুর অনেক কিছু ছোটখাট অন্তরঙ্গ গোপন কাজের সংবাদ রাখে—সে তার প্রভুর সম্বন্ধে যেমনভাবে প্রচার চালায়, ভার্জিন মেরীর সম্বন্ধেও তিনি ঠিক সেইভাবে প্রচার চালাতেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক ছোটখাট গল্প তিনি জানেন; মদ খাওয়ার পরে সেগুলি তিনি বন্ধুদের কানে-কানে বলেন।

কিন্তু এবিষয়ে তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকা উচিৎ।

ইষ্টদেবীর দৌলতে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাতে তাঁর কুলোয় না। তাই তিনি অনেক সেণ্টদের মূর্তি রাখার ব্যবস্থা করেছেন। বলতে গেলে, কোন সেণ্ট-ই প্রায় তাঁর বদান্যতা থেকে বঞ্চিত নন। গির্জার ভেতরে স্থানাভাব হওয়ার ফলে অনেকগুলিকে তিনি গির্জার পেছনে কাঠের চালাঘরের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। প্রয়োজনমত তাদের তিনি বাইরে টেনে নিয়ে আসেন। যে বছর তাঁর ঘর রঙ করা হল সেই বছর কাঠ কেটে নিজের হাতেই এই মূর্তিগুলি তিনি তৈরী করেছিলেন। নিজেই রঙ মাখিয়েছিলেন তাদের গায়ে। তুমি জান, এই সেণ্টদের কাজ হচ্ছে অসুখ সারানো। প্রতিটি সেণ্ট-এরই বিশেষ-বিশেষ রোগ সারানোর ক্ষমতা রয়েছে। বিশেষ একটি রোগের জন্যে সেই রোগের যিনি ধন্বন্তরী সেণ্ট তাঁর কাছে না গিয়ে অন্য সেণ্ট-এর কাছে ধর্ণা দেওয়ার ফল বড় বিষময়। কারণ, সাধারণ মানুষের মতই তাঁরাও বড় হিংসাপরায়ণ। এদিক থেকে পাছে কোন ভুল হ'য়ে যায় এই ভয়ে দরিদ্র বৃদ্ধারা এখানে এসে পাদরী ম্যাথুর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে কাজ করে।

তারা জিজ্ঞাসা করে: আচ্ছা বলত বাবা, কানের অসুখ সারানোর জন্যে কোন সেণ্ট-এর কাছে যাব?

তিনি বলেন: একজন আছেন—তিনি হচ্ছেন সেণ্ট ওসিমাস · তিনি ভালই। আরও একজন আছেন; তিনি হচ্ছেন সেণ্ট প্যাসফিলিয়াস। তিনিও খারাপ নন।

এইটাই ম্যাথুর সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। হাতে সময় থাকলে ম্যাথু মদ খান। মদ খান—তবে কলাবিদের মত। প্রতি সন্ধ্যায় মদ খেয়ে তিনি টলতে থাকেন। তিনি যে টলেন সেকথা তিনি নিজেও জানেন। এতটা পরিষ্কারভাবে জানেন যে কোন্ দিন তিনি কতটা মাতাল হয়েছেন সে সম্বন্ধে নিখুঁতভাবে একটা খাতায় তিনি টুকে রাখেন; এইটাই তাঁর মুখ্য কাজ; গির্জার কাজ গৌণ।

এছাড়া, তাঁর একটা আবিষ্কার রয়েছে। সেকথা শুনলে তুমি অবাক হ'য়ে যাবে। এই আবিষ্কারটির নাম "বুজোমিটার।" এরকম যন্ত্রের অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত কারও চোখে পড়ে নি; কিন্তু ম্যাথুর গণনা অর্থবিদদের মতই নির্ভুল। তুমি তাঁকে ক্রমাগতই বলতে শুনবে—'

গত সোমবার থেকে আমি পঁয়তাল্লিশের ওপরে যাই নি: অথবা বাহান্ন থেকে আটান্ন, অথবা ছেষট্টি থেকে সত্তর, অথবা ছত্তোর নিকুচি করেছে, আমার ধারণা,

পঞ্চাশ পূর্ণ হয়েছে মাত্র। এখন দেখছি, পঁচাত্তরের কোঠায় এসে পৌচেছি।

ম্যাথু যখন স্বীকার করেন তিনি নব্বই-এর সীমারেখা অতিক্রম করেছেন তখনই বুঝতে হবে তিনি মাতাল হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী মিলি আর একটি আজব বস্তু। স্বামীকে এমত অবস্থায় দেখলেই সে রাগে গর-গর করতে থাকে। স্বামী বাড়ি ফেরার সময় দাঁড়িয়ে থাকে দরজার সামনে। ম্যাথু ঘরে ঢোকামাত্র সে চীৎকার ক'রে বলে: অসভ্য শুয়োর কোথাকার। অপদার্থ মাতাল।

ম্যাথু তখন হাসেন না। তার সামনে নিজেকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে বলেন: মিলি, চোপ। এখন কথা বলার সময় নয়। কাল সকালে কাল সকালে।

এরপরেও মিলি যদি চেঁচানি না থামায় তাহলে ম্যাথু তার সামনে এগিয়ে যাবেন; তারপরে স্বরটাকে মোটা করে বলবেন: চোপ-প। এখন আমি ন'য়ের কোঠায়। এখন আমার মাথার ঠিক নেই। কাউকে ধোলাই দেওয়ার জন্যে হাতটা আমার নিসপিস করছে। সাবধান।

এই আপ্তবাক্য শুনেই কেটে পড়ে মিলি।

পরের দিন আবার সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই তিনি সোজাসুজি হেসে বলবেন: হয়েছে, হয়েছে—যথেষ্ট হয়েছে। যতদিন না আমি একশ'র গাঁট পেরোচ্ছি ততদিন মা ভৈ; সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলেই ঠিক কথার সুযোগ তোমাকে আমি দেব—কথা দিলাম।

কথা বলতে-বলতে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠলাম। বোমার-এর অদ্ভুত সুন্দর বনানীর মধ্যে দিয়ে আমাদের পথ। ডুক্রেয়ার ছাড়িয়ে গেলাম আমরা। তারপরে জুমিয়েজের দিকে না গিয়ে আমার বন্ধুটি বাঁ দিকের পথ ধরে বনের দিকে সোজা হাঁটতে সুরু করলেন। অনতিবিলম্বেই সবুজ পাহাড়ের চূড়া থেকে সীন নদীর ধারে মনোরম উপত্যকাটিকে নতুন করে দেখতে পেলাম আমরা, দেখতে পেলাম আমাদের পায়ের তলা দিয়ে প্রবাহিত আঁকাবাঁকা নদীটিকে।

ডান দিকে ছোট একটি বাড়ি; ছাতাটা তার শ্লেট দিয়ে ছাওয়া। ছাতার মত উঁচু গম্বুজাকৃতি একটা ঘড়ি—একটি সুন্দর বাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার সারসীগুলি সবুজ রঙের—মধুর চাক আর গোলাপ ফুলে ঢাকা।

শুনতে পেলাম কে যেন কাকে চেঁচিয়ে বলল: ক'জন বন্ধু এসেছেন।

কথাটা শুনে বারান্দার ওপরে এসে দাঁড়ালেন ম্যাথু। বয়স ষাট, রোগাটে —সুঁচোলো দাড়ি—সাদা গোঁফ। আমার বন্ধুটি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন; আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর। ম্যাথু একটা শীতল পরিচ্ছন্ন রান্না-ঘরের মধ্যে আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন। ওই ঘরটিকেই শোয়ার ঘর হিসাবে ব্যবহার করেন তাঁরা।

ম্যাথু বললেন: আমার কোন আলাদা শোয়ার ঘর নেই। খাবার ঘর

থেকে বেশী দূরে থাকতেও আমি চাইনে। থালা-বাটিরাই তো হচ্ছে মানুষের আসল সঙ্গী।

তারপরে আমার বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে বললেন: আজ বৃহস্পতিবার তুমি এসেছ কেন? তুমি জান আজ হচ্ছে আমার লেডীর "কনসালটেশন ডে।" আমি তো আজ বেরোতে পারব না।

কথাটা শেষ করেই দরজার কাছে গিয়ে হুংকার দিলেন একটা—মি-লি।

অন্য পাশ থেকে কারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ভ্রূকুটি করলেন ম্যাথ্: গতকাল আমি ন'য়ের কোঠায় ছিলাম। তাই সে আমার ওপরে চটে রয়েছে।

আমার প্রতিবেশীটি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন: ন'য়ের কোঠা! সেটা আবার কি বস্তু?

উত্তর দিলেন ম্যাথ্: বলছি তোমাকে। গত বছর আমি কিছু আপেল পেয়েছিলাম। সেগুলি থেকে এক ব্যারেল সিডার মদ আমি তৈরী করেছিলাম। গতকাল সেটাই ভাঙলাম। কি বলব ভায়া, একেবারে সত্যিকারের অমৃত। আমার সঙ্গে ছিল পোলাইট। এক বোতল খেলাম আমরা, তারপরে আর এক বোতল—তেষ্টা আর মেটে না। আগামীকাল পর্যন্ত গলায় ঢালতে পার এই মদ—তবু তোমার তেষ্টা মিটবে না। এত মদ আমি পেটে ঢাললাম যে পেটটা আমার ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেল। তখন আমি পোলাইটকে বললাম: এক গ্লাস ব্র্যানডি খেলে শরীরটা গরম হয়ে উঠবে। সেও আমার সঙ্গে একমত। ব্র্যানডি ঢালালাম। সঙ্গে-সঙ্গে শরীরটা গরম হয়ে গেল; এত গরম যে আবার তাকে ঠাণ্ডা না করে উপায় নেই। আবার সেই সিডার ঢাল। এইভাবে একবার ঠাণ্ডা, আর একবার গরম করার পালা চলল। বুঝতে পারলাম এইভাবে ন'য়ের কোঠায় পৌঁচেছি। পোলাইট একশর অনেক নীচে।

দরজা খুলে গেল। মিলি হাজির হল; তারপরে আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর আগেই চেঁচিয়ে বলল: শুয়োরছানা কোথাকার। তোমরা একশ'র মাত্রা ছাপিয়ে গিয়েছিলে—তোমরা দু'জনেই।

রেগে কাঁই হয়ে ম্যাথ্ বললেন: ওকথা বলো না মিলি। একশ'র মাত্রা আমি কোনদিনই ছাড়াইনি।

নতারদামের ছোট গির্জার পাশে দুটি লাইম গাছের নীচে তাঁরা আমাদের চমৎকার ব্রেকফাস্ট দিলেন। খেতে-খেতে ম্যাথ্ দু'চারটে অলৌকিক কাহিনীও শোনালেন।

খেয়ে-দেয়ে আরাম করে আমরা পাইপ ফুঁকছি এমন সময় দুটি দেহাতি বৃদ্ধা এসে হাজির হ'ল। তারা কেবল বৃদ্ধাই নয়; শুকনো, হাড্ডিসার; দেহগুলি তাদের নুয়ে পড়েছে। তারা এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল পাদরীকে; সেণ্ট ব্ল্যাঙ্ককে চাইল। তাদের দিকে পিট-পিট করে তাকিয়ে ম্যাথ্ বললেন—

এনে দিচ্ছি।

এই বলে কাঠের তৈরী গুদোম ঘরের দিকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে হন্তদন্ত হ'য়ে বেরিয়ে এসে হাত উঁচিয়ে বললেন: সেণ্ট ব্ল্যাঙ্ক কোথায় গিয়েছেন জানি না। তাঁকে আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। ঠিক জানি ওই গুদোমেই তিনি ছিলেন।

তারপরে হাতটা শিঙের মত বাঁকিয়ে হাঁকলেন—মিলি!

বাগানের নীচে থেকে উত্তর দিল মিলি—কী চাই?

সেণ্ট ব্ল্যাঙ্ক কোথায়? গুদোমে তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছিনে।

উত্তর এল মিলির—খরগোসের বাক্সের গর্ত বোজানোর জন্যে গত সপ্তাহে সেটা তুমি নাও নি?

হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই বটে। তোমরা আমার সঙ্গে এস।

বৃদ্ধা দুটি তাঁর পিছু নিল। হাসির চোটে মরে যাই আর কি! আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, এতদিন মাটিকাদায় মেশানো হ'য়ে সেণ্ট ব্ল্যাঙ্ক গুদোম ঘরে আরও দশটা জঞ্জালের সঙ্গে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। তারপরে সেটা নিয়ে ম্যাথু খরগোসের বাক্সের গর্তে চাপা দিয়েছেন।

সেণ্টকে পেয়ে বৃদ্ধা দুটি মাটিতে বসে প্রার্থনা করতে সুরু করল। ম্যাথু সেই দেখে বললেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও মাটিতে বস না। কিছু খড় বিছিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে খড় যোগাড় ক'রে প্রার্থনার আসন করে দিলেন তিনি। তারপরেই তাঁর লক্ষ্য পড়ল সেণ্টএর গোটা শরীরটা কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে না মোটে। তাই তিনি সেটাকে জল দিয়ে একটু ধোপদুরস্ত করার চেষ্টা করলেন। মোটামুটি কাজ চালানো গোছের করে সেটাকে তাদের সামনে বসিয়ে দিয়ে আমাদের জন্যে আর এক পাত্র মদ পরিবেশন করলেন।

মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে তিনি একটু বিব্রত হ'য়ে বললেন—মানে, সেণ্ট ব্ল্যাঙ্ককে দিয়ে আমার এক পেনিও আর রোজগার হবে না। এই ভেবেই ওটাকে আমি খরগোসের খাঁচায় বসিয়ে দিয়েছিলাম। গত দুটি বছর ধরে কেউ সেণ্ট ব্ল্যাঙ্ককে চায় নি। কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন. সেণ্টরা অমর—কোনদিই তাদের মৃত্যু হয় না।

মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে তিনি বলে গেলেন—আর এক রাউণ্ড হয়ে যাক। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মদ খেতে বসলে পঞ্চাশ পাত্রের নিচে থামা উচিৎ নয়। আমাদের হয়েছে মাত্র আটতিরিশ।

ওয়ালটার সক্‌নাফ-এর দুঃসাহসিক অভিযান

[Walter Schnaff's adventure]

আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ফ্রান্সে আসার পর থেকে ওয়ালটার সক্‌নাফ নিজেকে বড় দুর্ভাগ্যবান বলে মনে করছিলেন। বেশ শক্ত সমর্থ চেহারার মানুষ তিনি; হাঁটা চলা করতে কষ্ট হোত তাঁর; ধূমপান করতেন খুব বেশী; পা দুটি চওড়া আর মেদবহুল হওয়ার ফলে চলা-ফেরা করতে বিশেষ অসুবিধেই তাঁর হোত। বাইরে থেকে বেশ শান্তশিষ্ট আর পরোপকারী বলেই মনে হোত তাঁকে; সাহস আর জিঘাংসা কোনটাই তাঁর ছিল না। সন্তান ছিল তাঁর চারটি। তাদের তিনি ভালবাসতেন। বিয়ে করেছিলেন একটি সুন্দরী যুবতীকে। তার সান্নিধ্য আর আদর থেকে বঞ্চিত হওয়ায় প্রতিটি সন্ধ্যায় বড় মনোকষ্টে থাকতেন তিনি। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে আর দেরী করে উঠতে তিনি ভালবাসতেন। ভাল-ভাল খাবার খেতেন, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে। ভালবাসতেন কাফেতে বসে বিয়ার খেতে। তার মনে হল বর্তমানে যে জীবন তিনি কাটাচ্ছেন সেই জীবন থেকে তাঁর বেঁচে থাকার সব সুখ আর আনন্দগুলি বিনষ্ট হয়েছে। মনের ভেতর থেকেই তিনি ওই সব কামান, বন্দুক, তরোয়াল, রিভলবার—এগুলিকে ঘৃণা করতেন; এই ঘৃণা তিনি যে কেবল মন থেকেই করতেন তা নয়—যুক্তির দিক থেকেও এ-ঘৃণা করার অধিকার ছিল তাঁর। বিশেষ ক'রে ব্যায়োনেটটাকেই সহ্য করতে পারতেন না। ওই অস্ত্রটাকে দেখলেই একটা ভীষণ আতঙ্কে তিনি অস্থির হ'য়ে উঠতেন। তাঁর সেই বিরাট দেহ নিয়ে অস্ত্রটাকে তিনি সহজে চালাতেও পারতেন না; কেউ তেড়ে এলে সেই আক্রমণ থেকে নিজের দেহটাকে বাঁচাতেও বিশেষ অসুবিধে হোত তার।

রাত্রিতে কম্বল জড়িয়ে মাটির ওপরে শুয়ে শুয়ে জার্মানীতে তাঁর ঘরের কথা ভাবতেন। আমি যদি যুদ্ধে মরে যাই তাহলে আমার বাচ্চাগুলোর কী হবে? তাদের মানুষ করবে কে? যদিও ধার ক'রে তিনি তাদের কিছু অর্থ দিয়ে এসেছিলেন—তবু তাদের স্বাচ্ছল্য বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে ওয়ালটার কেঁদে ফেলতেন।

যুদ্ধে যোগ দেওয়ার প্রথম কিছুদিন হাঁটতে তার পা কাঁপতো; মনে হোত তিনি পড়ে যাবেন। কিন্তু শুয়ে পড়লে গোটা বাহিনীটা তাকে মাড়িয়ে চলে যাবে এই ভয়ে তিনি শুয়ে পড়তেন না। বুলেট ছোঁড়ার শব্দে তার গায়ে রোঁয়া দিত। কয়েকমাস এইরকম আতঙ্কে তার কাটলো।

সেদিন তাদের বাহিনী নরম্যানডি-র দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একদিন তাঁদের কয়েকজনকে সরজমিনে পাঠান হ'ল। তাদের ওপরে নির্দেশ ছিল অঞ্চলটির মধ্যে সামান্য একটা জায়গা পরীক্ষা করে দেখার। সেই অঞ্চলটি শান্ত ছিল; শত্রুদের দলবদ্ধ আক্রমণের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

নিশ্চিন্ত মনে তাঁরা একটা ছোট উপত্যকার নীচে নামছিলেন; নীচেটা অনেক ছোট-বড় গভীর নালায় ছিল ভরা। হঠাৎ চারপাশ থেকে সোঁ-সোঁ করে বুলেট ছোঁড়ার আওয়াজ ভেসে এল। থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁরা। দেখা গেল একদল বন্দুকধারী সেনা গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে, আর ব্যায়োনেট বাগিয়ে তাঁদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লেন ওয়ালটার। অকস্মাৎ এই ঝটিকা আক্রমণে তিনি এতই বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন যে কী করবেন তা তিনি প্রথমে বুঝতেই পারেন নি। তারপরেই দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার একটা মূর্খ বাসনা তাঁকে অধিকার করে বসল। কিন্তু ছুটতে গিয়েই মনে হল, এই স্থূল দেহ নিয়ে রোগা পাতলা ফরাসী সেনানীদের মত তিনি ছুটতে পারবেন না। ফরাসীরা ছাগলের মত দ্রুতবেগে লাফিয়ে-লাফিয়ে নামছে! হঠাৎ সামনের বিরাট একটা গর্ত চোখে পড়ল তাঁর—গর্তটা মাত্র ছ' ফুট দূরে—ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা। গর্তটা কত গভীর তা না জেনে উঁচু পোল থেকে নদীতে যেমন মানুষে ঝাঁপ দেয় তিনিও তেমনি ঝাঁপ দিলেন সেই গর্তে। সেই ঝোপের ভেতর দিয়ে সোঁ ক'রে ঢুকে গেলেন তিনি; কাঁটায় হাত-পা-মুখ ছড়ে গেল, তারপরে পাথর কুঁচির ওপরে ধপাস ক'রে বসে পড়লেন। চোখ তুলে দেখলেন যে ফাঁকটা তিনিই সৃষ্টি করেছেন তারই ভেতর দিয়ে কেবল আকাশ দেখা যাচ্ছে। পাছে এই ফাঁক দিয়ে শত্রুরা তাঁকে দেখতে পায় এই ভয়ে হাঁটু আর হাতে ভর দিয়ে তিনি পাশের ঘন ঝোপের আরও ভেতরে ঢুকে গেলেন। যতদূর ঢোকা যায় ঢুকে শুকনো ঘাসের বনের মধ্যে খরগোসের মত বসে রইলেন তিনি। কিছুক্ষণ ধরে কামান-বন্দুকের গর্জন শোনা গেল মাথার ওপরে, শোনা গেল আহতদের আর্তনাদ। তারপরে সব চুপ করে গেল।

হঠাৎ তাঁর কাছে কী যেন একটা নড়ে উঠল। ভয়ে চমকে উঠলেন তিনি। কারণটা হচ্ছে একটি পাতার স্খলন। গাছের ডালে পাখি বসেছিল একটি। তারই ফলে শুকনো একটা পাতা নীচে ঝ'রে পড়েছিল। এই শব্দে একঘণ্টা ধরে তাঁর বুক ধড়ফড় করতে লাগল।

নেমে এল রাত্রি। চারপাশ থেকে সেই খাদের বুকে নেমে এল অসংখ্য ছায়া। ওয়ালটার মনে-মনে ভাবতে লাগলেন—কী করব এবারে? আমার কী হবে? আবার বাহিনীতে গিয়ে যোগ দেব? কিন্তু কেমন করে, কোথায়? আবার সেই কষ্টের জীবন; সেই হাতে প্রাণ নিয়ে কোনরকমে দিন কাটাতে হবে আমাকে। না বাপু। সে সাহস আমার আর নেই। সৈন্যবাহিনীর

সঙ্গে আর আমি মার্চ করব না—শত্রুর বুলেটের সামনে আর আমি বুক পেতে দেব না।

কিন্তু তিনি করবেনটা কী? যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই গর্তের মধ্যে বসে থাকতে পারেন না। নিশ্চয় না। যদি তাঁর খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা না থাকত তাহলে হয়ত থেকেই যেতেন। কিন্তু তাঁকে খেতে হবে এবং প্রতিদিনই।

এইভাবে সৈনিকের ধড়াচূড়া পড়ে শত্রুদের দেশে একা তিনি পড়ে রইলেন। যারা তাঁকে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাতে পারে তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে তিনি বসে রয়েছেন। কথাটা ভাবতে গিয়েই দেহের ভেতর তাঁর কাঁপুনি ধরে গেল। তারপরে হঠাৎ তাঁর মনে হল—বন্দী হলে কেমন হয়। ফরাসীদের হাতে বন্দী হওয়ার এই অযৌক্তিক ভয়ঙ্কর উন্মাদ কামনায় তাঁর শরীরটা কেঁপে উঠল। তাহলে থাকা খাওয়ার বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। ভাল কারাগারে থাকতে পেলে বুলেট বা তরোয়ালের খোঁচা খাওয়ার ভয় থাকবে না আর। বন্দী! বন্দী! কী সুন্দর স্বপ্ন।

তাহলে কোথায় গিয়ে কার কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন? আর যাবেনই বা কেমন করে—কোন্‌দিকে যাবেন? মৃত্যুর করাল মূর্তিটা তাঁর আত্মাকে আক্রমণ করে বসল। ধাতুর শিরস্ত্রাণ পরে একা পথে বেরোলেই হয়ত তাঁকে বিপদের মুখে পড়তে হবে। যদি কোন দেহাতি লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়? আত্মরক্ষায় অসমর্থ, পথভ্রষ্ট প্রাশিয়ান সেনানীকে দেখতে পেলেই এ অঞ্চলের চাষীরা মেরে একেবারে চেপটা করে ফেলবে তাঁকে—কাঁটা, কোদাল-কুড়ুল, যা হাতের কাছে পাবে তাই দিয়ে খুঁচে খুঁচে শেষ করে ফেলবে।

আর যদি কোন সশস্ত্র সৈনিকের পাল্লায় পড়েন। তাহলে তো কথাই নেই। ঘণ্টাখানেক তাঁর মরা মুখ দেখে স্ফূর্তি করার জন্যে এই উন্মাদরা তাঁকে সোজাসুজি গুলিবিদ্ধ করে মেরে ফেলবে। তিনি স্পষ্টই মানস চোখে দেখতে পেলেন একটা দেওয়ালের গায়ে তাঁকে দাঁড় করানো হয়েছে—এক ডজন বন্দুকের কালো-কালো মুখ তার বুকের দিকে তাক করে তাকিয়ে রয়েছে। ভেবেই শিউরে উঠলেন তিনি।

যদি ফরাসী বাহিনীর সামনে গিয়ে পড়েন? তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাঁকে শত্রুদের গুপ্তচর বলে মনে করবে। ভাববে, এই সাহসী যোদ্ধা পথ অনুসন্ধান করার জন্যে একাই তাদের অঞ্চলে এসে পড়েছে। এই ভাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তারা তাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। শত্রুরা তাদের অনেক গোলাগুলি বনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে; তাঁকে খোলা মাঠের মধ্যে দেখতে পেলেই সেই সব বুলেট দিয়ে তাঁর বুক একেবারে ঝাঁঝরা করে দেবে। ভাবতে-ভাবতে হতাশায় আবার তিনি বসে পড়লেন। না, বাঁচার আর কোন পথ নেই তার।

রাত্রি নেমে এল—ঠাণ্ডা অন্ধকার রাত্রি। তিনি আর নড়াচড়া করলেন

না। পাশে একটু খসখস শব্দ হলেই তিনি চমকে উঠতে লাগলেন। একটা খরগোশ তাঁর পাশে গর্ত খুঁড়ছিল—এতেই তিনি প্রায় দৌড় দেন আর কি। পেঁচার ডাকে তাঁর প্রাণপাখি খাঁচা-ছাড়া হওয়ার উপক্রম করল। সেই ছায়ার মধ্যে চোখ চিরে-চিরে তিনি দেখতে লাগলেন। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর মনে হ'তে লাগল কেউ তাঁর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এইভাবে পরাজিত, পরিত্যক্ত মানুষের নৈরাশ্য আর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে-করতে সময় কাটতে লাগল তাঁর। তারপরে একসময় ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আকাশ ধীরে-ধীরে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে। অনেকটা স্বস্তি পেলেন তিনি। হাত-পা ছড়ালেন। মনটা হালকা হ'ল। চোখ দুটো বুজিয়ে এল তাঁর। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। চারপাশের পরিবেশ শান্ত। ওয়ালটারের মনে হল তাঁর খুব খিদে পেয়েছে। তিনি হাই তুললেন। সামরিক বাহিনীর ভাল-ভাল মুখরোচক খাওয়ার কথা ভেবে তাঁর জিবে জল এল। পাকস্থলীটা খিদেয় কুঁকড়ে-কুঁকড়ে উঠল।

তিনি উঠে পড়লেন, কয়েক-পা এগোলেন; বড় দুর্বল লাগল তাঁর। আবার বসে পড়লেন তিনি; বসে-বসে ভাবতে লাগলেন। আরও তিন চার ঘণ্টা ধরে তিনি ভাবতে লাগলেন—একবার ভাবলেন চলে যাই, একবার ভাবলেন—না, যাব না। এই দোটানায় পড়ে তাঁর মন ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল।

একটি পথই তাঁর কাছে বাস্তব বলে মনে হল। তিনি কোন দেহাতি লোকের জন্যে অপেক্ষা করবেন। নিরস্ত্র কোন দেহাতি কোন ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র না নিয়ে যদি সেইদিকে আসে তাহলে তিনি দৌড়ে গিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন—তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে তিনি ধরা দিচ্ছেন। তারপরে শিরস্ত্রাণটা খুলে ফেললেন তিনি; কারণ, ওটাই বিপজ্জনক। তারপরে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে তিনি গর্তের ভেতর থেকে উঁকি দিতে লাগলেন।

না; কেউ কোথাও নেই। দূরে গ্রামের বুক থেকে ধোঁয়া উঠছে আকাশে —নিশ্চয় রান্নাবান্না হচ্ছে। বাঁ দিকে লম্বা গাছের সারির ওপাশে বিরাট একটা প্রাসাদ দেখা গেল।

কেবল ঝাঁক-ঝাঁক কাক ছাড়া আর কিছুই তাঁর চোখে পড়ল না; শূন্য উদরের গড়গড়ানি ছাড়া অন্য কোন শব্দই তাঁর কানে ঢুকল না।

আবার রাত্রি ঘনিয়ে এল। গর্তের নীচে আবার তিনি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। সারা রাত্রি দুঃস্বপ্ন দেখে বারবার আঁৎকে উঠতে লাগলেন তিনি। অভুক্ত অনাহারী মানুষের জঠর-যন্ত্রণা নিয়ে রাতটা কেটে গেল তাঁর। আবার সকাল হল। আবার তিনি উঁকি দিয়ে দেখলেন। না; আগের দিনের মতই চারপাশ নিস্তব্ধ—থমথম করছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন একটা ভয়

এসে তাঁকে আক্রমণ করল। সে-ভয়টা হচ্ছে অনাহারের। শেষ পর্যন্ত অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে তাঁকে। সেই গর্তের ভেতরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি লম্বা হ'য়ে শুয়ে রয়েছেন, চোখ দুটো তাঁর বুজে রয়েছে। তারপরে জানোয়াররা এসে, নানা রকম ছোট-ছোট জানোয়ারের দল এসে তাঁর দেহটাকে কুরে-কুরে খেয়ে ফেলবে—তাঁর জামার তলায় দাঁত বসিয়ে চামড়া টেনে-টেনে ছিঁড়বে—এই দৃশ্যটা তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল। বিরাট একটা দাঁড়কাক হয়ত আকাশ থেকে নেমে এসে তাঁর চোখ দুটো খুবলে-খুবলে খাবে।

দুর্বলতার জন্যে তিনি মূর্ছা যাবেন, আর তিনি হাঁটতে পারবেন না—এই চিন্তাতেই তিনি উন্মাদ হ'য়ে গেলেন। তারপরে সবকিছু অগ্রাহ্য ক'রে সব-কিছু বিপদ তুচ্ছ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু কাঁধের ওপরে লাঙলের ফলা দিয়ে তিনজন চাষীকে মাঠের দিকে যেতে দেখে তিনি আবার গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যে হ'য়ে এলে চারিপাশ যখন অন্ধকারে ঢেকে এল তখন ধীরে-ধীরে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলেন; গুঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে এগোতে লাগলেন তিনি—তাঁর লক্ষ্য ছিল সেই দূরের প্রাসাদ। গ্রামের দিকে তিনি গেলেন না; কারণ, গ্রামেই শার্দূলদের দল রয়েছে। সেখানে যাওয়া বিপজ্জনক।

নীচের জানালাগুলি দিয়ে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। একটি জানালা খোলা। ভেতর থেকে বেশ ভাল-ভাল খাবারের খুশবাই বেরিয়ে ওয়ালটারের মনে বিভ্রান্তি জাগাল—তাঁর শরীরকে ক্ষুধার উন্মাদনায় অস্থির ক'রে তুলল। নিজেকে আর তিনি ধরে রাখতে পারলেন না। একটা দুর্নিবার আকাঙ্খা বেপরোয়া করে তুলল তাঁকে; এবং তারপরেই কিছুমাত্র চিন্তা না করেই, মাথার ওপরে হেলমেট চাপিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বিরাট একটা টেবিলের পাশে আটটি চাকর খাচ্ছিল। তাঁকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে একটি পরিচারিকা হাঁ করে চুপচাপ বসে রইল। হাত থেকে গ্লাস পড়ে গেল তার; চোখ দুটো ক্যাল-ক্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। তার দেখাদেখি অন্য সকলেও তাঁর দিকে তাকাল।

শত্রু! শত্রু!! হায় ভগবান! প্রাশিয়ানরা দুর্গ আক্রমণ করেছে।

প্রথমে চেঁচাল একজন; তারপরে আটজন—বিভিন্ন কণ্ঠে চীৎকার সুরু ক'রে দিল। তারপরেই শুরু হল দক্ষযজ্ঞ। চেয়ার ওলটালো, টেবিল ওলটালো, গ্লাস ভাঙলো, এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়লো—পুরুষরা মেয়েদের ঠেলে আগে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে শুরু করল ধ্বস্তাধস্তি। দু'মিনিটের মধ্যে ওয়ালটারের চোখের সামনেই ঘর ফাঁকা হ'য়ে গেল। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি তো অবাক, হতভম্ব।

কয়েকটি মুহূর্ত দ্বিধার পরেই জানালার ওপরে লাফিয়ে উঠলেন তিনি; তারপরে সাজানো খাবারের দিকে এগিয়ে গেলেন। নিদারুণ খিদেতে তিনি তখন জ্বরাগ্রস্ত রোগীর মত কাঁপছিলেন। কিন্তু তবু আতঙ্কে তাঁর হাত-পা অবশ হ'য়ে এসেছিল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। মনে হল সারা প্রাসাদটাই যেন কাঁপছে। দরজাগুলি বারবার খুলে গেল আবার বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল দোতলায় দ্রুত পায়ে কারা যেন হাঁটাহাঁটি করছে। একটা বিভ্রান্তিকর অস্পষ্ট গুঞ্জন শুরু হল। অস্বস্তির সঙ্গে প্রাশিয়ানটি সেই সব শব্দ শোনার জন্যে কান দুটি বাড়িয়ে দিলেন। তারপরে দোতলা থেকে বাসিন্দাদের নিয়ে লাফিয়ে পড়ার শব্দও শুনতে পেলেন।

তারপরে সব চুপচাপ। অতবড় প্রাসাদটি কবরখানার মত চুপ করে গেল। একটি পূর্ণ পাত্র নিজের কাছে টেনে নিলেন ওয়ালটার; তারপরে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলেন। মনে হল, অন্য কোন দিকে মন দেওয়ার সময় তাঁর নেই। দু'হাতে লম্বা লম্বা মাংসের ঠ্যাঙ ধরে সোজা পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে বিরতি দিলেন একটু। ভয় হল এখনই বুঝি পেটটা তাঁর ফেটে যাবে। তারপরে আপেল থেকে তৈরী করা মদের বোতল নিলেন টেনে। বন্ধ নালার মুখ খোলার জন্যে মানুষে যেমন জল ঢালে তিনিও তেমনি গলার মধ্যে মদের বোতলটা উজাড় করে ঢেলে দিলেন। পরপর যতগুলি প্লেট ডিস মদের বোতল ছিল সবগুলি শেষ করলেন তিনি। তারপরে ক্লান্ত হ'য়ে হাঁপাতে শুরু করলেন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সহজ করার জন্যে জামার বোতাম খুলে দিলেন। চলতে পারলেন না তিনি। তাঁর চোখ দুটি বুজে এল; দুটি হাত তিনি টেবিলের ওপরে এড়োএড়ি পেতে মাথাটা নামিয়ে দিলেন; তারপরে মহাসুখে পারিপার্শ্বিক জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

অর্দ্ধবৃত্তাকারে চাঁদের আলো দিকচক্রবালে ম্লান হ'য়ে এল। রজনী তখন প্রভাত-সম্ভবা। পরিচ্ছন্ন আকাশের বুকে শান্ত দুর্গটিকে কৃষ্ণকায় ছায়ার মত মনে হল। নীচের তলার দুটি জানালাই তখনও পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোতে চকচক করছিল। হঠাৎ বজ্রগর্জনে নির্দেশ জারি হল—এগিয়ে যাও—আক্রমণ কর বৎসগণ!

সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শব্দে জানালা দরজা ভেঙে জনতা পঙ্গপালের মত হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে এল। ঢোকার সময় তারা টেবিল ওলটালো, চেয়ার ভাঙলো। দেখতে দেখতে পঞ্চাশজন সুসজ্জিত সৈন্য যে রান্নাঘরে ওয়ালটার শান্তভাবে ঘুমোচ্ছিলেন সেই ঘরে হাজির হল; তারপরে তাদের গাদা বন্দুকের নল তাঁর বুকের সামনে ধরে মাটিতে ফেলে দিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল তাঁকে।

কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে, ভয়ে আধমরা হ'য়ে তিনি জুল-জুল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে গলায় সোনার পাত ঝুলিয়ে একটি লোক—দেখে

মনে হল সামরিক বাহিনীর—তার একটা পা তাঁর ভূলুণ্ঠিত দেহের ওপরে চাপিয়ে চীৎকার করে বলল : তুমি আমার বন্দী। আত্মসমর্পণ কর।

প্রাশিয়ান কেবল 'বন্দী' শব্দটিরই অর্থ বুঝতে পারলেন ; বুঝতে না পেরে গোঙালেন : জা, জা, জা।

তাঁকে মাটি থেকে তুলে একটা চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা হল ; বিজেতারা তাঁকে একটা অদ্ভুত কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগল। কঠোর পরিশ্রমে অনেকেই ক্লান্ত হ'য়ে বসে পড়ল।

ওয়ালটার হাসলেন—এখন তিনি হাসতে পারেন—কারণ তিনি যে সত্যি সত্যিই বন্দী সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

একজন অফিসার ভেতরে ঢুকে ঘোষণা করলেন : কর্নেল, শত্রুরা পালিয়ে গিয়েছে। মনে হয় তাদের মধ্যে অনেকেই হতাহত হয়েছে। আমরাই এখন এ-অঞ্চলের প্রভু।

সেই স্থূলকায় অফিসারটি কপালের ঘাম মুছে চীৎকার করে উঠলেন : জয় —জয়! তারপরে পকেট থেকে ছোট একটা নোট বই বার ক'রে খস্‌খস্ করে তাতে লিখলেন : প্রচণ্ড লড়াই-এর পরে প্রাশিয়ানরা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছে—তাদের হতাহতের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। সেই হত আর আহত-দের নিয়ে তারা পালিয়ে গিয়েছে। অনেকে আমাদের হাতে বন্দী।

যুবক অফিসারটি জিজ্ঞাসা করল : কর্নেল, এখন আমরা কী করব ?

কর্নেল বললেন : কামান বন্দুকধারী বলবান শত্রুদের এড়ানোর জন্যে আমরা এখন পিছু হ'টে আসব।

সেই দুর্গের দেওয়ালের ধারে সেনাবাহিনীকে নতুন করে সাজানো হল। হাত বাঁধা বন্দী ওয়ালটার যাতে পালিয়ে যেতে না পারেন সেইজন্যে রিভলবারধারী ছ'জন যোদ্ধা চারপাশ থেকে ঘিরে রইল তাঁকে। তারপরে সেই বাহিনী ওয়ালটারকে নিয়ে এগোতে লাগল। রাস্তা বার করার জন্যে অগ্রগামী একটি দলকে পাঠানো হল। অতি সন্তর্পণে, মাঝে-মাঝে থেমে-থেমে এগোতে লাগল বাহিনী। প্রভাতে লা রোচি—অয়সেল-এ সাব-প্রিফেক্ট-এর বাংলোতে হাজির হল তারা। এখানকার "ন্যাশনাল গার্ড"-ই এই যুদ্ধজয়ের বিরাট কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

উত্তেজনায় মুখর শহরের অধিবাসীরা তাদের পথ চেয়ে ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছিল। বন্দীর শিরস্ত্রাণ দেখে ভয়ার্ত হট্টগোল সুরু করল তারা। মহিলারা তাদের হাতগুলি ওপরে তুলল, চোখের জল ফেলল বৃদ্ধেরা, একটি দাদু প্রাশিয়ানটিকে লক্ষ্য করে তার লাঠিটা ছুঁড়ে দিল।

সেই লাঠি একজন রক্ষীর নাকের ওপরে এসে পড়ল। কর্নেল চীৎকার করে উঠলেন : সাবধান! বন্দীকে রক্ষা করো।

অবশেষে দলটি টাউন হলে হাজির হল। বন্দীশালার দরজা খোলা হল—

তারপরে দড়ি-দড়া খুলে নিয়ে সেইখানে নিক্ষেপ করা হল ওয়ালটারকে। সেই বন্দীশালার চারপাশে দু'শ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী সেনা পাহারা দিতে লাগল।

তারপরে, কিছুক্ষণ ধরে বদহজমে কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও, ওয়ালটার আনন্দে দিশেহারা হ'য়ে উন্মত্তের মত নাচতে লাগলেন—হাত তুলে, পা দুলিয়ে প্রাণের আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে চীৎকার করতে করতে একসময় পরিশ্রান্ত হ'য়ে দেওয়ালের গায়ে ঢলে পড়লেন। বন্দী, বন্দী হয়েছেন তিনি। এখন তিনি নিরাপদ।

এইভাবে মাত্র ছ'টি ঘণ্টা শত্রুদের কবলে থাকার পরে চামপিগনেট দুর্গটিকে আবার উদ্ধার করা হল; এবং এই অভিযানে লা রোচি—অয়েসল-এর ন্যাশনাল গার্ডের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী কর্নেল রেতিয়ার। এই সাফল্যের জন্যে তিনি পুরস্কৃত হলেন।

মাদাম ব্যাপটিস্ট

[Madame Baptiste]

লোবের স্টেশনের বিশ্রামাগারে ঢুকেই প্রথমে আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। প্যারিসে যাওয়ার একস্প্রেস ট্রেন আসতে এখনও দু'ঘণ্টা দশ মিনিট বাকি।

হঠাৎ খুব ক্লান্ত মনে হল নিজেকে। মনে হল আমি যেন মাইল কুড়ি হেঁটে এসেছি। সময়টা কোনরকমে কাটানো যায় কিনা এই ভেবে আমি স্টেশনের চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। তারপর স্টেশনের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সময়টা কী করে কাটাবো সেই কথাটা ভাবতে লাগলাম। একটা বেড়াল রাস্তা পেরিয়ে খুব সাবধানে ছাদের নালীর ওপর উঠে গেল;. প্রতিটি গাছের নিচে খাবারের গন্ধ শুঁকে-শুঁকে একটা ঘেয়ো কুকুর ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোন লোকজন চোখে পড়ল না। কেমন যেন মনমরা হয়ে গেলাম আমি। সময়টা আমি কাটাবো কেমন করে? রেল স্টেশনের কাছাকাছি যেসব ছোট-ছোট কাফে থাকে সেইখানে ঢুকে কিছু অখাদ্য মদ গলায় ঢেলে আঞ্চলিক সংবাদপত্রের ওপরে চোখ বুলানোরও ইচ্ছা আমার একটা হয়েছিল। এমন সময় দেখলাম একটি শোকযাত্রা উলটো দিকের রাস্তা থেকে বেরিয়ে আমি যে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েছিলাম সেইদিকে এগিয়ে আসছে। শবাধারটিকে দেখে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। অন্তত, মিনিট দশেকের জন্যেও সময়টা কাটানো যাবে।

হঠাৎ আমার ঔৎসুক্যটা বেড়ে গেল। শবাধারের পেছনে মাত্র আটজন ভদ্রলোক আসছেন; তাঁদের মধ্যে একজন কাঁদছেন; বাকি সবাই একসঙ্গে প্রার্থনার পদ উচ্চারণ করছেন। কিন্তু সঙ্গে কোন পাদরী ছিলেন না। ভাবলাম সম্ভবত এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। লোর্বের মত শহরে অন্তত একশজন এমন রয়েছেন যাঁরা স্বাধীন চিন্তাশীল। তাঁদের সেই মতটা প্রকাশ করার জন্যেই হয়ত এই শোকযাত্রায় গির্জার কোন প্রতীককে তাঁরা সঙ্গে নেন নি। তাছাড়া এর পেছনে অন্য কোন কারণ থাকতে পারে কি? যে রকম দ্রুতভাবে তাঁরা হাঁটছিলেন তাতে আমার মনে হয়েছিল কোনরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান বর্জন করেই কাজটা তাঁরা শেষ ক'রে ফেলতে চান।

আমার চিন্তাটা যে অলস মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত সেদিকে কোন সন্দেহ ছিল না। শবযাত্রাটি কাছাকাছি হওয়ামাত্র আমার মগজে এক অদ্ভুত চিন্তা খেলে গেল। সেই আটজন ভদ্রলোকের সঙ্গে-সঙ্গে যেতে ইচ্ছে হল আমার। তার ফলে ঘণ্টাখানেক সময় আমার কাটবে। এই ভেবে আমি রাস্তায় নেমে সেই দলে ভিড়ে গেলাম।

আমাকে দলে ভিড়তে দেখে তাঁরা নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে কথা বলতে লাগলেন—আমি এই শহরের মানুষ কিনা তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন। তাঁরা যেভাবে আমাকে দেখছিলেন তাতে আমার খুব বিরক্তি লাগছিল। সেই অস্বস্তি কাটানোর জন্যে আমি তাদের কাছে গিয়ে অভিবাদন ক'রে বললাম—আপনাদের আলোচনায় বাধা দিচ্ছি বলে ক্ষমা করবেন। বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় ব'লেই আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। মৃত ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই।

তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—ইনি একজন মহিলা।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম—কিন্তু এটা সিভিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, তাই নয় কি?

আর একটি ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ-ও বলতে পারেন, না-ও বলতে পারেন। গির্জায় ঢোকার অনুমোদন পাদরী আমাদের দেন নি।

তাই বুঝি! অ-বা-ক কাণ্ড।

ভদ্রলোকটি বললেন—এটি একটি দীর্ঘ কাহিনী। যুবতীটি আত্মহত্যা করেছিল। সেইজন্যেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তার কোন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে না। যে ভদ্রলোকটি কাঁদতে-কাঁদতে প্রথমে যাচ্ছেন উনিই মৃতা যুবতীর স্বামী।

কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে আমি বললাম—শুধু অবাকই হচ্ছি না; কিছুটা কৌতূহল-ও আমার জাগছে। মঁসিয়ে কী ঘটেছিল জানতে চাওয়াটা কী অভদ্রতা হবে?

ভদ্রলোকটি পরিচিত মানুষের মত আমার একটা হাত ধরে বললেন—মোটেই নয়। আসুন, আমরা একটু ধীরে-ধীরে এগোই। কাহিনীটা বড়

করুণ। তবু আপনাকে আমি বলব। ওই দূরে পাহাড়ের ওপরে যে গাছগুলি দেখছেন ওইখানেই সিমেট্রি। ওখানে পৌঁছতে আমাদের সময় লাগবে।

এই কথা বলে শুরু করলেন তিনি—

এই যুবতীর নাম মাদাম পল হ্যাযোত। পাশাপাশি অঞ্চলের একটি বেশ অর্থশালী ব্যবসাদার মঁসিয়ে ফঁভানেলের মেয়ে। এগার বছর বয়সে বাড়ির চাকর ওর ওপরে ভয়ানক রকমের পাশবিক অত্যাচার করে। সেই জঘন্য অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মেয়েটি প্রায় মর-মর হয়ে পড়েছিল। জানোয়ারটার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করা হল। অত্যচারের বর্বরতার দিকে লক্ষ্য রেখে বিচারে তার যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে মেয়েটি বেড়ে ওঠে। সমবয়সী আর বয়স্ক মানুষ—কেউ তার সঙ্গে মেলামেশা না করায় তাকে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে হয়েছিল। পাছে তার সংস্পর্শে এলে দূষিত হ'তে হয়, এই ভয়ে কেউ তাকে চুমু খেত না। শহরের ভেতরে সবাই তাকে এড়িয়ে চলত। সে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে সবাই তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে কী সব বলত—সরে যেত অন্য পাশে। তার বাবা মা তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোনোর জন্যে কোন পরিচারিকও সংগ্রহ করতে পারতেন না।

মেয়েটার অবস্থা কী অসহনীয় হয়ে পড়েছিল তা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। বিকালে তার সমবয়সী মেয়েরা মাঠের মধ্যে খেলাধুলো করছে, হুল্লোড় করছে, আর একটি পরিচারিকা সঙ্গে নিয়ে সে একপাশে মুখ চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝে-মাঝে মেয়েদের সঙ্গে মেশার জন্যে ভয়ে-ভয়ে নিতান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সে তাদের দলে ভিড়ে যেত। এই দেখেই অন্যান্য মেয়েদের মা বা পরিচারিকারা দৌড়ে গিয়ে তাদের টেনে বের করে আনত। কিছু বুঝতে পারত না বাচ্চা মেয়েটা। দুঃখে সে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে গিয়ে তার পরিচারিকার বুকে মুখ লুকিয়ে ফেলত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার অবস্থা আরও সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়াল। প্লেগগ্রস্ত রোগীর সান্নিধ্য মানুষ যেমন এড়িয়ে থাকত, যুবতী মেয়েদের-ও তাদের বাপ-মায়েরা তেমনিভাবে তাদের সরিয়ে রাখত। তার লেখাপড়া হ'ল না; বিবাহের রাত্রিতে মেয়েরা যে জিনিসটা শেখে সে কিছু লেখাপড়া না জেনেই সে জিনিসটা শিখে ফেলেছে—এই তার অপরাধ। যখন সে চোখ নিচু ক'রে পরিচারিকার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটতো, অপাপবিদ্ধা না হলেও অন্যান্য মেয়েরা চট ক'রে মাথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিত। কেউ তাকে অভিবাদন জানাত না; আর চ্যাংড়া ছেলেরা তাকে 'মাদাম ব্যাপটিস্ট' নামে ডেকে ব্যঙ্গ করত। যে চাকরটা তার ওপরে ব্যভিচার করেছিল সেই লোকটার নাম ছিল ব্যাপটিস্ট।

তার মনের ভেতরে যে যন্ত্রণা হোত সেকথা কেউ জানত না। মনের কথা

কোনদিনই সে মুখ ফুটে কাউকে বলত না ; হাসতও না সে কোনদিন। এমন কি তার বাবা-মাও তাকে দেখে বড় অস্বস্তি বোধ করতেন। সেই অপরাধের জন্যে তাঁরাও তার ওপরে বেশ চটেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন ওই হতচ্ছাড়া মেয়েটার জন্যেই সমাজে তাঁদের মর্যাদা নষ্ট হচ্ছে।

এইরকম একটি অপরাধীকে কোন্ ভদ্র যুবক বিয়ে করবে? নিজের ছেলেও যদি সেইরকম অপরাধী হয় কোন বাপমা তার বিয়ে দিতে চাইবেন না। এঁরাও সেই কথা ভেবে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার আশা জলাঞ্জলি দিলেন। মেয়েটি সুন্দরী ছিল ; কিন্তু বিবর্ণ তার চেহারা। দেখতে যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত, দীর্ঘাঙ্গিনী ; সেই কলঙ্ক জড়িয়ে না থাকলে আমারও মেয়েটিকে বেশ ভালই লাগত।

তারপরে এখানে যখন নতুন সাব-প্রিফেক্ট নিযুক্ত হলেন তখন তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন। সেটা প্রায় আঠার মাস আগের কথা। বড় অদ্ভুত মানুষ এই প্রাইভেট সেক্রেটারী। সম্ভবত তিনি ল্যাটিন কোয়ার্টারে থাকতেন। এই কুমারীকে দেখে তিনি সোজাসুজি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। যখন তাঁকে মেয়েটির পূর্ব ইতিহাস বলা হল তখন তিনি তা তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দিয়ে মন্তব্য করলেন—বা! ভবিষ্যতে ওটাই তো হবে আমার গ্যারান্টি। অঘটন জিনিসটা বিয়ের পরে না ঘটে আগে ঘটাই ভাল। এর ফল হচ্ছে মেয়েটিকে নিয়ে আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারব।

ভদ্রলোকটি তার কাছে গেলেন ; তার কাছে প্রস্তাব দিলেন বিয়ের। বিয়ে হয়ে গেল ; এবং নিজের যে সাহস রয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন অনেককে। যেন কিছুই ঘটে নি এইরকম একটা ভাব ; সেই ভোজে কেউ-কেউ এলো না। কিন্তু অবশেষে সকলেই আগের কথা ভুলে গেল ; এবং মেয়েটি সমাজে তার পূর্ণ মর্যাদা পেল। এই মর্যাদা সে যে তার স্বামীর জন্যেই পেয়েছে সেই কথাটা সে ভুলতে পারল না। স্বামীর এই তেজস্বীতা তাকে মুগ্ধ করেছিল। স্বামীকে সেইজন্যে সে দেবতার মত ভক্তি করত।

তারপরে সে অন্তঃসত্ত্বা হল ; এবং এতদিন যারা তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিল, কুৎসা প্রচার করেছিল তারাই তাকে দরজা খুলে দিল—সাদর অভ্যর্থনা জানাল তাকে—কারণ মাতৃত্বের পূতঃ সলিলে অবগাহণ ক'রে সে শুদ্ধ হয়েছে।

ব্যাপারটা কৌতুককর হ'লেও সত্যি। মেয়েটি সগৌরবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল। তারপরে সেদিন আমাদের শহরের পেট্রন সেন্ট-এর উৎসব সুরু হল। সেই সূত্রে গানের যে জলসা বসেছিল তাতে পৌরোহিত্য করেছিলেন প্রিফেক্ট। সঙ্গে ছিল তাঁর দলবল। প্রিফেক্ট-এর বক্তৃতা শেষ হলে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মেডেল বিলোতে উঠলেন।

আপনি জানেন এই পুরস্কার বিতরণের ব্যাপারে আপনি কাউকে কোন-

দিন সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। গ্রহীতারা সব সময় পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, হিংসা করে পরস্পরকে। ফলে, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে তারা। সমস্ত রমণীরা প্লাটফর্মের ওপরে জমায়েৎ হয়েছিলেন। এঁদের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মেডেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণ, সকলকে যে প্রথম শ্রেণীর মেডেল দেওয়া সম্ভব নয় তা আপনি স্বীকার করবেন। মোরিলোঁ গ্রামের ব্যাণ্ড মাষ্টার পুরস্কার নেওয়ার জন্যে এলে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মেডেলটি দেওয়া হল। প্রাইভেট সেক্রেটারী এই মেডেলটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সেটি তাঁর মুখের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—ব্যাপটিস্টের জন্যে এটা আপনি রেখে দিন। ঠিক আমার মতই তাকে আপনার প্রথম শ্রেণীর মেডেল দেওয়া উচিৎ।

এই কথা শুনে কিছু লোক হাসতে আরম্ভ করল। সাধারণ মানুষের মনে উদারতাও নেই, রুচি নেই। সবাই সেই হতভাগ্য রমণীটির দিকে চোখ ফেরালো। মঁসিয়ে, কোন নারীকে আপনি উন্মাদ হ'য়ে যেতে দেখেছেন? আমরা সেদিন দেখলাম। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল; তারপরে তিন তিনবার চেয়ারের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মনে হ'ল সে দৌড়ে পালিয়ে যেতে চায়; কিন্তু কিছুতেই জনতার ভিড় ঠেলে পালাতে পারল না। তারপরে জনতার ভেতর থেকে একজন চীৎকার করে উঠল—ও-হো! মাদাম ব্যাপটিস্ট।

প্রচণ্ড হই-চই, হট্টগোল সুরু হল। কথাটা বার বার চেঁচিয়ে বলতে লাগল সবাই। সেই হতভাগ্য রমণীকে দেখার জন্যে অনেকেই বুড়ো আঙুলের ওপরে ভর দিয়ে মুখ উঁচু করে দিল। স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের উঁচু করে তুলে ধরল।

কে—কোন্—কোন্‌টি? ওই নীল পোশাক পরা?

ছেলেগুলো মুরগীর মত চেঁচাতে লাগল।

মেয়েটি একভাবে চেয়ারের ওপরে বসে রইল। মনে হল, সকলকে দেখানোর জন্যেই সে যেন চেয়ারে বসে রয়েছে। সে নড়াচড়া করতে পারল না, পালিয়ে যেতে পারল না—মুখ ঢাকতে পারল না। সূর্যের আলো চোখে পড়লে মানুষ যেমন মিট মিট ক'রে তাকায় সে-ও সেইরকম করে তাকাতে লাগল। উঁচু পাহাড়ের ওপরে ওঠার সময় ঘোড়ারা যেমন করে হাঁপায় সে-ও সেইরকমভাবে হাঁপাতে লাগল। এরই ভেতরে মঁসিয়ে হ্যামোত একজনের গলা টিপে ধরেছেন। দুজনে তখন ধস্তাধস্তি করে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। বিরাট একটা হট্টগোল আর বিশৃঙ্খলতার ভেতরে উৎসবটির ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হ'য়ে গেল।

একঘণ্টা পরে হ্যামোত দম্পতি বাড়ির পথ ধরলেন। এতক্ষণ এত অপমানের পরেও মাদাম হ্যামোত কোন কথা বলে নি। সে থরথর করে কাঁপছিল। একটা পুলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় সে নীচে নদীর ওপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। স্বামী বাধা দেওয়ার কোন সুযোগ পেলেন না। প্রায় ঘণ্টা দুই অনুসন্ধানের পরে মাদামের মৃতদেহটি খুঁজে পাওয়া গেল।

একটু থেমে বক্তাটি বললেন—অবশ্য, এছাড়া তার আর করারই বা কি ছিল? মানুষের জীবনে এমন কিছু কলঙ্ক থাকে যেগুলিকে মুছে ফেলা যায় না। এইজন্যেই পাদরী মৃতদেহটিকে গির্জায় ঢুকতে দেন নি।

সিমেট্রির ভেতরে আমরা সবাই ঢুকলাম। কফিনটি নামানো হল। তারপরে আমি হতভাগ্য স্বামীটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। স্বামীটি তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। চোখের জলের ভেতর দিয়ে অবাক হ'য়ে আমার দিকে তিনি তাকালেন। আমি জোরে তাঁর হাতে চাপ দিতেই তিনি বললেন—মঁসিয়ে, আপনার সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ।

শবযাত্রাটি অনুসরণ করার জন্যে আমার কিন্তু কোন দুঃখ হয় নি।

মাষ্টার বেলহোম-এর জানোয়ার

[Master Belhomme's beast]

ক্রিকেতোত থেকে হ্যাভারেগামী স্টেজ-কোচ ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে; কমার্শিয়াল হোটেলের চত্বরে প্যাসেঞ্জাররা সব তৈরী হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এবার তাঁদের নাম ডাকা হবে। হলুদ রঙের গাড়ী ধুলো-বালি-কাদায় ধূসর হ'য়ে গিয়েছে। সামনের চাকাগুলি ছোট-ছোট। পেছনের চাকাগুলি বড়-বড়, কিন্তু হাড্ডিসার। গাড়ীটার-ও ছিরিছাঁদ বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। তিনটে বেশ বড় ঘোড়া গাড়ীটার সঙ্গে বাঁধা ছিল। এই অদ্ভুত গাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। গাড়োয়ানটি বেঁটে-খাট, স্থূলকায়; কিন্তু অনবরত ওঠা-নামা করার ফলে, স্বার রোদে-জলে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে যথেষ্ট কর্মঠ। সব সময়েই তার চোখ দুটো মিটমিট করে। তাকে দেখলে মনে হবে লোকটা সব সময় রোদ-জল আর ঝড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতের পেছন দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে সে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল। দেহাতী মেয়েদের সামনে বড়-বড় ডিম আর হাঁস-মুরগী বোঝাই-করা বেশ ভারি বোঝা ছিল। ড্রাইভার একটা-একটা করে সেগুলো নিয়ে গাড়ীর মাথায় তুলে দিল। তারপরে বীজ ভর্তি কয়েকটা থলি সে সন্তর্পণে নিচে থেকেই ছুঁড়ে দিল ওপরে; সেইসঙ্গে তুলে দিল ছোট ছোট কয়েকটি পুটলী। তারপরে গাড়ীর পেছনকার দরজা খুলে একটা তালিকা হাতে নিয়ে সে যাত্রীদের নাম ডাকতে লাগল:

"জর্জভাইল-এর সম্মানিত ফাদার।"

দীর্ঘাঙ্গী, চওড়া ছাতি, শক্ত-সমর্থ পাদরী এগিয়ে গেলেন। মুখের রঙটা

তাঁর লাল ; কিন্তু হৃদয়টা তাঁর বড় কোমল। তারপর, মহিলারা যেমন ক'রে তাদের স্কার্ট উঁচিয়ে ধরে সেইভাবে চাপকানটা পায়ের ওপরে কিছুটা গুটিয়ে নিয়ে তিনি নড়বড়ে গাড়ীটার মধ্যে ঢুকে গেলেন।

"রোলেবক্স-লা-গ্রিনেটস-এর মাষ্টার মশাই।"

মাষ্টারমশাই-ও দীর্ঘাঙ্গী। হাঁটু পর্যন্ত তাঁর ফ্রককোট নামানো। ইতস্তত করতে-করতে তিনি খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

"মাষ্টার পয়রেত—তুটি আসন।"

দীর্ঘ চেহারার মানুষটি মাথা নিচু ক'রে ভেতরে ঢুকলেন। উপযুক্ত খাবারের অভাবে তাঁর শরীরটা ডিগডিগ করছে—দেহের নানা জায়গা থেকে চামড়া ঝুলে পড়েছে। পেছনে এলেন তাঁর স্ত্রী। বেঁটে চেহারার মানুষটি—সংসারের জোয়াল টেনে-টেনে ক্লান্ত মাদী ঘোড়ার মত চেহারা হয়েছে তাঁর। ঢোকার সময় বিরাট ছাতাটিকে তু'হাতে আঁকড়ে ধরলেন।

"মাষ্টার ব্যারোত, তুটি আসন।"

চরিত্রের দিক থেকে ব্যারোত অস্থিরচিত্ত। ডাক শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আমাকে ডাকছেন ?

ড্রাইভারের ডাক নাম "ফক্সি।" সে একটা রসিকতা করার চেষ্টা করতেই তাঁর স্ত্রী পেছন থেকে ধাক্কা দেওয়ায় গাড়ীর ভেতরে তিনি গড়িয়ে পড়লেন। ভদ্রমহিলার চেহারা গোলাকার, ব্যারেলের মত তাঁর উদর, ধোপানীর কাপড়কাচা কাঠের হাতুড়ির মত লম্বা তাঁর হাত। গর্তের মধ্যে ইঁদুরের মত ব্যারোত সুড়ুৎ ক'রে ঢুকে গেলেন।

"মাষ্টার ক্যানিভ্যু।"

বিরাট দশাসুর চেহারার চাষী তার সমস্ত শক্তি একসঙ্গে করে ভেতরে ঢুকে গেল।

"মাষ্টার বেলহোম।"

লম্বা, কৃশকায় মানুষ বেলহোম। তাঁর কাঁধ ঘর্মাক্ত ; চেহারাটা করুণ। একটা রুমাল দিয়ে তাঁর কান তুটো জড়ানো। দেখলেই মনে হবে লোকটি দাঁতের যন্ত্রণায় ভুগছে।

যাত্রীদের গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল গাড়োয়ান। তারপরে ছাদে উঠে চাবুক মারল ঘোড়াগুলির পিঠে। চলতে শুরু করল গাড়ী। ঝাঁকানি খেতে-খেতে ভেতরের যাত্রীরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগলেন।

প্রথম দিকে পাদরীর উপস্থিতির জন্যে সবাই চুপচাপ বসেছিলেন ; আবোল-তাবোল গল্প করতে সাহস পান নি। ভদ্রলোক নিজেই কিছুটা বাচাল আর বন্ধুবৎসল হওয়ার ফলে তিনিই শুরু করলেন প্রথমে—মাষ্টার ক্যানিভু, ভাল আছেন তো ?

ক্যানিভূ হেসে বললেন—তা, একরকম ভালই, ফাদার। আপনি কেমন আছেন ?

আমি সব সময়েই ভাল থাকি। পয়রেত, আপনার সংবাদ কী ?

ভালই ফাদার, এক ওই চাষ ছাড়া। ফসল ভাল হ'লে তাই দিয়েই আমাদের ক্ষতি হয় যা আমরা উসুল ক'রে নিই।

অবশ্য, সময়টা বড় খারাপই চলেছে।

র‍্যাবোতের শক্তকায়া মহিষী পুলিশদের কাছাকাছি গলার স্বর করে বললেন—হায় ভগবান, দিনকাল সত্যিই বড় খারাপ।

পাশের গ্রাম থেকে আসছেন ব'লে পাদরী তাঁর নামটা ছাড়া আর কিছুই জানতেন না।

তুমি কি ব্লনডেলের মেয়ে ?—পাদরীটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ, আমি র‍্যাবোতকে বিয়ে করেছি।

দুর্বল, রোগাটে, আর সুখী র‍্যাবোত একটু হেসে পাদরীকে অভিবাদন করে বললেন—হ্যাঁ আমি সেই র‍্যাবোত; আমাকে ওই ব্লনডেলের মেয়ে বিয়ে করেছে।

মাষ্টার বেলহোম কানে রুমাল জড়িয়ে বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। দাঁত চিপে পা ঠুকে ঠুকে এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন যে মনে হল ভীষণ একটা যন্ত্রণায় তিনি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন।

পাদরী বললেন—তোমার দাঁতের ব্যথাটা খুব কষ্টকর হয়ে উঠেছে ব'লে মনে হচ্ছে।

উত্তর দেওয়ার জন্যে একটু চুপ করে থেকে চাষীটি বললেন—না, না—ফাদার। দাঁত নয় ফাদার, যন্ত্রণা হচ্ছে আমার ডান কানের ভেতরে।

কী হয়েছে ডান কানে ? ফোড়া ?

ফোড়া কিনা জানিনে; তবে ওটা যে একটা জঘন্য জন্তু সেবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি যখন খামারে খড়ের গাদায় শুয়েছিলাম তখনই ব্যাটা আমার কানের ভেতর ঢুকেছে।

জন্তু ? ঠিক বলছ ?

ঠিক বলছি কিনা জানিনে। তবে ফাদার, এটুকু আমি ধর্ম সাক্ষী রেখে বলতে পারি যে ব্যাটা আমার কানের ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে। এ ব্যাটা আমার মাথাটাকে কুরে-কুরে খেয়ে ফেলবে, ও—হো···এই বলে প্রচণ্ড বিক্রমে পা আছড়াতে লাগলেন তিনি।

এই দৃশ্যে আশপাশের সকলেই প্রায় কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। এই যন্ত্রণার উপশম কেমন ক'রে হতে পারে সে-সম্বন্ধে প্রত্যেকেই এক-একটা উপদেশ দিলেন। পয়রেত বললেন, জন্তুটা মাকড়শা না হয়ে যায় না; শিক্ষকটি বললেন—ও নিশ্চয় শুয়ো পোকা। এরকম ঘটনা ঘটতে তিনি নাকি

শুনেছেন। একবার একটি লোকের মাথার মধ্যে এইরকম একটা শুঁয়োপোকা ঢুকেছিল; তবে সে পরে তার নাক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে কানের ভেতর দিয়ে শুঁয়োপোকাটি ঢুকেছিল সেই কানে আর সে শুনতে পেত না; কারণ, কানের পর্দাটাকে ব্যাটা কেটে কুটে একেবারে তছনছ ক'রে দিয়েছিল।

পাদরী বললেন—নিশ্চয় কোন পোকাটোকা হবে।

মাষ্টার বেলহোম একেবারে শেষকালে গাড়ীর ভেতরে ঢুকেছিলেন; ফলে, তাঁকে বসতে হয়েছিল দরজার একেবারে ধারে। সেই দরজার গায়ে হেলান দিয়ে তিনি গোঙাতে লাগলেন···ও হো হো···আমি মরে গেলাম, মরে গেলাম। মনে হচ্ছে একটা পিঁপড়ে···ইয়া বড় একটা পিঁপড়ে···ওই··· ওই···ব্যাটা কানের ভেতরে লম্ফঝম্প জুড়ে দিয়েছে···গেলাম গেলাম, মলাম, মলাম···।

ক্যানিভু জিজ্ঞাসা করলেন—ডাক্তার দেখান নি?

না, ভগবান, না।

কেন দেখান নি?

ডাক্তারের ভয়ে বেলহোমের অসুখটা সেরে গেল বলে মনে হল। রুমালটা কান থেকে খুলে না নিয়ে তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

কেন দেখাই নি? এই সব অপদার্থ মানুষদের জন্যে নষ্ট করার মত টাকা আপনার রয়েছে? একবার, দুবার, তিনবার···আপনি যাচ্ছেন, যাচ্ছেন, আর যাচ্ছেন। আর প্রত্যেকবারেই কিছু না কিছু খসছে আপনার। আর তার প্রতিদানে সে আমার কতটুকু উপকার করছে? কচু···কচু···কিছু জানেন···

ক্যানিভু হেসে বললেন—তা আমি জানব কেমন ক'রে? তা আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

চ্যামবারলেনকে দেখানোর জন্যে হ্যাভারের দিকে যাচ্ছি।

চ্যামবারলেন কে?

ডাক্তার।

কোন্ ডাক্তার?

যে ডাক্তার আমার বাবাকে সারিয়েছিল।

আপনার বাবা?

হ্যাঁ; বাবা যখন বেঁচে ছিলেন।

আপনার বাবার কী হয়েছিল?

হাওয়া জমেছিল পিঠে, ফলে তিনি হাত-পা কিছুই নাড়তে পারতেন না।

তা, আপনার ওই চ্যামবারলেন কী করলেন?

তিনি ময়দা দলার মত ক'রে তার পিঠটা আচ্ছা ক'রে দলে ছিলেন। দুঘণ্টায় রোগ সেরে গেল।

চ্যামবারলেন যে সেই সঙ্গে কিছু মন্ত্র-ও আওড়েছিলেন সে কথা বেলহোমের বেশ মনে রয়েছে; কিন্তু পাদরীর সামনে সে কথা বলতে সাহস হ'ল না তাঁর।

ক্যানিভূ হাসতে-হাসতে বললেন—আপনার কানের ভেতরে যে একটা খরগোস ঢোকে নি তা আপনি কেমন ক'রে জানলেন? আপনার কানের ভেতরে চুলের যে জঙ্গল জন্মেছে, তাতে সে হয়ত ভেবেছে ওরই মধ্যে আরাম করে সে বাসা বাঁধতে পারবে। একটু থামুন; ব্যাটা পাঁই-পাঁই ক'রে পালাতে পথ পাবে না।

এই ব'লে হাতের দুটো তালুকে একসঙ্গে ক'রে শিকারের পেছনে দৌড়ানোর সময় শিকারী কুকুর যেরকম গর্জন করে, ক্যানিভূ-ও বেলহোমের কানের কাছে মুখ নিয়ে সেইরকম চীৎকার করতে শুরু করলেন—ঘেউ···ঘেউ ···ঘে-উ-উ···ঘে-উ-উ···ঘাঁক···ঘাঁক ইত্যাদি। সেই ধ্বনিতে সবাই হেসে উঠ-লেন, এমন কি স্কুলের শিক্ষকও বাদ গেলেন না।

সবাই তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করছে বুঝতে পেরে বেলহোম বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এই দেখে সকলেরই দৃষ্টি অন্য দিকে ঘোরানোর জন্যেই পাদরী র‍্যাবোতের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার সংসারটি বেশ বড় ব'লেই মনে হচ্ছে আমার। তাই না?

হ্যাঁ ফাদার। ঠিক বলেছেন। তাদের প্রতিপালন করা কী কষ্টকর বলুন তো!

মাথা নেড়ে সায় দিলেন র‍্যাবোত—হ্যাঁ, ফাদার। সেকথা ঠিক।

ছেলে-মেয়ে আপনার ক'টি?

বুকের ছাতি ফুলিয়ে ইচ্ছে ক'রে স্বরটাকে রূঢ় ক'রে র‍্যাবোত-মহিষী বললেন—ষোলটি, ফাদার। পনেরটি আমার এই স্বামীটিরই ঔরসজাত।

নিজের কৃতিত্বের কথা স্ত্রীর মুখে শুনে র‍্যাবোতের মুখের ওপরে বড় একটা হাসির রেখা ফুটে বেরোল। পনেরটি সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্যে তিনি বেশ গর্ব অনুভব করলেন। কিন্তু ষোড়শ সন্তানের পিতা কে সে সংবাদ পাওয়া গেল না। সম্ভবত, ওই সন্তানটিই তাঁদের প্রথম। সম্ভবত, সে-সংবাদ অনেকেরই জানা রয়েছে। তাই, এই সংবাদে কেউ আশ্চর্য হলেন না। এমন কি ক্যানিভূ পর্যন্ত না।

কিন্তু আবার চীৎকার করতে শুরু করলেন বেলহোম—ওরে বাবারে, মরে গেলাম রে। জানোয়ারটা আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল রে।

কাফে পোলাইট-এর কাছে গাড়ীটা থামলো। পাদরী বললেন—তোমার কানের মধ্যে কিছুটা জল ঢেলে দিতে পারলে পোকাটা বেরিয়ে আসত। চেষ্টা ক'রে দেখবে একটু?

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

এই কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে সকলেরই হাতগুলি প্রসারিত হ'ল। পাদরী একটা বেসিন আনতে বললেন, সেইসঙ্গে আনতে বললেন একখানা রুমাল, আর এক গ্লাস জল। তিনি বেলহোমের মাথাটাকে একপাশে ধরে রাখার জন্যে শিক্ষকটিকে অনুরোধ করলেন; সেই সঙ্গে বললেন জল কানের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার পরে তার মাথাটাকে নিয়ে তিনি যেন জোরে জোরে বার-কয়েক ঝাঁকানি দেন।

কিন্তু ক্যানিভু ইতিমধ্যে বেলহোমের কানটা টেনে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করেছেন; এবং করেই তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন—আরে, রাম-রাম! কানের ভেতরটা খোলে একেবারে বোঝাই হয়ে রয়েছে যে। ওর ভেতর থেকে কোন খরগোস বেরিয়ে আসতে পারে? তার চারটে পা-ই ওই আঠার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে।

পাদরীও ভাল ক'রে পরীক্ষা করলেন। কথাটা মিথ্যে নয়। ওই কানের ভেতর দিয়ে কোন পোকার বাইরে বেরিয়ে আসার মত ক্ষমতা থাকার কথা নয়। শিক্ষক মশাই দেশলাই-এর একটা কাঠি নিয়ে কানের খোল পরিষ্কার করতে লাগলেন। তারপরে পাদরী সেই কানের ভেতরে প্রায় আধ গ্লাস জল ঢেলে দিলেন; সেই জলের বেশ কিছুটা অংশ বেলহোমের চোখ-মুখ ভাসিয়ে দিল। তারপরে শিক্ষক মশাই বেলহোমের মাথাটা জোরে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বেসিনের ওপরে ধরে রাখলেন। সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বেসিনের ওপরে। না, কোন জানোয়ারই বেসিনের ওপরে সাঁতার কাটছে না!

বেলহোম মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—কই, মাথার মধ্যে আর কিছু নেই মনে হচ্ছে।

পাদরী বিজয়গর্বে চেঁচিয়ে উঠলেন—জানোয়ারটা নিশ্চয় তাহলে ডুবে মরেছে।

এই সংবাদে সবাই খুশী হ'য়ে গাড়ীর ভেতরে গিয়ে উঠে পড়লেন। কিন্তু গাড়ী চলতে না চলতেই আবার আর্তনাদ করে উঠলেন বেলহোম—ওরে বাবারে, গেলাম রে···ইত্যাদি। বেশ বোঝা গেল জন্তুটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ব্যাটা ছটফট করছে। বেলহোমের মনে হল জানোয়ারটা এবার মাথার মধ্যে ঢুকে তাঁর মস্তিষ্কটা চিবিয়ে খাচ্ছে। এমনভাবে বেলহোম চেঁচাতে শুরু করলেন, হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন যে পয়রোতের স্ত্রী তো কেঁদেই অস্থির; ভাবলেন, নিশ্চয় লোকটাকে ভূতে ধরেছে। তারপরে যন্ত্রণাটা যেন একটু কমে এল। মনে হল যেন জানোয়ারটা মাথা থেকে নেমে এসে কানের চারপাশে ঘুরঘুর করছে। জানোয়ারটা কেমন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা তিনি আঙুল নেড়ে-নেড়ে দেখাতে লাগলেন: এই দেখুন—এইরকম ক'রে···ও, মরে গেলাম, মরে গেলাম···

ততক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে ক্যানিভুর। তিনি বললেন—ওই জলের জন্তেই জানোয়ারটা মগজের মধ্যে তিড়িংবিড়িং করছে। সম্ভবত ওটা মদ খেতে বেশী অভ্যস্ত।

সবাই তো হেসে অস্থির। কিন্তু ক্যানিভু তাঁর সন্দেহে অটল। তিনি বললেন—কাকে বোরবোতে পৌঁছানো মাত্র ওকে সামান্ত একটু ব্র্যাণ্ডি দিয়ে দেবেন; তাহলে ওটা আর আপনাকে জ্বালাতন করবে না।

কিন্তু বেলহোমকে কিছুতেই আর থামানো গেল না। যন্ত্রণায় তিনি চীৎকার করতে লাগলেন—ছুঁড়তে লাগলেন হাত-পা। তখন সবাই মিলে গাড়োয়ানকে পরের যেকোন একটা বাড়ির কাছে গাড়ী থামাতে অনুরোধ জানালেন।

রাস্তার পাশে একটা ফার্ম। গাড়ীটা এসে সেইখানেই থামলো। তারপরে নতুনভাবে চিকিৎসা করার জন্তে তাঁকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের টেবিলের ওপরে শুইয়ে দেওয়া হল। ক্যানিভুর কথা মত ব্র্যাণ্ডি দেওয়া হল। তাতেই জানোয়ারটা হয় মাতাল হ'য়ে যাবে, না হয়, একেবারে মরে যাবে। কিন্তু পাদরী ভিনিগারটাই পছন্দ করলেন বেশী। এই সময় সবাই এক ফোঁটা, এক ফোঁটা ক'রে কানের মধ্যে মদ ঢালতে লাগলেন—যাতে ক'রে ফোঁটাগুলি কানের একেবারে অপরপ্রান্তে গিয়ে পড়ে। তারপরে কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

আর একটা বেসিন নিয়ে আসা হল। পাদরী আর ক্যানিভু দুজনে মিলে বেলহোমকে বেসিনের ওপরে উপুড় করে ধরলেন; আর শিক্ষকটি তাঁর স্বাস্থ্যবান হাত দিয়ে কানের ওপরে ঘুষি বসাতে লাগলেন। এমন কি ছড়ি হাতে নিয়ে ব্যাপারটা দেখার জন্তে ড্রাইভার পর্যন্ত নেমে এল।

সবাই একযোগে বেসিনের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। সেখানে লালচে রঙের ছোট একটা পোকা নড়ছে। একটা মাছি। প্রথমে সবাই অবাক হ'য়ে গেল; তারপরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন সবাই। একটা মাছি! মহানন্দে ক্যানিভু তাঁর দাবনা চাপড়াতে লাগলেন; গাড়োয়ান বাতাসে তার চাবুক কষাতে লাগল; পাদরী গাধার ডাকের মত হ:-হ: করলেন, শিক্ষক হাঁচলেন কি হাসলেন ঠিক বোঝা গেল না; আর দুটি মহিলা খিলখিল করে হেসে উঠলেন; মনে হল, মুরগীরা যেন কোঁক-কোঁক করছে!

জলের মধ্যে জানোয়ারটার শরীরটা কোঁকড়াচ্ছিল, এপাশ-ওপাশ করছিল। বেলহোম বেসিনের ধারে বসে একটা নিষ্ঠুর আনন্দে সেইদিকে তাকিয়েছিলেন।

শুয়োরের বাচ্চা! তুমি!—এই ব'লে প্রচণ্ড ঘৃণায় তার গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিলেন।

গাড়োয়ান বিপুল আনন্দে চীৎকার ক'রে বলল—মাঝি, মাঝি, শয়তানটা···

তারপরে উচ্ছ্বাস ক'মে এলে সে বলল,—চলুন, চলুন। অনেক সময় বাজে নষ্ট হল আমার।

হাসতে-হাসতে সবাই গাড়ীর ভেতরে উঠে এলেন। সব শেষে ছিলেন বেলহোম; বললেন, আমি আবার ক্রিকোতোত-এ ফিরে যাব। হ্যাভারেতে যাওয়ার কোন দরকার নেই আমার।

গাড়োয়ান বলল—ঠিক আছে। আমার ভাড়াটা দিয়ে দিন।

আমি অর্দ্ধেক পথ-ও আসি নি। সুতরাং অর্দ্ধেক ভাড়াই দেব আমি।

না। পুরো ভাড়া দিতে হবে।

কথা কাটাকাটি হ'তে-হ'তে বিরাট ঝগড়ার সৃষ্টি হ'ল। বেলহোম বললেন, কুড়ি সো-র বেশী কিছুতেই তিনি দেবেন না। গাড়োয়ান বলল—চল্লিশ সো আমার চাই।

জোর ঝগড়া। দুজনে দুজনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে খিঁচোতে সুরু করল।

তাড়াতাড়ি গাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এলেন ক্যানিভূ; বেলহোমকে লক্ষ্য করে বললেন—প্রথমতঃ পাদরী বাবার কাছে তোমার ঋণ রয়েছে চল্লিশ সো। তারপরে সবাইকে ড্রিঙ্ক খাওয়াতে হবে। তার জন্যে খরচ হবে তোমার পঞ্চাশ সো। তার ভেতর থেকে গাড়োয়ানকে দেবে কুড়ি সো। ফল্গি, কী বল—এতে তুমি রাজি?

বেলহোমের কাছ থেকে বেশী অর্থ নেওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সে বলল—রাজি।

তাহলে দিয়ে দাও।

না, দেব না। যাই বলুন, পাদরী ডাক্তার নন।

তুমি যদি না দাও তাহলে ওই গাড়ীতে চাপিয়ে তোমাকে আমরা হ্যাভারে পাঠিয়ে দেব।—এই বলে সেই দশাসুর চেহারার মানুষটি বেলহোমের কোমর ধরে শূন্যে তুলে গাড়ীর দিকে এগোতে লাগলেন।

বেলহোম দেখলেন তাঁর সঙ্গে শরীরের শক্তিতে তিনি পারবেন না। তাই টাকার থলি বার করে চাহিদা মিটিয়ে দিলেন।

গাড়ী তার যাত্রীদের নিয়ে হ্যাভারের দিকে এগিয়ে চলল। বেলহোম ফেরার পথ ধরলেন।

কাঠের গুঁড়ি

[The Log]

বসার ঘরটি ছোট; মোটা পর্দা ঝুলছে চারপাশে। ঘরের ভেতরে মিষ্টি একটা গন্ধের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। চুল্লীর ভেতরে গনগন করছে আগুন।

পাতলা পর্দার ভেতর দিয়ে তারই আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঘরের মধ্যে দুজন বসে-বসে গল্প করছিলেন। সেই আলো মৃদু আভায় ছড়িয়ে পড়েছে তাদের মুখে।

এ বাড়ির কর্ত্রী হচ্ছেন একটি বৃদ্ধা। মাথার চুলগুলি তাঁর সাদা। পরিচ্ছন্ন রুচিসম্পন্না মহিলা। দেহের ওপরে এখন-ও কোন বলিরেখা জেগে ওঠে নি। এ ঘরের দ্বিতীয় মানুষটি হচ্ছেন একটি বৃদ্ধ। বৃদ্ধটি অবিবাহিত; ভদ্রমহিলার প্রাচীন বন্ধু। দীর্ঘ জীবনে পরস্পরের মধ্যে একটা অটুট সৌহার্দ বজায় রয়েছে। এছাড়া দুজনের মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক নেই।

প্রায় মিনিটখানেক দুজনে চুপচাপ আগুনের দিকে তাকিয়ে নির্বাকভাবে বসে রয়েছেন। তাঁরা যে বিশেষ কিছু ভাবছিলেন তা নয়। সুখী হওয়ার জন্যে যাঁদের অনবরত কথা বলতে হয় না, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির বন্ধন যাঁদের অটুট রয়েছে—এই নীরবতা তাঁদের সেই নিস্তব্ধ বোঝাপড়ায় মুখর। হঠাৎ একটা পোড়া কাঠের চাঁই চুল্লীর বাইরে গড়িয়ে পড়ল। তারই ফলে ছড়িয়ে পড়ল আগুনের টুকরোগুলি। বৃদ্ধা মহিলাটি এই দেখে ছোট একটি আর্তনাদ ক'রে লাফিয়ে উঠলেন। মনে হ'ল, ঘর থেকে পালিয়ে যাবেন তিনি; কিন্তু ভদ্রলোকটি গোড়ালির ঠোক্কর দিয়ে গুঁড়িটাকে চুল্লীর ভেতর দিলেন ঢুকিয়ে; তারপরে আগুনের যে টুকরোগুলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলোকে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিয়ে দিলেন। বিপদমুক্ত হওয়ার পরে একটা পোড়া গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। বান্ধবীর উলটো দিকে চেয়ারে বসে ভদ্রলোক একটু হেসে তাঁর দিকে তাকালেন; তারপরে জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়িটার দিকে নির্দেশ ক'রে বললেন—এইরকম একটা দুর্ঘটনা আগেও আমার জীবনে ঘটেছিল। তাই আমি বিয়ে করি নি।

ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন। পুরুষের অন্তরঙ্গ সব কিছু জানার জন্যে মহিলা, বিশেষ ক'রে বৃদ্ধা মহিলাদের যেরকম গভীর আর হিংসাত্মক কৌতূহল থাকে—সেইরকম কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁর বন্ধুর দিকে তাকালেন; তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন—যথা ?

"সে-কাহিনী দীর্ঘ; করুণ, আর অপ্রীতিকর।

"আমার প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে জুলিয়েন। আমাদের মধ্যে হঠাৎ বিচ্ছেদ ঘটার কারণটা বুঝতে না পেরে আমার পুরানো বন্ধুরা অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কেমন ক'রে যে আমাদের অটুট বন্ধুত্বের দেওয়ালে চিড় ধরল সেকথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারলেন না। আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ কেন হ'ল সেই কথাটাই আমি আজ তোমাকে বলছি।

"একদিন সন্ধ্যায় জুলিয়েন আমাকে এসে জানালো সে বিয়ে করবে ঠিক করেছে। সংবাদটা পেয়ে খুব ধাক্কা খেলাম আমি। মনে হ'ল কেউ যেন

আমার ঘরে ডাকাতি করেছে, অথবা, প্রতারণা করেছে আমার সঙ্গে। কোন প্রিয় বন্ধু যখন বিয়ে করে তখন তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ফুরিয়ে যায়। এতদিন আমরা দুজনে এক আত্মা ছিলাম—এখন সেই নিগূঢ় সম্পর্কের দেওয়ালে ফাটল যে ধরবে সেদিক থেকে আমার মনে কোনরকম সন্দেহ ছিল না। স্বার্থপর এবং হিংস্র দুটি পুরুষের এই একাত্মতাকে কোন দিনই বরদাস্ত করবে না। দুটি পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠুক এটা কোন স্ত্রী-ই বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

"পুরুষ আর নারীর মধ্যে ভালবাসা যত গভীরই হোক না কেন মন আর বুদ্ধির দিক দিয়ে তারা চিরদিনই বিপরীত জগতে বাস করে। তারা যেন দুটি জাতের। সুযোগ পেলেই একে অপরকে আঘাত না ক'রে পারে না। সহ-অবস্থানের রীতিতে তারা বিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যে একজন হবে জয়ী, আর একজনকে যুদ্ধের অমোঘ রীতিতে পরাজয় বরণ করতে হবে। কামনার আতিশয্যে পরস্পরের হস্তমর্দন করবে তারা—একথা সত্যি; কিন্তু কোনদিন পরস্পরের কাছে তারা সরল বিশ্বাস আর আনুগত্যে হৃদয় উন্মোচন করবে না। যে সন্তানেরা বৃদ্ধ বয়সে অনিবার্যভাবেই তাদের পরিত্যাগ ক'রে যাবে তাদের আশায় বিয়ে না ক'রে যারা সত্যিকারের বিজ্ঞ তারা বৃদ্ধ বয়সে একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুকে খুঁজে বেড়ায়। দুটি বন্ধুর মধ্যেই পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান পরিচ্ছন্নভাবে চলে বলে তারাই বার্দ্ধক্যের একমাত্র সঙ্গী হওয়ার যোগ্য।

"যাই হোক, বন্ধু জুলিয়েন বিয়ে করল। তার স্ত্রীটি সত্যিই বড় সুন্দরী। কোঁকড়ানো-কোঁকড়ানো চুলের স্তবক, হাসি খুশি ভাব; বেঁটে চেহারার স্বাস্থ্যবতী যুবতী। আমার বন্ধুটিকেও সে খুব ভালবাসত। তাদের সহজ মেলামেশার পথে পাছে আমি কোন বাধার সৃষ্টি করে ফেলি এই ভয়ে প্রথম দিকে খুব বেশী একটা আমি তাদের বাড়ি যেতাম না। কিন্তু পরে যে-কোন কারণেই হোক তাদের ওপরে আমার আকর্ষণ বাড়লো; তারাও আমাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাতো; মনে হল, আমার সঙ্গটা তাদের বেশ ভাল লাগত। ফলে, তাদের মিষ্টি জীবনযাত্রার সঙ্গে আমিও নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলাম। প্রায়ই তাদের বাড়িতে আমি ডিনার খেতাম। রাত্রিতে যখন ফিরে আসতাম তখন আমার খুব খারাপ লাগত; মনে হোত, আমার বাসাটায় কোন আনন্দ নেই! মনে হোত এবারে আমিও একটা বিয়ে করব।

"একদিন জুলিয়েন আমাকে ডিনার খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালো। আমিও যথারীতি গেলাম। সে বলল—বন্ধু, এখনই বিশেষ একটা জরুরী কাজে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। এগারটার আগে আমি ফিরতে পারব না। তার বেশী দেরী আমার হবে না। এই সময়টা তুমি বার্থার কাছে থাকতে পারবে কি?

"যুবতীটি হেসে বলল—এই পরিকল্পনাটি কিন্তু আমারই।

"আমি রাজি হলাম ; কেবল রাজি হলাম না, তাদের এই অন্তরঙ্গতার বেশ প্রীতও হলাম। আটটার সময় ডিনার শেষ হ'ল আমাদের। তারপরে বেরিয়ে গেল জুলিয়েন। সে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অদ্ভুত অস্বস্তি এসে আমাদের দুজনকেই গ্রাস ক'রে বসল। যদিও আমাদের মধ্যে প্রায় একটা ঘরোয়া সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তবু আমরা এইভাবে একা-একা দুজনে কোন দিন থাকি নি। আমরা তাই একটা নতুন পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়লাম। এইরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শূন্যতা ভরিয়ে দেওয়ার খাতিরে আমি দুচারটে একথা-সেকথা বললাম। সে তার কোন জবাব দিল না। সে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল ; মনে হ'ল, কোন একটা গভীর সমস্যা সমাধান করার জন্যে সে বেশ ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। আর কোন কথা বলার বিষয় না পাওয়ায় আমিও চুপচাপ বসে রইলাম। মাঝে-মাঝে কথা খুঁজে পাওয়াটা যে কী রকম কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ায় তা ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি আমার হাড়ে মজ্জায় তখন কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি শিরশির ক'রে উঠছিল। কেন উঠছিল তা আমি বলতে পারব না ; সেই বিশেষ অনুভূতিটা কোন্ জাতীয় তা-ও আমার অজানা। ভালই হোক, আর খারাপই হোক, মনে হ'ল কেউ যেন আমার ওপরে লক্ষ্য রাখছে। এরকম অনুভূতি মাঝে-মাঝে মানুষের হয়।

"এই অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে কিছুক্ষণ কাটার পরে বার্থা বলল—আগুনটা নিবে আসছে ; আপনি একটা কাঠ চুল্লীর ভেতরে দয়া করে ফেলে দিন তো।

"তোমার ঘরে যেখানটায় কাঠ রাখার বাক্স রয়েছে সেইখানেও ওইরকম একটা বাক্স ছিল। সেই বাক্সটার ডালা খুলে আমি একটা কাঠের চাঁই বার করলাম ; চাঁইটা বেশ বড়ই ছিল। তারপরে সেটাকে চুল্লীর ভেতরে চাপিয়ে দিলাম। আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল।

"কিছুক্ষণের ভেতরেই গনগন করে কাঠ পুড়তে লাগল। মনে হ'ল সেই আগুনের তাপে আমাদের মুখ পুড়ে যাবে। যুবতীটি আমার দিকে তাকালো—সেই চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন অদ্ভুত, বলল—এখানে বড় গরম লাগছে। চলুন আমরা ওই সোফার ওপরে গিয়ে বসি।

"আমরা সেই সোফার ওপরে গিয়ে বসলাম ; তারপরেই সে আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল—কোন মহিলা যদি বলে আপনাকে সে ভালবাসে তাহলে আপনি কী করবেন ?

"এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব বুঝতে না পেরে আমি বললাম—সত্যি কথা বলতে কি সেরকম কোন অঘটন যে ঘটতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনে, কিন্তু কিভাবে প্রশ্নটা করা হবে তারই ওপরে আমার উত্তরটা নির্ভর করবে।

"সে একটু হাসল; হাসিটা কেঁপে-কেঁপে উঠল। এ হাসি সেই ধরনের প্রতারণার হাসি; মনে হবে সেই হাসির শব্দে পাতলা কাঁচের গ্লাস ভেঙে যায়। তারপরে সে বলল—'পুরুষরা কোন দিনই দুঃসাহসী বা চতুর নয়।' তার পরে একটু থেমে সে আবার বলল—'মঁসিয়ে পল, কোনদিন আপনি কি কাউকে ভালবেসেছেন?' বেসেছি শুনে আমাকে সেই কাহিনীটি বলতে সে অনুরোধ করল। আমি একটা কাহিনী খাড়া ক'রে তাকে শোনালাম। সে সেই কাহিনী বেশ মন দিয়ে শুনল; শোনার সময় কখনও তার চেহারায় ঘৃণার একটা চিহ্ন ফুটে বেরোল; কখনও বা আমার বক্তব্যকে সে ইঙ্গিতে সমর্থন জানালো। তারপরে সে হঠাৎ বলে উঠল—উঁহু! প্রেম জিনিসটা কী তার আপনি কিছুই জানেন না।, আমার বিশ্বাস, সত্যিকার প্রেম মনকে অস্থির করে তোলে, স্নায়ুগুলিকে ক'রে তোলে দুর্বল, আর মস্তিষ্কটিকে বিকল ক'রে ফেলে। করতে বাধ্য—কিন্তু আমার বক্তব্যটিকে ঠিকভাবে প্রকাশ করার মত ভাষা আমি পাচ্ছিনে। সত্যিকার প্রেম বড় ভয়ঙ্কর বস্তু; এ কারও পরোয়া করে না—ধর্মাধর্ম মানে না; মানে না কোন নীতি বা আইনের অনুশাসন। কোন স্বর্গীয় বাধা এর চলার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। যে প্রেমের মধ্যে দুর্নীতি নেই, যে প্রেমে তরঙ্গ নেই, যা সহজ সরল অনুত্তেজক—তাকে কি প্রেম বলে?

"কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। মনে হল দার্শনিক উত্তর দিয়ে বলি—এরই নাম নারী। কথা বলার সময় বন্ধু-স্ত্রীটি এমন একটা ভাব দেখালো যে মনে হ'ল জীবনের ওপরে তার একটা বীতশ্রদ্ধা জন্মেছে। কুশনের ওপরে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে সে আমার ঘাড়ের ওপরে তার মাথাটা রাখলো; তার স্কার্টটা টেনে নিল একটু; পায়ের সিল্কের মোজার কিছুটা অংশ বেরিয়ে পড়ল; আগুনে সেগুলো চকচক ক'রে উঠল। দু' এক মিনিট সেইভাবে পড়ে থেকে সে বলল—মনে হচ্ছে, আমি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি।

"তার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করলাম আমি। সে আমার বুকের ওপরে তার শরীরের ভারটা রেখে বসে রইল তারপরে আমার দিকে না তাকিয়ে সে বলল—আমি যদি বলি তোমাকে আমি ভালবাসি—তাহলে তুমি কী করবে?

"আমি কোন উত্তর দেওয়ার আগেই দুহাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মাথাটা তার বুকের ওপরে টেনে এনে আমার ঠোঁটের ওপরে তার দুটো ঠোঁট চিপে ধরল।

"সত্যি কথা বলছি, তার এই ব্যবহারে আমি মোটেই সুখী হ'তে পারিনি, শেষ পর্যন্ত বন্ধু জুলিয়েনকে প্রতারণা করব? এই বোকা, গর্দভ, গবেট মেয়েটার প্রেমিক হ'তে হবে আমাকে? এই কামুক মেয়েটার! নিজের স্বামী তার কাছে যথেষ্ট নয়? আর এরই জন্যে—এই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করার জন্যে

আমি আমার বন্ধুকে ক্রমাগত বঞ্চনা ক'রে যাব ? না, না। ওপথ আমার নয়, কিন্তু আমি করব কী ? এই উদ্ধত কলঙ্কিনী নারীকে আমি সামলাবো কেমন ক'রে ? আমি তো জোশেফের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারব না। যে পুরুষ কোনদিন এমন কোন নারীর চুম্বনের স্বাদ পায় নি—যে নারী তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে···সেই প্রথম আমার ওপরে আঘাত হানুক।

"আর একটি মুহূর্ত···সেইটিই আমার জীবনে সবচেয়ে শঙ্কটপূর্ণ—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ···কী হবে, কী হ'তে পারে···কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি···সে কী করত···আমি কী ক'রে ফেলতাম···হঠাৎ আমরা দুজনেই লাফিয়ে উঠলাম। হঠাৎ সেই কাঠের চাঁইটা চুল্লীর ভেতর থেকে ভীষণ একটা শব্দ ক'রে মেঝের ওপরে লাফিয়ে পড়ল। সেই ধাক্কায় টুকরো-টুকরো আগুনে পোড়া লাল-লাল কাঠের টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। কার্পেটটা পুড়তে সুরু করল। তারপরে সেই কাঠের চাঁইটা আর্ম-চেয়ারের সামনে এসে স্থির হয়ে গেল। আর একটু হলে চেয়ারটায় আগুন ধরে যেত।

"পাগলের মত আমি লাফিয়ে উঠলাম। তারপরে কাঠটাকে সরিয়ে আমি চুল্লীর মধ্যে পুরে দিলাম। ঠিক সেই সময় দরজা খুলে জুলিয়েন ঘরে ঢুকে এল। মুখে একটা তৃপ্তির আর আনন্দের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলে সে বলল—যতটা সময় নেবো ভেবেছিলাম তার ঘণ্টা দুই আগেই কাজটা আমার শেষ হয়ে গেল।

"বন্ধু তাহলেই বুঝতে পারছ—ওই কাঠের গুঁড়িটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে না উঠলে সে আমাদের ধরে ফেলত। তার ফলটা কী দাঁড়াত তা তুমি বুঝতেই পারছ। তারপর থেকে এসব ব্যাপারে আমি খুব সাবধান হয়ে গেলাম। তার পর থেকে জুলিয়েনও কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমার ওপরে তার আকর্ষণও কমে এল। সম্ভবত, আমাদের এই বন্ধুত্ব তার স্ত্রী ঠিক পছন্দ করে নি। ধীরে-ধীরে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব শেষ হয়ে গেল।

"সেজন্তেই আমি বিয়ে করি নি। নিশ্চয় এতে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ না।"

[The Relic]

অ্যাবে লুই দ্য এনেমারে-কে, সয়সোঁস

প্রিয় অ্যাবে,

তোমার মামাতো বোনের সঙ্গে আমার যে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তা ভেঙে গিয়েছে। তার জন্তে দায়ী অবশ্য আমার মূর্খতা। প্রাণের দায়ে আমি তোমার বোনের সঙ্গে বোকার মত ছলনা করেছিলাম। তার ফল আমি পেয়েছি।

তুমি আমার সহপাঠী। তুমিই এই বিপদ থেকে আমাকে বাঁচাতে পার এই আশা নিয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি। যদি সাহায্য করতে পার তাহলে চিরজন্ম আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

গিলবার্তাকে তুমি চেন; অথবা, চেন বলে তোমার ধারণা। কারণ নারীদের কি আমরা আজ পর্যন্ত কোনদিনই চিনতে পেরেছি? তাদের সমস্ত ধ্যান-ধারণা, জল্পনা-কল্পনা আমাদের অবাক করে দেয়। নারীজাতটা কোনদিনই সোজা পথে চলতে জানে না। সব সময়ই তারা ঘোরানো পথ দিয়ে হাঁটে; এমন সব তর্ক ক'রে যা বোঝা কোন পুরুষেরই কর্ম নয়। তাদের তর্কের ধারাতেও যথেষ্ট গলদ রয়েছে; তাদের চিন্তাটা সব সময়ই একগুয়েমীর মত, কোন একটা জিনিস একবার ধরলে তা থেকে আর তাদের নড়ানো যায় না। অথচ সেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও সামান্য কারও কথায় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। নারীচরিত্র বিধাতার একটা দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টি।

তোমার বোনটি যে ধার্মিক প্রকৃতির সেকথা না বললেও চলে। কারণ স্যানসিতে শ্বেত অথবা কৃষ্ণবর্ণের সিস্টারদের কাছেই সে মানুষ হয়েছে। এ বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে ভালই জান। তুমি যা জান না তা হচ্ছে এই যে ধর্মের বিষয়ে সে যেমন সহজেই উত্তেজিত হয় সেই রকম অন্যান্য সকল বিষয়েই তার উত্তেজনা সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়। বাতাসে ওড়া পাতার মত একটু কোন উত্তেজনার সুযোগ এলেই তার বুদ্ধিবৃত্তিগুলি উড়তে সুরু করে। আসলে সে নারী, অথবা বালিকাই তাকে বলতে পার। ভালবাসা পাওয়ার জন্যে সে যেমন বাঁধনছেঁড়া হয়ে দৌড়ে যায়, ঠিক তেমনি যাকে সে ঘৃণা করে তার কাছ থেকেও সে পাঁই-পাঁই ক'রে পালিয়ে যায়। মেয়েটি যে সুন্দরী তা তুমি জান··· অথবা আমি যতটুকু জানি তার চেয়েও সে অনেক বেশী সুন্দরী···এক হিসাবে কতটা সুন্দরী তা তুমি জান না।

যাই হোক, বিয়েটা আমাদের ঠিক হয়ে গেল। তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা কোলোন থেকে আমি একটা টেলিগ্রাম পেলাম। কনসালটেশনের জন্যেই আমাকে ডাকা হয়েছিল; তবে রোগীর অবস্থা যেরকম খারাপ তাতে হয়ত শেষ পর্যন্ত আমাকে একটি কঠিন এবং বিপজ্জনক অপারেশন করতে হ'তে পারে—টেলিগ্রামের ভাবটা ছিল এই জাতীয়। পরের দিন সকালেই আমাকে যাত্রা করতে হবে ব'লে আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম; বলে এলাম পরিবর্তিত অবস্থায় আগের সিদ্ধান্তমত তার সঙ্গে বুধবার আমি ডিনার খেতে পারব না; খাব শুক্রবার; কারণ, ওই দিনই আমি ফিরে আসব, হায়রে, এই শুক্রবার সম্বন্ধে সাবধান হয়ো বন্ধু। ওই বারটা যে অপয়া তা তোমাকে আমি জোর ক'রেই বলতে পারি।

যাওয়ার কথা শুনেই তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল, তারপরে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসব শুনে সে আনন্দে হাততালি দিয়ে বলল—তুমি যাচ্ছ

শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি আমার জন্যে কিছু নিয়ে এস—সামান্য কিছু—একটা স্মৃতিচিহ্ন আর কী! কী জিনিস আমার ভাল লাগতে পারে তা বাপু তুমি নিজেই ঠিক করো, খুশি হলে বুঝবো তোমার বুদ্ধি রয়েছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সে আবার বলল—কিন্তু কুড়ি ফ্রা র বেশী কিছুতেই তুমি খরচ করবে না। দামের জন্যে নয়, আমাকে তুমি কতটা ভালবাস তাই যাচাই করার জন্যে আমি ওটা পেতে চাই।

তারপরে আরও একটু থেমে বলল—যদি উপহারটার দাম বেশী না হয় অথচ বেশ নতুন রকমের হয় তাহলে···তাহলে···আমি তোমাকে চুমু খাব।

পরের দিনই আমি কোলোনে চলে গেলাম। রোগীর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। রোগীকে ঘিরে তাঁর বাড়ির সকলেই একেবারে কান্নাকাটি হইচই জুড়ে দিয়েছিলেন। ক্ষতস্থানটি কেটে বাদ দিতে হবে। তাঁরা আমাকে আটকে রাখলেন; আটকে রাখার চেয়ে চাবি দিয়ে রাখলেন বলাই ভাল। একটি মরণোন্মুখ মানুষের দেহে আমি কঠিন অস্ত্রোপচার করলাম। একবার মনে হল, টেবিলের ওপরেই সে মারা যাবে। দুটি রাত্রি সেই রোগীর পাশে আমাকে কাটাতে হল। তারপর যখন বুঝলাম রোগীটির বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী তখনই আমি ফেরার পথ ধরলাম। কিন্তু সময়ের ভুল হয়েছিল আমার। স্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন ছাড়তে তখনও এক ঘণ্টা দেরী। আমার সেই হতভাগ্য রোগীটির কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় একটি লোক এসে আমাকে জার্মান ভাষায় কী যেন বলল। আমি জার্মান বুঝিনে, সে বোঝে না ফরাসী ভাষা। কিন্তু তার শরীর আর কথার বিশেষ ভঙ্গিমা দেখে মনে হল সে আমাকে প্রাচীনকালের কিছু একটা স্মৃতিচিহ্ন গছাতে চায়। হঠাৎ আমার গিলবার্তার কথা মনে পড়ে গেল। আমি জানতাম সে একটি গোঁড়া ভক্ত। আর তাকে খুশি করার জন্যে উপযুক্ত বস্তুটা নিজেই আমার হাতের কাছে এগিয়ে এসেছে। সুতরাং যেখানে এই জাতীয় ধর্ম-সংক্রান্ত বস্তু বিক্রী হচ্ছে সেখানে লোকটির সঙ্গে আমি গেলাম। এগার হাজার ভার্জিনের একজনের একটুকরো অস্থি কিনে ফিরে এলাম। একটা পুরানো রূপোর বাক্সের মধ্যে সেই ভার্জিনের অস্থিটি ছিল। বাক্সটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল বলেই কিনেছিলাম আমি। তারপর সেটিকে পকেটে পুরে প্যারিসগামী ট্রেনে চড়ে বসলাম।

বাড়িতে ফিরে পকেট থেকে কৌটোটা বার করেই দেখি ডালাটা খোলা; আর ভার্জিনের সেই টুকরো অস্থিটা হাওয়া! পকেট হাতড়ালাম, ওলট-পালট করলাম পকেট। কাকস্য পরিবেদনা। আধখানা আলপিনের মত অস্থিটা একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে।

প্রিয় বন্ধু অ্যাবে, তুমি জান, ধর্মে আমার বড় একটা বিশ্বাস নেই; কিন্তু বন্ধু হিসাবে তা নিয়ে তুমি বিশেষ দুশ্চিন্তা করো না; আমাকে আমার

ভবিষ্যতের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছ। কিন্তু পুরানো জিনিস বিক্রির দোকান-দার আসল ভার্জিনের হাড় বিক্রী করছে একথা বিশ্বাস করতে কোনমতেই আমি রাজি নই। সেদিক থেকে তুমিও নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবে। সেইজন্যে ভেড়ার সেই টুকরো হাড়টা হারিয়ে আমার সত্যিকার কোন দুঃখ হয় নি। বাজার থেকে ওই মাপের একখানা হাড় কিনে নিয়ে জুয়েলের মধ্যে পুরে আমি আমার প্রেয়সীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

আমাকে দেখেই প্রেয়সী হাসতে-হাসতে ছুটতে-ছুটতে আমার কাছে এসে বলল—কী এনেছ দেখি!

আমি বললাম—হাই যা! ওকথা আমার একদম মনে নেই। কিন্তু আমার কথা সে বিশ্বাসই করল না। অনেক অনুনয়-বিনয় করার পরে আমি তাকে জিনিসটা দেখালাম। রূপোর বাক্সটা পেয়ে সে একেবারে আনন্দে আত্মহারা।

অস্থি! ও! অস্থি এনেছ?

এই বলতে-বলতে গভীর শ্রদ্ধাভরে বাক্সটাকে সে বার বার চুমু খেতে লাগল। তাই দেখে তাকে যে প্রতারণা করেছি এই ভেবে নিজেরই কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। সে তো বেজায় খুশি; তারপরেই কিন্তু তার চোখ দুটো ভয়ে বড় হয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করল—তুমি ঠিক জান, এটা আসল অস্থি?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। একেবারে খাঁটি।

কী ক'রে নিশ্চয় হলে?

এবারে আমি ধরা পড়ে গিয়েছি। রাস্তার একটি অজানা লোকের মারফৎ বস্তুটি আমি কিনেছি এই কথা শুনলেই আমার দফা রফা হ'য়ে যাবে। কী বলা উচিত ভাবছি, এমন সময় মগজে আমার চিন্তা তড়িৎপ্রবাহবৎ খেলে গেল। সামান্য একটু হেসে [মানে হাসিটি রহস্য-মেশানো আর কী!] বললাম—তোমার জন্যে চুরি করেছি।

চুরি!! কোথা থেকে!!!—অবাক বিস্ময়ে বড়-বড় চোখে সে আমার দিকে তাকালো।

গির্জা থেকে। এগার হাজার ভার্জিন যেখানে থাকেন সেই গির্জা থেকে।

তার বুকটা তখন আনন্দে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে; ভাবাবেগে বাক্যস্ফূর্তি হল না তার। কোনরকমে সে বলল—তুমি···মানে···তু···মি। আমাকে খুলে বল।

বোঝ ঠেলাটা! আর তো আমি কবুল করতে পারিনে। একটা সুন্দর রোমাঞ্চকর গল্প তৈরী করতে হল আমাকে; আর বেশ বিস্তারিতভাবেই। সবকিছু নিজের চোখে দেখার জন্যে গির্জারক্ষককে একশ ফ্রাঁ দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকে গেলাম। গির্জা তখন সারানো হচ্ছিল। লোকজন আর পাদরী

লাঞ্চ খেতে বাইরে গিয়েছেন। সেই সুযোগে আমি একটা কাঠের তক্তা সরিয়ে ফেলতেই অনেক হাড়ের মধ্যে [এগার হাজার ভার্জিনের হাড় কি একটু আধটু হ'তে পারে !] ছোট একখানা [খুব ছোট !] হাড় কুড়িয়ে নিলাম। তারপরে সেটিকে পকেটে পুরে একটা সোনার দোকানে গিয়ে উপযুক্ত একটা কাসকেট কিনলাম। ওই রূপোর বাক্সটা কিনতে আমার যে পাঁচশ ফ্রাঁ লেগেছে সেটা বলতেও আমার কোন দুঃখ হয় নি।

কিন্তু দাম নিয়ে সে এতটুকু ব্যতিব্যস্ত হল না। কাঁপতে-কাঁপতে গভীর আনন্দ আর রোমাঞ্চের সঙ্গে সে আমার কাহিনী শুনে ফিসফিস করে বলল—'ওঃ, তোমাকে আমি কত ভালবাসি !' এই বলেই সে আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

ব্যাপারটা একটু অনুধাবন কর বন্ধু! তার জন্যে গির্জাকে আমি অপবিত্র করেছি; তার জন্যে আমি চুরি করেছি, ধর্মীয় নীতি লঙ্ঘন করেছি, শুধু লঙ্ঘনই করি নি—পবিত্র অস্থি চুরি করেছি। এই সব অকার্য আর কুকার্য করার জন্যেই সে আমাকে এত ভালবাসে। আর তার ভালবাসা এতটা স্বর্গীয় !! প্রিয় অ্যাবে, একেই বলে নারী !!

দুটি মাস মহা আনন্দেই কাটলো আমাদের। নিজের ঘরেই সেই টুকরো ভেড়ার মাংসটিকে রাখার জন্যে সে একটা সুন্দর গির্জা তৈরী করালো। এই মাংসপিণ্ডটিই প্রেমের জন্যে আমি চুরি করে এনেছি। সেই পিণ্ডটিকে পূজা করার সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা রীতিমত সে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু করে দিল। ব্যাপারটা প্রচার হ'লে চুরির অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে জার্মানীতে চালান করে দিতে পারে এইরকম একটা ভয় দেখিয়ে সে যাতে বেশী হই-চই না ক'রে সেদিকে সাবধান করে দিলাম তাকে।

গ্রীষ্মকালের প্রথম দিকে যে জায়গা থেকে আমি অস্থিটি চুরি করে এনেছিলাম সেই জায়গাটা দেখার জন্যে গিলবার্তার মনটা একেবারে আইঢাই করে উঠল। আমাকে কোন কথা না বলে সে তার বাবাকে ধরল সেইখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আর তার বাবাও কোথায় যাচ্ছেন সেবিষয়ে আমাকে কোন কথা না বলে কন্যার ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে স্বকন্যা তিনি কোলোনের পথে যাত্রা করলেন।

এইখানে তোমাকে বলা আদৌ অযৌক্তিক হবে না যে উপরিউক্ত গির্জার ভেতরে আমি কোনদিনই ঢুকি নি। এগার হাজার ভার্জিনের কবরখানা কোথায় [সত্যিই যদি তেমন কিছু থেকে থাকে] তাও আমি জানিনে। তা ছাড়া যাব কী ক'রে ! ওসব জায়গায় কি কাউকে যেতে দেয় !

এক সপ্তাহ পরে দশটি ছত্রের একটি চিঠি পেলাম। আমাদের বিয়ে নাচক। সেই সঙ্গে কৈফিয়ৎ হিসাবে তার বাবার একখানি চিঠি।

গির্জাটি দেখেই গিলবার্তা আমার চালাকি ধরে ফেলেছে। সে বুঝতে

পেয়েছে এক মিথ্যাভাষণ ছাড়া অন্য কোন অপকর্ম করার ক্ষমতা আমার নেই। সেখানে সম্প্রতি কোন ডাকাতি হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন গির্জার রক্ষককে সে করছিল। প্রশ্ন শুনে রক্ষকটি তো হেসেই অস্থির। ওখান থেকে কোন জিনিস চুরি করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমুহূর্তে সে বুঝতে পারল যে ওই পবিত্র জায়গা থেকে পবিত্র অস্থি চুরি ক'রে নিজেকে আমি অপবিত্র করি নি সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারল তাকে বিয়ে করার যোগ্যতা আমার নেই।

বৃথাই তাকে অনুরোধ উপরোধ করলাম। তাদের বাড়িতে আমার প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেল। সেই পুণ্যাত্মা নারীকে কিছুতেই টলানো গেল না। গত সপ্তাহে তার সম্পর্কে একটি বোন—তোমার সম্পর্কেও তাই—বলে পাঠালো যে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। দেখা করলে সে বলল একটি শর্তে সে আমার অপরাধ ক্ষমা করতে পারে। সেই শর্তটি হচ্ছে—আমাকে একটি সত্যি-কার অস্থি সংগ্রহ করতে হবে; সেই অস্থিও যে আসল সেবিষয়ে আমাদের হোলি ফাদার পোপকে লিখিতভাবে স্বীকার করতে হবে।

প্রয়োজন হ'লে রোমেই যেতে হবে আমাকে। কিন্তু হঠাৎ গিয়ে পোপের সঙ্গে দেখা করা যায় না; আর গিয়ে আমার এই মূর্খ অভিযানের কথাও বলা যাবে না তাঁকে। আর তাছাড়া, গির্জার সঙ্গে সংযুক্ত নয় এমন কাউকে তারা ভার্জিনের অস্থি দেয় কিনা সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কোন কার্ডিনেলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তুমি আমাকে একটা পরিচিতিপত্র দিতে পার। অথবা মহিলা সেন্ট-এর অস্থি রয়েছে এমন কোন ফরাসী পাদরী হ'লেও চলবে। অথবা, এইরকম একটি মূল্যবান বস্তু যদি তোমার সংগ্রহশালায় থাকে তো আরও ভাল।

তোমার দ্বিতীয় বোনটিও আমাকে বলেছে—হতভাগিনী গিলবার্তা আর কাউকেই জীবনে বিয়ে করবে না।

হে আমার ছাত্র জীবনের প্রিয় বন্ধু, আমার একটা মূর্খ প্রতারণার শিকার হ'য়ে তোমার বোনটি কি শেষ পর্যন্ত মারা যাবে? দয়া করে এগার হাজার এক ভার্জিন না হ'তে তাকে অনুরোধ কর।

আমাকে ক্ষমা কর। অপদার্থ আমি। কিন্তু তোমাকে আমি আলিঙ্গন জানাচ্ছি। আমার ভালবাসা গ্রহণ কর।

তোমার পুরানো বন্ধু
"হেনরি ফঁত্যাল"

বিছানা

[The Bed]

গত গ্রীষ্মকালের একটা বেশ গরম অপরাহ্নের কথা বলছি। বেশ বড় বড় নীলাম করার ঘরগুলি যেন ঘুমোচ্ছিল। নীলাম-ওয়ালারা খেয়াল-খুশি মত জিনিসপত্রগুলোকে এধার-ওধার করতে লাগল। পেছনের দিকের একটা ঘরের এককোণে পুরানো ধর্মীয় সিল্কের পোশাকের দুটো স্তূপ পড়েছিল। মাঝে-মাঝে এসব জায়গায় পুরানো দামী জিনিসও আপনারা খুঁজে পাবেন। ময়লা দাড়ি-ওয়ালা দু'চারজন পুরানো আসবাবপত্রের ব্যবসাদার সেখানে ঘোরাঘুরি করছিল। সেইসঙ্গে ছিল একটা মোটা মেয়েমানুষ। তার পেটটা বেশ বড়। এইসব মেয়েরা পুরানো আসবাবপত্র কেনাবেচা করে; সেই সঙ্গে লুকিয়ে মেয়েমানুষের সংবাদ দিয়ে যায়। পুরানো পোশাকের মত মেয়েমানুষ নিয়েও এরা দালালি করে।

ঘুরতে-ঘুরতে পঞ্চদশ লুই-এর আমলের একটা বেশ সুন্দর পোশাক কিনে নিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। পুরানো আমলের সমস্ত রঙ-ই তার অটুট ছিল; এতটুকু কোথাও দাগ পড়ে নি তার গায়ে। কিনে নিয়ে আসার সময় তার গা থেকে বেশ একটা মৃদু মিষ্টি আমেজি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশে। বাড়িতে এসে ভাবলাম ওই সুন্দর জিনিসটাকে কোথায় রাখা যায়। ওই যুগের এমন একটি সুন্দর চেয়ার আমার চাই। তারপরে সেটা পাট করতে গিয়ে একটা খসখস শব্দ হল। সম্ভবতঃ, ওর ভেতরে একটা কাগজ রয়েছে। লাইনিঙ কেটে দিয়ে পোশাকটা ঝাড়তেই কয়েকটা চিঠি আমার পায়ের কাছে পড়ে গেল। চিঠিগুলি এত প্রাচীন যে হলদে হ'য়ে গিয়েছে; অক্ষরগুলোও সব ঝাপসা-ঝাপসা। প্রাচীন পদ্ধতিতে চিঠিটা ভাঁজ করা। তাদের ওপরে বেশ সুন্দর ক'রে লেখা রয়েছে একটি নাম—মঁসিয়ে লা আবে দ্য আরজেনস্।" প্রথম তিনটি চিঠিতে কোথায় তাঁদের দেখা হবে সেই সব নিয়ে আলোচনা; কিন্তু চতুর্থটি অন্যরকম। সেইটিই আমি এখানে উদ্ধৃত করছি—

"প্রিয় বন্ধু,—আমার শরীর মোটেই ভাল নেই; সত্যি কথা বলতে কি আমি অসুস্থ; বিছানা ছেড়ে ওঠার সামর্থ্য নেই আমার। বৃষ্টির ঝাট এসে আমার জানালার গায়ে পড়ছে; আমি সিভার তুলোর গদীর ওপরে আরাম ক'রে শুয়ে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখছি। আমি একটা বই পড়ছি; বেশ ভালই লাগছে আমার। মনে হচ্ছে আমার জীবনের কাহিনী নিয়েই যেন কেউ বইটা লিখেছে। শুনবে কী সে কাহিনী? না থাক! শুনলে হয়ত রাগ হবে তোমার।

"পেছনে বালিশ দিয়ে ওরা আমার মাথাটাকে উঁচু করে দিয়েছে। তুমি

আমাকে যে একটি সুন্দর ডেস্ক উপহার দিয়েছিলে তারই ওপরে কাগজ রেখে তোমাকে আমি এই চিঠি লিখছি।

"তিন দিন ধরে একনাগাড়ে বিছানায় শুয়ে থাকার ফলে বিছানার কথাই কেবল ভাবছি দিনরাত; এমন কি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও আমি ওই বিছানার স্বপ্ন দেখি। সম্প্রতি আমি এই উপসংহারে এসেছি যে এই বিছানাই আমাদের সমস্ত জীবন অধিকার ক'রে বসে রয়েছে। আমরা এই বিছানাতেই জন্মগ্রহণ করি, বিছানাতেই জীবন কাটাই, আর এই বিছানার ওপরেই আমরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। আমার যদি লেখার ক্ষমতা থাকত তাহলে বিছানা নিয়ে এমন একখানা রোমাঞ্চকর কাহিনী রচনা করতাম যা পড়ে সবাই অবাক হ'য়ে যেত। এই বিছানা থেকে মানুষ কত উপদেশই না সংগ্রহ করতে পারে!

"বন্ধু, আমার বিছানাটির সঙ্গে তোমার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে, কিন্তু এই তিনটি দিনে বিছানার মধ্যে এত জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি, আর তারই ফলে তাকে আমি এত ভালবেসে ফেলেছি যে তুমি তা কল্পনাও করতে পার না। আমার বিশ্বাস এ বিছানার মধ্যে অনেক মানুষের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, জড়িয়ে রয়েছে অনেক মানুষের স্পর্শ আর অনুভূতি।

"সে বিছানার সঙ্গে কারও কোন স্মৃতি জড়িয়ে নেই, জড়িয়ে নেই কারও কোন স্নেহ—সেরকম নতুন বিছানা মানুষ কেমন ক'রে কেনে তা আমি বুঝতে পারিনে। আমাদের এই সব বিছানায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কত স্মৃতিই না জড়িয়ে থাকে। যখন থেকে খাট তৈরী হয়েছে সেই তিনশ বছর আগে থেকে এই বিছানার প্রতিটি অঙ্গে যে কত মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, হাসি, কান্না জড়িয়ে রয়েছে তা কে বলবে।

একটি যুবতী এই বিছানায় শুয়ে রয়েছে।

মাঝে-মাঝে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে; তারপরে গোঙাচ্ছে; কাঁদছে তারপরে। তার মা বসে রয়েছেন তার পাশে। তার ঠিক পরেই বিড়ালের মত মিউ মিউ শব্দ ক'রে একটি শিশু এসে উপস্থিত হ'ল। একটা খোকার জন্ম দিয়েছে মেয়েটি। ভীষণ যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও মায়ের আনন্দ আর ধরে না। সন্তানের প্রথম কান্না শুনেই আনন্দে তার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম করল, তারপরে ছেলেটিকে স্পর্শ করার জন্যে সে তার হাত দুটি বাড়িয়ে দিল। তার আশেপাশে যারা বসেছিল তাদের চোখেও তখন আনন্দের অশ্রু বইছে; কারণ, এই সন্তানটিও তাদের বংশকে বাঁচিয়ে রাখবে।

"তারপরে জীবনের একটি মধুর আর পবিত্র সন্ধিক্ষণে দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা সেই প্রথম এই বিছানায় নীড় বাঁধলো। সেই প্রথম মিলনের শিহরণে তারা কেঁপে কেঁপে উঠল; তারপরে ধীরে ধীরে তারা খুব কাছাকাছি এল; একজনের ঠোঁট দুটি স্পর্শ করল আর একজনের ঠোঁট দুটিকে। সেই একটি চুমুতেই তারা এক হ'য়ে গেল—যাকে বলে একাত্মা। তারপরে তাদের বিছানা

উন্মাদনায় উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ-এর মত কাঁপতে লাগল ; কারণ, প্রেমের যে রহস্যময় ক্রিয়াকলাপ তা সম্পন্ন হ'ল এই বিছানার ওপরেই। প্রেমিক-প্রেমিকার এই অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনের চেয়ে বেশী মিষ্টি, বেশী সুন্দর এ পৃথিবীতে আর কিছু রয়েছে কি ?

"তারপরে মনে করে দেখ মৃত্যুর কথা। সেই মানুষের কথা যারা এই বিছানায় শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ছেড়েছে। কারণ, এ জগতে প্রবেশ করার তোরণ যেমন এই বিছানা, তেমনি এই বিছানাই আমাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্খার সমাধি ; আমাদের সবকিছুর পরিসমাপ্তি এইখানেই। কত কান্না, কত আর্তনাদ, দুঃখ আর হতাশা এই বিছানার ওপরে ঝরে-ঝরে পড়েছে। কত হাহাকার, চিরতরে হারিয়ে যাওয়া আনন্দকে ফিরে পাওয়ার জন্যে কত আবেদন যে এই বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে সেকথা কে বলবে !

"বিছানাই যে আমাদের জীবনের প্রতীক সেকথা তোমার নিশ্চয় স্মরণ রয়েছে। এই শেষ তিনদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি এইটাই আবিষ্কার করেছি। বিছানা ছাড়া ভাল জিনিস এ দুনিয়ায় আর কিছু নেই। আমাদের জীবনের অনেক সুন্দর আর মধুর মুহূর্তগুলি কি এই বিছানাতেই ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আমাদের কাটে না ?

"তারপরে দুঃখ-যন্ত্রণার কথাও ধর। বিছানায় শুয়ে-শুয়েও আমরা কম যন্ত্রণা ভোগ করিনে। যারা অসুস্থ, যারা যন্ত্রণাকাতর—এই বিছানাই তাদের শেষ আশ্রয়। দুঃস্থ, বিপর্যস্ত দেহের শেষ আশ্রয়স্থল।

"বিছানাই তো একটি পরিপূর্ণ মানুষ। প্রভু যীশুর কোন বিছানার প্রয়োজন হয় নি। এই থেকেই প্রমাণ হয় তিনি ছিলেন মহাপুরুষ। তিনি জন্মেছিলেন খড়ের ওপরে, মারা গিয়েছিলেন ক্রুশের ওপরে। আমাদের মত দরিদ্র দুর্বল মানুষদের জন্যে রেখে গিয়েছিলেন বিছানা।

"বিছানা নিয়ে অনেক চিন্তাই আমার মাথায় এসেছে। কিন্তু সে সমস্ত কথা তোমাকে লেখার মত সময় আমার নেই ; তাছাড়া, সে-সব চিন্তাও বেশ পরিষ্কার নয় আমার কাছে। তাছাড়া, আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ; এখন আমি বালিশটা একটু ঝেড়ে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে চাই। ঘুমোতে চাই একটু। কিন্তু আগামীকাল বেলা তিনটে নাগাদ আমাকে দেখতে আসতে যেন ভুলে যেয়ো না। কাল হয়ত আমি একটু ভাল থাকব, আর তা তোমার কাছে প্রমাণ করতেও পারব।

"হে বন্ধু বিদায়। তোমার চুম্বনের জন্যে হাত দুটি আমার বাড়িয়ে দিলাম, সেই সঙ্গে আমার ওষ্ঠাধর-ও।"

জাগরণ

[The awakening]

তিন বছর হল তার বিয়ে হয়েছে। এই ক'টি বছর ভাল-দ্য-সিরি ছেড়ে সে অন্য কোথাও যায় নি। এইখানেই তার স্বামীর চুটি তুলোর মিল রয়েছে। বেশ শান্তভাবেই তার জীবনটা গাছের অরণ্য ঘেরা দেহাতি মানুষেরা যাকে প্রাসাদ বলত সেই বাড়িতে কেটে যাচ্ছিল। ছেলেপিলে না হলেও, বেশ আনন্দেই ছিল সে। তার চেয়ে তার স্বামী মঁসিয়ে ভাসুরের বয়স অনেকটা বেশী; কিন্তু তিনি বেশ দয়ালু ছিলেন। সে-ও তার স্বামীকে বেশ ভালবাসত; কোন দিন অসৎ চিন্তা তার মনে দেখা দেয় নি।

প্রতিটি গ্রীষ্মকালেই অবশ্য তার মা আসতেন বাড়িতে; তারপরে শীত-কালে পাতা ঝরতে সুরু করলে তিনি আবার প্যারিসে ফিরে যেতেন। শরৎকাল থেকে সুরু করে পাঁচটি মাস এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ঘন কুয়াশায় ঢেকে দিত। সেই পাতলা কুয়াশায় ঢাকা নিচু মাঠগুলিকে দেখে জলাভূমি বলে মনে হোত। তারই ওপর থেকে দেখা যেত বাড়ির ছাদ। তারপরে ঢেউ খেলানো সাদা-সাদা ধোঁয়া এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অঞ্চলটিকে ঢেকে দিত। গোটা অঞ্চলটিকে একটি ভুতুড়ে রাজ্য বলে ভ্রম হোত। দশ গজ দূর থেকেও কাউকে চেনা যেত না। তাই ভেতর থেকে গাছপালাগুলি মাথা তুলে দাঁড়াতো। তাদের ডালপালা থেকে পিটপিট করে কুয়াশার ফোঁটা ঝরে পড়ত। এই ক'টি মাসই জেনি খুক-খুক করে কাসতো।

সেবারে অক্টোবর মাসে ডাক্তাররা শীতকালটা প্যারিসে কাটিয়ে আসতে জেনীকে পরামর্শ দিলেন; কারণ, ওখানকার জলবায়ুটা তার দুর্বল বুকের ওপরে বেশ চাপ সৃষ্টি করেছিল। জেনী প্যারিসেই গেল, কিন্তু মাসখানেক সে তার বাড়ি আর শান্ত পরিবেশটির কথা কিছুতেই ভুলতে পারল না। কিন্তু ধীরে ধীরে সে তার নতুন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। প্যারিসের আমোদ-প্রমোদ, সান্ধ্য মজলিস, আর ডিনার পার্টিতে সে বেশ মিশে গেল।

তখনও পর্যন্ত তার ছেলেমানুষী যায় নি। কী করবে না করবে কিছুই সে ঠিক করতে পারত না। চলা ফেরায় কেমন যেন জবুথবুর মত হয়ে পড়েছিল সে, ক্লান্তভাবে হেঁটে বেড়াত; গায়ে যেন কোন শক্তি তার ছিল না। কিন্তু সে প্রায় জীবন্ত হয়ে উঠল; আনন্দের আসরে যোগ দিয়ে রীতিমত আনন্দও সে পেতে লাগল। পুরুষেরা তাকে খুশি করার চেষ্টা করল। তাদের কথাবার্তা শুনে তারও বেশ মজা লাগতে লাগল; সে তাদের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে কিছু ঠাট্টা-তামাসাও করল; তাদের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি তার

যে রয়েছে সেদিক থেকে সে নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ, বিয়ের পরে ভালবাসা বলতে সে যা বুঝেছে এদের ভালবাসার সঙ্গে সেই ভালবাসার পার্থক্য অনেক, তাই সে এদের ভালবাসার অভিনয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল যথেষ্ট। এইসব দাড়িওয়ালা পুরুষদের অপরিচ্ছন্ন আদরের কাছে নিজের দেহটা সমর্পণের কথা ভাবতে গেলেই তার করুণার একটা হাসি আসত; আর তার শিরায়-শিরায় সৃষ্টি করত একটা চঞ্চল বিতৃষ্ণা। বাড়িতে আইনসঙ্গত স্বামী থাকা সত্ত্বেও কেমন করে মহিলারা যে পরিচিতদের দেহদান ক'রে গর্হিত কাজ করতে পারে সেটা বারবার সে নিজের মনেই চিন্তা করত। স্বামীর সঙ্গে সে যদি বন্ধুর মত ঘুরে বেড়াতে পারত তাহলে স্বামীকে সে আরও ভালবাসত; আর অনেক বেশী পবিত্র চুম্বনে তাকে আদর করত; কারণ, সেই আদরগুলি হচ্ছে আত্মার আসল আত্মীয়। কিন্তু তাকে পাওয়ার জন্যে পুরুষদের চোখে যে কামনাবহ্নি ধক ধক ক'রে উঠত, সেই কামনাকে প্রশ্রয় না দিলেও, তার ভালই লাগত। পার্টিতে ভাল ডিনারের পরে ড্রয়িংরুমে ফেরার পথে হঠাৎ একলা পেয়ে তারা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে যে প্রেমের বাণী আওড়াত তার অর্থ সে ভালই বুঝতে পারত, এবং তার রক্তও তাতে ঠাণ্ডা হয়ে যেত; কিন্তু তবু তার নারী-হৃদয় পুরুষদের এই প্রশংসায় খুশির আনন্দে কেঁপে-কেঁপে উঠত। এটা তার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে তারা যখন হঠাৎ তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ত, আর চাকরবাকরদের পায়ের শব্দে বিভ্রান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ত, সে তাদের সমস্ত প্রার্থনা আর আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করত সত্যি কথা তবু তার মনটা আনন্দে নেচে-নেচে উঠত।

মাঝে-মাঝে সে কর্কশভাবে হাসত। সেই হাসি দেখে উন্মাদ প্রেমিকের উচ্ছ্বাসও ফুটো বেলুনের মত চুপসে যেত। মাঝে-মাঝে সে বেশ রূঢ় কথাও বলত! সেই কথা তাদের প্রেমবহ্নিতে একঘড়া ঠাণ্ডা বরফজল ঢেলে দিত। তার স্বর শুনে তার সবচেয়ে বড় প্রেমিকেরও আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে যেত। তবু তার সেই অজস্র গুণমুগ্ধদের মধ্যে দুজন ছিল যাদের কিছুতেই দূরে সরানো গেল না। এই দুজনের মধ্যে কিন্তু কোনরকম মিল নেই। তাদের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে পল পেরোনেল; লম্বা চওড়া চেহারা, বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ; সাহসী; কোনকিছুতেই হার স্বীকার করতে সে রাজি নয়। প্রেমের ব্যাপারে সে সফল পুরুষ, সে জানত অপেক্ষা করতে; তারপরে একদিন যখন সুযোগ আসত সেই সুযোগের সে অপব্যবহার করত না।

আর একজনের নাম হচ্ছে মঁসিয়ে ত্য আর্ভাঁসেল। তার সঙ্গে দেখা হলেই ভাবাবেগে সে কাঁপতে সুরু করত। সে যে তাকে ভালবাসত সেই কথাটা সে মুখ ফুটে বলতেও পারত না; কিন্তু সব সময় জেনীর পিছু পিছু ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত। জেনী তার প্রথম প্রেমিকের নাম দিয়েছিল "ক্যাপ্টেন

জ্যাকাসে," আর দ্বিতীয়টিকে ডাকত "অনুগত ম্যাড়া" বলে। শেষকালে দ্বিতীয়টিকে সে ব্যক্তিগত ভৃত্যে পরিণত করেছিল।

কেউ যদি তাকে বলত তোমার অনুগতটিকে তোমার ভালবাসা উচিৎ তাহলে তার বেশ আমোদ লাগত; কিন্তু তবু জেনী তাকে ভালই বাসত; তবে সেই ভালবাসাটি ছিল অদ্ভুত ধরনের। অনুগতটি খুব বেশী তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত বলে অনুগতটির চলন-বলন, হাসি-ঠাট্টা, বেশ-ভূষা সবই প্রায় তার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে স্বপ্নেও তার মুখটা জেনীর কাছে ভেসে উঠত; মনে হোত, সে যেন তাকে চোখের সামনে দেখছে।—সেইরকম ভদ্র, রুচিশীল—তার প্রেমে উন্মাদ। মনে হোত, সে তার ডাক শুনছে; সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে যেত। তারপরে একদিন সন্ধ্যায় ছোট একটি বনের মধ্যে সে আর তার প্রণয়ীটি পাশাপাশি ঘাসের ওপরে বসল; অনুগতটি প্রেমের অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা তাকে শোনাল, তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে চুমু খেল সেই হাতে। তার উষ্ণ ত্বকের স্পর্শ পেল জেনী, তার নিঃশ্বাস তার গায়ে এসে লাগল; এবং জেনী সহজভাবে তার মাথার ওপরে হাত বুলোতে লাগল।

বাস্তব জগৎ থেকে স্বপ্নের জগৎ আমাদের কত দূরে। তারপরে জেনী একদিন স্বপ্ন দেখল—সে তার প্রেমিককে খুব ভালবাসে; একটা গভীর প্রেমে সে অবগাহন করে রয়েছে। প্রেমিককে হাতে করে ধরে সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে তার প্রেমিককে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল; চুমু খেল তার চোখে, গালে। সে ছাড়িয়ে নিল না নিজেকে। তারপরে একজনের ওষ্ঠাধর আর একজনের ওষ্ঠাধরের ওপরে চেপে বসল; জেনী সমর্পণ ক'রে দিল নিজেকে। এই মুহূর্তটি ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ; অতিমানবিক আনন্দের উচ্ছ্বাসে উদ্দাম—দৈহিক এ আনন্দকে কিছুতেই না বলে জেনী ফিরিয়ে দিতে পারল না। এইরকম পরিপূর্ণ আনন্দ কি বাস্তব জীবনে পাওয়া যায়? শরীরে রোমাঞ্চ নিয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল জেনীর। প্রিয় মিলনের আশায় তার মনটা এতই ব্যাকুল হয়ে উঠল যে সেদিন আর সে ঘুমোতে পারল না। মনে হল, সে তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

পরের দিন তার সঙ্গে দেখা হল জেনীর। স্বপ্নের কথা স্মরণ করে লজ্জায় সে লাল হয়ে গেল। অনুগতটি তার এই বিকলন লক্ষ্য করল। সে চুমু খেতে পারে এই আশংকা থাকা সত্ত্বেও জেনী স্বপ্নদর্শনের কথাটা তাকে না ব'লে পারল না; সেই সঙ্গে এই অনুরোধও সে তাকে করল যেন সে তাকে সম্মান করে। অনুগতটি তার সম্মান রক্ষা করেছিল। তারপরে তারা অনেকক্ষণ ধরে একা একা ঘুরে বেড়াত; সেই সময় আত্মায় আত্মায় তাদের মিলন হোত। তারপর তারা যখন যে যার ঘরে ফিরে যেত তখন দু'জনেরই কেমন যেন দুর্বল দুর্বল লাগত।

মাঝে মাঝে তারা চুমু খেত; একটি পবিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে তারা সেই আনন্দ উপভোগ করত। এরই মাঝখানে জেনী বেশ বুঝতে পারল অনুগতটিকে আর বোধ হয় রাখা যাবে না। তখন সে তার স্বামীকে লিখল এবার সে তার শান্ত গৃহকোণে ফিরে যাবে। কিন্তু স্বামীর চিঠিতে বুঝলো সেখানে প্রচণ্ড শীত চলেছে। এ সময় স্বাস্থ্যের খাতিরেই তার বাড়ি যাওয়া উচিৎ হবে না। ভীষণ ক্ষেপে উঠল জেনী। আচ্ছা মানুষ! তার মনের ভেতরে যে সংঘর্ষ চলেছে তার সে কিছুই অনুমান করতে পারছে না, বুঝতে পারছে না কিছুই।

উষ্ণ ফেব্রুয়ারী মাস এল প্যারিসে। অধুনা যদিও সে মঁসিয়ে আর্ভাসেলের সান্নিধ্য কিছুটা এড়িয়েই চলছিল তবু একদিন সন্ধ্যায় লেকের ধারে বেড়ানোর সময় সে জেনীকে আমন্ত্রণ জানাল। জেনী সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়ীতে চড়ে তারা দু'জন বেড়াতে গেল। তাদের গাড়ীটা ধীরে ধীরে বনের দিকে এগিয়ে চলল। খুব পাশাপাশি তারা বসে রয়েছে। দু'জনেই দু'জনের হাত দুটি ধরে রয়েছে। জেনী ভাবল—এই-বার আমার শেষ। কারণ স্বপ্নে তার শিরায় শিরায় যে উত্তেজনার ঢল নেমে-ছিল প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করার সেই উদগ্র কামনা তাকেও ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। প্রতিটি মুহূর্তেই তাদের ঠোঁটগুলি মিশছিল, ছাড়ছিল—আবার মিশছিল। মঁসিয়ে তাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে যেতে সাহস করল না; দরজার সামনে রেখে ভেতরে ঢুকে গেল। ছোট ড্রয়িংরুমে মঁসিয়ে পল তার জন্য অপেক্ষা করছিল। জেনীর সঙ্গে করমর্দন করেই সে বুঝতে পারল জেনীর হাতটা কাঁপছে। মঁসিয়ে পল মৃদুস্বরে তাকে প্রেম নিবেদন করতে লাগল।

কোন উত্তর না দিয়েই জেনী তার কথা শুনছিল। কারণ, সে তখন অপর প্রেমিকটির কথা ভাবছিল—গভীর আগ্রহে, একেবারে তন্ময় হয়েই ভাবছিল। একটা চীৎকার করে তার তন্ময়তা কেটে গেল। দেখল পল তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে। সে যখন তার খোলা চুলের ওপরে চুমু খেতে লাগল তখন জেনী চীৎকার করে উঠল—"চলে যান, চলে যান।···আপনাকে আমি ঘৃণা করি।" অবাক হয়ে পল দাঁড়িয়ে উঠল; তারপরে টুপীটা নিয়ে চলে গেল।

পরের দিনই সে ভাল-দ্য-সিরিতে ফিরে গেল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে তার স্বামীকে বলল—তোমাকে ছেড়ে বেশী দিন আমি থাকতে পারি না।

ভদ্রলোক দেখলেন জেনীর চরিত্রে বেশ একটা পরিবর্তন হয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কী বলত? মনে হচ্ছে তুমি সুখী নও! কী চাও তুমি?

জেনী বলল—কিছুই না। এ পৃথিবীতে সুখ শুধু আমাদের স্বপ্নেই।

পরের গ্রীষ্মে আর্ভাসেলে তার সঙ্গে দেখা করতে এল। জেনী তাকে অত্যন্ত সহজভাবে অভ্যর্থনা জানাল। কারণ জেনী বুঝতে পেরেছিল সে তাকে

কোনদিনই ভালবাসে নি। ভালবাসার যে স্বপ্নে সে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সেই স্বপ্ন থেকে পল তাকে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে জাগিয়ে দিয়েছে।

যুবকটি তখনও জেনীকে ভালবাসত ; প্যারিসে ফিরে গিয়ে সে ভাবল—মহিলাটি সত্যিই বড় অদ্ভুত, জটিল আর দুর্বোধ্য।

সিঁদেল চোর

[The barglar]

"আমি তোমাকে বলছি ; কিন্তু তুমি তা বিশ্বাস করবে না।"

"তবু বল।"

"বেশ, শোন। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কথা আমি বলতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলেও, আমার কাহিনীটা সত্যি। একমাত্র আর্টিস্টরাই এই কাহিনী শুনে অবাক হবে না। উত্তেজিত অবস্থায় ইয়ার্কি শুরু করলে চরম বিপর্যয়ের মুখেও যে ইয়ার্কি করা বন্ধ করা যায় না সেকথা তারা জানে।" বৃদ্ধ আর্টিস্ট চেয়ারের ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়েছিলেন। বারবিজোনে একটা হোটেলের ডাইনিঙ রুমে আমরা তখন বসেছিলাম।

"দরিদ্র সোরিইউলের বাড়িতে আমরা সেদিন ডিনার খেয়েছিলাম। বেচারা মারা গিয়েছে। আমাদের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে খারাপ। সম্ভবত সেদিন আমরা তিনজন ছিলাম—সোরিইউল, আমি, আর পয়তিভিঁ। তবে সেকথা আমি ঠিক মনে করতে পারছিনে। অবশ্য পয়তিভিঁ বলতে আমি ম্যারাইন পেণ্টার ইউজিন লে পয়তিভিঁর কথাই বলছি। সেও আজ মৃত।

"সোরিইউলের বাসায় ডিনার খেয়েছিলাম—একথার অর্থই হচ্ছে আমরা তখন মাতাল হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের ভেতর একমাত্র লে পয়তিভিঁর মাথাটা তখনও টলটলায়মান হয় নি। এটা আমাদের যৌবনের কাহিনী। স্টুডিয়ো ঘরের পাশের ঘরে মেঝের ওপরে আমরা লম্বা হয়ে শুয়ে আবোল-তাবোল বকছিলাম। চেয়ারের ওপরে পা তুলে দিয়ে কড়িকাঠের দিকে মুখ করে শুয়েছিল সোরিইউল। শুয়ে শুয়ে সে যুদ্ধের আর যুদ্ধ পোশাকের গল্প করছিল। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে বিরাট ওয়ার্ড্রোবটা খুলে ফেলল। সেই-খানেই সে তার যন্ত্রপাতি আর পোশাক রাখত। সেই পোশাক সে পরল। তারপরে সে ব্রিটিশ সেনানীর একটা পোশাক বার করে পয়েতেভিঁকে পরতে বলল। কিন্তু সে রাজি না হওয়ায় আমরা দু'জনে তাকে জাপটে ধরে উলঙ্গ

করে সেই পোশাক পরিয়ে দিলাম। সেই আলখাল্লায় সে একেবারে ঢাকা পড়ে গেল। নিজেকে সাজালাম অশ্বারোহী সেনানীর বেশে। সাজগোজ হ'লে সোরিইউল আমাদের দিয়ে কিছুক্ষণ জটিল মিলিটারী প্যারেড করালো। প্যারেড শেষ হলে সে চীৎকার ক'রে বলল—আমরা এখন সৈন্য-বাহিনী। সুতরাং এস আমরা সবাই সেনাবাহিনীর মতই মদ্যপান করি।

তথাস্তু। এক গামলা মদ নিয়ে পাঞ্চ ক'রে আমরা সবাই গলায় ঢাললাম; তারপরে আর এক গামলা 'রাম' উদরস্থ করলাম। মদ খাওয়ার পর্ব শেষ ক'রে সত্যিকার সেনাবাহিনীর জোয়ানদের মত গলা ছেড়ে গান শুরু করে দিলাম। অতটা মদ গলায় ঢালার পরেও লে পয়তেভিঁর-ই মাথাটা কিছুটা প্রকৃতিস্থ ছিল। সে হঠাৎ একটা হাত তুলে বলল—চু-প! নিশ্চয় কেউ স্টুডিয়োর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ। নিশ্চয়।

সোরিইউল টলতে টলতে দাঁড়িয়ে উঠে বলল —'চোর!' তারপরেই সে নির্দেশ দিল—কমরেডস, অস্ত্র নিয়ে তৈরী হও।

নির্দেশ পেয়েই দেওয়ালের গা থেকে যে যার মর্যাদা অনুযায়ী অস্ত্র খুলে নিলাম। আমি নিলাম একটা মাসকেট আর একখানা তরোয়াল। পয়তেভিঁর হাতে গুঁজে দেওয়া হল ব্যায়োনেট শুদ্ধ একটা বিরাট বন্দুক। ঠিক কোন্ অস্ত্রটা চাই বুঝতে না পেরে সোরিইউল একটা পিস্তল তুলে নিয়ে তার বেল্ট-এর ভেতরে গুঁজে রাখলো। তারপরে এক হাতে একটা কুড়োল নিয়ে স্টুডিয়োর দরজাটা খুব সাবধানে গিয়ে খুলল। সেই সন্দিগ্ধ রাজত্বে সৈন্য-বাহিনীটি সন্তর্পণে প্রবেশ করল। বড় বড় ক্যানভাস, আসবাবপত্র, আর অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসে বিকীর্ণ বিরাট ঘরটির মাঝখানে ঢুকে আসার পরে সোরিইউল বলল—নিজেকেই আমি সেনাপতির পদে বরণ করলাম। এস আমরা যুদ্ধকালীন মন্ত্রণাসভায় বসি। হে অশ্বারোহী সেনানী, শত্রুর পথরোধ করবে তুমি। অর্থাৎ দরজায় তালা লাগিয়ে দাও। আর তুমি পদাতিক সেনানী, তুমি আমার সঙ্গে এস।

সেনাপতির নির্দেশমত কাজ ক'রে আমি মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলাম। মূল বাহিনীর কাছে পৌছানো মাত্র আমি একটা ভীষণ শব্দ শুনলাম। একটা জলন্ত বাতি নিয়ে ব্যাপারটা কী জানার জন্যে আমি দৌড়ে গেলাম। দেখলাম পয়তেভিঁ তার ব্যায়োনেট দিয়ে একটা ডামীকে এফোঁড় ওফোঁড় করছে আর আমাদের সেনাপতি তার কুড়োল দিয়ে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। ভুলটা ধরা পড়ার পরে সেনাপতি নির্দেশ দিলেন—সাবধান! তারপরে আবার আমাদের অভিযান শুরু হল।

কুড়িটি মিনিট ধরে স্টুডিয়ো ঘরের চারপাশ আমরা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম। তারপরে পয়তেভিঁ কুলুঙ্গীর দিকে এগিয়ে গেল। কুলুঙ্গীটা বেশ গভীর আর অন্ধকার থাকার ফলে একটা বাতি নিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি।

উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়েই হতভম্ব হয়ে আমি পিছিয়ে এলাম। একটা সত্যিকার জীবন্ত মানুষ তার ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যাই হোক, তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গীর কপাটটা বন্ধ করে দিলাম আমি। তারপরে কয়েক পা পিছিয়ে এসে আমরা আবার মন্ত্রণাসভায় বসলাম।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার বিষয়ে আমরা একমত হ'তে পারলাম না। সোরিইউল বলল—ধোঁয়া দিয়ে চোরটাকে তাড়িয়ে দাও। পয়তেভিঁ বলল—অনাহারে চোরটাকে শুকনো ক'রে মেরে দাও। আমার প্রস্তাবটা হল ডিনামাইট ফাটিয়ে লোকটাকে উড়িয়ে দেওয়া। শেষ পর্যন্ত পয়তেভিঁর মতটাই মেনে নেওয়া হল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরে আবার আমরা মদ্যপানের ব্যবস্থা করলাম। পয়তেভি তার সেই বিরাট বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়ে পাহারা দিতে লাগল; আমরা কুলুঙ্গীর সামনে বসে নিবিষ্ট মনে বন্দীর স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে মদের জালা শেষ করতে লাগলাম। কয়েক জালা মদ শেষ করার পরে পয়তেভিঁ প্রস্তাব দিল—বন্দীকে বার ক'রে এনে তার চেহারাটা একবার নিরীক্ষণ করা যাক।

উত্তম প্রস্তাব। 'হুররে' বলে চীৎকার ক'রে উঠলাম আমি। তারপরে অস্ত্রশস্ত্র বাগিয়ে নিয়ে বিপুল আনন্দে চীৎকার করতে করতে আমরা কুলুঙ্গীর দিকে ছুটলাম। কুলুঙ্গীর দরজাটা খোলা হল। সোরিইউল তার পিস্তলটা [পিস্তলের ভেতরে কোন টোটা ছিল না] নিয়ে সকলের আগে আগে বীরদর্পে এগিয়ে গেল। উন্মত্তের মত চীৎকার ক'রে আমরা দু'জন তার পিছু পিছু ছুটলাম। তারপরে তিনজনে মিলে লদকালদকী করার পরে বন্দীকে আমরা বার করে নিয়ে এলাম। বিশ্রী চেহারার, সাদা চুলো বুড়ো ডাকাত; ছেঁড়া নোংরা পোশাক-পরা। তার হাত-পা বেঁধে আমরা তাকে আর্ম চেয়ারের ওপরে শুইয়ে দিলাম। সে কোন কথা বলল না।

সোরিইউলের মগজে তখন বেশ নেশা ধরে গিয়েছে। সে বলল—আমরা এই হতভাগাটার বিচার করব। আমারও মনে হল, প্রস্তাবটা ঠিকই। ঠিক হল পয়তেভিঁ বন্দীর পক্ষে আর আমি বিপক্ষে সওয়াল করব। বন্দীর নিজের উকিল ছাড়া সর্ববাদীসম্মতভাবে বন্দী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল।

সোরিইউল বলল—আমরা ওকে ফাঁসি দেব। তবে অনুশোচনা না ক'রে ও মরতে পারে না। তারপরে একটু ইতস্তত ক'রে সে বলল—ঠিক আছে। একটা পাদরীকে ডেকে পাঠানো যাক।

অনেক রাত্রি হওয়ায় এই প্রস্তাবে আমি আপত্তি জানালাম। এই কথা শুনে সে আমাকেই পাদরীর কাজ করতে বলল। সেই সঙ্গে বন্দীকে বলল তার পাপ স্বীকার করতে। গত পাঁচ মিনিট ধরে বন্দীটি চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে আমাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছিল। আমাদের হাবভাব দেখে সেও বেশ শঙ্কিত চিত্তেই ভাবছিল আমরা কোন্ দেশী হতচ্ছাড়া। এইবার হেঁড়ে

গলায় সে জিজ্ঞাসা করল—সত্যি-সত্যিই তোমরা একাজ করতে চাও না?' তাই না?

সোরিইউল জোর ক'রে তাকে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে দিয়ে বলল—চোপ্। তোমার শেষ সময় উপস্থিত। নিজের পাপ স্বীকার কর। তারপরে তার ব্যাপটিজম্ হয় নি এই ভয়ে সে তার মাথায় এক গ্লাস 'রাম' ঢেলে দিল।

ভয় পেয়ে সেই বুড়ো শয়তানটা চীৎকার করে উঠল—'বাঁচাও, বাঁচাও', তার চেঁচানিতে পাছে পাশের বাড়ির লোকেরা জেগে ওঠে এই ভয়ে আমরা তার মুখটা চেপে ধরলাম।

তারপরে সে মেঝের ওপরে হাত-পা ছুঁড়ে, টেবিল চেয়ার ফেলে দিয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল; ক্যানভাসের ছবিগুলিকে ভেঙে প্রায় গুঁড়িয়ে দিল। অবশেষে সোরিইউল বিরক্ত হ'য়ে ক্ষেপে উঠে বলল—একে শেষ করে ফেলি। এই বলে সে তার পিস্তলের ঘোড়াটা টিপে দিল। একটা তীক্ষ্ণ ক্লিক শব্দ ক'রে পিস্তলের চাবিটা পড়ে গেল। তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে বন্দীর দিকে লক্ষ্য ক'রে আমিও আমার বন্দুক ছুঁড়লাম। অবাক হ'য়ে দেখলাম মাত্র একটু আগুন বেরিয়ে চুপ করে গেল। তারপরে পয়তিভিঁ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল—এই মানুষটিকে হত্যা করার কোন অধিকার কি আমাদের রয়েছে?

সোরিইউল অবাক হ'য়ে বলল—কেন? আমরা তো ওকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছি।

তা বটে! কিন্তু বেসামরিক লোকদের গুলি ক'রে মারার অধিকার আমাদের নেই। চল, আমরা ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আসি। তারাই ওকে জল্লাদের হাতে তুলে দেবে।

প্রস্তাবে রাজি হলাম আমরা। বুড়োটার হাঁটবার কোন শক্তি ছিল না বলে আমরা একটা তক্তার সঙ্গে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলাম। আমি আর পয়তিভিঁ তাকে কাঁধে করে নিয়ে চললাম। সোরইউল অস্ত্র নিয়ে সতর্ক হ'য়ে চলল আমাদের পিছনে। থানার মুখে পুলিশ আমাদের আটকে দিল। পুলিশের বড় কর্তা আমাদের চিনতেন। আমরা যে কী ধরনের ঠাট্টা তামাশায় অভ্যস্ত তাও তাঁর অজানা ছিল না। তাই তিনি আমাদের বন্দীকে গ্রহণ করলেন না; হেসে আমাদের ফিরিয়ে দিলেন। সোরিইউল জিদ ধরাতে তিনি আমাদের বেশ রূঢ়ভাবেই বললেন—বাড়ি ফিরে যাও। গোলমাল করো না। সুতরাং সৈন্যবাহিনী মার্চ করতে-করতে আবার স্টুডিয়োতে ফিরে এল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অত কিম্?

পয়তিভিঁ সহানুভূতির স্বরে বলল—হতভাগাটা নিশ্চয় বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে।

লোকটার ওপরে আমারও কেমন যেন দয়া হ'ল [মদের সৌজন্যেই

অবশ্য]; আমি তার মুখের বাঁধন খুলে দিলাম; জিজ্ঞাসা করলাম—বুড়ো, তুমি কেমন আছ?

বুড়ো আর্তনাদ করে বলল—আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে বাপু!

পিতৃস্নেহ উথলে উঠল সোরিইউলের। সে তার হাত আর পায়ের দড়ি-দড়া খুলে দিয়ে তাকে একটা চেয়ারের ওপরে বসিয়ে দিল, এবং অনেক দিনের হারানো বন্ধুর মত তার সঙ্গে ব্যবহার করতে সুরু করল। আমরা আবার মদ নিয়ে বসলাম। বুড়োটা আর্ম চেয়ারে বসে আমাদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল। পাঞ্চ তৈরী হওয়ার পরে বন্দীকে আমরা এক গ্লাস মদ এগিয়ে দিলাম; বেশ খুশি হ'য়েই আমরা তার মাথাটাও উঁচিয়ে ধরতে পারতাম। টোস্টের পর টোস্ট চলতে লাগল। দেখলাম আমরা তিনজনে মিলে যতটা মদ খেলাম বুড়োটা একাই তার চেয়ে অনেক বেশী মদ উড়িয়ে দিল। দিনের আলো ফুটে বেরোনোর সঙ্গে-সঙ্গে বুড়োটা শান্তভাবে উঠে বলল—ধন্যবাদ। কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে।

আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও থাকতে সে রাজি হ'ল না। সুতরাং করমর্দন ক'রে আমরা তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। বাতি জালিয়ে সোরিইউল দরজার কাছ পর্যন্ত এসে বলল—বাইরে চৌকাঠটা ভাল ক'রে দেখে যেয়ো। হোঁচট খেয়ো না যেন।

তার গল্প শুনে সবাই হোহো ক'রে হাসতে লাগল। গল্প শেষ ক'রে সে উঠে দাঁড়াল; তারপরে পাইপটা ধরিয়ে আমাদের সামনে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বলল—এই কাহিনীর সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিল।

ঘোড়ার পিঠে

[On horse back]

স্বামীর মাইনের ওপরে নির্ভর করেই সংসার চলত। দুটি সন্তান ছিল তাদের। একদিন সমাজে তারা অবস্থাপন্নই ছিল; কিন্তু তারপরে অবস্থা পড়ে যায়; তবু বাইরের চাকচিক্য বজায় রাখতে হোত তাদের। ফলে আর্থিক অবস্থা তাদের সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়েছিল।

হেক্টর দি গ্রিবেলি বাবার সংসারে গ্রামেই মানুষ হয়েছিল। বৃদ্ধ অ্যাবের কাছেই সে লেখাপড়া শিখেছিল। ধনী ছিল না তারা। কোনরকমে দারিদ্র্যকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। বছর কুড়ি বয়সে সে নৌ-মন্ত্রণালয়ে চাকরি

করতে গেল। চাকরিটা কেরাণীর—মাইনে ছিল পনের শ ফ্রাঁ। জীবনে কঠোর পরিশ্রমের জন্তে যারা প্রস্তুত থাকে তাদেরই মত হেক্টর চাকরির জীবনে দিশেহারা হয়ে পড়ল। যারা জীবনে অসুবিধার সঙ্গে মোকাবিলা করার শিক্ষা পায় নি, শৈশব থেকে যাদের মন অপরিপুষ্ট, যারা জীবন সংগ্রামে অপটু, হেক্টর ছিল তাদেরই একজন। চাকরি জীবনের প্রথম তিনটি বছর তার কাছে ছিল ভয়ঙ্কর।

কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তাদেরই স্বগোত্র প্রাচীন কিছু লোকের সঙ্গে সে আলাপ করল, তারই মত দরিদ্র তারা। ফবার্জ সেনত-জাঁর্মের কিছু বিশেষ রাস্তায় বাস করত তারা, রাস্তাটাও তেমনি নিরানন্দ। আধুনিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় ছিল না। দরিদ্র, অথচ দম্ভ ছিল তাদের বেশ। পুরানো বাড়িতে এইসব হতভাগ্য অভিজাতরা বাস করত—একতলা থেকে উপরতলা পর্যন্ত; কিন্তু কোন তলাতেই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। চিরন্তন কুসংস্কার, পুরানো লুপ্তপ্রায় বনেদীআনার দম্ভ, আর অর্থ রোজগারের জন্তে প্রচেষ্টার অভাব—পুরুষদের কর্মহীনতা, সব মিলিয়ে তাদের দুরবস্থার আর সীমা পরিসীমা ছিল না। এই রকম এক দরিদ্র সংসারেই হেক্টর বিয়ে করল। চারটি বছরে দু'টি সন্তান হল তাদের। দারিদ্র্যের বোঝা ঘাড়ে চাপায় তারা কোনরকম আমোদ করতে পারত না। রবিবার দিন মাঝে-মাঝে কাছাকাছি একটু তারা বেড়িয়ে আসত; আর প্রতিটি শীতের সময় বন্ধুর দেওয়া ফ্রি পাশ নিয়ে দু'একবার তারা থিয়েটার দেখতে যেত।

কিন্তু বসন্ত আসার সময় তার মনিব তাকে দিয়ে অফিসের কিছু বাড়তি কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন। তাই কাজের জন্ত হেক্টর তিনশ ফ্রাঁ বাড়তি রোজগার করেছিল সেবার। সেদিন রাত্রিতে বাড়ি ফিরে সে তার স্ত্রীকে বলল—প্রিয় হেনরিয়েটা, এই টাকাটা নিয়ে আমাদের কিছু একটা করা উচিৎ। ছেলেদের নিয়ে বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি চল না?

অনেক আলোচনার পরে ঠিক হল সবাই মিলে তারা বনভোজনে যাবে।

হেক্টর বলল—বাইরে যাওয়ার অভ্যাস আমাদের খুব কম রয়েছে। তাই যোগাড়যন্ত্র আমাদের বেশ ভালভাবেই করতে হবে। তুমি আর বাচ্চারা যাবে গাড়ীতে করে; আমি যাব ঘোড়ার পিঠে। আমার দিক থেকে সেটা ভালই হবে।

সারা সপ্তাহটা কেবল ওই নিয়েই আলোচনা হল। যাকে বলে একরকম সরগরম আলোচনা। সবাই উত্তেজনায় একেবারে ভেঙে পড়ল। গাড়ীর পাশে পাশে হেক্টর ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে এ দৃশ্য একেবারে অভূতপূর্ব। হেক্টর বুক ফুলিয়ে বলল ঘোড়ায় চড়তে সে বেশ ভাল করেই শিখেছে। একবার ঘোড়ার পিঠে চড়লে আর তাকে ধরে রাখা যাবে না।

হাতের চেটো ঘষতে-ঘষতে সে তার স্ত্রীকে বলল—তার সবচেয়ে ভাল

তেজী ঘোড়া। আমি কেমন করে ঘোড়ায় চেপে যাই তা তুমি এবার দেখবে। তোমার ইচ্ছে হ'লে চ্যাম্পস-ইলিসির পাশ দিয়েও আমরা ফিরতে পারি। খুব ভালই হবে। ফেরার পথে আমারই অফিসের কারও সঙ্গে দেখাও হ'য়ে যেতে পারে। মানুষের কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার এরচেয়ে ভাল পথ আর নেই।

যাত্রার দিন গাড়ী আর ঘোড়া দুটোই তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। হেক্টর তাড়াতাড়ি নিচে নেমে তার ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করতে লাগল। আগের দিনই সে একটা চাবুক কিনে এনেছিল। বাতাসের বুকে সেটাই সে সাঁই-সাঁই ক'রে কসাতে লাগল। তারপর সে ঘোড়ার পিঠ, বুক, পা, পাঁজর —সব ভাল ক'রে পরীক্ষা করে দেখল; মুখ চিরে ভেতরটা দেখল তার; তার পর তার পিঠে হাত বুলোল। বয়সটা কত যাচাই করল। আর সকলে এসে যখন গাড়ীতে চাপার উপক্রম করল তখনও সে ঘোড়ার জাত নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তার সংসারের সবাই গাড়ীর ওপরে বেশ আরাম ক'রে বসল। তারপরে হেক্টর ঘোড়ার ওপরে তড়াং ক'রে লাফিয়ে উঠল। ঘোড়ার পিঠে বসার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াটা এমনভাবে নাচতে সুরু করল যে আর একটু হলেই হেক্টর ছিটকে পড়ে যেত। লজ্জা পেয়ে হেক্টর ঘোড়াটার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলল—'স্থিরোভব বৎস, স্থিরোভব।' ঘোড়া আর আরোহী সামলে নেওয়ার পরে হেক্টর জিজ্ঞাসা করল—রেডি?

সবাই বলল—রেডি।

চলতে সুরু করল দলটি। সবারই চোখ তখন হেক্টরের ওপরে নিবদ্ধ। সে তখন ঘোড়ার ওপরে দেহটা নানাভাবে বাঁকিয়ে একটা বেশ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। মনে হল, সে বোধ হয় ঘোড়ার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কোনমতে নিজেকে আয়ত্বের ভেতরে রেখে সে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু তখন তার অবস্থা বেশ ভাল নয়। কপাল কুঁচকিয়ে বিবর্ণ মুখে সে কোনরকমে তাল সামলাতে ব্যস্ত ছিল। তার স্ত্রী আর চাকরাণী দুটো ছেলেকে ধরে রেখেছিল। ছেলেদুটো বারবার হেক্টরের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে বলতে লাগল—দেখ, দেখ—বাবা যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে। বাইরে বেরিয়ে তাদের বেশ স্ফূর্তি হয়েছে। চীৎকার ক'রে মনের আনন্দ তারা প্রকাশ করতে লাগল।

তাদের চীৎকারে বিভ্রান্ত হয়ে হঠাৎ ঘোড়াটা লাফাতে-লাফাতে ছুটতে সুরু করল। তাকে সংযত করতে গিয়ে হেক্টরের টুপীটা গেল পড়ে। ঘোড়া থামিয়ে নিচে নামতে হ'ল আরোহীকে। টুপীটা কুড়িয়ে নিয়ে হেক্টর তার স্ত্রীকে সম্বোধন ক'রে চেঁচিয়ে বলল—বাচ্চাদের চীৎকার করতে বারণ কর—বুঝেছ!

দুপুরের খাবারটা তারা সঙ্গেই নিয়েছিল। ভিসিনেট বনের মধ্যে গিয়ে

তারা লাঞ্চ খেল। গাড়োয়ানই ঘোড়ার তদারক করছিল; তবু বারবার হেক্টর ঘোড়াটার কাছে উঠে গিয়ে তার দেখাশোনা করতে লাগল। সে আদর করে ঘোড়াটার ঘাড়ে হাত বুলোল; তাকে রুটি, কেক আর চিনি খাওয়ালো। স্ত্রীকে বলল—ঘোড়াটা খুব তেজী। প্রথমে ও আমাকে একটু বেকায়দায় ফেলেছিল। কিন্তু দেখলে তো ওকে কেমন ক'রে আমি কায়দা করে ফেললাম। আমি যে কী চিজ সেটা ও এখন বুঝতে পেরেছে।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা চ্যাম্পস-ইলিসি-এর পাশ দিয়েই ফিরল। বিরাট রাজপথটা তখন লোকজন, গাড়ী-ঘোড়ায় একেবারে গিজগিজ করছে। সূর্যের আলো পড়ে গাড়ীর রঙ, লোহার জিন, আর দরজার হাতলগুলি সব চকচক করতে সুরু করেছে। সবাই তখন গতির আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। কিছুটা দূর এগোনোর পরেই হেক্টরের ঘোড়াটা দুর্বার গতির ছন্দে মেতে উঠল। সেই অজস্র যানবাহনের ভেতর দিয়ে বেপরোয়া হয়ে সে তার আস্তাবলের দিকে ছুটতে সুরু করল। তাকে সংযত করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল হেক্টরের। যে গাড়ীতে ক'রে তার স্ত্রী-পুত্রেরা আসছিল সেই গাড়ীটা অনেক পেছনে প'ড়ে রইল। প্যালে ডি ল ইনডাসট্রির সামনে এসে ঘোড়াটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে ডান দিকে ঘুরে গেল। সেই সময় একটি বৃদ্ধা ধীরে সুস্থে রাস্তা পার হচ্ছিল। ঘোড়াটাকে সামলাতে না পেরে হেক্টর চীৎকার ক'রে উঠল—অ্যাই···অ্যাই···সাবধান। কিন্তু বৃদ্ধাটি সম্ভবত কালা থাকায় সে তার কথা শুনতেই পেল না। যেমন যাচ্ছিল তেমনি যেতে লাগল। ঘোড়াটা তাকে গিয়ে জোরে একটা ধাক্কা মারল। ধাক্কা খেয়ে বৃদ্ধাটি বার-তিনেক ডিগবাজি খেয়ে দশ ফুট দূরে ছিটকে পড়ল। জনকয়েক লোক বেরিয়ে এসে চীৎকার করে উঠল—ধর, ধর—ঘোড়াটাকে ধর।

প্রচণ্ড বিভ্রান্তির মধ্যে হেক্টর তখন মরীয়া হয়ে প্রাণপণে ঘোড়াটার ঘাড়ের লোমগুলি হাত দিয়ে ধরে চীৎকার করে উঠল—বাঁচাও, বাঁচাও। বিরাট একটা ধাক্কা খেয়ে সে ঘোড়ার ওপর থেকে ছিটকে পুলিশম্যানের প্রসারিত হাতের মধ্যে পড়ে গেল। গোলমাল শুনে পুলিশটি ঘোড়াটা থামানোর জন্যে সেইদিকে ছুটে এসেছিল। সরকারী পোশাক পরা একটি বৃদ্ধ তো ব্যাপারটা দেখে ক্ষেপে লাল হয়ে উঠল; বলল—কী কাণ্ড! আপনি যদি ঘোড়ায় চাপতে না জানেন তাহলে আপনার ঘরে বসে থাকা উচিত ছিল। এই-ভাবে রাস্তায় মানুষ চাপা দেওয়ার কোন অধিকার আপনার নেই।

চারটি লোক বৃদ্ধাটিকে তুলে নিয়ে এল। মনে হ'ল বৃদ্ধাটি মারা গিয়েছে। তার মুখটা বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে; গোটা গাটা ছেয়ে গিয়েছে ধুলোয়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলল—একে ডাক্তারখানায় নিয়ে যান। আমরা স্টেশন-হাউসে যাচ্ছি। একদল লোক হেক্টরের পিছু-পিছু চলল। হেক্টর চলল দুটি পুলিশের পাশে-পাশে। আর একজন নিয়ে চলল তার ঘোড়াটা। ইতিমধ্যে

তার স্ত্রীর গাড়ীটা এসে পড়েছে। দূর থেকে ব্যাপারটা আন্দাজ করে সে তার দিকে দৌড়ে এল। চাকরাণী আর বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে তার পিছনে এসে দাঁড়ালো। হেক্টর বলল তার ঘোড়া একটি বৃদ্ধাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। ব্যাপারটা কিছুই নয়। সে শীগগীরই বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এই কথা শুনে রীতিমত ভয় পেয়েই তার পরিবারের সকলে বাড়ি ফিরে গেল।

স্টেশন-হাউসে বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। নিজের নাম ঠিকানা আর তার অফিস কোথায় এই সব সংবাদ দিয়ে আহত বৃদ্ধাটির খবরটা কি জানার জন্যে সে অপেক্ষা করতে লাগল। সংবাদ নিয়ে একটি পুলিশ ফিরে এল। বৃদ্ধাটির নাম মাদাম সইমোন; পেশায় সে কাঠকুড়ানী। বয়স পঁয়ষট্টি। তার জ্ঞান ফিরে এসেছে; তবে তার বিশ্বাস তার শরীরের ভেতরে কিছু যখম হয়েছে। বৃদ্ধা মারা যায় নি এই সংবাদ পেয়ে হেক্টর তার মনোবল ফিরে পেল; বলল—বৃদ্ধার চিকিৎসার জন্যে যা খরচ হয় তা সে করবে। যে ওষুধের দোকানে বৃদ্ধাটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেইখানে সে গেল। বৃদ্ধাটি 'যাই বাবা, গেলাম বাবা' বলে কাতরাচ্ছিল। দুজন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছিলেন। তাঁরা বললেন—কোন হাড় ভাঙে নি; কিন্তু ভয় হচ্ছে, ভেতরে কিছু গণ্ডগোল হয়ত হয়েছে।

হেক্টর জিজ্ঞাসা করল—খুব কষ্ট হচ্ছে?

হ্যাঁ, হচ্ছে।

কোথায়?

মনে হচ্ছে শরীরটা আমার পুড়ে যাচ্ছে।

একজন ডাক্তার তার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী?

হ্যাঁ, স্যার।

একে একটা হাসপাতালে পাঠানো দরকার। একটা হাসপাতালের সঙ্গে আমার পরিচয় রয়েছে। তারা রোজ ছ' ফ্রাঁ হিসাবে নেবে। সেইখানে আমি কি এর জন্যে ব্যবস্থা করব?

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং সেই মত ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়ে আশ্বস্ত হ'য়ে হেক্টর বাড়ি ফিরে গেল। দেখল তার স্ত্রী তখনও বসে-বসে কাঁদছে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল— কিছু ভেব না। বিশেষ কিছু নয়। তাকে আমি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। তিন দিনে সুস্থ হ'য়ে উঠবে।

পরের দিন অফিসের পর সে মাদাম সাইমনকে দেখতে গেল। সে ভালই রয়েছে—গরুর মাংসের স্যুপ খেতে তার ভালই লাগছে।

হেক্টর জিজ্ঞাসা করল—কেমন আছ?

সে বলল—ভাল নয়। মনে হচ্ছে আমি মরে গিয়েছি। মোটেই ভাল নয়।

ডাক্তার বললেন—এখনই বলা যাচ্ছে না। পরে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

তিন দিন অপেক্ষা করার পরে হেক্টর আবার গেল বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করতে। তার দেহের রঙ ফিরেছে ; ফিরে এসেছে চোখের জেল্লা। কিন্তু হেক্টরকে দেখামাত্র সে ঘ্যান-ঘ্যানানি সুরু করল—আমি মোটেই হাঁটাচলা করতে পারছিনে। বাকী জীবনটা আমাকে এইভাবেই কাটাতে হবে দেখছি।

কথাটা শুনে হেক্টরের শিরায় শিরায় একটা ঠাণ্ডা শিহরণ জেগে উঠল। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা ক'রে রোগীর কথা জিজ্ঞাসা করল।

ডাক্তার বললেন—আমিও বুঝতে পারছিনে। ওকে বিছানা থেকে একটু তোলার চেষ্টা করলেই ও এমন চীৎকার ক'রে ওঠে যে আমরা ভয় পেয়ে যাই। তবু, ওকে বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই। যতক্ষণ না ও হাঁটতে পারছে ততক্ষণ ও রোগমুক্ত হয়েছে বলতে পারব না।

বৃদ্ধাটি তাদের আলোচনা বেশ মন দিয়ে শুনল। তার চোখের ওপরে ফুটে বেরোল একটা ধূর্ত চাউনি। এক সপ্তাহ কাটলো, দু' সপ্তাহ কাটলো ; দেখতে-দেখতে একমাস কেটে গেল। তবু, মাদাম সাইমনকে চেয়ার থেকে ওঠানো গেল না। তার খিধে চমৎকার—সেদিক থেকে কোন অভিযোগ তার নেই। স্বাস্থ্যও বেশ ফিরেছে। অন্যান্য রোগীদের সঙ্গেও সে বেশ গল্পগুজব করছে। পঞ্চাশ বছর ধরে ঘুঁটে কুড়ানোর পরিশ্রম ক'রে সে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। এই বিশ্রাম নেওয়ার পূর্ণ অধিকার তার যেন রয়েছে।

প্রতিদিনই হেক্টর আসে তাকে দেখতে। প্রতিদিনই বৃদ্ধা বলে—ভাল নয়, মোটেই ভাল নয়।

বাড়ি ফিরলে প্রতিদিনই হেক্টরের স্ত্রী তাকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছে ?

হতাশ হয়ে হেক্টর বলে—একই রকম। কোন উন্নতি নেই।

চাকরানীকে জবাব দিল তারা। সংসারের খরচ কমালো। অফিসের মনিবের কাছ থেকে বাড়তি সে যা পেয়েছিল সব খরচ হয়ে গেল। তারপরে একদিন হেক্টর চারজন ডাক্তারের সঙ্গেই মাদাম সাইমনের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করল। বৃদ্ধাটি তাদের কথা শুনল ; ধূর্তের মত তাকিয়ে রইল তাদের দিকে।

একজন ডাক্তার বললেন—ওকে হাঁটতে হবে।

হাঁটতে আমি পারব না।

তাঁরা তার হাত ধরে হাঁটাতে লাগলেন। কয়েক পা গিয়ে সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চীৎকার করতে-করতে মাটিতে বসে পড়ল। তাঁরা আবার তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। কোন অভিমত দিলেন

না তাঁরা; কিন্তু এটা বললেন যে জীবনে আর সে কাজ করতে পারবে না।

বাড়িতে এসে দুঃসংবাদটা দেওয়া মাত্র হেক্টরের স্ত্রী মাটিতে শুয়ে পড়ল প্রায়; তারপরে বলল—ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসাই ভাল। তাতে আমাদের খরচ কমই পড়বে।

আমাদের বাড়িতে? বলছ কী?

এছাড়া আর কী করতে পারি বল? নিশ্চয় এর জন্যে দায়ী আমি নই?

সহানুভূতি

[Sympathy]

বিষণ্ণ মনে লোকটি রিউ দে মার্টারস্-এর পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মেয়েটিও সেই একই পথ ধরল। লোকটি বৃদ্ধ—বয়স ষাটের কোঠায়; মাথায় টাক; টাকের ওপরে জীর্ণ একটা টুপী; দীর্ঘ শার্টের কলারে অর্দ্ধেকটা ঢাকা সাদা দাড়ি; ম্লান দুটি চোখ, বিমর্ষ মুখ, আর হলদে দাঁত।

মেয়েটির বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। তার চুলগুলি বিরল হয়ে এসেছে; তার পোশাকের রঙ বিবর্ণ; মনে হয় রাস্তার ধারে পুরানো কোন দোকান থেকে নামমাত্র দাম দিয়ে সেগুলি সে কিনেছে। লোকটি রোগা; মেয়েটি স্থূল, গোলগাল। লোকটির চেহারা একসময় ভালই ছিল। আত্মবিশ্বাস ছিল তার; ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সে ছিল স্থিরবিশ্বাসী; তাকে দেখে মনে হয় প্যারিসে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় পূর্ণ অংশ গ্রহণ করার জন্যে সব সময় সে প্রস্তুত হয়েছিল। আর মেয়েটি ছিল সুন্দরী। যৌবনে তাকে পাওয়ার জন্যে অনেকেই লালায়িত ছিল। সেদিন সে নিয়মিতভাবেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে বেড়াত।

তার এই বিষণ্ণ দিনগুলিতে এখনও মাঝে-মাঝে লোকটির যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়। প্রথম যেদিন সে প্যারিসে এল সেদিন একটা বাক্স করে সে এনেছিল এক বাণ্ডিল কবিতা আর কিছু নাটক। তখনকার সমস্ত সাহিত্যিকদের ওপরে বিরাট একটা অনীহা নিয়ে সেদিন সে ভেবেছিল—একমাত্র সে-ই তাদের সবাইকে ছাপিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে নাম করতে সক্ষম হবে। আর দুঃখের দিনে মেয়েটিও তার যৌবনের দিনগুলির কথা ভাবত। তার জন্মের কথা; ভাবত সেই সব তারই বন্ধু-বান্ধবদের কথা যারা

তারই মত পাপের পথে নেমেছিল, তারই মত যারা অন্য মহিলাদের প্রণয়ীদের ছিনিয়ে নিয়ে আসত; ভাবত সেই সব মধুর অথচ উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলির কথা যেদিন তার প্রেমিকের সংখ্যা ছিল অগণিত।

লোকটি জীবন সুরু করেছিল বেশ ভালভাবেই। গল্প-কবিতায় নাম অবশ্য সে করতে পারে নি; কিন্তু নাম করেছিল পরের কুৎসা রচনা করে। এই কুৎসা রচনায় তার কলম এতই দক্ষ হয়ে উঠেছিল যে বুলেভার্ডে সে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এর জন্যে কিছু ক্ষতিপূরণ তাকে অবশ্য দিতে হয়েছিল; দ্বন্দ্বযুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল কয়েকবার; কিন্তু তীক্ষ্ণধী আর সাহসী বন্ধু বলে তাকে স্বীকার করতে অনেকেই বেশ গর্ব অনুভব করত।

মেয়েটির-ও যশ একদিন তুঙ্গে উঠেছিল। যদিও তা সামান্য কিছুদিনের জন্যে। সে হয়ত ম্যারী পি—অথবা, ক্যামিলী এল–এর যশকে নষ্ট করতে পারে নি, তবু মেজাজী হোটেল আর কাফেতে তাকে নিয়ে অনেকেই হইচই করত। তারপর একদিন যে খবরের কাগজে আমাদের ওই বন্ধুটি তার কুৎসা প্রচার করে নাম কিনেছিল সেই খবরের কাগজটি উঠে গেল, কারণ তার চেয়ে বড় কুৎসা-রচনাকারী আর একজন ক্ষমতাশালী লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল। তার লেখা পড়ে, পূর্বতন লেখকের কুৎসাগুলি নিতান্ত জলো বলে সকলের ধারণা হয়েছিল। ফলে তাকে ছোট একটি কাগজের সঙ্গে যোগ দিতে হয়েছিল। তখন সে পরিণত হল দরিদ্র 'ম্যাচি''। প্রতিটি লাইনের জন্যে সে তখন এক পেনী করে মজুরি পেত।

একদিন ম্যারী পি, এবং ক্যামিলী এল–এর প্রতিদ্বন্দ্বিনী অসুখে পড়ল; অর্থ-সংকট ঘনিয়ে এল তার। আর 'কে-জানে-কে' বেশ্যাটি ডিনার খাওয়ার জন্যে পথে বেরোল; মনত্মার্টি হোটেলের বেশ গরম খানা খাওয়ার শখ হয়েছিল তার। এদিকে ম্যাচি'র আবার কাব্য আর নাটক লেখার শখ চাপলো। কিন্তু তার যৌবনের কবিতাগুলি ততদিনে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। অন্য ধরনের কাব্য রচনা করতে হবে তাকে; কিন্তু সে-ক্ষমতাও তার রয়েছে বলে সে হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে বসল। তার মাথার মধ্যে তখন অজস্র নতুন চিন্তা আর ভাবনা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনও ইচ্ছে করলে অনেক নামকরা সাহিত্যিককেই সে ঘায়েল ক'রে দিতে পারে। কিন্তু বিপদটা হচ্ছে কোথায় বসে সে লিখবে? তার সে সময়ই বা কোথায়? রোজকার খাবার যোগাড় করতেই তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছে; তাছাড়া রয়েছে তার কফি, জুয়া, আর এদিক-ওদিকের খরচ। পাতার পর পাতা লিখে যেটুকু সে পায় তাতেই তো তার পেট ভরে না সুতরাং বছরের পর বছর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও তার দারিদ্র্য আর ঘুচলো না; সে আগের মতই দরিদ্র রয়ে গেল।

মেয়েটিও ভাবত তার অবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে নতুন কোন প্রেমিকের সন্ধান পাওয়াটা এমন একটা কিছু কঠিন কাজ নয়। তার চেয়ে

দেখতে অনেক খারাপ মেয়েরাও কি সে-সুযোগ পায় নি? কিন্তু বিপদটা হচ্ছে তার যৌবন আর নেই। অন্য মেয়েমানুষরা তাদের পছন্দমত মনিব সংগ্রহ করতে পারে; তাকে প্রতিদিনই দর কমাতে হচ্ছে। এইভাবে মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে গেছে। সেই 'কে-জানে-কে' বেশ্যাটি এখনও সেই 'কে-জানে-কে'-ই রয়ে গেল।

হতাশায় মরীয়া হয়ে লোকটি সফল কোন মানুষকে লক্ষ্য করে মনে-মনে গজরাতো—কিন্তু যাই বল, ওই লোকটার চেয়ে আমি অনেক বেশী চালাক। দিনের পর দিন ক্লান্ত পথপরিক্রমার পরে যারা বিলাসের মধ্যে দিয়ে দিন কাটায় সেই সব বেশ্যাদের উদ্দেশ্য করে সেই মেয়েটিও বলত—কোন্ দিক দিয়ে ওই নচ্ছার বেশ্যাটা আমার চেয়ে ভাল?

এইভাবে ম্যাচি'র বয়স ষাট হল, তার মাথায় টাক গজালো; দাড়ি পাকল, দাঁত বেগনে হয়ে গেল। এইভাবে সকলের ওপরে ক্ষেপতে-ক্ষেপতে সে এক-দিন বুড়িয়ে গেল। আর 'কে-জানে-কে' বেশ্যাটির মাথায় চুল উঠতে লাগল—দাঁত পড়তে লাগল—পোশাক পরিচ্ছদ বিবর্ণ হয়ে উঠল; দরিদ্র পোশাক পরে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সে-ও সকলের ওপরে ক্ষেপে উঠল।

হায়রে, দুঃখের কী জ্বালা! পূর্বস্মৃতির কী ভয়ঙ্কর বেদনা। সেদিন সন্ধ্যায় লোকটি বিশেষভাবে মুষড়ে পড়েছিল। অতএব কষ্ট ক'রে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কাগজ সম্পাদনা করার জন্যে সে একমাসের আগাম মাইনে যে তিনশ ফ্রাঁ পেয়েছিল একটা বেশ্যার বাড়িতে গিয়ে সেই টাকা সে একেবারে উড়িয়ে দেয়েছে। মুষড়ে পড়ারই কথা, আর মেয়েটিও তার বান্ধবীর বাড়িতে বিনা পয়সায় অনেকটা বিয়ার খেয়ে কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল। তাছাড়া বাসায় ফিরে যেতে ভয়ও করছিল তার; কারণ সকালেই তার বাড়িওয়ালা নোটিশ দিয়েছিল সে যদি রাত্রির মধ্যে রোজ এক ফ্রাঁ ক'রে পনের দিনের বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে দিতে না পারে তাহলে তার সমস্ত আসবাবপত্র কেড়ে নিয়ে তাকে সে তাড়িয়ে দেবে।

এক কারণেই দুজনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। এই কারণেই মন তাদের বিষণ্ণ ছিল। কর্দমাক্ত পথের ওপরে একটা পথচারীও ছিল না। তার ওপরে অন্ধকার হয়ে আসছে; বৃষ্টি পড়তেও সুরু ক'রেছে। ড্রেণ থেকে বেরিয়ে আসছে পচা গন্ধ।

লোকটি মেয়েটির পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল। মেয়েটি যান্ত্রিক স্বরে বলল—হে সুন্দর অন্ধকারের পথিক, তুমি কি আমার বাড়িতে আজ আসবে না?

লোকটি উত্তর দিল—আমার কাছে কিছু নেই।

দৌড়িয়ে গিয়ে মেয়েটি তার একটা হাত ধরে বলল—মাত্র এক ফ্রাঁ। ওটা তোমার কাছে কিছুই নয়।

লোকটি ঘুরে দাঁড়াল—তাকালো মেয়েটির দিকে। মনে হল মেয়েটি দেখতে

ভালই—এবং স্বাস্থ্যবতী [স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের সে বেশী পছন্দ করে]; সে বলল—কোথায় থাক ? কাছাকাছি ?

রু লেপিক-এ।

কী ! আমিও তো সেইখানেই থাকি।

তাহলে তো ভালই হল। আমার সঙ্গে এস।

লোকটি পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখল মাত্র তিরিশটা সো তার কাছে রয়েছে। বলল : বিশ্বাস কর—এছাড়া আর কিছু আমার কাছে নেই।

মেয়েটি বলল—ওতেই হবে। এস।

বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল তারা; কেউ কোন কথা বলল না; তারা ভাবতেও পারল না যে তাদের দুটি জীবন একই খাদে বয়ে চলেছে, আর দুজনে একই সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে থাকার ফলে তারা তাদের সেই দুটি দুর্ভাগ্যকে একই সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

একটি অদ্ভুত ভোজনোৎসব

[An odd feast]

সময়টা শীতকাল। বছরটা আমার মনে নেই। জুলে দি ব্যানেভাইল সম্পর্কে আমার ভাই হয়। জুলে বিয়ে করে নি। নরম্যানডির একটা পুরানো খামারে একটি চাকর আর চাকরাণী নিয়ে সে একাই থাকত। তার বাড়িতে সেবার আমি গিয়েছিলাম। শিকার করার ঝোঁক আমার প্রচণ্ড। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমি কেবল শিকার করেই বেড়াতাম।

ধূসর রঙের পুরানো কেল্লাটির চারপাশে লম্বা লম্বা পাইন আর ওক গাছের অরণ্য। দেখলেই মনে হবে যুগ-যুগ ধরে জায়গাটি জনমানবহীন হয়ে রয়েছে। প্রাচীন আসবাব-পত্র আর জুলের পূর্ব-পুরুষদের ছবিগুলি এখানকার বড়-বড় প্রশস্ত ঘরগুলির একমাত্র বাসিন্দা। সেই ঘরগুলি এখন বন্ধ। এই বিরাট বাড়িটির বাসযোগ্য একটিমাত্র ঘর ছিল। সঙ্গে ছিল বিরাট একটা রান্নাঘর। ইঁদুরদের তাড়ানোর জন্যে তার দেওয়ালগুলিতে পলেস্তারা করা হয়েছিল। সেই ঘরটিতেই আমরা থাকতাম। ঘরের বড়-বড় সাদা দেওয়ালে নানা-জাতীয় বন্দুক আর শিঙা ঝুলানো থাকত। বিরাট চুল্লীতে কাঠের আগুন জলত। অপ্রীতিকর ঘরটির ভেতরে সেই চুল্লীর আলোই ছড়িয়ে পড়ত চার পাশে। প্রতিদিন রাত্রিতে আমরা আগুনের ধারে হাত পা ছড়িয়ে বসতাম। আমাদের কুকুরগুলি সেই বিস্তীর্ণ ঘরের মেঝেতে যদৃচ্ছা শুয়ে থাকত; ঘুমোত, ঘুমোতে ঘুমোতে চীৎকার করত। তারপরে ঝিমোতে ঝিমোতে

আমরাও একসময় শীতে হিহি করতে-করতে বিছানার ওপরে চলে পড়তাম।

সেদিন খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল। আমরা যথারীতি আগুনের ধারে বসে-ছিলাম। একটা খরগোস আর দুটো প্যাট্রিজ তখন সেদ্ধ হচ্ছিল। তাদের সুগন্ধ ভরিয়ে দিয়েছিল আমাদের নাক।

জুলে বলল—যে ঠাণ্ডা পড়েছে আজ ঘুমানো খুব কষ্টকর হবে।

উদাসীনভাবে আমি বললাম—তা বটে; তবে কাল সকালে শিকার পাওয়া যাবে প্রচুর।

পরিচারিকা একপাশে আমাদের খাবার দিয়ে আর একপাশে তাদের খাবার সাজালো। তারপরে সে জিজ্ঞাসা করল—আজ যে ক্রিশমাস ইভ তা কি আপনারা জানেন?

সে-খেয়াল আমাদের আদৌ ছিল না। তাই আমরা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালাম।

জুলে বলল—তাই বুঝি গির্জায় ঘণ্টা পড়ছে। আর রাত্রিতে তাহলে গির্জায় ভজন হবে?

হ্যাঁ, স্যার। তবে বুড়ো কোরনেল মারা গিয়েছে। বেল বাজার সেও কারণ একটা।

কোরনেল একটি বুড়ো মেষপালক—এ অঞ্চলে বেশ পরিচিত। বয়স তার হয়েছিল ছিয়ানব্বই। একমাস আগেও তার কোন অসুখ ছিল না। তারপর একদিন রাতের অন্ধকারে সে পুকুরে পড়ে যায়। সেই থেকে তার ঠাণ্ডা লাগে: আর তাইতেই সে মারা গিয়েছে।

জুলে আমাকে বলল—তোমার ইচ্ছে হলে ডিনার সেরে এই দরিদ্র লোকটিকে একটু দেখে আসতে পারি।

বৃদ্ধটির সংসারে আছে এক নাতি; বয়স তার আটাশ। তার স্ত্রীর বয়স এক বছর কম। তার ছেলেমেয়েরা অনেক আগেই মারা গিয়েছে। গ্রামে ঢোকার পথে একটা একেবারে রদ্দি বাড়িতে তারা বসবাস করত।

নির্জন বাড়িতে ক্রিশমাস ইভ সত্যিই বোধ হয় মানুষকে উৎসাহিত করে। যাই হোক, সেদিন আমরাও বেশ গল্প করলাম। ডিনার শেষ করতে-করতে বেশ রাত হয়ে গেল আমাদের। চাকররা চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ ধরে আমরা পাইপের পর পাইপ টানতে লাগলাম, স্মৃতিচারণা করলাম; আলোচনা হল পরের দিনের শিকার কাহিনী নিয়ে। চারপাশের নির্জনতা আমাদের দুজনকে খুব কাছাকাছি টেনে নিয়ে এল। দুটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই আমরা পরস্পরের কাছে এগিয়ে এলাম।

চাকরটি ফিরে এসে বলল—আমি গির্জায় যাচ্ছি, স্যার।

জুলে বলল—কী ব্যাপার! এত তাড়াতাড়ি?

বারটা বাজতে আর মিনিট পনের বাকি আছে স্যার।

জুলে বলল—তাহলে আমরাও উঠি চল। মধ্যরাত্রির ভজন শুনতে বেশ ভালই লাগে।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। তারপরে বেশ ভাল ক'রে দেহগুলিকে জড়িয়ে আমরা গ্রামের দিকে যাত্রা করলাম। ঠাণ্ডাটা ভীষণ পড়েছে; কিন্তু রাত্রিটি বেশ পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। বরফজমা মাটির ওপরে চাষীদের কাঠের জুতোর শব্দ হচ্ছে; আর হচ্ছে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি। রাস্তার ওপরে এখানে-ওখানে বিন্দু-বিন্দু আলোর নাচন সুরু হয়েছে। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের পথ দেখানোর জন্যে চাষীরা লণ্ঠন নিয়ে চলেছে। গ্রামের কাছাকাছি আসতেই জুলে বলল: এখানেই ফোরনেলরা থাকে। চল, ভেতরে যাই।

বারবার দরজায় ধাক্কা দিলাম আমরা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। একজন চাষী আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বলল—ওরা কেউ বাড়ি নেই। ঠাকুর্দার আত্মার জন্যে প্রার্থনা করার জন্যে তারা সব গির্জায় গিয়েছে।

আমরা গির্জায় ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই ভজন সুরু হল। অজস্র ছোট-ছোট বাতি জ্বালানো হয়েছে চারপাশে। বাঁদিকে ছোট একটি চ্যাপেল; তারই মধ্যে যীশুর জন্ম মুহূর্তটি দেখানোর জন্যে ছটি মোমের মূর্তি গড়া হয়েছে। পুরুষরা মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে; গভীর শ্রদ্ধায় মেয়েরা হাঁটু মুড়ে বসে হাত দুটি জড়ো করে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে জুলে বলল—এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে। চল, বাইরে যাই।

শীতার্ত চাষীদের প্রার্থনা-সভায় রেখে আমরা বেরিয়ে এলাম; তারপরে নির্জন পথের ওপরে নেমে এসে আবার কথাবার্তা বলতে সুরু করলাম। ভজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা গল্প করলাম। তারপরে আমরা গ্রামে ফিরে এলাম। ফোরনেলদের ঘরের ভেতর থেকে ফিকে একটা আলোর রেখা বেরোচ্ছে।

জুলে বলল—মৃত আত্মাকে এরা পাহারা দিচ্ছে। আমাদের দেখলে এরা খুশিই হবে।

আমরা ভেতরে ঢুকে গেলাম। ছোট নিচু ঘরে একটিমাত্রই আলো জ্বলছিল। ঘরের মধ্যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। সেইখানে বিষণ্ণ মুখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে ফোরনেল আর তার স্ত্রী। ক্রিশমাস ইভের প্রিয় খাদ্য এক প্লেট পুডিং সামনে বসানো রয়েছে। সেটা থেকে টুকরো টুকরো করে কেটে রুটির সঙ্গে মিশিয়ে তারা খাবে। পুরুষের গ্লাসটি শূন্য হয়ে গেলে মেয়েটি সিডার ভর্তি মাটির কলসী থেকে সিডার নিয়ে আবার সেটা ভর্তি করে দেবে।

তারা আমাদের ভেতরে ডেকে তাদের সঙ্গে খাবার অনুরোধ করল। আমরা খেতে অস্বীকার করায় তারা যেমন খাচ্ছিল তেমনি খেতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে জুলে বলল—অ্যানথাইম, তোমার ঠাকুর্দা তাহলে মারা

গিয়েছেন!

হ্যাঁ স্যার। আজ বিকেলে।

কোন কথা খুঁজে না পেয়ে আমি বললাম—অনেক বয়স হয়েছিল। তাই না?

মেয়েটি বলল—হ্যাঁ, মরার বয়স তাঁর হয়েছিল। এ জগতে তাঁর আর কোন প্রয়োজন ছিল না।

বৃদ্ধটিকে একবার দেখার আমার একটা দুর্দান্ত ইচ্ছে জাগলো। আমি তাকে দেখতে চাইলাম। ওরা দুজনে হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। অর্থাৎ, মৃতদেহটি দেখানো উচিৎ হবে কিনা। জুলে তা লক্ষ্য করল। আরও জিদ চেপে গেল তার। তখন লোকটি সন্দেহজনক-ভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে ধূর্তের মত জিজ্ঞাসা করল—দেখে কী লাভ হবে স্যার?

জুলে বলল—কিছুই হবে না। কিন্তু আমাদের দেখতেই বা তোমরা দেবে না কেন?

কাঁধটা কুঁচকিয়ে লোকটি বলল—আমার কোন আপত্তি নেই, তবে এখন দেহটাতে ঠিক হাত দেওয়া যাবে না।

তারপরে আমরা নানা কথা ভাবলাম; কিন্তু তাদের কেউ নড়াচড়া করল না। চোখ নিচু করে বিষণ্ণ মুখে তারা চুপচাপ বসে রইল। মনে হল তারা যেন বলতে চায়—বাপু, তোমরা কেটে পড়।

জুলে অধিকার খাটিয়ে বলল—এস অ্যানথাইম, আমরা ঘরের ভেতরে যাই।

কিছু লাভ হবে না স্যার। সে ওখানে নেই—

কোথায় আছে?

মেয়েটি বাধা দিয়ে বলল—দেখুন স্যার, মৃতদেহ রাখার কোন জায়গা নেই আমাদের। তাই সকাল পর্যন্ত মৃতদেহটা আমরা ময়লা ফেলার ঝাঁপির মধ্যে রেখে দিয়েছি।

তারপরে টেবিলের খোলটা তুলে ফেলে সেই ফাঁকের মধ্যে সে বাতিটা ঢুকিয়ে দিল, ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, সে-ই বটে। মেষপালকের পোশাকে জড়ানো, রুগ্ন, অনেক দিনের শুকনো বাসী রুটির মতই সে তাল-গোল পাকিয়ে বাড়ির সমস্ত জঞ্জালের মধ্যে শেষ ঘুম ঘুমোচ্ছে। যে পাত্রের ভেতরে তার মৃতদেহটা রয়েছে সেই পাত্রের ওপরটা টেবিল হিসাবে ব্যবহার করছে তার নাতি।

মৃতদেহের এই অসম্মানে বেশ চটে গিয়ে ঘৃণামিশ্রিত স্বরে জুলে চেঁচিয়ে উঠল—বদমাশ কোথাকার! তাকে তার বিছানার ওপরে শুইয়ে রাখলে না কেন?

মেয়েটি কেঁদে ফেলল; তারপরে তাড়াতাড়ি বলল—মানে, কী করব বলুন! আমাদের বিছানা বলতে ওই একটা। ওইখানেই আমরা তিনজনে রাত্রে শুতাম। কিন্তু তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমরা দুজনে মেঝেতেই রাত কাটিয়েছি। মেঝেটা খুব শক্ত আর ঠাণ্ডা। সেই জন্যে আজ বিকেলে যখন তিনি মারা গেলেন তখন আমরা বলাবলি করলাম—মারা গেলে মানুষের কোন অনুভূতি থাকে না। সেই জন্যে ওঁকে আর বিছানার ওপরে শুইয়ে রেখে লাভ কী? ওই ময়লা ফেলার পাত্রও ওঁর কাছে যা—বিছানাও তাই।—মরা মানুষের সঙ্গে আমরা শুতে পারিনে। পারি কি?

ভীষণ ক্ষেপে বিরক্ত হয়ে জোরে দরজাটা ঝাঁকানি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জুলে। তার পেছনে বেরিয়ে এলাম আমি। হাসতে-হাসতে তখন আমার পেটে খিল ধরে গিয়েছে।

মঁসিয়ে জোকাস্তে

[Monsieur Jocaste]

মাদাম, এক সন্ধ্যায় ছোট একটি জাপানী ড্রয়িংরুমে বাবার একটি ব্যভিচারকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের মধ্যে যে বিরাট কলহ বেঁধেছিল সেকথা নিশ্চয় আপনার মনে রয়েছে। সেদিন আপনি যে আমাকে কড়া-কড়া কথা বলেছিলেন, সেদিন আপনি যে আমার ওপরে ভীষণ রাগ করেছিলেন সে সব কথা নিশ্চয় আপনি ভুলে যান নি। একথাও নিশ্চয় আপনার মনে রয়েছে সেদিন আমি বাবাকেই সমর্থন করেছিলাম। আপনি আমার ওপরে দোষা-রোপ করেছিলেন। আপনার বিরুদ্ধে আমি আপীল জানাচ্ছি।

আপনি বলেছিলেন আমি যাকে সমর্থন করেছিলাম সেই মানুষকে পৃথিবীর কেউ সমর্থন করতে পারে না। আজ আমি সেই কাহিনীটি সকলের সামনে বলছি।

নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচারকে অনেকেই সহ্য করতে পারে না কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষও রয়েছে যারা বুঝতে পারে যে অনেক সময় এমন অনেক দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে, চরিত্রের দিক থেকে যাদের তারা প্রতিরোধ করতে পারে না। চরিত্রের দুর্দান্ত আবেগে কুটোর মত সে ভেসে যায়।

ষোল বছর বয়সে মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল একটি নিষ্ঠুর প্রকৃতির বৃদ্ধের সঙ্গে। ব্যবসাদার বৃদ্ধটি মেয়েটির টাকার জন্যেই তাকে বিয়ে করেছিল।

মেয়েটির সুন্দর চেহারা, স্বপ্নিল তার চোখ দুটি—আনন্দময়ী; আদর্শ সুখ পাওয়ার জন্যে তার মনটা সব সময় আকুলি-বিকুলি করত। সেই আশা বিবাহিত জীবনে তার পূর্ণ হয়নি; ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল তার হৃদয়। হঠাৎ জীবনটা সে উপলব্ধি করল। সে বুঝতে পারল তার কোন ভবিষ্যৎ নেই, আর কোন আশা নেই তার। একটিমাত্র আশাই তার আত্মাকে তখন গ্রাস করে বসল। তার ভালবাসাকে সার্থক করে তুলতে চাই একটি সন্তান।

কিন্তু কোন সন্তানই তার হল না। দুটি বছর কেটে গেল। তারপর সে একটি যুবকের প্রেমে পড়ে গেল। যুবকটির নাম পেয়ারি মার্টেল। বয়স তার তেইশ। মেয়েটিকেও সে উন্মাদের মতই ভালবাসত।

শীতকালে একদিন সন্ধ্যায় মেয়েটির বাড়িতে তারা একা-একা বসেছিল। মার্টেল এসেছিল এক কাপ চা খেতে। একটা নিচু সোফার ওপরে আগুনের ধারে তারা পাশাপাশি বসেছিল। কথাবার্তা তারা প্রায় বলেই নি। কিন্তু দুটি হৃদয়ের মধ্যে প্রেম তখন তরঙ্গ ভঙ্গে নেচে-নেচে চলেছিল। দু-জোড়া ওষ্ঠাধরই তখন তৃষ্ণার্ত; বিস্তারিত হওয়ার জন্যে দুজনের বাহু দুটিও তখন কাঁপছিল। ড্রয়িংরুমের মধ্যে একটি আলোর শিখা চারপাশে একটি প্রহেলিকার সৃষ্টি করেছিল। কথা বলতে সত্যিই তারা বড় অস্বস্তি বোধ করছিল। তবু যখন তাদের চোখাচোখী হচ্ছিল তখন তাদের হৃদয় দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

কষ্ট ক'রে যে ভব্যতাকে বেঁধে রাখা হয়, প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসের সামনে সেই বাঁধ কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে? প্রকৃতির দুর্নিবার ধাক্কার কাছে কতক্ষণ মানুষ নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারে? ধীরে-ধীরে তাদের হাতগুলি পরস্পরকে স্পর্শ করল। এই যথেষ্ট। তারপরে আর তাদের ধরে রাখা গেল না। প্রবল আলিঙ্গনের মধ্যে হারিয়ে ফেলল নিজেদের।

মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হল। এর জন্যে দায়ী তার স্বামী না তার প্রেমিক বোঝা গেল না। সেই বা জানবে কেমন ক'রে? নিঃসন্দেহে এর পিতা তার প্রেমিকই।

হঠাৎ মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হল প্রসবের সময়ই সে মারা যাবে। সে বার-বার বলতে লাগল এই সন্তানটির জন্মের জন্যে যে দায়ী সেই এর ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ ভার নেবে; এর জীবনকে সম্পূর্ণ করে তুলতে কোন কিছু করতেই সে পিছ-পা হবে না—প্রয়োজন হলে অন্যায় পর্যন্ত। প্রসবের সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই তার মনে ওই এক চিন্তাই তোলপাড় করতে লাগল।

মেয়ের জন্ম দিয়ে সে মারা গেল।

যুবকটি দুঃখে দিশেহারা হয়ে গেল। এতটা অস্থির হয়ে উঠল যে কিছুতেই দুঃখটাকে সে ভেতরে চেপে রাখতে পারল না। মেয়েটির স্বামী হয়ত কিছু সন্দেহ করে থাকবে। হয়ত সে বুঝতে পেরেছিল এই মেয়েটি তার নয়। যাকে

সে এই মেয়েটির বাবা বলে সন্দেহ করেছিল তাকে সে বাড়িতে ঢুকতে দিল না। তার কাছ থেকে মেয়েটিকে সরিয়ে একটি গোপন জায়গায় পাঠিয়ে দিল।

তারপর অনেকগুলি বছর কেটে গেল।

মানুষে যেমন সাধারণত ভুলে যায় পেয়ারি মার্টেলও সবকিছু ভুলে গেল। সে অর্থ রোজগার করে ধনী হল ; কিন্তু আর কাউকেই সে ভালবাসতে পারল না। বিয়েও সে আর করল না। সুখী শান্ত সাধারণ মানুষের মতই সে দিন কাটাতে লাগল। তার মৃতা প্রেমিকার স্বামীর কাছ থেকে আর কোন সংবাদ সে পায় নি। তার মেয়েটিও যে কোথায় তা-ও সে জানতে পারেনি।

তারপরে প্রায় একটি অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে একদিন সে একটি চিঠি পেল। সেই চিঠিতেই সে বুঝতে পারল তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বামীটি মারা গিয়েছে। খবরটা পেয়েই সে বিব্রত হয়ে উঠল—মেয়েটার জন্যে অনুশোচনায় ভরে উঠল তার মন। মেয়েটা কোথায় রয়েছে, কেমন রয়েছে কিছুই জানে না সে। তারপরে অনুসন্ধান করে জানল মেয়েটি রয়েছে তার এক কাকীর কাছে, কাকীটি বড় দরিদ্র।

মেয়েটিকে সে দেখতে চায়, সাহায্য করতে চায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন তার কাকীর বাড়িতে হাজির হল পেয়ারি।

সে তার নাম বলল। কিন্তু সে নামের কাউকেই তারা চিনতে পারল না। পেয়ারির বয়স চল্লিশ ; কিন্তু চেহারায় এখনও সে যুবকের মতই। তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। পাছে ভবিষ্যতে কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক হয় এই ভয়ে সে বলতে পারল না যে তার মায়ের সঙ্গে তার একদিন পরিচয় ছিল।

ছোট ড্রয়িংরুমে সে বসেছিল উৎকণ্ঠা নিয়ে। কিন্তু মেয়েটি যখন সামনে এসে দাঁড়াল তখন সে স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে গেল। এ কে? একি তার মেয়ে? না, সেই মৃতা নারীর আত্মা? এই মেয়েটির বয়স সেই মেয়েটিরই মত। সেই চোখ, সেই মুখ, সেইরকম চুল, সেইরকম চেহারা, সেইরকম হাসি, সেইরকম স্বর, কথা বলার ধরণ। মায়া, না মতিভ্রম? যাই হোক, এই সাদৃশ্য দেখে পেয়ারি একেবারে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। মৃতা প্রেমিকার ওপরে তার সমস্ত ভালবাসা তার বুকের তটে উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেল। করমর্দন করল তার।

বাড়িতে ফিরে আসার পরে তার সেই পুরানো ক্ষতটা আবার টনটন ক'রে উঠল। উন্মাদের মত সে কাঁদল। যে নারীটি মারা গিয়েছে তার জন্যে সে দুহাতের মাঝখানে মাথাটা চিপে কাঁদতে লাগল। তার স্মৃতি আবার ফিরে এল। সে যে সব কথা বলত, যে ভাবে বলত সবই মনে পড়ে গেল তার। সে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল। সেই দুঃখ থেকে তার আর মুক্তি নেই।

মেয়েটির বাড়িতে সে আবার গেল। তাকে না দেখে, তার মিষ্টি কথা না

শুনে সে পারল না। ফল হল, তার চিন্তার মধ্যে এই দুই নারী কেমন একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে বসল। একজন মৃতা, আর একজন জীবন্ত। সময়ের দূরত্ব সে ভুলে গেল; মৃত্যুর কথা সে বিস্মৃত হল। একবারও সে ভাবতে চাইল না যে এই মেয়েটি সেই মেয়েটির মেয়ে। তালগোল পাকিয়ে সব একাকার হয়ে গেল। মেয়েটি যে দারিদ্র্য আর অসুবিধের মধ্যে রয়েছে সেকথা ভাবতে গিয়ে সে মেয়েটিকে আরও বেশী ভালবেসে ফেলল।

এখন সে কী করবে? টাকা দেবে? কী করে দেবে? টাকা দেওয়ার অধিকার তার কী রয়েছে? সে কি তার অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে? তার নিজের বয়স তো এমন কিছু বেশী নয়? সবাই তাকে মেয়েটির প্রেমিক বলে মনে করবে। তার কি সে বিয়ে দিয়ে দেবে? চিন্তাটা হঠাৎ মনে হতেই সে কেমন ভয় পেয়ে গেল। তারপরে সে শান্ত হল। কে তাকে বিয়ে করবে? এক কপর্দকও যে তার নেই।

মেয়েটির কাকী তার আসা-যাওয়া লক্ষ্য করলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে সে মেয়েটির প্রেমে পড়েছে। তাহলে সে অপেক্ষা করছে কেন? সে কি তা নিজেই জানত?

একদিন সন্ধ্যায় পাশাপাশি একটি সোফার ওপরে বসে তারা ফিস ফিস করে গল্প করছিল। বাবা যেমন করে তার মেয়ের হাত ধরে সে-ও সেইরকম হঠাৎ মেয়েটির হাত ধরল। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার হৃদয় আর অনুভূতি উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়েটি তার হাত সরিয়ে নিল না দেখে সেও জোর করে তার হাতটা সরিয়ে দিতে পারল না। কিন্তু সে দুর্বল হতে লাগল। হঠাৎ মেয়েটি তার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল কারণ তার মা তাকে যেমন ভালবাসত সেও পেয়ারিকে ঠিক তেমনি ভালবেসেছিল। তার মায়ের কাছ থেকেই সে তার এই ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী প্রবণতা লাভ করেছিল।

জ্ঞানগম্য হারিয়ে পেয়ারি মেয়েটির সুন্দর চুলগুলির ওপরে চুমু খেল। নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে মাথাটা তুলতেই তাদের চার চোখের মিলন হল।

মাঝে-মাঝে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। তারাও উন্মাদ হয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে পেয়ারি সোজা হাঁটতে লাগল। কী করবে কিছুই সে ভেবে পেল না।

মাদাম, তখন আপনি ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে বলেছিলেন—আত্মহত্যা ছাড়া তার আর কোন পথ ছিল না।

আপনার সেই কথাটা আজও আমার মনে রয়েছে। আমি তখন প্রশ্ন করেছিলাম—আর মেয়েটি? মেয়েটিকেও কি পেয়ারির হত্যা করা উচিত ছিল?

মেয়েটিও যে তাকে পাগলের মত ভালবাসে। একটি উদ্দাম কামনা সেই

অপাপবিদ্ধা নারীটিকে যে পুরুষের বুকের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল। সে এমন কাজ করল কেন? করল এই জন্যে যে তার সমস্ত সত্তায়, ধমনীর শিরায় শিরায় যে মাদকতা জেগে উঠেছিল, তাকে সে সংযত করতে পারে নি। যৌবনজল-তরঙ্গকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার তখন ছিল না। ছিল না বলেই তার প্রেমিকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল সে।

পেয়ারি যদি আত্মহত্যাই করত তাহলে মেয়েটির কী হোত?···সে মারা যেত···অসম্মানের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে···হতাশায়···ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে সে মারা যেত।

সে এখন কী করবে?

মেয়েটিকে পরিত্যাগ করে তার জন্যে একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে?··· তাহলে সে মরে যাবে। তার কাছ থেকে কোন টাকা না নিয়ে, আর কাউকে বিয়ে না করে, গভীর দুঃখেই সে মারা যাবে। কারণ, সে যে পেয়ারিকেই প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে। পেয়ারিই তো তার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে, নষ্ট করেছে তার আনন্দ, লুটে নিয়েছে বেঁচে থাকার তার সমস্ত রসদ। তারই জন্যে মেয়েটি সারা জীবন ভুগবে; শেষ পর্যন্ত সেই শোকে তার মৃত্যু পর্যন্ত হ'তে পারে।

তাছাড়া, সে নিজেও যে মেয়েটিকে ভালবাসে। তবে সেই ভালবাসায় সে নিজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সে তারই মেয়ে। তা হোক। মেয়েটিকে সে তার মায়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য করেই দেখেছে। শুধু তাই নয়, মেয়েটি তার কাছে আরও অনেক বেশী! তার মনের মধ্যে দুটি ভালবাসা এক হয়ে গিয়েছে।

তাছাড়া, সে কি সত্যি-সত্যি তারই মেয়ে? তাতেই বা কী আসে যায়? কে তা জানে?

সেই মৃতা মহিলার আকৃতি তার স্মৃতিপথে ভেসে উঠল—পেয়ারি প্রতিজ্ঞা করেছে তার সমস্ত জীবন দিয়ে সন্তানটিকে সুখে রাখবে। তার জন্যে তাকে যদি কিছু অন্যায়-ও করতে হয় তাতেও সে পিছপা হবে না। সন্তানকে সুখী করাটাই হবে তার প্রথম আর প্রধান কাজ।

পেয়ারি মেয়েটিকে এত ভালবাসত যে সে আর কোনদিকে তাকাল না। যন্ত্রণায় গোঙাতে-গোঙাতে কামনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে সে এই অন্যায় করল; যে অন্যায় ক'রে মানুষের অন্তরাত্মা গভীর আত্মপ্রসাদে ভরে ওঠে।

তার বাবা মারা গিয়েছে। তার আর কোন সাক্ষী নেই।

সে বলল—তবে তাই হোক। গোপন পাপ আমার হৃদয়টাকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিক। ও যখন কোন সন্দেহ করছে না তখন এই পাপের বোঝা আমি একাই বয়ে বেড়াব।

তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

তারা সুখী হয়েছে কিনা তা আমি জানিনে। কিন্তু মাদাম, আমি নিজেও ওই অবস্থায় পড়লে ওই কাজই করতাম।

বার্ধক্যের দ্বারদেশে

[Going old]

কোন এক বসন্তের সন্ধ্যায় প্যারিসের একটি কাফেতে বসে দুই বন্ধু নৈশভোজনের পর গল্প করছিল। এই ধরনের মিষ্টি বসন্ত সন্ধ্যায় যখন চারদিক হতে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে মৃদুমন্দ বাতাস বয়, নদীর জলের উপর চাঁদের আলো ঝরে পড়ে তখন অজানা আনন্দের এক মত্ততা অনুভব করে না এমন লোক খুব কমই আছে।

দুই বন্ধুর মধ্যে একসময় হেনরি সাইমন বলল, আমি কেমন যেন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আমার বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু এর মধ্যেই আমি আর কোন কিছুতে আনন্দ খুঁজে পাই না। কোন কিছু আর আগের মত ভাল লাগে না।

দ্বিতীয় পিটার গার্নিয়ার বলল, আমার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হলো। তবু আমার মন কিন্তু আগের মতই আছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে বুঝতে পারি আমিও বুড়ো হয়ে পড়েছি। কিন্তু কেমন করে তা বুঝতে পারি না। কী আশ্চর্যের কথা দেখ, কোন মানুষ অনবরত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও সে বুঝতে পারবে না কিভাবে তার যৌবন তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। কিভাবে সে দিনে দিনে এগিয়ে গিয়ে বার্ধক্যের দ্বারদেশে এসে হাজির হয়।

আমি যে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি সেটা আমি একটা ঘটনার মাধ্যমে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসি আর এই আবিষ্কার আমাকে এমনই অভিভূত করে তোলে যে পাঁচ ছ মাস হলো এর জন্য এক তীব্র মনোকষ্ট ভোগ করি আমি। তারপর কোনরকমে নিজেকে মানিয়ে নিই।

জীবনে আমি কয়েকবার কয়েকটি মেয়েকে ভালবাসি। পুরুষের জীবনে প্রায়ই এই ধরনের একাধিক প্রেমের আনাগোনা দেখা যায়। আর আমরা এটাকে সহজভাবেই ধরে নিই। কিন্তু একটি প্রেমের কথা আমি ভুলতে পারিনি জীবনে।

মেয়েটি ছিল বিবাহিত। নাম মাদাম জুলি লেফিভার। তার সারা দেহে

ও চুলে, চোখে, গালে, নাকে সর্বত্র এক আশ্চর্য রূপলাবণ্য এমনভাবে ঢেউ খেলে বেড়াত যে তার চেয়ে সুন্দরী আর আমি দ্বিতীয় জন কোথাও খুঁজে পাইনি। তার স্বামী অন্যত্র চাকরি করত। প্রতি শনিবার বাড়ি আসত। রবিবার থেকে সোমবার চলে যেত।

তার সঙ্গে আমার প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠার পর তিনটি মাস ভালভাবেই কেটে যায়। তারপর কাজের খাতিরে আমাকে হঠাৎ আমেরিকা চলে যেতে হয়। তাকে ছেড়ে যেতে মন আমার চাইছিল না। কিন্তু কোন উপায় ছিল না।

কিন্তু সুদূর আমেরিকা গিয়েও তাকে ভুলতে পারিনি আমি। তার কথা রোজ আমার মনে পড়েছে। তার দেহের ছবিটা অনবরত আমার চোখের সামনে ভেসেছে। এইভাবে বারোটা বছর কাটাবার পর দেশে ফিরে আসি। দেশে ফিরে জুলির কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হয়নি। তার দেখা পাইনি।

একদিন সন্ধ্যের সময় লাফেত্তে অঞ্চলে এক বাড়িতে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ট্রেনে উঠেই দেখি এক মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা চারটি মেয়ে নিয়ে আমার কামরায় এসে উঠে বসল। আমি তাকে চিনতে পারিনি। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ সেই মহিলা আমার কাছে এসে বলল, তোমার নাম মঁসিয়ে গার্নিয়ার না?

আমি বললাম, কিন্তু আমি ত আপনাকে চিনতে পারছি না। মুখখানা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। তবু ঠিক মনে করতে পারছি না।

মহিলাটি তখন বলল, আমার নাম মাদাম জুলি লেফিভার!

আমি এক অপ্রত্যাশিত আঘাতের ঘায়ে চমকে উঠলাম ভীষণভাবে। আমার সেই জুলি! সেই রূপলাবণ্যময়ী আমার অন্তরের রাণী জুলি আজ চারটি সন্তানের জননী পৃথুলাদেহী এক গৃহিণী। তার সেই যৌবনের লেশ-মাত্র নেই তার দেহে।

আমার চোখে জল এল। আমি তার একখানি হাত ধরলাম। তার হাতের উপর আমার চোখের জল ঝরে পড়ল। জুলি বলল, এখন আমি একেবারে বদলে গেছি না? তুমি যাওয়ার দু'বছর পর আমার প্রথম সন্তান হয়। পরপর চারটি মেয়ে। আমার প্রথম মেয়ের বয়স দশ। তোমাকেও যেন চেনা যায় না। তোমার দেহেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

সেইদিনই আমি বাড়ি ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি আমার বয়স হয়েছে। আমার সেই যৌবন আর নেই, যদিও এখনো আমার মন জুড়ে আছে সেই হারানো যৌবনের অনেকখানি উত্তাপ।

মোহমুক্ত

[The charm dispelled]

নৌকোটা যাত্রীতে ভরে উঠল। বাতাস অনুকূল থাকায় হাভারের যাত্রীরা ক্রভিল যাবার জন্য নিশ্চিন্তে চেপে বসল নৌকোটায়। আর জায়গা না থাকায় ক্যাপ্টেন বাঁশি বাজিয়ে নৌকোটা ছেড়ে দিল। যাত্রীরা হাত ও রুমাল নেড়ে উৎসাহের সঙ্গে তাদের আত্মীয় স্বজনদের বিদায় জানাতে লাগল। যেন তারা অনেক দূর দেশে যাচ্ছে।

তখন জুলাই মাস। উত্তপ্ত সূর্যের কিরণ ঝরে পড়ছিল জলে। সেন নদী-টাকে বাঁ দিকে ফেলে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম সমুদ্রের দিকে। নৌকোর উপর উঠেই আমি ডেকের যাত্রীদের মধ্যে আমার পরিচিত কোন মুখের খোঁজ করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন আমার নাম ধরে ডাকল। ঘুরে দেখলাম তার নাম হেনরি সিদোনিক। তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ দশ বছর দেখা নেই।

তার সঙ্গে প্রথম করমর্দনের পর দু'জনে বোটের মধ্যেও খাঁচার ভালুকের মত এক পা এক পা করে কিছুটা বেড়ালাম। আমাদের নৌকোটায় ইংরাজ যাত্রী বেশী ছিল। বিশেষ করে ইংরেজ মেয়েযাত্রী ছিল বেশী। সাপের মত বিনুনি করা চুলের উপর টুপী মাথায়, সাদা স্কার্ট আর নীল জুতো মোজা পরা তরুণী ইংরেজ মেয়েদের দেখে মনে হচ্ছিল ইংরেজরা সত্যিই নৌশক্তিতে সুদক্ষ। আমার বন্ধু সিদোনিক কিন্তু ইংরেজ যাত্রীদের পানে বারকতক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, এত ইংরেজ ফরাসীদেশে ছিল? কোথায় যাচ্ছে?

আমি বললাম, ওরা সবাই যাচ্ছে ক্রভিল। কিন্তু তুমি ওদের দেখে বিরক্ত হচ্ছ কেন?

সিদোনিক বলল, আমি ওদের বিষয়ে ভালই জানি। তুমি হয়ত জাননা, আমি নিজে একজন ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করেছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, তাহলে আমাকে তোমার বিবাহিত জীবনের সব কথা বল। তোমার ইংরেজ স্ত্রী কি তোমার জীবনে কোন অশান্তি সৃষ্টি করেছে? সে কি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে?

সিদোনিক বলল, না, তা ঠিক না। তবে তাকে ঠিক আমার আর ভাল লাগে না। তার কথা শুনলেই বিরক্তি বোধ হয়।

আমি বললাম, তোমার বিরক্তির কারণ কি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সিদোনিক তখন বলল, তাহলে শোন বলছি সব কথা। বছর ছয়েক আগে

আমি একবার এশিয়াতে গ্রীষ্মটা কাটাতে যাই। আমি ছিলাম একা। জীবনে বিয়ে করার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ছিল না আমার। নিঃসঙ্গ জীবনযাপনই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু আমার সে লক্ষ্যের পথে বাধ সাধল এত্রিয়াতের সমুদ্রতীর। সমুদ্রে স্নানরতা অথবা স্নানান্তিকা অথবা প্রশস্ত বেলাভূমিতে স্বল্পাবৃত অবস্থায় শায়িতা তরুণী মেয়েদের দেখে কোন অবিবাহিত যুবকের কখনো মাথার ঠিক থাকতে পারে না। প্যারিসে যেমন বয়স্ক মেয়েদের ভিড় বেশী তেমনি এত্রিয়াতের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে দেখবে তরুণী মেয়েদের ভিড়। তার উপর যদি তুমি দেখ তোমার সামনে সমুদ্রের উদার বেলাভূমিতে আঠারো বছরের এক সুন্দরী তরুণী ছুটে বেড়াচ্ছে অথবা পথের ধারের কোন ফুলগাছ হতে ফুল তুলছে তাহলে তুমি কখনই তোমার কৌমার্য রক্ষা করতে পারবে না।

এমন সময় এক ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায়। পরিবারের ছয়জন লোকের মধ্যে বাবা মা আর চারটি ছেলেমেয়ে। দুটি ছেলে বড় হয়েছে, অন্য দুটি মেয়ের মধ্যে একটি বড় অন্য একটি সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়েছে। এই ছোট মেয়েটির রূপে মন আমার মজে গেল। আমার সারা জীবনের সব স্বপ্ন সব আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে দেখা দিল তার দু'চোখের তারায়। আমি সব ভুলে গেলাম। ওলট পালট হয়ে গেল আমার জীবনের সব লক্ষ্য।

আমাদের ফরাসী জাতির একটা দোষ কি জান। তারা বিদেশীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে। মেয়েটি বিদেশিনী বলেই হয়ত তাকে বেশী করে ভালবেসে ফেললাম। তার মুখে ভাঙা-ভাঙা ফরাসী ভাষা শুনতে তখন খুব ভাল লাগত আমার। কিন্তু কি আশ্চর্য! এখন তার মুখে সেকথা শুনতে আর মোটেই ভাল লাগে না। আর শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে আজও নির্ভুলভাবে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারে না।

আমি বললাম, তোমার স্ত্রী এখন কোথায় আছে?

সিদোনিক বলল, তাকে এখন এত্রিয়াতেই রেখে এসেছি। আমি এখন যাচ্ছি ক্রভিলে। কিছুদিন একা একা বেড়াব।

কথায় কথায় ক্রভিলের বন্দর এসে গেল। সিদোনিক নামার আগে আমায় বলল, যারা বিয়ে করেনি তারা বেশ ভাল আছে। তুমি ধারণা করতে পারবে না বিবাহিত লোকদের জীবনে তাদের স্ত্রীরা এক এক সময় কী ধরনের বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

ম্যাদময়জেল

[Mademoiselle]

তার নাম ছিল জঁা মেরি ম্যাথিউ ভেলার। কিন্তু লোকে তাকে বলত, ম্যাদ্‌ময়জেল, যা বলা হয় কোন কুমারী মেয়ের নামের আগে। ছোটবেলায় তার চেহারাটা ফর্সা আর রোগা রোগা ছিল বলে তার মা আর ঠাকুরমা তাকে ম্যাদময়জেল বলে ডাকতেন। মা ঠাকুরমা মারা গেলেও সেই নামটা বাইরে প্রচারিত হয়ে যায়। তাই গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সকলেই তাকে ম্যাদময়জেল বলে ডাকে। এমন কি ওর পোশাকটাও ছিল মেয়ের মত। ও সাধারণতঃ পরত লম্বা ফ্রক আর টুপী। দেখলেই একনজরে মেয়ের মতই মনে হয়।

ওকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা উপহাস করলেও ওর থাকা খাওয়ার কোন ভাবনা ছিল না। পরের কাছে হাত পাততেও হত না। মা ওর জন্ম কিছু সম্পত্তি রেখে যান। তার থেকেই ওর চলে। ওর বাবার এক কাকা আছেন। তিনিই ওকে ছোট থেকে মানুষ করে তোলেন।

গাঁয়ের কোন উৎসবে ওর বয়সের ছেলেরা যখন এক একজন মেয়ের হাত ধরে নাচত ও তখন একা নাচত। কেউ যদি কখনও বলত তুমি কোন মেয়ের সঙ্গে নাচ না কেন, ও তখন বলত, আমি ত ছেলেদের মত পোশাক পরে নেই তাই একাই নাচি।

কেউ কেউ ওকে বলত, তোমাকে চমৎকার মানিয়েছে মেয়ে বলে।

ও বলত, লোকে আমাকে মেয়ের পোশাকে দেখে মজা পায় বলেই আমি এ পোশাক পরি। ইচ্ছা করেই পরি।

একদিন ওর কি মনে হলো, ও সকালে উঠে পুরুষের পোশাক পরে বার হলো গাঁয়ের পথে। একটা পায়জামা, একটা কোট আর মাথায় পুরুষের টুপী। কিন্তু পথে বার হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা পিছু নিল ওর। সবাই তাড়া করল ওকে। ঠাট্টা টিটকারিতে অতিষ্ঠ করে তুলল ওকে। এমন কি বয়স্ক মানুষরাও নানা রকমের প্রশ্ন করতে লাগল ওকে।

মনে মনে রাগ করল ও। কেন ও ত সত্যি সত্যিই পুরুষ মানুষ। পুরুষের মত পোশাক পরে কি ভুল বা কি অন্যায় করেছে ও? অনেক ভাবনা চিন্তা করেও কিছু বুঝতে পারল না। ব্যাপকতর বিদ্রূপের ভয়ে ও পরদিন আবার মেয়ের পোশাক পরে বার হলো পথে। কিন্তু মনের মধ্যে ওর বিদ্রোহ রয়ে গেল। মনে মনে ঠিক করে রাখল, যে যাই বলুক ও যে পুরুষ একথাটা সমাজের সকলের সামনে প্রচার করবে একদিন জোর গলায়। ওর পুরুষত্বকে একদিন

সকলের চোখের সামনে প্রতিষ্ঠিত করবে। আর তার জন্ত উপযুক্ত স্বযোগ খুঁজতে লাগল ও।

গাঁয়ে যেদিন কোন নাচগানের উৎসব হত ও প্রায়ই শুনত ওর বয়সের ছেলেরা গর্ব করে বলত কে কোন মেয়েকে নিয়ে নেচেছে, কে কোন মেয়ের দেহটাকে উপভোগ করেছে। তারা আরও বলত যেসব ছেলেরা জোর করে এগিয়ে যায় সাহস করে মেয়েরা তাদের খাতির করে। ও দেখত নাচগানের পর মেয়েদের কোমর ধরে ছেলেরা অন্ধকার বনপথ ধরে চলে যাচ্ছে আপন আপন ঘরের দিকে। অনেক সময় সেই পথের ধারে অন্ধকারে আপন আপন প্রেমাস্পদের সঙ্গে নর্মক্রিয়ায়ও প্রবৃত্ত হয়ে পড়ত। ও এমন অনেকদিন দেখেছে।

একদিন রাত্রিবেলায় নাচগানের উৎসব শেষ হয়ে গেলে ম্যাদময়জেল সেই অন্ধকার বনপথের ধারে একা একা দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ জোশেফিন নামে একটি স্বন্দরী যুবতীকে সেই পথ দিয়ে যেতে দেখেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জোশেফিন তখন তাকে জোর করে ঠেলে ফেলে দিল। ম্যাদময়জেল তার গলাটা দু'হাত দিয়ে টিপে ধরে। জোশেফিন তখন ভয়ে চীৎকার করতে থাকে। তার চীৎকার শুনে পথচারীরা ছুটে আসে। তারা জোর করে ম্যাদময়জেলকে ঠেলে সরিয়ে দিলে সে উঠে এসে বীরদর্পে সকলের সামনে জোর গলায় বলে, আর আমি মেয়ে নেই। আমি পুরুষ। একথা আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি। জানিয়ে দিচ্ছি।

দার্শনিক

[A philosopher]

ব্লেরত ছিল আমার স্বদূর শৈশবের বন্ধু। সে আমার এত অন্তরঙ্গ ছিল যে জীবনের যতসব গোপন কথা অকপটে বিশ্বাস করে বলতে পারতাম তার কাছে। আর সেও সব অকুণ্ঠভাবে বলত আমার কাছে।

এ হেন অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্লেরত যখন একদিন বলল সে বিয়ে করতে যাচ্ছে তখন সত্যিই একটা অজানা অব্যক্ত ব্যথায় মনটা আমার ভরে গেল। মনে হলো তার বিয়ে হয়ে গেলে আমাদের দুজনের এই বন্ধুত্বের নিবিড়তা আর থাকবে না। মনে হলো, আমাদের দুজনের এই অবিচ্ছিন্ন অন্তরঙ্গতার মাঝখানে এক অনতিক্রম্য বাধা হয়ে তার স্ত্রী এগিয়ে আসছে। আরো মনে হলো জীবনে স্ত্রীর থেকে একদিক দিয়ে বন্ধু অনেক বড়। অনেক মানুষ স্ত্রীকে

তার জীবনের অনেক গোপন কথা বলতে পারে না। কিন্তু বন্ধুকে তা বলতে পারে।

ব্লেরতের বিয়েটা যখন রেজেস্ট্রী হয় তখন সেখানে আমি যাইনি। তবে চার্চে ও তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তার স্ত্রী সত্যিই সুন্দরী। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। সুন্দর চোখ মুখ। আমাকে পেয়ে ব্লেরত আবেগের সঙ্গে বলল, সত্যিই আমি সুখী। আমি সত্যিই আমার মনোমত স্ত্রী পেয়েছি। রূপে গুণে অদ্বিতীয়া অতুলনীয়া সে। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। দেখলাম সত্যিই গুণবতী তার স্ত্রী। প্রথম পরিচয়েই সে আপন করে নিল আমাকে। আন্তরিকতার সুরে বলল, আসবেন, এ বাড়ি নিজের মত মনে করবেন।

কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যেই দেশভ্রমণে বেড়িয়ে গেলাম। আঠারো মাস ধরে জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশ ঘুরে অবশেষে প্যারিসে ফিরে এলাম। ব্লেরতের কথাটা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম।

আসার পরদিনই আমি বুলভার্ড অঞ্চলে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখলাম ব্লেরত আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে চিনতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। এই ক'মাসের মধ্যে সে এমনভাবে বদলে যাবে চেহারায় আমি কোন মতেই ভাবতে পারলাম না।

কিন্তু ব্লেরত আমাকে চিনতে ভুল করেনি। আমাকে জড়িয়ে ধরে বদেভিল থিয়েটারের দিকে নিয়ে গেল। তার চেহারাটা অসম্ভব রকমের রোগা হয়ে গেছে, তার চোখগুলো কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে। মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে মত দেখাচ্ছিল। বেশীক্ষণ হাঁটতে বা কথা বলতে পারছিল না সে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

ব্লেরত বলল, ডাক্তার বলেছে এ্যানিমিয়া।

আমি বললাম, তুমি কোন মনোকষ্ট পাচ্ছ না ত?

ব্লেরত বলল, না, আমি খুব সুখে আছি। আমার স্ত্রী সত্যিই খুব ভাল মেয়ে। আমি তাকে আগের থেকে বেশী ভালবাসি।

আমি তবু জেদ ধরলাম, সব কথা আমাকে বল। কিছু গোপন করো না।

ব্লেরত প্রথমে কিছু বলতে চাইল না। এড়িয়ে যেতে লাগল বারবার। তার পর আমার অনেক পীড়াপীড়িতে বলল, বলব আর কি, কারো কোন দোষ নেই, আমার ভালবাসাই আমাকে দিনে দিনে হত্যা করছে।

আমি তার কথা বুঝতে পারলাম না। সে তখন আমাকে বলল, আমার স্ত্রীর প্রতি আমি এতই আসক্ত যে সেই আসক্তির আতিশয্যই আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি আর বেশীদিন বাঁচব না।

তখনও আমি তার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। সে বলল, রোজ ভাবি, না, এভাবে আর চলবে না, আমি কোথাও চলে যাব। দূরদেশে কোথাও।

তাহলে আমি বেঁচে যাব। কিন্তু যখনি বাড়ি ফিরে দেখি আমার স্ত্রী একা একা আমারই পথ চেয়ে বসে রয়েছে। যখন সে আমার মুখপানে গভীর দৃষ্টিতে তাকায়, যখন দেখি তার কম্পিত অধরোষ্ঠে চুম্বনের একটা তপ্ত পিপাসা উত্তাল হয়ে উঠেছে তখন আমি সব ভুলে যাই। তখন আমি তাকে আবার জড়িয়ে ধরি। আবার সেই নিষিদ্ধ দেহসংসর্গে লিপ্ত হই। এইভাবে আমার স্ত্রীর প্রতি উন্মত্ত আসক্তির রূপ ধরে আমাকে ধীরে ধীরে জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি এর পরিণতি কোথায়। কিন্তু কোন-মতেই নিবৃত্ত করতে পারছি না নিজেকে।

আমি বললাম, এক কাজ করো, তোমার স্ত্রীর কাছে এক প্রেমিক জুটিয়ে দাও। তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নাও।

কিন্তু কথাটা মনঃপূত হলো না রেরতের। সে উঠে গেল আমার কাছ থেকে।

তারপর থেকে ছ'মাস কোন খবর পাইনি রেরতের। একদিনও দেখা হয়নি কোথাও তার সঙ্গে। রোজ ভাবতাম তার শোকযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য একখানা চিঠি পাব যেকোনদিন। কিন্তু আমার সে ভাবনা ভুল হলো। ছ'মাস পর সত্যিই একদিন দেখা পেলাম রেরতের। দেখলাম তার স্বাস্থ্য ফিরে গেছে। চেহারার উজ্জলতা অনেক বেড়ে গেছে। আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু সে তার কোন উত্তর দিল না। সে জোর করে তার বাড়িতে সন্ধ্যের সময় ডিনার খাবার জন্য নিয়ে গেল আমাকে।

তার স্ত্রী আমায় আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল। রেরত ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, লুসিয়েঁ আসেনি এখনো ?

তার স্ত্রী বলল, না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক লম্বা ভদ্রলোক এসে খাবার টেবিলে যোগদান করল। আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল রেরত। আমি লক্ষ্য করলাম লুসিয়েঁ আর রেরতের স্ত্রীর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো অলক্ষ্যে। অথচ রেরতকে খুব খুশি আর নির্বিকার দেখা যাচ্ছিল।

খাওয়ার পর রেরত তার স্ত্রীকে বলল, আমি আমার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি। তোমরা থাক।

বাইরে বেরিয়ে এসে রেরত হঠাৎ আমায় বলল, চল না আজ সন্ধ্যায় কিছু মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করা যাক।

আমি উত্তরে করলাম, তোমার যা খুশি।

নারীর ফাঁদ

[Woman's Wiles]

নারী ? কি শুনতে চাও নারীদের সম্বন্ধে ? নারীর মত এমন কোন যাদুকর নেই যারা তাদের খেয়াল খুশিমত আমাদের ফাঁদে ফেলে আমাদের উপর চাতুরী খেলে নিজেদের কাজ হাসিল করে চলে যায়। তোমরা হয়ত বলতে পার অনেক সময় একাজ বাধ্য হয়েই করে নারীরা। আর তাছাড়া পুরুষরাও অনেক সময় অত্যাচার করে নারীদের উপর। কিন্তু পুরুষদের খেয়াল খুশি-গুলিকে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে কাজে লাগিয়ে তাদের সঙ্গে মিষ্টিভাবে প্রতারণা বা ছলনার খেলা খেলতে নারীদের মত আর কেউ পারবে না।

এ কথাগুলো বললেন ফ্রান্সের ভূতপূর্ব বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী কাউণ্ট ছ লিঁয়। লিঁয়র কথাগুলো একজন যুবক আগ্রহ সহকারে শুনছিল।

লিঁয় আবার বলতে শুরু করল, তুমি জান, আমাকে সাধারণ এক অশিক্ষিত গৃহস্থ স্ত্রীলোক আশ্চর্যভাবে ঠকায়। আমি তখন ছিলাম বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী। রোজ সকালে শ্যাম এলিসি অঞ্চলে হাওয়া খেতাম। সেখানে রোজ এক সুন্দরী রমণীকে গর্বভরে চলে যেতে দেখতাম। মেয়েটি যাবার সময় আমার প্রতি কটাক্ষ করে যেত। একদিন তাকে একটা বেঞ্চের উপর একা একা বসে থাকতে দেখে তার পাশে বসে আলাপ করলাম তাঁর সঙ্গে। প্রথম আলাপেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আমরা পরস্পরের। সে বলল, তার স্বামী সামান্য এক কেরাণীর কাজ করে। আমার পরিচয় শুনে সে চমকে উঠল।

পরদিন সে আমার দপ্তরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করল। তারপর থেকে রোজ আমাদের সকালে ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দেখা হতো। দেহ-মিলন হতো; বিশেষ করে রোজ সকালে পার্কে দেখা হতো আমাদের। তখন ঠিক হতো আবার কোথায় কখন দেখা হবে।

মাস দুই পরে একদিন সকালে দেখলাম, তার চোখমুখটা অস্বাভাবিক রকমের ভারী। মনে হলো, তার চোখের কোণে জল দেখা যাচ্ছে। আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হলো তোমার ?

সে বলল, আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছি।

আমি বললাম, তাতে কি হয়েছে। তুমি ত বিবাহিতা, তোমার স্বামী আছে।

সে বলল, আমার স্বামী আছে বটে, কিন্তু সে এখন ইটালিতে। ছ'মাস হলো এখানে নেই আর এখন সে আসবেও না।

তার কথাটা সত্যিই আমার বুকটাকে বিদ্ধ করল অতর্কিতে। আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। এই অবৈধ অবাঞ্ছিত পিতৃত্বের দায়িত্ব হতে মুক্ত করতে চাইলাম নিজেকে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল আমার মাথায়। বললাম, তুমি এখনি তোমার স্বামীর কাছে কোন একটা অজুহাতে চলে যাও।

দেখলাম সে রাজী। তবু তাকে ইতস্তত করতে দেখে বুঝলাম, সে কিছু টাকা চায়। তখন তার হাতে পথ খরচের জন্য কিছু টাকা দিয়ে বললাম, দেরী না করে অবিলম্বে সেখানে চলে যাও।

দিনকতক পর তার একখানা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, আমার স্বাস্থ্য ভালই আছে। তবে পেটটা মোটা হয়ে উঠেছে। আমার স্বামী কিছু সন্দেহ করেনি। প্রসবের সব ঝামেলা চুকে গেলে একেবারে দেশে ফিরব।

আট মাস পরে সে আবার জানাল একখানি চিঠিতে তার এক পুত্র সন্তান হয়েছে।

এর মাসখানেক পরেই সে একদিন আমার কাছে এসে হাজির। আমি মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে আমার রু দ্য গ্রেনেলের বাড়িতে বাস করছি। সে আবার আগের মত আমার কাছে আসতে লাগল। একদিন সে বলল, তুমি কিন্তু বড় নিষ্ঠুর, তোমার ছেলেকে একবারও দেখতে চাও না।

আমি বললাম, আমার দেখার দরকার নেই। তুমি বরং কিছু টাকা নাও। তার দেখাশোনা করো। তার খাওয়া পরার দিকে যত্ন রেখো।

কিন্তু সে আমায় এত চাপ দিতে লাগল যে একদিন আমি কথা দিলাম পরদিন সকালে আমি পার্কে গিয়ে আমার ছেলেকে দেখব, সে কোলে করে নিয়ে আসবে।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে আমি গেলাম না। ভাবলাম ছেলেটার যদি মায়ায় পড়ে যাই, মনে আবেগ আসে তাহলে মুস্কিলে পড়ে যাব। আমি না গিয়ে ভাইকে মেয়েটার ঠিকানা দিয়ে তার খোঁজ খবর নিতে বললাম। তাকে আদ্যোপান্ত সব কথা খুলে বললাম।

আমার ভাই তার ঠিকানা খুঁজে ঠিক তার বাসায় যায়। কিন্তু তখন সে বাসায় ছিল না বলে দেখা হয়নি। কিন্তু সেখানে আর যারা ছিল তাদের কাছে আমার ভাই অনেককিছু জানতে পারে। জানতে পারে তার কোন সন্তান আদৌ হয়নি। আর সে কোনদিন ইটালিও যায়নি। তবে তার স্বামী সত্যিই ভাল লোক এবং বরাবর এখানেই থাকে।

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার খুব রাগ হলো। মেয়েটা তাহলে প্রতারণা করেছে আমার সঙ্গে। ছলনার খেলা খেলেছে। আমি একটা দিন ঠিক করে আমার বাড়িতে আসতে বললাম তাকে। তারপর আমার ভাইকে বললাম, আমি থাকব না। তুমি নির্দিষ্ট সময়ে তার সঙ্গে দেখা করে তাকে

প্রশ্ন করে জানবে সে কেন প্রতারণা করেছে আমার সঙ্গে। তারপর এই দশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে বলবে এই টাকাটা আমি দিচ্ছি। আর যেন সে কখনো আমার কাছে না আসে।

যথাসময়ে সে আমার বাড়ি এলে আমার ভাই তাকে সব কথা বললে সে উত্তর করে, ছলনার আশ্রয় না নিলে কাউন্টের মত এতবড় লোককে তিন বছর আমার প্রেমে আবদ্ধ করে রাখতে পারতাম না। কাউন্ট সেদিন পার্কে গেলে আমি আমার এক দিদির ছেলেকে দেখাতাম।

আমার ভাইয়ের দেওয়া টাকাটা তুলে নিয়ে সে বলে, ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের। কাউন্ট কি আমার সঙ্গে আর দেখা করবে না ?

আমার ভাই উত্তর করে, না, আর কোনদিন না।

কিন্তু মেয়েটা তখন নির্বিকারভাবে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে যায় আমাদের বাড়ি থেকে। সুতরাং আবার বলছি এই ধরনের বাস্তুঘুঘুদের কখনো বিশ্বাস করবে না।

চন্দ্রালোক

[Moonlight]

মাদাম জুলি রুবেয়ার তার বোন মাদাম হেনরিয়েত্তে লেতোরের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। মাদাম হেনরিয়েত্তে সবেমাত্র সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ করে দেশে ফিরেছে।

মাদাম লেতোর সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফিরে তার স্বামীকে পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের গাঁয়ের খামারবাড়ি ক্যালভাডোসে। তাঁর সেখানে জরুরী কাজ আছে। স্বামীকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে প্যারিসে বোনের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। আর তারই জন্য অপেক্ষা করছে মাদাম জুলি রুবেয়ার। অন্যমনস্কভাবে একটা বই পড়তে পড়তে অপেক্ষা করছিল মাদাম জুলি।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সবেমাত্র ঘন হয়ে উঠতে শুরু করেছে এমন সময় সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। মাদাম লেতোর সোজা বাড়ি ঢুকে তার বোনের কাছে চলে এল। দুজনে দুজনকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল।

চাকরে বাতি দিয়ে গেলে সেই বাতির আলোয় মাদাম লেতোরের মাথায় ঘন কালো চুলের মধ্যে মাত্র দু গাছি সাদা চুল দেখে অবাক হয়ে গেল মাদাম রুবেয়ার। তার মনে হচ্ছিল মাদাম লেতোরের কালো চুলের অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে আশ্চর্য দুটি রূপালি জলের ধারা। অথচ মাদাম লেতোরের

বয়স মাত্র চব্বিশ। রুবেয়ারের থেকে দু বছরের বড়। মাদাম রুবেয়ার আরো দেখল তার দিদির মুখখানা কেমন যেন এক অব্যক্ত বিষাদে মলিন।

রুবেয়ার বলল, কি হয়েছে বলত ? তুমি যদি মিথ্যা কথা বল তাহলে পরে আমি সব তথ্য খুঁজে বার করব।

কাঁপা কাঁপা গলায় মাদাম লেতোর বলল, আমি একজনকে ভালবেসেছি। এই কথা বলে তার বোনের কাঁধের উপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মাদাম রুবেয়ার তখন তার দিকে বসার ঘর থেকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। দুজনে পাশাপাশি একটি সোফায় বসল। মাদাম লেতোর একটু শান্ত হয়ে তার সব কথা বলতে শুরু করল বোনের কাছে।

ওঃ, সেকথা কি বলব ! সেদিন থেকে আমার কেবলি মনে হচ্ছে আমি যেন পাগল হয়ে গেছি। খুব সাবধানে চলবি জুলি, আমার এই ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করবি। আমরা মেয়েরা দুর্বলমনা। অল্পতেই সব দৃঢ়তা গলে যায় আমাদের। মাঝে মাঝে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে এক ভাবময় বিষাদ আচ্ছন্ন করে ফেলে আমাদের মনকে। তখন কোন কিছু ভাল লাগে না। তখন শুধু মনে হয় অতি অন্তরঙ্গ মানুষকে দুহাত দিয়ে আলিঙ্গন করি, আর বুকে বুক দিয়ে মনের কথা সব খুলে বলি।

তুমি জান আমার স্বামী ভাল লোক, আর তাকে আমি কত ভালবাসি তাও জান। কিন্তু তার মনটা এমনই পাকা পরিণত আর দৃঢ় যে সে আমাদের নরম মনের সূক্ষ্ম মধুর অনুভূতিগুলোর কথা কিছুই বুঝতে পারে না। কতবার মনে হয়েছে আমার স্বামী আমাকে দুহাত দিয়ে আগ্রহভরে জড়িয়ে ধরে অসংখ্য চুম্বনে আমার মুখখানা ভরিয়ে দিক। আমাদের দুটো সত্তা এক হয়ে যাক সেই আলিঙ্গন আর চুম্বনের মাঝে। কতবার মনে হয়েছে আমার স্বামী বড় একা। আমার নিবিড়তর সাহচর্য তাঁর দরকার। আমি তাঁকে আদর করি চুম্বন করি ! তাঁর শীতল একাকীত্বটাকে উত্তপ্ত করে তুলি আমার সান্নিধ্যের নিবিড়তায়।

এগুলো বোকামির কথা বলে মনে হতে পারে অনেকের। কিন্তু আমার যা যা সত্যি সত্যিই মনে হয়েছে আমি তাই বলছি। স্বামীর সঙ্গে প্রতারণার কথা আমি কখনো ভাবতে পারিনি। কিন্তু আজ সেকথা ভাবছি। অথচ তার পিছনে কোন যুক্তি খুঁজে পাইনি আমি। তার একমাত্র যুক্তি হলো এই যে সেদিন সুইজারল্যাণ্ডে এক পাহাড়ের ধারে লুসার্ণে হ্রদের জলে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমার স্বামীর সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ড বেড়াতে গিয়ে কী বিপদেই না পড়েছিলাম। চারদিকের প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ আমার অন্তরাত্মায় যখনি কোন তপ্ত আবেগ অবুঝ উচ্ছ্বাসে ফুটে উঠতে চেয়েছে বুদ্বুদের মত তখনি আমার স্বামী তাঁর শান্ত শীতল ঔদাসিন্যের অনুশাসন দিয়ে তাকে দমিয়ে দিয়েছেন।

কোনদিন সূর্যোদয়কালে চার ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে বেড়াবার সময় যখন একটা পাতলা কুহেলির অবগুণ্ঠন ঢাকা পাহাড় বন নদী সমুদ্র দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি, আপন মনে হাততালি দিয়েছি, আবেগের মাথায় স্বামীকে আমায় চুম্বন করতে বলেছি, আমার স্বামী তখন কড়া গলায় জবাব দিতেন, কোন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য তোমার ভাল লেগেছে তাই আমাদের পরস্পরকে চুম্বন করতে হবে—এটা যুক্তির কথা হলো না।

এইভাবে তাঁর কথায় আমার সব আবেগ অকালে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমার সব উচ্ছ্বাস শান্ত হয়ে গেছে। আমার কেবলি মনে হত সুন্দর কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের সংস্পর্শে এলে মানুষের ভালবাসার প্রবণতা বেড়ে যায়। সে সংস্পর্শে প্রেমিক প্রেমিকারা আরো কাছে এসে পড়ে পরস্পরের। আমার কেবলি মনে হত আমার মনটা যেন ফুটন্ত জলের বয়লার, অথচ আমার নীতি-বাদী স্বামী জোর করে তার মুখটা এঁটে দিয়েছেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমার স্বামীর মাথায় যন্ত্রণা করায় তিনি বেরোলেন না। একাই আমি হ্রদের ধার দিয়ে বেড়াতে গেলাম সন্ধ্যের সময়। তখন আকাশে চাঁদ কিরণ দিচ্ছিল। মাথায় শুভ্র তুষারের মুকুট পরে লম্বা পাহাড়-গুলো গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়েছিল। মৃদুমন্দ মিষ্টি বাতাসের আলতো ঘায়ে ছোট ছোট ঢেউ জাগাচ্ছিল হ্রদের বুকে। অকারণ আনন্দের এক অনির্বচনীয় রোমাঞ্চ জাগছিল আমার সারা গায়ে। কিসের একটা অজানা আবেশ ফুলে ফুলে উঠছিল আমার অন্তরের গভীর গোপনদেশ।

হ্রদের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘাসের উপর বসেছিলাম আমি। সহসা ভালবাসার এক সর্বনাশা নেশা জেগে উঠল আমার মধ্যে। আমার মনে হলো, মিষ্টি চাঁদের অফুরন্ত আলো ঝরেপড়া এই হ্রদের ধারে এই নরম ঘাসের বিছানায় আমি যদি একটি মানুষকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারতাম, যদি তার মুখে মুখ আর বুকে বুক দিয়ে মন জানাজানি করতে পারতাম। মনে হলো, আমাদের এই ধরনের ভালবাসাবাসির জন্যই ঈশ্বর এই মনোরম নিদাঘনিশীথের শান্ত শীতল বুকটাকে আলোছায়ার এমন মায়া দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছেন।

আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সহসা শুনলাম কে যেন আমায় কি বলছে। মুখ ফিরিয়ে দেখি একজন যুবক আমার দিকে এগিয়ে এসে বলছে, আপনি কাঁদছেন মাদাম?

আমি তাকে চিনতাম। যুবকটি একজন ব্যারিস্টার। অবিবাহিত। মাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিল সুইজারল্যাণ্ডে। আমি এমনই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে-ছিলাম যে আমি কী উত্তর দেব তা বুঝে উঠতে পারলাম না। সঠিক উত্তর খুঁজে না পেয়ে বললাম, আমার শরীরটা ভাল নেই।

আমি কোন কথা বলতে না পারলেও আমার অন্তরের অবর্ণনীয় আবেগকে

প্রকাশ করতে না পারলেও মনে হলো আমার চারদিকের পাহাড়, হ্রদের জল আর চাঁদের আলোই আমার মনের সব কথা বলে দিচ্ছে। এক অনন্ত মাধুর্য অশ্রুত গানের মত ধ্বনিত হয়ে উঠছে যেন তাদের না বলা কথার নীরব বাঙ্ময়তায়।

কেমন করে ঘটে গেল ব্যাপারটা তা ঠিক বলতে পারব না। কেমন করে কোন যাদুমন্ত্রবলে ঘটল তাও ঠিক জানি না। তারপর থেকে তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। একবার হয়েছিল যখন সে হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। সে আমাকে একখানা কার্ড দিয়েছিল।

সবকিছু শুনে রুবেযার বলল, আমার কি মনে হয় জানিস দিদি। এক এক সময় আসলে আমরা কোন মানুষকে ভালবাসি না, ভালবাসি আমাদের মনের ভালবাসাটাকে। সেদিন রাত্রিতে আসলে তুমি যাকে ভালবেসেছিলে সে হলো চাঁদের আলো।

সংশয়াত্মক সুখ

[Doubtful happiness]

জায়গাটার নাম আমি বলতে পারব না, লোকটার নামও জানি না। শুধু জানি জায়গাটা ছিল এখান থেকে বহুদূরে এক উপকূলভাগে। সেদিন সকাল থেকে সোজা হেঁটে চলেছিলাম আমি। সূর্যকিরণে তপ্ত সমুদ্রটাকে ডাইনে ফেলে রেখে তার তীরবর্তী বিরাট গমের ক্ষেতের উপর দিয়ে অবিরাম হেঁটে চলেছিলাম আমি।

এখানকার স্থানীয় কোন লোক আমায় বলেছিল, এই ক্ষেতের শেষ প্রান্তে কমলালেবু গাছে ঘেরা একটি বাড়ির মধ্যে এক ফরাসী ভদ্রলোক বাস করেন। আপনি সন্ধ্যের সময় তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলে রাত্রিটা সেখানে কাটাতে পারবেন।

আমি ঠিক তাই করেছিলাম। কিন্তু এখনো জানতে পারিনি ভদ্রলোক কে। শুধু জেনেছিলাম তিনি দশ বছর আগে কোথা হতে এসে সমুদ্রের ধারে এই জায়গাগুলো চাষের কাজের জন্য একে একে কিনে নেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা উষর মাটিকে উর্বর করে তুলে সোনার ফসল ফলান তাতে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা চাষের বিভিন্ন কাজ তদারক করতে থাকেন। ক্রমে টাকার নেশা পেয়ে বসে তাঁকে। তিনি খুব ধনী হয়ে ওঠেন ক্রমবর্ধমান চাষের আয়ে।

সেদিনটার কথা আমার আজও মনে আছে। আমি যখন কমলালেবু গাছে ঘেরা বাড়িটায় গিয়ে পৌছলাম তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমার ডাকে বাড়িওয়ালা লম্বা চওড়া এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। রাত্রির মত আশ্রয় চাইলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বাড়ির চাকরদের কি বললেন।

আমরা একসঙ্গে খেতে বসলাম। খাবার সময় আমাকে ভদ্রলোক বললেন, জায়গাটা ভালই। তবে প্রিয়জনের কাছ থেকে এত দূরে থাকতে কারোরই মন চায় না।

আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ফ্রান্সের জন্য দুঃখ করছেন ?

তিনি বললেন, আমি বলছি প্যারিসের কথা।

আমি তখন বললাম, আপনি সেখানে যান না কেন ? গেলেই ত পারেন।

তিনি বললেন, হ্যাঁ সেই চেষ্টাই করছি।

এরপর তিনি খুঁটিয়ে প্যারিসের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন বুর্তেন, রিদেমি প্রভৃতি পুরুষ আর সুজান বার্নার, সোফি এ্যাস্তিয়ের প্রভৃতি মেয়েদের কথা। আমি বললাম আমি তাদের চিনি। তবে সোফি মারা গেছে।

তিনি আমাকে ভিতরের একটি প্রশস্ত ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরের সামনের দেওয়ালে দুটো বন্দুক টাঙানো ছিল। এক কোণে কতকগুলো কোদাল, টাকনা ও চাষের কিছু যন্ত্রপাতি জড়ো করা ছিল। আর একটি ঘরে গিয়ে দেখলাম সারা ঘরখানা জুড়ে বহু ভাল ভাল বড় বড় ছবি সাজানো রয়েছে। ঘরের মাঝখানে একটি সোনার বাক্সে একখণ্ড সিল্কের কাপড় গাঁথা একগাছি লম্বা চুলে জড়ানো একটা পিন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, এই পিনটিই আমার জীবনের সব। গত দশ বছর ধরে রোজ একবার করে দেখে আসছি এই পিনটি। না দেখে কিছুতেই পারি না।

আমি বললাম, আমার মনে হয় কোন নারীঘটিত ব্যাপারে জীবনে দুঃখ পাচ্ছেন আপনি।

কথায় কথায় ঘর থেকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। দোতলায় সেই বারান্দা থেকে দেখলাম বাড়িটার অদূরে সামনে দু'দিকে দুটো উপসাগরের মাঝখানে একটা পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠেনি। বাড়ির উঠোনভর্তি কমলালেবু গাছে কুঁড়ি ধরেছিল। তার মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল সন্ধ্যার উতল বাতাসে।

ভদ্রলোক একসময় হঠাৎ বলে উঠলেন, জিয়ান দ্য লিমোর্স এখনো বেঁচে আছে ? আপনি তাকে চেনেন ?

আমি বললাম, হ্যাঁ চিনি, এখন ভালই আছে। প্যারিসের মধ্যে সবচেয়ে মনোহারিণী রমণী। রাজরাণীর মত বিলাসব্যসনে জীবনযাপন করে।

ভদ্রলোক বললেন, ওকে আমি একদিন ভালবাসতাম, আজও বাসি। ওকে নিয়ে আমি তিন বছর একসঙ্গে বাস করি। এর মধ্যে আমি ওকে পাঁচ ছ'বার খুন করার চেষ্টা করি আর ও এই পিনটা দিয়ে সে আমার চোখদুটো কানা করে দেবার চেষ্টা করে। আমার চোখের পাতার উপর একটা দাগ এখনও আছে। ওটা প্রেমের দাগ বলতে পারেন। আসল কথা কি জানেন? দু ধরনের প্রেম আছে। একধরনের সরল সাদাসিদে প্রেম আছে তাতে প্রেমিক-প্রেমিকার দু'জনের মনের খুব মিল দেখা যায়। আবার একধরনের প্রেম আছে যা অসম আর ভয়ঙ্কর। তাতে দুজনের মনের মধ্যে কোন মিল দেখা যায় না। দুজনের মধ্যে কোন মিল না থাকলেও কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না। আমি তার জন্য তিন বছরের মধ্যে চল্লিশ লক্ষ ফ্রাঁ খরচ করি। তার চোখ মুখের মধ্যে আমি কি যে পেয়েছিলাম তা জানি না। ওকে যতই দেখতাম, ততই আরো দেখতে ইচ্ছা হত। ওকে যত ভোগ করতাম আরো ভোগবাসনা জাগত। মনে হত সব নারীকেই ঠিকমত জানা যায়, তার হৃদয়ের তল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অনন্যসাধারণ ওর নারীত্বের মধ্যে এমন এক অপরিমেয় রহস্যের গভীরতা ছিল যার তল খুঁজে পাইনি আমি কোনদিন।

ওর মত মেয়ে আমি কোথাও কখনো দেখিনি। আমি যখন ওকে নিয়ে পথে বার হতাম তখন সব মানুষের দৃষ্টি ওর উপর পড়ত। আমার কেবলি মনে হত ও শুধু আমার একার নয়, ও সকলের। ওকে পেয়েও পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছি না অথবা ওর উপর আমার দখলস্বত্বটাকে একান্তভাবে কায়েম করতে পারছি না এই ধরনের একটা অলস আশঙ্কা, একটা অনির্দেশ্য আক্রোশ আমার মনটাকে কুরে কুরে খেত অনবরত।

তখন অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। কমলালেবুর কুঁড়িগুলোর সুবাস ভেসে আসছিল সন্ধ্যার শান্ত নিস্তরঙ্গ বাতাসে। আমি বললাম, আপনি কি তাকে আবার পেতে চান?

ভদ্রলোক বললেন, চাই মানে? আমি তাকে আজও ভালবাসি। আমি তাকে পাবার জন্য দশ বছর ধরে কষ্ট করে আসছি। এত কষ্ট করছি শুধু তারই জন্য। কারণ আমি অনেক খেটে আজ পর্যন্ত সাত আট লক্ষ ফ্রাঁ জমিয়েছি। আর কিছু হলেই দশ লক্ষ অর্থাৎ এক মিলিয়ন পূর্ণ হবে আর তা হলেই আমি চলে যাব তার কাছে। তার সঙ্গে অন্ততঃ একটা বছর সুখে কাটাতে পারব।

আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না, তারপর?

উনি বললেন, তারপর বলব আমাকে তোমার ভৃত্য হিসাবে অন্ততঃ তোমার কাছে রেখে দাও।

আদালতের ভিতরে

[In the Court room]

জর্জভিলের আদালত সেদিন লোকে লোকারণ্য। স্থানীয় চাষী-লোকদের ভিড়ে গোটা ঘরটা একরকম ভরে গেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে জজসাহেব এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি আদালতে হাকিমগিরি করলেও পণ্ডিত লোক। তিনি হোরেস অনুবাদ করেছেন এবং ভলতেয়ার পড়েছেন।

জজসাহেব ঢুকতেই কোর্টের কেরাণী যাদের মামলার বিচার হবে প্রথমে তাদের নাম ধরে ডাকল। মাদাম ভিক্তোরি বাসকিউন বনাম ইসিদোর পাতুরেঁা।

ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে মোটা চেহারার এক গ্রাম্য মহিলা এগিয়ে এল। তার বুকে একটা চেন ঝোলানো ঘড়ি ছিল।

জজ একবার সেদিকে তাকিয়ে বললেন, মাদাম বাসকিউন, আপনার অভিযোগের কথা আপনি বলুন।

বাদী পক্ষে মাদাম বাসকিউন একা। সে যখন তার জবানবন্দীর জন্য এগিয়ে এল তখন কানের ইয়াররিংগুলো জ্বলন্ত বাতির মত জ্বলজ্বল করছিল। বিবাদী পক্ষে ছিল তিনজন—একজন যুবক, তার স্ত্রী আর তার বৃদ্ধ পিতা।

মাদাম বাসকিউন জজকে বলল, হুঁজুর, এই যুবককে আমি পনেরো বছর ধরে কাছে রেখে মাতৃস্নেহে পালন করেছি। মানুষ করে তুলেছি। আমি মর্তিনে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেছি ওকে। আমার এই দানের একটি শর্ত ছিল। সে শর্ত এই যে সে আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার সেবা করে যাবে। এই দেখুন একটা কাগজে ও এই শর্তে রাজী হয়ে সই করেছে।

ইসিদোর পাতুরেঁা আপত্তি করে বলল, মিথ্যা কথা হুঁজুর।

মাদাম বাসকিউন একটা স্ট্যাম্প লাগানো চুক্তিপত্র জজের হাতে দিতে জজ সেটা পড়তে লাগলেন। 'আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ইসিদোর পাতুরেঁা আমার উপকারিণী মাদাম বাসকিউনের নিকট এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে আমি আমার সারা জীবনকাল ধরিয়া তাঁহার সেবা করিয়া

যাইব। কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে কখনো ত্যাগ করিয়া যাইব না। জর্জভিল আগস্ট ৫, ১৮৮৩।'

কাগজটা পড়ে জজ বললেন, সাক্ষরের জায়গাটায় একটা সই রয়েছে। কে সই করেছে ?

ইসিদোর বলল, আমি সই করতে জানি না হুঁজুর। ও নিজেই মিথ্যে করে সই করেছে। আমি আমার বাবা মা ও ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি সই করিনি।

জজ ইসিদোরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে মাদাম বাসকিউনের কি সম্পর্ক ছিল ?

ইসিদোর বলল, আমি ওকে সঙ্গ দান করতাম। আনন্দ দিতাম।

ইসিদোরের পিতা বৃদ্ধ পাতুরেঁা বলল, আমার ছেলের বয়স পনেরো বছর পূর্ণ না হতেই মেয়েটা আমার ছেলেকে খারাপ করে। তার আগে হতেই ও তাকে আদর যত্ন করতে থাকে। তারপর ওর দেহে যৌবন এলেই ওকে কুপথে নিয়ে যায়। আমার ছেলেকে ওই মেয়েটার কবল হতে মুক্ত করা সম্ভব নয় বলেই আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি হুঁজুর।

মাদাম বাসকিউন এই সময় বলল, না হুঁজুর, ওরা মিথ্যা বলছে, আমি ছেলেটাকে মানুষের মত মানুষ করে তুলি। কিন্তু সেকথা এখন ওরা অস্বীকার করছে অকৃতজ্ঞের মত। ছেলেটা আমার দেওয়া সেই সম্পত্তি ওর নববিবাহিতা স্ত্রীকে দান করে দিয়েছে।

এবার ইসিদোর বলল, ওর ওকথা সত্য নয় হুঁজুর। আজ নয়, আজ হতে পাঁচ বছর আগেই আমি ওকে ত্যাগ করে চলে যেতে চাই। কারণ ওর দেহটা অত্যধিক মোটা হওয়ায় আমার সঙ্গে খাপ খেত না। আমি চলে যেতে চাই। কিন্তু ও তখন আমায় মার্তিনের জমিটা নিয়ে আরো পাঁচ বছর থাকতে বলে। আমি অতিকষ্টে আরো পাঁচ বছর কাটাই ওর কাছে। তারপর চলে আসি। কাজেই ওর শর্ত আমি যথাযথ পালন করেছি বলে মনে করি। আজ আমি স্বাধীন। আমার ওপর আজ ওর কোন অধিকার নেই।

বৃদ্ধ পাতুরেঁা বলল, হ্যাঁ হুঁজুর, ও আজ স্বাধীন। ওর উপর মেয়েটার কোন অধিকার নেই।

জজ মাদাম বাসকিউনকে বললেন, আমি কিছু করতে পারি না মাদাম। আপনি বিধিগতভাবেই সম্পত্তিটা দান করেছেন। সুতরাং সে সম্পত্তি গ্রহীতা ইচ্ছামত তার স্ত্রীকে দান করতে পারে। আমি শুধু সব ব্যাপারের আইনগত দিকটা বিচার করে দেখতে পারি। আর কিছু করার সাধ্য আমার নেই।

মাদাম বাসকিউন তার চেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

জজ তাকে বললেন, কেঁদে লাভ নেই। ও গেলেই বা আর একজনকে খুঁজে নাও।

কাঁদতে কাঁদতে মাদাম বাসকিউন বলল, আর যে পাচ্ছি না কাউকে।

জজ বললেন, তোমার জন্য কাউকে আমিও খুঁজে পাচ্ছি না। এজন্য আমিও দুঃখিত।

মাদাম বাসকিউন একটা কাঠের উপর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তিটার পানে তাকিয়ে থেকে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জজ বললেন, ইউলিসেস চলে গেলে ক্যালিপসোর দুঃখ এমনি কোন সান্ত্বনা মানেনি। কই এরপর কার মামলা আছে দেখ।

কেরাণী হাঁকল, পোলাইৎ লেকাশোর বনাম প্রসপার দোনোকেৎ।

আসল রসিকতা

[Practical Joke]

বর্তমানে মানুষকে হাসাবার জন্য যে সব রসিকতা করা হয় তা বড় বাস্তব আর সেই জন্যেই তা কেমন যেন ভয়াবহ। আগেকার কালে অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে যে সব রসিকতা করা হত তা ছিল যেমন নির্দোষ তেমনি হাস্যোদ্দীপক।

আমি নিজেও অনেকের সঙ্গে রসিকতা করেছি এবং আমার সঙ্গে অনেকে রসিকতা করেছে। আমি একজনের সঙ্গে এমন রসিকতা করেছিলাম যে তার ফল হয়েছিল বড় ভয়ানক। লোকটা শেষে মারা গিয়েছিল।

তবু সে কথা যদি আজ কারো কাছে বলি তাহলে অনেকে হাসতে থাকবে সে কথা শুনে। ব্যাপারটা ঘটেছিল প্যারিসের এক মফঃস্বল শহরে। সে ঘটনা যারা দেখেছিল আজও তারা সে কথা মনে পড়লে হাসতে থাকবে। কিন্তু সে কথা আমি পরে বলব।

আজ আমি বলব দুটি রসিকতার ঘটনার কথা। একটি ঘটনায় আমার উপর রসিকতা করা হয় অর্থাৎ আমি ছিলাম রসিকতার বস্তু আর একটি ঘটনায় আমি ছিলাম নায়ক অর্থাৎ আমি একজনের সঙ্গে রসিকতা করি।

আমার কয়েকজন বন্ধু একবার পিকার্ডিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করে। তারা আমায় খাতির করতে থাকে, বন্দুক ছুঁড়ে এমন অভ্যর্থনা জানাতে থাকে যে আমি মনে মনে বলতে বাধ্য হই, এত খাতির ত ভাল নয়।

রাত্রিতে খাবার সময় তারা কেউ বিশেষ হাসল না। এতে আমার ভয় হলো, আমার মনে হলো ওরা আমাকে ঠকাবার কোন পরিকল্পনা আঁটছে মনে মনে। খাওয়ার পর ওরা সবাই আমায় শোবার ঘরে পৌছে দিয়ে গেল।

আমি ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। আমার মনে হলো বাইরে ওদের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে আর ওরা হাসাহাসি করছে। আমার মনে হলো হয়ত আমি শুলেই খাটটা ভেঙ্গে পড়বে। আমি এর আগে মানুষকে যে যেভাবে ঠকিয়েছিলাম সেইভাবে আমাকেও হয়ত ঠকানো হবে একথা বারবার ভাবতে লাগলাম। ভয়ে ঘুম হলো না আমার। দরজার কাছে একটা চেয়ার টেনে তার উপর বসে বসে ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ কি মনে হলো খাটের উপর থেকে তোষক চাদর সব টেনে নিয়ে মেঝের উপর বিছানা পেতে তার উপর শুয়ে পড়লাম। মাঝরাতের পর ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ কি একটা গরম জিনিস মুখে পড়তে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার গায়ের উপর মানুষের মত একটা ভারী জিনিস পড়ল। আমি তখন হাত দিয়ে তার নাকে মুখে ঘুষি মারতে লাগলাম।

পরে ঘুমের ঘোর কাটলে জানলাম বাড়ির চাকর আমার জন্য সকালের চা নিয়ে ঘরের দরজা ঠেলে দেখে আমি খাটের পরিবর্তে মেঝের উপর শুয়ে আছি। সে হঠাৎ ঘরে ঢুকতে অবাক হয়ে যায় আর তার হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে যায়। গরম চা আমার মুখে লাগে। সে নিজেও আমার দেহের উপর পড়ে যায়। আর আমি তখন ঘুষি মারতে থাকি। কথাটা শুনে হাসতে থাকে সবাই।

আর একটা ঘটনা ঘটেছিল আমার ছেলেবেলায়। আমার প্রিয় শাস্ত্র রসায়ণবিদ্যা। ক্যালসিয়াম ফসফেট নিয়ে আমি প্রায়ই খেলা করতাম। ক্যাল-সিয়াম ফসফেট জলে দিলেই আগুন ধরে যায় আর ধোঁয়া ছাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদ্কুটে গন্ধ বার হয়।

একবার ছুটির সময় বাড়িতে গেছি। দেখি মাদাম দুফোর এসেছেন আমাদের বাড়ি বেড়াতে। উনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসতেন। কিন্তু আমাকে উনি মোটেই দেখতে পারতেন না। আমি যা কিছু করতাম বা বলতাম উনি তার ভুল ব্যাখ্যা করে আমাকে বকতেন বা লোকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতেন।

একদিন রাত্রিতে একটা পরিকল্পনা করলাম। মাদাম দুফোরকে জব্দ করতে হবে। আমি লক্ষ্য করেছিলাম মাদাম দুফোর রোজ শোবার সময় তাঁর বাঁধানো দাঁত খুলে জলভরা একটা গ্লাসে রাখেন এবং পরচুলটাও খুলে রাখেন। তখন তাঁকে বিশ্রী দেখায়। একদিন আমি শোবার সময় চাতুরী করে ওর জলের গ্লাসে ক্যালসিয়াম ফসফেট ফেলে দিই। মাদাম দুফোর তখন হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছিলেন।

সহসা জলের গ্লাসে এক জোর বিস্ফোরণ দেখে চমকে ওঠেন মাদাম দুফোর। উনি দেখেন ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলি পাকিয়ে আর বিদ্কুটে এক গন্ধে

ভরে গেছে ঘরখানা। উনি ভাবলেন নিশ্চয় কোন শয়তানের কাজ।

আমি কাজটা করে নিঃশব্দে আমার শোবার ঘরে চলে যাই। তারপর চেঁচামেচি হাসাহাসি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বাবা এসে আমার কান মলে দেন। মাদাম ডুকোর কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন নি। অথবা বুঝতে চেষ্টা করেন নি। হয়তো কারো কথায় বিশ্বাস করেন নি তিনি। তিনি শুধু কয়েক গ্লাস জল খেয়ে বললেন, মাঝে মাঝে শয়তানেরা এসেই এই রকম কাজ করে। মানুষকে অসুস্থ করে তোলে।

বিড়াল সম্বন্ধে

[on Cats]

সেদিন আমি আমার ঘরের দরজার কাছে একটা বেঞ্চের উপর বসে জর্জ ডুভানের লেখা 'কপার' নামে বইটা পড়ছি এমন সময় একটা বিড়াল হঠাৎ লাফিয়ে পড়ল আমার কোলের উপর। আমি তখন বইটা বন্ধ করে বিড়ালটাকে কোলে তুলে নিলাম আদর করার জন্য।

বিড়ালটাকে তুলে তার সিল্কের মত নরম লোমগুলোর উপর হাত বুলোতে লাগলাম। এত নরম মোলায়েম এবং এত আরামপ্রদ আর কিছু হতে পারে না। তাই বিড়ালকে আদর করতে আমি ভালবাসি। আমি যখন তার সাদা নরম গায়ে হাত বোলাই তখন আমার আঙুলের ডগা থেকে একটা আশ্চর্য সংবেদন শিরায় শিরায় খেলে যায়।

বিড়ালটা আমার কোলের উপর উঠে গড়াগড়ি খেতে লাগল। একবার পাগুলো উপরের দিকে তুলে শুয়ে রইল আমার কোলে। কিন্তু যখনি আমি কোন বিড়ালকে আদর করি তখনই আমার মনে হয় বিড়ালরা সব সময় বড় সতর্ক, বড় সচকিত। ওরা আদর ভালবাসে, কিন্তু তার মাঝে কোথাও একটু শত্রুতার ভাব বুঝলেই সঙ্গে সঙ্গে তার সন্দিগ্ধ শত্রুকে আঁচড়ে ও কামড়ে দেবে। তাই আমি কোন বিড়ালকে আদর করি বটে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে সব সময় সতর্ক থাকি। মনে হয় এই বুঝি বা আমাকে আঁচড়ে বা কামড়ে দেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে আঁচড়ে দেবার কামড়ে দেবার যে হিংস্র ভাবটা অন্তর্নিহিত আছে সে ভাবটা আমার মধ্যে গোপনে সঞ্চারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে জেগে ওঠে এক জিঘাংসার ভাব। মনে হয় যাকে আমি এই মুহূর্তে আদর করছি তাকে পরমুহূর্তে খুন করে ফেলি। অনেক সময় তাই কোন বিড়ালকে আদর করতে করতে তার ঘাড়টা ধরে এত দূরে নির্মমভাবে

আছাড় মেরে ফেলে দিয়েছি যে সেখান থেকে ও এসে আমার উপর আর প্রতিশোধ নিতে পারবে না।

ছোটবেলায় বিড়ালকে ভয় করতাম আমি। একবার হঠাৎ ফাঁদে আটকে পড়ে একটা বিড়ালকে ছটফট করে মরতে দেখেছি। তবু তাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করিনি। অথচ কোন কুকুর হলে আমি তাকে নিশ্চয় বাঁচাতাম। অনেকে অবশ্য বিড়াল ভালবাসে। ফরাসী কবি বোদলেয়ার ত বিড়ালের কত গুণগান করেছেন তাঁর কবিতায়।

আমার মনে হয় মেয়েদের সঙ্গে বিড়ালদের কোথায় যেন মিল আছে। বিড়ালদের মত মেয়েদের গাটাও বড় কোমল। তারাও বড় আদর ভালবাসে। কিন্তু বিড়ালদের মতই ওরা সদাসতর্ক, সচকিত আর ভয়ঙ্করভাবে স্বার্থপর। আদর করার সময় বিড়ালরা যেমন তাদের হলুদ চোখের নীল তারা দিয়ে সদা-সতর্ক দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকিয়ে থাকে এবং একটু তৃপ্তি বা নিরাপত্তার অভাব দেখলেই আমাদের আঁচড়ে ছিঁড়ে ও কামড়ে দিয়ে চলে যায়। মেয়েরাও ঠিক তেমনি তাদের তৃপ্তি বা নিরাপত্তার অভাবের কোন আভাস আমাদের মধ্যে কোনভাবে পেলেই আমাদের কামড়ে দিয়ে চলে যায়।

আমার বেশ মনে আছে একবার ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোতে বেড়াতে বেড়াতে পার্বত্য অঞ্চলে একটা প্রাচীন প্রাসাদে গিয়ে পড়ি। সেখানে যারা বাস করে তাদের আতিথ্যে একটা রাত বাস করি আমি সেখানে। সেই প্রাসাদের মত বিরাট বাড়িটিতে এমনি একটা সাদা বিড়াল সারা রাত ধরে অবাধে নিঃশব্দ পদক্ষেপে আধিপত্য করে বেড়াত।

গত বছর ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত নিযেতে আমি যাই প্রথম। কিন্তু সেখানে বড় গরম বোধ হওয়াতে আমি চলে যাই ফ্লোরেন্সের পার্বত্য অঞ্চলে। এই পার্বত্য অঞ্চলে অনেক ঘোরাঘুরির পর হঠাৎ নব জাগরণের যুগের প্রারম্ভে নির্মিত চারটি গম্বুজবিশিষ্ট এক প্রাচীন প্রাসাদের সামনে গিয়ে পড়ি। তার তিনদিকে লম্বা লম্বা পাইনগাছ আর সামনে ঘাসে ঢাকা সবুজ প্রান্তর। বড় মনোরম জায়গায় অবস্থিত দুর্গের মত বিরাট প্রাসাদটা। ফ্লারেন্স থেকে যখন আমি আসি তখন একজন ভদ্রলোক এই প্রাসাদের মালিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য একটা পরিচয়পত্র দেন। চারদিকে পাহাড়ের মাঝে খুঁজতে খুঁজতে একটা উপত্যকাভূমিতে সেটা পেয়ে গেলাম। বাড়ির মালিক আমাকে হোটেলে যেতে দিলেন না। সে রাতের মত সেই বাড়িতেই আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাত্রিতে একটা বিরাট ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। শোবার সময় আমি সব দরজা জানালা ঠিকভাবে বন্ধ করে দিলাম। তারপর শুতেই ঘুম এল। কিন্তু ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম, আমি এক পান্থশালায় একটা ঘরে শুয়ে আছি। সে ঘরে কোন দরজা নেই আর সেই পান্থশালার দুটো চাকর

আমাকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে আসছে। অস্বস্তিতে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখলাম ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। সহসা কি একটা নরম জিনিস পড়ার শব্দ হলো মেঝের উপর। আমি একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে দেখলাম কোথাও কিছু নেই।

তারপর আমি আবার ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুম আসতেই আবার একটা স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম আমি তুর্কীদের দেশে বেড়াতে গিয়েছি। তুর্কী মুসলমান-দের কোন এক বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছি আমি। সহসা রাত্রিতে আমার শোবার ঘরে দেখি পরমা সুন্দরী এক তুর্কী রমণী বসে রয়েছে। আমি তার পাশে গিয়ে তার হাত ধরে আমার বিছানায় নিয়ে আসতেই আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের নিচে নরম তুলতুলে একটা জিনিস অনুভব করলাম। দেখলাম একটা বিড়াল নিশ্চিতভাবে আমার কাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখি বিড়ালটা পালিয়ে গেছে কোথায়। কিন্তু কোন্‌দিক দিয়ে বিড়ালটা এল ?

বাড়ির মালিককে কথাটা বলতেই তিনি বললেন, এ বাড়ির সব ঘরেই দেওয়ালে গর্ত করা আছে। প্রয়োজন মত সে গর্ত দিয়ে একটা মানুষও কোন-মতে বেরিয়ে যেতে পারে গুড়ি মেরে। জানলাম প্রাচীনকালে এ অঞ্চলের সব বাড়িতেই সব ঘরেই এমনি করে একটা করে গর্ত থাকত যাতে কোন মানুষ ইচ্ছামত বাড়ির যেকোন ঘরে দরকার পড়লে যাওয়া আসা করতে পারত।

বাড়ির মালিক বললেন, ঐ বড় সাদা বিড়ালটা আমাদের সারা বাড়িটাতে সারা রাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। যেকোন বিছানাতে ও শোয়, যেকোন ঘরে ঢোকে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ওই নিশাচরটা ঘুরে বেড়ায় ইচ্ছামত।

এগারো নম্বর ঘর

[Room No 11]

আচ্ছা তুমি কি জান প্রেসিডেণ্ট আমার্দ কিভাবে অপসারিত হন ?

না। আমার জানা নেই।

অবশ্য আসল কারণটা জানা যায়নি। তবে এবিষয়ে একটা অদ্ভুত কাহিনী শোনা যায়।

বল না সে কাহিনী।

আচ্ছা, মাদাম আমার্দর কথা তোমার মনে আছে ? সেই সুন্দরী

মধ্যবয়সী মহিলা যাকে পার্থ্'ই লে অঞ্চলে সবাই মাদাম মার্গারেট বলে ডাকত।

হ্যাঁ মনে আছে।

আর একটু ভেবে দেখ সারা শহরের লোক তাঁকে কত ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। মায়া মমতা ও সামাজিকতার দিক থেকে তাঁর গুণের তুলনা পাওয়া যায় না। গরীবদের সাহায্যের জন্য তিনি মাঝে মাঝে চাঁদা তুলতেন। শহরের যুবকদের খুশি করার জন্য কত সময় কত আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন।

আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা প্রায় সবাই প্যারিসের লোক। তাঁরা প্যারিসের মেয়েদের গুণগানে পঞ্চমুখ। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান প্যারিসের অতি আধুনিকা বিলাসিনী রমণীরা বড় চটুলমনা। তারা সুন্দরী হলেও তাদের সে সৌন্দর্য বড় খরতপ্ত। কোন শান্তশীতল ভাব নেই সে সৌন্দর্যের মধ্যে যেটা তুমি গ্রাম অঞ্চলের সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে দেখতে পাবে। তারা ছল চাতুরী তত জানে না।

মাদাম আমার মফঃস্বলের অভিজাত সমাজের মহিলা হলেও তিনি ছিলেন ক্ষণপ্রণয়ের ছলনায় সিদ্ধ। মাদাম আমার্দ সব সময় তাঁর চোখে মুখে এমনই এক সরলতা ফুটিয়ে রাখতেন যে কেউ ঘুণাক্ষরেও তাকে কখনো সন্দেহ করত না।

মাদাম আমার্দ সব সময় সেনাদলের অফিসারদের মধ্য হতে তাঁর প্রেমিক নির্বাচন করতেন। কিন্তু তিন বছরের বেশী কাউকে ভালবাসতেন না। অর্থাৎ সেনাবাহিনীর অফিসারেরা তিন বছরের বেশী কোন সৈন্যনিবাসে থাকে না। একজনকে নির্বাচিত করে তাকে তিন বছর ভালবাসার অভিনয় করার পর সে বদলি হয়ে গেলেই আবার নূতন দলের একজন অফিসারকে বেছে নিতেন।

মাদাম আমার্দের প্রেমিক নির্বাচনের পদ্ধতিটাও ছিল বড় অদ্ভুত। এক একটি দলে কতজন সামরিক অফিসার থাকে এবং তাদের কার কি যোগ্যতা তা সব তাঁর জানা ছিল। প্রথমে তিনি প্রতিটি দলের তালিকা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে তাদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিতেন। তারপর তাকে কোন নাচের আসরে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তার সঙ্গে নাচতেন। নাচের সময় তার হাতটাতে খুব জোরে চাপ দিতেন আর নিজের দেহটাকে খুব বেশী করে ঠেলে দিতেন নাচের সঙ্গী সেই অফিসারের গায়ের উপর। মাদাম আমার্দের এই সঙ্কেত বুঝতে পারলে সেই অফিসার অবশ্যই তাঁর সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত। কিন্তু মাদাম আমার্দ এত সহজে নিজেকে ধরা দিতেন না কারো কাছে। পাকা দেড় মাস ধরে খোঁজখবর নিতেন সেই অফিসারের স্বভাব চরিত্র কেমন, অমিতব্যয়ী বা অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসে কি না।

এই সব পরীক্ষায় যে অফিসার উত্তীর্ণ হতো মাদাম তাকে আবার একবার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন। তারপর এক ফাঁকে নিচু গলায় বলতেন, আগামী মঙ্গলবার রাত্রি নটার সময় গোল্ডেন ইস্ট হোটেলে ম্যাদময়জেল ক্ল্যারিসের নাম করে অপেক্ষা করব। আমি অপেক্ষা করব সেখানে তোমার জন্য। তবে সাদা পোশাক পরে যাবে।

আট বছর ধরে ঐ ছোটজাতের হোটেলটায় একটা ঘর ভাড়া রাখেন মাদাম আমার্দ। ওঁর প্রেমিকদের সঙ্গে ওখানে মিলিত হতেন উনি। ওঁর নির্বাচিত অফিসারদের বয়স ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। কারণ মাদাম আমার্দর মতে তিরিশের কম বয়সের পুরুষদের তেমন বুদ্ধি বিবেচনা থাকে না। আবার চল্লিশের বেশী বয়স হলেই দেহের মধ্যে তেমন বলিষ্ঠতা থাকে না।

মফঃস্বল এলাকায় সাদাসিদে একটা ছোটখাটো হোটেল। তার মধ্যে একটা ঘর নেওয়া ছিল মাদাম আমার্দর। ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে ছিল দুটো চেয়ার, একটা ইজিচেয়ার। একটা শোবার খাট আর দেওয়ালে তিনটে ছবি। তিনটি ছবিই তিনজন কর্ণেলের ঘোড়ায় চাপা অবস্থায় তোলা।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সেই হোটেলে নির্বাচিত নায়কের সঙ্গে গোপনে মিলিত হবার জন্য উপায়ের কোন অভাব হত না মাদাম আমার্দর। তিনি সমাজের অনেক সেবা করেছেন, দেশের সেবা করেছেন। তিনি সন্ধ্যের সময় তাঁর স্বামীকে বলতেন, কোন সভা সমিতির অনুষ্ঠান আছে। তাঁকে আজ রাতে সেখানে যেতে হবে। স্বামী কোন খোঁজখবর না নিয়েই সরলভাবে বিশ্বাস করতেন তাঁর কথা। কারণ সত্যি সত্যিই এ ধরনের অনেক সভায় গেছেন মাদাম আমার্দ।

সেখানে যাবার সময় সাদাসিদে পোশাক পরতেন মাদাম। রাস্তায় বেরিয়ে কুমারী মেয়েদের টুপী পরতেন। হোটেলে তাঁর পরিচয় ছিল ম্যাদময়জেল ক্ল্যারিসে। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে চিনতে পারেনি। হোটেলের মালিক ক্রুভোও কিছুই বুঝতে পারেনি। কিন্তু একদিন একটা ঘটনার মাধ্যমে ম্যাদময়জেল ক্ল্যারিসের আসল পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়।

হোটেলে মাদাম আমার্দর ঘরটা ভাড়া করা থাকলেও সেখানে রোজ তাঁর নায়কের সঙ্গে মিলিত হতেন না। দিনকতক বাদ দিয়ে আবার যেতেন। কিন্তু গত গ্রীষ্মকালে প্রেসিডেণ্ট মঁসিয়ে আমার্দ এক সপ্তার জন্য বাইরে যান। সেই সুযোগে কোন এক মঙ্গলবার হোটেলে তাঁর প্রেমিক কমাণ্ডার বারাজেলকে পরের দিনও ঠিক সেই সময়ে আসতে বলেন। তাঁর ঘরের নম্বর ছিল এগারো।

মাদাম আমার্দ তখন কমাণ্ডার বারাজেলের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তাঁর স্বামী বাড়িতে না থাকায় বারাজেলকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি যদি

অগামীকাল ঠিক এই সময়ে আমার আগে এসে পড় তাহলে বিছানায় আমার জন্ম অপেক্ষা করবে।

কিন্তু মাদাম আমার্দ পর পর দুদিন প্রেম করতে আসবেন তাঁর এই ঘরে তা ভাবতে পারেনি হোটেল মালিক ক্রভো। তাই সে পরদিন দুপুরে ঘরটা কয়েক ঘণ্টার জন্ম একজন পথিককে থাকতে দেয়। তখন চারদিকে কলেরা হচ্ছিল। লোকটা এসে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। হোটেল মালিক ক্রভো তা জানতে পেরে হোটেলের বাসিন্দাদের কাউকে কিছু না বলে গোপনে ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা করে। পুলিশ লাসটা দুপুর রাতে সরিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক হয়।

কিন্তু মাদাম আমার্দ ম্যাদময়জেল ক্ল্যারিসে সেজে এসে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখে বিছানায় কে একটা লোক শুয়ে রয়েছে। তিনি ভাবেন তাঁর নির্দেশমত কমাণ্ডার বারাজেল শুয়ে ঘুমোচ্ছে অথবা ঘুমোবার ভান করছে। তাই একে একে গায়ের সব পোশাক খুলে শুধু লাল গাউনটা পরে বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন মাদাম আমার্দ। কিন্তু হঠাৎ দেখেন একটা ঠাণ্ডা অসার মৃতদেহ। বাতিটা এনে ভাল করে দেখে সেই গাউন পড়েই ঘর থেকে বাইরে গিয়ে চীৎকার করতে থাকেন মাদাম আমার্দ। বলতে থাকেন, আমার ঘরে খুন।

চীৎকার শুনে হোটেলের অন্যান্য ঘরের বাসিন্দারা বেরিয়ে এলেন। মালিক ক্রভোও এল। সব কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলল। এমন সময় কমাণ্ডার বারাজেলও এল। তাকে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে মাদাম আমার্দ বললেন, আমাদের ঘরে একটা খুন হযেছে।

হোটেলের বাসিন্দাদের মধ্যে একজন বলল, ম্যাদময়জেল ক্ল্যারিসে ও তার প্রেমিককে পুলিশ না আসা পর্যন্ত ছাড়া হবে না। কারণ মৃতদেহটা তাদের ঘরেই আছে।

হোটেল মালিক ক্রভো বারবার বলল, ওদের ছেড়ে দেওয়া হোক, আমি দায়ী রইলাম ওদের জন্য।

কিন্তু বাসিন্দারা রাজী হলো না। অগত্যা পুলিশ আসার জন্য অপেক্ষা করতে হলো। পুলিশ এসে অবশ্য তাঁদের মুক্তি দিল। কিন্তু সব গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেল।

ফলে পরের মাসেই অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যেতে হলো মঁসিয়ে আমার্দকে।

বিকল্প

[The substitute]

মাদাম বন্দেরয় ?

হ্যাঁ মাদাম বন্দেরয়।

অসম্ভব।

আমি তোমাকে বলছি ঠিক তাই।

ফিতের টুপী মাথায় সেই ধর্মভীরু প্রায়বৃদ্ধা মহিলা মাদাম বন্দেরয় যার মাথায় আছে কোঁকড়ানো পরচুল ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি বলছি তারই কথা।

তুমি দেখছি পাগল হয়ে গেছ।

আমি বলছি তিনিই সেই মহিলা। সেই মাদাম বন্দেরয়, আর কেউ নয়। তাহলে আমাকে খুলে বল ব্যাপারটা।

ব্যাপারটা হলো এই।

মঁসিয়ে বন্দেরয় ছিলেন একজন নামকরা উকিল। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তাঁর স্ত্রী মাদাম বন্দেরয় ছিল মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। কিন্তু মনটা ছিল তার বড় নীচ। লোকে বলাবলি করত তার জারজ লালসা পরিতৃপ্ত করার জন্য তাঁর স্বামীর কেরাণীদের মধ্যে একজনকে সে বেছে নিত।

স্বামীর মৃত্যুর পর নির্বিঘ্নে নিজের কামনা চরিতার্থ করে যেতে থাকে মাদাম বন্দেরয়। স্বামী যা রেখে গেছে তাতে খাওয়া পরার অভাব ছিল না। কিন্তু বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারত না মাদাম বন্দেরয়ের আসল পরিচয়টা। কারণ বন্দেরয় নিয়মিত চার্চে যায়। পাড়াপ্রতিবেশীদের যেকোন অন্যায় কাজের সমালোচনা করে।

তুমি হয়ত জান না দুজন সামরিক অফিসার, তার মধ্যে আমার এক বন্ধুও আছে একবার মাদাম বন্দেরয়ের জন্য ডুয়েল লড়ে। তারা নিজের মুখে স্বীকার করে তারা মাদাম বন্দেরয়ের জন্য ডুয়েল লড়েছে। অবশ্য তাতে কারো কোন ক্ষতি হয়নি এবং পরে তাদের মিলন হয়।

কি বলছ তুমি ?

আচ্ছা শোন, সেই সামরিক অফিসার অর্থাৎ আমার বন্ধু যা বলেছিল আমি তাই বলছি। ঘটনাটা প্রথম ঘটে দেড় বছর আগে। আমার বন্ধু আমাকে বলল, একদিন সন্ধ্যের সময় সে যখন তাদের সৈন্যাবাসের কাছে বেড়াচ্ছিল তখন একজন মধ্যবয়সী মহিলা এসে তাকে বলে, শোন সৈনিক, আচ্ছা তুমি কি সপ্তায় দশ ফ্রাঁ রোজগার করতে চাও ?

সে বলল, হ্যাঁ মাদাম অবশ্যই চাই। তখন মহিলাটি বলল, তাহলে আগামী কাল বেলা বারোটার সময় আমার বাড়ি চলে এস। আমার নাম মাদাম বন্দেরয়, আমার বাড়ির ঠিকানা হলো ৬, র‍্যু দ্য লী ত্রানসী।

পরদিন যথাসময়ে আমার বন্ধু তার সামরিক পোশাক পরে শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে গিয়ে হাজির হলো সেই বাড়িতে। মাদাম নিজেই দরজা খুলে তার ঘরে নিয়ে গেল। সোফায় বসিয়ে বলল, একথা যদি ঘুণাক্ষরেও কাউকে কখনো বল তাহলে তোমাকে জেলে দেব।

আমার অফিসার তখনো বুঝতে পারল না তাকে কি করতে হবে। সে বলল, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মাদাম।

তারপর মাদাম বন্দেরয় জানিয়ে দিল কি তাকে করতে হবে। তখন সে তার শিরস্ত্রাণ খুলে চেয়ারের উপর রেখে বলল, প্রকৃত সৈনিক কখনো কোন কাজে পিছপা হয় না।

মাদাম বন্দেরয়ের দেহে আর যৌবন না থাকলেও তার দেহটা একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি। আমার বন্ধু তার কাজ সেরে দশ ফ্রাঁর একটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে চলে এল। মাদাম বন্দেরয়ের কথামত প্রতি মঙ্গলবার দুপুর বারোটায় সে তার বাড়িতে যেত।

এইভাবে একবছর চলল। একদিন আমার বন্ধুর শরীর খারাপ থাকায় উঠতে পারেনি। সে তখন তার বিশ্বস্ত এক বন্ধুকে সব বুঝিয়ে বলে এই কাজে পাঠায়। মাদাম প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও পরে সবকিছু শুনে রাজী হয়। পরে মাদাম বন্দেরয় দুজনকেই নিযুক্ত করে রাখে। দুজনের জন্য সপ্তায় দুটি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। দুজনকেই দশ ফ্রাঁ করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। আমার বন্ধু অফিসার স্বীকার করল এতে সে নিয়মিত তার বাবার কাছে প্রতি মাসে ঠিক সময়ে টাকা পাঠাতে পারে। এই রোজগারের সব টাকাটাই সে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এতে সবদিকই বজায় থাকে।

বিধবা

[A widow]

দ্য বানভিলের গ্রামাঞ্চলে শিকারের মরসুম চলেছে। শরৎকালটা বৃষ্টিতে জ্যাবজ্যাব করছে। গাছের লাল পাতাগুলি পায়ের তলায় পড়ে ভুমড়ে যাওয়ার পরিবর্তে প্রচণ্ড বৃষ্টির জলে পচতে সুরু করেছে। প্রায় পত্রহীন বনভূমি বাথরুমের মত স্যাঁতসেঁতে হ'য়ে উঠেছে। বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিরাট-বিরাট

গাছের তলা দিয়ে চলার সময় একটা ভ্যাপসা গন্ধ আপনাকে অস্থির ক'রে মারবে। এই বিরামহীন বৃষ্টির নীচে শিকারীদের নাকালের শেষ থাকত না: ভিজে জায়গায় কুকুরগুলো ল্যাজ নীচু করে শিকারের সন্ধানে বৃথাই ঘুরে বেড়াত। আর নাজেহাল হোত আঁটসাঁট পোশাক পরা যুবতী শিকারীরা। এইভাবে ক্লান্ত বিপর্যস্ত হ'য়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তারা বিমর্ষ হ'য়ে ফিরে আসত।

ডিনার শেষ ক'রে রাত্রিতে তারা বিরাট হলঘরে বসে লোটো খেলত—কিন্তু খেলা তাদের মোটেই জমত না। কেউ-কেউ গল্প বলার প্রস্তাব রাখত, কিন্তু ভাল গল্প কারও মুখ থেকে বেরোত না। কোন-কোন শিকারী খরগোশ শিকারের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী বলত—নতুন কোন কাহিনী আবিষ্কারের জন্যে মহিলারা মাথা কুটে সারা হ'য়ে যেত। কিন্তু মনোরম অথবা চটকদার কোন কাহিনীই কারও মাথা থেকে বেরোত না।

এ-ব্যাপারে বিশেষ জুৎ হচ্ছে না ভেবে তারা যখন গল্প শোনার চেষ্টা পরিত্যাগ করার উপক্রম করল ঠিক এমনি সময় একটি যুবতী তার অবিবাহিতা বৃদ্ধা মাসীর হাতটা নিয়ে খেলা করতে-করতে তাঁর আঙুলে ছোট একটি আংটি লক্ষ্য করল। এই বস্তুটি সে আগেও মাসীর আঙুলে দেখেছিল, কিন্তু সেটাকে আগে সে বিশেষ আমল দেয় নি। আঙুলের ওপরে আংটিটা আলতোভাবে নাড়তে-নাড়তে সে হঠাৎ বলে উঠল: আন্টি, এই আংটির গল্পটা আমাদের বল। এটাকে একটা শিশুর কেশ ব'লে মনে হচ্ছে যেন······

বৃদ্ধা মহিলাটির মুখটা হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠল; বিবর্ণ হ'য়ে গেলেন তিনি; তাঁর স্বরটা কাঁপতে লাগল; তিনি বললেন: কাহিনীটি বড় করুণ; এত করুণ যে এটা বলার আগ্রহ আমার হয় নি কোনদিন। আমার জীবনের সমস্ত দুঃখ আর কষ্ট ওই কাহিনীটিকেই কেন্দ্র ক'রে। আমি তখন যৌবনের সীমানায় এবং ঘটনাটি এমনই বেদনাদায়ক যে তার কথা মনে হলেই আজও আমি চোখের জল রাখতে পারিনে।

গল্পটা শোনার জন্যে সবাই উদ্গ্রীব হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রথমে বলতে রাজি হন নি; তারপর সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে সুরু করলেন তিনি:

"সাঁতেজ বংশের কথা আমার কাছে প্রায়ই তোমরা শুনেছ। সেই বংশে বাতি দেওয়ার কেউ নেই আজ। এই বংশের শেষ তিনটি ভদ্রলোককে আমি জানি। তিন মাসের মধ্যে একইভাবে তাঁরা মারা যান। এই কেশটি শেষ বংশধরের। আমার জন্যে সে যখন আত্মহত্যা করল তখন তার বয়স তের। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগছে তোমাদের, তাই না?

'পৃথিবীতে একদল রয়েছে যারা অদ্ভুত রকমের মূর্খ—মূর্খতাই তাদের সৌন্দর্য—এদের আমরা মূর্খ-প্রেমিক বলি। বাপ-ঠাকুর্দা থেকে সুরু ক'রে এই বংশের সকলেই ভীষণ রকমের ভাবপ্রবণ; এই ভাবপ্রবণতার ফলে তাঁরা

যেমন অনেক ভাল কাজ করেছে, তেমনি করেছে অনেক অন্যায় কাজও। তাঁদের আত্মীয় স্বজনেরা বলাবলি করতেন—ওঁরা এই সাঁতেজ-এর মতই কামাতুর।

'তাঁদের দেখলেই এই বৈশিষ্ট্যটি অনুমান করা যায়। তাঁদের চুলগুলি কোঁকড়ানো, কপাল পর্যন্ত ঝোলানো; কোঁকড়ানো দাড়ি, চোখ দুটি বড়; সেই দুটি চোখের মণি থেকে এমন চাহনি বেরিয়ে আসত যে অন্য লোকে অস্থির হ'য়ে উঠতো—কেন হোত তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারত না।

'এঁদের একজনের ঠাকুর্দা ছিলেন ভয়ানক রকমের ভাবপ্রবণ। নারীঘটিত ব্যাপারে অনেক দুঃসাহসিক কাজ তিনি করেছিলেন, দু'দশটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতেও পিছিয়ে আসেন নি। সেই ঠাকুর্দা শেষ পর্যন্ত তাঁর নায়েবের মেয়ের গভীর প্রেমে পড়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি, আমার সঙ্গে দু'জনেরই পরিচয় ছিল। মেয়েটির চেহারা ভালই; কিছুটা বিবর্ণ—হাবভাব সম্ভ্রান্ত, মিষ্টি চাহনি —কথা বলতেন বেশ মিষ্টি করে। তাঁকে দেখলে আমার ম্যাডোনার কথা মনে পড়ে যেত। বৃদ্ধ লর্ড তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাঁকে তিনি এত ভালবেসে ফেললেন যে তাঁকে ছেড়ে এক মুহূর্তও তিনি থাকতে পারতেন না। তাঁর কন্যা আর পুত্রবধূ তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন। বংশের সকলেই প্রেমটাকে এত বড় ক'রে দেখতেন যে এ-ব্যাপারটা তাঁদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল। কেউ যদি তাঁদের কাছে ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী বর্ণনা ক'রে প্রতিহিংসা নেওয়ার কথা ঘোষণা করত তাঁরা সবাই বলতেন—'আহা, বেচারা কত কষ্টই না পেয়েছে।' হৃদয়ঘটিত সব ব্যাপারটাকেই তাঁরা সবাই বেশ সহানুভূতির চোখে দেখতেন; এবং নায়করা যত অপরাধীই হোক না কেন তাদের সম্বন্ধে কোনদিনই তাঁরা তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলতেন না।

'এক শরৎকালে তিনি মঁসিয়ে দ্য গ্র্যাভেল নামে একটি যুবককে শিকারের জন্যে নিমন্ত্রণ করেন; সেই ছোকরা তাঁর যুবতী স্ত্রীটিকে নিয়ে পালিয়ে গেল, মঁসিয়ে সাঁতেজ চুপচাপ রইলেন—দেখে মনে হল ব্যাপারটাকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি। কিন্তু একদিন সকালে সবাই আবিষ্কার করল একপাল কুকুরের-ঘরে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন।

'১৮৪১ সালে তাঁর ছেলেটিও প্যারিসের একটা হোটেলে ওই একইভাবে আত্মহত্যা করেন। অপেরার একটি গায়িকা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছিল।

'তাঁর একটি ছেলে ছিল। ছেলেটির বয়স তখন বার। আর ছিলেন তাঁর বিধবা স্ত্রী। তিনি হচ্ছেন আমার মাসী। বার্তিলেঁ এস্টেটে আমার বাবার বাড়িতে ছেলেটিকে নিয়ে তিনি বাস করতে আসেন। আমার বয়স তখন সতের।

'এই বাচ্চা ছেলেটি যে কী অদ্ভুত ধরনের অকালপক্ক ছিল তা তোমরা ভাবতে পারবে না। দেখলে মনে হবে বংশের এই শেষ সন্তানটির মধ্যে

সাঁতেজ বংশের সব উত্তেজনা, সমস্ত সুকুমার বৃত্তিগুলি একসঙ্গে বাসা বেঁধেছিল। আমাদের বাড়ি থেকে অরণ্য পর্যন্ত এলম গাছের মধ্যে দিয়ে যে পথটি বেরিয়ে গিয়েছে সেই পথটির ওপর দিয়ে সব সময় সে স্বপ্নালু চোখে ঘুরে বেড়াত। জানালা দিয়ে প্রায়ই লক্ষ্য করতাম এই ভাববিহ্বল আত্মসমাহিত ছেলেটি পেছনে ছুটি হাত মুড়ে মাথা নীচু করে আপন মনে পথ দিয়ে হাঁটছে; মাঝে-মাঝে চারপাশে তাকাচ্ছে—মনে হচ্ছে এমন একটা কিছু সে অনুভব করতে চায় যা তার বয়সী ছেলেদের পক্ষে অনুভব করা কষ্টকর।

'প্রায় মাঝে-মাঝে পরিষ্কার ঝরঝরে রাত্রিতে ডিনারের পরে সে আমাকে বলত—দিদি চল; আমরা একটু বেড়াতে-বেড়াতে স্বপ্ন দেখি গে। আমরা হু'জনে পার্কের ভেতরে বেড়াতে যেতাম। মাঝে-মাঝে ফাঁকা জায়গায় সে থমকে দাঁড়াত; চাঁদের আলোতে বনের পাতায় সূক্ষ্ম তুলোর মত যে আবরণ পড়ত—সেইদিকে একমনে তাকিয়ে থাকত সে। আমার হাত ধরে বলত: দেখ, দেখ। কিন্তু না; আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাকে বুঝতে পারছ না। আমি বুঝতে পারলে তুমি সুখী হবে। ভাল ক'রে কাউকে জানতে গেলে তাকে ভালবাসতে হয়।

তার কথা শুনে হেসে আমি তাকে জড়িয়ে ধরতাম। ছেলেটা আমাকে সত্যিই বড় ভালবাসত—এতটা ভালবাসত যে আমার ভালবাসা পাওয়ার জন্যে সে মরতেও পারত।

কখনও-কখনও ডিনারের পরে আমার মায়ের কোলে বসে সে বলত—আন্টি, একটা প্রেমের গল্প বল। ঠাট্টা করে আমার মা আমাদের বংশে যত উদ্দাম প্রেমের কাহিনী আর সত্যমিথ্যায় মেশানো কিংবদন্তী রয়েছে সেগুলি তাকে শোনাতেন। পূর্বপুরুষদের অকাজগুলিই পরবর্তী পুরুষদের উত্তেজিত করত। তারাও পূর্বপুরুষদের মতই কাজ ক'রে বংশের গৌরব বাড়াতে চাইত।

এই সব কাহিনী শুনে সেই বাচ্চা ছেলেটি উত্তেজনায় সোজা হ'য়ে বসত; তারপরে হাততালি দিয়ে বলত—আমি—আমিও ভালবাসতে জানি—তাঁদের চেয়ে অনেক ভাল ক'রে জানি।

তারপরেই সে আমাকে প্রেম নিবেদন করতে সুরু করল—খুব ধীরে-ধীরে ভয়ে-ভয়ে, গভীরভাবে। তার ব্যাপার দেখে আমরা হাসতাম। প্রতিদিন সকালে সে আমার জন্যে ফুল তুলে আনত। প্রতিদিন রাত্রিতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমার হাতে চুমু খেয়ে আস্তে-আস্তে বলত—আমি তোমাকে ভালবাসি।

অপরাধিনী আমি—নিজেকে আমি খুবই অপরাধিনী মনে করছি—একদিন নয়, হু'দিন নয়—প্রতিদিন—অবিবাহিতা থেকে, অথবা, তার বাগদত্তা বিধবার বেশে—চিরদিন আমি আমার কৃতকার্যের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করছি।

তার এই ছেলেমানুষীতে আমার বেশ আমোদ লাগত; আমি অনেক সময় তাকে তাতিয়ে দিতাম। এটাই ছিল আমার সময় কাটানোর একটা খেলা; আমার মা আর তার মা-ও এতে বেশ আমোদ পেতেন। বয়স্ক প্রেমিকদের সঙ্গে যুবতীরা যেরকম ছলাকলা দেখায় আমিও তার সঙ্গে সেইরকম লীলা করতাম—তাকে আদর করতাম—প্রতারণা করতাম তার সঙ্গে। এই শিশুটিকে আমি উত্তেজিত করতাম। তোমরা ভেবে দেখ, ছেলেটির বয়স তখন মাত্র বার। বাচ্চার এই শিশু প্রেমকে কে সত্যি বলে মনে করে। তার ইচ্ছেমত আমি তাকে চুমু খেতাম। এমন কি তাকে আমি প্রেমপত্রও লিখতাম। সেই পত্রগুলি আমার মায়েরাও পড়তেন। সেগুলির উত্তরও সে দিত—উচ্ছ্বাসভরা সে চিঠিগুলি। সেই প্রেমপত্রগুলি এখনও আমার কাছে রয়েছে। সে নিজেকে পুরুষ মানুষ বলে ভাবত; সে ভেবেছিল আমাদের ভালবাসা তৃতীয় কেউ জানত না। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম সে সাঁতেজ বংশের ছেলে।

এইভাবে এক বছর কাটলো। তারপরে একদিন রাত্রিতে পার্কে বেড়ানোর সময় সে আমার পায়ের কাছে বসে আমার স্কার্টের উপরে চুমু খেয়ে বেশ আবেগবিহ্বল কণ্ঠেই বলল: আমি তোমাকে ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি। তোমাকে আমি জীবন দিয়ে ভালবাসি। যদি কোনদিন তুমি আমাকে প্রতারণা কর—আমাকে ছেড়ে আর কাউকে ভালবাস তাহলে বাবা যা করেছিলেন আমিও তা-ই করব।

তারপর একটু থেমে আস্তে-আস্তে বলত—বাবা কী করেছিলেন তা তুমি জান?

তার কথা শুনে ভয়ে বুকটা আমার ধড়ফড় করে উঠত।

তারপরে সোজা হ'য়ে উঠে সে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে মিষ্টি করে আমার নাম ধরে ডাকত। তার সেই মিষ্টি ডাকে আমার দেহের ভিতর দিয়ে শিহরণের দোলা লাগত; আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে বলতাম—এবার চল—ঘরে ফিরে যাই।

আর কিছু না বলে সে আমার পিছু-পিছু ফিরত। সিঁড়িতে ওঠার সময় আমাকে থামিয়ে আবার সে স্মরণ করিয়ে দিত—আমাকে ছেড়ে গেলে আমি কী করব তা তুমি জান। আত্মহত্যা করব।

আমি যে অনেকদূর এগিয়ে পড়েছি তা বুঝতে পেরেই আমি সংযত হ'য়ে গেলাম। আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে সে একদিন আমাকে তিরস্কার করলে আমি বলেছিলাম—দেখ, ঠাট্টা-তামাসা করার মত বয়স তোমার আর নেই। সত্যিকার প্রেম করার মত বয়সও তোমার এখনও হয় নি। আমি অপেক্ষা করব।

ভেবেছিলাম তার হাত থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি।

শরৎকালে তাকে দূরের একটা স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। পরের গ্রীষ্মে সে যখন ফিরে এল আমার বিয়ের ব্যবস্থা তখন পাকা হ'য়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে তার এতটুকু দেরী হল না। একটা সপ্তাহেরও বেশী সে এমন চুপচাপ হয়ে গেল যে আমারই কেমন অস্বস্তি লাগছিল।

ন' দিনের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম দরজার তলা দিয়ে আমার ঘরে কে একখানা ছোট চিঠি ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে। পত্রটা তুলে নিয়ে পড়লাম: তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ। তুমি জান সেদিন আমি কী বলেছিলাম। তুমি আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়েছ। আমি চাইনে কেউ আমাকে দেখুক। কেবল তুমি পার্কের সেই কোণায় এস যেখানে গত বছর তোমাকে আমি আমার প্রেম নিবেদন করেছিলাম সেইখানেই খুঁজলে আমাকে তুমি দেখতে পাবে।

উন্মাদিনীর মত কোনরকমে পোশাক পরে আমি সেই পার্কের নির্ধারিত জায়গার দিকে ছুটলাম। মাটির ওপরে কাদায় তার সেই ছোট স্কুলের টুপীটা পড়েছিল, আগের রাত্রিতে সারাক্ষণই বৃষ্টি পড়েছিল। চোখ তুলে তাকালাম আমি। ঝড়ের ঝাপটায় পাতার আড়ালে কী যেন একটা ঝুলছে মনে হল আমার।

তারপরে কী যে করেছিলাম তা আমার মনে নেই। নিশ্চয় আমি চীৎকার করে মূর্ছা গিয়েছিলাম—তারপরে দৌড়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি আমি বিছানায় শুয়ে রয়েছি—মা বসে রয়েছেন আমার পাশে।

প্রথমে মনে হয়েছিল আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আমি বিড়-বিড় করে জিজ্ঞাসা করলাম—ও—ও কি গোনট্রা?

কেউ কোন উত্তর দিল না।

আমার অনুমান সত্য। সে-ই বটে।

আমি আর তার দিকে তাকাতে সাহস করি নি। আমি কেবল তার একগাছি সুন্দর চুল চেয়েছিলাম।"

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রমহিলা বারকয়েক রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছলেন; তারপরে বললেন: কোন কারণ না দেখিয়েই বিয়েটা আমি ভেঙে দিলাম, তারপর থেকে আমি—আমি সেই তের বছরের শিশুর বিধবা স্ত্রী হ'য়ে দিন কাটাচ্ছি।

এইটুকু বলেই তিনি বুকের ওপরে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগলেন—অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে।

সবাই সে রাত্রির মত বিদায় নিলে একটি স্থূলকায় শিকারী—যে এতক্ষণ ঘুমোনোর ব্যর্থ চেষ্টায় মনে-মনে গজরাচ্ছিল—তার পাশের লোকটির কানে-কানে বলছে: অতটা ভাবপ্রবণ হওয়ার বিপদ এইখানে। তাই না?

ছায়াময়ী

[An apparition]

কোন একটা মামলায় সম্পত্তি পৃথকীকরণের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছিলাম। রু দ্য গ্রেনেল-এর পুরানো বাড়িতে সন্ধ্যার সময় কয়েকজন বন্ধু মিলে জটলা করছিলাম আমরা। কথা ছিল আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক একটা সত্যি কাহিনী বলবে। তারপরে বিরাশী বছর বয়স্ক মার্কুই দে লা টুর স্যামেল দাঁড়িয়ে উঠে কম্পিত স্বরে নিম্নলিখিত কাহিনীটি বললেন—

আমিও কিছু আশ্চর্য কাহিনীর কথা জানি। কাহিনীগুলি এমন অদ্ভুত যে সারা জীবন ধরে তারা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ছাপ্পান্ন বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল ; তবু এমন একটা মাসও যায় নি যে মাসে সেই কাহিনী নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি নি। সেদিন যে ভয়টা আমি পেয়েছিলাম সেই ভয়টা আজও আমার মন থেকে অপসৃত হয় নি। পুরো দশটি মিনিট ধরে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার সামনে আমি বসেছিলাম। সেই স্মৃতিটা আজও আমার মন থেকে মুছে যায় নি। হঠাৎ কোন গোলমাল শুনলেই আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে ; রাত্রির অন্ধকারে আবছা কিছু দেখলেই ভয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠি। মোট কথা, রাত্রিতে আমি ভয় পাই।

ঘটনাটি আমাকে এতই ভয়বিহ্বল আর বিপর্যস্ত করে তুলেছিল যার কোন কারণ আমি খুঁজে পাই নি ; খুঁজে পাই নি বলেই সে কথা কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি নি। ঠিক যেভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল সেভাবে আমি তোমাদের কাছে বলব না। এর কোন কৈফিয়তও আমি তোমাদের দেব না। সে সময় আমি যদি উন্মাদ হয়ে না যেতাম তাহলে হয়ত ঘটনাটিকে আমি ব্যাখ্যা করতে পারতাম। কিন্তু আমি প্রমাণ করব যে আমি উন্মাদ হই নি। তোমাদের যা ইচ্ছে হয় মনে করতে পার। ঘটনাটা হচ্ছে এই—

১৮২৭ সাল—মাসটা হচ্ছে জুলাই। তখন আমি রাওয়েনে চাকরি করছি। একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিলাম—এমন সময় একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। মনে হল, তাঁকে আমি চিনি ; কিন্তু কবে আর কোথায় যে আমাদের পরিচয় হয়েছিল তা আমি মনে করতে পারলাম না। স্বাভাবিকভাবেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনিও তা লক্ষ্য করলেন, তারপরে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে।

ভদ্রলোকটি আমার যৌবনের বন্ধু। তাঁকে একসময় আমি খুবই

ভালবাসতাম। পাঁচটা বছর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। মনে হল, এই ক'বছরের মধ্যে তিনি পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ হ'য়ে গিয়েছেন। চুল সাদা ; জীর্ণের মত তিনি কুঁজো হ'য়ে হাঁটছিলেন। আমাকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি তাঁর জীবনের কাহিনী বললেন। একটি দুর্ভাগ্য তাঁকে একেবারে ধরাশায়ী করেছে। একটি যুবতীর প্রেমে পড়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। বছরখানেক উন্মাদের মত ভালবেসেছিল তাকে, সুখের সাগরে ভেসে দিন কাটিয়েছিলেন। তারপরে হঠাৎ হৃদ-রোগে যুবতীটি মারা যায়—খুব সম্ভবতঃ প্রেমের ব্যর্থতাও সেই মৃত্যুর জন্যে কিছুটা দায়ী ছিল। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেদিন শেষ হল সেইদিনই তিনি তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ; এবং রাওয়েনে তাঁর যে নিজের বাড়ি রয়েছে সেইখানে বসবাস করতে থাকেন। সেইখানে শোকে মুহ্যমান হ'য়ে তিনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন। মাঝে-মাঝে শোকের উচ্ছ্বাসটা তাঁর এত বেড়ে ওঠে যে আত্মহত্যার কথা চিন্তা না ক'রে তিনি পারেন না।

তিনি বলে গেলেন—তোমার সঙ্গে আবার যখন আমার দেখা হ'য়ে গেল, তখন তুমি একটা কাজ করে দাও। কাজটা খুব জরুরী। তুমি আমার পুরনো বাসায় যাও ; সেখানে আমার অর্থাৎ আমাদের শোওয়ার ঘরের ডেস্ক-এ আমার কয়েকটা দরকারী কাগজ পড়ে রয়েছে। সেগুলি নিয়ে এস। জিনিসটাকে গোপন রাখার প্রয়োজন রয়েছে বলেই আমি কোন উকিল বা চাকরকে সেখানে পাঠাতে চাইনে। আমার কথা যদি বল তাহলে বলব বিশ্বের কোন কিছুর লোভেই আর আমি সেখানে যাব না। তোমাকে আমি ঘরের চাবিটা দিচ্ছি। চলে আসার সময় নিজেই আমি ঘরে তালা দিয়ে এসেছিলাম। সেই সঙ্গে দিচ্ছি ডেস্ক-এর চাবি—মালিকেও একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। সে-ই তোমাকে দরজা খুলে দেবে। কিন্তু কাল এস, আমার সঙ্গে প্রভাতী চা খাবে। পরের ব্যবস্থাটা আমরা তখনই করে ফেলব।

এইটুকু সাহায্য আমি করব—এই বলে তাঁকে আমি আশ্বাস দিলাম। একটু বেড়িয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়। রাওয়েন থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে তাঁর পূর্বতন বাড়ি। ঘোড়ায় চড়ে সেখানে পৌছতে ঘণ্টাখানেক সময় লেগেছিল মাত্র।

পরের দিন সকাল দশটায় ব্রেকফাস্টের জন্য আমি বন্ধুর বাসায় হাজির হলাম ; দু'জনে বসে একসঙ্গেই খেলাম, কিন্তু তিনি বিশেষ কথা বললেন না। তিনি কথা না বলার জন্যে আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন—বললেন ও-বাড়ির কথা মনে হতেই আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছি। পুরনো শোকটা আবার আমার উথলে উঠেছে।

তাঁকে দেখে বেশ উত্তেজিত মনে হল। মনে হল তিনি কী যেন ভাবছেন। যেন তাঁর মনের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ চলছে।

অবশেষে কী আমাকে করতে হবে সে সম্বন্ধে আমাকে সব বুঝিয়ে বললেন। কাজটা খুব সহজ। ডেস্ক-এর ডান দিকের প্রথম ড্রয়ারে দুটো চিঠির প্যাকেট রয়েছে আর রয়েছে এক বাণ্ডিল কাগজ। সেই ড্রয়ারের চাবিটা আমাকে তিনি দিলেন। তিনি বললেন—চিঠিগুলির ওপরে ইচ্ছে করলে তুমি চোখ বুলাতে পার।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেলা একটার সময় আমি কাজে বেরিয়ে গেলাম।

আবহাওয়াটি বড় চমৎকার ছিল। ভরতপাখির গান শুনতে-শুনতে বুকের ওপরে তরোয়ালের ঝংকার তুলে মাঠের ওপর দিয়ে মহা আনন্দে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগোতে লাগলাম। তারপরে আমি বনের মধ্যে ঢুকলাম—ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলাম। তাঁর পল্লীনিবাসে পৌঁছিয়ে মালির জন্যে যে চিঠিটি পকেটে ছিল সেটিকে আমি বার করলাম। অবাক হ'য়ে দেখলাম সেটার মুখ গালা দিয়ে জোড়া। শুধু চটিই নি; বিরক্ত হ'য়ে আমি ভেবেছিলাম ফিরে আসি; কিন্তু তারপরেই মনে হল—এইভাবে ফিরে গেলে নিজের ভাবাবেগকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। আমার বন্ধুটি তাঁর বর্তমান মানসিক বিপর্যয়ের জন্যই হয়ত অন্যমনস্কভাবে চিঠিটি এঁটে দিয়েছেন; আর আমি তা লক্ষ্য করি নি।

দেখে মনে হল, প্রায় বছর কুড়ি বাড়িটি পরিত্যক্ত রয়েছে। গেট খোলা, এতটা ভাঙা যে ওই অবস্থায় ওটা যে কেমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা ভেবেই আমি আশ্চর্য হলাম। ভেতরে ঢোকার রাস্তাটা বড়-বড় ঘাসে ঘোরাই হ'য়ে গিয়েছে। ফুলগাছগুলিকে উঠোনের ঘাসে আর চেনা যায় না।

জানালায় জোরে ঝাঁকানি দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাশের দরজা দিয়ে একটি বুড়ো লোক বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে কেমন যেন অবাক হ'য়ে গেল। চিঠিটি পেয়ে সে পড়ল, একবার নয়, বার বার, তারপরে সেটি পকেটে ঢুকিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল: কী চাই আপনার?

আমি ছোট্ট করে বললাম: তোমার তা জানা উচিৎ কারণ মনিবের নির্দেশ তুমি পড়েছ। আমি ঘরে ঢুকতে চাই।

কেমন যেন বিভ্রান্ত হ'য়ে গেল লোকটি—মানে আপনি······মেয়েটির ঘরে ঢুকবেন······

ধৈর্যচ্যুতি ঘটার যোগাড় হল আমার—এই···শোন···তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও?

বিভ্রান্ত হ'য়ে সে আমতা-আমতা করতে লাগল—না, তা নয় স্যার। সেই থেকে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ও-ঘরটা আর খোলা হয় নি।—আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন······আমি দেখে আসি···

আমি চটে উঠে থামিয়ে দিলাম তাকে; বললাম: কী বলতে চাচ্ছ তুমি? চাবি আমার কাছে। তুমি ঘরে ঢুকবে কী করে?

তাহলে, স্যার, আসুন।……এ ছাড়া আর কিছুই বলার ছিল না তার।

বললাম: আমাকে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও। আমি নিজেই ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা করব।

কিন্তু স্যার… মানে… বাস্তবিক…

এবারে আমি সত্যি-সত্যিই চটে উঠলাম; বললাম: এখন তুমি চুপ কর। বকবক করলে মজাটা বুঝতে পারবে।

এই বলে তাকে ঠেলে সরিয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

প্রথমে আমি রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম। তারপরে ঢুকলাম দু'টি ঘরে—একটি ঘরে থাকত তার চাকর, আর একটি ঘরে তার স্ত্রী। তারপরে পড়ল একটি বড় হল ঘর। সেখান থেকে উঠলাম সিঁড়িতে। তারপর বন্ধুর নির্দেশিত ঘরের দরজাটাকে চিনতে পারলাম। দরজাটা সহজেই খুলে ফেললাম। তার পর ভেতরে ঢুকলাম। ঘরটা এত অন্ধকার ছিল যে প্রথমে আমি কিছুই দেখতে পাই নি; আমি একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনেকদিন ধরে ঘর বন্ধ থাকলে, বিশেষ ক'রে যে ঘরের মধ্যে কেউ মারা গিয়েছে সেইরকম ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে যেরকম একটা পচা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয় এই ঘরটির ভেতরেও সেইরকম শ্বাসরোধকারী একটা দুর্গন্ধ ছাড়ছিল। তারপরে ধীরে ধীরে অন্ধকারে আমার চোখ দুটি থিতিয়ে এল। সেই বিরাট অগোছালো শোওয়ার ঘরটি আমি বেশ ভাল করেই দেখতে পেলাম। দেখলাম, বিছানার ওপরে কোন চাদর পাতা নেই; কিন্তু তখনও একটা মাদুর পাতা রয়েছে, আর রয়েছে বালিশ। তার একটির ওপরে বেশ গভীর একটা দাগ পড়েছে, দেখলেই মনে হবে কিছুক্ষণ আগেই কেউ যেন কনুই-এর ওপরে তার মাথাটি রেখে বিশ্রাম করছিল। চেয়ারগুলি এদিকে-ওদিকে ছড়ানো। একটা ছোট ঘর আমার চোখে পড়ল। তার দরজা অর্দ্ধেকটা খোলা।

প্রথমেই আমি জানালার ধারে গেলাম; আলো ঢোকার জন্তে পাল্লাগুলো খুলে দিলাম। কিন্তু জানালার খড়খড়িগুলি অনেক দিন বন্ধ থাকার ফলে এমনি শক্ত হ'য়ে বসে গিয়েছিল যে সেগুলিকে কিছুতেই আমি নড়াতে পারলাম না। তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করলাম। তাতেও কিছু হল না। তারপর আমি যখন তিতিবিরক্ত হ'য়ে উঠলাম—এবং সেই আলোতেই মোটামুটি রকম সবকিছু দেখতে পারছিলাম এই ভেবে খড়খড়ি খোলার চেষ্টায় আর পণ্ডশ্রম না করে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

একটা আরাম কেদারার ওপরে বসে যে ড্রয়ারটির কথা বন্ধু আমাকে বলেছিল তার তালাটা টানলাম। ড্রয়ারটা একেবারে বোঝাই হয়ে ছিল। আমার দরকার ছিল মাত্র তিনটি কাগজের প্যাকেটের। সেইগুলিই হাতড়াতে

লাগলাম।

প্যাকেটগুলির ওপরের লেখাগুলি পড়ার জন্তে আমি যখন চোখ চিরে-চিরে দেখছি এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হল আমার পেছনে একটা যেন খস খস শব্দ হচ্ছে। বাইরের হাওয়ায় ভেতরের কোন কাগজপত্র নড়ছে এই ভেবে প্রথমে ব্যাপারটাকে আমি কিছুমাত্র গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি নি। কিন্তু দু' এক মিনিটের মধ্যেই আর একটা খসখসানি হ'ল; এবারে খুব কাছে—আর প্রায় অস্পষ্ট সে শব্দ। আমার চামড়ার ভিতর দিয়ে একটা অস্বস্তিকর কনকনে শিহরণ বয়ে গেল। ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা মূর্খতা হবে ভেবে একবারও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম না আমি। তখন আমি দ্বিতীয় প্যাকেটটা পেয়েছি; এবং তৃতীয় প্যাকেটটা তুলে নেওয়ার জন্তে হাত দিয়েছি এমন সময় ঠিক আমার কাঁধের ওপরে একটি দীর্ঘ আর করুণ যন্ত্রণা-দায়ক নিঃশ্বাস এসে পড়ল। হঠাৎ পাগলের মত এক ঝটকায় পেছনে ঘুরেই লাফ দিলাম আমি—কয়েক ফুট দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। লাফ দিয়েই তরো-য়ালের মাথাটা মুঠোর মধ্যে ধরে আমি দাঁড়ালাম ঘুরে। সত্যি কথা বলতে কি অশরীরিটি আমার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা অনুভব করতে না পারলে কাপুরুষের মত আমি চোঁ-চোঁ দৌড় দিতাম।

কী দেখলাম! একটি মহিলা—দীর্ঘাঙ্গিনী—সাদা ধবধব করছে তার পোশাক; যে চেয়ারের ওপরে একমুহূর্ত আগে আমি বসেছিলাম সেই চেয়ারের পেছন থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার সারা শরীরের ভেতরে এমন একটা কাঁপুনি ধরল যে আর একটু হলে আমি মেঝের ওপরে পড়ে যেতাম। সেই ভয়ানক আতঙ্ক যে কোনদিন অনুভব করে নি তাকে আমার অবস্থাটা বোঝানো যাবে না। অথচ, সেই আতঙ্কের পিছনে কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই নি। এই অবস্থায় কোন কিছু চিন্তা করার মত মানসিক অবস্থা মানুষের থাকে না; হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম করে। সারা শরীরটা স্পঞ্জের মত শিথিল হ'য়ে যায়—মনে হয় প্রাণটুকু এবারে বুঝি বেরিয়ে যাবে।

ভূত-টুতে আমি বিশ্বাস করিনে; তবু সেদিন ভূতের ভয়ে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। সেদিন সেই অশরীরী আত্মাটাকে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি যে ভয় পেয়েছিলাম ওরকম ভয় জীবনে আর কোনদিনই আমি পাই নি। সে যদি কথা না বলত তাহলে হয়ত আমি মারাই যেতাম। কিন্তু সে কথা বলল; এমন মিষ্টি সুরে বলল যে আমার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীগুলি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। একথা আমি বলতে পারব না যে নিজেকে সামলিয়ে নিতে পেরেছিলাম আমি। সুস্থভাবে চিন্তা করার শক্তিও যে ফিরে পেয়েছিলাম সে কথাও বলব না আমি। না, আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে কী করছি তা আমি মোটেই বুঝতে পারি নি। তবে হ্যাঁ, একটা গর্ব, সৈনিকের শেষ

দন্ত নিয়ে মুখের চেহারাটাকে আমি মোটামুটিভাবে সহজ করে রাখতে পেরে-ছিলাম। নিজের কাছে ভূতই হোক, অথবা কোন নারীই হোক—তার কাছে আমি যে ভয় পাই নি সেইটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম। অবশ্য পরে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম ; কারণ সেই মূর্তিটি দেখার পরে, আমি তোমাদের নিশ্চয় করে বলতে পারি, ওসব কথা আদৌ মনে হয় নি আমার। তখন আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।

মেয়েটি বলল—করুণ কণ্ঠে বলল—স্যার, আমার জন্তে অনেক কিছু করতে আপনি পারেন।

উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমি, কিন্তু মুখে কোন কথা যোগায় নি। গলার ভেতর থেকে কেবল একটা অস্পষ্ট শব্দ তালগোল পাকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল মাত্র।

সে বলে গেল—করবেন ? আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন ; নিরোগ করতে পারেন আমাকে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে—ভীষণ, ভীষণ।—এই-ভাবে বলতে-বলতে সে সেই চেয়ারের ওপরে বসে পড়ল। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলল—করবেন ?

তখনও আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না ; কেবল ঘাড় নেড়ে বললাম—হ্যাঁ, করব।

এই কথা শুনে মেয়েটি আমার সামনে কচ্ছপের খোলার একটা চিরুনী ধরে আস্তে-আস্তে বলল : আমার চুলগুলি আঁচড়িয়ে দিন। তাতেই আমার অসুখ সেরে যাবে। চুল আমার আঁচড়ে দিতেই হবে আপনাকে। আমার মাথার দিকে চেয়ে দেখুন। কী কষ্টই না পাচ্ছি। এই চুলগুলিই আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

তার চুল খোলা, লম্বা আর কালো। মনে হল চেয়ারের পেছন দিয়ে ঝুলে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়েছে। কাঁপতে-কাঁপতে সেই চিরুনীটা আমি নিলামই বা কেন, আর তার সেই লম্বা কালো চুলগুলি—যেগুলি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে একটা ভীষণ ঠাণ্ডা কনকনে অবসাদ নেমে এল তা আমি বলতে পারব না। সেই অনুভূতিটা আজও আমার আঙুলের ডগায় লেগে রয়েছে। সেকথা মনে হলেই আজও আমি ভয়ে শিউরে উঠি।

কেমন করে তার সেই ঠাণ্ডা চুলগুলিকে সেদিন আমি আঁচড়েছিলাম তা আমি জানিনা। সেই চুলগুলি টেনে-টুনে আঁচড়ে দিয়েছিলাম আমি ; ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম জট। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে মাথা নীচু করেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সে বেশ আনন্দ পাচ্ছে। হঠাৎ সে বলে উঠল—ধন্তবাদ। তারপরে আমার হাত থেকে চিরুনীটা ছিনিয়ে নিয়ে সে পাশের ঘরে পালিয়ে গেল ; আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম পাশের ঘরের দরজাটা আধ-খোলা অবস্থায় ছিল।

একা বসে রইলাম আমি। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে মানুষ যেভাবে চুপচাপ বসে থাকে বেশ কয়েক সেকেণ্ড আমিও সেইরকম চুপচাপ হতভম্বের মত বসে রইলাম। অবশেষে জ্ঞান ফিরে এল আমার। জানালার ধারে দৌড়ে গেলাম আমি ; জোর করে খড়খড়িগুলো খুলে দিলাম। ঘরের মধ্যে একঝলক আলো ঢুকে এল। যে দরজা দিয়ে মেয়েটি ভিতরে ঢুকে গেল সেই দরজার সামনে হাজির হলাম। দেখলাম কপাট তার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। তাকে খোলার সাধ্য আমার নেই।

তারপর আকস্মিক একটা আতঙ্কের মত দৌড়ে পালিয়ে আসার একটা উন্মাদ বাসনা আমার ওপরে ভর করে বসল ; যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা জানে এ-আতঙ্ক কী জিনিস। ডেস্কের ওপরে কাগজের যে তিনটে প্যাকেট পড়েছিল সেগুলি তুলে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম আমি, চারটে করে সিঁড়ির ধাপ এক একটা লাফে পেরিয়ে এলাম ; কেমন করে যে শেষ পর্যন্ত বাইরে বেরিয়ে এলাম তা আমি জানিনে। ঘোড়াটা আমার একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সোজা তার ওপরে লাফিয়ে পড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

পুরো একটি ঘণ্টা ধরে আমি কেবলই ভাবতে লাগলাম—সত্যিই কি আমি ভূত দেখেছি। আমার স্নায়ুগুলি দুর্বোধ্য কোন আতঙ্কে যে দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানসিক দুর্বলতার ফলেই মাঝে-মাঝে আমরা অলৌকিক বস্তু দেখতে পাই ; এই অলৌকিক ঘটনার মূলে রয়েছে অতিপ্রাকৃত কোন শক্তি।

জানালার কাছে এসে আমার মনে হল হয়ত আমি কোন অবাস্তব ছায়াই দেখেছি—। তারপরেই হঠাৎ আমার বুকের দিকে লক্ষ্য পড়ল। আমার সামরিক পোশাক চুলে ভর্তি হ'য়ে গিয়েছে। মেয়েদের লম্বা চুল—আমার গলার বোতামে আটকে রয়েছে। কাঁপতে-কাঁপতে একটি-একটি করে খুঁটে সেগুলি আমি বাইরে ফেলে দিলাম।

তারপরে আমি আর্দালীকে ডাকলাম। বিগত কয়েকটি ঘণ্টায় আমি এতই বিব্রত হ'য়ে ছিলাম যে তখনই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। তাঁকে আমার কী বলা উচিত সে-বিষয়েও কিছু চিন্তা করার ছিল আমার। আর্দালীর হাতে বন্ধুটিকে তার চিঠিগুলি পাঠিয়ে দিলাম। বন্ধুটি সেনানীটির হাতে প্রাপ্তি স্বীকারও করেছিলেন। বিশেষ করে আমার কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাকে। সেনানীটি তাঁকে বলেছিল যে রোদে আমার মাথা ধরেছে—আমি অসুস্থ। সংবাদটা পেয়ে তাঁকে আমার সম্বন্ধে বেশ উদ্বিগ্ন হতে দেখা গিয়েছিল। পরের দিন প্রভাতে সত্য কথাটা বলার অভিপ্রায় নিয়ে আমি তাঁর বাসায় গেলাম। শুনলাম আগের দিন সন্ধ্যেবেলাতেই তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন—তখনও ফেরেন নি। সেদিন আবার গেলাম। তখনও তিনি ফেরেন নি। এক সপ্তাহ আমি অপেক্ষা করলাম—

তখনও তিনি নিরুদ্দেশ। ব্যাপারটা আমি কর্তৃপক্ষদের জানালাম। অনুসন্ধান করার জন্যে দল বেরোল; কিন্তু তাঁর কোন চিহ্ন কেউ পেল না—বা, কী ভাবে তিনি নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন সে বিষয়েও কেউ কিছু জানে না।

বন্ধুর পরিত্যক্ত সেই গ্রাম্য বাড়িটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হল। সন্দেহজনক কোন কিছুই চোখে পড়ল না। সেখানে যে কোন মহিলাকে আটকে রাখা হয়েছে তারও কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধানে কিছু পাওয়া গেল না দেখে অনুসন্ধান বন্ধ করে দেওয়া হল। পরের ছাপ্পান্ন বছর ধরে আর কিছু শুনি নি আমি। আমি আগেও যা জানতাম আজ তাই জানি—তার বেশী নয়।

আমাদের চিঠি

[Our letters]

রাত্রিতে ট্রেণ যাত্রায় কেউ-কেউ ঘুমোয়, কেউ-কেউ অনিদ্রায় ভোগে। আমার কথা যদি বলেন, ট্রেণে চাপলেই পরের দিন আমার ঘুম হবে না।

অ্যাবেল এসটেটে যখন আমি পৌছলাম তখন বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে। বাড়িটি মুরেত দ্য আর্টাসদের। ওঁরা আমার বন্ধু। ওইখানেই তিন সপ্তাহ কাটানোর জন্যে আমি গিয়েছিলাম। বাড়িটি বড় সুন্দর। গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ওদেরই পূর্ব পুরুষরা ওই বাড়িটি তৈরী করিয়েছিলেন। তারপর থেকে বাড়িটিতে তাঁদের সংসারের ছেলেমেয়েরাই বাস করেন। সেইজন্যেই এটির পরিবেশ অত্যন্ত ঘরোয়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে মানুষের বাস করার স্পর্শ ছড়িয়ে রয়েছে, জড়িয়ে রয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার প্রয়াস। একই বাড়ির মানুষেরা এ ঘর সাজিয়েছে, গুছিয়েছে সরগরম করে রেখেছে। কিছুই এর পরিবর্তন হয় নি। কোন আত্মাই এ-বাড়ির চৌহদ্দি থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় নি। একটি আসবাব এ ঘর থেকে সরে যায় নি, পর্দাগুলি বিবর্ণ অবস্থায় দেওয়ালের একই জায়গায় ঝুলছে। নতুন আসবাব আসার ফলে পুরানোগুলি নতুন আত্মীয়দের স্থান করে দেওয়ার জন্যে একটু সরে দাঁড়িয়েছে মাত্র। মনে হবে, ভাই-বোনদের মধ্যে নতুন একটি শিশুর আবির্ভাব হয়েছে।

একটা পার্কের মাঝখানে পাহাড়ের ওপরে বাড়িটি। পাহাড়টা ঢালু হয়ে নদীর দিকে নেমে গিয়েছে। যেখানে নদীর সঙ্গে মিশেছে সেখানে ছোট একটা পাথরের সেতু। নদীর ওপাশে দূরে বিরাট মাঠ। সেখানে ভিজে ঘাসের বনে গরুগুলো ধীরে সুস্থে ঘাস খায়, পায়চারি করে। এই বাড়িটি

আমার বেশ ভাল লাগে। খুব আনন্দের সঙ্গেই প্রতিটি শরৎকালে আমি এখানে আসি। ফিরে যাওয়ার সময় কষ্ট পাই।

ডিনার শেষ হওয়ার পরে প্রিয় বন্ধু পল মুরেতকে জিজ্ঞাসা করলাম: এ বছর কোন্ ঘরে আমাকে শুতে দেবে?

আনট্ রোজের ঘরে।

একঘণ্টা পরে দুটি দীর্ঘাঙ্গিনী কন্যা আর বিরাট বপু ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে মাদাম মুরেত আমাকে আনট্ রোজের ঘরে পৌঁছে দিলেন। এ-ঘরে আগে কোনদিন আমি ঘুমোই নি।

সবাই চলে গেলে ঘরটির সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার জন্যে আমি দেওয়াল আর আসবাবপত্রগুলি পরীক্ষা করলাম। এই ঘরে আগে দু'এক-বারের বেশী আমি ঢুকি নি। সেইজন্যে এর সঙ্গে পরিচয়টা আমার খুব বেশী ছিল না। রঙীন খড়ি দিয়ে আঁকা আনট্ রোজের যে প্রতিকৃতিটি ছিল তার দিকেও বিশেষ অবহেলার সঙ্গেই তাকিয়ে রইলাম। তাঁর নাম থেকেই ঘরের নাম হয়েছে।

আনট্ রোজের বয়স অনেক; চুলগুলি কোঁকড়ানো, চশমার ভেতর থেকে তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু সে-চাহনি আমার মনের ওপরে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, দেখে মনে হল তিনি প্রাচীন-পন্থী মহিলা; এঁদের নীতি আর অনুজ্ঞা ধর্মীয় এবং চারিত্রিক নীতির মতই গোঁড়া, এঁকে দেখলেই আমার সেই সব বৃদ্ধা আনট্দের কথা মনে পড়ে যায় যাঁরা সংসারের সমস্ত রকম আনন্দ আর উচ্ছ্বাসকে শিথিল-ভ্রূকুটি দিয়ে নষ্ট করে দেন, যৌবনের আগুন ভিজে কম্বল দিয়ে নিবিয়ে দেন।

তাঁর সম্বন্ধে কারও কাছ থেকে আমি কিছু শুনি নি। তাঁর জীবন অথবা মৃত্যু কোন বিষয়েই আমি কিছু জানিনে। তিনি কি এই শতাব্দীর মানুষ অথবা, আগের শতাব্দীর? তিনি কি আর পাঁচজনের মত সহজ-ভাবেই দেহত্যাগ করেছেন, অথবা, তাঁর জীবন ছিল উদ্দাম। তিনি কি পবিত্র অবিবাহিতা নারী হিসাবেই স্বর্গে গিয়েছেন? অথবা, বিবাহিতা মহিলার শান্ত আত্মা নিয়েই তিনি মারা গিয়েছেন; অথবা মাতৃহৃদয়ের কোমল প্রাণ ছিল তাঁর? আর তাতে তফাতটাই বা কী রয়েছে? 'আনট্ রোজ'—এই নামটাই কেমন যেন হাস্যকর শুনতে, অতি সাধারণ, আর কুৎসিত।

আমি একটা বাতি তুলে নিয়ে সোনার ফ্রেমে ঝোলানো আনট্ রোজের রূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম মুখের ওপরে বিশেষ কিছু দেখার ছিল না; অথবা, মুখটা খারাপই লাগল আমার—দেখে মনে হল, তার মধ্যে করুণার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তাই আমি আসবাবপত্রগুলি দেখতে লাগলাম। অতি প্রাচীনকালের আসবাব—সেই ষষ্ঠ লুই-এর আমলের। তারপর থেকে

নতুন একটা চেয়ার অথবা পর্দা—কিছুই এ ঘরে ঢোকে নি। এদের মধ্যে থেকে একটি ক্ষীণ আর তীক্ষ্ণ গন্ধ বেরিয়ে আসছিল—সেই গন্ধ হচ্ছে কাঠ, পোশাক, চেয়ার, টেবিল, পর্দা—সব মিশিয়ে; সেই সঙ্গে এতদিন যারা এ ঘরে বাস করত, ভালবাসত, এবং দুঃখ পেত—তাদের গায়ের মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে।

বাতিটা নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়লাম; কিন্তু ঘুম এল না। দু'এক ঘণ্টা এপাশ ওপাশ ক'রে আমি ঠিক করলাম বিছানা থেকে উঠে দু'একখানা চিঠি লিখে ফেলি। দুটো জানালার মাঝখানে একটা ছোট মেহ্‌গনি ডেস্ক ছিল। কালি আর একটু কাগজের খোঁজে আমি সেই ডেস্ক-এর ডালাটা একটু তুললাম। কিন্তু বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না—একটা খাগের কলম ছাড়া—তার একটা পাশ চিবানো। ডেস্কটাকে আমি বন্ধ করতে যাব এমন সময় হঠাৎ একটা চকচকে জিনিসের ওপরে আমার চোখ পড়ে গেল। মনে হল একটা পেরেকের হলদে মাথার মত, ট্রের একটা কোণে একটু উঁচু হ'য়ে রয়েছে। আঙুল দিয়ে তার মাথাটা খুঁটতেই মনে হল সেই যেন ঘুরছে। দুটো নখের ভেতরে ধরে সেটাকে আমি জোরে টান দিলাম। আস্তে-আস্তে সেটা বেরিয়ে এল। এটা একটা লম্বা পিন—কাঠের মধ্যে ঢোকানো ছিল। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে এটা একটা পিন।

হঠাৎ এখানে পিন কেন? কিন্তু তখনই আমার মনে হল হয়ত এর ভেতরে গোপন কোন ড্রয়ার রয়েছে। সেটার কোন স্প্রিং এটা দিয়ে খোলা যাবে। সেইটাই খুঁজতে লাগলাম আমি। অনেক দেরী হল—প্রায় ঘণ্টা দুই চেষ্টার পরে প্রথম গর্তটির ঠিক উলটো দিকে, কিন্তু কাঠের খাঁজের একেবারে তলায় আর একটা ফুটো রয়েছে। এর ভেতরে আলপিনটা ঢুকিয়ে চাপ দিতেই আমার মুখের সামনে একটা ডালা তড়াং করে লাফিয়ে উঠল। সেই খোপের ভেতরে দু'প্যাকেট হলদে চিঠি দেখতে পেলাম। একটা নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা রয়েছে সেগুলি।

আমি সেগুলি পড়লাম। এখানে দু'টি আমি পড়ছি:

"তাহলে তুমি চিঠিগুলি ফিরে পেতে চাও—তাই না প্রিয়তমে? তাই পাঠালাম; কিন্তু পাঠাতে বেশ কষ্ট হয়েছে আমার। কীসের ভয় করেছিলে তুমি? হারিয়ে ফেলব? কিন্তু ওগুলি আমি চাবি দিয়ে রেখেছিলাম সেগুলি খোয়া যাবে বলে কি ভয় হয়েছিল তোমার? ওগুলি আমার সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন, ওগুলি যাতে খোয়া না যায় সেদিক থেকে সতর্ক ছিলাম আমি।

হ্যাঁ, খুবই কষ্ট হচ্ছে আমার। এর জন্যে মনে-মনে তুমি কোন অনুশোচনা করছ কিনা অবাক হয়ে সেই কথাটাই আমি ভাবছি। আমাকে ভালবাসার জন্যে অনুশোচনা নয়—কারণ আমি জানি তুমি আজও আমাকে ভালবাস, অনুশোচনা হচ্ছে এই কারণে যে সাদা কাগজে কলমের মুখ দিয়ে যে ভালবাসা

তুমি প্রকাশ করেছ তা তুমি আমার সামনে বিশ্বাস ক'রে প্রকাশ করতে পার নি। ভালবাসলে মুখোমুখী কথা বলে অথবা লিখে সেই ভালবাসা প্রকাশ করতে হয়। আমরা তাই করে থাকি। ভালবাসার কথাগুলি সঙ্গীতের মত মিষ্টি। সেই বায়বীয়, নরম, উষ্ণ আর হালকা কথাগুলি বলার সঙ্গে-সঙ্গেই উড়ে যায়—পড়ে থাকে কেবল স্মৃতিটুকু; কিন্তু তোমার হাতে লেখা শব্দের মত কেউ তাকে না পারে দেখতে, না পারে স্পর্শ করতে, না পারে চুমু খেতে। তোমার চিঠি? হ্যাঁ, সেগুলি আমি ফিরিয়েই দিচ্ছি। কিন্তু কী দুঃখে!

তুমি যা বলেছ তা মোছ যাবে না। দ্বিতীয় চিন্তায় তুমি নিশ্চয় এই কাজের জন্য লজ্জিত হয়েছ। তোমার ভীরু স্পর্শকাতর মনের অন্তঃস্থলে নিঃসন্দেহে তুমি আঘাত পেয়েছ এই ভেবে যে, যে লোকটি তোমাকে ভালবাসে তাকেই তুমি চরম আঘাত করেছ। তুমি যে কথাগুলি লিখেছিলে নিশ্চয় তা তোমার মনে রয়েছে। তুমি তখন নিজের মনেই বলেছিলে: সেই কথাগুলিকে আমি পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

সন্তুষ্ট হও এবার। শান্ত হও। এই তোমার চিঠি নাও। আমি তোমাকে ভালবাসি।

"প্রিয়বন্ধু,

না, তুমি আমাকে বুঝতে পার নি, ধরতে পার নি আমার কথা। তোমাকে আমি যে ভালবাসার কথা শুনিয়েছি তার জন্যে আমি কোন অনুশোচনা করি নি—করব না কোনদিন। আমি সব সময় তোমাকে চিঠি দেওয়ার চেষ্টা করব, কিন্তু পড়ার পরেই সেগুলি তুমি অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে আমাকে।

প্রিয়তম, এর কারণটা কী তোমাকে যদি বলি তাহলে তুমি আঘাত পাবে। তুমি যা মনে করেছ—এর মধ্যে কবিত্ব কিছু নেই; রয়েছে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয়। আমি ভয় পাই—তোমাকে নয়—কোন দুর্যোগকে। অপরাধিনী আমি নিজে। আমি চাইনে সেই অপরাধের বোঝা আর কাউকে বইতে হয়।

আমাকে ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা কর। তুমি আর আমি দু'জনেই মারা যাব। তুমি রোজ ঘোড়ায় চড়; ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে পার তুমি। দ্বন্দ্বযুদ্ধে হঠাৎ আক্রান্ত হতে পার, হৃদ্‌ঘটিত অসুখে মারা যেতে পার তুমি, গাড়ীর দুর্ঘটনাতেও মারা যাওয়ার সম্ভাবনা তোমার রয়েছে। হাজার রকমে তোমার মৃত্যু হতে পারে। কারণ, মানুষের মৃত্যু যদিও একবারই আসে আমরা যত দিন বেঁচে থাকি তবু তারচেয়েও বেশী পথ দিয়ে মৃত্যু আসতে পারে।

তখন তোমার বোনেরা, তোমার ভাই, অথবা ভাই-এর বৌ-এর হাতে আমার লেখা চিঠিগুলি পড়তে পারে। তোমার কি মনে হয় তারা আমাকে

পছন্দ করে ? সেবিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। ধরে নিলাম তারা আমাকে পছন্দই করে। কিন্তু তাহলেও দুটি মহিলা আর একটি পুরুষের পক্ষে এই গোপন জিনিস সত্ত্বেও তা বাইরে প্রকাশ না করা কি সম্ভব ?

প্রথমেই তোমার মৃত্যুর কথা বলে পরে তোমার আত্মীয়দের বিচক্ষণতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে মনে হয় আমি ভয়ানক রকমের অন্যায় কথাই বলছি। কিন্তু আমরা সবাই কি মারা যাব না ?—কেউ দু'দিন আগে ; কেউ দু'দিন পরে ! আর আমাদের মধ্যে একজন যে আগে মারা যাবে সে-সম্বন্ধেও আমাদের কোন সন্দেহ নেই। সবরকম বিপদের কথাই আমাদের আগে থাকতে ভেবে রাখতে হবে। এমন কি ওই মৃত্যুর সম্ভাবনাটা পর্যন্ত। আমার কথা যদি বল, আমি চিঠিগুলি আমার কাছেই রাখব—আমার ছোট একটা গোপন ড্রয়ার রয়েছে সেইখানে। কবরখানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকা দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার মত প্রেমের কথায় আর ভাবে বিভোর হয়ে সিল্কের ফিতেতে বাঁধা চিঠিগুলি তাদের গোপন গুহায় ঘুমোচ্ছে—তোমাকে আমি তা দেখাব।

তুমি আমাকে বলবে : তুমি যদি আগে মারা যাও তাহলে ওই চিঠিগুলি তোমার স্বামীর হাতে গিয়ে পড়বে।

না, না। সে-ভয় আমি করিনে। প্রথমত আমার এই গোপন ড্রয়ারটির কথা তিনি জানেন না—এবং জানারও চেষ্টা করবেন না। আর আমার মৃত্যুর পরে এগুলি যদি তাঁর চোখেও পড়ে তাতেও আমার কোন ভয় নেই। মৃতা কোন মহিলার ড্রয়ারে কতগুলি প্রেমপত্র রয়েছে তা কি তুমি কোনদিন দেখতে চেয়েছ ? বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তা করেছি ; আর সেই জন্তেই আমার চিঠিগুলি তোমার কাছ থেকে ফিরিয়ে আনার কথা আমি স্থির করে ফেলেছি।

মনে রেখ, যে-চিঠিতে নারীকে কেউ ভালবাসার কথা জানায় সেই চিঠি সে কোনদিনই পোড়ায় না, ছিঁড়ে ফেলে না, নষ্ট করে না। ভালবাসাই তো হচ্ছে আমাদের সারা জীবন, সমস্ত আশা, আকাঙ্খা, আর স্বপ্ন। এই সব ছোট-ছোট কাগজে যেখানে আমাদের আদর করে কিছু লেখা হয় সেইগুলিই তো আমাদের স্মৃতিচিহ্ন, এবং আমাদের—মহিলাদের গির্জা রয়েছে—সেই-খানে প্রেমিকরা আমাদের সেন্ট বলে পূজা করে। প্রেমমাত্রই আমাদের সৌন্দর্য, লাবণ্য, আমাদের মনোমুগ্ধকারী চটুলতা আর দম্ভ বিস্তারের ক্ষেত্র, আমাদের হৃদয়ের ধন। কোন নারী এই গোপনকাহিনী নষ্ট করতে পারে না ; কারণ ওগুলিই হচ্ছে আমাদের জীবনের কারুকার্য।

কিন্তু আর সকলের মতই আমরাও মারা যাব, এবং তারপর···তারপর এই চিঠিগুলি লোকের চোখে পড়বে। কে খুঁজে পাবে ? স্বামী ? খুঁজে পেয়ে তিনি কী করবেন ? কিছু না—পুড়িয়ে ফেলবেন।

এ-বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছি আমি। একবার ভেবে দেখ অপরের ভাল-বাসা নিয়ে প্রতিদিনই নারীরা মারা যাচ্ছে। প্রতিদিনই সেই সব নারীদের অপরাধের দলিল তাদের স্বামীদের হাতে পড়ছে; আর তার জন্যে বাইরে তাদের কোন কুৎসা রটে না—দ্বন্দ্বযুদ্ধ তো নয়ই।

প্রিয়তম, পুরুষদের হৃদয় যে কী দিয়ে গড়া সেকথা একবার ভেবে দেখ। জীবন্ত নারীদের ওপরেই পুরুষরা প্রতিহিংসা নেয়। কোন পুরুষ প্রেমিকাকে অপমান করলে তার প্রেমিক সেই অপমানকারীর সঙ্গে লড়াই করে। প্রেমিকা বেঁচে থাকতেই সে করে আত্মহত্যা—কারণ—কেন বলত? ঠিক কেন তা আমি জানিনে। কিন্তু সেই প্রেমিকার মৃত্যুর পরে সেই পুরুষ যদি একই রকমের প্রমাণ পায় তাহলে সে সেগুলিকে পুড়িয়ে ফেলে; এবিষয়ে আর কেউ কিছু জানতে পারে না। সে সেই মৃতা নারীর প্রেমিকার সঙ্গে করমর্দন করে—সেই প্রেমপত্রগুলি যে অন্য কারও হাতে পড়ে নি এই ভেবে শান্তি পায় মনে। চিঠিগুলি যে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এই ভেবে সোয়াস্তি পায় যথেষ্ট।

আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এমন অনেক পুরুষকে আমি জানি যারা এই ধরনের প্রমাণ পুড়িয়ে ফেলেছে, তারপর এমন সব ভাব দেখায় যে যেন তারা কিছুই জানে না। অথচ এমনি মজার ব্যাপার যে সেই নারীরা যখন বেঁচে থাকে তখন এই পুরুষরাই উন্মাদের মত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে যুদ্ধ করত। কিন্তু সেই নারীদের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সম্মানের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। মৃত্যুই বৈবাহিক অপরাধ মুকুব করে দেয়।

সেইজন্যেই আমাদের চিঠিগুলি আমার কাছে নিরাপদে থাকবে—তোমার কাছে থাকলে ওগুলি আমাদের দুজনেরই বিপদ ডেকে আনবে। এর পরেও কি তুমি বলবে যে আমি ঠিক নয়?

আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার চুম্বন গ্রহণ কর। রোজ।

আনটু রোজের প্রতিকৃতির দিকে আমি মুখ তুলে তাকালাম। তাঁর সেই রুক্ষ কঠোর কুঞ্চিত মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম মহিলাদের হৃদয়রহস্য কী গভীর—এত গভীর যে তার তলদেশে কী রয়েছে তা আমরা বুঝতে পারিনে। বাইরে থেকে দেখে তাদের যেরকমটি মনে হয় আসলে তারা তা কোনদিনই নয়। তাদের সেই সহজাত এবং ধূর্ত কলাকৌশল আর নিঃশব্দ কপটতা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য।

রাত্রি

[Night]

একটি দুঃস্বপ্ন

রাত্রিকে আমি খুব খুব ভালবাসি। নিজের দেশকে মানুষ যেমন ভালবাসে, নিজের প্রেমিকাকে মানুষ যেমন ভালবাসে আমিও রাত্রিকে ঠিক সেইরকম ভালবাসি। সমস্ত মন-প্রাণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে রাত্রিকে ভালবাসি আমি—চোখ দিয়ে দেখি, অনুভূতি দিয়ে এর গন্ধ উপভোগ করি, কান দিয়ে নৈশব্দের গুঞ্জন শুনি, সমস্ত দেহ দিয়ে সম্ভোগ করি এর সান্নিধ্য। এর ছায়াগুলি আমাকে আদর করে যায়। নীল আকাশে প্রভাতের গরম রোদে ভরত-পাখিরা গান গায়। রাত্রির অন্ধকারে উড়ে যায় পেঁচা—মনে হয় আকাশের একফালি বিষণ্ণ অন্ধকার একপোঁচ কালি ঢেলে দিল। অফুরন্ত কালোর সমুদ্রে মসগুল হয়ে সে সাঁতার কাটছে; অন্ধকারের রূপে উন্মাদ হ'য়ে সে ভয়ঙ্কর রকমের একটি কর্কশ ধ্বনি করছে। সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারপাশে।

দিনের বেলায় আমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি—কিছু ভাল লাগে না আমার। দিনগুলি বড় নিষ্ঠুর, বড় শব্দমুখর। দিনের বেলা বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না আমার—ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে আমি পোশাক পরি; বাইরে বেরোই বেশ কষ্ট করে। তখন প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন, প্রতিটি কথাবার্তায় বেশ একটা কষ্ট হয় আমার—মনে হয় যেন একটা বিরাট বোঝা আমার ঘাড়ে চেপে রয়েছে।

কিন্তু সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার সারা সত্তার ওপর দিয়ে একটা নাম-না-জানা আনন্দের ঢল নামে। আমি জেগে উঠি—চঞ্চল হ'য়ে ওঠে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি। ছায়াগুলি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়—আমি তখন অন্য মানুষ—আমার স্তিমিত যৌবন আবার ফিরে আসে, ফিরে আসে শক্তি; আমি যেন আরও চঞ্চল, সুখী হ'য়ে উঠি। বিরাট-বিরাট দীর্ঘায়ত ছায়াগুলি আলতোভাবে আকাশ থেকে নেমে আসে—ধীরে-ধীরে ঘন হয়। আমি তাদের লক্ষ্য করি। শহর আর শহরতলীকে তারা পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে—গ্রাস করে ফেলে একেবারে। চারপাশের রঙ নিশ্চিহ্ন করে মুছে দেয়। বাড়ি, ঘর, দুয়ার সব ঢেকে যায় অন্ধকারে। তখন আনন্দে পেঁচার মত ডাকতে ইচ্ছে যায় আমার, বেড়ালের মত ছাদের ওপরে ছোটাছুটি করতে ইচ্ছে যায়—ধমনীতে জ্বালা অনুভব করতে আমার মনে একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন প্যারিসের বাইরে আমি ঘুরতে বেরোই, ঘুরে বেড়াই কাছাকাছি কোন বনের ধারে—সেখানে আমার বোনের মত জন্তুরা আর ভাই-এর মত পোকারা শিকারের অন্বেষণে লুকিয়ে-লুকিয়ে চুপিসারে ঘুরে বেড়ায়।

কোন জিনিসকে মানুষ যদি উন্মাদের মত ভালবাসে তাহলে শেষ পর্যন্ত তারই হাতে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু আমার কি হচ্ছে তা আমি মানুষকে বোঝাব কেমন করে ? এটা যে বলার ক্ষমতা আমার রয়েছে তাই বা তাদের আমি বোঝাব কেমন করে ? তা আমি জানিনে ; তা আমি বলতে পারিনে। কী ঘটেছে সেইটুকুই আমি কেবল জানি। এর বেশী কিছু নয়।

গতকাল—সত্যিই কি গতকাল ? হ্যাঁ—নিঃসন্দেহে, যদি অবশ্য আরও আগে—একদিন, একমাস, একবছর আগে না হয়। আমি ঠিক মনে করতে পারছিনে—নিশ্চয় গতকাল হবে—কারণ তারপর থেকে আর কোনদিন আসে নি, আমার জীবনে আর কোন সূর্য ওঠে নি। কিন্তু কতক্ষণ রাত্রি ছিল ? কতক্ষণ ? কে বলবে ? কে বলতে পারে ?

প্রতিদিনের মত গতকালও ডিনার শেষ করে আমি বেড়াতে বেরোলাম। সুন্দর রাত, বেশ গরম। বুলেভার্ড পেরিয়ে যাওয়ার সময় ওপরে তাকিয়ে দেখলাম বাড়ির ছাদগুলির মাঝখান দিয়ে খণ্ড-খণ্ড আকাশ-ভরা নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। তারা অন্ধকারের টানা স্রোতে ভাসছে ডুবছে। নক্ষত্র থেকে গ্যাসের বাতিগুলি পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন আকাশের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। শহরের ওপরে এত আলো জ্বলছিল যে ছায়াগুলিও কেমন যেন উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। প্রখর সূর্যকিরণের চেয়ে আলোয় ভরা রাত্রি আমাকে অনেক বেশী আনন্দ দেয়। বুলেভার্ডের ওপরে রেস্তোরাঁগুলি আলোতে চকচক করছিল। হাসতে-হাসতে গল্প করতে-করতে অসংখ্য মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে—মদ খাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্যে আমি থিয়েটারে গেলাম। সেখানে এত আলো যে অবসন্ন হ'য়ে পড়লাম আমি। আলোর চমক সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এলাম। হাজির হলাম ক্যাম্পস-এলিসিতে। সেখানে ফাঁকা জায়গায় কনসার্ট বসেছে। মনে হল যেন গাছের ডালগুলি সব দাউ-দাউ করে পুড়ে যাচ্ছে। ইলেকট্রীক বাল্বগুলিকে দেখে মনে হল উজ্জ্বল চাঁদগুলি ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে ; মনে হল চাঁদের ডিম তারা। বিশ্রী গ্যাসের বিভিন্ন রঙের আলোতে মনে হল যেন বিরাট-বিরাট জীবন্ত মুক্তাবিন্দু আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে।

দীর্ঘ এবং অদ্ভুত সুন্দর রাজপথের দিকে তাকিয়ে দেখার জন্যে আমি আর্ক ড ট্রায়োমফের নিচে দাঁড়ালাম। আগুন আর নক্ষত্রের সারির মধ্যে দিয়ে এই রাজপথটি সোজা প্যারিসের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। তারপরে হাজির হলাম বয় ড বোলোন-এ। এইখানে আমি অনেকক্ষণ রইলাম। এইখানে একটা নাম-না-জানা চঞ্চলতা আমাকে গ্রাস করে ফেলল—একটি অভূতপূর্ব উত্তেজনা—মনে হল, ভেতরের উত্তেজনায় আমি উন্মাদ হ'য়ে যাব। আমি

হাঁটতে লাগলাম। তারপরে ফিরলাম। তারপরে আবার কখন আর্ক দ্য ট্রায়োমফেতে ফিরে এলাম তা আমি বলতে পারব না। সময়ের কোন জ্ঞান ছিল না আমার। সারা শহর তখন ঘুমোচ্ছে; আর বিরাট-বিরাট কালো মেঘ আকাশের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই প্রথম আমার মনে হল ভয়ঙ্কর কিছু একটা আজ ঘটবে।

খুব শীত-শীত করছিল। আমার প্রিয় রাত্রির ওপরে, আমার হৃদয়ের ওপরে বাতাস ভারি হ'য়ে চেপে-চেপে বসছিল। জনশূন্য রাজপথ। একটা ঘোড়ার গাড়ীর পাশ দিয়ে দুটি নিঃসঙ্গ পুলিশম্যান হেঁটে যাচ্ছিল; 'হাল'-এর দিকে চলেছিল সারিবন্দী হয়ে অনেকগুলি শব্জীর গাড়ী—নিঃশব্দে অন্ধকারে। তাদের গ্যাসের লণ্ঠন নিবু-নিবু হয়ে উঠেছিল। গাজর, শালগম আর কফিতে বোঝাই ছিল গাড়ীগুলি। ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল তারা। গাড়োয়ানরা ভেতরে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ঘোড়াগুলি স্বাধীনভাবে কোনরকম শব্দ না করেই এগিয়ে যাচ্ছিল ধীরে-ধীরে। মাঝে-মাঝে রাস্তার বাতিস্তম্ভগুলি পেরিয়ে যাওয়ার সময় আলো পড়ে শব্জীগুলি চিকচিক করে উঠছিল। তাদের পিছু-পিছু কিছুটা গিয়ে আমি রু অ্যালএর দিকে ঘুরলাম—তারপরে ফিরে এলাম বুলেভার্ডে। পথঘাট নির্জন—কোন কাফেই খোলা নেই। কেবল কিছু পথচারী রাত হয়ে যাওয়ার ফলে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে। এইরকম মৃত আর পরিত্যক্ত প্যারিস কোনদিনই আমার চোখে পড়ে নি। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো বাজে।

একটা শক্তি আমাকে যেন টেনে নিয়ে চলেছিল। ব্যাস্টিল পর্যন্ত তাই আমি এগিয়ে গেলাম। সেখানেই বুঝতে পারলাম এত অন্ধকার রাত্রি জীবনে আমি দেখি নি; কারণ, কোলোন দ্য জিলেটকেও আমি দেখতে পারছিলাম না। ওখানকার সোনার জিনিয়াস মূর্তিটিও দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি। আশেপাশে একটা লোকও চোখে পড়ল না আমার। একটা মাতাল আমার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল; তারপরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণ ধরে তার স্খলিত পদের অবিন্যস্ত পদধ্বনি আমি শুনতে পেলাম। আমি চলতে লাগলাম। ফবর্গ মন্তমার্টির ওপরে একটা ঘোড়ার গাড়ী দেখতে পেলাম। সেটা সীন নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। গাড়োয়ানকে আমি ডাকলাম—কিন্তু আমার কথা কানেই তুলল না সে। রু ক্রয়োতের কাছে একটা বারবণিতা দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। আর কেউ কোথাও নেই—আর কোন শব্দ নেই কোনখানে; ভদেভিল থিয়েটারের সামনে একটা ভিখারীর সঙ্গে দেখা হল। পুচকে একটা লণ্ঠন নিয়ে সে ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ক'টা বাজে বন্ধু?

সে গজগজ করে বলল: কী করে জানব? আমার হাতে কোন ঘড়ি

নেই।

তারপরেই হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম সব আলো নিভে গিয়েছে। আমি জানতাম ব্যয় সঙ্কোচের জন্যে বছরের এই সময়টা তাড়াতাড়ি রাস্তার আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দিনের আলো আসতে এখনও অনেক—অনেক দেরী।

মনে-মনে বললাম: চল, এখন 'হাল'-এর দিকে যাই। সেখানে জীবন্ত মানুষের কিছু সন্ধান পেতে পারি।

সেইদিকে এগিয়ে গেলাম; কিন্তু বড় অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বনের মধ্যে দিয়ে লোকে যেমন করে পথ চলে আমিও সেইভাবে অতি সন্তর্পণে রাস্তা গুণে-গুণে এগোতে লাগলাম। ক্রেডট ল্যায়োনের কাছে একটা কুকুর চীৎকার করে উঠল। খানিকটা পিছন ফিরলাম আমি; তারপরেই গুলিয়ে ফেললাম পথ। আবার অন্ধকারে ঘুরতে লাগলাম। সারা প্যারিস শহরই যেন মরণ ঘুমে ঘুমোচ্ছে। দূরে একটা—মাত্র একটা—ঘোড়ার গাড়ীর ক্যাচক্যাচানি শোনা গেল। সম্ভবত এটার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই আমার দেখা হয়েছিল। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মৃতবৎ নির্জন পথের ওপর দিয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম আমি। আবার পথ হারিয়ে ফেললাম। আমি কোথায়? এইভাবে রাস্তার সব আলো নিভিয়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয়? একটা লোকও রাস্তায় নেই—একেবারে নির্জন, নিরালা পথ। একটা চোরও নেই—কামুক কোন বেড়ালের ডাকও শুনতে পেলাম না। কিছু না, কিছু না।

মনে মনে বললাম: পুলিশই বা কোথায়? জোরে চেঁচাই। তাহলে নিশ্চয় তাদের সাড়া পাওয়া যাবে।

এই ভেবে চীৎকার করলাম। না, কেউ কোথাও নেই। আরও জোরে চীৎকার করলাম। কারও কোন সাড়া নেই। কোন প্রতিধ্বনিও শুনতে পেলাম না। সেই দুর্ভেদ্য রাত্রির অন্ধকারে আমার স্বরের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। ব্যাকুল হয়ে আমি আবার চীৎকার করে উঠলাম—সাহায্য কর সাহায্য কর। আমার সেই আর্তনাদে কেউ সাড়া দিল না। ক'টা বাজে। ঘড়িটা টেনে নিলাম। কিন্তু আমার কাছে কোন দেশলাই ছিল না। একটু অদ্ভুত আর অপরিচিত আনন্দে ঘড়িটা টিকটিক করতে লাগল। মনে হল ওটা জীবন্ত। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিজেকে আর একা মনে হল না আমার। কী অদ্ভুত! সেই অন্ধকারে লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে আমি এগোতে লাগলাম। দিনের আলো ফুটে উঠতে আর কত দেরী দেখার জন্যে মাঝে-মাঝে আমি আকাশের দিকে তাকাই। কিন্তু আকাশ অন্ধকার, শহরের চেয়েও অনেক—অনেক বেশী অন্ধকারের আস্তরণে ঢাকা।

রাত কত হ'তে পারে। মনে হল আমি অনন্তকাল ধরে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যন্ত্রণায় আমার পাগুলি ভেঙে পড়ছে, ঢিপ-ঢিপ করছে বুক;

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। ঠিক করলাম, এবার প্রথম যে বাড়ি চোখে পড়বে সেখানেই কলিং বেল টিপব। একটা তামার বেল টিপলাম। ঘরের ভেতরে ঝনঝন করে বেলটা বেজে উঠল। শব্দটা অদ্ভুত ; মনে হল, ঘরের মধ্যে সেই শব্দ ছাড়া আর কেউ নেই। অপেক্ষা করলাম আমি। না, কারও কোন সাড়া নেই। দরজা খুলল না। আবার বেল টিপলাম। আবার অপেক্ষা করলাম—সেই একই ব্যাপার। ভয় পেয়ে গেলাম। ছুটলাম পাশের বাড়িতে। পরপর কুড়িবার বেল টিপলাম সেখানে। সেই অন্ধকার বারান্দায় দরোয়ানের থাকার কথা ; কিন্তু ঘুম তার ভাঙলো না। পরপর অনেক বাড়িতেই বেল বাজালাম, দরজায় লাথি মারলাম, লাঠি দিয়ে ঠকঠক করলাম। না, কারও কোন সাড়া নেই। মনে হল এই প্রেতের রাজ্যে একটা মানুষও আজ আর বেঁচে নেই।

হঠাৎ মনে হল আমি 'হাল'-এতে হাজির হয়েছি। নির্জন বাজার—কোন লোক নেই, পসারী নেই, শকট নেই, পণ্য নেই ; শূন্য, স্থবির, মৃত, পরিত্যক্ত। হঠাৎ ভয়ে শিউরে উঠলাম। কী হচ্ছে চারপাশে ? হায় ভগবান, চারপাশে কবরখানার স্তব্ধতা কেন ?

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু ক'টা বেজেছে ? ক'টা ? কে আমাকে বলবে রাত্রি এখন কত ? গির্জার ঘড়িতে কোন ঘণ্টা বাজলো না, সরকারী বাড়ির ঘড়িগুলিও সব চুপচাপ। ভাবলাম—আমার ঘড়ির ডালাটা খুলে হাত দিয়ে দেখি কাঁটাগুলি চলছে কি না, ডালাটা খুলে দেখলাম—ওগুলিও চুপচাপ—নড়াচড়া করছে না, কিছু না। কিছু না। কোথাও কোন শব্দের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অনন্ত নৈশব্দের অতলে সব ডুবে গিয়েছে। আর কিছু নেই। আর কোথাও কিছু নেই। এমন কি দূরাগত কোন শকটের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দও কানে আসছে না। নদীর ধারে এসে গিয়েছি আমি। নদী থেকে একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস আসছে। সীন নদী কি এখনও বইছে ? ব্যাপারটা জানার জন্যই নীচে নামতে লাগলাম—পুলের তলা দিয়ে যে জলের স্রোত বইছে তার কোন শব্দ আমার কানে ঢুকল না। আরও ক'টা ধাপ নেমে গেলাম···বালি···কাদা···তারপরে জল। সেই জলে হাত ডুবালাম। না, স্রোত এখনও বইছে···বইছে···তবে বড় ঠাণ্ডা···প্রায় জমাট বাঁধার উপক্রম···প্রায় মৃত···।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম এখান থেকে উঠে যাওয়ার শক্তি আর আমার নেই—বেশ বুঝতে পারলাম এবারে আমার মৃত্যু হবে···ক্ষুধা, ক্লান্তি, আর শৈত্যই গ্রাস করে ফেলবে আমাকে।

জলাতঙ্ক

[Hydrophobia ?]

প্রিয় জিনিভিভ, তুমি আমার মধুচন্দ্রিমা যাপনের কাহিনী শুনতে চেয়েছ। কী করে বলব বলত ? ধূর্ত চতুর মেয়ে কোথাকার। এ-সম্বন্ধে একটা কথাও তুমি আমাকে বলে দাও নি, ইঙ্গিতটুকু পর্যন্ত না। ভেবে দেখ, আঠার মাস হল তোমার বিয়ে হয়েছে। তুমি আমার সেরা বান্ধবী বলে বল, আমার কাছে আগে কোনদিনই তুমি কিছু লুকোও নি। আর এবিষয়ে সাবধান ক'রে দেওয়ার এতটুকু বদান্যতাও তোমার হল না। তুমি যদি এতটুকু ইঙ্গিত আমাকে দিতে, তুমি যদি এতটুকু সতর্ক আমাকে করে দিতে, আমার মনের মধ্যে এতটুকু সন্দেহ যদি জাগাতে পারতে তাহলে এতবড় বোকামি করার হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাতে পারতে। এই বোকামির জন্যে আমিই লজ্জায় মরে যাচ্ছি, আর আমার স্বামী যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন হাসবেন। এর জন্যে একমাত্র তুমিই দায়ী।

আমি যে চরম হাস্যকর কাজ করেছি তা আর ভুলবার নয়। আমি এমন একটা ভুল করেছি যা কেউ কোনদিন ভুলে যায় না। এবং তার জন্যে দায়ী তুমি। বদ মেয়ে কোথাকার···হায়রে, আমি যদি জানতাম !

যাই হোক, লিখতে বসে কিছুটা সাহস পাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে, সব ঘটনাটাই তোমাকে আমি বলতে পারব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, এই কাহিনী শুনে তুমি বেশী হাসবে না।

কমেডি আশা করো না। এটা একটা নাটক।

আমার বিয়ের দিনের কথা মনে রয়েছে তোমার। বিয়ের রাত্রেই আমার হনিমুনে বেরিয়ে যাওয়ার কথা। গিপ তাঁর একটি উপন্যাসে নায়িকা পলেত-এর সম্বন্ধে যে সরস 'কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন আমি নিশ্চয় সেই পলেত-এর মত ছিলাম না। আমার মা যদি মাদাম স্ত হুট্রে তাঁর মত আমাকে বলতেন—তোমার স্বামী তোমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরবে···এবং···" আমি তাহলে পলেত-এর মত হেসে গড়িয়ে পড়ে বলতাম, "না—মা, থাক থাক, ।···তুমি যা জান আমি তার সবটুকুই জানি···"

এবিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না; আর আমার মা ছিলেন ভীরু স্বভাবের। একটু এদিক-ওদিক হলেই তিনি ভয় পেয়ে যান। এ ব্যাপারে কিছু বলতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেছিলেন।

লাঞ্চ শেষ হওয়ার পরে বিকাল পাঁচটা নাগাদ সংবাদ এল গাড়ী প্রস্তুত।

অতিথিরা বিদায় নিয়েছেন। আমিও প্রস্তুত হলাম। সিঁড়ি দিয়ে ট্রাঙ্ক নামানোর শব্দ আমার এখনও মনে রয়েছে; মনে রয়েছে বাবার নাকি সুরের কথাগুলি। তিনি যে কাঁদছিলেন এটা তিনি মোটেই বাইরে প্রকাশ করতে চান নি। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন—"ভয় পেয়ো না।" তাঁর কথা শুনে মনে হল আমি যেন দাঁত তুলতে যাচ্ছি। মা তো কেঁদেই আকুল। এই সব কষ্টকর বিদায় অনুষ্ঠান থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্যে আমার স্বামী আমাকে তাড়াতাড়ি বার ক'রে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। সুখী হলেও, আমার চোখেও তখন জল ঝরছিল। এর কারণটা আমি জানিনে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কে যেন পেছন থেকে আমাকে টানছে। ঘুরে চেয়ে দেখি আমার কুকুর বিজো। তার কথা সকাল থেকে আমার মনেই ছিল না। বেচারা তার নিজের মত ক'রে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে। আমার খুব কষ্ট হল। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চুমু খেতে লাগলাম।

আর বিজো-ও তখন আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে। সে আমার গায়ে মুখ ঘষতে লাগল, গালে থাবা মারতে লাগল, চাটতে লাগল আমার সর্বাঙ্গ। হঠাৎ আমার নাকটা ধরে বাচ্চা কুকুরটা তার দুটো দাঁত বসিয়ে দিল। খুব লেগে গেল আমার। চীৎকার করে উঠলাম আমি। চীৎকার করেই কুকুরটাকে মাটিতে নামিয়ে দিলাম। খেলার ছলে সত্যি সে আমাকে জোরে কামড়িয়ে দিয়েছে। সবাই তাড়াতাডি জল নিয়ে এল, নিয়ে এল ভিনিগার আর ব্যাণ্ডেজ। আমার স্বামী নিজেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যে এগিয়ে এলেন। ব্যাপারটা এমন একটা কিছু নয়। সূঁচ ফোটালে যেমন ফুটকি পড়ে এ-ও অনেকটা সেইরকম দুটো ফুটকি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রক্ত বন্ধ হ'য়ে গেল। বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

আমরা ঠিক করেছিলাম নরম্যানডিতে ছ' সপ্তাহ বেড়াব।

সন্ধ্যের দিকে আমরা ডিপিতে পৌছলাম। সন্ধ্যে অর্থে রাত্রে। তুমি জান সমুদ্রকে আমার খুব ভাল লাগে। স্বামীকে বললাম সমুদ্র না দেখে আমি ঘুমোতে যাব না। প্রস্তাবটা শুনে তিনি তো অবাক। আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার কি ঘুম পাচ্ছে ?

না, তা নয়। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি যে একা থাকতে চাই সেটা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ ?

অবাক হয়ে গেলাম আমি: আমার সঙ্গে একা ? কিন্তু প্যারিস থেকে সারা পথটাই তো ট্রেনে আমরা ছিলাম।

তিনি হাসলেন: হ্যাঁ, তা বটে···ট্রেনে একা থাকা আর দু'জনে ঘরের ভেতরে একা থাকা এক কথা নয়।

আমি রাজি হলাম না, বললাম: বেশ, সমুদ্রের তীরে দু'জনে আমরা একা

থাকব—চল।

আমার কথা শুনে নিশ্চয় তিনি খুশি হলেন না ; তবুও বললেন : তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন চল।

কী সুন্দর অপূর্ব রাত্রি। এমন রাত্রিতে মানুষের কল্পনাপ্রবণ মন অস্পষ্ট, বিরাট অনুভূতিতে ভরে যায় ; মনে হয় দুটি ডানা মেলে সে অসীম শূন্যে উড়ে যাবে। গোটা আকাশটাকেই জড়িয়ে ধরবে বুকের মধ্যে। আর কী যে সে করবে তা আমি জানিনে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এমন রাত্রিতেই মানুষ বিশ্বের রহস্য বোঝার কাছাকাছি এসে পড়ে। বাতাসে স্বপ্নের জাল ; রোমান্স আমাদের হৃদয়কে গুঁড়িয়ে দেয়। চাঁদ, নক্ষত্র, আর চঞ্চল জলরাশির ভেতর থেকে একটা স্বর্গীয় মাদকতা উঠে আমাদের উন্মাদ করে তোলে। এদের চেয়ে শুভ মুহূর্ত মানুষের জীবনে আর নেই।

আমার স্বামী কিন্তু ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমার কী ঠাণ্ডা লাগছে ?" না। তাহলে, ওইখানে যে নৌকোটা বাঁধা রয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে দেখ। মনে হচ্ছে, জলের ওপরে ও ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর চেয়ে সুন্দর জায়গা আর আমরা পাব না ; পাব কি ? সকাল না হওয়া পর্যন্ত এখানে আমি বসে থাকতে পারি। আচ্ছা বলত, তোমার কি তা ভাল লাগে না ?

তিনি ভাবলেন আমি ঠাট্টা করছি। এই ভেবে জোর করে টেনে আমাকে তিনি হোটেলে নিয়ে এলেন। তখন আমি কি জানতাম ওর পেটে এত দুষ্টুমি ছিল ?

ঘরের মধ্যে দু'জনে ঢোকার পরেই আমার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। বিশ্বাস কর, কী জানি কেন আমার বড় অস্বস্তি লাগছিল। শেষ-কালে আমি তাঁকে বসার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। হায় বন্ধু, কী করে বোঝাব তোমাকে ? কিন্তু ব্যাপারটা এই। আমার নির্ভেজাল অজ্ঞতাকে তিনি লজ্জা বলে ভেবেছিলেন ; আমার চরম সরলতাকে তিনি লাম্পট্য বলে মনে করেছিলেন ; আমার অকৃত্রিম স্বাধীনতা তিনি ভেবেছিলেন মহিলাদের ছলনা বলে। ফলে, এই জাতীয় গোপন যৌন রহস্য প্রকাশ করার জন্য অনভিজ্ঞতা এবং অপ্রস্তুত নারীর কাছে যে সঙ্কোচ আর কোমলতা দেখাতে হয় তার ব্যবহারে ঠিক সেইরকম সুচিতা দেখা যায় নি।

হঠাৎ আমার মনে হল তাঁর মাথাটি বিগড়ে গিয়েছে। আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও ?" ভয় পেলে তুমি চিন্তা কর না, যুক্তি দিয়ে কোনকিছু বিচার কর না, তুমি সোজাসুজি উন্মাদ হ'য়ে যাও। সঙ্গে-সঙ্গে, ভীষণ ভয়ঙ্কর রকমের দুশ্চিন্তা আমাকে গ্রাস করে ফেলল। যে-সব যুবতীরা দুষ্ট লোকদের বিয়ে ক'রে বিপদে পড়ে তাদের করুণ কাহিনী খবরের কাগজে ছাপা হয়। সেই সব কাহিনী আমার মনে পড়ে

গেল। আমি কি এই মানুষটিকে চিনতাম। ভয়ে উন্মাদ হ'য়ে উঠলাম আমি। ধস্তাধস্তি করে সরিয়ে দিলাম তাঁকে। এমন কি হাতে ক'রে তাঁর একমুঠো চুল ছিঁড়ে ফেললাম। ছিঁড়ে ফেললাম তাঁর গোঁফের একটা পাশ। এই করে ছাড়া পেলাম আমি। বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে চীৎকার করলাম—বাঁচাও, বাঁচাও। দরজার কাছে দৌড়ে গেলাম, দরজা খুলে বাইরে থেকে হুড়কো টেনে দিলাম, তারপরে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়ে গেলাম সিঁড়ির কাছে।

অন্য ঘরের দরজাগুলি খুলে গেল। নাইট শার্ট পরে লণ্ঠন হাতে নিয়ে পুরুষরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তাদের একজনের বুকের মধ্যে ঢুকে আমি বললাম—'আমাকে বাঁচান।' সেই লোকটি আমার স্বামীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তারপরে কী হল তা আমার মনে নেই। তাঁরা চীৎকার করতে-করতে মল্লযুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। তারপরে হো-হো করে হেসে উঠলেন। এরকম উচ্চ-গ্রামের হাসি আর কোনদিনই আমি শুনি নি জীবনে। সারা বাড়িটা হেসে কুটি কুটি। বারান্দায় সবাই জোরে-জোরে হাসতে লাগল। সেই শব্দ কানে এল আমার, শোওয়ার ঘরগুলিতেও হাসির বিরাম নেই। চাকর-বাকররা চিলে-কোঠায় হাসতে লাগল; হলের মধ্যে দরোয়ান মাদুরের ওপরে হাসতে-হাসতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখ—হোটেলে এই কাণ্ড!

সব মিটে গেলে আবার আমি স্বামীর সঙ্গে ঘরের মধ্যে এসে পড়লাম। রাসায়নিক পরীক্ষা সুরু করার পূর্বে মানুষ যেভাবে তার কাজের সপক্ষে যুক্তি দেখায় তিনি তেমনি আমার কাছে ছোট-ছোট কয়েকটি কৈফিয়ৎ দিলেন। আমাকে বোঝাতে চাইলেন কিছু। কিছুতেই তাঁকে খুশি করা গেল না। সকাল না হওয়া পর্যন্ত আমি কাঁদতে লাগলাম; তারপরে হোটেলের দরজা-গুলি খোলার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সেখান থেকে চলে গেলাম।

এই শেষ নয়।

পরের দিন পোরভিলে হাজির হলাম আমরা। ছোটখাট মিষ্টি আর ভদ্র ব্যবহারে আমার স্বামী আমাকে অভিভূত করে ফেললেন। আমার প্রথম বিরক্তি উৎপাদন করার পরে তিনি বেশ খুশি হ'য়ে উঠলেন। আগের রাতের ঘটনায় লজ্জিত হওয়ার পরে আমি নিজে যতটা সম্ভব মোলায়েম হয়ে উঠেছিলাম। যে ভয়ঙ্কর গোপন রহস্যটা যুবতীদের কাছ থেকে সযত্নে সরিয়ে রাখা হয় সেই রহস্য ফাঁস করতে হেনরী আমাকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল; সেটা কার্যকরী করতে গিয়ে আমার কী ভয়, ঘৃণা, আর বিতৃষ্ণা হয়েছিল সেকথা তুমি ভাবতেও পার না। আমি কেমন বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছিলাম; এত দুঃখ পেয়েছিলাম যে মরে যেতে ইচ্ছে করছিল আমার, কোনকিছুই ভাল লাগছিল না; মনে হচ্ছিল বাবা-মার কাছে আমি পালিয়ে

যাই। পরের দিন আমরা এট্রেটাট-এ হাজির হলাম। সেখানে যাঁরা বেড়াতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একটা দারুণ উত্তেজনা দেখা গেল। একটি যুবতী কিছুক্ষণ আগেই জলাতঙ্কে মারা গিয়েছে। তাকে একটা বাচ্চা কুকুর কামড়ে দিয়েছিল। হোটেলে খেতে বসে সবাই এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিল। সেই শুনে ভয়ে আমার সারা শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল। হঠাৎ মনে হল, আমার নাকে যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সারা শরীরটা কেমন যেন করতে লাগল আমার।

সেদিন রাত্রিতে আমার ঘুম হল না। স্বামীর কথাও আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। যদি আমিও জলাতঙ্কে মারা যাই? পরের দিন হোটেলের হেড ওয়েটারের কাছে ব্যাপারটার সম্বন্ধে আরও কিছু শুনতে চাইলাম। তার কাছে যা শুনলাম তাতে আমার ভয়টা আরও বেড়ে গেল। সারাদিনই আমি বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ালাম। কাউকে কিছু বললাম না; কেবল ভাবতে লাগলাম। জলাতঙ্ক? কী ভীষণ মরণ! হেনরি আমাকে জিজ্ঞাসা করল: "কী ব্যাপার বলত? মনে হচ্ছে তোমার মন ভাল নেই।"

আমি বললাম: ও কিছু নয়, ও কিছু নয়।

সমুদ্রের দিকে আমি ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম; দেখলাম না কিছুই। কারখানার দিকে, মাঠ-ময়দানের দিকে তাকালাম; কী যে দেখলাম জানিনে। আমার ভেতরে যে কষ্ট হচ্ছিল তা পৃথিবীর কোন কিছুর লোভেই আমি প্রকাশ করতে পারি নি। আমার একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল; নাকের ওপরে সত্যি একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল। বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য জিদ ধরলাম আমি।

হোটেলে ফিরে আসার পরেই ঘরের দরজা বন্ধ করে নাকের ক্ষতটিকে পরীক্ষা করলাম আমি। কিছু নেই—দাগটা পর্যন্ত মিলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু নাকটার ওপরে কেমন ব্যথা-ব্যথা করছিল।

তখনই মাকে একটা চিঠি লিখলাম, ছোট চিঠি; মা পড়ে নিশ্চয় খুব অবাক হবেন। কয়েকটি অজরুরী প্রশ্নের—যেগুলির সত্যিকার কোন দাম নেই—তাড়াতাড়ি উত্তর চেয়ে পাঠালাম। চিঠিটি সই করার পরে একটু যোগ করে দিলাম: যাই হোক, বিজোর সংবাদ দিতে ভুল করো না।

পরের দিন কোন কিছু খেতে পারলাম না; কিন্তু আমি ডাক্তার দেখাতে চাইলাম না। স্নানার্থীদের দিকে তাকিয়ে সমুদ্রের তীরে বসে-বসে কাটিয়ে দিলাম। তাদের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবলাম—ওরা কত সুখী। ওদের কোন কুকুর কামড়ায় নি। ওরা সব বেঁচে থাকবে। ওদের কোন ভয় নেই। যেভাবে ইচ্ছে ওরা স্ফূর্তি করতে পারবে। ওদের মনে কোন অশান্তি নেই।

নাকের ওপরে হাত চাপিয়ে নানাভাবে আমি পরীক্ষা করতে লাগলাম। ফুলেছে নাকি ? হোটেলে গিয়েই দরজা বন্ধ করে আমি আরশীর সামনে দাঁড়ালাম ; তাকালাম—না, কোথাও কিছু নেই। নাকের রঙ একটু এদিক-ওদিক হলেই, সত্যিই আমি তখনই মারা যেতাম।

সেইদিন রাত্রিতে হঠাৎ স্বামীর ওপরে আমার ভালবাসা যেন উথলে উঠল, এ ভালবাসা হতাশার। মনে হল, তাঁর মনটা বড় নরম ; আমি তাঁর গায়ে হেলান দিয়ে বসলাম। আমার ভয়টা যে কোথায় সেই কথাটা তাঁকে বলার জন্যে প্রায় কুড়িবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না।

এইভাবে নিজেকে শিথিল ক'রে দেওয়ার ফলে, তাছাড়া বাধা দেওয়ার শক্তিও তখন আমার ছিল না, তিনি আমার ওপরে যে সুযোগ নিলেন তাকে জঘন্য ছাড়া আর কিছু বলতে রাজি নই আমি। তাঁকে বাধা দেওয়ার শক্তি তো ছিলই না, এমন কি ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত ছিল না। মনে হচ্ছিল আমি যেন সমস্ত রকম দৈহিক আর মানসিক কষ্ট সহ্য করতে পারব। পরের দিন মায়ের চিঠি পেলাম। তিনি আমার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন, কেবল বিজোর কথা কিছু বললেন না। মনে হল, এখনই পোষ্ট অফিসে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে একটা টেলিগ্রাম করি। কিন্তু তারপরেই ভাবলাম—'যদি বিজো সত্যিই মারা গিয়ে থাকে তাহলে সেকথা তাঁরা আমাকে জানাবেন না। সুতরাং আরও দুটি দিন কেটে গেল—সেই দুটি দিনই আমি অবসাদ আর আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আবার একটা চিঠি দিলাম আমি—আমার মন মেজাজ ভাল নেই ; সেই জন্য তাঁরা যেন কুকুরটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।

বিকালের দিকে আমার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। কাঁপতে লাগল হাত। ভর্তি গ্লাস তুলতে গিয়ে খানিকটা জল মাটিতে পড়ে গেল। আমার মনের অবস্থা তখন যে কী রকম তা তোমাকে কী বলব ? সন্ধ্যের দিকে স্বামীকে লুকিয়ে আমি গির্জায় হাজির হলাম। অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করলাম সেখানে।

ফিরে আসার সময় মনে হল নাকে আবার যন্ত্রণা হচ্ছে। একটা ডাক্তারখানায় হাজির হলাম। ডাক্তারকে বললাম—'আমার একটি বন্ধুকে কুকুরে কামড়িয়েছে। কী করব বলুন।' কী করা উচিৎ সেকথা তিনি আমাকে বলেছিলেন ; কিন্তু আমার মনটা তখন এতই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল যে তিনি কী বলেছিলেন তা আমি একেবারে ভুলে গেলাম। বন্ধুকে দেওয়ার অজুহাতে কয়েকটা বোতল আমি কিনলাম ; কিন্তু কী ওষুধ কিনলাম—তা আমি স্মরণ করতে পারছিনে।

রাস্তায় কুকুর দেখলে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠতাম ; দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার একটা অদ্ভুত আকাঙ্খা আমাকে গ্রাস করে ফেলত। মাঝে-মাঝে মনে হোত

তাদের আমি কামড়িয়ে দিই। রাত্রিতে আমি ঘুমোতে পারলাম না। অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলাম। আমার স্বামী সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। সকাল হ'তেই মায়ের চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন বিজো ভালই আছে। কিন্তু রেলে করে একলা তাকে পাঠানো একটু বিপজ্জনক। সেই জন্য তাঁরা তাকে পাঠাবেন না। তাহলে সে মারা গিয়েছে!

এরপরে আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। হেনরী মজাসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। কয়েকবার অবশ্য সে জেগে উঠল; কিন্তু অবসাদে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলাম।

পরের দিন আমি সমুদ্রে স্নান করলাম। এত শীত লাগছিল যে জলে নেমে আমার মূর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা। কনকনে ঠাণ্ডার জন্যেই আমার শরীর অবশ হয়ে উঠছিল; কাঁপছিল আমার পা দুটো; কিন্তু সব চেয়ে বেশী যন্ত্রণা হচ্ছিল নাকে।

স্থানীয় একজন মেডিকেল ইনস্পেকটরের সঙ্গে আমার আলাপ হল। ভদ্রলোকটি বেশ চমৎকার। বুদ্ধি ক'রে ঘুরিয়ে অত্যন্ত সাবধানে তাঁর কাছে ব্যাপারটা বললাম আমি। তারপরে তাঁকে বললাম, কয়েকদিন আগে আমার বাচ্চা কুকুরটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে, জায়গাটা ফুলে উঠলে কী করব সে কথাটা তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করতেই তিনি হেসে বললেন: আপনার বিষয়ে, মাদাম, আমি একটি কথাই বলতে পারি। সেটি হচ্ছে অপারেশন।

কথাটা আমি ঠিক ধরতে পারলাম না দেখে তিনি আবার বললেন: সে কাজটা আপনার স্বামীর।

তাঁর কথার বিন্দুবিসর্গ আমার মাথায় ঢুকল না।

সেদিন সন্ধ্যের সময় হেনরীকে স্ফূর্তি করতে দেখা গেল। সন্ধ্যের দিকে ক্যাসিনোতে গেলাম আমরা। কিন্তু অভিনয় শেষ হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল না। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসার কথা বলতেই আমি রাজি হয়ে গেলাম। বাইরে থাকতে একটুও ভাল লাগছিল না আমার।

কিন্তু সুস্থির হয়ে বিছানায় আমি শুয়ে থাকতে পারছিলাম না। আমার সারা শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে আসছিল। তারও ঘুমানোর কোন লক্ষণ দেখলাম না। সে আমাকে জড়িয়ে ধরল, আদর করল। মনে হল আমি যে কষ্ট পাচ্ছি তা সে যেন বুঝতে পেরেছে। তার আসল উদ্দেশ্যটা কী তা বুঝতে না পেরে—অথবা, সে কথা গ্রাহ্য না করেই—আমি শুয়ে-শুয়ে তার আদর খেতে লাগলাম।

হঠাৎ দারুণ একটা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। সে যে কী ভীষণ যন্ত্রণা তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমার সারা শরীর

থরথর করে কাঁপতে লাগল। চীৎকার করে উঠলাম আমি। হেনরী আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তাকে দু'হাতে ঠেলে ফেলে মেঝের ওপরে লাফিয়ে পড়লাম, তারপরে কপাটের ওপরে মুখ চেপে কাঁদতে লাগলাম। আমি একে-বারে উন্মাদ হয়ে গেলাম।

ব্যাপারটা কী বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে গেল হেনরী। আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল কী হয়েছে আমার। কোন উত্তর দিলাম না আমি। সহ্য বা কিছু চিন্তা করার মত শক্তি তখন আমার ছিল না। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম আমি। আমি জানতাম কিছুক্ষণ বিরতির পরে আবার এই উত্তেজনা দেখা দেবে। তারপর আর একটা, তারপরে শেষ উত্তেজনা, তারপরেই মৃত্যু।

সে আমাকে বিছানার ওপরে শুইয়ে দিল। ভোর হয়-হয় এমন সময় হেনরী আবার বাঁদরামি সুরু করল। আবার সেই উত্তেজনা দেখা দিল আমার। শরীর কাঁপতে লাগল। এবারে উত্তেজনাটা অনেকক্ষণ ধরে রয়ে গেল। আমার মনে হল সব ভেঙে, ছিড়ে, কেটে-কুটে, কামড়ে শেষ ক'রে ফেলি। ভয়ঙ্কর সে যন্ত্রণা, এত বিশ্রী যে ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল আমার।

সকাল আটটার সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। গত চারদিনের মধ্যে সে-ই আমার প্রথম ঘুম।

এগারটার সময় একটি বহুপরিচিত প্রিয় স্বর শুনে আমি জেগে উঠলাম। মা এসেছেন। আমার চিঠি পেয়ে তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছেন আমাকে দেখতে। তাঁর কোলে বেশ বড় একটা ঝুড়ি। হঠাৎ শুনতে পেলাম সেই ঝুড়ির ভিতর থেকে একটা কুকুর ডাকছে। ডালা খুলে ফেললাম আমি। সঙ্গে-সঙ্গে বিজো আমার বিছানার ওপরে লাফিয়ে পড়ল। তারপরে আনন্দের চোটে আমাকে আদর করতে লাগল, গা চাটতে লাগল, বিছানার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত গড়াগড়ি দিতে সুরু করল।

একেই বলে কল্পনা……অথবা দুশ্চিন্তা। এই বস্তুটি মানুষের কত ক্ষতি করে বুঝতে পারছ। আমি কী ভেবে নিয়েছিলাম বলত ? কী বোকামি করেছি আমি ?

বুঝতেই পারছ, সেই চারটি দিন কী মানসিক যন্ত্রণাই না ভোগ করে-ছিলাম আমি। সেই যন্ত্রণার কথা কাকেও আমি মুখ ফুটে বলতে পারি নি। আমার স্বামী যদি জানতে পারতেন ?

মার্টিনের মেয়েটি

[Martin's girl]

একদিন রবিবারে গির্জায় প্রার্থনা শেষ হওয়ার পরেই ব্যাপারটা ঘটলো। গির্জা থেকে বেরিয়ে সরু পথ ধরে সে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় সে দেখতে পেল মার্টিনের মেয়েটি তার আগে-আগে চলেছে। মেয়েটিও উপাসনা শেষ করে বাড়ি ফিরছিল।

বাড়ির কর্তা মেয়েটির পাশে-পাশে সদর্পে হাঁটছেন। তিনি যে বেশ ধনী চাষী, তাঁর চলনেই তা বেশ ফুটে উঠেছে। ঢিলে জামা ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করে ধূসর রঙের একটা জ্যাকেট পরেছেন তিনি। মাথার ওপরে চাপিয়েছেন একটা বেশ চওড়া ফেল্ট্ হ্যাট। আর মেয়েটি কাঁচুলির ভেতরে তার বুকটিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেছে। দেখে মনে হবে সপ্তাহে একদিনই সে কাঁচুলি পরে। শরীরটাকে শক্ত করে, হাত দুটো একটু দোলাতে-দোলাতে সে হাঁটছে,তার কোমর শক্ত করে বাঁধা, কাঁধ দুটি বেশ চওড়া। হাঁটার সময় সে পাছাটা বাঁকিয়ে-বাঁকিয়ে চলছে। মাথার ওপরে টুপী, তাতে ফুল গোঁজা ; শক্ত অথচ নরম ঘাড়টা খোলা ; তুলোর মত মোলায়েম ছোট-ছোট মাথার চুল—রোদে চকচক করছে ; হাওয়ায় সেগুলি মুখের চারপাশে উড়ছে।

মেয়েটির পেছনটা চোখে পড়ল বেনয়েস্ট-এর। যদিও মেয়েটির মুখের দিকে সে কোনদিন দেখবে বলে তাকিয়ে দেখে নি ; তবুও মেয়েটির মুখ তার পরিচিত।

হঠাৎ সে বলে উঠল : 'দুত্তোর। মার্টিনের মেয়েটা সত্যিই বড় ভাল দেখতে।' মেয়েটির প্রশংসায় মনে-মনে বেশ মুখর হয়ে উঠল সে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সে চলতে লাগল। কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল সে। মেয়েটির মুখের দিকে তাকানোর কোন দরকার ছিল না তার। সে কেবল তাকিয়ে রইল তার দেহের দিকে ; আর মাঝে-মাঝে তারিফ করে বলতে লাগল—মেয়ে বটে, একখানা মাইরি।

মার্টিন-ফার্মে ঢোকার জন্যে মেয়েটা ডান দিকে বাঁকলো। ফার্মটা হচ্ছে তার বাবা জঁ। মার্টিনের। ঘুরে সে একবার পিছন ফিরে দেখল। চোখে পড়ল বেনয়েস্ট আসছে। বেনয়েস্টকে মেয়েটির অদ্ভুত বলে মনে হল।

মেয়েটি বলল : সুপ্রভাত, বেনয়েস্ট!

সে বলল : সুপ্রভাত, সুপ্রভাত,—বলতে বলতে সে সামনের দিকে এগিয়ে এল।

বাড়িতে পৌঁছিয়ে সে দেখল টেবিলের ওপরে স্যুপ ঢাকা রয়েছে। সে তার মায়ের উলটো দিকে গিয়ে বসল। পাশে খেতে বসল একজন শ্রমিক আর একটা ছেলে। পরিচারিকা মেয়েটা আনতে গেল আপেলের মদ।

সামান্য কয়েক চামচ খেয়ে সে প্লেটটা সরিয়ে দিল।

মা জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার শরীরটা কি খারাপ ?

না। পেটটা কেমন ফুলেছে। ক্ষিদে নেই তেমন।

অন্য সবাই খাচ্ছে সে চেয়ে-চেয়ে দেখল। মাঝে মাঝে এক-আধ টুকরো রুটি কেটে সে মুখে দিল। ধীরে-ধীরে অনেকটা সময় নিয়ে সে চিবোতে লাগল। সে সেই মেয়েটির কথাই ভাবছিল। মেয়েটা বড় সুন্দর। কী আশ্চর্য ! এ কথাটা তার আগে কোনদিন মনে হয় নি। আজকেই অকস্মাৎ তার মনে হল কথাটা। এমনভাবে মনে হল যে খাওয়ার স্পৃহাটা তার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

স্ট্যুটা তো ছুঁলোই না।

মা বললেন—ওটা মজার মাংস। ও খেলে তোমার ভালই হবে। ক্ষিদে না থাকলেও তোমার খাওয়া উচিৎ।

একটুখানি মুখে দিয়েই সে প্লেটটা সরিয়ে রাখল—ওটাও ভাল লাগছে না তার।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সে মাঠে ঘুরতে গেল; যারা মাঠে খাটছিল বিকালটা তাদের ছুটি দিয়ে দিল; বলে দিল গরুগুলোর দিকে সে লক্ষ্য রাখবে।

সেদিনটা ছিল বিশ্রামের দিন। মাঠে লোকজন ছিল না। ভুরিভোজনের পরে গরম রোদে শুয়ে গরুরা নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটছিল। হালকরা মাঠের এককোণে জোয়াল-খোলা গরুরা বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়েছিল। শরৎকালে শুকনো বাতাস বইছিল। মনে হচ্ছিল সন্ধ্যেটা বেশ ঠাণ্ডা হবে। বাঁধের ধারে বসেছিল বেনয়েস্ট; কোলের ওপরে ছিল তার টুপীটা। দেখলে মনে হবে মাথায় সে একটু হাওয়া লাগাচ্ছে। সেই নিস্তব্ধ মাঠে বসে সে বেশ চেঁচিয়েই বলল—খাসা মেয়ে।

মেয়েটার কথা সে আর ভুলতে পারল না—শুয়ে-শুয়ে, ঘুমোতে-ঘুমোতে জেগে উঠে—সব সময়ই সে তার কথা ভাবতে লাগল।

সে যে খুব কষ্ট পাচ্ছিল তা নয়; সে যে অস্থির হয়ে উঠেছিল সেকথাও সত্যি নয়। কী যে তার হচ্ছিল সেটা সে নিজেও ভাল বুঝতে পারে নি। অথচ চিন্তাটা তাকে গ্রাস ক'রে ফেলেছিল—মনের মধ্যে একটা মাদকতা সৃষ্টি করেছিল। মাঝে-মাঝে ঘরের ভেতরে বেশ বশ বড় একটা মাছি আটকে পড়লে সে ভোঁ ভোঁ করতে-করতে ঘরময় উড়ে বেড়ায়; তুমি সেই একটানা শব্দ শুনতে পাও। ক্রমাগত শুনতে-শুনতে সেই শব্দ তোমাকে বিরক্ত করে।

হঠাৎ মাছিটা চুপ করে যায়। সব ভুলে যাও তুমি। আবার অকস্মাৎ সেই শব্দ শুরু হয়। আবার তুমি মাথা তুলে তাকাও। তুমি তাকে ধরতেও পার না, তার পিছু ধাওয়াও করতে পার না, মারতেও পার না, তার শব্দ বন্ধও করতে পার না। সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে থেকে আবার নতুন উদ্যমে সেটা ঘ্যান-ঘ্যান করতে থাকে। মার্টিন-মেয়ের চিন্তাটাও বন্দিনী মৌমাছির মত তার মনের ভেতরে অস্বস্তির সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তারপরেই মেয়েটিকে আবার একবার দেখার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠল; আর সেই উদ্দেশ্যে মার্টিন-ফার্মের আশেপাশে বারকয়েক ঘুরঘুর করল, অবশেষে মেয়েটি তার চোখে পড়ল। দুটি আপেল গাছের ওপরে টাঙানো একটা দড়িতে সে কাচা জামা শুকোবার জন্যে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল।

বেশ গরম থাকায় মেয়েটি একটা শেমিজ আর ছোট পেটিকোট ছাড়া আর সব খুলে ফেলেছিল। সেই অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় সে জামাগুলি ক্লিপ খুলে-খুলে টেনে তুলছিল বলেই তার দেহের বেশ কিছুটা অনাবৃত অংশ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল।

সেই বাঁধের পাশে এক ঘণ্টারও বেশী সে গুঁড়ি দিয়ে বসে রইল—মেয়েটি চলে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ। তারপরে সে ফিরে গেল ঘরে; কিন্তু মেয়েটির চিন্তা আরও গভীরভাবে তাকে গ্রাস করে ফেলল। প্রায় একমাস ধরে তার মনটা মেয়েটির চিন্তায় সরগরম হয়ে রইল। তার কাছে কেউ মেয়েটির কথা বললেই তার সারা সত্তা শিরশির করে উঠত। খাওয়া-দাওয়ায় রুচি ছিল না তার। ঘুমোতে-ঘুমোতে সে জেগে উঠত; প্রতিটি রাত্রিতেই ঘামে ভিজে যেত তার দেহ—ছটফট করত সে। রবিবার দিন উপাসনার সময় গির্জার ভেতরে বসে সারাক্ষণই সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকত; মেয়েটি তা লক্ষ্য করে হাসত।

একদিন সন্ধ্যায় দু'জনের হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। তাকে আসতে দেখে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল। একটা আতঙ্ক আর সঙ্কোচ তাকে দুর্বল করে তুললেও সে ঠিক করে ফেলেছিল আজ সে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করবেই। আমতা-আমতা ক'রে সে বলল: শোন শোন; এভাবে আর চলছে না।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল: কী চলছে না?

মনে হল মেয়েটি তাকে উপহাস করছে।

সে বলল: তোমার কথা দিনের মধ্যে চব্বিশটি ঘণ্টা আমি চিন্তা করি। মানে, না ক'রে পারি নে।

কোমরের ওপরে দু'টি হাত রেখে মেয়েটি বলল: তার জন্যে আমার দায়িত্ব কতটুকু? আমি কি আপনাকে চিন্তা করতে বলেছি?

আমতা-আমতা করে উত্তর দিল সে: করেছো বই কি! আমি না পারি

খেতে, না পারি শুতে, না পারি ঘুমোতে।

মেয়েটি মিষ্টি করে বলল : তাই বুঝি ? তাহলে রোগটা সারবে কেমন করে জানতে পারি কি ?

কথাটা শুনে সে অবাক হয়ে গেল—অবশ হয়ে গেল তার হাত পা, চিন্তা করার শক্তি। সেই সুযোগে মেয়েটা তার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

তারপরদিন থেকে আবার তাদের বাঁধের ধারে দেখা হতে লাগল, সেই সংকীর্ণ পথের ধারে ; ঝোপের ধারে—সন্ধ্যের সময় মাঠের ধারে বেশী—যখন সে মাঠ থেকে ছাগলগুলি তাড়িয়ে নিয়ে আসত—আর মেয়েটি ফিরত তার গরু নিয়ে।

মেয়েটির সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যে তার মন কেমন আকুলি-বিকুলি করে উঠত। বেনয়েস্টের মনে হোত মেয়েটিকে সে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একেবারে দম বন্ধ করে মেরে ফেলে। কিন্তু মেয়েটিকে সে একান্ত নিজস্ব করে পায়নি। এই না-পাওয়ার বেদনায় সে অসহায়ের ব্যর্থ আক্রোশে ফুলে-ফুলে মরত। তাদের নিয়ে চারপাশে কানাঘুষা সুরু হল ; সবাই ভেবেছিল তাদের বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গিয়েছে। সত্যি বলতে কি একদিন মেয়েটিকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল—'তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?' মেয়েটি বলেছিল—'করব।' সব ঠিক করেছিল তারা। বাকি ছিল কেবল বাড়িতে জানানোর ব্যাপারটা। তারই জন্যে তারা সুযোগ খুঁজছিল।

তারপরে হঠাৎ একদিন যথাসময়ে মেয়েটি আর এল না। সে যে আসবে না সেকথা তাকে সে আগের দিনও বলে নি। মেয়েটি গোলার চারপাশে ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও বেনয়েস্ট তাকে দেখতে পেল না। রবিবার দিন উপাসনা করার পরেও তাকে দেখা গেল না। তারপরে এক রবিবার পাদরী তাঁর মণ্ডপ থেকে ঘোষণা করলেন যে ভিক্টর-অ্যালিয়েড মার্টিন-এর সঙ্গে জোসেপিন-ইসিডোর ভার্লি'র বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়েছে।

বেনয়েস্টের হাতের পেশীতে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা জেগে উঠল। মনে হল তার শিরাগুলি রক্তহীন হয়ে গিয়েছে। তার কান দুটো ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। কিছুই কানে ঢুকলো না তার। কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই বুঝতে পারল সে কাঁদছে।

মাসখানেক সে আর ঘর থেকে বেরোয় নি। তারপরে আবার সে যথারীতি কাজকর্ম শুরু করল। কিন্তু চিন্তার হাত থেকে সে একেবারে মুক্তি পেল না। মেয়েটির কথা ক্রমাগত ভাবতে লাগল। মেয়েটি যে বাড়িতে থাকত সেই বাড়ির পাশের রাস্তাটি সে এড়িয়ে চলত ; যদিও তার ফলে সকাল সন্ধ্যায় অনেকটা পথ তাকে বেশী হাঁটতে হোত।

মেয়েটি যাকে বিয়ে করেছে ও-অঞ্চলে লোকটি ছিল সবচেয়ে ধনী চাষী।

ছেলেবেলা থেকে বেনয়েস্টএর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। এখন আর তার সঙ্গে কথা বলে না।

গাঁয়ের পথে হাঁটতে-হাঁটতে একদিন সন্ধ্যায় শুনল মেয়েটি গর্ভবতী হয়েছে। সংবাদটা শুনে সে দুঃখে মুষড়ে পড়েনি; বরং সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভেবেছিল—এই ভাল হল। এখন সব শেষ হয়ে গেল। মনে মনে এই রকমই কিছু একটা চাইছিল সে।

মাসের পর মাস কেটে গেল। দেহের মধ্যে একটা বোঝা নিয়ে ধীরে ধীরে গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে যেতে মেয়েটিকে কয়েকবার সে দেখেছিল। তাকে দেখে মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে মুখ নীচু ক'রে তার গতি বাড়িয়ে দিত, আর সে-ও পাছে মুখোমুখী পড়তে হয় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি অন্য পথে ঘুরে যেত। কিন্তু তার কেমন যেন মনে হোত, একদিন-না-একদিন তাকে মেয়েটির মুখোমুখী হতেই হবে। কথাটা ভেবে সে রীতিমত অস্বস্তি ভোগ করত। সে-দিন তো মেয়েটির সঙ্গে তাকে কথা বলতেই হবে। একদিন সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, তাকে আবেগভরে চুমু খেয়েছিল; তারপরে এখন সে তার সঙ্গে কথা বলবে কেমন ক'রে? প্রতিজ্ঞা ক'রেও অন্য কাউকে বিয়ে করাটা তার অন্যায় হয়েছে।

একটু-একটু করে সে সহজ হয়ে এল; পড়ে রইল একটু স্মৃতি মাত্র। তার পরে একদিন মেয়েটির বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে আবার সে যাচ্ছিল। কাছাকাছি আসার অনেক আগে থেকেই মেয়েটির ঘরের চাল তার নজরে পড়ল। এই বাড়িতেই সে আর একটি মানুষের সঙ্গে বাস করছে। আপেল গাছে ফুল ফুটছে, গোয়াল ঘর থেকে মোরগ ডাকছে। কেউ বাড়িতে নেই। বসন্তের ফসল কাটতে সবাই এখন মাঠে। কুকুরটা তার ঘরের সামনে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে; তিনটে বাছুর ধীরে-ধীরে পুকুর ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছে। একটা মোরগ তার পালক মেলে মুরগীর পালের ভেতরে অভিনেতার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বেনয়েস্ট দাঁড়াল। কান্নার একটা প্রচণ্ড আবেগ হঠাৎ তাকে অভিভূত করে ফেলল, কিন্তু হঠাৎ সে একটা আর্তনাদ শুনতে পেল—'বাঁচাও, বাঁচাও'। আর্তনাদটা ঘরের ভিতর থেকেই আসছিল। সেই কাঠের খুঁটিটাকে শক্ত করে ধরে হতভম্ব হয়ে সে সেই আর্তনাদ শুনতে লাগল। আবার একটা আর্তনাদ। তার সারা সত্তার ওপরে সেই আর্তনাদ সূচের মত বিঁধতে লাগল। সেই মেয়েটিই কাঁদছে। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল সে; ঘাসের বন পেরিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল; দেখল মেয়েটি মেঝের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে। তার শরীর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে-কুঁকড়ে উঠছে; চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে মেয়েটি।

বিবর্ণ হয়ে সে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে

থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল, তারপরে আমতা-আমতা করে বলল : এই যে, এই যে আমি এসে গিয়েছি।

হাঁপাতে-হাঁপাতে মেয়েটি বলল—আমায় ছেড়ে যেয়ো না, ছেড়ে যেয়ো না, বেনয়েস্ট।

আর কী বলা উচিত বা কী করা উচিত তা বুঝতে না পেরে বেনয়েস্ট তার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটি যন্ত্রণায় আবার চীৎকার করে উঠল—ওঃ, মরে গেলাম, মরে গেলাম বেনয়েস্ট।

যন্ত্রণায় আবার সে কুঁকড়ে উঠতে লাগল।

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না বেনয়েস্ট ; মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্তে, মেয়েটির যন্ত্রণা কমানোর জন্তে হঠাৎ সে উন্মত্ত হয়ে উঠল। নীচু হয়ে বসে দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে নিল, বিছানায় শুইয়ে দিল তাকে। যন্ত্রণায় তখনও মেয়েটি গোঙাচ্ছে। সে তার পোশাক খুলতে লাগল, বক্ষআবরণী, স্কার্ট, পেটিকোট সব খুলে দিল। চীৎকার না করার জন্তে মেয়েটি হাত মুঠো ক'রে কামড়াতে লাগল। বেনয়েস্ট গরু, ঘোড়া, আর ছাগলদের প্রসব করানোর জন্তে যে পদ্ধতি গ্রহণ করে এখানেও সেই পদ্ধতি গ্রহণ করল। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই একটি বেশ স্বাস্থ্যবান শিশু কাঁদতে-কাঁদতে তার দুটি হাতের ওপরে বেরিয়ে এল। তারপরে শিশুটির উপযুক্ত ব্যবস্থা করে, সে মায়ের কাছে ফিরে এল।

বেনয়েস্ট মেয়েটিকে মেঝেতে নামিয়ে দিল ; বিছানা পরিষ্কার ক'রে আবার তার ওপরে শুইয়ে দিল তাকে। সে কোনরকমে বলল : বেনয়েস্ট ধন্তবাদ, ধন্তবাদ ! তোমার দয়ার শরীর।

চোখ দিয়ে তার দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

বেনয়েস্ট কিন্তু তখন নির্বিকার। তার মন থেকে সব ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কেন, কী ক'রে তা সে জানে না। গত একটি ঘণ্টায় যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করল তাতেই তার ভালবাসা উবে গেল ; দশ বছরের অদর্শনও এতটা ম্যাজিকের মত কাজ করতে পারত না।

ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল : কী হল ? ছেলে না মেয়ে ?

মেয়ে। ভারি সুন্দর মেয়ে।

কয়েক মুহূর্তের বিরতি নেমে এল। তারপরে মেয়েটি বলল : আমাকে একবার দেখাও।

বেনয়েস্ট বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে মেয়েটির কাছে দিতে যাবে এমন সময় দরজা খুলে গেল ; ভেতরে ঢুকে এল ইসিডোর ভালিঁ।

ব্যাপারটা কী প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারল না ; তারপরে হঠাৎ বুঝতে

পারল সব।

বিভ্রান্ত হয়ে বেনয়েস্ট বলল: আমি এই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম—এমন সময় ওর আর্তনাদ শুনলাম···আর্তনাদ শুনেই ভেতরে ঢুকে এলাম আমি··· এটা তোমারই বাচ্চা ভালি।

স্বামীটির চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে; ঝুঁকে প'ড়ে বাচ্চাটা সে কোলে তুলে নিল; চুমু খেল তাকে। ভাবাবেগে মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে; তারপরে বাচ্চাটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সে বেনয়েস্টের দিকে দুটো হাত প্রসারিত করে বলল: ওখানেই রেখে দাও, বেনয়েস্ট। এখন আমাদের আর কিছু বলার নেই। তোমার আপত্তি না থাকলে আবার আমরা বন্ধু হব।

বেনয়েস্ট উত্তর দিল—আমি রাজি—নিশ্চয় রাজি।

একরাত্রির আনন্দ

[One Night's Entertainment]

সার্জেন্ট-মেজর ভারাজু বোন মাদাম প্যাদোই-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছিলেন। ভারাজু তখন রেনের সৈন্যশিবিরে থাকতেন। স্ফূর্তি করতে-করতে নিজেও তিনি কপর্দকহীন হয়ে পড়েছিলেন—বাড়িতেও তাঁর সুনাম নষ্ট হয়েছিল যথেষ্ট। সেজন্যেই তিনি তাঁর বোনকে লিখেছিলেন যে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে তিনি তাঁর বাড়িতে কাটিয়ে আসবেন। তিনি যে মাদাম প্যাদোইকে ভালবাসতেন তা নয়, আর তারই ফলে হয়ত তিনি ক্যাট-ক্যাট করে কথা বলতেন। কিন্তু ভারাজুর বড় অর্থাভাব চলছিল; এবং প্যাদোইরাই তাঁর একমাত্র আত্মীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়েন যাঁদের কাছ থেকে তখনও পর্যন্ত তিনি কোন ট্যাকস্‌ আদায় করার সুযোগ পান নি।

সিনিয়র ভারাজু অ্যানজার্সে ব্যবসা করতেন; তাঁর পেশা ছিল উদ্যান-পালন বিদ্যায় অপরকে জ্ঞান দেওয়া। ব্যবসা থেকে অবসর নেওয়ার পরে তিনি তাঁর এই লক্ষ্মীছাড়া সন্তানটিকে একটি পয়সাও দেন নি; কেবল তাই নয়, বছর দুই পর্যন্ত তার মুখদর্শনও করেন নি। তাঁর মেয়েটি বিয়ে করেন ভূত-পূর্ব ব্যাঙ্কের কেরাণী প্যাদোইকে। বর্তমানে তিনি ভ্যানের ট্যাকস্‌ কালেকটর।

ভারাজু ট্রেনে চেপে তার ভগ্নীপতির বাড়িতে হাজির হলেন। ভগ্নীপতিকে তিনি অফিসে পেলেন—সেইখানে পাশের গ্রাম থেকে আগত কয়েকজন ব্রিটন

চাষীদের কী একটা বিষয় নিয়ে তিনি গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই প্যাদোই দাঁড়িয়ে উঠে একগাদা ফাইলপত্রের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন, আস্তে-আস্তে বললেন : বস, এক মিনিট। তারপরেই তোমার সঙ্গে কথা বলব।

এই বলে তিনি বসে পড়লেন ; তারপরে পূর্ব আলোচনায় ফিরে গেলেন। চাষীরা তার কথা বুঝতে পারছিল না ; তিনি পারছিলেন না তাদের কথা বুঝতে ; আর মাঝখানে যে কেরাণীটি দোভাষীর কাজ করছিল তার অবস্থা আরও সঙীন। দু'পক্ষের ভাষাই তার কাছে সমান দুর্বোধ্য ছিল।

অনেকক্ষণ ধরে ভারাজু তাঁর ভগ্নীপতির কার্যকলাপ লক্ষ্য করে ভাবলেন—একটি আস্ত গর্দভ।

প্যাদোই-এর বয়স নিশ্চয় পঞ্চাশের কম নয় ; লম্বা, রোগা, লোমশ, অস্থি-ময়, অতিমাত্রায় বাঁকানো ভুরু ; মাথায় একটি ভেলভেট ক্যাপ ; দৃষ্টিটা, ব্যবহারের মতই তাঁর নরম। কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম সবেতেই তাঁর ওই নরম মেজাজ। ভারাজু মনে-মনে তাঁর সেই পূর্ব মন্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করলেন : একটি আস্ত গাধা।

তিনি নিজে ছিলেন অত্যন্ত স্ফূর্তিবাজ। মদ আর মেয়েমানুষের মত বড় ধরনের আনন্দ তাঁর আর কিছু ছিল না। এ দুটি জিনিস ছাড়া আর কিছু বুঝতেন-ও না তিনি। মদ্যপ আর দাম্ভিক হওয়ার ফলে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বড় অজ্ঞও ছিলেন ; সেই অজ্ঞতার শিখর থেকে প্রতিটি মানুষকেই তিনি অবজ্ঞা করতেন। কাউকে প্রশংসা করতে গেলে তিনি বলতেন, গোল্লায় যাও! তুমি সত্যিই একটি ভাঁড়।

চাষীদের বিদায় দিয়ে প্যাদোই শেষকালে শ্যালককে নিয়ে পড়লেন : ভাল তো সব?

দেখতেই পাচ্ছ খুব খারাপ নয় ; তোমাদের খবর কী?

মোটামুটি ভালই। ধন্যবাদ। তুমি যে মনে করে আমাদের দেখতে এসেছ এতেই আমি আনন্দিত।

তোমাদের এখানে আসার ইচ্ছে অনেকদিনই আমার ছিল ; কিন্তু বুঝতেই পারছ, সামরিক চাকরিতে ইচ্ছে করলেও মানুষ অনেককিছুই করতে পারে না।

না, না। সেকথা অবশ্যই আমি জানি। তবু, তুমি যে আসতে পেরেছ এতেই তোমার বদান্যতা প্রকাশ পেয়েছে।

জোসেফিন ভাল আছে?

হ্যাঁ। ধন্যবাদ। এখনই তাকে দেখতে পাবে তুমি।

কোথায় সে?

একটু বেরিয়েছে। এখানে আমাদের পরিচিতের সংখ্যা অনেক কিনা।

শহরেও বেশ বাছা-বাছা লোক বাস করেন।

আমিও সেদিক থেকে নিশ্চিত।

কিন্তু দরজা খুলে গেল। মাদাম প্যাদোই ভেতরে ঢুকে এলেন। ভাইকে দেখে তিনি যে বেশ আনন্দ পেয়েছেন তা মনে হল না। তবু চুমু খাওয়ার জন্যে ভাই-এর মুখের কাছে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: অনেকক্ষণ এসেছ?

না। আধ ঘণ্টাটাক হবে।

তাই বুঝি। ভেবেছিলাম, ট্রেন আসতে দেরী হবে। ড্রয়িংরুমে এস।

তাঁরা দু'জনে ড্রয়িংরুমে হাজির হতেই মাদাম বললেন: তোমার সম্বন্ধে সুন্দর-সুন্দর কাহিনী শুনতে পাচ্ছি।

যথা?

মনে হচ্ছে, তুমি বেশ জঘন্য জীবন যাপন করছ। মদ খেয়ে-খেয়ে দেনা বাড়াচ্ছো কেবল।

কথাটা শুনে যেন ভীষণ অবাক হয়েছেন এইরকম একটা ভঙ্গী করে তিনি বললেন: কখনও না, কখনও না।

অস্বীকার করো না। আমি খুব ভালই জানি।

আত্মরক্ষার্থে আর একবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু মাদাম এমন দুর্দান্তভাবে তাঁকে তিরস্কার করতে লাগলেন যে বাধ্য হয়েই ভারাজু চুপ করে রইলেন। বকা শেষ করে মাদাম বললেন—ছ'টার সময় আমরা ডিনার খাব। সেই সময় পর্যন্ত তোমার ছুটি। আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। সেইজন্যে তোমাকে আমি সঙ্গ দিতে পারব না এখন।

ছাড়া পেয়ে, ঘুমোবেন না বেড়াতে যাবেন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না তিনি। যে দরজা দিয়ে তাঁর ঘরে ঢোকা যায় একবার তিনি সেইদিকে তাকালেন; আর একবার তাকালেন রাস্তার দিকে। তারপরে তিনি রাস্তায় বেরোনোর মনস্থ করলেন।

সুতরাং তিনি রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন, ধীরে-ধীরে এগোতে লাগলেন। তাঁর কোষবদ্ধ তরোয়ালটা পায়ে লেগে ঝনঝন শব্দ করতে লাগল। এই শহর ব্রিটন—ধূ-ধূ করছে, রুক্ষ, ঘুমন্ত, অনেকটা জীবন্মৃতের মত। ধূসর রঙের ছোট-ছোট বাড়িগুলির দিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন, দেখলেন দু'চারজন পথচারীদের; আর তাকালেন জনশূন্য বিপণির দিকে; তারপরে বিরক্ত হ'য়ে বিড়বিড় করলেন: হতচ্ছাড়া জায়গা, এই ভ্যানে। এমন একটা রদ্দি জায়গাতে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে।

বিষণ্ণ মনে হাজির হলেন তিনি, তারপরে পরিত্যক্ত বুলেভার্ডের পাশ দিয়ে পাঁচটা নাগাদ ফিরলেন বাড়িতে। ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে লম্বা একটা ঘুম দিলেন সেই ছ'টা পর্যন্ত।

দরজায় টোকা পড়ল—ডিনার তৈরী, স্যার।

নিচে নেমে এলেন ভারাজু। ডাইনিং-রুমটা ভিজে স্যাঁতসেঁতে; দেওয়াল-গুলির নিচের অংশ থেকে চুণবালি সব ঝরে পড়েছে। খাবার টেবিলের ওপরে কোন ঢাকা নেই। তারই ওপরে একগামলা সুপ; আর তার সঙ্গে তিনটে প্লেট সাজানো রয়েছে। মঁসিয়ে আর মাদামও সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকলেন।

সবাই খেতে বসলেন। খাওয়া সুরু করার আগে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পাকস্থলীর ওপরে ক্রশের ভঙ্গিতে হাত দুটি করে সুরু করলেন খেতে। সুপ শেষ হওয়ার পরে গরুর মাংস এল। বেশী সেদ্ধ হওয়ার ফলে একেবারে গলে গিয়েছে। সার্জেন্ট-মেজর ধীরে-ধীরে চিবোতে লাগলেন; খাবারের ছিরি দেখে বিরক্তি, অবসাদ আর রাগে ফেটে পড়লেন তিনি।

মাদাম স্বামীকে বলছিলেন: আজ রাত্রিতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তোমার দেখা করার কথা রয়েছে না?

হ্যাঁ।

বেশী রাত করো না। কোথাও গেলেই আজকাল তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়। খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে তোমার বাইরে বেরোনো উচিৎ নয়।

তারপরে এল আলুর তরকারি, ঠাণ্ডা সসেজ; চিজ দিয়ে ডিনার-পর্ব সমাপ্ত হল। কফি নেই।

ভারাজু বুঝতে পেরেছিলেন সন্ধ্যেটা জেনের সঙ্গে একাই কাটাতে হবে তাঁকে। এই কাটানোর অর্থ হচ্ছে বোনের গুচ্ছের গালাগালি খাওয়া। এক-আধ গ্লাস মদ পেলেও না হয় গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু সে-সম্ভাবনাও না থাকায় তিনি ঠিক করলেন একটু বাইরে বেরিয়ে পড়বেন। তিনি মাদামকে বললেন—তাঁর কাগজপত্র ঠিক-ঠাক করার জন্যে এখনই একবার পুলিশ ফাঁড়িতে যেতে হবে তাঁকে। এই বলেই তাড়াতাড়ি তিনি বেরিয়ে পড়লেন। সন্ধ্যে তখন সাতটা।

রাস্তায় পড়েই পুকুর থেকে স্নান করে কুকুর যেমন গা-ঝাড়া দেয় তিনিও তেমনি গা-ঝাড়া দিলেন। বাবা, কী নোংরা জায়গা।

কাফের সন্ধানে তিনি বেরিয়ে পড়লেন—শুধু কাফে হলেই হবে না, হতে হবে একটা ভাল কাফে। শেষ পর্যন্ত ভাল কাফেই বেরোল একটা। ভেতরে পাঁচ ছ'জন কনুই-এর উপরে ভর দিয়ে মদ খেতে-খেতে বেশ শান্তভাবে গল্প করছিল। দেখে মনে হয় বেশ অবস্থাপন্ন ব্যবসাদার তারা। দু'জন বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় টেবিলের দিকে গেল এগিয়ে। খেলার ফলাফল জোরে-জোরে ঘোষিত হচ্ছিল: আঠার, উনিশ, না কপালে নেই। বাঃ, বাঃ, চমৎকার মার! সাবাস! এগার। লালটা থেকে তোমার পয়েণ্টটা নেওয়া উচিত ছিল। কুড়ি······চালাও, চালাও। বার—আমি ঠিক বলি নি?

ভারাজু অর্ডার দিলেন—কফি; আর খুব ভাল ব্র্যানডি।

তারপরে পানীয় আসার অপেক্ষায় চুপচাপ বসে রইলেন তিনি।

অবসর সময়টা তিনি এতদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হইচই করে সিগারেট ফুঁকে কাটিয়ে দিতেন। এই জায়গাটার নিস্তব্ধতা তাঁর অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। প্রথমে তিনি কফি খেলেন; তারপরে ব্র্যানডির বোতলটা টেনে নিলেন। প্রথম বোতল নিঃশেষ হওয়ায় তারপরে দ্বিতীয় বোতলে দিলেন টান। এখন তিনি হাসতে পারেন, চীৎকার করতে পারেন, গান করতে পারেন; যুদ্ধও করতে পারেন কারও সঙ্গে!

তিনি বললেন: ভগবানকে ধন্যবাদ। ভারাজু এখন স্বস্থানে ফিরে এসেছে।

তারপরে স্ফূর্তি করার জন্যে কোন মেয়েমানুষ সংগ্রহ করার কথা মনে হল তার। ওয়েটারকে ডাকলেন তিনি: ওহে ছোকরা।

বলুন স্যার।

এখানে স্ফূর্তি করার কোন জায়গা আছে কিনা বলতে পার?

তাঁর প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে লোকটা হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

জানিনে স্যার। এখানে?

এখানে মানে কী? স্ফূর্তি করা বলতে কী বোঝ তুমি?

জানিনে স্যার। এক গ্লাস ভাল বিয়ার মদ খাওয়া?

বোকা কোথাকার! মেয়েমানুষ!

মেয়েমানুষ!! আ!!!

হ্যাঁ; মেয়েমানুষ। এখানে কোথায় পাওয়া যাবে বলত?

মেয়েমানুষ?

অবশ্যই, মেয়েমানুষ।

ওয়েটারটি সামনে এগিয়ে এসে নীচু গলায় বলল: বাড়িটা আপনি জানতে চান?

হ্যাঁ।

বাঁদিক দিয়ে দ্বিতীয় রাস্তা: তারপরে ডানদিকে ১৫ নম্বর।

ধন্যবাদ। এই নাও তোমার বকশিস।

ধন্যবাদ স্যার।

ঠিকানাটা আওড়াতে-আওড়াতে ভারাজু কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটার পরে তিনি ভাবলেন: বাঁদিকে দ্বিতীয় রাস্তা···হ্যাঁ··· কিন্তু কাফে থেকে আমি ডানদিকে ঘুরব, না বাঁদিকে ঘুরব? জাহান্নামে যাক। আমি শীঘ্রই খুঁজে বার করে নেব।

হাঁটতে-হাঁটতে দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে তিনি বাঁদিকে ঘুরলেন, তারপরে এগিয়ে গেলেন প্রথম ডান দিকে। তারপরে তিনি পনের নম্বর খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। বাড়িটা মোটামুটি বেশ বড়। তিনি দেখতে পেলেন দোতলায়

বন্ধ শার্সীর ভেতরে আলো জ্বলছে। সামনের দরজার অর্দ্ধেকটা খোলা রয়েছে। হলঘরের ভেতরে একটা আলো জ্বলছে। সার্জেণ্ট-মেজর ভাবলেন এইটাই সেই বাড়ি।

সুতরাং তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন; এবং কেউ বেরিয়ে এল না বলে তিনি ডাকলেন —হুলো, হুলো!

একটি বাচ্চা পরিচারিকা বেরিয়ে এল; কিন্তু একটি সৈনিককে দেখে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি তাকে বললেন: গুড ইভনিঙ! মহিলারা ওপরতলায়?

হ্যাঁ, স্যার।

ড্রয়িংরুমে?

হ্যাঁ, স্যার।

মনে হচ্ছে আমি ওপরে যেতে পারি। পারি তো?

হ্যাঁ, স্যার।

সিঁড়ির ওপরে দরজা?

হ্যাঁ, স্যার।

তিনি সোজা ওপরে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। ভেতরের ঘরটিতে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল, সেই ঘরে সান্ধ্য-পোশাক পরে চারটি মহিলা বসেছিল। তাদের হাবভাবে মনে হচ্ছিল, কারও জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। সবচেয়ে ছোট তিনটি যুবতী ভেলভেটের পোশাক পরে পর-পর চেয়ারে বসে রয়েছে। চতুর্থটির বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। একটি ফুল সাজানো পাত্রে সে ফুল সাজাচ্ছিল। স্বাস্থ্যের দিক থেকে সে খুব মোটা। সবুজ রঙের সিল্কের পোশাক তার পরিধানে। তার হাত আর গলাটি বেশ বড়। প্রসাধনের দাপটে সেগুলি গোলাপের মত লাল দেখাচ্ছে।

সার্জেণ্ট-মেজর স্যালুট করে বললেন—গুড ইভনিঙ লেডিস।

বয়স্ক মহিলাটি ঘুরে দাঁড়াল—দেখে মনে হল সে বেশ অবাক হয়েছে; কিন্তু মাথা নীচু করে বলল—গুড ইভনিঙ।

তিনি বসলেন। কিন্তু তারা তাঁকে দেখে বেশ খুশী হল না দেখে তাঁর মনে হল এখানে হয়ত অফিসাররাই ঢুকতে পারে। চিন্তাটা তাঁকে অস্থির করে তুলল। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে জিজ্ঞাসা করলেন: সব ঠিক আছে তো?

বয়স্ক, বেশ শক্ত সমর্থ মহিলাটিও সম্ভবত ওখানকার মিসট্রেস। সে বলল: হ্যাঁ। সব ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

আর কী বলবেন বুঝতে পারলেন না তিনি। আর কেউ কোন কথা বলল না।

অবশেষে নিজের যে এগিয়ে যেতে লজ্জা করছিল এই ভেবে তিনি নিজেই

লজ্জা পেলেন ; তারপরে অস্বস্তির সঙ্গে হেসে বললেন : যাই হোক, বেশী হই-চই আমরা করব না। এক বোতল মদের দাম আমি দেব,······

কথাটা তাঁর শেষ হ'তে-না-হ'তেই আবার দরজা খুলে গেল ; ঢুকে এলেন প্যাদোই।

তাঁকে দেখেই ভারাজু প্রচণ্ড আনন্দে ফেটে পড়লেন ; তারপর দাঁড়িয়ে উঠে ভগ্নীপতির দুটো হাত ধরে নাচতে সুরু করে দিলেন ; নাচতে-নাচতে বললেন, প্যাদোই এসেছে···বৃদ্ধ প্যাদোই···এসেছে···এসেছে···

প্যাদোই তো অবাক—যাকে বলে একেবারে হতভম্ব। তাঁকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে, ভারাজু তাঁর মুখের ওপরে চীৎকার ক'রে বললেন : ও তুমি··· কুকুর এখানে মজা করতে এসেছ ? আর আমার বোন···তাকে তুমি ছেড়ে দিয়ে এসেছ···নাকি !

প্যাদোইকে এই অবস্থায় তিনি বাগে পাবেন তা তাঁর কল্পনাতীত ছিল। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন এর ফলে প্যাদোইকে মোচড় দিয়ে ইচ্ছেমত টাকা ধার পাওয়া যাবে, ব্ল্যাকমেইল করার সুযোগ পাওয়া যাবে অনেক। এই কথা ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সোফার ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি।

এই দেখে তিনটি যুবতী একসঙ্গে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল ; আর বয়স্কাটি দাঁড়াল গিয়ে একটা কোণে। তার চোখ মুখের অবস্থা দেখে মনে হল হয়ত সে-ও মূর্ছা যাবে।

সান্ধ্য-পোশাক পরে এবং সরকারী চিহ্ন ঝুলিয়ে দু'জন ভদ্রলোক ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলেন। প্যাদোই তাঁদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বিনীতভাবে বললেন : মিঃ প্রেসিডেন্ট, লোকটা পাগল···পাগল,···অসুস্থ। ওকে সারিয়ে তোলার জন্যে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজের চোখেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন···ও পাগল···।

হাসি বন্ধ হয়ে গেল ভারাজুর। ব্যাপারটা কী তা তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না ; কিন্তু কোথাও যে তিনি একটা বিরাট ভুল ক'রে ফেলেছেন সেটা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হল না। দুশ্চিন্তাটা হঠাৎ মাথায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন ; তারপরে ভগ্নীপতির সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : এ বাড়িটা কার ? আমরা কোথায় এসেছি ?

হঠাৎ চটে উঠে প্যাদোই তোতলাতে লাগলেন : আমরা কোথায় ? আমরা কোথায় এসেছি···হতচ্ছাড়া···নচ্ছার কোথাকার ! রাস্কেল···বদমাশ। কোথায় ? প্রেসিডেন্টের বাড়িতে···প্রেসিডেন্ট স্য মর্টমেঁর প্রাসাদে··· স্য মর্টমেঁ··· ও হো···শুয়োর···শুয়োর···শুয়োর···গাধা···গিধোড়···উল্লুক কাঁহাকার···

স্বীকারোক্তি

[Thc Confession]

ক্যাপটেন হেক্টর-ম্যারি ছ ফঁতেঁর সঙ্গে মিলি লরি'র যখন বিয়ে হল তখন সবাই এমন কি তাঁদের বাপ-মা এবং বন্ধুবান্ধবরাও পর্যন্ত—সবাই একবাক্যে বলেছিলেন যে এ বিয়েটা অত্যন্ত অযৌক্তিক হয়েছে।

চেহারার দিক দিয়ে মিলি ছিল সুন্দরী, রোগাটে, দুর্বল ; কিন্তু মোটেই চঞ্চল প্রকৃতির নয়। বার বছর বয়সেই তিরিশ বছর বয়সের মহিলার মত ছিল তার আত্মপ্রত্যয়। অনেক অকালপক্ব খুদে প্যারিস বালিকার মতই সে-ও জীবন-যাপনের কলাবিদ্যাটা সঙ্গে নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ; মেয়েদের সবরকম চাতুরীতে দক্ষ ছিল সে। এছাড়া সহজাত ছিল তার অপূর্ব ছলাকলা দেখানোর দক্ষতা,—পুরুষের সঙ্গে খেলা করার আর তাদের বিভ্রান্ত করার, প্রতারিত করার যে সমস্ত গুণগুলি নারীদের মজ্জাগত—সেগুলির কোনটারই অভাব ছিল না তার মধ্যে। নারীদের ক্রিয়াকলাপ সবই পূর্বপরিকল্পিত ; হঠাৎ করে তারা কিছু ক'রে না ; সবকিছু ভেবে চিন্তে—ফলাফল চিন্তা ক'রে তারা নিজেদের পথে এগিয়ে যায়। অভিনয় করাটাই তাদের জীবন। মিলি শৈশব থেকেই ছিল যাকে বলে পরিপক্ক রমণী।

ফুটফুটে ছিল মেয়েটি। হাসির একটু কথাতেই সে একেবারে হেসে কুটিকুটি হ'য়ে যেত—কলহাস্যে গড়াগড়ি দিত মাটিতে। তখন আর তাকে ধরে রাখা যেত না। লোকের সামনেই সে হাসত—সেই হাসিটা অনেকক্ষেত্রেই অশালীনতার পর্যায়ে পড়ত। কিন্তু সেই হাসিটি এমনই মধুর ছিল যে কেউ রাগ করত না।

তাছাড়া ছিল তার অর্থ। প্রচণ্ড ধনী ছিল মেয়েটি। ক্যাপটেন ফঁতেঁর সঙ্গে তার বিয়ে হয় একজন পাদরীর মধ্যস্থতায়। ক্যাপটেন শিক্ষা পেয়েছিলেন এমন একটি বিদ্যালয়ে যেখানে চরিত্র গঠন আর নিয়মানুবর্তিতার ওপরে জোর দেওয়া হোত সবচেয়ে বেশী। সেই শিক্ষা পেয়ে তিনি নিজের সৈন্যদেরও কঠোর হস্তে সংযত করেছিলেন। চরিত্রের দিক থেকে তিনি এমন একটি মানুষ ছিলেন ভাগ্য যাকে হয় কোন সেণ্ট অথবা দানব করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এসব মানুষের আদর্শই এঁদের ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করে ; এবং এঁরা যা করব বা করা উচিৎ বলে মনে করে তা থেকে এঁদের বিচ্যুত করা যায় না।

লম্বা-চওড়া চেহারা, কৃষ্ণবর্ণ যুবক, গম্ভীর প্রকৃতির, নীতির দিক থেকে

কঠোর, সরল, স্থিতি-প্রতিজ্ঞ; উত্তর দেন সোজাসুজি, মুখের ওপর, এবং একগুঁয়ে। ইনি সেই প্রকৃতির মানুষ যিনি জীবনের অসংখ্য অলিগলির কথা জানেন না, দুনিয়ার সহস্র ছলাকলার সম্বন্ধে যিনি অনভিজ্ঞ। এই জাতীয় মানুষ সন্দেহ করেন না কাউকে · কারও যে নিজস্ব কোন চিন্তাধারা রয়েছে সে কথা যিনি বিশ্বাস করেন না; এবং আত্মবিশ্বাসের দৌরাত্ম্যে সবসময় যিনি অন্য মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করেন।

মিলি তাঁকে দেখল, একটি দৃষ্টি দিয়েই তাঁর চরিত্র কী রকম তা বুঝে নিল। তারপরে তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হ'য়ে গেল।

বেশ ভালভাবেই দিন কাটছিল তাঁদের, বুদ্ধিমতী মেয়ে মিলি; যাকে বলে ধুরন্ধর, সাংসারিক বিষয়ে নিজেকে সে তাড়াতাড়ি খাপ খাওয়াতে পারত। ভাল কাজে এতটুকু অনিচ্ছা ছিল না তার, আনন্দের আসরে উচ্ছ্বাসময়ী; গির্জা এবং থিয়েটার—এই দুটি জায়গাতেই সে নিয়ম করে যেত। গম্ভীর প্রকৃতির স্বামীর সঙ্গে গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলার সময় তার চোখের ভিতরে একটা ব্যঙ্গ আর তামাসার দ্যুতি সবসময় ঝলসে উঠত। গির্জার পাদরীদের সঙ্গে যে সব জনহিতকর কাজের আযোজন সে করেছে সেগুলির ফিরিস্তি সে তার স্বামীকে নিয়ম করে দিত; আর এই সব কাজের অছিলায় সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে ঘরের বাইরে কাটাত।

কিন্তু মাঝে-মাঝে এই সব জনহিতকর কাজের বর্ণনা দিতে-দিতে সে খিল খিল করে হেসে উঠত। সেই হাসির আবেগটা হঠাৎ এমন বেড়ে যেত যে কিছুতেই নিজেকে সে সামলিয়ে রাখতে পারত না। ক্যাপটেন সাহেব স্ত্রীর এই অকারণ উদ্বেগজনক হাসির কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে অবাক হ'য়ে তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। স্ত্রীর হাসির উচ্ছ্বাস থিতিয়ে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন—'ব্যাপারটা কী বলত?' স্ত্রী বলত—'না, না। ও কিছু নয়। আমার জীবনে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।' এই বলেই সে হযত কোন একটা গল্প ফেঁদে বসত।

১৮০৩ সালের গ্রীষ্মকালে ক্যাপটেন হেক্টর দ্য ফঁতেঁ বত্রিশ নম্বর সামরিক বাহিনীর বিরাট অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা শহরের বাইরে তাঁর বাহিনী তাঁবু ফেলেছিল। দশ দিন কঠোর পরিশ্রম আর ক্যানভাসের ছাউনিতে থাকার পরে ক্যাপটেনের বন্ধুরা ঠিক করলেন এবার ক'দিন ভাল-ভাল ডিনারের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথমে মঁসিয়ে ফঁতেঁ তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হন নি; তারপরে সবাই যখন অবাক হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল তখনই তিনি রাজি হলেন। সামরিক অভিযানের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করার ছলে, এবং একমাত্র ওই বিষয়ে আলোচনা করতেই ক্যাপটেন ফঁতেঁ আনন্দ পেতেন, মেজর দ্য ফরি টেবিলে তাঁর পাশে বসলেন এবং ফঁতেঁর শূন্য গ্লাস মদে পূর্ণ করতে

লাগলেন। খুব গরম পড়েছিল সেদিন—মানুষের কণ্ঠ শুকিয়ে যাচ্ছিল বারবার। কোনকিছু খেয়াল না করেই ক্যাপটেন ফঁতেঁ গ্লাসের পর গ্লাস মদ গলায় ঢালতে লাগলেন। তিনি বুঝতেও পারলেন না যে তাঁর মেজাজটা বেশ শরীফ হয়ে উঠছে, মাথার ভেতরে একটা উত্তেজনা চঞ্চল পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনের মধ্যে একটা নাম-না-জানা আকাঙ্খা জেগে উঠল তাঁর।

ডিনারের শেষ পর্যায়ে যখন ফলমূল হাজির হল তখন তিনি মাতাল হ'য়ে পড়েছেন। উন্মাদের মত তিনি জোরে-জোরে হাসতে লাগলেন, মুখভঙ্গী করতে লাগলেন। অমন যে শান্ত মানুষ—মদের চাপে তিনিও কেমন যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

থিয়েটারে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন একজন। বন্ধুদের সঙ্গে তিনিও থিয়েটারে গেলেন। হঠাৎ একজন অভিনেত্রীকে দেখে চিনতে পারলেন। অভিনেত্রীটি নাকি পূর্বজীবনে তাঁর প্রেমিকা ছিল। রাত্রিতে ভোজের আয়োজন হল; সেইখানে নিমন্ত্রণ জানানো হল থিয়েটারের সমস্ত অভিনেত্রীদের।

পরের দিন সকালে একটি অপরিচিত ঘরে ক্যাপটেন ফঁতেঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। ঘুম ভাঙতেই তিনি দেখলেন একটি ক্ষুদে চেহারার সুন্দরকেশী রমণীর আলিঙ্গনের মধ্যে তিনি শুয়ে আছেন। তাঁকে চোখ খুলতে দেখে রমণীটি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল—গুড মর্ণিঙ, ডিয়ারি।

ব্যাপারটা কী তা প্রথমে তিনি বুঝতে পারলেন না। পরে ধীরে-ধীরে ঘটনাটা আবছা-আবছা মনে পড়ল তাঁর। কোন কথা না বলে তিনি উঠে পড়লেন, পরলেন পোশাক; তারপরে কুলুঙ্গি থেকে টাকার ব্যাগটা নিয়ে উপুড় করে দিলেন। সুসজ্জিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে এই নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, এবং সম্ভবত বারবণিতার ঘরে রাত কাটানোর জন্যে তিনি যথেষ্ট লজ্জিত হলেন। তখনই বাইরে বেরিয়ে যেতে বা প্রকাশ্যে সিঁড়ি দিয়ে নামতে সাহস করলেন না তিনি। কেউ তাঁকে ওই পোশাকে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলে লজ্জায় মরে যাবেন তিনি।

রমণীটি বলল: কী হল তোমার? কথা নেই যে! গত রাত্রিতে তো মুখ থেকে ফোয়ারা ছুটছিল। একটি কিম্ভূতকিমাকার বস্তু বাপু তুমি।

রমণীটিকে আভিজাত্যের সঙ্গে নমস্কার জানিয়ে সাহস সংগ্রহ করে বাসায় ফিরে এলেন তিনি। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে তাঁর হাবভাব আর পোশাক-আশাক দেখে সবাই জানতে পেরেছে যে তিনি বারবণিতার ঘর থেকে সোজা উঠে আসছেন।

অনুশোচনায় জর্জরিত হ'য়ে উঠলেন। গির্জায় গিয়ে তিনি পাপ স্বীকার করলেন। তবু শান্তি পেলেন না। পদস্খলনের জন্যে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না। তাঁর কেবল মনে হতে লাগল এখনও কিছুটা পবিত্র

কর্তব্য তাঁর বাকি রয়ে গিয়েছে—সেটা হচ্ছে তাঁর স্ত্রীর কাছে।

অভিযানের সময় তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাঁর বাপের বাড়িতে। এক মাসের আগে তাঁর সঙ্গে ক্যাপটেনের দেখা হয় নি। দেখা যেদিন হল সেদিন প্রেয়সী দু'হাত বাড়িয়ে হাসতে-হাসতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ক্যাপটেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন বেশ বিব্রত হয়ে—দ্বিধা আর সঙ্কোচের সঙ্গে এতই ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন যে সন্ধ্যের আগে অর্দ্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে কোন কথাই বলতে পারলেন না তিনি।

দু'জনে একসঙ্গে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কী বলত, ডারলিঙ! তোমাকে কেমন-কেমন লাগছে যেন!

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে উত্তর দিলেন ক্যাপটেন—না, না, কিছু না—কিছু না।

কী বললে? কিছু না? নিশ্চয় কিছু, এবং ভয়ঙ্কর রকমের কিছু। আমি বেশ বুঝতে পারছি এমন কিছু ঘটেছে যেটা তোমাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে—হয় তুমি কোন বিপদে পড়েছ, আর না হয়ত কোন দুঃখ পেয়েছ। অথবা, আর কিছু ঘটেছে।

মানে, হ্যাঁ; আমি বিক্ষুব্ধ।

কিসের জন্যে?

তা আমি তোমাকে বলতে পারব না।

আমাকে বলতে পারবে না? কেন? আমার ভয় করছে।

বলার মত কোন কারণ আমার নেই। যদিও থাকে, আমি তোমাকে তা বলতে পারব না।

স্ত্রী বসেছিলেন একটা নীচু সোফার ওপরে। ক্যাপটেন পেছনে দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মেঝের ওপরে পায়চারি করছিলেন। পায়চারি করার সময় স্ত্রীর দুটি চোখ তিনি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন।

স্ত্রী বললেন: ঠিক আছে। তাহলে আমি তোমার স্বীকারোক্তিই শুনব। শোনাই আমার কর্তব্য। তোমার মুখ থেকে সত্যি কথা শোনার অধিকার আমার রয়েছে। তোমার কাছে আমার যেমন কোন গোপন কথা থাকবে না, আমার কাছ থেকেও তেমনি তুমি কোন কথা গোপন করে রাখতে পার না।

ক্যাপটেন সাহেব পেছন ফিরে লম্বা উঁচু জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন, সেখান থেকেই বেশ গম্ভীর স্বরে বললেন—প্রিয়তমে, এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা না বলাই ভাল। সেইরকম একটা জিনিসই আমাকে বিব্রত করে তুলেছে।

কথা শুনে মহিষী উঠলেন, এগিয়ে গেলেন; স্বামীর হাত ধরে টেনে নিজের দিকে ঘুরালেন। নিজের দুটো হাত দিয়ে স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরে

ভুরু দুটি কুঞ্চিত করে হাসতে-হাসতে আদর ক'রে বললেন : শোন ম্যারি, (স্বামীকে যখন তিনি খুব ভালবাসতেন তখন এই নামে তাকে তিনি ডাকতেন) আমার কাছ থেকে কোনকিছুই তুমি লুকিয়ে রাখতে পার না। আমার বিশ্বাস, তুমি কোন খারাপ কাজ করেছ।

তিনি বিড়বিড় করে বললেন—আমি একটা খারাপ কাজই করেছি।

হাসির ছলে স্ত্রী বললেন—তাই বুঝি ? তুমি ? আমাকে অবাক করলে দেখছি।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল স্বামীর স্বর—আর তোমাকে কিছু আমি বলব না। বারবার একই প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই তোমার।

কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্রী মহিষী নন। স্বামীকে তিনি ধরে এনে আরাম-কেদারায় বসালেন—নিজে বসলেন তাঁর ডান কোলে ; তাঁর গোঁফের সূচলো অংশে ছোট্ট একটা চুমু খেলেন ; তারপরে বললেন : তুমি যদি আমাকে না বল, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে কোন বন্ধুত্ব থাকবে না।

আমি যা করেছি তা যদি তোমাকে বলি তাহলে তুমি আমাকে ভবিষ্যতে ক্ষমা করবে না।

ঠিক তার উলটো, ডারলিঙ। আমি তোমাকে সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষমা করে দেব।

না, এ অসম্ভব।

কথা দিচ্ছি।

আমি বলছি, এ অসম্ভব।

প্রতিজ্ঞা করছি।

না, না। তুমি তা পারবে না।

ডারলিঙ, বোকামি না বলে বলছি, কী ছেলেমানুষীই না তুমি করছ ? তুমি কী করেছ সেকথা আমাকে না বলার ফল কী জান ? আমি তোমার সম্বন্ধে যা তা কথা ভাববো। সব সময় আমি ওই কথাটাই ভাববো। আর তুমি যে আজ আমাকে তোমার পাপের কথা বললে না তার জন্যে চিরকালই তোমার ওপরে আমি একটা রাগ পুষে রাখবো। আর তুমি যদি সব কথা এখনই আমাকে খোলাখুলি বলে দাও তাহলে কালই তোমাকে আমি ক্ষমা করে দেব।

মানে, আমি···

কী করেছ···?

বলতে গিয়ে কানের গোড়াগুলি পর্যন্ত তাঁর লাল হয়ে গেল, তিনি বেশ গম্ভীরভাবেই বললেন : পাদরীর কাছে যেমন করে মানুষ নিজের পাপের কথা স্বীকার করে আমি তোমার কাছে সেইরকম করেই স্বীকার করব আমার অন্যায়।

একটা হাসির ঝিলিকে মহিষীর ঠোঁট দুটি কুঁকরে উঠল ; তারপরে কিছুটা

ঠাট্টার স্বরে তিনি বললেন : বলে যাও। আমি শুনছি।

স্বামী বলে গেলেন—আমি যে খুব মদ্যপান করি তা তুমি জান। যা খাই সেটা হচ্ছে জল—পাতলা মদ দিয়ে একটু রঙিন করা মাত্র।

হ্যাঁ; তা আমি জানি।

তুমি কি জান এই অভিযানের সময় একদিন সন্ধ্যায় প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত হয়ে আমি একটু বেশী পরিমাণ মদ্যপান করেছিলাম···

তুমি মাতাল হয়েছিলে? কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড!

হ্যাঁ; আমি মাতাল হয়েছিলাম।

কড়া অনুশাসনের পরে স্ত্রী বললেন : তাহলে মদ খেয়ে তুমি মাতাল হয়েছিলে···স্বীকার করছ তুমি। এত মাতাল হয়েছিলে যে চলতে পার নি—তাই না?

না, ঠিক ততটা নয়। জ্ঞানটা আমি হারিয়েছিলাম সত্যি কথা; দেহের সমতা হারাই নি। আমি খুব বকবক করেছিলাম, হেসেছিলাম; আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। চুপ করে গেলেন ক্যাপটেন।

ক্যাপটেন-পত্নী বললেন : এই স-ব?

না।

মানে, এর পরেও রয়েছে······?

তারপরে···তারপরে···আমি···আমি একটা ঘৃণ্য কাজ করেছিলাম।

অস্বস্তির সঙ্গে ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিছুটা আতঙ্ক আর কিছুটা করুণার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—কী করেছিলে, ডারলিঙ?

রাত্রির ভোজ-এ আমরা কয়েকজন অভিনেত্রীকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম··· এবং কী করে যে ঘটনাটা ঘটলো তা আমি জানিনে; কিন্তু তোমার প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি লরি।

উদাত্ত স্বরে গম্ভীরভাবে ঈশ্বরের কাছে স্বীকারোক্তি করার মত ক্যাপটেন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

ভদ্রমহিলা একটু নড়াচড়া করলেন; একটা কৌতুকের ঝিলিকে, একটা বিপুল আর অদম্য কৌতুকে তাঁর চোখ দুটি জলজল করে উঠল। তিনি বললেন—তুমি···তুমি···তুমি···

একটুকরো নিরানন্দ হাসি বারতিনেক তাঁর ঠোঁট দুটির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, রুদ্ধ করে দিল তাঁর স্বর।

গাম্ভীর্য পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করলেন ভদ্রমহিলা, কিন্তু যতবারই তিনি কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে যান ততবারই গলার নীচে হাসির বুদ্বুদ উঠে তাঁর কণ্ঠ রোধ করে দেয়। আবার কথা বলতে যান; আবার হাসির আবেগে সব ভেস্তে যায়। ছিপি-না-খোলা বোতলের ভিতরে শ্যাম্পেনের ফেনাগুলি যেমন গ্যাসের চাপে আটকে থাকে এ-ও সেইরকম একটা ব্যাপার। ভেতরের

আবেগটাকে প্রশমিত করার জন্যে তিনি ঠোঁটের ওপরে আঙুল চাপা দিলেন : এবং মুখের মধ্যে যে হাসির ফোয়ারা উঠছিল তাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে হাসি ছিটকে পড়ল বাইরে, দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল তাঁর। অসংলগ্ন প্রলাপের মত বেরিয়ে এল কথাগুলি—তুমি···তুমি···তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ। ও-হো···ও-হো··ও-হো···

বজ্রাহতের মত ক্যাপটেন সাহেব নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ ভদ্রমহিলা আত্মসংযমের সব চেষ্টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। মনে হল হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। ছোট ছোট ভাঙা-ভাঙা তীক্ষ্ণ কান্নার সুর মনে হল তাঁর বুকের মধ্যে থেকে প্রবল বেগে বেরিয়ে এল বাইরে। দুটো হাত দিয়ে নিজের পেট টিপে ধরলেন তিনি। উদ্গত হাসির ঝোঁকে তাঁর প্রায় দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। হাসি চাপতে যতবারই চেষ্টা করলেন ততবারই হুপিং কাশির মত খকখক করে কাশতে লাগলেন তিনি।

ভদ্রমহিলাকে আরাম কেদারায় ফেলে ক্যাপটেন নিজে উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন—সরি, তুমি অসভ্যেরও অধম।

কৌতুকের উচ্ছ্বাসে ভদ্রমহিলা তোতলাতে লাগলেন—মানে, মানে···কী তুমি আশা করেছিলে···? আমি···আমি নিজেকে সামলাতে পারছিনে। তুমি এত রসিক···ওঃ—ওঃ—ওঃ।

ক্যাপটেন একদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন আতঙ্কিত হয়ে। সেই দৃষ্টির অন্তরালে অদ্ভুত-অদ্ভুত চিন্তা ঘুরে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ কিছু বলার জন্যে চেঁচাতে গিয়ে মুখটা বুজিয়ে ফেললেন তিনি। তারপরে দরজাটা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আরও ঝুঁকে পড়লেন তাঁর স্ত্রী ; ক্লান্ত, মূর্ছাতুরা হয়ে হাসতে লাগলেন—অর্দ্ধ নির্বাপিত আগুনের শিখার মত এক একবার অদম্য কাশির ঝোঁক উঠে বাইরে ছিটকে পড়তে লাগল তাঁর।

জানালা

[The Window]

এই বছর শীতের সময় প্যারিসে মাদাম দি জ্যাডেল-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরিচয় হওয়ামাত্র তাঁকে আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল।

কিন্তু আমার মত আপনারাও তাঁকে জানেন…না…ক্ষমা করবেন…আমি তাঁকে যতটা জানি আপনারাও প্রায় ততটাই তাঁকে জানেন। আপনারা জানেন তিনি যতখানি রোমান্টিক ঠিক ততখানিই খামখেয়ালী। আচারে-ব্যবহারে দিলখোলা, হৃদয়বতী, একগুঁয়ে, কোন বিষয়েই গোঁড়ামির বাষ্পটুকু তার মধ্যে আপনারা খুঁজে পাবেন না; ভয় বলে কোন বস্তু তাঁর ভেতরে নেই, দুঃসাহসিকা বেপরোয়া। সংস্কার মাত্রকেই তিনি ঘৃণা করতেন; এবং তা সত্ত্বেও, বড়ই ভাবপ্রবণ, খুঁতখুঁতে; বিরূপ মন্তব্যে খুব তাড়াতাড়িই রেগে যান তিনি, নম্র এবং অনুভূতিপ্রবণা।

ভদ্রমহিলা বিগত বিধবা। আমি নিজে অলস; তাই আমি বিধবাদের শ্রদ্ধা করি। সেই সময় বিয়ে করার কথা আমি ভাবছিলাম। সেই জন্যে তাঁর সঙ্গে আমি মেলামেশা করতে সুরু করে দিলাম। পরিচিতির অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে ভাললাগার গভীরতাও আমার বাড়তে লাগল। ঠিক করে ফেললাম —এবার আমার প্রস্তাবটা তাঁর কাছে রাখব। আমি তাঁর প্রেমে পড়েছিলাম, শুধু প্রেম নয়, একেবারে গভীর প্রেম। বিয়ে করার সময় কোন মানুষেরই তার স্ত্রীর সঙ্গে গভীর প্রেমে পড়া উচিৎ নয়; পড়লে, নিজেকে সে একটি আস্ত গাধায় পরিণত করবে। আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে সে বোকার মত কাজ করবে, এককথায় ছ্যাবলা হয়ে যাবে সে। পুরুষ মানুষের কাছে আত্মসংযমটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম রাত্রিতেই সে যদি তার সংযমের বাঁধ ভেঙে ফেলে, একটি বছরের মধ্যেই তার মত আর পথ পরিবর্তনের যথেষ্ট বিপদ রয়েছে।

সেই জন্যে একদিন হালকা ধরনের দস্তানা পরে আমি তাঁর বাড়িতে হাজির হলাম, বললাম: মাদাম, আমার অনেক সৌভাগ্য যে আমি তোমাকে ভালবাসতে পেরেছি। তোমাকে খুশী করব আর তোমাকে আমার যা কিছু ভাল রয়েছে সব দান করব এই আশা নিয়ে আমি আজ এখানে এসেছি। সেই সঙ্গে আমার পদবীটাও তোমাকে দান করার বাসনা আমার রয়েছে।

শান্তভাবে উত্তর দিলেন তিনি—তোমার যা অভিরুচি। তোমাকে ভালবেসেই যে শেষ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব এমন কথাও আমি এখনই ঠিক বলতে পারছিনে। কিন্তু একটা পরীক্ষা করতে আপত্তি নেই। মানুষ হিসাবে আমি তোমাকে পছন্দ করি। তোমার স্বভাব-চরিত্র কেমন, চাল-চলনই বা কী রকম তা দেখা দরকার। অনেক বিয়েই যে দুর্যোগে ভেঙে যায়, অথবা শেষ পর্যন্ত নীতি-বিগর্হিত হয়ে দাঁড়ায় তার একমাত্র কারণ হচ্ছে বিয়ের আগে দু'পক্ষের কেউ পরস্পরকে ভালভাবে চেনার সুযোগ পায় না। ফলে, সামান্য-সামান্য অতি তুচ্ছ কারণেই দুজনে ঝগড়া করে; কোন গভীর বিতৃষ্ণা, নীতি বা ধর্ম বা অন্য কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত পরস্পরের কাছ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা অপ্রিয়

অপগুণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করে—পরস্পরকে চিরশত্রু করে তোলে। পৃথিবীর অনেক-অনেক প্রেমিক দম্পতির জীবনই ঠিক এই কারণেই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

'ভালভাবে না জেনে কাউকেই আমি বিয়ে করব না; যাকে আমি জীবনে সঙ্গী করব তার চরিত্রের প্রতিটি খুঁটিনাটি, চাল-চলন, হাব-ভাব লক্ষ্য করব আমি। সময়মত, খুব কাছাকাছি থেকে কয়েক মাস ধরে আমি তাকে অনুশীলন করতে চাই।

'আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই: লভিল-এ আমার যে এসটেট রয়েছে সেইখানে গ্রীষ্মের সময়টা তুমি থাকবে চল। আমাদের একসঙ্গে বাস করার যোগ্যতা রয়েছে কিনা সেই শান্ত-পরিবেশে আমরা যাচাই করে দেখব···

'দেখতে পাচ্ছি আমার কথা শুনে তুমি হাসছ। আমার সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা করছ তুমি। কিন্তু প্রিয় বন্ধু, নিজেকে আমি খুব ভাল ক'রে না চিনলে কখনই তোমাকে এই প্রস্তাব আমি দিতাম না। প্রেম-ভালবাসা বলতে তোমাদের মত পুরুষরা যা বোঝে তার ওপরে আমার এত ঘৃণা আর বিরক্তি জন্মেছে যে আর কোন প্রলোভনেই আমি আমার মাথাটাকে বিকৃত হওয়ার সুযোগ দেব না। আমার প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করলে?

তাঁর হাতে চুমু খেয়ে বললাম: কখন আমরা যাত্রা করব, মাদাম?

১০ই মে। রাজি তো?

রাজি।

একমাস পরে আমি তাঁর প্রাসাদে গিয়ে উঠলাম। সত্যিই অদ্ভুত এই মহিলা: সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তিনি আমাকে দেখতে লাগলেন। ঘোড়ায় চড়তে তাঁর খুব ভাল লাগত। তাই আমরা প্রতিদিন বনের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতাম। বেড়াতে-বেড়াতে পৃথিবীতে এমন কিছু বিষয় আর অবিষয় ছিল না যা নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম না, কারণ আমার গভীরতম চিন্তার বিষয়েও যেমন তিনি অবহিত হ'তে চাইতেন, আমার ছোটখাট ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তেমনি তিনি আদৌ উদাসীন ছিলেন না।

আমার কথা যদি ধরেন তাহলে আমি বলতে পারি যে আমি তাঁকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছিলাম। তাই চরিত্রগত মিল আমাদের রয়েছে কি না তাই নিয়ে বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত হই নি আমি। শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম, আমার রাত্রির নিদ্রাটিকেও পাহারাধীনে রাখা হয়েছে। আমার পাশের ঘরেই একজন ঘুমোত। অনেক রাত্রি না হলে সে আমার ঘরে ঢুকত না; আর ঢুকত অত্যন্ত সন্তর্পণে, পা টিপে-টিপে। রাত্রির অন্ধকারে এই মানুষটির ক্রমাগত অভিসারে শেষ পর্যন্ত আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। ব্যাপারটার একটা ফয়শালা করতে বদ্ধপরিকর হলাম আমি। সন্ধ্যের সময় কথাটা পাড়তেই এমন ধাতানি খেলাম যে সে-প্রসঙ্গে বেশীদূর এগোতে আর সাহস করলাম না

কিন্তু আমি ঠিক করে ফেললাম যেমন করেই হোক এর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। কী করে নেওয়া যায় সেই কথাই ভাবতে লাগলাম আমি।

আপনারা সিজারীঁকে জানেন। সিজারীঁ হচ্ছে তাঁর পরিচারিকা। গ্রাঁভালির সব মেয়েদের মতই সে সুন্দরী, একদিন বিকালে তাকে আমি ঘরের মধ্যে টেনে এনে পাঁচটা ফ্রা তার হাতে গুঁজে দিয়ে মিষ্টি করে বললাম—এই শোন। আমি তোমাকে অন্যায় কিছু করতে বলছিনে; কিন্তু তোমার মনিব আমার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করছেন আমিও তাঁর সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করতে চাই।

পরিচারিকাটি ব্যঙ্গ ক'রে মুচকে একটু হাসল।

আমি বললাম—রাতদিন যে আমি ভীষণ মনোকষ্টে রয়েছি তা আমি জানি। আমার খাওযা থেকে সুরু করে জামাকাপড় পরা, মোজা পরা, কথা বলা, হাসা—সব বিষয়ে কেউ গভীর লক্ষ্য রাখছে।

যুবতীটি বলল—মানে, ব্যাপারটা কী হচ্ছে জানেন স্যার…।

এইটুকু বলেই সে থেমে গেল। আমি বলে গেলাম—তুমি আমার পাশের ঘরে শোও; আমার নাক ডাকে কিনা, ঘুমোতে-ঘুমোতে আমি ভুল বকি কিনা—এই সব তুমি শুয়ে-শুয়ে শোন। অস্বীকার করো না।

সোজাসুজি হাসতে লাগল মেয়েটি; বলল—মানে, জানেন কি স্যার…

আবার থেমে গেল মেয়েটি; ভাবের আবেগে আমি বলে গেলাম—তুমি বুঝতেই পারছ—আমার গোপন চরিত্রটা সবাই জেনে যাবে আর যে মহিলাটি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হ'তে যাচ্ছেন তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু জানতে পারব না—এটা ঠিক নয়। আমি অবশ্য তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। সেদিক থেকে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। তবুও এমন কিছু আছে যা জানার জন্যে আমি অনেককিছু দিতে পারি।…

সিজারীঁ আমার টাকাটা তার জামার পকেটে ঢোকাতে মনস্থ করতেই আমি বুঝলাম আমার দাওয়াইটা লেগেছে। আমি বললাম—শোন…আমরা পুরুষ মানুষ…মেয়েদের সম্বন্ধে আমরা এমন কয়েকটা জিনিস জানতে চাই, অর্থাৎ শরীরিক গঠনের কথা আমি বলছি, যে জিনিসগুলি তাদের বাইরের সৌন্দর্য নষ্ট করে না বটে—কিন্তু আমাদের চোখে তাদের দাম অনেকটা পালটিয়ে যায়। তোমার মনিবের নিন্দে করতে আমি তোমাকে বলছিনে; যদি তাঁর কোন গোপন দোষ থাকে সেকথাও বলতে তোমাকে আমি অনুরোধ করব না। তাঁর সম্বন্ধে চারটে কি পাঁচটা প্রশ্ন আমি তোমাকে করব। সেগুলির যথাযর্থ উত্তর দাও তুমি। মাদামের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তোমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত, কারণ প্রতিদিনই তুমি তাঁকে পোশাক-আশাক পরাও। তাঁকে যেরকম মোটাসোটা দেখায় আসলে তিনি কি সেইরকম?

পরিচারিকাটি কোন উত্তর দিল না।

আমি বলে গেলাম—বৎস, তোমার নিশ্চয় অজানা নেই যে কিছু মহিলা প্যাড ধারণ করেন···মানে প্যাড বাঁধেন সেইখানে যেখান থেকে শিশুরা দুধ খায়, আবার যেখানে ভর দিয়ে তুমি বস সেইখানে। আমাকে বলত— মাদাম কি সেইরকম প্যাড ব্যবহার করেন ?

চোখমুখ নীচু ক'রে সিজারী ভয়ে-ভয়ে বলল : আপনার সব প্রশ্ন শেষ করুন স্যার। আমি একসঙ্গে উত্তর দেব।

ভাল কথা, বৎস। কিছু-কিছু মহিলা রয়েছেন যাঁরা বক্রজানু। এর ফলে প্রতিটি পদক্ষেপেই তাঁদের হাঁটুতে-হাঁটুতে ঠোকর লাগে। আর একদল রয়েছেন যাঁদের বক্রতা এত দূরে-দূরে যে তাঁরা যখন হাঁটেন তখন তাঁদের পা দুটি পোলের ওপরে খিলানের মত বেঁকে যায়। সেই ফাঁক দিয়ে ইচ্ছে করলে তুমি গ্রাম্য পরিবেশটি বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পাবে। এই দুটি ফ্যাশানই সুন্দর। তোমার মনিবের পা দুটি কেমন বল দেখি ?

এবারেও সে কোন উত্তর দিল না। আমি আবার সুরু করলাম—এমন কিছু কিছু মহিলা রয়েছেন যাঁদের কুচযুগল বড় সুন্দর। নীচের দিকে তাদের বেশ গভীর ভাঁজ রয়েছে। কারও-কারও হাতগুলি বেশ মোটা, শরীরটা রোগা। কোন-কোন মহিলা আছেন যাঁদের সামনে থেকে দেখতে বেশ ভালই লাগে ; কিন্তু পেছনটা তাঁদের একেবারে যাচ্ছেতাই। কিছু মহিলা আছেন যাঁদের পেছনটা ভাল—সামনেটা একেবারে বিশ্রী। এই সব ফ্যাসানগুলিই কিন্তু ভারি সুন্দর, কিন্তু তোমার মনিবটির চেহারা কেমন সেইটুকুই আমি জানতে চাই।

সিজারী কী যেন দেখার জন্যে আমার দিকে তাকাল ; তারপরে খিলখিল করে হেসে বলল—রঙটা কালো ছাড়া, মাদামের চেহারা ঠিক আমারই মত স্যার।

এইটুকু বলেই সে ছুট দিল।

আমার হয়ে গেল। মনে হল কী বোকা আমি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলাম এই অবাধ্য মেয়েটিকে উচিৎ শিক্ষা দেব আমি।

যে ছোট ঘর থেকে মেয়েটি আমার ঘুমনোর ঘরে নজর রাখত, ঘণ্টাখানেক পরে সেই ঘরে ঢুকে আমি খিলটা খুলে রাখলাম। মধ্য রাত্রিতে মেয়েটি ঘরে ঢুকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করার নির্ধারিত জায়গায় এসে উপস্থিত হল। আমি তখনই তার পিছু নিলাম। আমাকে দেখতে পেয়েই মনে হল মেয়েটা এখনই চীৎকার করে উঠবে, কিন্তু আমার হাত দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরলাম ; এবং তাকে বোঝাতে আমার বেশী সময় গেল না যে সে যদি মিথ্যে কথা বলে না থাকে তাহলে মাদামের শারীরিক গঠন নিশ্চয় সুন্দর। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার জন্যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমি আরও ভাল করে পরীক্ষা করলাম। তাতে সে অখুশি হল ব'লে মনে হল না আমার। তারপরে সেই দিনই তাকে

আমি একটা ফ্ল্যাস্ক অ্যাম্বার ল্যাভেনডার উপহার দিলাম। এরপরে খুব তাড়াতাড়ি পরস্পরের প্রতি আনুগত্য আমাদের বেড়ে গেল। একরকম বন্ধু হয়ে গেলাম আমরা। মিসট্রেস হিসাবে সে ছিল অপরূপা। যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি সুন্দরী। প্যারিসে গেলে সে বিখ্যাত রূপজীবিনী হিসাবে নাম কিনতে পারত।

যে আনন্দ সিজারীঁর কাছ থেকে আমি পাচ্ছিলাম তাতেই খুশি হয়ে মাদামের পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ধৈর্য নিয়েই অপেক্ষা করছিলাম। আমার ব্যবহার, চাল চলন একেবারে নিখুঁত হয়ে দাঁড়াল।

আমার বাগদত্তার কথা যদি ধরেন তাহলে বলতে হবে তিনি অতীব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এমন কতকগুলি লক্ষণ আমার চোখে পড়ল যা থেকে আমার মনে হল যে আমাকে তিনি শীঘ্রই গ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন। একটি সুন্দরী যুবতী যে আমার কাছে অস্বাভাবিক রকমের প্রিয় ছিল—তার কোলের মধ্যে বসে আমার পাত্রীর কাছ থেকে আইনসঙ্গত চুমু খাওয়ার জন্যে আমি শান্ত-ভাবে অপেক্ষা করছিলাম।

এবার আমার কাহিনীর ক্লাইমেকসে আসছি।

সেদিন রাত্রিটা বেশ শান্তভাবে কাটিয়ে পরের দিন মেজাজ শরীফ নিযে উঠে পড়লাম আমি। তারপর পোশাক ছাড়লাম; সকালে চিলে-ছাদে গিয়ে প্রতিদিন আমি সিগারেট খেতাম। এখানের সিঁড়িটা ঘোরানো। এরই পাশে একতলার মুখে একটা জানালা। মরক্কো চটি পরে নিঃশব্দে আমি ওপরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম জানালার ওপরে আধখানা ঝুঁকে সিজারীঁ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিজারীঁর সমস্ত চেহারাটা আমি দেখতে পাই নি; তার পেছনের অংশটাই আমার দিকে ছিল। সেই অংশটাই আমার পছন্দ! যেমন আমার ভাল লাগে মাদামের শরীরের ওপরের অংশ-টুকু। যে অংশটি আমার সামনে ছিল সেটি আমার কাছে বড়ই মনোরম বলে মনে হচ্ছিল। ছোট একটা সাদা পেটিকোট পরনে ছিল তার—ছোট —আবরণের দিক থেকে সেটি আদৌ পরিমিত ছিল না।

ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম আমি—নিঃশব্দে। মেয়েটা জানতেও পারল না যে আমি উঠছি। হাঁটু মুড়ে বসলাম আমি; তারপরে অসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে পেটিকোটের দুটি কোণ ধরে ওপরে তুললাম। তুলেই বুঝতে পারলাম সেটি আমার মিসট্রেস সিজারীঁর হৃষ্টপুষ্ট মসৃণ দাবনা। তার ওপরে গালটা আমার চেপে ধরলাম।—প্রেমিকের একটি চুম্বন এঁকে দিলাম সেখানে। কোন্ কাজ করতে প্রেমিকারা ভয় পায়?

অবাক হয়ে গেলাম। গন্ধটা ল্যাভেনডারের নয়, ভারবেনার। কিন্তু তখন আর গবেষণা করার সুযোগ ছিল না আমার। বেশ জোরাল একটা ঘুষি এসে পড়ল আমার মুখে; কেউ যেন জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল

আমাকে। আমার নাকটা আর একটু হলে ভেঙে যেত আর কি! একটা চীৎকার কানে এল আমার। শব্দ শুনেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। মহিলাটি ঘুরে দাঁড়ালেন। ইনি মাদাম দি জ্যাডেল।

মূর্ছাতুর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে মানুষ যেমন হাওয়ার বুকে ঘুষি ছোঁড়ে তিনিও সেই রকম হাওয়াতে ঘুষি ছুঁড়তে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন তিনি; তারপরে হাত তুললেন—মনে হল, আমাকে মারবেন। তারপরে পালিয়ে গেলেন।

মিনিট দশেক পরে হতভম্ব সিজারী আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। তাতে লেখা ছিল—মাদাম দি জ্যাডেল আশা করেন, মঁসিয়ে দি ব্রাইভস যেন এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করে চলে যান।

আমি চলে গেলাম।

অনেক চেষ্টা করেছিলাম তাঁকে খুশি করার জন্য; কিন্তু পারি নি।

আপনারা কি জানেন সেই থেকে আমার নাকের কাছে ভারবেনার একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে ওঠে। সেই গন্ধ ভূরিভোজন করার জন্য আমার মনে একটা অদ্ভুত মাদকতা জাগে।

মোচি

[Mouche]

একটি মাঝির স্মৃতিচারণ

সে বলল—আমি যখন নদীর বুকে ঘুরে বেড়াতাম সেই পুরনো দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল আমার। তখন কত অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিসই না চোখে পড়েছে আমার—সেই সঙ্গে অদ্ভুত মেয়েছেলে। কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে যেরকম হইচই হট্টগোল আর স্ফূর্তি করে সীন নদীর ওপরে কপর্দক-হীন অবস্থায় দিনগুলি আমার কেটেছে মাঝে-মাঝে মনে হয় তাই নিয়ে একখানা ছোট বই লিখি। সেই বইটার নাম হবে "সীন নদীর ওপরে"।

আমি তখন কপর্দকহীন কেরাণী। এখন আমি সাফল্য অর্জন করেছি। আজ আমি মুহূর্তের খেয়াল মেটাতে প্রচুর অর্থ খরচ করতে পারি। আমার মনের মধ্যে অজস্র ছোট-খাট বাসনা ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার কল্পনাকে রাঙিয়ে দিয়েছে। তাদের অনেকগুলিকেই চরিতার্থ করার কোন উপায় নেই। আজ তো আরাম কেদারায় বসে-বসে বেশ মাথা নাড়ছিলাম। হঠাৎ কেন দাঁড়িয়ে উঠলাম বুঝতে পারছিনে। দশটি বছর ধরে সীন নদীই

ছিল আমার প্রধান আকর্ষণ। হায়রে, সেই সুন্দর, শান্ত, পরিবর্তনশীল, আর অপরিচ্ছন্ন সীন নদীর জল আমার মনে কত মরীচিকাই না সৃষ্টি করেছিল, নোংরা করে তুলেছিল আমার কল্পনা। সীন নদীর দৌলতেই জীবনের আস্বাদ আমি পেয়েছিলাম; সেই জন্তেই নদীটা আমার কাছে এত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল; অন্তত: তাই আমার ধারণা। এর দুটি তীরই ফুলে বোঝাই হয়ে থাকত—কত রঙিন-রঙিন ফুল তার ইয়ত্তা নেই, শালুক গাছের পাতার ওপরে আমার বন্ধু ব্যাঙেরা বসে-বসে স্বপ্ন দেখত; আর নীল আগুনে শিখার মত কিঙ-ফিসার পাখীরা আমার সামনে দিয়ে সোঁ-সোঁ করে উড়ে বেড়াত! কী ভালই না লাগত আমার।

মানুষ যেমন সুন্দর রাতের স্বপ্ন দেখে, আমি সেই স্বপ্ন দেখতাম ভিজে সকালে যে সূর্য ওঠে তাকে; প্রভাতের আগে মৃতের মত সাদা যে ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা থাকে তাকে। তারপরে প্রভাতের রঙিন আলো যখন মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে তখন স্বপ্ন দেখতাম প্রবহমান জলের ঢেউ-এ কাঁপা-কাঁপা ভাঙা-ভাঙা চাঁদের আলোকে। মানুষের শাশ্বত স্বপ্ন আমার কাছে স্বপ্নিল হয়ে উঠেছিল কর্দমের আবর্তে—প্যারিসের আবর্জনা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যে জল হুঁ হুঁ করে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল সেই জল থেকে।

আর বন্ধুদের সঙ্গে কী আনন্দ করেই না জীবন কাটত আমার। দলে আমরা ছিলাম পাঁচজন; ছোট দল ছিল আমাদের। আজ তারা সবাই বেশ সফল মানুষ খুব সিরিয়াস প্রকৃতির। সে যুগে আমাদের পয়সা ছিল না। তাই আর্জেন্টিউলে আমরা ছোট একটা ঘর নিয়েছিলাম। সেই ঘরটাই ছিল আমাদের আড্ডা দেওয়ার জায়গা। সেইখানে কত উদ্দাম সন্ধ্যাই না আমি কাটিয়েছি। স্ফূর্তি করা আর নদীতে নৌকো বাওয়া ছাড়া তৃতীয় কোন কাজ আমাদের তখন ছিল না। নৌকো বাওয়াটাকে তখন আমরা ধর্ম বলে মনে করতাম। সেই অনবদ্য দুঃসাহসিক অভিযানের কথা আজও আমার মনে পড়ে যায়। আমরা পাঁচজন বেকার বন্ধু মিলে যে ধরনের রসিকতায় মসগুল হয়ে থাকতাম সে সব কথা বললে আজ আর কেউ বিশ্বাস করবে না। আজকাল আর সে রকম আনন্দ নেই—এমন কী সীন নদীও তা হারিয়ে ফেলেছে। আসল কথাটা হচ্ছে আধুনিক জগৎ থেকে সেই রকম আনন্দ করার মনটাই গিয়েছে হারিয়ে।

পাঁচ বন্ধুতে মিলে অনেক কষ্টে আমরা একটা নৌকো কিনেছিলাম। তাই নিয়ে সে যুগে আমরা অনেক হাসাহাসি করেছি—ভবিষ্যতে আর করব না। বিরাট নৌকো; ভারি, কিন্তু সরেস, বেশ চওড়া, আর আরামপ্রদ। বন্ধুদের বিশেষ বর্ণনা আপনাদের কাছে আর আমি করব না। একজন ছিল বেঁটে-খাটো চেহারার—ভারি বদমাইশ—তার ডাকনাম হচ্ছে পেতিত ব্লিউ। দ্বিতীয়টির চেহারা বেশ লম্বা চওড়া, ধূসর চোখ—কালো চুল—দেখতে

অসভ্যের মত। তার ডাকনাম তোমাহক। আর একজন ছিল ভীষণ কুঁড়ে—কিন্তু মগজটা তার বেশ উর্বর ছিল। তাকে আমরা লা-তোকি বলে ডাকতাম। ওই ছোকরাটাই কেবল দাঁড় ছুঁতো না। বলত—আমি দাঁড়ে হাত দিলেই তোমাদের নৌকো ডুবে যাবে। আর একজন ছিল—রোগাটে, বেশ সুন্দর চালচলন ছিল তার। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম না-কুঁ-ইল। ওই নামে সম্প্রতি ক্লডেলের একটি উপন্যাস বেরিয়েছে। সে একচোখে চশমা পরত। আর আমার নাম ছিল যোশেফ প্রুনিয়ার। মনের দিক থেকে আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না, আমাদের একটি মাত্র দুঃখ ছিল। সেটা হচ্ছে হাল-রমণী। নৌকো বাইতে গেলে সঙ্গে মেয়েছেলে না থাকলে চলে না। চলে না এই জন্যে যে মাঝিদের একঘেয়ে জীবনটা হাসি-ঠাট্টা আর আনন্দ দিয়ে সে-ই মশগুল করে রাখে। কিন্তু এ মেয়ে যেমন-তেমন হলে চলবে না; কারণ আমরা পাঁচ বন্ধু পৃথিবীর আর পাঁচটা মানুষের মত ছিলাম না। আমরা এমন একটি মেয়ে চেয়েছিলাম—সত্যি কথা বলতে কি যাকে খুঁজে পাওয়া বড়ই দুষ্কর। কয়েকজনকে সুযোগ দেওয়া হল; কিন্তু তারা টিকলো না। এরা ছিল সব দাঁড়ী মেয়ে—দাঁড়ী-রমণী নয়। সাধারণ দাঁড়ীমাঝির নৌকোতে যেসব মেয়েরা ঘুরে বেড়ায় তারা ছিল সেই জাতীয়—বোকা-বোকা, নদীর জলের মত পাতলা মদ খেতেই তারা ভালবাসত। একদিনের মত তাদের নৌকোতে রেখে পরের দিনই বিরক্ত হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিতাম আমরা।

সেদিনটা ছিল এক শনিবারের সন্ধ্যা। না-কুঁ একটা ছোটখাটো রোগাটে মেয়ে নিয়ে হাজির হল। বেশ প্রাণবন্ত মেয়েটা, চটপটে; জিবের ওপরে কোন সংযম তার ছিল না। হাসি-ঠাট্টা-মস্করা করতে একেবারে অদ্বিতীয়া। প্যারিসের উপান্তে যে সব বস্তীবাসী মেয়েপুরুষ বাস করে তাদের কাছে এই ধরনের ঠাট্টা উঁচু ধরনের রসিকতা বলে পরিচিত। সুন্দরী নয়; তবে চেহারাটা মিষ্টি; ডিনার শেষ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে নীচু-মানের চিত্রকরেরা তিনটি আঁচড়েই পেন্সিল দিয়ে এই ধরনের নারীর ছায়া-চিত্র আঁকতে পারে; সাধারণতঃ আঁকেও। প্রকৃতিও মাঝে-মাঝে এই ধরনের নারী সৃষ্টি করে থাকে।

প্রথম রাত্রিতেই তার হাসি আর ঠাট্টায় সে আমাদের একেবারে অবাক করে দিল। তাকে নিয়ে আমরা কী করব ভেবে পেলাম না। আমরা সব পুরুষ মানুষ। কোনরকম ইয়ার্কি ফাজলামি করতেই আমাদের দ্বিধা হোত না। সেই দলের মধ্যে পড়ে সে খুব তাড়াতাড়ি অবস্থাটা তার আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে এসে একেবারে সর্বময়ী গিন্নী বনে গেল। পরের দিন সকালে সে আমাদের জয় করে ফেলল।

তাছাড়া, মেয়েটা প্রকৃতির দিক থেকে অদ্ভুত—পাগলাটে বলা যেতে পারে। পেটে মদের বোতল নিয়েই সে যেন জন্মেছে। মাতাল অবস্থায় তার

মাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হোত। জীবনে কোনদিনই সে স্থিরপ্রকৃতির হতে পারে নি; কারণ 'রাম'-এর ফোঁটা দিয়েই তৈরী হয়েছিল তার ধমনীর রক্ত।

আমাদের মধ্যে কে তার নাম মোচি দিয়েছিল তা আজ আর আমার মনে নেই, বা কেনই বা তার ওই নামটা রাখা হয়েছিল তাও আমি ভুলে গিয়েছি, কিন্তু নামটা তার বেশ মানানসই হয়েছিল।

সত্যি কথা বলতে কি তাকে আমরা পূজো করতাম। এই পূজো করার পেছনে কারণ ছিল অনেক; পরে অবশ্য একটা কারণেই এসে দাঁড়িয়েছিল। নৌকোর ওপরে বসে সে অনর্গল কথা বলে যেত; সেই শব্দ বাতাসে উড়ে জলের ওপরে হড়কে পড়ত। সে বকছে তো বকছেই; ক্রমাগত বকবক করে যাচ্ছে। তার সেই বকবকানি শুনে মনে হোত বাতাসে কোন যান্ত্রিক পাখার ভনভনানি ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ সে হয়ত চীৎকার ক'রে উঠত; এমন সব অপ্রত্যাশিত আর হাস্যকর কাজ করত যা দেখে আমরা গড়িয়ে পড়তাম।

তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উত্তর পাওয়ার জন্যে মাঝে-মাঝে আমরা তাকে নানারকম প্রশ্ন করতাম—খুঁচিয়ে দিতাম তাকে। সেগুলির মধ্যে আমাদের একটি প্রশ্নই তাকে খুব বিব্রত করত।

তোমাকে সবাই 'মোচি' বলে ডাকে কেন?

প্রশ্নটির এমন উত্তর সে দিত যে দাঁড় ফেলা বন্ধ ক'রে আমরা হাসতাম।

মেয়েছেলে হিসাবে-ও তাকে আমাদের খুব ভাল লাগত। আমাদের মধ্যে লা-তোকে কোনদিনই দাঁড় ধরত না। সারাদিন তার পাশে বসে থাকত সে। একদিন সে বলল—তোমার নাম মোচি কেন হল বলব? তুমি বিষাক্ত মাছি বলে।

তাই বটে। ভনভনে ক্যানথারিস মাছির মতই—সব সময় জ্বরের বীজাণু নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তবে সেই প্রাচীন যুগের ক্যানথারিস-এর মত বিষাক্ত নয় এই যা। এর হুলের দাপটে আমাদের নৌকোর মাঝি-মাল্লারা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

মোচি আমাদের নৌকোতে আসার পর থেকেই না-কুঁ বেশ ভারিক্কী হয়ে গেল; সব বিষয়েই আমাদের ওপরে সে টেক্কা দিতে লাগল—মনে হল পাঁচজনের মধ্যে মোচি একমাত্র তারই। আমাদের সামনেই মাঝে-মাঝে মোচিকে জড়িয়ে ধরে সে তার সুযোগের অপব্যবহার করত। আমরাও বেশ চটে যেতাম—এ ছাড়াও খাবার শেষে মাঝে-মাঝে সে তাকে কোলে নিয়ে বসত; এমন সব হাবভাব দেখাত যা দেখে আমরা যে কেবল বিরক্তই হতাম তা নয়—কাজগুলিও রীতিমত লজ্জাকর বলে মনে হোত। সেই জন্যে ওই নৌকোর ভেতরে তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করে পর্দা-ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু অতি শীঘ্রই আমাদের অভিবাহিত জীবনে মস্তিষ্কে একটা প্রশ্নই বারবার ঘ্যানঘ্যান ক'রে ঘুরতে লাগলো—কোন বিষয়েই মোচির কোন-রকম সংস্কার নেই। তাহলে, কোন্ নীতি অথবা দুর্নীতির বলে সে একমাত্র তার প্রেমিককে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে —বিশেষ ক'রে যখন উন্নত স্তর অথবা সমাজের মহিলারা স্বামীর কাছে দাসখৎ লিখে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে স্বীকার করে না।

আমাদের চিন্তার পেছনে যে যুক্তি রয়েছে তা আমরা শীঘ্রই বুঝতে পারলাম। এ-চিন্তাটা আমাদের মাথায় আগে আসে নি কেন? যাই হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি ব'লে আমরা আর সময় নষ্ট করলাম না। মোচি না-কুঁকে প্রতারিত ক'রে আমাদের বাকি ক'জনকেও সে টেনে নিল। এর জন্যে কোন আপত্তি জানায় নি সে, কোনরকম বাধা দেয় নি। প্রত্যেকে প্রস্তাব দেওয়া মাত্র সে রাজি হয়ে গেল।

আমার বিশ্বাস নীতিবাগীশরা মোচির এই ব্যবহারে ভীষণ আহত হবেন। কিন্তু কেন? কোন রুচিবাগীশ বারবণিতার এক ডজনের কম প্রণয়ী রয়েছে? আর তাদের মধ্যে এত বোকা মানুষ কে রয়েছে যে এটা জানে না? থিয়েটার বা অপেরায় যাওয়ার মত কোন বিখ্যাত, আর আকাঙ্খিত রূপজীবির ঘরে একটি সন্ধ্যা কাটানোটা কি একটা প্রচলিত রীতি নয়? দশজন ভাগ করে একটা বেশ্যা পুষে—যেমনভাবে একটা রেসের ঘোড়া রাখার জন্যে দশটা লোক ক্লাব তৈরী করে, যদিও সেই ঘোড়ার পিঠে একমাত্র জকী ছাড়া আর আর কেউ চড়ে না।

রুচির দিক থেকে বিচার করে শনিবারের সন্ধ্যা থেকে রবিবারের সকাল পর্যন্ত মোচিকে আমরা না-কুঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। নদীতে যে ক'টা দিন আমরা থাকতাম সে ক'টা দিন মোচি তারই ছিল। সীন নদী থেকে দূরে প্যারিসে যখন আমরা কাটাতাম সপ্তাহের সেই অন্য দিনগুলি আমরা তাকে ভাগ করে নিয়েছিলাম। এটা মোটেই বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায় না।

ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ অদ্ভুত এই জন্যে যে আমরা এই চারটি দস্যু যারা মোচির অনুকম্পা ভাগ করে নিয়েছিল—আমরা সবাই এ বিষয়ে অবহিত ছিলাম; মাঝে-মাঝে এই নিয়ে আমরা ঠারেঠুরে আলাপ আলোচনাও করতাম। তাই নিয়ে মোচিও বেশ আনন্দ পেত। কেবল না-কুঁ এ সম্বন্ধে কিছু জানত বলে মনে হয় না। ফলে, তার সঙ্গে আমরাও বেশ প্রাণ খুলে কথা বলতে পারতাম না। মনে হোত, আমাদের এতদিনকার বন্ধুত্বের দেওয়ালে চিড় ধরেছে। তাকে দেখে আমরা ভাবতাম—আহা বেচারা! প্রবঞ্চিত প্রেমিক আর প্রবঞ্চিত স্বামী একই পর্যায়ের। কিন্তু বড় চতুর ছিল এই না-কুঁই। সত্যিই কি সে কোন সন্দেহ করে নি? সে আমাদের নতুন সংবাদ পরিবেশন করার

চেষ্টা করত; এমনভাবে করত যে ব্যাপারটা বেশ কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়াত। সেদিন বোগিভাল-এ ডিনার খেতে যাওয়ার জন্তে জোরে-জোরে দাঁড় ফেলেছিলাম। এমন সময় মোচির একেবারে গা ঘেঁষে বসল লা-ভোকে। সেদিন সকাল থেকেই তাকে বেশ তৃপ্ত আর স্ফূর্তিবাজ দেখাচ্ছিল। সে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল—স্টপ।

চার জোড়া দাঁড় সেই শব্দে একসঙ্গে জলের ওপরে উঠে স্থির হয়ে রইল।

তোমাকে সবাই মোচি বলে ডাকে কেন?

মোচি কোন উত্তর দেওয়ার আগেই না-কূঁ বলল—তার কারণ সে সব মাংসভোজীদের সঙ্গে একটা রক্ষা করতে পারে।

কথাটা শুনে প্রথমেই আমাদের ওপরে একটা গভীর স্তব্ধতা নেমে এল। হাসতে গিয়ে মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ল একটা বিভ্রান্তি। মোচি নিজেও কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।

লা-ভোকে নির্দেশ দিল—চালাও পানসী!

তীর বেগে ছুটতে লাগল নৌকো।

ঘটনার সমাপ্তি এইখানেই। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেল।

এই ছোট ঘটনাটি আমাদের চরিত্রের বা চালচলনের মধ্যে কোনরকম ব্যতিক্রম আনে নি। এটা শুধু না-কূঁ আর আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনায় সাহায্য করেছিল। শনিবারের সন্ধ্যা থেকে রবিবারের সকাল পর্যন্ত মোচির ওপরে একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার করতে লাগল সে; আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরে গেল। আমরা তার অনুগামী বন্ধু হয়েই খুশি হলাম; আর সন্তুষ্ট রইলাম সপ্তাহের বাকি ক'টা দিন মোচিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে। এ-ব্যাপারে আর আমাদের মধ্যে কোনরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা রইল না।

মাস তিনেক এইভাবে ভালই কাটলো। তারপরে হঠৎ একদিন লক্ষ্য করলাম মোচি কেমন একরকম হয়ে গিয়েছে যেন। আর তার সে আনন্দ নেই, কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে; মেজাজটা হয়ে উঠেছে তিরিক্ষী—একটা অস্থিরতা জেগেছে তার দেহে। আমরা ক্রমাগত তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম—কী হয়েছে তোমার?

সে বলল—কিছু না। আমাকে একলা থাকতে দাও।

শনিবারের এক সন্ধ্যায় না-কূঁ সত্যি ঘটনাটা আমাদের কাছে প্রকাশ করে দিল। আমরা সবাই ডাইনিঙ রুমে টেবিলের ধারে খেতে বসেছি। স্যুপ খাওয়া শেষ করে মাছ ভাজার জন্তে অপেক্ষা করছি এমন সময় আমাদের বন্ধু না-কূ বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মোচির একটা হাত ধরল, তারপরে বলল: প্রিয় বন্ধুগণ, তোমাদের কাছে একটি জরুরী বার্তা ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছি। এ নিয়ে হয়ত দীর্ঘ আলোচনা হবে। বন্ধুগণ, খেতে-খেতে সে বিষয়ে আলোচনা

আমরা নিশ্চয় করব। বেচারা মোচি আমাকে একটা বিপজ্জনক সংবাদ দিয়েছে, সেই সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছে সেই সংবাদটা তোমাদেরও জানিয়ে দিতে।

সংবাদটা হচ্ছে—'মোচি অন্তঃসত্ত্বা।'

এর সঙ্গে আমি কেবল দুটি কথা যোগ করব—এখন ওকে পরিত্যাগ করা যাবে না, আর ওই সন্তানের বাবা কে সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা চলবে না।

সংবাদটা শুনে প্রথমেই আমরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। অপরাধীকে সনাক্ত করার জন্যে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু কে অপরাধী? কার ওপরে অপরাধের বোঝা চাপানো হবে? প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। গর্ভস্থ সন্তানের পিতা কে সে কথা প্রকৃতি আমাদের ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় না।

আমাদের মধ্যে তোমাহক চিরকালই কম কথা বলে; সে শান্তভাবে বলল—মিলনই হল শক্তি। দশে মিলি করি কাজ……

বাসন মাজার চাকর ততক্ষণে মাছ ভাজা নিয়ে হাজির হল। কিন্তু তখনও মনের দিক থেকে আমরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারি নি। তাই চিরাচরিত অভ্যাস মত তখনই আমরা সেই ভাজা মাছের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম না।

না-কুঁ বলে গেল—এই অবস্থায় অনেক সঙ্কোচের সঙ্গে ও আমাকে সব কথা বলেছে। বন্ধুগণ, এদিক থেকে আমরা সকলেই অপরাধী। আমার কথায় রাজি হও তোমরা। এস, এই সন্তানটিকে আমরা সবাই মিলে গ্রহণ করি।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। সেই ভাজা মাছের ডিশের দিকে হাত বাড়িয়ে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করলাম যে সন্তানটিকে আমরা সবাই একসঙ্গে গ্রহণ করব।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কাঁদতে লাগল মোচি; বলল—বন্ধুরা, তোমাদের এত দয়া! ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!

আমাদের চোখের ওপরে সেই প্রথম তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

তারপরে নৌকোয় বসে-বসে শিশুটার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতাম। আলোচনার ধরণ দেখে মনে হোত শিশুটা বোধ হয় সত্যিই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। মোচির শারীরিক বিকৃতি যতই ঘটতে লাগল ততই আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। মাঝে-মাঝে আমাদের উদ্বেগটা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগল।

দাঁড় ফেলা বন্ধ করে আমরা জিজ্ঞাসা করতাম—মোচি, তোমার কী হবে? ছেলে, না, মেয়ে?

ছেলে।

সে কী হবে বলত?

এইবার সে তার কল্পনাকে ডানা মেলে অবিশ্বাস্যভাবে আকাশে উড়িয়ে দিত। জন্ম থেকে শেষ বিজয় পর্যন্ত শিশুটি কী করবে সে-সম্বন্ধে সে অসংখ্য কথা বলে গেল আমাদের। এই অদ্ভুত, অশিক্ষিত মেয়েটির সব কল্পনা রাঙিয়ে উঠেছিল অজাত শিশুটির মধ্যে। সে আমাদের বলত "পাঁচটি বাবা"। একবার সে বলল ছেলেটি নাবিক হয়ে অ্যামেরিকার চেয়ে অনেক বড় মহাদেশ আবিষ্কার করবে। একবার বলল সে সেনাপতি হয়ে ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধ করে অ্যালসেকলোরেন উদ্ধার করে আনবে। তারপরে বলল শিশুটা সম্রাট হয়ে বিজ্ঞ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করবে—যিনি তাঁর দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। বৈজ্ঞানিক হতে পারে সে। বৈজ্ঞানিক হয়ে প্রথমেই সে সোনা তৈরী করার গোপন তথ্যটি আবিষ্কার করবে, তারপর অনন্ত জীবনের পথটা আবিষ্কার করবে। শেষকালে বলল—সে হবে মহাকাশচারী—অনন্ত আকাশকে সে জনসাধারণের খেলার মাঠে পরিণত করবে। কী অদ্ভুত, চমৎকার স্বপ্ন!

হায়রে, বেচারা কী আনন্দেই না মসগুল হয়ে রইল—কিন্তু গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত।

বিশে সেপ্টেম্বরই তার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। কিছুদিন ধরেই সে বেশ ভারি হয়ে উঠছিল। সাধারণভাবে আগের মত সহজভাবে চলাফেরা করতে পারত না বলে নিজের ওপরে সে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলো, নৌকো তীরে ভিড়লে নৌকো থেকেই সে তীরে লাফ দিয়ে নামত। এখন তাকে আমরা হাত ধরে নামাই। কিন্তু আমাদের চীৎকার সত্বেও সে প্রায় কুড়িবার তীরে নামার চেষ্টা করেছিল; পারে নি। নামলে সে আছাড় খেত।

সেই বিশেষে দিনেব কথা বলছি। মোচির হঠাৎ তেষ্টা পাওয়ায় সেন্ট জারমেনএর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা পেক-এ থামলাম। অসুস্থ বা পরিশ্রান্ত পালোয়ানরা বাহোবা নেওয়ার জন্যে যেমন মাঝে-মাঝে হঠকারীর মত কাজ করে ফেলে, মোচিও সেদিন সেইরকম একটা কাণ্ড করে বসল। নৌকো তীরে বাঁধার অপেক্ষা না করেই আমাদের হতচকিত ক'রে দিয়ে সে নৌকো থেকে লাফ দিয়ে তীরে নামার চেষ্টা করল। খুবই দুর্বল ছিল সে। পাথর দিয়ে গাঁথা তার তীরের ওপরে পায়ের আঙুলগুলি মাত্র ঠেকলো; পড়েই সে হড়কে গেল। পাথরের ওপরে মুখ গুঁজে পড়ল, পাথরের সূঁচোলো মুখটা তার পেটের চামড়ায় বিঁধে গেল; যন্ত্রণায় তীব্র একটা চীৎকার ক'রে সে গড়িয়ে পড়ল জলে; তারপরে অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায়।

আমরা পাঁচজনেই লাফিয়ে পড়লাম জলে; অনেক কষ্টে ওপরে তুলে আনলাম ওকে। তখন সে নীল হয়ে গিয়েছে; যন্ত্রণায় কুকড়ে-কুঁকড়ে উঠছে।

কাছাকাছি একটা সরাইখানায় তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডাকলাম।

পরের দশটি ঘণ্টা বীরত্বের সঙ্গে সে যন্ত্রণা ভোগ করল। আমরা ভয় আর অনুশোচনায় তার পাশে চুপ করে বসে রইলাম। তারপরে একটা মরা শিশু

প্রসব করল সে। আরও কয়েকটা দিন জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সে পড়ে রইল। তারপরে একদিন সকালে ডাক্তার আমাদের বললেন—'মনে হচ্ছে মেয়েটি বিপন্মুক্ত হয়েছে। মেয়েটির শরীরটা লোহার।'

খুশি হয়ে আমরা তার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

আমাদের হয়ে ন-কৃঁ তাকে বলল—মোচি, আর কোন ভয় নেই তোমার। আমরা খুব খুশি হয়েছি।

এই কথা শুনেই সে কেঁদে উঠল। চোখ দুটো তার জলে ভরে উঠল। আমাদের সামনে এই তার দ্বিতীয়বার কান্না।

তোমরা যদি জানতে আমার কত দুঃখ······কত কষ্ট······আমার আর সান্ত্বনা নেই···

কিন্তু কেন বলত ?

কারণ, আমিই তাকে মেরে ফেলেছি···আমিই মেরে ফেলেছি···কিন্তু আমি চাই নি···কী কষ্ট আমার।

কাঁদতে লাগল মোচি। কী করব, কী বলা উচিৎ বুঝতে না পেরে আমরা চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে দাঁড়ালাম।

মোচি জিজ্ঞাসা করল—তোমরা তাকে দেখেছ ?

আমরা একবাক্যে উত্তর দিলাম—দেখেছি।

ছেলে ? তাই না ?

হ্যাঁ।

বেশ সুন্দর দেখতে ?

আমরা একটু ইতস্তত করলাম। আমাদের মধ্যে পেত্তিত ব্লিউ হচ্ছে সবচেয়ে বেপরোয়া। সে বলল—ভারি সুন্দর।

কথাটা বলা তার ঠিক হয় নি ; কারণ, এই কথা শুনেই সে আবার কাঁদতে সুরু করল।

না-কৃঁ সম্ভবত তাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত। তাকে শান্ত করার চমৎ কার একটা পরিকল্পনা তার মাথায় গেল। জলে-ভেজা চোখ দুটিতে চুমু খেয়ে সে বলল—কেঁদ না, কেঁদ না, মোচি ;—আমরা তোমাকে আর একটা ছেলে দেব।

তার হাড়ে-মজ্জায় রসিকতার যে বীজ লুকিয়ে ছিল সেটা হঠাৎ বেরিয়ে এল। তার কথা যে সে একেবারে বিশ্বাস করল তা মনে হল না। কান্নার আবেগে তখনও সে ফুলে-ফুলে উঠছিল, তা সত্ত্বেও কিছুটা ঠাট্টার সুরে আমা-দের দিকে তাকিয়ে সে বলল—প্রতিজ্ঞা করছ ?

আমরা একস্বরে উত্তর দিলাম—প্রতিজ্ঞা করছি।

মুখোশ

[The mask]

এলিসি-মন্তমার্টিতে সেদিন 'ফ্যান্সি-ড্রেস বল'-এর আয়োজন হয়েছিল। উৎসবটা ছিল "মিডলেনট" এর। বাঁধ ভেঙে যেমন নদীর জল বেরিয়ে আসে চারপাশ থেকে সেই রকম মানুষের স্রোত ভেসে আসছিল এইদিকে— আলোতে ঝলমল বারান্দার ওপর দিয়ে তারা নাচঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অর্কেষ্ট্রার তুমুল ধ্বনি ঝড়ের মত উচ্চনাদে ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে—ঘরের দেওয়াল, ছাদ ফুঁড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সেই শব্দ; তারপরে রাস্তায় বেরিয়ে পাশাপাশি রাস্তা, রাস্তা ছাড়িয়ে বসতি, বসতি পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভীষণ নাদে সেই শব্দ ছড়িয়ে পড়ল—মানুষের মনের গভীরে যে পশুটা ঘুমিয়ে থাকে তাকে জাগিয়েছিল। হই-হই করতে করতে দুর্নিবার একটা আকাঙ্খার টানে ছুটে এল মানুষ—'ফ্যান্সি-ড্রস বল' এ যোগ নেওয়ার জন্যে।

যারা নিয়মিত এখানে আসা যাওয়া করে প্যারিস শহরের চারপাশ থেকে তারা এসেছে; যারা মোটা ধরনের রসিকতা, আমোদ-প্রামোদ, উচ্ছ্বাস-কলরব পছন্দ করে, যারা মাতাল, লম্পট, চরিত্রহীন—সব ঝেঁটিয়ে এসেছে। কেউ বাদ যায় নি। সর্বস্তরের মানুষ হাজির হয়ে জায়গাকে শ্রীক্ষেত্র বানিয়ে তুলেছে। দোকানের কর্মচারীরা এসেছে, ভিড় করেছে কুটনী আর বারবণিতারা; দরিদ্র বারবণিতা থেকে বেশ ধনী, গয়নাপরা বারবণিতা, কপর্দকহীন যুবক থেকে সুরু করে অর্থশালী ঘাটেরমড়া পর্যন্ত সবাই এসেছে। কেউ এসেছে মক্কেলের সন্ধানে, কেউ এসেছে টাকা খরচ করার তালে। অনেক যুবতী এসেছে যারা নিস্পাপ কুসুম নয়; তবু তারা আকাঙ্খিত; সুন্দর ঘোপদুরস্ত পোশাক পরে অনেকে এসেছে তাদের অনুসন্ধানে। আর একদিকে এই বিপুল বিভিন্নমুখী জনতাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে মুখোশধারীরা নাচছে। বিখ্যাত কোয়াড্রিল নাচিয়েরা তাদের চারপাশে অনেক লোক জড় করেছে। সেই বিরাট ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলিত জনতা চারটি মুখোশধারী নৃত্যবিদের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে; ঘূর্ণায়মান আবর্তে তারা নাচছে। জনতা সেই নৃত্যের তালে তালে একবার এগিয়ে যাচ্ছে, আবার তাদের পথ করে দেওয়ার জন্যে পিছিয়ে আসছে। এই নৃত্যবিদরা একসঙ্গে জোট পাকিয়ে নাচছে; দেখে তাদের সাপের মত মনে হচ্ছে। দুটি মেয়ে অদ্ভুত কেরামতি দেখাচ্ছে তাদের পায়ের। ভারতীয় রবার স্প্রিঙ দিয়ে দাবনার সঙ্গে পা দুটি

তাদের বাধা রয়েছে বলে মনে হল যেন। সেই পা দুটিকে এক একবার আকাশের দিকে এমনভাবে ছুঁড়ে দিচ্ছে যে মনে হবে এবারে তারা ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে; আবার সেগুলিকে গুটিয়ে নিচ্ছে তারা—প্রসারিত করছে দু'পাশে; তারপরে সামনে আর পেছনে দু'টি পা দু'দিকে যুগপৎ লম্বা করে দিচ্ছে। এইভাবে তারা এতটা দ্রুতভাবে মাটির সঙ্গে নিজেদের দেহটা মিশিয়ে দিচ্ছে যা দেখলে কেবল খারাপই লাগে না, হাসিও লাগে।

তাদের মধ্যে একজনই একা-একা নাচছে। একটি বিখ্যাত নর্তকের অনুপস্থিতি পূরণ করার জন্যে এই মানুষটি এসেছে। তার অদ্ভুত নাচের ভঙ্গিমায় ব্যঙ্গ আর আনন্দের ধ্বনি বেরিয়ে আসছে দর্শকদের কাছ থেকে। মানুষটি রোগা, পাতলা। ফুলবাবুর পোশাক তার গায়ে; রঙকরা সুন্দর একটা মুখোশ তার মুখে বসানো, বেশ সুন্দর কোঁকড়ানো তাঁর গোঁফজোড়া, মাথার ওপরে জট পাকানো পরচুলা।

গ্রেভি মিউজিয়ামে একটি সুন্দর চটকদার যুবকের মোমে গড়া যে অদ্ভুত ব্যঙ্গ প্রতিকৃতিটি রয়েছে, লোকটির চেহারা প্রায় সেইরকম। নাচের মধ্যে কোন ফাঁকি তার নেই—কিন্তু ভঙ্গিমাটি তার স্খলিত। অন্য সকলের চটকদার লম্ফঝম্পের অনুকরণ সে করছে নিশ্চয়; কিন্তু বেশী মানাচ্ছে না তাকে। মনে হল পা দুটো খোঁড়া; সে দুটির উত্থান আর পতনও তাই ছন্দবিহীন। মনে হচ্ছে একটা ছোট চ্যাপ্টা নেকো কুকুর বিরাট গ্রেহাউণ্ডদের সঙ্গে খেলা করছে। দর্শকদের ব্যঙ্গধ্বনি তাকে এমনভাবে উৎসাহিত করে তুলল যে সে আরও জোরে নাচতে সুরু করল। এই রকম উত্তেজনায় তার মাথা গেল টলে —দর্শকদের গায়ের ওপরে সে ঢলে পড়ল। তাকে পথ করে দেওয়ার জন্যে দর্শকরা সব সরে গেল। তারা সরে যেতেই লোকটি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। তার সেই আপাত নির্জীব দেহটির চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল দর্শকরা।

সবাই তাকে তুলে বাইরে নিয়ে গেল। "ডাক্তার," "ডাক্তার" বলে চীৎকার শোনা গেল চারপাশে। সেই শব্দ শুনে একটি পরিচ্ছন্ন চেহারার যুবক সামনে এগিয়ে এলেন। গায়ে তাঁর একটি কালো কোট—শার্টের ওপরে অজস্র মুক্তো বসানো। বেশ নম্রভাবেই তিনি বললেন—মেডিকেল স্কুলের আমি একজন প্রফেসর। তাঁরা তাঁকে রাস্তা ছেড়ে দিল। ডাক্তার একটা ঘরে ঢুকে গেলেন। দেখে মনে হচ্ছিল ঘরটি একটি দোকান—কাগজের বাক্সে বোঝাই। সেই ঘরের একটি চেয়ারের ওপরে তিনি একটি অচৈতন্য দেহ দেখতে পেলেন। দেহটি চেয়ারের ওপরে শোওয়ানো রয়েছে। ডাক্তার প্রথমেই মুখোশটা খোলার চেষ্টা করলেন; দেখলেন, সে বড় জটিল ব্যাপার। অসংখ্য সরু-সরু তার দিয়ে পরচুলার সঙ্গে জড়ানো; শুধু চরচুলা নয়; মাথার চারপাশে ঝুরির মত তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে। সহজভাবে

সেগুলিকে ছাড়ানো বিষম কষ্টকর। ঘাড়ের ওপরে একটা চামড়ার খোলস বেশ শক্ত করে জড়ানো। রঙ ক'রে সেই খোলসটাকে মানুষের গায়ের চামড়ার মত করা হয়েছে।

একটা শক্ত বড় কাঁচি দিয়ে সব কাটতে হল তাঁকে। সব কেটেকুটে মুখোশটাকে টেনে বার করে আনতেই আসল মানুষটিকে দেখা গেল। মুখটি বৃদ্ধের, বিবর্ণ, ক্ষতবিক্ষত, পাতলা মাংসহীন বৃদ্ধের মুখ; বলিরেখায় আকীর্ণ। যারা সেই সুন্দর মুখোশপরা যুবক নর্তককে তুলে নিয়ে এসেছিল এই দেখে তারা এতই মর্মাহত হল যে একটুও হাসল না তারা; মুখ থেকে একটি কথাও বেরোল না তাদের।

তারা অবাক হয়ে সেই চেয়ারের ওপরে ঢলে পড়া মূর্তিটির বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটি তার বোজানো; দেহের এখানে-ওখানে সাদা চুলগুলি ছড়ানো; তাদের মধ্যে কতকগুলি বড়-বড়—কপালের ওপর থেকে মুখের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে; কয়েকটি ছোট-ছোট গাল আর থুতনির ওপরে ফুটে বেরিয়েছে: সেই কদাকার মুখটির পাশে সেই সুন্দর, চকচকে, তাজা পালিশ করা মুখোশটা তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হাসছে।

অনেকক্ষণ পরে লোকটির জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু তখনও তাকে বেশ দুর্বল আর অসুস্থ বলে মনে হল। ডাক্তারের ভয় হল হয়ত কোন জটিল রোগে সে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

আপনি কোথায় থাকেন?—জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

মনে হল, বৃদ্ধ নর্তকটি তাঁর স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে; তারপর মনে পড়ল তার। সে একটা রাস্তার নাম বলল। সে-রকম নাম কেউ জানে বলে মনে হল না। যে অঞ্চলে সে থাকে সেই অঞ্চলের অনেক খবরাখবর তার নিল। অনেক কষ্টে সে সব খবর সে দিল বটে; কিন্তু যেভাবে দিল তাতে মনে হল তার মনটা তখনও স্থির হ'তে পারে নি।

ডাক্তার বললেন—চলুন; আমিই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

লোকটির সম্বন্ধে তাঁর একটা কৌতূহল জেগে উঠেছিল।

একটা বেশ উঁচু বাড়ির সামনে গিয়ে তাঁরা দাঁড়ালেন। চেহারা দেখে মনে হল বড়ই দরিদ্র সেই বাড়ি। বাড়িটা তখনও পুরোপুরি তৈরী হয় নি। দুটি এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটি। অজস্র জানালায় বাড়িটা একেবারে গিজগিজ করছে। দেখলেই বেশ বোঝা যায় এ বাড়িতে যারা বাস করে তারা হচ্ছে দরিদ্র—সমাজের একেবারে তলানি যারা তারা।

কোনরকমে টানতে-টানতে রেলিঙ ধরে-ধরে ডাক্তার বৃদ্ধটিকে চারতলায় নিয়ে গেলেন। এর ভেতরে বৃদ্ধটি তার শক্তি ফিরে পেয়েছে। ধাক্কা দিতেই একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। সামনে এসে দাঁড়ালেন একটি মহিলা। তাঁরও বয়স যথেষ্ট হয়েছে; কিন্তু পরিচ্ছন্ন; অস্থিময় মুখ; মাথায় সাদা

হাইট ক্যাপ—বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। একটি পরিশ্রমী, বিশ্বাসী খেটে-খাওয়া রমণীর মতই তাঁর চেহারা—পরিশ্রমে পোড়-খাওয়া, উদার, সৎ মুখের আদলটি তাঁর। তাঁদের দেখেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন—কী ব্যাপার? কী হল ওর?

সব শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন; এটা যে তার প্রথম দুর্ঘটনা নয় এই বলে ডাক্তারকেও নিশ্চিন্ত করলেন তিনি। তারপরে বললেন—ওকে এবারে বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে স্যার। এছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। ও ঘুমোবে। কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তার বললেন—কিন্তু উনি যে কথা বলতে পারছেন না।

ও কিছু নয়। মদটা একটু বেশী খেয়েছে, এই যা। শরীরটা নরম রাখার জন্যে ও ডিনার খায় নি; তার ওপরে খেয়েছে দু'বোতল "আবসিনথ"। ওটা না খেলে ও দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন ও জিনিসটা মানুষের বুদ্ধিনাশ করে। যেভাবে ও এখন নাচে সেরকম নাচার মত বয়স ওর আর নেই। না। ওর যে কোনদিন বুদ্ধি হবে সে-আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

অবাক হয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে উনি নাচেন কেন?

কাঁধে ঝাগ করলেন তিনি; মুখ তাঁর লাল হয়ে উঠল; ভেতরে-ভেতরে রাগের আগুন তখন তাঁর জ্বলতে সুরু করেছে।

কেন? কেন আবার? মুখোশের বাইরে থেকে সবাই ওকে যুবক বলে ভাববে; রসিক কুকুর ভেবে মেয়েরা ওর কানে ফিস-ফিস করে যতসব নোংরা কথা বলবে; সেই শুনে ও তাদের দেহে, সেই নোংরা দেহে, গা ঘষবে; তাদের চামড়ায় লাগানো সেণ্ট আর পাউডারের গন্ধ শুঁকবে। ওঃ, কি বিশ্রী, কী বিশ্রী!! কী জীবন আমার!! এই করে চল্লিশটা বছর আমাকে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু যাতে ওর কোন ক্ষতি না হয় সেই জন্যে প্রথমেই ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া দরকার আপনি দয়া করে একটু হাত লাগাবেন? এই রকম অবস্থায় আমি একা ওকে তুলতে পারিনে!

মাতালের মত তাকিয়ে বৃদ্ধটি বিছানার ওপরে বসেছিল। লম্বা-লম্বা চুলগুলি তার মুখের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তার সঙ্গিনীর কেমন যেন মায়া হল; কিন্তু তারপরেই তিনি রেগে বললেন—দেখুন, এই বয়সেও ওর মুখটা কী সুন্দর। অথচ, ও বেরিয়ে গিয়ে নিজেকে বাদমাসের মত লুকিয়ে রাখে কেন? রাখে, এই জন্যে যে লোকে ওকে যুবক বলে মনে করবে। কী দুঃখের কথা! ওর মুখটা সত্যিই বড় সুন্দর, স্যার। একটু দাঁড়ান, শুইয়ে দেওয়ার আগে আমি আপনাকে তা দেখাব।

একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি; সেখানে হাত ধোবার একটা বেসিন ছিল। সেই বেসিনের ওপর থেকে একটা ব্রাশ নিয়ে বিছানার কাছে ফিরে এলেন। তারপরে সেই ব্রাশ দিয়ে বৃদ্ধ লোকটির মাথার ওপরে যে জড়ানো চুলগুলি ছিল সেইগুলি সযত্নে এদিক-ওদিক ক'রে দিলেন। সেই বিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুলগুলি দেখে মনে হবে চিত্রকররা এই রকম একটি মুখকেই মডেল হিসাবে ব্যবহার করে। সামনের দিকে দু'একপা এগিয়ে এসে তিনি একদৃষ্টিতে শায়িত স্বামীর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন—এই বয়সেও চেহারাটা যথেষ্ট সুন্দর রয়েছে, তাই না?

ডাক্তার বললেন—সত্যিই বড় সুন্দর।

মহিলাটি বললেন—ওর পঁচিশ বছর বয়সের চেহারাটা যদি আপনি দেখতেন। কিন্তু এখন ওকে শুইয়ে দিতে হবে; তা না হলে, অ্যাবসিনথ ওর পাকস্থলীটাকে আবার গোলমাল করে দেবে। এখন, ওর জামার হাতা দুটো একটু তুলে ধরুন তো। আরও একটু ওপরে···হ্যাঁ, হ্যাঁ···ব্যাস···এবারে ওর ব্রিচেশ দুটো···আমি ওর জুতো খুলে দিচ্ছি···এখন আপনি একটু তুলে ধরুন, আমি বিছানাটা গুছিয়ে দিই। ঠিক আছে···এবার ওকে আপনি শুইয়ে দিন। আমার শোয়ার জন্যে ও যে বিন্দুমাত্র বিব্রত হবে তা ভাববেন না। শোওয়ার জন্যে বিছানার কোণে একটু জায়গা খুঁজে নেব আমি। সে-জন্যে ও মোটেই ব্যস্ত নয়। এবার, বুড়োমস্তান, এবার তুমি ঘুমিয়ে পড়।

বিছানার মধ্যে শুয়েছে বুঝতে পেরেই, বেচারা তার চোখ দুটি বন্ধ করে দিল, আবার খুলল। বারকয়েক পর্যায়ক্রমে খোলা আর বন্ধ করার পরে মনে হল, ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে সে এবারে মনস্থির করে ফেলেছে।

সেই শায়িত মানুষটির দিকে কৌতূহলের দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থেকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে উনি 'ফ্যানসি-ড্রেস বল'-এ যুবকের অভিনয় করেন—তাই না?

সমস্ত নাচের আসরেই, স্যার। সকালের দিকে কী বিশ্রী অবস্থায় ও যে বাড়ি ফিরে আসে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। বুঝতেই পারছেন দুঃখ আর অনুশোচনাতেই ও বাইরে ছুটে যায়। দুঃখ হচ্ছে, আগে ও যা ছিল এখন আর তা নেই; আর নেই বলেই, এখন মানুষে আর ওকে পুছে না।

মানুষটি এখন ঘুমোচ্ছে। শুধু ঘুমোচ্ছে না, নাকও ডাকছে। ভদ্রমহিলাটি করুণার দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন, তারপরে বললেন—ওঃ, একদিন ওই মানুষটি জয়ের পর জয় করে ঘুরে বেড়াত। সে সাফল্য যে কী তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। সমাজের যে কোন অভিজাত মানুষ, অথবা সেনাপতির চেয়েও ওর বিজয় অভিযান ছিল বড়; অনেক বেশী সাফল্যমণ্ডিত।

বলেন কী ? উনি কী করতেন তখন ?

ওর ভরা যৌবনের দিনগুলির কথা আপনি জানেন না বলেই অবাক লাগছে আপনার। ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ওই বল-এ। কারণ, প্রতিটি বলেই ও অংশগ্রহণ করত। প্রথমবার দেখেই ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। কী সুন্দর চেহারা ছিল ওর ?—ওর দিকে তাকালেই চোখ দুটি আমার জলে ভরে উঠত। কাকের মত কালো, কোঁকড়ানো-কোঁকড়ানো চুল, গবাক্ষের মত বড়-বড় কালো দুটি চোখ। ওঃ—কী সুন্দর চেহারাই না তখন তার ছিল। সেই রাত্রিতেই ও আমাকে নিয়ে পালিয়ে আসে। তার পর থেকে একদিনের জন্যেও ওকে আমি ছেড়ে যাই নি। না; কোন প্রয়োজনেই না। ও আমাকে কম কষ্ট দিয়েছে ?

আপনারা বিয়ে করেছেন ?

মহিলাটি সহজভাবে বললেন—হ্যাঁ, স্যার……তা না হলে, অন্য সকলের মত, আমাকেও ছেড়ে ও পালিয়ে যেত। আমি একাধারে ওর স্ত্রী, আর নার্স। ও যা চায় সব আমি। এই জন্যে ও আমাকে কম কাঁদায় নি। কিন্তু কোনদিন ওর সামনে আমি চোখের জল ফেলি নি।…ও আমাকে ওর নিত্য নতুন বিহার আর ভালবাসার কথা বলত। বুঝতেও পারত না সেই সব কাহিনী শুনে কত কষ্ট পেতাম আমি।

কিন্তু ওর পেশাটা কি ছিল ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভুলে গিয়েছি, ভুলে গিয়েছি। মার্টেল-এর দোকানে ও ছিল হেড অ্যাসিসটেন্ট—কদর ছিল খুব। ও ছিল একজন আর্টিস্ট। ঘণ্টায় গড়পড়তা দশ ফ্রাঁ রোজগার হোত ওর।

মার্টেল ?…ওরা কারা ?

ওরা ? ওরা হচ্ছে বিখ্যাত হেয়ার ড্রেসার; অপেরা-র অভিনেত্রীরাই হচ্ছে ওদের মক্কেল। হ্যাঁ, নামকরা সব অভিনেত্রীরা ওখানে যেত চুল বাঁধতে। অ্যামব্রইসির কাছে চুল বাঁধতে না পারলে তাদের মন খুঁতখুঁত করত। বাড়তি টাকাও তারা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে যেত। এইভাবে অনেক টাকা রোজগার করেছিল ও। আপনাকে আর কী বলব, স্যার! সব মেয়েই এক জাতের। যে পুরুষ তাদের একটু খুশি করে তাকে তারা সব কিছু দিয়ে দেয়। মেয়েদের খুশি করা কত সহজ। আর এ শিক্ষা পুরুষদের হয় না। ও আমাকে সব কথাই বলত; ও চুপ করে থাকতে পারত না।……এই সব জিনিস পুরুষদের খুব আনন্দ দেয়। মেয়েদের সঙ্গে মিশে যা আনন্দ পায় তার চেয়েও বোধ হয় বেশী পায় সেই কাহিনী ফলোয়া করে বলতে।

কোন-কোন দিন রাত্রিতে সে ফিরে আসত কিছুটা বিবর্ণ হয়ে; বেশ খুশি খুশি ভাব; চোখ দুটো হয়ত জলজল করছে। এই দেখেই আমি নিজের মনেই বলতাম—আজকে নিশ্চয় আবার একটা মেয়ে জুটিয়েছে ও।

ব্যাপারটা জানার জন্যে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম; একবার সুরু করলে ও আর থামতে চায় না, এই আশঙ্কায় কোনকিছু জিজ্ঞাসা করতেও ভয় লাগত আমার। তখন আমরা দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

আমি জানতাম যে শেষ পর্যন্ত সে না বলে পারবে না; আর সেই জন্যেই মনে-মনে সে তৈরী হচ্ছে। তার হাবভাব, খুশ মেজাজ দেখেই আমি তা বুঝতে পারতাম। সে বলত—'মেদেলি, আজকের দিনটা আমার ভালই গিয়েছে।' তার মুখের দিকে না তাকানোর, তার কথা না শোনার ভান করতাম আমি। খাবার টেবিল গোছানোর চেষ্টা করতাম আমি। সুপ নিয়ে তার উলটো দিকে বসতাম আমি।

সেই সময়টা সত্যি কথা বলতে কি স্যার, ওর ওপরে বিতৃষ্ণায় ভরে যেত আমান মন; মনে হোত, আমার দেহটাকে কে যেন পাথরের টুকরো দিয়ে ঠুকে-ঠুকে ভাঙছে। মনের এই অবস্থাটাই হচ্ছে সত্যিকার ভয়ঙ্কর। কিন্তু সেসব চিন্তা ওর ছিল না। ও ভাবতেই পারত না যে এসব কথা শুনতে আমার কষ্ট হয়। কাউকে এসব কাহিনী বলতে সে চাইত; তাকে যে মেয়েরা কত ভালবাসে সেই কথাটা গর্বের সঙ্গে বলার জন্যে সে আকুলি-বিকুলি করত। আর আমাকে ছাড়া আর কাকে ও বলবে……বুঝতে পারছেন আমার অবস্থাটা? সেইজন্যেই বিষ খাচ্ছি মনে করেই সে-কাহিনী আমাকে শুনতে হোত। সুপ খেতে-খেতে সে বলত—মেদেলি আজকে আর একজন এসেছিল।

আমি ভাবতাম—এবার সুরু হল। ভগবান, এ-মানুষটা কী? এই মানুষটাকেই আমার জীবনের সঙ্গী করেছি?

তারপরেই সুরু করত ও—আর একজন……যাকে বলে সত্যিকারের সুন্দরী।…

মেয়েটির নাম-ধাম-গোত্র সব বলত; কোন্ ঘরে তারা ছিল, কী তারা করেছে, কী তারা খেয়েছে……স-ব স-ব আনুপূর্বিক বর্ণনা করে যেত ও। এই সব শুনে আমার মনটা পুড়ে যেত; কিন্তু ও বলছে তো বলছেই…… একটানা বলে চলেছে। মাঝে-মাঝে আমাকে হাসির ভান করতে হোত। সেটুকু না করলে ও ভীষণ চটে যেত। ও যা বলত তার সবটাই হয়ত সত্যি নয়; কারণ—নিজেকে ফোলানোর জন্যে অনেককিছুই বাড়িয়ে বলা ওর অভ্যাস ছিল। তার জন্যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতেও কোনরকম দ্বিধা হোত না ওর। তবে যা বলত তা যে একেবারে মিথ্যা সে রকম ভাবার পেছনেও কোন যুক্তি ছিল না। এসব রাত্রিতে তাকে বেশ ক্লান্ত দেখাত। খাওয়ার পরেই সে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠত।

প্রেমের উপাখ্যান শেষ করার পরে সিগারেট খেতে-খেতে সে মেঝের ওপরে পায়চারি করত। তার সেই সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে

আমি ভাবতাম—ও আমাকে সত্যি কথাই বলে। আমি নিজেই তো ওকে দেখে একদিন উন্মাদ হয়েছিলাম। অন্য মেয়েরাও যে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী ?

কিন্তু তবু মনটা আমার দাউ দাউ করে জ্বলতো। খাওয়ার টেবিল পরিষ্কার করতে করতে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হোত আমার ; ইচ্ছে হোত জানালা দিয়ে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ি : ও নিজের মনে সিগারেট খেত, মাঝে মাঝে হাই তুলত · তারপরে শুতে যাওয়ার আগে বার দু'তিন বলত—হায় ভগবান, আজ কি আমার ঘুম হবে !

এই জন্যে ওকে আমি দোষ দিতাম না ; কারণ ও বুঝতে পারত না যে ওর কথা শুনে আমি কষ্ট পাচ্ছি। এতটুকু বুঝতে পারত না। ময়ূররা যেমন পেখম তুলে নিজেদের চেহারা দেখিয়ে বেড়ায় ও-ও সেই রকম এই সব কাহিনী বর্ণনা করে নিজেকে দেখিয়ে বেড়াতে ভালবাসত। কেমন যেন ওর একটা ধারণা হয়েছিল যে সব মেয়েরাই ওর দিকে তাকিয়ে থাকে—সব মেয়েরাই ওকে পেতে চায়। বৃদ্ধ হওয়ার পরেই ব্যাপারটা হজম করা ওর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

সত্যি কথা বলছি স্যার, ওর মাথায় যখন আমি প্রথম সাদা চুল দেখলাম তখন আমি :ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম ; সেই সঙ্গে আনন্দও কিছুটা হয়েছিল ঠিকই···একটা নিষ্ঠুর আনন্দ···ভীষণ-ভীষণ আনন্দ···সত্যিকার আনন্দ বলতে যা বোঝা যায় তাই। মনে মনে বললাম—বাছাধন, এইবার তোমার শেষ··· শেষ। মনে হল, এবারে কারাগার থেকে মুক্তি হবে আমার। আর কোন মেয়েই ওর দিকে তাকাবে না—ও একমাত্র আমার···আমার হয়ে যাবে, আর কোন অংশীদার থাকবে না।

সেদিন সকালে বিছানায় শুয়েছিলাম আমরা। ও তখনও ঘুমোচ্ছিল। চুমু খেয়ে ঘুম ভাঙানোর জন্যে আমি ওর ওপরে ঝুঁকে পড়েছিলাম ; এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল ওর মাথার ওপরে লম্বা রূপোর সুতোর মত কী একটা জিনিস চক্‌চক্‌ করছে। চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গেল আমার। ভাবলাম, এও কি সম্ভব ? একবার মনে হল, ওকে না জানিয়ে চুলটা তুলেই দিই। কিন্তু ভাল ক'রে দেখতে গিয়ে—একটু ওপরে আরও একটা সাদা চুল লক্ষ্য পড়ল আমার। সাদা চুল ! ওর চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে !! কথাটা ভাবতে গিয়ে বুকটা ধড়ফড় করে উঠল আমার। গায়ের চামড়া গেল ভিজে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মনে-মনে খুশিই হলাম।

এ-সব কথা নিয়ে বেশীক্ষণ চিন্তা করাটা আনন্দের নয় ; কিন্তু সেদিন ওকে না জাগিয়ে বেশ আনন্দের সঙ্গেই সংসারের কাজ কর্ম করে গেলাম ; এত আনন্দ অনেকদিনই আমার হয় নি। ঘুম ভাঙলে ওকে আমি বললাম—তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে তখন একটা জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি।

কী ?

তোমার মাথার কিছু চুলে পাক ধরেছে।

কাতুকুতু দিলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, ও-ও সেইরকম বিরক্ত হয়ে চট করে বিছানার ওপরে উঠে বসল; তারপরে বেশ রাগ করেই বলল: তোমার কথা সত্যি নয়।

হ্যাঁ; তোমার কপালে। চারটে চুল পেকেছে।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আয়নার কাছে দৌড়ে গেল ও। দেখতে পেল না কিছু। আমি তখন পাকানো কোঁকড়া চুল ধরে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম—তুমি যেভাবে জীবন কাটাচ্ছ তাতে চুল পাকাটা এমনকিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়। আর দুটি বছর; তারপরেই তোমার শেষ হয়ে যাবে।

স্যার, আমি সেদিন সত্যি কথাই বলেছিলাম; দু'বছর পরে তাকে দেখলে আর আপনি চিনতে পারতেন না। কত তাড়াতাড়িই না মানুষের চেহারা পালটে যায়। তখনও চেহারাটা তার সুন্দরই ছিল; কিন্তু আগের মত মেয়েরা আর ওর পেছনে ছুটলো না। সেই সময়টা কী কষ্টই না আমার গিয়েছে! বাইরে ধাক্কা খেয়ে—সেই ধাক্কা নির্মমভাবে ও আমাকে ফিরিয়ে দিল। কিছুতেই ও আর খুশি হল না। টুপীর ব্যবসা করার জন্যে ও চাকরি ছেড়ে দিল; তাতে অনেক টাকা নষ্ট করল। তারপরে চেষ্টা করল অভিনেতা হ'তে; পারল না। তারপরে নাচের মজলিসে যেতে শুরু করল। অবশ্য কিছুটা টাকা সে যে বুদ্ধিমানের মত আগেই সরিয়ে রেখেছিল তাই রক্ষা। সেটাও এমন কিছু বেশী নয়; তবে তাতেই আমাদের চলে যাচ্ছে। একসময় কত টাকাই না সে রোজগার করেছে।

বর্তমানে ও কী ক'রে বেড়াচ্ছে তা আপনি নিজের চোখে দেখতে পেলেন। কেমন একটা ঝোঁক ওর ঘাড়ের ওপরে চেপে বসেছে। যৌবন ওকে ফিরে পেতেই হবে। মেয়েদের সঙ্গে নাচতে ওকে হবেই; তাদের দেহের গন্ধ, রুজ পাউডারের সুবাস তাকে শুঁকতেই হবে। হায়রে! ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়।

মনে হ'ল এবার বুঝি তিনি কান্নায় ভেঙে পড়বেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি তাঁর ঘুমন্ত বৃদ্ধ স্বামীর দিকে গভীর স্নেহে তাকিয়ে রইলেন। স্বামীটির তখন নাক ডাকছে। ধীরে-ধীরে তার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি; তাঁর চুলের ওপরে আলতোভাবে একটা চুমু দিলেন। এই অদ্ভুত দম্পতিকে বলার আর কিছু ছিল না ডাক্তারের। এবারে ফিরে যাওয়ার জন্যে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

দু'এক পা এগিয়ে যেতেই মহিলাটি বললেন—আপনার ঠিকানাটা একটু দেবেন? ওর শরীরটা যদি খারাপ হয় তাহলে আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব।

মাদার সুপিরিয়র-এর পঁচিশটি ফ্রাঁ

[The mother superior's twentyfive franks]

বৃদ্ধ প্যাভিলী ; তার পা দুটি বিরাট মাকড়শার মত বাঁকানো ; পুঁচকে চেহারা, লম্বা হাত ; সুঁচোলো দাড়ি—আর মাথার খুলির চারধারে আগুনে রঙের লাল চুলের গুচ্ছ। সব জড়িয়ে মানুষটাকে একটা বিদূষক ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। মানুষটা সত্যিই একটি ভাঁড়, চেহারায় আর পেশায়। তবে বেশ আমুদে, সরল—প্যাঁচোয়া নয়। চাষীর ছেলে প্যাভিলী, নিজেও সে চাষী। শরীরের নানা ভঙ্গী দেখিয়ে সে লোক হাসাত। লেখাপড়া সে জানত না ; ওই ভাঁড় সেজেই সে তার রুজি-রোজগার করত। হ্যাঁ, ভগবান তাকে গ্রামের অজস্র দরিদ্র মানুষদের, থিয়েটারে পয়সা দিয়ে যাওয়া যাদের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব ছিল না, সেই তাদের আনন্দ দেওয়ার জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের কিছুটা আনন্দ দেওয়ার জন্যে সে প্রাণপণে চেষ্টা করত। আমোদ করার জন্যে লোকেরা কাফের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখত, মদ খাওয়াতো। সে-ও বোতলের পর বোতল শেষ করে ফেলত ; যারা সেখানে আসত-যেত তাদের আনন্দ দিত। কেউ তাতে বিরক্ত হোত না ; সবাই তার রসিকতায় হেসে গড়িয়ে পড়ত।

চেহারাটা বলতে গেলে তার কুৎসিতই ছিল ; তবু তার অঙ্গভঙ্গী দেখে মেয়েরাও কোন আপত্তি করত না ; তারাও খিলখিল করে হাসত। সে তাদের কাঁধের ওপরে তুলে দেওয়াল. খানা, অথবা, কোন আস্তাবলের ধারে নিজে গিয়ে এমনভাবে কাতুকুতু দিত যে হাসতে-হাসতে তাদের পেটে খিল ধরে যেত ; একহাতে পেট চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে তারা তাকে ঠেলে দিত। এই ঠেলা খেয়ে সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পিছিয়ে আসত ; তার হাবভাব দেখে মনে হোত সে বোধ হয় আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। তার সেই ভঙ্গিমা দেখে মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়ত ; হাসির দাপটে চোখ ফেটে তাদের জল গড়িয়ে পড়ত। এই দেখে তিন লাফে সে ফিরে এসে তাদের দেহটা ধরে এমন কৌশলে ঝাঁকানি দিত যে তারা আর বাধা দিতে পারত না ; শেষ পর্যন্ত তারই কাছে নিজেদের ছেড়ে দিত।

একবার জুন মাসের শেষাশেষি ফসল কাটার জন্যে রুভিল-এর কাছে লে

হারিভু-র খামারে সে গেল। তিনটি সপ্তাহ দিনরাত্রি ধরে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সে ক্ষেতের মজুরদের নেচে-কুঁদে আনন্দ দিল। ফসল কাটার সময় মজুররা কাজ করতে করতে তার দিকে তাকিয়ে থাকত; আর কাটা ফসলের শিষ বাঁধতে বাঁধতে সে এমন সব অঙ্গভঙ্গী করত যে মাঠের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মজুরেরা হো-হো করে হেসে মাঠ একেবারে ফাটিয়ে দিত। রাত্রিতে চারপায়ের ওপরে ভর দিয়ে জন্তুর মত মেয়েদের রান্নাঘরে হাজির হোত· অন্ধকারে তাদের খুঁজে বেড়াত; সবাই হইচই করে জেগে উঠত; ছোট ছোট ডাণ্ডা নিয়ে তাকে তাড়া করত। সেই তাড়া খেয়ে সে হনুমানের মত চারপায়ে অদ্ভুতভাবে লাফাতে লাফাতে পালিয়ে যেত। তাই দেখে হো-হো করে হেসে উঠত সবাই।

ফসল কাটার শেষ দিনে মজুররা সব মাথায় ফিতে জড়িয়ে, ব্যাগ পাইপ বাজিয়ে একটা ওয়াগনে চেপে রওনা হল। ছ'টা ঘোড়া সেই গাড়ীটাকে ধীরে ধীরে টানতে লাগল। গাড়োয়ান ছিল ঢিলে পোশাক পরা একটা ছোকরা। সবাই মদ খেয়ে গাড়ীর ওপরে নাচছে; আর তাদের মাঝখানে মেয়েদের মধ্যে বুড়ো প্যাভিলী মদে চুর হয়ে নেচে নেচে ধিনতা-ধিনা করতে লাগল। তার শরীরের অদ্ভুত ভঙ্গিমায় সেই মজুর ছোকরারা হাঁ করে বসে নানান ঢঙে হেলে দুলে তাল দিতে লাগল।

তারপর সে হারিভুর খামারের ধারে গিয়ে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যাভিলী দুটো হাত ওপরে তুলে গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়ল মাটিতে, কিন্তু মাটিতে নামার আগে দুর্ভাগ্যবশত গাড়ীর একটা লম্বা কাঠে ধাক্কা খেয়ে পড়ল গিয়ে চাকার ওপরে। সেখান থেকে ছিটকে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। পড়েই চুপ করে গেল। একটি চোখ বন্ধ আর একটি চোখ মেলে ধূলোর ওপর চুপ করে পড়ে রইল তার বিরাট দেহটা। ভয়ে মুখটা তার নীল হয়ে গিয়েছে তখন। সেই দেখে তার বন্ধুরা লাফিয়ে পড়ল নীচে। তার ডান পায়ে হাত দিতেই সে ডুকরে কেঁদে উঠল। তারা যখন তাকে ধরে তুলতে গেল, তখন সে দাঁড়াতে পারল না; মাটিতে পড়ে গেল।

একজন চিৎকার করে বলল—নিশ্চয় ওর পা ভেঙেছে।

কথাটা সত্যি। পা-ই একটা সে ভেঙেছে।

তাকে ধরাধরি করে সবাই খামারের ভেতরে নিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার এলেন। ক্ষেতের মালিক তার চিকিৎসার খরচ দেবেন এই শুনে ডাক্তারবাবু তাঁর নিজের গাড়ীতে করে তাকে একটা হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। সেইখানেই তার পায়ের হাড়টাকে বসিয়ে দেওয়া হল।

যখন সে বুঝতে পারল এ-অসুখে মারা যাওয়ার তার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই, এখানে তাকে খেতে দেওয়া হবে, তাকে ওষুধ দেওয়া হবে, তার যত্ন নেওয়া হবে—তখনই সে অন্য মানুষ হয়ে গেল। কোনরকম কাজকর্ম না

থাকার ফলে বিছানার ওপরে শুয়ে-শুয়ে সে নিঃশব্দে মহাখুশিতে টেনে-টেনে হাসতে লাগল। সেই হাসির চোটে তার পোকায় কাটা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

সিস্টার তার বিছানার ধারে হাজির হলেই সে তার দিকে চেয়ে মুখ ভেঙাত, চোখ মারত, নাক বাঁকাত। শরীরের এই ভঙ্গিমাগুলি দেখতে এতটুকু কষ্ট হোত না তার। পাশাপাশি যে-সব রোগীরা শুয়ে থাকত তারা বেশ আনন্দ পেত তাতে। সিস্টার-ও মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার এই সব নিরপরাধ ব্যঙ্গ কৌতুক উপভোগ করার জন্যে কিছুটা সময় তার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াত। প্যাভিলীও তাকে খুশি করার জন্যে নিত্য নতুন মতলব ভাঁজতো।

একদিন প্যাভিলী ঠিক করল সিস্টারের কাছে গান গাইবে। তার গান শুনে সিস্টার মহাখুশি। তারপরে তার গানের ধারাটা পালটানোর জন্যে সিস্টার একদিন তাকে প্রার্থনা সঙ্গীতের একটা বই এনে দিল। বইটা পেয়ে সে ধীরে-ধীরে বিছানার ওপরে উঠে বসল—পাটাও তার সেরে আসছিল তখন। বিছানায় বসে নানান সুরে সে যীশুর স্তব, ভগবান আর তাঁর 'হোলি গোষ্ট' এর স্তব গাইতে সুরু করল; আর সিস্টার তার বিছানার একধারে বসে তাল দিতে লাগল হাতের তালু বাজিয়ে। সে মাটিতে হাঁটতে সুরু করল। এই দেখে মাদার সুপিরিয়র তাকে দিয়ে গির্জায় গান গাওয়ানোর উদ্দেশ্যে আরও কিছুদিন ধরে রাখতে চাইলেন। প্যাভিলীর এতটুকু আপত্তি ছিল না তাতে। পরের একটি মাস মহা আনন্দে গান করতে লাগল; সন্ধ্যা-বেলা গির্জায় না গিয়ে অনেকেই হাসপাতালে ভিড় করতে লাগল তার মুখে হাসির গান শোনার জন্যে।

পৃথিবীতে সব কিছুরই শেষ হয় একসময়। প্যাভিলীর মেয়াদও শেষ হয়ে এল একদিন। হাসপাতাল ছাড়ার সময় এল তার। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার সময় কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মাদার সুপিরিয়র তাঁকে পঁচিশটা ক্রা বকশিস দিলেন।

টাকাটা পকেটে পুরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল প্যাভিলী। রাস্তায় এসে দাঁড়ানো মাত্র সে ভাবতে লাগল এবার সে কী করবে? গ্রামে ফিরে যাবে? উহুঁ! অনেকদিন সে পেট পুরে আরাম করে মদ খায় নি। সেই সাধ পূর্ণ হওয়ার আগে গ্রামে ফেরার কোন কথাই ওঠে না। সুতরাং একটা কাফেতে ঢুকল সে। শহরে সে খুব কমই এসেছে—বছরে একবার কি দু'বার। শহরে আসার একমাত্র আকর্ষণ মদ আর মেয়েমানুষ। তার কেমন যেন একটা ধারণা হয়েছিল যে মানুষ ওই জন্যেই শহরে আসে। সেও ঠিক করে ফেলল—মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে সে-ও একটু স্ফূর্তি করে যাবে।

কাফেতে ঢুকেই এক গ্লাস কগন্যাক-এর অর্ডার দিল সে। কগন্যাক আসা-

মাত্র সবটা গলায় ঢেলে একটু ভিজিয়ে নিল; তারপরে জিনিসটা কী রকম খেতে তাই জানার জন্মে আর একটা গ্লাস গলায় ঢাললো। ব্রানডিটা গলায় ঢালার সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল। এই জ্বালাময় আনন্দ অনেকদিন সে পায় নি। গলায় ঢালার সঙ্গে-সঙ্গে একটা তিক্ত বিষণ্ণ, উত্তেজক অনুভূতি তাকে এমনভাবে অভিভূত করে ফেলল যে মনে হল গোটা বোতলটাই সে নিঃশেষ করে ফেলে। কিন্তু অন্য মদও তাকে খেতে হবে। এই জন্মে ওই বোতলটার দাম কত স জানতে চাইল। দাম তিন ফ্রাঁ জেনে পুরো বোতলটাই গলায় ঢেলে দিল। তারপরে অন্য মদ খেয়ে সে একেবারে মাতাল হয়ে গেল।

কিন্তু যাতে অন্য স্ফূর্তি করার শক্তি সে হারিয়ে না ফেলে সেদিকেও সে সাবধান হয়ে গেল। তার চোখের ওপরে চিমনীগুলো কাঁপতে সুরু করেছে বুঝতে পেরেই সে উঠে পড়ল; তারপরে বগলে একটা বোতল নিয়ে স্খলিত পায়ে কাঁপতে কাঁপতে সে বেশ্যাপাড়ার পথ ধরল। পথে একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করল: সে বলতে পারল না। একটা পিয়োনকে জিজ্ঞাসা করল: সে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিল। একটা রুটিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতে সে তাকে যা-নয়-তাই বলে গালাগালি দিল। শেষকালে একটি বরকন্দাজ দয়াপরবশ হয়ে তাকে সঙ্গে করে একটি বেশ্যাবাড়ির দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল; বলে গেল, এইখানেই "কুইন" থাকে।

তখনও সূর্য মধ্য গগনে এসে হাজির হয় নি। সেই রসের অন্তঃপুরে মহা আনন্দে ঢুকে গেল প্যাভিলী। বাড়ির চাকরাণী তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু নানারকম বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করে সে তাকে হাসালো; তার পরে তিনটি ফ্রাঁ দেখাল। ওই জায়গায় বিশেষ আমোদ প্রমোদের রেট-ই হচ্ছে ওই। তারপরে একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অনেক কচলাকচলির পরে সে দোতলায় উঠল। ঘরের মধ্যে ঢুকেই সে "কুইনকে" ডেকে পাঠালো। ডেকে পাঠিয়েই বোতল খুলে খানিকটা মদ সে গলায় ঢেলে দিল।

দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে এল দীর্ঘাঙ্গিনী, মোটাসোটা, লালমুখী, বিশালবপুধারিণী একটি রমণী। অভ্রান্ত দৃষ্টি আর বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে লোকটিকে একবার সে যাচাই করে নিল; তারপরে চেয়ারে উপবিষ্ট সেই মাতালটাকে বলল—এ সময়ে আসতে তোমার লজ্জা করল না?

সে জড়িয়ে-জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—কে-ন, কে-ন বলত রাজকন্যা?

তুমি একটি ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করতে এসেছ—তার দুপুরের খাবার খাওয়ার আগেই—এই জন্মে।

প্যাভিলী হাসার একটু চেষ্টা করে বলল—সাহসী মানুষের কাছে কোন সময়ই অসময় নয়।

বুড়ো-হাবড়া কোথাকার—মাতলামি করার এ সময় নয়।

ক্ষেপে উঠল প্যাভিলী; বলল—প্রথমত আমি বুড়ো নয়; দ্বিতীয়ত আমি

মাতাল নই।

মাতাল নও?

কভী নেহী।

তাহলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছ না কেন?

মেয়েটির বন্ধুবান্ধবরা সব খেতে বসেছে; আর সে অভুক্ত অবস্থায় রয়েছে এই ভেবে মেয়েটি রোষকষায়িত চক্ষে তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল।

প্যাভিলী দাঁড়িয়ে উঠে বলল—এই দেখ, আমি 'পোলকা', নাচ নাচছি।

তার পা যে কাঁপছে না, সে যে মাতাল হয় নি এটা প্রমাণ করার জন্যেই সে চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে নাচের ভঙ্গী করল; তারপরে বিছানার ওপরে লাফিয়ে পড়ল। সেই পরিষ্কার বিছানার চাদরের ওপরে তার কাদা-মাখামাখি জুতোর দুটি বিরাট ছাপ পড়ে গেল।

মেয়েটা চীৎকার করে উঠল—হতচ্ছাড়া, নচ্ছার, পাজি···

এই বলে তার দিকে দৌড়ে গিয়ে তার পেটে এইসা জোরে একটা ঘুষি মারল যে বেচারা প্যাভিলী তাল সামলাতে না পেরে কোচের নিচে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল; সেখান থেকে আর একটা ডিগবাজি খেয়ে পড়ল ড্রয়ারের গায়ে। ড্রয়ারের ওপরে ছিল মুখ ধোওয়ার বেসিন আর জলের কুঁজো—প্রচণ্ড চীৎকার করতে-করতে সেই দুটো নিয়ে সে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপরে। সেই ধস্তা-ধস্তি আর তার প্রচণ্ড হৃদয়বিদারক চীৎকারে সেখানকার সবাই দৌড়ে এল— মঁসিয়ে থেকে সুরু করে মাদাম, চাকর-চাকরানী সবাই।

মঁসিয়েই প্রথম তাঁকে মেঝে থেকে তোলার চেষ্টা করলেন; কিন্তু পায়ের ওপরে দাঁড় করানোর সঙ্গে-সঙ্গে প্যাভিলী আবার মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ল; পড়েই তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল—তার একটা পা ভেঙে গিয়েছে—এবারে তার ভাল পা-টা।

কথাটা সত্যি। দৌড়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল তারা। এই ডাক্তারটি সেই আগের; ইনি লে হারিভুর খামারে প্যাভিলীর প্রাথমিক চিকিৎসা করেছিলেন।

প্যাভিলী জিজ্ঞাসা করল—আবার আপনি? কী হয়েছে আপনার?

আর একখানা পা ভেঙে গিয়েছে ডাক্তার।

কী করে ভাঙলো?

এই বেশ্যাটা ভেঙে দিয়েছে।

তাঁর এই মন্তব্যে সবাই বিরক্ত আর অস্বস্তির সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার বললেন—এই দুর্ঘটনাটা আপনার ক্ষতি করবে মঁসিয়ে। টাউন কাউন্সিল আপনাদের সুনজরে দেখে না। এই ঘটনার কথা তাদের কানে গেলে তারা আপনাদের সহজে ছেড়ে দেবে না।

কী করা উচিৎ তাহলে?—জিজ্ঞাসা করলেন মঁসিয়ে।

উচিৎ হচ্ছে এইমাত্র যে হাসপাতাল থেকে ও ছাড়া পেয়েছে সেই হাসপাতালে ওকে এখনই পাঠিয়ে দেওয়া ; আর সেই সঙ্গে ওর চিকিৎসার খরচ দেওয়া।

মঁসিয়ে বললেন—কেলেঙ্কারীর চেয়ে খরচই বরং আমি দেব।

আধঘণ্টা পরে মত্ত অবস্থায় গোঙাতে-গোঙাতে যে-হাসপাতাল সে ঘণ্টা-খানেক আগে ছেড়ে গিয়েছিল, প্যাভিলী আবার সেই হাসপাতালে ফিরে এল।

মাদার সুপিরিয়র মহা-আনন্দে দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে ; হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কী হল ভাই ?

আর একটা পা ভেঙেছে, ডিয়ার সিস্টার।

আবার তুমি খড়ের গাদায় উঠেছিলে ? পাগল কোথাকার···

বিভ্রান্ত হয়ে প্যাভিলী জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল—না, না,···এবার খড়ের গাদা নয়···তবে দোষটা আমার নয়—এবারে দোষ হচ্ছে খড়ের তৈরী শতরঞ্জির।

মাদার সুপিরিয়র বুঝতে পারলেন না এর জন্যে দায়ী হচ্ছে তাঁর পঁচিশটি ফ্রাঁ।

খোঁড়া

[The cripple]

১৮৮২ সালের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল ঘটনাটা।

ট্রেনের একটা ফাঁকা কামরায় সেইমাত্র ঢুকে নিরুপদ্রবে কাটানোর জন্যে দরজাটা সবেমাত্র বন্ধ করে দিয়েছি এমন সময় দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। কে যেন বলছে শুনলাম—সাবধানে আসুন স্যার। আমরা লাইনের ধারে এসে পৌচেছি। পা-দানিটা খুব উঁচুতে।

আর একটা স্বর শোনা গেল তার পরেই—ভয় নেই লরেঁ! আমি শক্ত করেই ধরছি।

তারপরেই একটা মাথা ঢুকে এল। মাথার ওপরে একটা গোল টুপী। কামরার দু'পাশে যে চামড়ার দড়ি ঝোলানো ছিল, সেই দড়ি দুটি হাতে শক্ত করে ধরল। সব শেষে একটা বেশ মোটা চেহারার শরীর ঢুকে এল। কামরার মেঝেতে পা দেওয়ামাত্র লোহায়-লোহায় ঘর্ষণ খেয়ে যেরকম ধাতব

একটা শব্দ হয় সেই রকম শব্দ হল। সমস্ত শরীরটা ভেতরে ঢুকে আসার পরে দেখলাম যাত্রীটির দুটি পা-ই কালো কাঠের।

এই যাত্রীটির পেছনে আর একটা মাথা উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—ঠিক আছে স্যার ?

হ্যাঁ।

এই আপনার জিনিসপত্র, আর ক্রাচ রইল।

যে চাকরটি কথা বলছিল তাকে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সেনানী বলেই মনে হল। কালো আর সবুজ কাগজে মোড়া, শক্ত ক'রে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছোটখাট অনেকগুলি বাণ্ডিল ছিল তার হাতে। সেগুলি সে একটি-একটি করে নামিয়ে তার মনিবের মাথার ওপরে র‍্যাকে বেশ ভাল করে গুছিয়ে রাখল ; তারপরে বলল—এই সব রইল স্যার। মিষ্টি, পুতুল, ড্রাম, গান, আর এইটা—মোট পাঁচটা।

ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মামুলি দু'চারটে কথা বলে চাকরটি বিদায় নিল। যাওয়ার সময় বন্ধ করে দিয়ে গেল দরজাটা। এতক্ষণে, সহযাত্রীটির দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখার সময় পেলাম আমি।

মাথার চুলগুলি তার সবই প্রায় সাদা হয়ে গিয়েছে বটে তবু আমার মনে হল বয়স তার পঁয়তিরিশের ওপরে যাবে না। তার জামার ওপরে নানা রকম স্মারক চিহ্ন ঝুলছে। গোঁফ রয়েছে, বেশ শক্ত সমর্থ ; খুব কর্মঠ মানুষ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে যেমন একটু খিটখিটে হয়ে যায় আগন্তুকটিকে দেখে আমার কিছুটা সেই প্রকৃতিরই মনে হল।

কপালের ঘাম মুছে একটু জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি ; মনে হল তিনি যেন বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তারপরে সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—সিগারেট খেলে কি আপনার কোন অসুবিধে হবে স্যার ?

না, স্যার। নিশ্চয় না।

ওই চোখ, ওই স্বর, ওই মুখ—খুব পরিচিত বলেই মনে হল আমার। কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিক মনে করতে পারলাম না। নিশ্চয় একদিন ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি। এবং নিশ্চয় একদিন ওঁর সঙ্গে আমি করমর্দন করেছি। কিন্তু সে অনেক দিন আগে। কতদিন আগে স্মৃতির কুয়াশায় তা ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। আগন্তুকটিও ঠিক সেই-ভাবেই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল তিনিও যেন তাঁর স্মৃতির ভাঁড়ার খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অস্বস্তির সঙ্গে দু'জনেই আমরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলাম ; চোখাচোখী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দুজনেই মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ এইভাবে লুকোচুরি খেলার পরে আমিই কথা বললাম

প্রথম—সত্যিই স্যার, এইভাবে ঘণ্টাখানেক ধরে পরস্পরের দিকে তাকানোর ছলনা না করে কোথায় আমাদের পরিচয় হয়েছে সেটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করাটা কি আমাদের উচিৎ হবে না ?

ঠিকই বলেছেন স্যার—আমার সহযাত্রীটি মিষ্টি ক'রে বললেন।

আমি তাঁকে আমার নাম বললাম। তিনি বললেন—আমার নাম হেনরী বুক্লেয়ার। আমি এখন ম্যাজিস্ট্রেট।

একটু চুপ করে রইলেন তিনি ; ইতস্তত করলেন একটু ; তারপরে বেশ অনিশ্চয়তার সঙ্গে বেশ কষ্ট ক'রে তিনি বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ ; ঠিকই মনে হচ্ছে। অনেকদিন হল, যুদ্ধের আগে, পঁয়সেল-এ আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। প্রায় বার বছর হবে।

হ্যাঁ ; তাই বটে। আপনিই লেফটন্যান্ট রেভালিয়ের ?

হ্যাঁ। উড়ন্ত গোলায় আমার দুটি পা একসঙ্গে উড়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম।

অপরিচিতির কুয়াশা কেটে যাওয়ার পরে আমরা আবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

খুব ভাল ক'রেই এবারে মনে পড়ে গেল আমার। তখন ইনি ছিলেন দোহারা চেহারার সুন্দর তরুণ। কী তৎপরতার সঙ্গেই না ইনি তখন সৈন্য পরিচালনা করতেন। ঝড়ের মত বেগে ঝাঁপিয়ে পড়তেন শত্রুবাহিনীর ওপরে। সেই জন্যে তাঁর নাম ছিল 'দুরন্ত ঝড়'। কিন্তু সেই দুরন্তপনার মধ্যে এঁর আর একটি চরিত্র অলক্ষ্যে কাজ করত ; সেটি হচ্ছে হৃদয় সম্পর্কিত—প্রণয়ের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ রয়েছে। যদিও সেটি ক্ষণস্থায়ী ছিল। ঘটনাটা আমি একদিন জানতাম ; আজ আমি ভুলে গিয়েছি। ঠিক যেমন-ভাবে কুকুর শিকারের গন্ধ শুঁকে বেড়ায় আমিও তেমনি মনের গহনে সেই বিস্মৃতপ্রায় অনুভূতিটি হাতড়াতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে গেল ; আমার সামনে ভেসে উঠল একটি যুবতীর মুখ। সশব্দে কাটা ক্র্যাকারের মত তার নামটাও হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। তার নাম হচ্ছে মিলি দি ম্যানডেল। সমস্ত ঘটনাটা আমার মনে পড়ে গেল। এটা একটা প্রেমের কাহিনী অবশ্যই ; কিন্তু অ ত সাধারণ। আমার সঙ্গে যখন এই যুবকের আলাপ হল তখন ওদের মধ্যে প্রেম বেশ জমে উঠেছে। তাদের যে শীঘ্রই বিয়ে হবে সে কথাও শুনতে পেলাম ; যুবকটিও মেয়েটিকে খুব ভালবাসত।

কিছুক্ষণ আগে চাকরটি যে সব জিনিস র‍্যাকের ওপরে রেখে গিয়েছিল ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সেগুলি ঠক-ঠক করে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। সেইদিকে তাকিয়ে দেখলাম আমি। হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা রোমান্টিক চিন্তা আমার মনের মধ্যে ঝলকে উঠল। এরকম রোমান্টিক কাহিনী আমরা গল্প-

উপন্যাসে সাধারণত পড়ে থাকি। এই সব কাহিনীতে বাগদত্তা মেয়ে অথবা ছেলে দুর্ঘটনায় পড়ার পরেও তাদের প্রণয়ী অথবা প্রণয়িনীকে বিয়ে করেছে। সেই দুর্ঘটনা দেহেরই হোক অথবা অর্থ সম্বন্ধীয়ই হোক—তাতে তারা পিছপাও হয় না। সেই রকম, যুদ্ধে বিকলাঙ্গ হওয়ার পরে এই যুবকটি যুদ্ধশেষে তার প্রেয়সীর কাছে ফিরে আসে, এবং প্রেয়সী তাকে বিয়ে করে।

বই-এর কাহিনীতে এই ধরনের আত্মত্যাগ খুবই সহজ, এই ব্যাপারটিকেও আমি তেমনি সুন্দর এবং সহজ ভেবেছিলাম। এই সব উদার কাহিনী পড়ে আমাদের হৃদয়ও ঔদার্যে বিস্তৃত হয়, আত্মদান করার বিরাট উৎসাহে উৎসাহিত হই; অথচ, পরের দিনই কোন হতভাগ্য বন্ধু সামান্য কিছু অর্থ ধার করতে আমাদের দ্বারস্থ হলে বিরক্তিতে আমাদের গাটা রি-রি করে ওঠে।

কিন্তু তারপরেই অকস্মাৎ আর একটি সম্ভাবনার কথা উঁকি দিয়ে গেল। এটি কম রোমান্টিক এবং বেশী মাত্রায় বাস্তব। সম্ভবত, হয়ত যুদ্ধে তার পা দুটি উড়ে যাওয়ার আগেই তাদের বিয়ে হয়েছিল; ফলে যুদ্ধের পরে মেয়েটি তাকে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে, বাধ্য হয়েছে তাকে সান্ত্বনা দিতে, তার সেবাশুশ্রূষা করতে।

ছেলেটি কি সুখী হয়েছিল, না, যন্ত্রণা পেয়েছিল? ব্যাপারটা কী জানার একটু ইচ্ছে হয়েছিল আমার; কিন্তু পরে সেই ইচ্ছে প্রবল হ'তে হ'তে একেবারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ালো। পুরোটা না হোক; বিশেষ-বিশেষ কিছু সূত্র পেলেও কাহিনীটি আমি কল্পনা দিয়ে গেঁথে নিতে পারব। মামুলি কিছু কিছু আলাপ আলোচনার পরে র‍্যাকের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম —তাহলে সাকুল্যে ওরা পাঁচজন? স্ত্রী, দুটি ছেলে, একটি মেয়ে, আর নিজে। ওই পাঁচজনের জন্যে পাঁচটি উপহার বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার ছেলেপুলে হয়েছে, স্যার?

আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই, স্যার।

হঠাৎ আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম; মনে হল, আমি কোন অশালীন ব্যবহার করেছি, বললাম—ক্ষমা করবেন। আপনার সঙ্গীটি খেলনার যে ফিরিস্তি দিয়ে গেল তাতে আপনার সম্বন্ধে আমি ওই কথাই ভেবেছিলাম। অনেক সময় মনোযোগ না দিয়েই মানুষ অন্য লোকের কথা শোনে; আর তাই শুনে উপসংহার টানে।

একটু হেসে তিনি বিড় বিড় করে বললেন—না। আমি বিয়ে করি নি, আমাদের ব্যাপারটা বেশীদূর এগোয় নি।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার; বললাম—তা বটে, তা বটে। আপনার সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছিল তখন, যতদূর মনে হয়, মিলি দি ম্যানডেলের সঙ্গে আপনার বিয়ে ঠিক হয়েছিল।

হ্যাঁ, স্যার। আপনার স্মরণশক্তি অদ্ভুত।

সাহস পেয়ে বললাম—হ্যাঁ ; মনে পড়েছে আমার। যতদূর শুনেছি, মিলি যাঁকে বিয়ে করেছেন তাঁর নাম মঁসিয়ে…মঁসিয়ে…।

শান্তভাবে পাদপূরণ করলেন তিনি—মঁসিয়ে দি ফ্লুরেল।

হ্যাঁ, তাই বটে। এই বিয়ের পটভূমিকাতেই আপনার আহত হওয়ার সংবাদ আমি পেয়েছিলাম।

আমি তাঁর মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। তিনি একটু লজ্জা পেলেন।

হেরে যাওয়ার পরে মানুষ যেমন মাঝে-মাঝে নিজের হয়ে জগতের কাছে কৈফিয়ৎ দেয়, সেইরকম একটা আগ্রহ নিয়ে তিনি বললেন—মাদাম দি ফ্লুরেল-এর সঙ্গে আমার নাম যোগ ক'রে লোকে ভুল করে স্যার। দুটি পা হারিয়ে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পরে সে আমাকে বিয়ে করুক এ-প্রস্তাবে কিছুতেই আমি রাজি হতাম না। একাজ করা কি সম্ভব? করুণা প্রচার করার জন্যে কেউ বিয়ে করে না, স্যার। মেয়েরা বিয়ে করে একটি পুরুষের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত বেঁচে থাকার জন্যে। আর সেই মানুষটি যদি আমার মত বিকলাঙ্গ হয় তাহলে তাকে বিয়ে করার অর্থই হচ্ছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জ্বালা আর যন্ত্রণাকে স্বীকার করে নেওয়া। সত্যি কথা বলতে কি স্যার একটা সীমা পর্যন্ত সমস্ত রকম আত্মত্যাগ অথবা আকর্ষণকে আমি শ্রদ্ধা করি ; কিন্তু কিছু হাততালি বা বাহবা পাওয়ার জন্যে কোন মেয়ে যদি তার জীবনের সব আনন্দ, সব স্বপ্ন নষ্ট করতে যায় তার সেই আত্মত্যাগকে কোন-মতেই আমি সমর্থন করতে পারিনে। আমার ঘরের মেঝেতে প্রতিটি পা ফেলার সময় আমার ক্রাস-এর তলায় যে লোহার পাত রয়েছে তার যখন শব্দ হয় তখন মাঝে-মাঝে উন্মাদের মত চাকরটার গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে যায় আমার। পুরুষ নিজে যা সহ্য করতে পারে না আপনি কি মনে করেন মেয়েটি চিরজীবন ধরে তা-ই সহ্য করুক এটা সে চায়? তার ওপরে, আপনার কি মনে হয় আমার এই কাঠের পা দুটি দেখতে খুব সুন্দর…

চুপ করে গেলেন তিনি। আমি তাকে কী বলব? মনে হল, তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। মেয়েটিকে কি আমি দোষ দিতে পারি, না ঘৃণা করতে পারি? তাঁকে বা মেয়েটির বিরুদ্ধেই বা কি কোন রায় দিতে পারি? না। তবু কৌতূহল মেটে না মানুষের। আমি তাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম —মাদামের ছেলেপুলে রয়েছে?

রয়েছে। একটি মেয়ে, দুটি ছেলে। তাদের জন্যেই এই সব খেলনা নিয়ে যাচ্ছি। তাঁর স্বামী এবং তিনি নিজেও আমাকে বেশ ভালবাসেন।

সেণ্ট-জার্মের পাহাড়ের ওপর দিয়ে আমাদের ট্রেন তখন উঠতে সুরু করেছে। টানেলের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে, স্টেশনে এসে থেমে গেল ট্রেনটা।

বিকলাঙ্গ অফিসারটিকে নামায় সাহায্য করার জন্তে আমি এগিয়ে গেলাম ; এমন সময় খোলা দরজার ভেতর দিয়ে দুটি হাত ঢুকে এল।

তুমি কেমন আছ, ডিয়ার রিভেলিয়ার ?

তোমরা ভাল তো, ফ্লুরেল ?

লোকটির পেছনে তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে ; একমুখ হেসে দস্তানায় ঢাকা আঙুলগুলি উঁচিয়ে তিনি তাঁর দিকে নাড়ছেন। তাঁর পাশে একটি বাচ্চা মেয়ে আনন্দে নাচছে। দুটি ছেলে লোভীর মত দুটি ড্রামের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের বাবা তখন ট্রেনের কামরা থেকে ওই দুটি ড্রাম আর বন্দুকটা নামিয়ে আনছিলেন।

বিকলাঙ্গ মানুষটি প্লাটফর্মে নামতে ছেলেমেয়েরা চারপাশ থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তাঁরা চলতে লাগলেন। বাচ্চা মেয়েটা তার ছোট হাতে পরম স্নেহে একটা ক্রাচের মসৃণ দেহটা ধরে রেখেছে। মনে হল সে যেন তার কোন প্রিয় বন্ধুর একটা হাত ধরে চলেছে।

প্রতিদ্বন্দ্বী পিন

[The rival pins]

মেয়েরা একেবারে জানোয়ার, জানোয়ার !

অর্থাৎ ?

তারা আমার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছে।

তোমার সঙ্গে ?

হ্যাঁ, আমার সঙ্গে।

অনেকগুলি, না, একটি মেয়ে ?

দুটি।

একই সঙ্গে ?

হ্যাঁ, একই সঙ্গে।

কী রকম বলত ?

বুলেভার্ডের ওপরে বিরাট একটা কাফে। তারই সামনে দুটি যুবক মুখোমুখী বসে মদে জল মিশিয়ে খাচ্ছিল। মদের রঙটা দেখতে হয়েছিল "ওয়াটার-কলার পেণ্টের মত।"

তাদের বয়স প্রায় একই রকমের—পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। একজন সুন্দর, আর একজন কালো। কেতাদুরস্ত চেহারা দু'জনেরই। এদের মত

মানুষদেরই সাধারণত স্টক একস্চেঞ্জ-এ ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, দেখা যায় ড্রয়িং রুমে। এদের গতি সর্বত্র, বাসা এদের সব জায়গা; আর যেখানে এরা যায় সেখানেই তারা প্রেম ক'রে বেড়ায়। কালো চেহারার লোকটি বলল: দিপির সমুদ্রতীরে একটি ক্ষুদে মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তার সঙ্গে আমার যে একটা অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল সে কথা তোমাকে আমি আগেই বলেছি।

হ্যাঁ; তা বলেছ।

এই অন্তরঙ্গতার অর্থ কী তা তুমি জান। প্যারিসে আমার একটি প্রণয়িনী রয়েছে; তাকে আমি খুব ভালবাসি। সে-ই আমার পুরনো বন্ধু, আর বেশ ভাল বন্ধু। আসল কথাটা, তার সঙ্গে প্রেম করাটা আমার কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস?

হ্যাঁ; অভ্যাস ছাড়া আর কী? আর আমার দু'জনেরই এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তাকে আমি ছাড়তে চাই নি। তার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল সেই ছোকরাটিও বেশ সুন্দর। তাকে আমারও খুব ভাল লাগত। বেশ হাসিখুশি ভাব, আমার সত্যিকারের বন্ধু। ছোট্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় তাদের বাড়িতেই আমার জীবন কেন্দ্রীভূত ছিল।

তারপর?

তারা প্যারিস ছেড়ে আসতে পারল না বলেই দিপিতে নিজেকে মৃতদার বলে মনে হল আমার।

দিপিতে গিয়েছিলে কেন?

হাওয়া বদলাতে। শহরের বিলাসে সারা জীবন তুমি কাটাতে পার না।

বলে যাও।

তারপরেই সমুদ্রতটে ওই ক্ষুদে মেয়েটির সঙ্গে আমার আলাপ হল।

ওই সিভিল সার্ভেন্টের বউ-এর সঙ্গে?

হ্যাঁ। মনের দিক থেকে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মেয়েটি। একমাত্র রবিবারের দিনগুলিতেই তার স্বামী ঘরে আসত; আর স্বামী তো নয়, একেবারে যাচ্ছেতাই বস্তু। তার অবস্থাটা কী তা আমি ভালই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে আমরা দু'জনে গল্প করলাম, হাসলাম, এবং নাচলাম।

বাকিটা?

হ্যাঁ, তবে পরে। আমাদের দেখা হত; পরস্পরকে পছন্দ করলাম আমরা; আমি যখন বললাম—'তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে'—সে আমার মুখ দিয়ে আবার সেই কথাটা বলিয়ে নিল—আমার কথাটা যে ঠিক

সেটা যেন সে বাচাই করে নিতে চায়। ফলে আমার পথে সে কোন বাধার সৃষ্টি করে নি।

তুমি কি তাকে ভালবাসতে ?

হ্যাঁ ; কিছুটা। মেয়েটি বড় ভাল।

আর একজনকে।

সে তো তখন প্যারিসে। ছ'টি সপ্তাহ ধরে দিনগুলি আমাদের ভালোই কাটলো ; তারপর, পরম বন্ধুর মত আমরা ফিরে এলাম। কোন মহিলার ওপরে তোমার কোন অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও কেমন করে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া যায় তা কি তুমি বলতে পার ?

নিশ্চয় পারি।

কী করে ?

আমি তাকে বর্জন করি।

সুরু কর কেমন ক'রে ?

তার সঙ্গে দেখা করতে যাইনে।

সে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ?

তাহলে···আমি···আমি বাড়িতে নেই।

যদি সে আবার ফিরে আসে ?

আমি বলি আমি অসুস্থ।

সে যদি তোমাকে দেখতে চায় ?

তাহলে আমি তার সঙ্গে একটু নোংরামি করি।

সেটাকেও যদি সে হজম করে ফেলে ?

তখন আমি তার স্বামীর নামে বেনামা চিঠি ছেড়ে সাবধান ক'রে দিই। যেদিনটা তার আমার কাছে আসার কথা সেদিনটা তার গতিবিধি লক্ষ্য করার নির্দেশ দিই।

ওইটাই আসল কথা। কিন্তু কাউকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। মেয়েদের আমি পরিত্যাগ করতে পারিনে। আমি তাদের সংগ্রহ করি। কারও সঙ্গে আমি বছরে একবার দেখা করি, কারও সঙ্গে দশ মাসে একবার ; কারও-কারও সঙ্গে দিনে তিনবার ; আর কারও-কারও সঙ্গে বাইরে ডিনার খাওয়ার সময়। যাদের সঙ্গে আমার দিন ঠিক করা রয়েছে তাদের নিয়ে আমার কোন অসুবিধে নেই ; অসুবিধে হচ্ছে নতুন সংগ্রহদের নিয়ে।

তারপর ?

তারপর ওই ক্ষুদে সিভিল সার্ভেন্টটি রেগে কাই হয়ে গেল। তার অবশ্য দোষও নেই। তার স্বামী সারাটা দিনই প্রায় অফিসে কাটাতেন। বেচারা একেবারে বেকার। তাই হঠাৎ-হঠাৎ আমার বাড়ি আসার চেয়ে ভাল কাজ তার হাতে ছিল না। দু'বার সে আমাকে পায় নি।

শয়তান কোথাকার!

যা বলেছ। এই ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্তে আমি ওদের দিন ঠিক করে দিয়েছিলাম। সোমবার আর শনিবার দিলাম পুরনো বন্ধুটিকে; মঙ্গল, বৃহস্পতি আর রবিবার ঠিক করে দিলাম নতুনটিকে।

এইরকম পক্ষপাতিত্ব কেন?

বুদ্ধু কোথাকার। নতুনটির বয়স অনেক কম যে!

সপ্তাহে মাত্র দু'টি দিন তাহলে ছুটি ছিল তোমার!

ওই তো যথেষ্ট।

আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।

কিন্তু বিবেচনা কর, পৃথিবীর মধ্যে যাকে বলে সবচেয়ে হাস্তকর আর হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্তমানে তাই ঘটেছে। চার মাস ধরে পরিকল্পনাটি নিখুঁত-ভাবে কাজ করেছে। দু'জনের সঙ্গেই আমি শুয়েছি, সত্যিকারের সুখী হয়েছিলাম। হঠাৎ একটি সোমবারে অশনিপাত হল।

একটা বেশ দামী সিগারেট টানতে-টানতে আমার প্রথম প্রেমিকার জন্তে আমি অপেক্ষা করে বসেছিলাম। সময়টা তখন দুপুর একটা বেজে পনের। বসে-বসে আমি স্বপ্নের জাল বুনছিলাম; খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠেছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল নির্ধারিত সময় অতিক্রম করেছে। হঠাৎ অবাক হয়ে গেলাম আমি; কারণ, এসব বিষয়ে সে একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে; কিন্তু আমি ভাবলাম হয়ত আকস্মিক কোন কারণে সে সময়টা রাখতে পারে নি। যাই হোক, আধ ঘণ্টা কাটলো, তারপরে এক ঘণ্টা; তারপরে দেড় ঘণ্টা কেটে গেল। আমি নিশ্চিৎ হলাম হয়ত তার মাথা ধরেছে, অথবা কোন অপ্রত্যাশিত অতিথি এসে হাজির হয়েছেন। তাই সে আসতে পারে নি। এইভাবে অপেক্ষা করাটা সত্যিই বড় কষ্টকর···সম্পূর্ণ অর্থহীন···ভারি বিরক্তিকর; এই ধরনের প্রতীক্ষা স্নায়ুর ওপরে বেশী চাপ সৃষ্টি করে। অবশেষে, অবশ্যম্ভাবীর কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম; তারপরে কী করা উচিৎ বুঝতে না পেরে আমি তাকে দেখতে গেলাম।

দেখলাম সে একটা উপন্যাস পড়ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপারটা কী?

সে বেশ শান্তভাবে বলল—আমি যেতে পারি নি···আমাকে যেতে দেয় নি।

কেন দেয় নি?

ওঃ—মানে···ওই সব ব্যাপার।

কী সব ব্যাপার?

ওই একটি বিরক্তিকর অতিথি।

আমার মনে হল যে কোন কারণে আসল কারণটা সে আমাকে বলতে

রাজি নয়; আর এ ব্যাপারে তাকে মোটেই উত্তেজিত দেখা গেল না বলেই আমিও কোন অস্বস্তি বোধ করলাম না। পরের দিন অপর প্রেমিকার ওপর দিয়ে আমার ক্ষতিটা পুষিয়ে নেব এই কথাটাই ভেবে নিলাম আমি।

সেই জন্যে বৃহস্পতিবার···খুব উত্তেজিত হয়ে প্রেমিকার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে হল, তাকে আমি খুব ভালবাসি। সে যে কিছুটা আগে আসছে না কেন এই ভেবে অবাক হলাম। অধীরভাবে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম আমি। পনের মিনিট পেরোল, পেরিয়ে গেল আধ ঘণ্টার সীমানা; তারপরে বাজলো দুটো।···আর সহ্য করা কষ্টকর হয়ে উঠল আমার পক্ষে; ঘরের মধ্যেই আমি পায়চারি করতে লাগলাম: সিঁড়ির ওপরে তার পায়ের শব্দ হচ্ছে কি না তাই শোনার জন্যে আমি কান পেতে রইলাম।

বাজলো আড়াইটে! তারপরে তিনটে! টুপীটা মাথায় চাপিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম আমি। সে কী করছিল জান কি বন্ধু? নভেল পড়ছিল।

আতঙ্কিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কী বলত?

বেশ শান্তভাবেই সে বলল—যেতে পারলাম না কেন জান? যেতে দিল না আমাকে।

কে দিল না?

ওঃ···ওই সব ব্যাপার।

কিন্তু···ব্যাপারটা কী?

একটি বিরক্তিকর অতিথি এসে হাজির হল। কী ক'রে যাই?

অবশ্য আমি তখনই বুঝতে পারলাম যে ও সব জানে, কিন্তু তার মধ্যে কোনরকম মানসিক উদ্বেগের চিহ্নটুকু না দেখে আমার মনে হল নিশ্চয় কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। ও যে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করবে সেকথা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। ঘণ্টাখানেক ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তার সঙ্গে গল্প করলাম; এর মধ্যে তার বাচ্চা মেয়েটা অন্তত ডজনখানেক বার আমাদের ঘরে এল আর গেল। তারপরে বিরক্ত হয়ে আমি উঠে গেলাম। পরের দিন কী হল জান···

একই ঘটনা?

হ্যাঁ···তারপরের দিনও তাই। পুরো তিনটি সপ্তাহ ধরে ওই একই ব্যাপার ঘটে গেল। কেন ঘটছে, এর পেছনে আসল কারণটা কী তা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না; অবশ্য সন্দেহ একটা আমার হয়েছিল।

তারা দুজনেই জানতে পেরেছিল?

অবশ্যই। কিন্তু কী ক'রে? কারণটা খুঁজে বার করার আগে পর্যন্ত কী দুর্ভাবনাতেই না আমার কেটেছে ক'দিন?

শেষ পর্যন্ত তুমি বার করলে কেমন ক'রে ?

আমাদের চিঠি পড়ে। একই দিনে একই ভাষায় তারা আমাকে বর্জন করল।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম। মেয়েদের দেহে যে অনেক পিন থাকে তা নিশ্চয় তুমি জান। হেয়ার পিনের ব্যাপারটা আমি জানি। ওদের আমি বড় অবিশ্বাস করি ; সব সময় খুঁজে বেড়াই কোথাও ওটা পড়ে রয়েছে কি না। কিন্তু অন্ত পিনগুলি বড়ই বিশ্বাসঘাতক—ওই হতচ্ছাড়া কালো কালো মাথার পিনগুলি—আমাদের চোখে দেখতে সবাই প্রায় একই রকমের —মূর্খ আমরা—কিন্তু তুমি যে স্বচ্ছন্দে ঘোড়া আর কুকুরের পার্থক্যটা বলে দিতে পার—ওরা তার চেয়েও স্বচ্ছন্দে ওই জাতীয় দুটি পিনের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় তা বলে দিতে পারে।

সম্ভবত একদিন আমার ওই ক্ষুদে আমলাতান্ত্রিক মহিলাটি আমার আয়নার ধারে তার ওই তুচ্ছ পিনটি ফেলে গিয়েছিল। আমার প্রথম প্রেমিকা সেটি দেখে বুঝতে পেরেছিল যে ওটি অন্ত পিন, এই দেখে বিনা বাক্যব্যয়ে সে সেই পিনটি তুলে নিয়ে নিজের পিনটি—আকৃতির দিক থেকে দুটি পৃথক ছিল—একই জায়গায় রেখে গেল।

পরের দিন আমার আমলাতান্ত্রিক প্রেমিকা তার সম্পত্তি ফিরিয়ে আনতে গিয়েই দেখল তার সম্পত্তিটি হস্তান্তরিত হয়েছে ; তার জায়গায় আর এক জনের সম্পত্তি পড়ে রয়েছে। তখন তার সন্দেহ হল। সেদিন সে তার দুটি পিন খুলে এড়োএড়ি করে ফেলে রেখে গেল। আমার প্রথম প্রেমিকা এই টেলিগ্রাফিক ইঙ্গিতের উত্তর দিল তার তিনটি কালো-মাথার পিন দিয়ে—একটার ওপরে আর একটা চাপিয়ে সেইখানে ফেলে গেল সে।

সুরু হওয়ার পর থেকে সমান গতিতে এই খেলা কিছুদিন ধরে চলল ; কেউ কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করল না, শুধু দু'জনেই দু'জনের ওপরে লক্ষ্য রাখতে লাগল। তারপরে সম্ভবত আমার প্রথম প্রেমিকা—সেই কিছুটা দুঃসাহসিনী—পিনের সঙ্গে নিজের ঠিকানা লেখা একটা ছোট কাগজ মুড়ে রেখে গেল একদিন।

তারপরেই তাদের পত্রালাপ সুরু হল। আমার কপাল পুড়লো। বুঝতেই পারছ, ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা করাটাও তাদের কাছে বেশ সহজ ছিল না। এসব ব্যাপারে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ততটা সতর্ক হয়েই তারা চলছিল। হঠাৎ আমার প্রথম প্রেমিকা বেশ দুঃসাহসের সঙ্গেই দ্বিতীয় প্রেমিকার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে বসল। তাদের নিজেদের মধ্যে কী কথা হল তা অবশ্য আমি জানিনে। আমি যেটুকু জানি তা হচ্ছে এই যে আমি তাদের কাছে বেশ একটা মজার

খেলায় পরিণত হয়েছিলাম।

এই কি সব?

হ্যাঁ, এই সব।

তাদের সঙ্গে আর তুমি দেখা কর না?

নিশ্চয় করি। তবে বন্ধুর মত। পাকাপাকিভাবে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় নি।

এবং তাদের মধ্যেও আবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে?

আরে, হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

বটে, বটে! এরপরেও কিছু মাথায় ঢুকছে না তোমার?

না। কী বলত?

গবেট কোথাকার! আরে ওই জন্যেই তো তারা সেফটি-পিন-রেখে গিয়েছিল।

ডুচো

[Duchox]

ক্লাব ঘরটাকে এতটা উত্তপ্ত করা হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল যেন আগুন ছুটছে। ক্লাবের প্রধান সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ব্যারণ মর্দিয়েঁ তাঁর কার ওভারকোটের বোতামগুলি খুলে দিলেন। কিন্তু বাইরে বেরোনোর সঙ্গে-সঙ্গে এমন কড়া শীত তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে তিনি ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। তাছাড়া, খেলায় টাকা হেরেছিলেন সেদিন; আর বেশ কিছুদিন ধরে অজীর্ণতে ভুগছিলেন; ফলে ইচ্ছেমত খেতে তিনি পারতেন না।

বাড়ির কাছাকাছি এসে আর একটা চিন্তা তাঁকে ক্লিষ্ট করে তুলল। তাঁর সেই বিরাট নির্জন ঘর; তাঁর সেই বিরাট প্রাচীন শয্যা—যেটির কথা ভাবলেই মৃত্যুশয্যা বলে মনে হয়—এদের কথা মনে হতেই তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। পাশের ঘরে চাকর ঘুমোচ্ছে—তাঁর প্রসাধন-গৃহ স্টোভের ওপর জল ফোটার শব্দ হচ্ছে। বাড়ির সেই নিরানন্দ পরিবেশের কথা মনে হতেই তাঁর দেহের মধ্যে যে শীতার্ত শিহরণ বয়ে গেল বাইরের শীতের চেয়েও সেটি অনেক বেশী নিষ্করুণ।

কয়েক বছর ধরেই নিঃসঙ্গতার একটা পাষাণ-ভার তাঁর বুকের ওপরে চেপে বসেছে। কিছু-কিছু অবিবাহিত বৃদ্ধদের এই রকম নিঃসঙ্গতার পাষাণ-ভারে

জর্জরিত হতে হয়। এমন একটা সময় ছিল যখন তিনি মনের জোরেই দিন-গুলি আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারতেন। এখন তিনি বৃদ্ধ। কোন কিছু করতেই আর তার ভাল লাগে না। ব্যায়াম তাঁকে ক্লান্ত করে তুলত। বেশী খাওয়া-দাওয়া অসুস্থ করত; এমন কি, আগে যে মেয়েদের নিয়ে তিনি এত স্ফূর্তি করতেন সেই মেয়েদের-ও আজকাল আর তাঁর ভাল লাগে না।

সেই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন। একই রকম সান্ধ্য মজলিস, একই ক্লাব, একই বন্ধুবান্ধব, একই রকম আলোচনা, সেই তাস খেলা, সেই হারজিৎ, এমন কি একই মেয়েদের নিয়ে একই রকমের কুৎসা প্রচার—বিরক্তিকর, বিরক্তিকর। মাঝে-মাঝে তাঁর মনে হোত এবারে তিনি আত্মহত্যা করবেন। এইরকম একঘেয়ে বিবর্ণ জীবন আর যেন তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। কী জানি কেন তাঁর মনে হচ্ছিল এবারে একটু শান্তি চাই, চাই বিশ্রাম, আর একটু আরাম।

তাই বলে অবশ্য বিয়ে করার কথা তিনি চিন্তা করেন নি; কারণ বিয়ে করার অর্থকে তিনি দাসত্ব বলে মনে করতেন। বিয়ে করার অর্থ ই হচ্ছে নারী আর পুরুষের একান্ত সহবাস; আর এ দুটি নর-নারী বিশেষ পরিচিতির ফলে বৈচিত্র্যহীন, যারা পরস্পরকে এমনভাবে চেনে যে একজনের প্রতিটি ভঙ্গী অপরের স্পষ্ট। বাস্তবের এই রুক্ষ মাদকতাহীন দৈনন্দিন জীবনের ব্যভিচারের মুখোমুখী দাঁড়ানোর সাহস ছিল না তাঁর। ব্যারণ মনে করতেন, নারীরা ততক্ষণই কামনীয়া যতক্ষণ তারা অল্প বা অপরিচিতির অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে, যতক্ষণ তাদের ধরা-ছোঁওয়া যায় না—যতক্ষণ তাদের মনের অতলে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সেই জন্যেই তিনি এমন একটি সংসার কামনা করেছিলেন যেখানে সাংসারিক জীবনের অত্যাচার নেই; যেখানে তিনি দিনের কিছুটা অংশ কাটাতে পারেন। নিজের ছেলের স্মৃতিটা আবার তাঁকে অস্থির করে তুলল।

গত একটি বছর ধরে এই ছেলের কথা ক্রমাগত তিনি ভেবেছেন; তার সঙ্গে দেখা করার, পরিচিত হওয়ার বাসনা দিন-দিন তাঁর বেড়েছে, আর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ার ফলে বেশ কষ্টও পেয়েছেন তিনি। এই ঘটনাটা ঘটেছিল তাঁর যৌবনে। তখন তাঁর মনটা রোমান্সে ভরপুর ছিল। ছেলেটিকে দক্ষিণ ফ্রান্সে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। মার্সেলিস-য়েই মানুষ হয়েছিল সে। কিন্তু তার বাবার নাম সে জানত না। শৈশবে, পাঠ্যাবস্থায় এবং তারপরেও তার ভরণপোষণের সমস্ত খরচ তার বাবাই দিতেন। তারই ফলে ছেলেটির বিয়ে ভালই হয়েছিল। গোপন রহস্য ফাঁস না করে একজন বিশ্বাসী আইনজ্ঞের মারফতে এই কাজটি ব্যারণ করেছিলেন।

ব্যারণ শুধু এইটুকুই জানতেন যে মার্সেলিস-এর কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় তাঁর ছেলে থাকে। ছেলেটি মোটামুটি বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত; আর

সে বিয়ে করেছে একটি আর্কিটেক্ট এবং সার্ভেয়ার-এর মেয়েকে ; শ্বশুরের মৃত্যুর পরে তাঁরই ব্যবসাটির মালিক হয়েছে সে। ছেলেটি যে বেশ টাকা রোজগার করে সে সংবাদও তাঁর কানে এসেছে।

নিজের পরিচয় ফাঁস না করে তিনি সেই অপরিচিত ছেলের বাড়ি যাবেন না-ই বা কেন ? তার সঙ্গে আলাপ করে তিনি দেখতে চান জীবনের বাকি ক'টা দিন ছেলের সঙ্গে কাটানো যায় কি না। ছেলেটির জন্যে তিনি অকৃপণ ভাবেই খরচ করেছেন। ছেলেও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে-সব গ্রহণ করেছে। এই সব ভেবেই তাঁর মনে হল ছেলেটির অযৌক্তিক কোন দম্ভ নেই। এই চিন্তা করেই দক্ষিণে যাওয়ার আকাঙ্খা তাঁর হয়েছিল ; এবং দিন-দিন সে-আকাঙ্খা বাড়ছিল তাঁর। মনের ভেতরে আরও একটা চিন্তা খেলা করছিল তাঁর। সমুদ্রোপকূলে একটি মিষ্টি বাড়ির কথা ভাবছিলেন তিনি। সেখানে রয়েছে তাঁর সুন্দরী যুবতী পুত্রবধূ। নাতি-নাতনী আর ছেলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। একান্ত আপনার জনের কাছে থাকার ফলে তাঁর সেই অল্প-পরিসর অথচ আনন্দের দিনগুলির কথা মনে পড়ে যাবে। তাঁর একমাত্র অনুশোচনা হচ্ছে তাঁর ভূতপূর্ব বদান্যতা—এই বদান্যতাই ছেলেকে মানুষ করার পথে সাহায্য করেছিল—আর তারই ফলে উপকারকারীর মূর্তিতে তিনি আর তাদের কাছে হাজির হতে পারবেন না।

এই সব কথা চিন্তা করতে-করতে মাথার ওপরে কার কোটটা টেনে দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করতে দেরী হল না তাঁর। চলন্ত একটা গাড়ি থামিয়ে তার ওপের চড়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। ঘুমন্ত চাকরকে ডেকে দরজা খুলিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন—লুই, কাল সন্ধ্যায় আমরা মার্সেলিস যাচ্ছি। সম্ভবত, দিন পনের সেখানে আমরা থাকব। খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে ফেল।

পীত বর্ণের সমতল আর পাহাড়ঘেরা সূর্যকরোজ্জ্বল গ্রামের মধ্যে দিয়ে রোন নদীর বালিভরা তীরের পাশ দিয়ে ছুটে চলল ট্রেন। একটি রাত্রি গাড়ীতে কাটিয়ে ব্যারণ বিষণ্ণভাবে আয়নাতে নিজের চেহারা দেখছিলেন। প্যারিসের আবছায়া আলোতে এতদিন যা তাঁর চোখে পড়ে নি, দক্ষিণের পরিচ্ছন্ন আলোতে মুখের ওপরে বার্দ্ধক্যের সেই বলিরেখাগুলি তাঁর চোখে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল। নিজের মনেই তিনি বিড়-বিড় করে বললেন—হায় ভগবান, এ যে দেখছি শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছি।

মার্সেলিস-এ নেমে একটা গাড়ী ভাড়া করলেন তিনি ; তারপরে এক-সারি গাছের একেবারে শেষ প্রান্তে রোদে কাঠফাটা একটি গ্রাম্য বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। গাছের সারির ভেতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বেশ খুশি হয়েই তিনি বললেন—না, জায়গাটা সত্যিই বড় সুন্দর।

হাঠৎ পাঁচ ছ' বছরের একটি বাচ্চা ঝোপের ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে

এসে আগন্তুকের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

ব্যারণ এগিয়ে গিয়ে বললেন—সুপ্রভাত খোকা।

খোকা কোন উত্তর দিল না।

চুমু খাওয়ার জন্যে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিতেই তার মুখ দিয়ে রসুনের এমন একটা কড়া গন্ধ বেরিয়ে এল যে তিনি তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন—এ নিশ্চয় মালির ছেলে।

এই বলেই তিনি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

দরজার সামনে সারি-সারি কাচা সার্ট, প্যান্ট, জামা, তোয়ালে শুকোচ্ছে, জানালার ওপরে ঝুলছে মোজার দঙ্গল। দেখলেই মনে হবে কষাই-এর দোকানে শিকে বেঁধা মাংসের টুকরো ঝুলছে।

একটি চাকরানী তাঁর ডাক শুনে বেরিয়ে এল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মঁসিয়ে তুচো বাড়িতে রয়েছেন?

চাকরানী বলল—বৈঠকখানায় বসে তিনি নক্সা আঁকছেন।

তাঁকে বল মঁসিয়ে মার্সি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল: তাই বুঝি? আসুন, আসুন। মঁসিয়ে তুচো, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বিরাট একটা ঘরে ঢুকলেন ব্যারণ। জানালার শার্সিগুলি অর্দ্ধেকটা বন্ধ থাকার ফলে ঘরের ভেতরে বিশেষ আলো পড়ে নি। তাঁর কেমন যেন মনে হল ঘরের ভেতরে নোংরা জমে রয়েছে।

একটা টেবিলের ওপরে একগাদা কাগজপত্র ছড়ানো ছিল। সেই টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একজন বেঁটেখাটো টেকো লোক কাজ করছিল। কাজ বন্ধ করে সে এগিয়ে এল। তার বোতাম খোলা ওয়েস্ট কোট, ঢলঢলে ট্রাউজার, জামার হাতা দুটো গোটানো। এই সব দেখে মনে হবে ঘরটা বেশ গরম। তার কাদা মাখানো জুতো দেখে মনে হবে সম্প্রতি সে-অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছিল।

সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—কার সঙ্গে আমি কথা বলছি···

তার স্বরের মধ্যে দক্ষিণ ফ্রান্সের উচ্চারণী ঢঙটা প্রকট হয়ে উঠেছে।

আমার নাম মঁসিয়ে মার্সি। এই অঞ্চলে বাড়ির জমি নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি কিছুটা আলোচনা করতে এসেছি।

তাই বুঝি! ভাল, ভাল।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে বসে তার স্ত্রী সেলাই করছিল। তার দিকে তাকিয়ে তুচো বলল—জোসেফিন, একটা চেয়ার খালি ক'রে দাও।

ব্যারণ তাকিয়ে দেখলেন [illegible] জোসেফিন যুবতী—বয়স বছর পঁচিশের কাছাকাছি; কিন্তু গ্রাম্য নারীর মত এরই মধ্যে সে যেন বুড়িয়ে গিয়েছে। দেখেই মনে হয় শরীরের [illegible] দান যত্ন নেয় না; পরিষ্কার করে না তার

দেহ। সত্যি কথা বলতে কি টয়লেট প্রভৃতি শরীর চর্চার যে সব অসংখ্য প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহার করে নারীরা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাদের যৌবনকে ধ'রে রাখে সেগুলির কোনটিই তার অঙ্গে পড়ে নি। তার কাঁধের ওপরে একটা তোয়ালে ছিল; তার সেই ঘন কালো চুলগুলি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কপালের চারপাশে। দেখে মনে হল সেই চুলগুলির ওপরে কোনদিন চিরুণী পড়ে নি। তার সেই শক্ত হাত দুটি দিয়ে চেয়ারের ওপর থেকে সে একটা বাচ্চার জামা, একটা ছুরি, একটা লোহার তার, একটা শূন্য ফুল রাখার পাত্র, আর চিটচিটে একটা প্লেট তুলে নিয়ে সে আগন্তুককে তাতে বসতে বলল।

বসলেন ব্যারণ; তারপরে লক্ষ্য করলেন ছুচো যে টেবিলের ওপরে কাজ করছিল সেই টেবিলের ওপরটাও যথারীতি অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে—তার পড়ার বই ছাড়াও, সদ্যকাটা লেটুসের ডাঁটা, একটা জল ঢালার পাত্র, একটা হেয়ার ব্রাশ, একটা তোয়ালে, একটা রিভলভার, আর সেই সঙ্গে কয়েকটা শূন্য চায়ের কাপ পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপরে।

আগন্তুক টেবিলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন দেখে ছুচো একটু হেসে বলল—ঘরটা বড় অপরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য দুঃখিত আমি। ছেলেদের জ্বালায় কিছু পরিষ্কার রাখার উপায় রয়েছে?

এই বলেই সে চেয়ার টেনে নিয়ে আগন্তুকের সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্তা বলার চেষ্টা করল; মার্সেলিস-এর আশেপাশে আপনি একটু জায়গা চান?

যদিও ব্যারণ তার কাছে থেকে একটু দূরেই বসেছিলেন, তবু ছুচোর মুখ থেকে কড়া রসুনের একটা গন্ধ ভেসে এল তাঁর নাকে। ফুলের গন্ধ শোঁকার মত দক্ষিণ ফ্রান্সের অধিবাসীরা রসুনের গন্ধ শুঁকতে ভালবাসে।

ব্যারণ জিজ্ঞাসা করলেন—গাছতলায় যাকে দেখলাম সে কি আপনার ছেলে?

হ্যাঁ। মেজ ছেলে।

তাহলে আপনার ছেলে হচ্ছে দুটি?

তিনটি স্যর—বছরে একটি করে—কথাটা বলতে গিয়ে মনে হল গর্বে তার বুক ভরে উঠেছে।

পূর্ব কথার জের টানলেন ব্যারণ—হ্যাঁ, এই কাছাকাছি একটু জায়গা খুঁজছিলাম—মানে একটু নির্জন সমুদ্রের উপকূলে…

ছুচোর মুখে কথার ফুলঝুরি ফুটে বেরোল। সে বলল তার সন্ধানে দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশটি প্লট রয়েছে ঠিক ওই রকম। যার ঠিক যেরকমটি পছন্দ সেইরকম জমি সন্ধানে রয়েছে। এই সব আলোচনা করার সময় পরিপূর্ণ আত্মপ্রসাদের সঙ্গে সে তার টেকো মাথাটিকে বারবার দোলাতে লাগল।

সেই ক্ষুদ্র চেহারার, গৌরবর্ণা, কিছুটা বিষণ্ণ মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল

তাঁর। সে তাঁকে ভাবের আতিশয্যে "প্রিয়তম," "প্রিয়তম" বলে সম্বোধন করত। সেই মধুর স্মৃতিটা তাঁকে উন্মাদ করে তুলত। তিনটি মাস ধরে সে তাঁকে কী ভালই না বেসেছিল। তারপরেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। তার স্বামী কোন একটি কলোনীর গভর্ণর ছিলেন। তাঁরই অনুপস্থিতিতে সে গর্ভবতী হয়; ভয় আর আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে মেয়েটি আত্মগোপন করে। সেই সময়েই এই ছেলেটির জন্ম হয়। জন্মের পরে ব্যারণ এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ছেলেটিকে দূরে সরিয়ে দেন। সেই থেকে তাঁদের কেউ-ই আর ছেলেটিকে দেখেন নি।

তারপরে মেয়েটি কলোনীতে তার স্বামীর কাছে ফিরে যায়। বছর তিনেক পরে সেইখানে ক্ষয়রোগে সে মারা যায়। তাঁর পাশে বর্তমানে যে বসে রয়েছে এ তাঁদের সেই ছেলে। কাংসকণ্ঠধ্বনি ফুটিয়ে সে বলল—জায়গার কথা যদি বলেন স্যার···তাহলে এমন সুবর্ণ সুযোগ···

দখিণা বাতাসে মৃদুগুঞ্জনের মত আর একটি মিষ্টি সুর ব্যারণের কানে ভেসে এল—প্রিয়তম—আমরা কোনদিনই ছাড়াছাড়ি হব না।

সেই শান্ত, নীল, আবেগমাখা দুটি চোখের দৃষ্টি আবার তাঁর মনের দরজায় উঁকি দিল। সেই সঙ্গে সামনেবসা সেই ছেলেটির দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। এর চোখ দুটিও গোলাকার, নীল; কিন্তু শূন্য তার চাহনি। তার চেহারা দেখলেই হাসি পায়। মায়ের মতই তার চেহারা, তবু যেন কত তফাৎ—তার চাল-চলন, হাব-ভাব, উচ্চারণ সবই তার মায়ের মত; হনুমানের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য যেটুকু—ছেলেটির সঙ্গে তার মায়ের সাদৃশ্যও তার চেয়ে বেশী নয়। তবু এই ছেলে তারই রক্ত দিয়ে গড়া, তার অনেক ছোটখাটো অভ্যাস এই ছেলেটির মধ্যে সংক্রামিত, কিন্তু সেগুলি সবই বিকৃতির মধ্যে দিয়ে এর মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে। যতই সময় যাচ্ছে ততই দু'জনের সাদৃশ্যটা ব্যারণের কাছে প্রকট হতে লাগল; একটা দুঃস্বপ্নের কবলে পড়লে মানুষ যেমন অস্থির হয়ে ওঠে, তিনিও সেইরকম মনে-মনে অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন, তারপরে কোনরকমে বিড়-বিড় করার ভঙ্গিতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—জমি কখন আমরা দেখতে পারি?

ইচ্ছে হলে, আগামী কালই।

তাই হবে। কখন?

বেলা একটার সময়।

ঠিক আছে।

যে ছেলেটিকে তিনি রাস্তায় দেখেছিলেন সে ঘরের মধ্যে ঢুকে কাঁদতে-কাঁদতে বলল—বাবা!

কেউ তার দিকে নজর দিল না।

সেখান থেকে পালিয়ে আসার একটা অদম্য উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে

মর্দিয়ে উঠে পড়লেন। 'বাবা' শব্দটি বুলেটের মত তাঁকে গিয়ে আঘাত করল। সেই রসুনের গন্ধ মুখে ছড়ানো 'বাবা'—সেই দক্ষিণ ফ্রান্সের 'বাবা' যেন তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। হায়রে, অতীতে তাঁর প্রিয়তমার গা দিয়ে যে সুগন্ধ বেরোত তা কত মিষ্টি!

ছুঁচো পিছু-পিছু বাড়ির বাইরে এগিয়ে এলে ব্যারণ জিজ্ঞাসা করলেন—এইটিই আপনার বাড়ি?

হ্যাঁ, স্যার। সম্প্রতি এইটাই আমি কিনেছি। এর জন্যে আমি গর্বিত। আমি যে সৌভাগ্যবান সেকথা আমি অস্বীকার করব না। কারও কাছে আমার ঋণ নেই। নিজের চেষ্টাতেই আমি বড় হয়েছি—আমি ঋণী নিজের কাছেই।

দরজার সামনে সেই বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে আবার চীৎকার করল—বাবা।

তাঁর মনে হল এ স্বরটা যেন অনেক দূর পথ অতিক্রম করে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। মর্দিয়েঁ ভয়ে শিউরে উঠলেন; একটা আতঙ্ক তাঁকে প্রায় গ্রাস করে ফেলল। ভয়ঙ্কর কোন বিপদ থেকে মানুষ যেভাবে পালিয়ে যায় তিনিও সেই রকম পালিয়ে এলেন। তিনি ভাবলেন—আমি কে ও নিশ্চয় ধরে ফেলবে। তারপরেই ও আমাকে জড়িয়ে ধরে 'বাবা' বলে ডেকে ওই রসুনের গন্ধে ভরা মুখে তাঁকে চুমু খাবে।

কাল আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে স্যার!

কাল, বেলা একটার সময়।

সাদা রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ী ঘড়ঘড় ক'রে ছুটতে সুরু করল।

তিনি চীৎকার ক'রে বললেন—ড্রাইভার, সোজা স্টেশনে চল।

দুটি স্বর তাঁর পিছু-পিছু ছুটতে লাগল, একটি অনেকদিন আগে শোনা মিষ্টি স্বর—প্রিয়তম। আর একটি বিশ্রী কাংসকণ্ঠের ধ্বনি—বাবা! মনে হল পলায়মান চোরকে ধরার জন্যে যেমন কেউ চেঁচিয়ে বলে—ওকে থামাও—'বাবা' শব্দটা যেন সেই রকম।

পরের দিন সন্ধ্যায় যথারীতি ক্লাবে হাজির হ'তেই কাউণ্ট দ্য এড্রেলিস তাঁকে বললেন—তিনদিন তোমাকে আমরা দেখিঁ নি। তুমি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?

হ্যাঁ, শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। মাঝে-মাঝে আমার মাথায় যন্ত্রণা হয়।

রাঁদিভু

[The rendezvous]

মেয়েটির মাথায় ছিল টুপী; পায়ে ছিল কোট। কালো ঘোমটাটা তার নাক পর্যন্ত টানা। চার চাকার গাড়ীতে ঢোকামাত্র আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়ার জন্যে আর একটা কালো ঘোমটা সে পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। ছাতার বাঁট দিয়ে সে তার জুতোর ওপরে ঠুকলো; তারপরে নিজের ঘরে বসে ভাবতে লাগল প্রমোদ বিহারে সে এবার বেরোবে কি না।

কিন্তু তবু স্টক্এক্সচেঞ্জে তার স্বামী বেরিয়ে গেল [তার স্বামী ছিল স্টক ব্রোকার] বিগত দুটি বছরের মধ্যে কতদিনই না সে তার সুন্দর চেহারার প্রেমিক ভাইকাউণ্ট দ্য মার্টিলেটের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে তার বাড়িতে গিয়েছে! তার পেছনে যে দেওয়াল-ঘড়ি ছিল জোরে টিক্‌টিক্ ক'রে সেটা সময়টাকে এগিয়ে দিচ্ছিল। জানালার মাঝখানে গোলাপ কাঠের একটা লেখার টেবিল ছিল; তার ওপরে খোলা অবস্থায় পড়েছিল আধপড়া একটা বই। কুলুঙ্গিতে ছোট সুন্দর দুটো ফুল রাখার জায়গা ছিল: তার ওপরে দু'গোছা ভায়লেট ফুল ভাসছিল। সেইখান থেকে তীব্র গন্ধ ভেসে আসছিল: সঙ্গে মিশে ছিল ভারবেনার মিষ্টি গন্ধ।

ঘড়িতে তিনটে বাজার শব্দ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠল, ঘড়ির দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল সে; ভাবল—'সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে—এবারে সে রেগে যাবে।' তারপর সে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে চাকরকে ডেকে মিথ্যে কথা বলল—আমার ফিরতে অন্তত ঘণ্টাখানেক দেরী হবে।

মে মাসের শেষ। শেষ বিদায়ের আগে বসন্ত প্যারিসকে ফলে-ফুলে রঙিন ক'রে তুলেছে।

মাদাম হর্গা রাস্তায় বেরিয়ে ডানদিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। গাড়ী ধরার জন্যে দ্য প্রোভেনস্-এর পথ ধরে এগোনোর ইচ্ছে ছিল তার; কিন্তু বসন্তের আমেজ হঠাৎ তাকে গ্রাস করে ফেলল। কি জানি কেন পথ পরিবর্তন করল মাদাম; ট্রিনিটি পার্কে মেলা দেখার জন্য রু দ্য লা চোসি দ্য আর্তি'র পথ ধরল।

মানে-মানেই বলল মাদাম—'মিনিট দশেক সে অপেক্ষা করতে পারে।' প্রেমিককে বসিয়ে রাখার কথা মনে হতেই সে বেশ খুশি হয়ে উঠল। জনতার ভেতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে মানস চোখে দেখতে পেল—ভাইকাউণ্ট

ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে ; ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখছে বারবার, জানালার শার্সি খুলছে—দরজার ওপরে কান পেতে পায়ের শব্দ শুনছে, বসছে, উঠছে, সিগারেট খেতে সে তাকে নিষেধ করেছিল বলে সে সিগারেট ধরাতে সাহস করছে না—ধরাতে না পেয়ে মরীয়া হয়ে বারবার সে তার সিগারেট কেস-এর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাচ্ছে।

ধীরে-ধীরে সে এগোতে লাগল ; দোকান, মানুষ, আর এদিক-ওদিকে চাইতে-চাইতে তার গতি ক্রমশ শ্লথ হ'তে লাগল। প্রেমিকের দরবারে হাজিরা দেওয়ার ইচ্ছা তার এতটা কমে গেল যে সে প্রতিটি দোকানের শো-কেসের কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করতে লাগল। রাস্তার শেষে গির্জা। তার সামনে যে সবুজ পার্ক রয়েছে সেটি তাকে আকর্ষণ করল। রাস্তা পেরিয়ে সে শিশুদের বাগানে এসে ঢুকল। এখানে শিশুরা খেলা করে। সেই-খানে চকচকে পোশাক পরে নার্সরা সব শিশুদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে নিজেকে সে মিশিয়ে দিল। তারপরে একটা চেয়ারে বসে ঘড়ির দিকে তাকালো।

আধ ঘন্টা বাজার শব্দ হল। শব্দটা কানে ঢোকামাত্র তার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। ইতিমধ্যে তার আধ ঘন্টা সময় নষ্ট হয়েছে ; আরও একটু এদিক-ওদিক ঘুরে প্রেমিকটি বাড়ি পৌঁছতে সাকুল্যে এক ঘন্টার মত দেরী হ'তে পারে তার। প্রমোদ-বিহার থেকে এক ঘন্টা চুরি ! তাহলে চাল্লশ মিনিটও তার থাকা হবে না ; তারপরেই সব শেষ।

হায় ভগবান ! যেতে তার একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না। ডেনটিস্টের দোকানে যাওয়া এমনিতেই বিরক্তিকর : এই নিয়মিত দেখা করার ব্যাপারটা তাঁর স্মৃতিকে বিব্রত করে তুলল ; গত দুটি বছর ধরে নিয়ম ক'রে প্রতিটি সপ্তাহে একবার ক'রে—আর এখনই আর একবার নিয়মগতভাবে তাদের দেখাশুনা হবে এই কথা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। অবশ্য ডেনটিস্টের দোকানে যাওয়ার মত কষ্টকর নয় ; তবু, এই সাক্ষাৎকার এতই একঘেয়ে, এতই দীর্ঘ, এতই অস্বস্তিকর আর অপ্রীতিকর যে মনে হয় অপারেশনও বুঝি তার চেয়ে অনেক ভাল। তবু সে এগোতে লাগল, কখনও কখনও ধীর পায়ে, কখনও কখনও বসে, কখনও বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আজকের এই দেখা না হলে কত খুশিই না সে হোত। কিন্তু গত মাসে বেচারা ভাইকাউন্টের সঙ্গে সে দু'বার ছলনা করেছিল। এত তাড়াতাড়ি তাকে আর একবার ঠকাতে মাদামের সাহস হল না। কেন সে ফিরে এল ? হ্যাঁ, কেন ? কারণ, এটা তার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আর বেচারা ভাইকাউন্ট যদি জিজ্ঞাসা করে তার এই মত পরিবর্তনের কারণটা কী তাহলে মাদাম তার কোন জুৎসই উত্তর দিতে পারবে না। মাদাম এই ব্যাপারটা সুরু করল কেন ? কেন ? সেকথা তার আর মনে নেই। তাকে সে

ভালবাসে? সম্ভবত! খুব বেশী নয়—ওই একটু আর কি। ভাইকাউন্ট-এর ব্যবহারটি বড় সুন্দর। কিছুতেই সে খুশি হয় না, বেশ সম্ভ্রান্ত তার রুচি, আর সাহসী। তাকে একবার দেখেই ব'লে দেওয়া যায় পৃথিবীর মধ্যে নারীদের প্রেমিক হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র তারই রয়েছে। ভাব আদান-প্রদান চলেছিল তিন মাস ধরে—নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার আসার এইটুকু সময়ই যথেষ্ট। তারপরেই মাদাম আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু প্রথম মিলনের দিন—প্রথমই বা বলি কেন—পরের মিলনগুলিতেও—কি দুরু-দুরু বুকে, কি লজ্জানত মুখে, কি সুন্দর সঙ্কোচের ভেতর দিয়ে মাদাম নিজেকে ধরা দিয়েছিল রু মিরোমেসনিলের অবিবাহিত ফ্ল্যাটে। তার হৃদয়! এই রকমভাবে প্রলুব্ধা হয়ে, পরাজিতা হয়ে সে যখন প্রথম দিন সেই দুঃস্বপ্নের ঘরের দরজার মধ্যে প্রবেশ করল তখন সে কী ভেবেছিল? সত্যিই তা সে জানত না? সে কথা সে ভুলে গিয়েছে। কোন কাজ, কোন দিন, কোন জিনিস মানুষের মনে থাকে; কিন্তু দু'বছর আগে মানুষের মনে যে ভাবালুতা জাগে সে কি কারও মনে থাকে না, থাকার কথা? স্মৃতির বুকে ভাস্বর হয়ে থাকার মত দ্যুতি তার নেই। বাকি সবই তার মনে রয়েছে, বিহার, মিলন—সব। এসব ব্যাপার-গুলি তার কাছে নকারজনক ব'লে মনে হয়।

হায় ভগবান! সঙ্কেতকুঞ্জে যাওয়ার জন্যে যে সব চার-চাকার গাড়ী এই দু'বছরে সে ভাড়া করেছে তাদের কথা একবার ভেবে দেখ। আর এই সব গাড়ী সাধারণ গাড়ী নয়। গাড়োয়ানরা নিশ্চয় আন্দাজ করেছে কোথায় সে যায়। গাড়োয়ানরা যে দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকত সেই দৃষ্টি তার চোখ এড়ায় নি; আর প্যারিস শহরের এই জাতীয় গাড়োয়ানরা কী ভয়ানক। এদের স্মৃতিশক্তি কত প্রখর! আদালতে ফৌজদারী মামলায় আসামীদের সনাক্ত করতে এরা ওস্তাদ। কয়েক বছর আগে গভীর রাত্রিতে কোন রাস্তা বা স্টেশন থেকে একবার যাকে ওরা বিশেষ কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে তাদের চিনে ফেলতে ওদের দেরী হয় না। একবারমাত্র দেখেই ওরা কোন-রকম চিন্তা না করেই বলে দিতে পারে—এই মানুষটিকে আমি গত বছর দশই জুলাই রাত্রি পৌনে একটার সময় রু ড মার্টারস্ থেকে তুলে নিয়ে লায়নস্ স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলাম। প্রেমবিহারে যাওয়ার সময় নারীর সমস্ত ঝুঁকি আর মর্যাদা যে রাস্তার প্রথম গাড়োয়ানের হাতে যে তোমাকে তুলে দিতে হয় এ কথা ভাবতেই যে-কোন নারীর বুক ধড়ফড় ক'রে ওঠে। গত দুটি বছর সপ্তাহে একবার করে সে অন্তত একশ বা একশ কুড়িবার ওই জাতীয় গাড়ী ভাড়া করেছে। বিপদের মুহূর্তে সেই সব গাড়োয়ানরাই হয়ত তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে।

গাড়ীতে উঠেই মাদাম তার পকেট থেকে আর একটা ঘোমটা বার করে' মাথার ওপরে চাপিয়ে দিত, ঝুলিয়ে দিত চোখের ওপরে। এটাতে

তার মুখ ঢাকা পড়ত সত্যি কথা; কিন্তু তার হাত-পা, পোশাক-আসাক —এগুলি তো ঢাকা পড়ত না। এসব জিনিস কি তাদের চোখে পড়ে না? তারা যে আগেই লক্ষ্য করে নি সে কথাই বা কে বললে? প্রেমিকের বাড়িতে কী যন্ত্রণাই না সে ভোগ করেছে। তার মনে হল প্রতিটি মানুষ—তার পথের ধারে যারা পড়ে—তাদের সবাইকে সে চেনে। ফলে গাড়ী থামতে না থামতেই সে বাইরে লাফিয়ে পড়ে গিরগির করে ছোটে। ভাইকাউণ্টের গেটে একজন দরোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে সব সময়! সেই লোকটা তার নাম ধাম গোত্র, তার স্বামীর নাম, পেশা—নিশ্চয় সবকিছু জানে। গত দুটি বছর ধরে সে দরোয়ানটিকে ঘুষ দিয়ে হাত করতে চেয়েছিল, তার মনে হোত যাওয়ার পথে তার সামনে একশ ফ্রার একটা নোট ফেলে দিয়ে যায়; কিন্তু পাছে লোকটা বুঝতে না পেরে পেছন থেকে তাকে ডাকে এই ভয়ে সে একাজ করতে পারে নি। নোট ত চুলোয় যাক; একটুকরো কাগজ ছুঁড়ে দিতেও ভয় হোত তার। কিসের ভয়? তা সে জানত না। কেলেঙ্কারীর ভয়? গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়? সম্ভবত। ভাইকাউণ্টের ফ্ল্যাট মাত্র কয়েকটা সিঁড়ি ওপরে; সেই ক'টা সিঁড়ি ভাঙতেই মাদামের মনে হোত যেন সে স্বর্গে উঠছে। বাড়ির ফটকের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হোত সে যেন ফাঁদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। তখন সামনে অথবা পেছনে এতটুকু শব্দ হলেই সে চমকে উঠত। এগোতেও সাহস করত না, পেছোতেও সাহস হোত না তার। কেউ নেমে এলে সে সাহস করে মার্টিলেটের কলিং বেল টিপতে পারত না। দরজা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত যাতে লোকে মনে করে সে অন্য কোথাও যাবে। সে উঠে যেত···একতলা···দোতলা···তিনতলা···। তারপরে সব চুপচাপ হয়ে গেলে আবার নেমে আসত সে, এবং প্রায় দৌড়ে—প্রতি মুহূর্তে তার ভয় হোত যদি সে ফ্ল্যাট ভুল করে ফেলে।

ভেলভেটের পোশাক পরে ভাইকাউণ্ট ঠিক অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলেই হাসি পেত তার। বিগত দুটি বছর ধরে একই রীতিতে ভাইকাউণ্ট তাকে অভ্যর্থনা করেছে—তার হাবভাব, চলাফেরার মধ্যে এতটুকু ইতর-বিশেষ চোখে পড়ে নি মাদামের।

দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভাইকাউণ্ট বলবে—'প্রিয় বান্ধবী, তোমার হাত দুটি চুমু খেতে আমাকে অনুমতি দাও।' এই বলেই সে তার পিছু পিছু ঘরের মধ্যে ঢুকে যাবে। ঘরে যথারীতি শার্সি বন্ধ থাকে; সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বাতি জ্বলে। শীত অথবা গ্রীষ্ম—একইভাবে আলো জ্বলে এ ঘরে। তারপরে তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে ভাইকাউণ্ট তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করবে। প্রথম প্রথম মাদামের এটা ভালই লাগত। এখন মনে হয় ভাইকাউণ্ট পঞ্চম অঙ্কে অভিনয় করছে—আর এই একই অভিনয় সে করে চলেছে একশ কুড়িবার। এই রীতির কিছুটা পরিবর্তন

নিশ্চয় তার করা উচিৎ।

এবং তারপর···হায়রে হায়···হা ভগবান···ভাবতে গেলেও লজ্জায় মরে যায় মাদাম···সে ব্যাপারটা সহ্য করা সত্যিই তার পক্ষে কষ্টকর। না; সেখানেও বেচারার কোন নতুনত্ব নেই। মানুষটা ভাল···কিন্তু বড়ই গতানুগতিক।

পরিচারিকার সাহায্য ছাড়া উলঙ্গ হওয়া কী কষ্টকর ব্যাপার। এক আধ বার না হয় কষ্ট করে তা হওয়া যায়; কিন্তু প্রতি সপ্তাহে এইভাবে কারও সাহায্য না নিয়ে উলঙ্গ হওয়াটা কী বিরক্তিকর না; কোন পুরুষেরই এদিক থেকে নারীর ওপরে জুলুম করা উচিৎ নয়। কিন্তু উলঙ্গ হওয়াটা যত কষ্টকরই হোক, কারও সাহায্য না নিয়ে জামা-কাপড় পরাটা আরও কষ্টকর। এই সময় কোন পুরুষ যদি অক্ষম হাতে নারীকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে, বলে—'আমি একটু সাহায্য করব কী?' তখন ইচ্ছে যায় তার কানে একটা ঘুষি বসিয়ে দিই, সাহায্য করবে তুমি? কী ক'রে উলঙ্গ নারীদের পোশাক পরাতে হয় তা তুমি জান? ভাইকাউন্ট যেভাবে পিন ধরে তা থেকেই বোঝা যায় এসব ব্যাপারে সে একেবারে অপদার্থ। ঠিক এই সময়েই ভাইকাউন্টের ওপরে তার বিতৃষ্ণা জাগে। মনে হয় তাকে সে খুন করে ফেলবে। তা ছাড়া যে পুরুষ কোন নারীকে পরিচারিকার সাহায্য ছাড়াই একশ কুড়িবার পোশাক পরতে বাধ্য করে সে-পুরুষকে ঘৃণা করে না এমন নারী কে রয়েছে? কথাটা সত্যিই যে অনেক পুরুষই এসব ব্যাপারে তার মত অপদার্থ নয়। ক্ষুদে ব্যারণ দি গ্রিমবেল-এর কথাই ধরা যাক, কোন সময়েই সে বলে না—তোমাকে একটু সাহায্য করব কি?—সে সব সময় দক্ষ হাতে এগিয়ে আসে। একেবারে প্রাণবন্ত এই ব্যারণ—যাকে বলে নিখুঁত কলাবিদ। সে পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরে বেরিয়েছে—নানা দেশের নারীদের সাজসজ্জার কৌশল সে জানে; এটা তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল।

গীর্জার ঘড়িতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের শব্দ হল। নিজেকে টেনে তুলল মাদাম—ঘড়ির দিকে তাকাল—একটু হাসল, ভাবল—এতক্ষণে নিশ্চয় সে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারপরে দ্রুত সে পার্ক ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল। সে সবেমাত্র রাস্তায় পৌঁচেছে এমন সময় একটি লোক তার সামনে মাথাটা নুইয়ে তার টুপীটা খুলে দাঁড়াল।

অবাক হয়ে মাদাম বলল—কী আশ্চর্য, ব্যারণ তুমি?

হ্যাঁ, মাদাম। তুমি কেমন আছ?

দু' একটা একথা-সেকথার পরে ব্যারণ বলল—তুমি কি জান আমার বান্ধবীদের মধ্যে একমাত্র তুমিই এখনও পর্যন্ত আমি যে জাপানী চিত্রকলার আয়োজন করেছি তা দেখতে তুমি আসনি।

কিন্তু ব্যারণ, কোন বিবাহিতা নারী কোন অবিবাহিত পুরুষের বাড়িতে

যায় কি ?

কী, কী বললে ? দুষ্প্রাপ্য শিল্প দেখতে যাওয়াও কি অন্যায় ?

বস্তুটা যাই হোক, একলা সে দেখতে পারে না।

কিন্তু কেন পারে না ? অনেক বিবাহিতা মহিলাই একা-একা সেই সংগ্রহ দেখতে গিয়েছেন। প্রতিদিনই তাঁরা যান। তাঁদের নাম আমি বলব ? না, থাক। মনের মধ্যে কোন পাপ না থাকলেও প্রত্যেকের রুচিশীলা হওয়া উচিৎ। নীতির দিক থেকে কোন ভদ্রলোকের বাড়ি যাওয়ার মধ্যে কোন অপরাধ নেই ; বিশেষ ক'রে যে ভদ্রলোক বহুপরিচিত আর সম্ভ্রান্ত—যদি অবশ্য কেউ সেখানে খারাপ উদ্দেশ্যে যায়।

হ্যাঁ, অবশ্য, মোটের ওপরে তুমি সত্যি কথাই বলেছ।

তাহলে তুমি আমার সংগ্রহ দেখতে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

কখন ? এখনই ?

অসম্ভব। আমি আজ বড় ব্যস্ত।

বাজে কথা বলো না। এই পার্কে তুমি আধ ঘণ্টা বসে রয়েছ।

তুমি আমাকে লক্ষ্য করছিলে ?

আমি তোমাকে দেখছিলাম।

সত্যি বলছি, আমার খুব তাড়া রয়েছে।

আমিও সত্যি কথাই বলছি, কোনরকম তাড়া তোমার নেই। সেটা তুমি স্বীকার কর।

মাদাম হাসতে-হাসতে বলল—না, না…খুব বেশী নয়…

একটা গাড়ী পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ; ব্যারণ তাকে থামিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলল—এস মাদাম।

কিন্তু ব্যারণ, অসম্ভব, আজ আমি যেতে পারব না।

তুমি বড় অবাধ্য, মাদাম। এ-স। আমাদের দিকে সবাই তাকিয়ে রয়েছে। এখনই ভিড় জমে যাবে। তারা ভাববে তোমাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দু'জনকেই পুলিশে গ্রেপ্তার করবে। তোমাকে অনুরোধ করছি—ভেতরে ঢোক।

ভয় পেয়ে আচ্ছন্নের মত মাদাম গাড়ীর ভেতরে ঢুকলো। তার পাশে ব'সে ব্যারণ বলল—রু দ্য প্রোভেনস্-এ চালাও।

হঠাৎ মাদাম চীৎকার করে উঠল—হায় হায়, একটা জরুরী টেলিগ্রাম করতে আমি ভুলে গিয়েছি। কাছাকাছি একটা পোস্ট অফিসে আমাকে নিয়ে যাবে কি ?

একটু দূরে গাড়ীটা থামলে মাদাম ব্যারণকে বলল—পঞ্চাশ সেন্টাইম দামের একটা টেলিগ্রাফ কার্ড নিয়ে এস তো। স্বামীর কাছে কথা দিয়েছিলাম

মার্টিলেটকে আগামী কাল আমরা ডিনারে নিমন্ত্রণ করব। সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

নীল কার্ডটা নিয়ে ব্যারণ ফিরে এলে মাদাম পেনসিল দিয়ে লিখল—

প্রিয় বন্ধু,

আমার শরীর ভাল নয়। স্নায়ুর অসুখে আমি শয্যাশায়িনী। বেরোতে পারছিনে। আমার অপরাধ ক্ষমা করার জন্যে কাল সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে তোমার ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল। এস। 'জেনি'

জিব দিয়ে আঁটাটা ভিজিয়ে নিয়ে টেলিগ্রাফ কার্ডটা এঁটে তার ওপরে ভাইকাউন্টের ঠিকানা লিখে ব্যারণকে মাদাম বলল—টেলিগ্রাম ফেলার বিশেষ বাক্সে এটা একটু ফেলে দিয়ে এস।

বন্দরে

[In Port]

১৮৮০ সালের তেসরা মে হ্যাভার পরিত্যাগ ক'রে তিন-পালের জাহাজ নোত্তর-ডম-দেভেনতস্ চীন সমুদ্রে পাড়ি দিল; তারপরে চার বছর পরে ১৮৮৬ সালের চৌঠা আগস্ট মার্সেলিস বন্দরে আবার এসে ঢুকলো। একটা চীনা বন্দরে যাওয়ার জন্যে সে মালবোঝাই করেছিল। সেই মাল নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে নতুন মাল নিয়ে সেটি বুয়েনোস এয়ারস্-এর পথে ভাসলো। সেখান থেকে মাল বোঝাই ক'রে চলে গেল ব্রেজিলের দিকে।

এগুলি ছাড়া আরও অনেক বন্দর সে ঘুরেছে। এছাড়া ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার ফলে সারানোর জন্যে কয়েটি মাস তাকে চুপচাপ পড়ে থাকতে হয়েছে; ঝড়ের ঝাপটায় গতিচ্যুত হ'তে হযেছে তাকে; দুর্ঘটনা ঘটেছে কিছু; দুঃসাহসিক অভিযান, এবং ব্যর্থ কিছু অভিযানকেও একেবারে নাকোচ ক'রে দেওয়ার উপায় ছিল না। এত সব হাঙ্গামা হুজ্জোতের পরে তিন-পালের নরম্যান জাহাজটি শেষ পর্যন্ত অ্যামেরিকান খাবার বোঝাই অজস্র টিনের বাক্স ভর্তি ক'রে মার্সেলিস বন্দরে এসে ঢুকলো।

প্রথম যাত্রার সময় ক্যাপটেন আর মেট ছাড়া জাহাজে ছিল চৌদ্দটি নাবিক—আটজন নর্মান আর ছ'জন ব্রিটন। শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল পাঁচজন ব্রিটন, আর চারজন নর্মান। একজন ব্রিটন সমুদ্রে মারা যায়। নানান অবস্থার মধ্যে চারজন নর্মান জাহাজ থেকে উধাও হয়ে যায়। তাদের স্থান পূরণ করে দু'জন অ্যামেরিকান, একজন নিগ্রো, আর এক সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরের গর্ত

থেকে নিয়ে আসা হয় সাংহাই-এর স্থায়ী বাসিন্দা একটি নরওয়েজকে।

একটি ইতালিয়ান ব্রিগ আর একটি ইংলিশ স্কুনারের মাঝখানে নোতর-ড্যম তার জায়গা করে নিল। তারপরে শুল্ক বিভাগের কাজ শেষ হওয়ার পরে ক্যাপটেন তাঁর নাবিকদের তীরে বেড়ানোর জন্যে সান্ধ্য ছুটি মঞ্জুর করলেন।

রাত্রি হয়েছে। জলে উঠেছে মার্সেলিস-এর রাস্তার বাতিগুলি। গ্রীষ্ম-কালীন উষ্ণ সন্ধ্যায় বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে রসুন দিয়ে রান্না করা খাবারের গন্ধ। রাস্তায় ভিড়ে, গাড়ীর শব্দে, মানুষের চীৎকারে পথ একেবারে সরগরম। এই সব দক্ষিণ অঞ্চলের রীতিই এই রকম।

জাহাজ থেকে মাটিতে পা দিয়েই দশটি মানুষ অতি সন্তর্পণে হাঁটতে লাগল। অনেকদিন তারা শহর থেকে নির্বাসিত ছিল। তার ফলে খুব সাবধানে দু'জন দু'জন করে একসঙ্গে এগোতে লাগল তারা। বন্দরের মুখ থেকে বেরিয়ে নানান পথ বেয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে তারা এগিয়ে গেল। বিগত ষাটটি দিন সমুদ্রে বাস করার ফলে তাদের দেহের প্রতিটি অংশ নারীসঙ্গ কামনায় একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘায়ত, চতুর আর স্বাস্থ্যবান সিলেসটিন ডুক্লোসের নেতৃত্বে নরম্যানরা চলল সামনে। যতবারই এখানে শহরে পদযাত্রা করেছে ততবারই এই সিলেসটিন নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের। সবচেয়ে ভাল জায়গাটা সে-ই নির্বাচন করেছে; কোন জায়গাটা ভাল আর পরিতৃপ্তিকর সেটা ঠিক করে দিয়েছে সে; তীরে নাবিকদের মদ খাওয়ার নোংরা আস্তাবল আর তাদের স্বাগত জানানোর জন্যে যে সব বিশ্রী পতিতালয় রয়েছে সেগুলিকে সে সব সময় দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু যেখানে সে ঢুকেছে সেখানে সে বীরের মতই নির্ভয় হয়ে ঢুকেছে।

শহরের চারপাশে নালার মত যে সব রাস্তা বেরিয়েছে সেই সব রাস্তা ঘুরতে-ঘুরতে সিলেসটিন শেষ পর্যন্ত একটা গলির মধ্যে দিয়ে দলবল নিয়ে ঢুকে গেল। সে রাস্তাটায় আলো ছিল প্রচুর—দোকানপত্তর বাড়ি-ঘর-দুয়ারের ওপরে সাইনবোর্ডগুলি ঝকমক করছিল। খোলা দরজার ভেতরে সরু-সরু পথ। তাদের সামনে ছোট-ছোট চেয়ারের ওপরে ঢিলেঢালা জামা পরে মেয়েরা বসেছিল। তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে তারা সবাই প্রত্যাশায় উঠে দাঁড়ালো—রাস্তার ওপরে এগিয়েও এল কয়েকটা পা। তাদের সামনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। জনতাও সামনে বেশ্যাপল্লী দেখে উত্তেজিত হয়ে গুনগুন করে গান করতে লাগল। কখনও-কখনও দোতলার জানালা খুলে গেল। সামনে এসে দাঁড়ালো বেশ শক্ত করে পোশাক পরা অর্দ্ধ-উলঙ্গ কোন একটি বেশ্যা; পোশাকের ভেতর থেকে তার দেহের শক্ত গাঁথুনিটা বাইরে প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো। ভেতরে আনার জন্যে ওপর থেকেই জানালার বাইরে মুখ বার করে সে পথচারীদের ডাকতে লাগল।

কখনও-কখনও নীচে নেমে এসে তাদের কারও-কারও হাতে টান দিয়ে অথবা মাকড়শার মত তাকে জড়িয়ে ধরে তার চেয়েও ভারি কোন লোককে ভেতরের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তার স্পর্শে উত্তেজিত হয়ে লোকটি মৃদু বাধা দিল; তার দলের লোকেরা চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল; ভেতরে যাবে কি যাবে না ভাবতে লাগল। দেরী তাদের যেন আর সইছিল না। কেউ কেউ আবার ভাবছিল দেহের খিদেটাকে আর একটু জিইয়ে রাখার জন্যে আরও কিছুটা সময় তারা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। তারপরে প্রবল বিক্রমে অনেক ধস্তাধস্তির পরে মেয়েটা লোকটাকে টানতে-টানতে তার দরজার কাছে নিয়ে গেল; তার দলের লোকরাও তাদের পিছু-পিছু গিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় অভিজ্ঞ সিলেশ্টিন হঠাৎ চীৎকার করে উঠল —মারচান্দ, ওখানে যেয়ো না। আমাদের যাওয়ার উপযুক্ত ঘর ওটা নয়।

তার নির্দেশ শিরোধার্য করে লোকটা প্রায় পাশবিক শক্তি খাটিয়ে মেয়েটির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল; তার বন্ধুরাও সঙ্গে-সঙ্গে পিছু ঘুরে দাঁড়াল। মেয়েটি তাদের পিছু পিছু এগিয়ে এসে অশ্রাব্য ভাষায় তাদের গালাগালি দিতে লাগল। অন্য মেয়েরাও সঙ্গিনীর ব্যর্থতায় দল বেঁধে বেরিয়ে এসে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়ে ভেতরে আসার জন্যে তাদের প্রলুব্ধ করতে লাগল। প্রেম-দেউলের বারবঙ্কিনীদের প্রলুব্ধ অনুনয় আর জৈবিক ক্ষুধার তাড়না—এই দুই সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে আন্দোলিত চিত্তে তারা সোজা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সুরু করল; তাদের পেছনে ব্যর্থ অপমানিতা বারবনিতাদের অশ্রাব্য চীৎকার একসঙ্গে গমগমিয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে আরও অনেক দলের সঙ্গে তাদের দেখা হল; তাদের মধ্যে সেনাবাহিনীর লোক ছিল। তরোয়ালের ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল তাদের চলার সঙ্গে-সঙ্গে। ছিল নাবিকের দল। নিঃসঙ্গ পথচারী—দু'জন দোকানদারও ছিল তাদের মধ্যে। অশুভ ইঙ্গিত দেখিয়ে চারপাশে সরু-সরু গলিগুলি তাদের সামনে খুলে গেল। খোয়া-ওঠা চিটচিটে পিছল রাস্তার ওপর দিয়ে তারা দৃঢ়পদক্ষেপে এগোতে লাগল। দু'পাশে বেশ্যালয় গিজগিজ করছে। সেই রাস্তার ওপরে নোংরা জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে মনোস্থির করে বসল ডুক্রো। মোটামুটি দেখতে ভাল এইরকম একটা বাড়ির সামনে এসে সে দাঁড়ালো। তারপরে দলবল নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

(২)

খাওয়া-দাওয়া আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয় নি। পরের চারটি ঘণ্টা ধরে নাবিকরা প্রেমের আদান-প্রদান আর সুরার উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দিল নিজেদের। এতেই তাদের ছ'মাসের বেতন হাওয়া হয়ে গেল। অতিথিদের

অভ্যর্থনা করার বিরাট ঘরে মনিবের মত তারা ভারিক্কী চালে বসল। যেসব সাধারণ শ্রেণীর মক্কেলরা এক একটা চেয়ারে ছড়িয়ে বসেছিল তাদের দিকে অসৌজন্যভরে তাকালো। ঢিলে জামা গায়ে দিয়ে বুড়ো খুকী অথবা গানের আসরে গায়িকার মত একটা মেয়ে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে এগিয়ে এল; কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনরকম সাড়া না পেয়ে তাদের পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ওখানে গিয়েই তারা পছন্দমত নিজেদের সঙ্গিনী বেছে নিল; কারণ এখানে সবাই প্রায় একই রকম। তিনটে টেবিল এক জায়গায় টেনে আনা হল। প্রথম দফায় মদ খাওয়া শেষ করে তারা দুটি দলে বিভক্ত হল। প্রতিটি নাবিক এক-একটি মেয়ে বেছে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ ধরে কাঠের সিঁড়ির ওপরে চারটি পায়ের শব্দ শোনা গেল; তারপর জোড়া-যাত্রাটি ভিন্ন-ভিন্ন ঘরে অন্তর্হিত হল।

তারপরে মদ খাওয়ার জন্যে আবার তারা নীচে নেমে এল। মদ খেয়ে উঠে গেল ওপরে; আবার নেমে এল নীচে। এইভাবে মদ গিলতে-গিলতে একসময় তারা মাতাল হয়ে উঠল; তারপরেই চীৎকার করতে সুরু করল তারা; প্রেয়সীকে হাঁটুর ওপরে বসিয়েছে; তারপর জুড়েছে গান। সে তো গান নয়, চীৎকার। চীৎকার করতে করতে দু' হাতের ঘুষি তুলে তারা টেবিলের ওপরে জোর করে মারতে লাগল। গলায় মদ ঢেলে পশুর মত ব্যবহার করতে সুরু করল তারা। সারা ঘর সরগরম হয়ে উঠলো। তাদের মাঝখানে বসেছিল সিলেসটিন ডুক্লো, ছড়িয়ে দেওয়া দুটো পায়ের ওপরে একটি দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরী বেশ্যাকে বসিয়ে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মদ সে যে কিছু কম খেয়েছে সেকথা সত্যি নয়; তবে অন্যদের মত সে অতটা মাতাল হয় নি। একটিমাত্র জিনিস ছাড়া অন্য অনেক আরও জিনিস যে রয়েছে সেকথা ভাবার মত শক্তি তার তখনও ছিল! অন্যান্য সঙ্গী-দের মত তখনও সে তার মনুষ্যত্ববোধ হারায় নি। মেয়েটির সঙ্গে তাই সে আলাপ করার চেষ্টা করল। কিন্তু সুস্থভাবে চিন্তা করার মত ক্ষমতাও তখন তার ছিল না। কী কথা সে বলবে, কেমন করে আলাপ করবে সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা তার মনে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার খেই হারিয়ে ফেলে সে।

হাসতে-হাসতে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে সে—তারপর···হ্যাঁ··· তারপর···কী যেন বলেছিলে···ক'দিন তুমি এখানে রয়েছ?

মেয়েটি বলল—ছ'মাস।

মনে হল, মেয়েটির কথা শুনে সে বেশ খুশিই হয়েছে—যেন ছ'টা মাস পাপালয়ে বাস করাটা যেকোন মেয়েরই সৎ চরিত্রের পরিচায়ক। তারপরে

সে আলাপ সুরু করে দিল—এ জীবন তোমার ভাল লাগে ?

একটু ইতস্তত করল মেয়েটি ; তারপরে হতাশভাবে বলল—সবই সহ্য হয়ে যায়। অন্য সব কাজের চেয়ে এটা খারাপ নয়। কোন বাড়িতে চাকরাণীর কাজ করা অথবা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে একাজ অনেক ভাল।

এই কথা যে সত্যি তা সেও স্বীকার করল।

এই অঞ্চলের মেয়ে তুমি নও ?

কোন উত্তর না দিয়ে সে কেবল ঘাড় নাড়লো।

অনেকদূর থেকে তুমি এসেছ ?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো মেয়েটি। কোন উত্তর দিল না।

তোমার দেশ কোথায় ?

মনে হল তার দেশ কোথায় সেই কথাটাই খুঁজে বার করার জন্যে মেয়েটি তার স্মৃতির ভাঁড়ার হাতড়াচ্ছে। তারপরে সে বিড়বিড় করে বলল—পারপিগনা।

শুনে খুব সন্তুষ্ট হল ডুক্লো ; বলল—ও, বেশ, বেশ।

এবারে মেয়েটির জিজ্ঞাসা করার পালা : তুমি নাবিক, তাই না ?

হ্যাঁ, প্রিয়তমে।

তুমি কি অনেকদূর থেকে আসছ ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। অনেক দেশ, বন্দর পার হয়ে এসেছি আমি।

মনে হচ্ছে, সারা পৃথিবী বেড়িয়ে এসেছ ?

তার দ্বিগুণ জায়গা ঘুরেছি একথা তোমাকে আমি বলতে পারি।

আবার মনে হল মেয়েটি ইতস্তত করছে। কী যেন একটা হারানো জিনিস সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপরে গম্ভীরভাবেই সে জিজ্ঞাসা করল—সমুদ্রে অনেক জাহাজ নিশ্চয় তুমি দেখেছ ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়।

নোত্তর-দ্যম জাহাজটিও তোমার চোখে পড়েছে ?

চুকচুক করে উঠলো ডুক্লো—নিশ্চয়। এই ত সপ্তাহখানেক আগে দেখেছি তাকে।

তার মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল ; মনে হল তার গণ্ডদেশ থেকে সব রক্ত নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল—সত্যিই !

হ্যাঁ, সত্যি।

তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলছ না ?

ডুক্লো একটা হাত আকাশের দিকে তুলে বলল—ভগবানের দিব্যি…

তাহলে তুমি কি জান সিলেসটিন ডুক্লো সেই জাহাজে রয়েছে কি না !

আশ্চর্য হয়ে গেল ডুক্লো ; কিছুটা অস্বস্তিও লাগল তার। মেয়েটির কথার উত্তর দেওয়ার আগে আরও কিছু জানতে চাইল সে।—তুমি কি তাকে

চেন ?

মেয়েটিও এবারে কিছুটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো; বলল—আমি না'; আমারই পরিচিত কোন মেয়ে।

এখানকার কোন মেয়ে ?

না।

রাস্তার কোন মেয়ে ?

না। অন্ত একটি।

কী রকম মেয়ে ?

মেয়ে যে রকম হয়; ধর, আমারই মত।

তার সঙ্গে এই মেয়েটির কী দরকার ?

তা আমি কেমন করে বলব ?

তারা এবারে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল; অপরের মনের মধ্যে ঠিক কী রয়েছে সেইটাই যেন খুঁজে বার করার চেষ্টা করল তারা। দু'জনেই ভাবলো এবার কোন একটা সিরিয়াস ঘটনা ঘটবে।

ভুক্লো জিজ্ঞাসা করল—মেয়েটিকে আমি দেখতে পারি ?

দেখা হলে, তাকে তুমি কী বলবে ?

আমি বলব···আমি বলব···সিলেসটিন ভুক্লোর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

সে ভাল আছে ?

তোমার আমার মতই সে ভাল আছে। এখন সে পূর্ণ যুবক।

আবার চুপ ক'রে গেল মেয়েটি; একসঙ্গে করল তার এলোমেলো চিন্তাগুলিকে; তারপরে আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করল—নোত্তর ডম কোথায় যাচ্ছিল ?

মার্সেলিস।

হঠাৎ যেন চমকে উঠলো মেয়েটি—সত্যিই ?

হ্যাঁ; সত্যি।

তুমি তাকে চেন ?

চিনি।

আবার একটু ইতস্ত ক'রে নীচু গলায় মেয়েটি বলল—ভাল, খুব ভাল।

তার সঙ্গে তোমার কী দরকার ?

শোন। তাকে বলো······না, থাক।

ক্রমশ অস্থির হ'তে লাগল ভুক্লো; মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ব্যাপারটা কী তা তাকে জানতে হবে।

তুমি কি তাহলে তাকে চেন ?

না।

তাহলে, তার সঙ্গে তোমার দরকারটা কী ?

হঠাৎ মেয়েটি মনোস্থির করে ফেলল; দাঁড়িয়ে উঠে যেখানে বার-এর মালিকানী বসে রয়েছে সেখানে দৌড়ে গেল, একটা লেমন-এর বোতল নিয়ে তার ছিপি খুললো: গ্লাসের মধ্যে সবটা ঢাললো; তারপরে সেই গ্লাসে কিছুটা সাদা জল মিশিয়ে তার হাতে দিয়ে বলল—খাও।

কেন?

তোমার মাতলামি কেটে যাবে। তারপরে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব।

সুবোধ বালকের মত সে সেটা খেয়ে ফেলল; হাতের পেছন দিয়ে ঠোঁট দুটো মুছলো, তারপরে বলল—এবারে বল—শুনছি।

আমাকে যে তুমি দেখেছ, অথবা, আমি এখনই তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি সেকথা তোমাকে কে বলেছে তা তুমি তাকে বলবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা কর।

প্রতিজ্ঞা করছি।—এই কথা ব'লে দিব্যি করার ভঙ্গিমায় সে ওপর দিকে হাত তুললো।

ভগবানের নামে দিব্যি করছ?

ভগবানের নামে দিব্যি করছি।

তুমি তাকে বলবে যে তার বাবা মারা গিয়েছেন; মারা গিয়েছেন তার মা, আর ভাই। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে টাইফয়েড জ্বরে তিনজনেই মারা গিয়েছেন—আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে।

এখন ড়ুক্লোর পালা। এই কথা শুনে শরীরের ভেতর তার রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠলো। শোকে মুহ্যমান হয়ে কিছুক্ষণ সে চুপচাপ বসে রইল। তারপরে তার কেমন যেন সন্দেহ হল; মেয়েটা ঠিক সংবাদ দিয়েছে তো?

তুমি ঠিক বলছ?

ঠিক বলছি।

তোমাকে একথা বলল কে?

মেয়েটি ড়ুক্লোর কাঁধে একটা হাত রেখে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—প্রতিজ্ঞা কর,—একথা তুমি কাউকে বলবে না?

প্রতিজ্ঞা করছি।

আমি তার বোন।

হঠাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা—ফ্রাঙ্কয়, তুমি?

মেয়েটি একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল; তারপরে নাম-না-জানা একটা ভয়—একটা দুর্দান্ত আতঙ্ক তাকে অভিভূত ক'রে ফেলল। দাঁতে দাঁত চিপে তার কানের কাছে মুখটা নামিয়ে এনে সে জিজ্ঞাসা করল···হায় ভগবান, তুমিই সেই সিলেসটিন?

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা নির্বাক নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

তাদের চারধারে তখন নাবিকদের উদ্দাম হট্টগোল শুরু হয়েছে। টেবিলের ওপরে জোরে-জোরে ঘুষি মেরে বোতল ঠোকার তালে-তালে তারা একসঙ্গে গলা ছেড়ে দিয়েছে। আর তাদের সঙ্গে সমতা রেখে চলার জন্যে মেয়েরাও তারস্বরে চীৎকার করছে।

ডুক্লো তার বোনকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে অন্য কেউ শুনতে না পায় এইভাবে ফিস-ফিস ক'রে বলল—হায় ভগবান, তোমার সঙ্গে কী চমৎকার ব্যবহারই না আমি করেছি।

মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটির চোখও জলে ভরে গেল—তার জন্যে আমি দায়ী নই—তাই না ?

হঠাৎ বলে উঠলো ডুক্লো—তাহলে, সবাই মারা গিয়েছে ?

হ্যাঁ, সবাই।

বাবা, মা, ভাই ?

সবাই—আর একমাসের মধ্যেই। পড়ে রইলাম কেবল আমি একা। ওষুধের দোকানে দেনা, ডাক্তারের কাছে দেনা—তারপরে তিনজনের শেষ কাজ করার খরচ ! আসবাবপত্র বেচে দিয়ে এসব দেনা শোধ করলাম আমি। তারপরে ক্যাচে-র বাড়িতে ঝি-বৃত্তি করতে গেলাম। সেই বিকলাঙ্গকে তুমি চেন। আমার বয়স তখন পনের। যখন তুমি বেরিয়ে গেলে চাকরি করতে তখন আমার বয়স মাত্র চৌদ্দ। সেই লোকটার সঙ্গে একটা ঝামেলায় পড়লাম আমি। বয়স কম থাকলে মানুষ বোকার মত কাজ করে। তারপরে একজন সলিসিটারের বাড়িতে গেলাম গৃহপরিচারিকার কাজ নিয়ে। সেও আমাকে প্রলুব্ধ করে বার ক'রে নিয়ে এসে হাভারে একটা ঘর ভাড়া ক'রে রেখে গেল। তারই কয়েকদিন পরে সে-ও আসা বন্ধ ক'রে দিল। তিন দিন সেখানে আমাকে না খেয়ে থাকতে হয়েছিল। রোজগার করার মত কাজ না পেয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে আমি একটা নোংরা বাড়িতে হাজির হলাম। আমি এই নোংরা পৃথিবীর অনেক দেখেছি। অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষপর্যন্ত আমি এখানে এসে পৌচেছি।

কথা বলতে-বলতে চোখের জল তার উপছিয়ে তার দুটি গাল বেয়ে তার শরীরটাকে ভিজিয়ে দিল। তারপরে সে বলল—ভেবেছিলাম, তুমিও মারা গিয়েছ সিলেসটিন।

সিলেসটিন বলল—তখন তুমি এত ছোট ছিলে যে তোমাকে আমি চিনতেই পারতাম না। এখন তুমি কত বড় হয়েছ। কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারলে না কেন ?

একটা হতাশার মত অঙ্গভঙ্গী ক'রে সে বলল—কত লোককেই তো দেখলাম—মনে হয় তারা যেন সব একই রকমের।

প্রচণ্ড মার-খাওয়া শিশুর মত তখনও সে মুহ্যমান হয়ে বসে তার দিকে

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তখনও মেয়েটি তার প্রসারিত দুটি পায়ের ওপরে বসে রয়েছে। তার একটি হাত তখনও মেয়েটির কাঁধের ওপরে। সিলেসটিন তাকে নিবিড়ভাবে দেখতে লাগল ; তার মনে হল—এটি তার সেই ছোট্ট বোনটিই বটে। সে যখন সমুদ্রের বুকে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল ঠিক সেই সময় এই ছোট্ট মেয়েটি তার বাবা, মা, আর ভাইকে মারা যেতে দেখেছে।

হঠাৎ সিলেসটিন তার বিরাট দুটো হাতের মধ্যে মেয়েটির নতুন করে খুঁজেপাওয়া মুখটাকে ধরে তাকে বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগল। তারপরে সে ফুঁপিয়ে উঠলো—মনে হল, মৃত্যুপথযাত্রী কোন মানুষ যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

তারপরে সে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ; ভীষণ গর্জন করতে-করতে দিব্যি করতে লাগল ; এত জোরে টেবিলের ওপরে ঘুষি মারতে সুরু করল যে টেবিল উলটে গিয়ে কাঁচের বোতল আর গ্লাস ঝনঝন ক'রে প'ড়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। তিন পা এগিয়ে গেল সে ; তারপরে মুখ থুবড়ে মাটিতে প'ড়ে আর্তনাদ করতে সুরু করল।

নাবিকরা তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হাসতে লাগল।

একজন বলল—কতটুকুই বা মদ খেয়েছে—এতেই এই !

আর একজন বলল—ওকে শুইয়ে দাও। এমন সময় রাস্তায় বেরোলে ওকে পুলিশে ধরবে।

সিলেসটিনের পকেটে টাকা ছিল ; সুতরাং রাত্রির মত একটা আশ্রয় পেতে তার কোন অসুবিধে হল না। অন্য নাবিকরা তখন অপ্রকৃতিস্থ—তারা নিজেরাই দাঁড়াতে পারছে না। সেই সরু সিঁড়ি দিয়ে কোনরকমে তারা ধরাধরি করে তাকে সেই মেয়েটির বিছানায় শুইয়ে দিল। যেখানে কিছুক্ষণ আগেই তারা অপরাধ করেছে, সেই বিছানার পাশে একটি চেয়ারের ওপরে মেয়েটি সারারাত ধরে বসে-বসে কাঁদতে লাগল।

অবশেষে প্রভাত হল একসময়।

ব্যাবেতী

[Babette]

বৃদ্ধ এবং অথর্বদের সেই আশ্রমটি পরিদর্শন করতে আমার বিশেষ ভাল লাগত না ; কারণ, সেখানে গেলেই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক নিজে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। এই ভদ্রলোকটি কেবল যে বাচাল ছিলেন তা

নয়; পরিসংখ্যান বিষয়েও তিনি বেশ ওস্তাদ। কিন্তু যে মহিলা এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর নাতি সব সময়ে আমার সঙ্গে থাকতেন; এবং এই-রকম তথ্য বিশ্লেষণে তিনি বিশেষ খুশি হ'তেন। নাতিটি মানুষ হিসাবে চমৎকার। তাঁর বিরাট একটি অরণ্য ছিল; সেই অরণ্যে শিকার করার অনুমতি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। সেই জন্যেই তাঁর ঠাকুরমার এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি দেখে আমি যে বিশেষ খুশি হয়েছি এই রকম একটা মনোভাব না দেখানো ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। মুখের ওপরে হাসিটি ফুটিয়ে তত্ত্বাবধায়কের অজস্র কাহিনী আমাকে শুনতে হোত—আর মাঝে-মাঝে তারিফ ক'রে বলতে হোত—বা-বা! কী আশ্চর্য! এসব কথা আপনার মুখ থেকে না শুনলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

কিন্তু তাঁর কোন্ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এইরকম মন্তব্য করতাম তা আমার মনে নেই। মনে থাকলে আমি নিশ্চয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম—আচ্ছা, এই ব্যাবেত্তীটি কে বলুন তো? আপনার আশ্রমের লোকেরা ওর সম্বন্ধে এত কথা বলে যে মানুষটি কে জানার বড় কৌতূহল হয়েছে আমার।

কথাটা সত্যি। প্রায় ডজনখানেক মানুষ, তাদের মধ্যে পুরুষ এবং নারী দু'দলই রয়েছে, তার কথা আমার কাছে বলে যেত; কেউ করত প্রশংসা, কেউ করত তিরস্কার। তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে দেখা হলেই তারা বলত—শুনছেন মঁসিয়ে, আপনার ব্যাবেত্তী আমার···

তত্ত্বাবধায়কের ভদ্র স্বরটি হঠাৎ উত্তেজনায় মুখর হ'য়ে উঠত—হয়েছে, হয়েছে···শুনেছি···

অন্য সময়ে কোন বৃদ্ধকে সম্বোধন ক'রে তিনি একগাল হেসে বলতেন—আশা করি, আপনি এখানে আনন্দেই আছেন।

কার-ও কার-ও মুখে তার প্রশংসা শুনলে তিনি আনন্দে গদ-গদ হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে হাত দুটি জড় ক'রে বলতেন—ব্যাবেত্তী একটি রমণীরত্ন।

কথাটা মিথ্যে নয়—এরকম একটি নারীকে জানার কৌতূহল কার না থাকে; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয় বুঝতে পেরেই মনের মাধুরী মিশিয়েই তার একটি মূর্তি আমি আমার মনের মধ্যে সৃষ্টি ক'রে ফেললাম। কবরখানার অন্ত্যজ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রভাত সূর্যের কিরণের মত সেই বিষাদময় আশ্রমের মধ্যে একটি সুন্দর কুসুমের মতই তাকে আমার মনে হয়েছিল। তার ছবিটি এমন সুন্দরভাবে আমার মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল যে তাকে চাক্ষুষ দেখার ইচ্ছে আমার আর ছিল না। তার কথা বলার সময় লোকের মুখে যে পরিতৃপ্তির ছাপটি আমি দেখেছি তা থেকেই সে আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল; ফলে যে সমস্ত বৃদ্ধারা তার নিন্দা করত তাদের ওপরে আমি রীতিমত বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু একটা জিনিস

কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে নি; সেটা হচ্ছে তার সম্বন্ধে কোন কথা তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করি নি।

কিন্তু ব্যাবেত্তীর সম্বন্ধে আমার মনে এই যে ধারণাটা জন্মেছিল—সেটা স্পষ্ট নয়, অস্পষ্ট। কল্পনায় তার একটি সুন্দর মূর্তি আমি গড়ে তুলেছিলাম —এই পর্যন্ত। ওখান থেকে চলে আসার পরে অনেক কথার মত তার কথাও হয়ত আমি ভুলে যেতাম যদি না সেদিন হঠাৎ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেত। কল্পনায় তার যে মূর্তিটি আমি গড়ে তুলেছিলাম তার সঙ্গে তার বাস্তব চেহারার যে পার্থক্য তা দেখেই কেমন যেন আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

পেছনের ছোট একটা উঠোন পেরিয়ে সবেমাত্র আমরা একটি অন্ধকার রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়িয়েছি এমন সময় রাস্তার অন্যপাশে হঠাৎ একটা দরজা খুলে গেল; আর তার ভেতর থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে এল একটি ছায়ামূর্তি। সেটি যে একটি নারীর তা আমরা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক কর্কশকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলেন—ব্যাবিত্তী, ব্যাবেত্তী!

এই বলেই তিনি প্রায় ছুটতে সুরু করলেন। আমরাও ছুটলাম তাঁর পিছু-পিছু। যে দরজার ভেতর দিয়ে ছায়ামূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তিনি সেই দরজাটা খুলে দিলেন। দরজার পরেই সিঁড়ি। তিনি আবার চীৎকার করলেন। উত্তরে কেবল একটুকরো চাপা হাসি বেরিয়ে এল তার। রেলিঙ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে আমরা দেখলাম নীচে থেকে একটি মহিলা স্থির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

তার মুখের ওপরে কুঞ্চন আর সাদা চুল থেকে বোঝা যায় যে মহিলাটি বৃদ্ধার পর্যায়ে পড়ে কিন্তু তার চোখ দুটো দেখলে মনে হয় না যে তার অত বয়স হয়েছে। সেগুলি যুবতীর চোখের মত চলচল। তার দৃষ্টিটা যেন সমুদ্রের মত গভীর—বেগুনে নীল—শিশুর চাহনির মত সরল।

হঠাৎ তত্ত্বাবধায়ক চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন—আবার তুমি না ফ্রিজের কাছে গিয়েছিলে?

বৃদ্ধাটি কোন উত্তর দিল না; হাসতে লাগল। তারপরে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার হাবভাব দেখে মনে হ'ল সে যেন স্পষ্ট ক'রে বলে গেল—তোমার কথা আমি গ্রাহ্যই করিনে।

এই অপমানজনক কথাগুলি তার মুখের ওপরে জলজল ক'রে ফুটে উঠেছিল; সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলাম তার চাহনিটিও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। তার শিশুর মত সরল চাহনির পরিবর্তে ফুটে উঠেছে হনুমানের চাহনি; হিংস্র, একগুঁয়ে বেবুনের চাহনি।

এরপরে আর কোন প্রশ্ন করার ইচ্ছা না থাকলেও তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা

না ক'রে পারি নি—ওই বুঝি আপনাদের ব্যাবেতী ?

বৃদ্ধাটির অপমানজনক চাহনির অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি এটা অনুমান ক'রেই তিনি রাগে লাল হয়ে বললেন—হ্যাঁ।

স্বরটাকে বিদ্রূপাত্মক ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—ওইটিই আপনার রমণীরত্ন ?

আমার প্রশ্নে আর-ও লাল হয়ে উঠল তাঁর চোখ আর মুখ।

পাছে আরও তাঁকে প্রশ্ন করি এই ভয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে-হাঁটতে তিনি বললেন—হ্যাঁ।

কিন্তু তখন আমার কৌতূহল চরমে উঠেছে। তাই আমি বললাম—এই স্ত্রিজকে আমি দেখতে চাই। এ কে ?

তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—ও কিছু নয়; ও কিছু নয়। দেখার কিছু নেই তার। তাকে দেখে সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই।

এই ব'লেই তিনি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। যিনি সবকিছু একটি-একটি ক'রে আমাদের দেখানোর জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিলেন তিনি এখন কোনরকমে শেষ করতে পারলে বাঁচেন।

পরের দিনই ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে এলাম আমি; ফিরলাম প্রায় চার মাস পরে—শিকার করার ঋতু সুরু হওয়ার সময়। এই সময়টা বৃদ্ধাটিকে আমি ভুলতে পারি নি। কারণ, একবার যে তার চোখ দুটি দেখেছে তার পক্ষে তাকে ভুলে যাওয়া কঠিন। সেই জন্য তিনটি ঘণ্টার এই ক্লান্তিকর যাত্রায় আমার একটি সহযাত্রীকে পেয়ে বিশেষ খুশীই হয়েছিলাম; তিনি সারা পথটিই ব্যাবেতীর কথা আমাকে শুনিয়েছিলেন।

এই সহযাত্রীটি আমার পূর্ব-পরিচিত একজন ম্যাজিস্ট্রেট—বয়সে তরুণ, কিন্তু অভিজ্ঞ-দৃষ্টি—সবকিছু খুঁটিয়ে দেখাই তাঁর অভ্যাস। তাছাড়া, তিনি বুদ্ধিমান। তাছাড়া, আর একটি বিশেষ গুণ তাঁর ছিল। সেটি হচ্ছে বিচারকের কঠোর মনোভাবের সঙ্গে সবকিছু স্থিরভাবে পর্যবেক্ষণ করার শক্তি।

তাঁরই মুখ থেকে রহস্যময়ী এই নারীটির কাহিনী শুনলাম।

দশ বছর বয়সে তার বাবা তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে; চরিত্র সংশোধন করানোর জন্যে তের বছর বয়সে তাকে চরিত্রশুদ্ধির আশ্রমে পাঠানো হয়। কুড়ি থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে আশপাশে অনেক বাড়িতেই সে চাকরাণীর কাজ করে; কোন কাজটাই তার স্থায়ী হয় নি; এবং যে-বাড়িতেই সে কাজ করতে গিয়েছে সেই বাড়িরই মনিবের সে রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটিয়েছে। অনেক সংসারকেই সে ধ্বংস করেছে; প্রতিদানে নিজে সে কোন অর্থ পায় নি, বা কোথাও স্থায়ী কাজ যোগাড় করতে পারেনি। তার জন্য একটি দোকানদার আত্মহত্যা করেছে; একটি যুবক

চোর-বদমাইশ হয়ে অসামাজিক জীবে পরিণত হয়েছে। দু'বার তার বিয়ে হয়েছিল। দু'বারই তার স্বামী মারা গিয়েছে। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তার অঞ্চলে সে-ই একমাত্র বারবণিতা বলে পরিচিতা ছিল।

নিশ্চয় খুব সুন্দরী ছিল?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

তিনি বললেন—মোটেই না। যৌবনেও যে সে সুন্দরী ছিল একথাও কেউ স্মরণ করতে পারে না।

তাহলে?

ওই যে চোখ দুটি! নিশ্চয় সেগুলি দেখেন নি।

বললাম—ঠিকই বলেছেন। ওই চোখ দুটিই সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে। সরল শিশুর মত চাহনি তাদের।

তিনিও বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলে উঠলেন—যে নারীর ওইরকম চোখ রয়েছে সে কোনদিন বুড়ো হ'তে পারে না। ব্যাবেতীর বয়স যদি একশ'ও হয় তাহলেও তাকে সবাই ভালবাসবে—ঠিক এখন যেমন বাসে।

কিন্তু বর্তমানে তাকে কে ভালবাসে?

ওই আশ্রমের সব বৃদ্ধরাই।

তাই কি?

নিশ্চয়। আর সবচেয়ে বেশী ভালবাসে আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক।

অসম্ভব।

আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

আর ওই লা ক্রিজটি কে?

লোকটি হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত কসাই। ১৮৭০-এর যুদ্ধে ওর পা দুটো বাতিল হয়ে যায়। লোকটা ব্যাবেতীকে ভালবাসে। যদিও লোকটার দুটো পা-ই কাঠের, আর বয়সও প্রায় ষাট, তবুও বেশ বলিষ্ঠ, মুখটাও সুন্দর। তত্ত্বাবধায়ক ওকে বেশ হিংসা করে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা যখন আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখি সবাই বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করছে। আশ্রমের বাসিন্দারা ভীষণ উত্তেজনায় ফেটে পড়েছে। পুলিশ এসেছে; আর আশ্রমের মালিক তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শুনলাম কেউ খুন হয়েছে। দলে ভিড়ে গেলাম আমরা। লা ক্রিজ তত্ত্বাবধায়ককে খুন করেছে। খুন করার যে বিবরণ শুনলাম তা বীভৎস। ভূতপূর্ব কসাই দরজার পাশে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল। তত্ত্বাবধায়ক ঘরে ঢোকামাত্র তাঁকে ঝাপটিয়ে ধরে সে মাটির ওপরে ফেলে দেয়। তারপরে তাঁর গলা কামড়িয়ে ধরে। এত জোরে কামড় দেয় যে তাঁর ক্যারোটিড আর্টারি ছিড়ে যায়; সেইখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ঘাতকের গোটা মুখ দেয় ভরিয়ে।

লা ক্রিজকে দেখলাম।| ধুয়ে ফেলার পরেও তার মুখের ওপরে রক্তের দাগ

লেগে রয়েছে। জানোয়ারের মুখের মত বীভৎস তার মুখের চেহারা। আর দেখলাম ব্যাবেত্তীকে। সে হাসছিল। সে দুটি চোখের চাহনি শিশুর মত নির্মল; সংবেদনশীল।

আশ্রমের মালিক; যাঁর বাড়িতে আমরা গিয়েছি, নীচু গলায় আমাকে বললেন—ওই মেয়েটা বার্দ্ধক্যজনিত স্নায়ুবিকারে ভুগছে। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখার পরেও ওর চাহনি যে ওইরকম তার কারণই হল এই স্নায়ুবিকার।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—তাই কি? মনে রাখবেন, ওর বয়স এখনও ষাট হয়নি। আমার মনে হয় না ও কোন বার্দ্ধক্যজনিত স্নায়ুরোগে ভুগছে; আর এও আমি বিশ্বাস করি, কী ঘটেছে তা-ও ও বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছে।

তাহলে, ও হাসছে কেন?

হাসছে এই জন্যে যে যা ঘটেছে তাতে ও খুশি হয়েছে।

না, না। তা কী করে হবে?

ম্যাজিস্ট্রেট হঠাৎ ব্যাবেত্তীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন; তারপরে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী ঘটেছে আর কেন ঘটেছে, আশা করি তুমি তা জান?

তার মুখ থেকে সরল হাসিটি মুছে গেল। তার চোখের দৃষ্টি হনুমানের দৃষ্টির মত কর্কশ, ঘৃণ্য হয়ে উঠল। তারপরে হঠাৎ সে তার পেটিকোট ওপরে তুলে তার শরীরের নিম্ন অঙ্গটি সকলের সামনে খুলে দেখাল। হ্যাঁ, ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক কথাই বলেছেন। তার নিম্ন অঙ্গটি দেখে বজ্রাহতের মত আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

লা ফ্রিজ আমাদের দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—সব শুয়োর, সব শুয়োর! তোমরাও ওর ওপর অত্যাচার করতে চাও।

এবং আমি দেখলাম ম্যাজিস্ট্রেটের মুখটা সত্যি-সত্যিই বিবর্ণ হয়ে উঠল; তাঁর ঠোঁট আর হাত দুটি কাঁপতে লাগল। মনে হ'ল অন্যায় কিছু করতে গিয়ে যেন তিনি ধরা পড়েছেন।

[Lily Lala]

স্বপ্নালু চোখে স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে হাতড়ে-হাতড়ে কী যেন খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলেন লুই দ্য আরাঁদেল; তারপরে বললেন—যখন তাকে

আমি প্রথম দেখলাম তখন আমার মনে হয়েছিল বিস্মৃত কোন গায়কের গাওয়া অনেকদিন আগে শোনা আমি একটা মিষ্টি অথচ মন্থর গানের কলি শুনছি। সেই গানের গ্রন্থনায় একটি সুকেশ রমণীর কাহিনী ছিল। এমন সুন্দর তার কেশের বর্ণবিন্যাস যে তার মৃত্যুর পরে তার প্রেমিক সেই কেশগুলি কেটে তাই দিয়ে বেহালার তার তৈরী করেছিল। সেই বেহালার তার থেকে যে সুর সৃষ্টি হোত তাই শুনে শ্রোতারা মৃত্যু পর্যন্ত ভাল না বেসে পারত না।

'তার চোখে আমি অতল জলের ছায়া দেখেছি। সেই অতল জলের মধ্যে সবাই তলিয়ে যেত; তার ঠোঁটের কোণে এমন একটি স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর হাসি উঁকি দিত যে মনে হোত সে বেশ জানে তাকে কেউ জয় করতে পারবে না; নিষ্ঠুর সাম্রাজ্ঞীর মত সে সমস্ত পুরুষের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করবে, শত ব্যভিচারের ভেতরেও তার মনটা থাকবে অপাপবিদ্ধা রমণীর মত।

'স্বর্গের অপ্সরীর মত মাথাটি তার আমি দেখেছি; দেখেছি তার সোনালী রঙের চুলগুলি, তার সেই দীর্ঘ, ছন্দোময় শরীরটি; তার শ্বেতশুভ্র কচি-কচি শিশুর মত আঙুলগুলি; যখন সে বাব্‌লা গাছের সারির মধ্যে দিয়ে হাঁটতো তখন সেই নিঃসঙ্গ নারীটিকে দেখে মনে হোত মানুষের অনন্ত আনন্দের উচ্ছ্বাসকে সে যে থামাতে পারত না তার জন্যে সে বেশ ক্রুদ্ধা হয়ে উঠেছে। কেউ তখন বিশ্বাস করতে পারত না যে এই রমণীটি অনাবিল জীবন স্রোতে বাঁধনহারা হয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে—শৌর্যের ইতিহাসে লিলি লালা এই অদ্ভুত নামে সে পরিচিতা—আর কেউ একবার তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত নষ্ট না ক'রে কিছুতেই সে ফিরে আসতে পারত না।

'কিন্তু এ-সমস্ত সত্ত্বেও, লিলির স্বরটি ছিল স্কুলের মেয়ের স্বরের মত নরম, নিরপরাধ। মনে হোত সে এখনও দড়ি দিয়ে স্কিপিং করে, এখনও ছোট জাঙিয়া পরে; তার মিষ্টি হাসি শুনে মনে হোত, বিয়ের ঘণ্টা বাজছে। মাঝে মাঝে আমি আমোদ করার জন্যে তার সামনে নতজানু হয়ে তার হাত দুটি জড়িয়ে ধরতাম—একটি সেণ্ট-এর মত মনে হোত তাকে।

'একদিন সন্ধ্যাবেলা বিয়ারিটজ-এর সমুদ্রকূলে আমরা বেড়াচ্ছিলাম। প্রচণ্ড উত্তাপে ঝলসে উঠেছিল আকাশ। ভূসোর মত কালো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল সমুদ্রকে; পোর্ট-ভিকস্-এর সমুদ্রোপকূলের বেলাভূমিতে অতিকায় ঢেউগুলি ভেঙে আছড়ে পড়ছিল। এসব দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না লিলির। সে বালির ওপরে অন্যমনস্কভাবে জুতোর গোড়ালি দিয়ে গর্ত খুঁড়ছিল। হঠাৎ সে তার গোপন কথাটি আমার কাছে প্রকাশ করে দিল। মেয়েরা মাঝে মাঝে কী জানি কেন এই রকম আকস্মিকভাবে নিজেদের ধরা দেয়; তারপরেই তারা অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে।

'প্রিয় বন্ধু, সেণ্ট হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই, "গসপেল" বা

"গোল্ডেন লিজেনড" নয়; আমার জীবন পূর্ণমাত্রায় নাটকীয়। যতদূর মনে পড়ে বহুপ্রত্যাশিত শিশুর মত জামাকাপড় জড়িয়ে আমাকে ছেলেবেলায় মানুষ ক'রে তুলেছিল সবাই; চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে কোলে ক'রে একজন মেয়েমানুষ ঘুরে বেড়াত। ফলে আদর আর যত্নের বাড়াবাড়িতে আমি একেবারে বয়ে গেলাম।

'সেই সব চুম্বনগুলি এত মিষ্টি ছিল যেন এখনও সেগুলি আমার ঠোঁটের ওপরে লেগে রয়েছে। শৈশবের সেই পারিপার্শ্বটি—সারি-সারি গাছ যাদের দেখে আমি ভয় পেতাম, সেই সব ঝড়ের আর্তনাদ—যা শুনে আমি আঁৎকে উঠতাম—সেই সব পুকুর যাদের জলে হাঁসগুলি সাঁতার কেটে বেড়াত—সেই-সব আমার মনে ছবির মত ভেসে রয়েছে। নিজেকে নিছক দেখার জন্যে আজও যখন আমি আরশীর সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন আমার মনে হয় যে মেয়েটি শৈশবে আমাকে চুম্বন করত, যে সকলের চেয়ে মিষ্টি সুরে আমার সঙ্গে কথা বলত আমি যেন তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তারপর?

"আমাদের বাড়ির কোন অসৎ চাকর কি আমাকে গোপনে কোন ভ্রাম্যমাণ সার্কাসওয়ালার কাছে বেচে দিয়েছিল? তা আমি জানিনে; জানতেও পারি নি কোনদিন; কিন্তু আমার শৈশব যে ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দলে জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে কেটেছিল তা আমি জানি। তখন আমি কত ছোট। তারা আমাকে অনেক কঠিন-কঠিন খেলা শেখালো—টানা শক্ত অথবা আলগা দড়ির ওপরে দিয়ে শেখালো হাঁটতে। কারণে অকারণে তারা আমাকে মারতো; মাংসের পরিবর্তে শুকনো রুটির টুকরো চিবোতে দিত আমাকে। কিন্তু একবার মনে রয়েছে একটা গাড়ীর তলায় লুকিয়ে আমি একবাটি সুপ চুরি ক'রে খেয়েছিলাম। আমাদের সার্কাসের একটি ভাঁড় তার তিনটি শিক্ষিত কুকুরের জন্যে এই সুপটা তৈরী করেছিল।

'সেখানে আমি ছিলাম নির্বান্ধব। সবচেয়ে নোংরা জঘন্য কাজ আমাকে দিয়ে তারা করাতো। আমার গা খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে তারা টাট্টু চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। সার্কাস দলের মধ্যে যে লোকটা আমার সঙ্গে সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করত সে হচ্ছে ম্যানেজার। মনে হোত, আমাকে মারধোর করতে তার বেশ আনন্দ হোত। প্রতিদিনই সে আমাকে যন্ত্রণা দিত। এই লোকটাই সার্কাসের মালিক। বুড়ো, নোংরা জানোয়ার ছিল লোকটা; আর সেই রকম ছিল যাকে বলে হাড়-কেপ্পন। দলের আর সবাই দুষ্ট ব্যাধির মত তাকে ভয় করতো। লোকটা সব সময় মাদুরের নীচে টাকাগুলো লুকিয়ে রেখে রোজগারপত্তর হচ্ছে না বলে চেঁচামেচি করত; যতটা পারতো দলের লোকদের মাইনে কেটে দিত সেই ছুতোয়। তার নাম হচ্ছে রাকা। আমি ছাড়া অন্য কোন শিশু হ'লে সে আত্মহত্যা ক'রে শহীদ হয়ে যেত; কিন্তু আমি বেড়ে উঠতে লাগলাম। যতই বয়স বাড়তে লাগল আমার ততই সুন্দরী

হ'তে লাগলাম আমি। আমার বয়স যখন পনের তখন সবাই আমাকে প্রেম-পত্র লিখতে সুরু করল; খেলার মাঠে দর্শকরা আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল ফুলের তোড়া। আমি যখন দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতাম তখন সবাই আমার সেই জাঙ্গিয়া পরা পীনোন্নত চেহারার দিকে তাকিয়ে হইচই ক'রে উঠতো।

'দলের লোকেরাও আমার সঙ্গে সমীহ ক'রে কথা বলতে সুরু করল; ড্রেসিং রুমে আমি যখন পোশাক বদলাতাম সবাই তখন আমার সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়াতো। সবচেয়ে ঘায়েল হ'ল মালিক রাফা। আমার সামনে এলে তার বুকটা ধড়ফড় করত। হ্যাঁ, সে আমাকে চুমু খাওয়ার জন্যে রফা করতে আসতো। আমি ঘৃণায় মরে যেতাম। যে লোকটা আমার ওপরে সবচেয়ে বেশী অত্যাচার করেছে, জর্জরিত করেছে আমাকে, আমার জীবন বিষময় করে তুলেছে, যতদূর সম্ভব তাকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম। নারীজাতির স্বভাবসুলভ চাতুরি, ছলাকলা, মিথ্যাভাষণ—যেগুলির মাধ্যমে জানোয়ারদের মত পুরুষদের আমরা বশ করি, মালিকের ওপরে আমার সেই সব চোখা-চোখা অস্ত্রগুলি ছুঁড়তে লাগলাম আমি।

'সেই লম্পট কামুক ছাগলটা আমাকে সত্যিই ভালবাসতো। নারীজাতিকে লোকটা বিলাসের শয্যাসঙ্গিনী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারত না। বৃদ্ধেরা যেমন যুবতীদের ভালবাসে সেই প্রাচুর্য নিয়েই সে আমাকে ভালবাসতো। ভালবাসার ছলনা দেখিয়ে সেই গর্দভটাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই আমি করিয়ে নিতাম। আমিই এখন দলের ম্যানেজার বনে গেলাম। সেই হতভাগা ব্যর্থ আশায় দিন-দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। তখনও পর্যন্ত সে আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি। আমার জুতো আর পরচুলোর ওপরেই সে কেবল চুমু খেত। তার কোনরকম ঘনিষ্ঠতা আমি বরদাস্ত করতাম না। ফলে সে রোগা হ'তে লাগল, হ'তে লাগল অসুস্থ আর নির্বোধ। সে যখন করজোড়ে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে আমার কৃপা ভিক্ষা ক'রে প্রতিজ্ঞা করত যে আমাকে সে বিয়ে করবে তখন আমি অট্টহাসিতে ফেটে পড়তাম। সে আমাকে কত মেরেছে, কত গালাগালি দিয়েছে, কত অপমান করেছে—সে-সব কথা তাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতাম। এবং এইভাবে বিফল হয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে মদের বোতল খুলে প্রাণের জ্বালা মেটানোর চেষ্টা করত। জিন আর হুইস্কি খেয়ে মাতাল হয়ে মেঝের ওপুরে লুটিয়ে প'ড়ে তার দুঃখ আর কামনা ভোলার চেষ্টা করত।

'আমাকে প্রলুব্ধ ক'রে তার স্ত্রী হওয়ার জন্যে সে আমাকে অনেক গয়না দিল। আমি অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও, সব কাজেই সে আমার মতামত নিতে লাগল। একদিন সন্ধ্যায় তার গালে একটু আদর করে আমি তাকে দিয়ে

তার সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে উইল করিয়ে নিলাম। এই উইল অনুসারে তার অবর্তমানে তার সমস্ত টাকা, সার্কাস এবং অন্যান্য সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আমি হয়ে গেলাম।

'সেবারে আমরা মস্কোর কাছে তাঁবু ফেলেছি। সময়টা শীতের মাঝামাঝি। বরফ পড়ছিল অবিশ্রান্ত ধারায়। শীত থেকে বাঁচার জন্যে সবাই গনগনে স্টোভের ধারে বসেছিল। খেলার পরে বিরাট একটা পাত্রে রাকা খেতে বসল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমরা দু'জনে পান ভোজন করলাম। তার সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহারই করলাম আমি। বারবার মদের গ্লাস ভর্তি করে তাকে দিতে লাগলাম। আমি তার হাঁটুর ওপরে বসে তাকে চুমু খেলাম। তার প্রেম আর মদের ধোঁয়া মিশিয়ে তার মগজে চড়ে বসল। ক্রমশ মাতাল হয়ে সম্বিত হারিয়ে সে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ল। মনে হল সে বজ্রাহত হয়ে পড়েছে। তার চোখ দুটো বুজে এল। কথা বলার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলল।

'দলের সবাই তখন ঘুমোচ্ছে। সকলের ঘরের বাতি নেভানো। কোথাও কোন শব্দ নেই, কেবল বরফ পড়ছে অবিশ্রাম। আমি আলোটা নিভিয়ে দিলাম, দরজা খুললাম। তারপরে বস্তার মত মাতালটার পা ধরে টানতে-টানতে বাইরে বরফের মধ্যে ফেলে দিলাম। পরের দিন সকালে রাকার শক্ত প্রাণহীন দেহটা সকলে আবিষ্কার করল। প্রচুর মদ খাওয়ার অভ্যাস যে তার ছিল সেকথা সবাই জানতো। তাই তার মৃত্যুর জন্যে আমাকে কেউ দায়ী করল না। এইভাবে আমি প্রতিশোধ নিলাম; এবং বছরে প্রায় পনের হাজার ফ্রাঁ আয়ের অধিকারিণী হলাম আমি। পৃথিবীতে সৎ হয়ে লাভ কী? গসপেলে যে শত্রুকে ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়েছে তারই বা অর্থ কি?'

কাহিনী শেষ ক'রে লুই স্য আর্দেল বললেন—আমার ধারণা জীবনে এত বেশী কথা আমি আর কখনও বলি নি। এবারে একটু ককটেল খাওয়া যাক চলুন।

একটি ভবঘুরে

[A vagabond]

আজ একমাসের ওপরে র‍্যাঁদেল কেবল ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে। একটা কাজ যোগাড় করার জন্যে সর্বত্র সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রামে কোন কাজ নেই; তাই সে গ্রাম ছেড়েছে। সাতাশ বছরের শক্ত, সমর্থ ছোকরা, পেশায় ছুতোর মিস্ত্রী; কাঠের কাজ সে ভালই জানে। অথচ দু'মাস হল সে বেকার।

বাড়ির বড় ছেলে হওয়া সত্ত্বেও কাজের অভাবে সে সংসারের ঘাড়ে বসে খাচ্ছে। তার দুটি বোন ঠিকে-ঝির কাজ করে, রোজগার করে সামান্য। আর সংসারের সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ জেকিস রঁাদেল কাজের অভাবে বেকার হয়ে অপরের খাবার খাচ্ছে।

টাউন হলে সে কাজের সন্ধ'নে গেল। মেয়রের সেক্রেটারী বললেন শ্রমিক কেন্দ্রতে সে কাজ পাবে। বাড়তি একজোড়া জুতো, একজোড়া ট্রাউজার, একটা শার্ট, আর কিছু দরকারী কাগজপত্র একটা নীল রুমালে বেঁধে লম্বা একটা লাঠির ডগায় ঝোলানো। তারপর সেই লাঠিটা কাঁধের ওপরে চাপিয়ে সে শ্রমিক কেন্দ্রের দিকে রওনা দিল।

কিন্তু কোথায় সেই রহস্যময় শ্রমিক কেন্দ্র যেখানে গেলে কাজ পাওয়া যায়? সে কেবল হাঁটলো, হাঁটলো—রোদে-জলে ভিজে দিনরাত্রি কেবল হাঁটতেই লাগল। শ্রমিক কেন্দ্রের দেখা আর পেল না। প্রথমে সে ভেবেছিল ছুতোর মিস্ত্রীর কাজই সে করবে; কিন্তু অনেক ছুতোরের দোকানে শুনল কাজের অভাবে কিছুক্ষণ আগেই সেসব জায়গায় ছাঁটাই হয়েছে। সেই জন্য সে ঠিক করল হাতের কাছে সে যা পাবে তাই করবে। সুতরাং সে যুদ্ধজাহাজে কাজ করল, ঘোড়ার আস্তাবল পরিষ্কার করার কাজ নিল; রাস্তায় পাথর ভাঙলো। মালিকদের প্রলুব্ধ করার জন্যে নামমাত্র মজুরি নিল সে। এত কম মজুরি নিতে তার নিজেরই লজ্জা করছিল। কিন্তু এত ক'রেও মাঝে-মাঝে দু'তিন-দিন ছাড়া স্থায়ী কাজ সে যোগাড় করতে পারল না।

বর্তমানে সপ্তাহখানেক সে বেকার। টাকা পয়সাও তার খরচ হ'য়ে গিয়েছে। রাস্তায় এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে সে একটা পাউরুটি ভিক্ষে করে এনেছিল। এখন সে তাই চিবোচ্ছে! সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শরতের শেষ হল ব'লে। ভারি মেঘ জমেছে আকাশে। মনে হল, এখনই বৃষ্টি নামতে পারে। ক্লান্ত পা দুটি টানতে-টানতে পরিশ্রান্ত দেহে সে কোনরকমে হাঁটতে লাগল। রঁাদেলের পেটে তখন খিদের আগুন জ্বলছে। এই রকম খিদে পেলেই নেকড়েরা মানুষকে আক্রমণ করে। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বেশী পদক্ষেপ এড়ানোর জন্যে সে লম্বা-লম্বা পা ফেলতে লাগল; কাঁধের ওপরে লাঠিটাকে সে শক্ত করে বাগিয়ে ধরল; মনে হল, প্রথমে যে মানুষটিকে সে দেখতে পাবে এবং মনে হবে সে খাওয়ার জন্যে বাড়ি যাচ্ছে তাঁকেই সে সজোরে লাঠিপেটা করবে। যেতে-যেতে রাস্তার ধারে আলকাটা মাঠের কিছু অংশ তার নজরে পড়ল। বোঝা গেল ওখান থেকে আলু তোলা হয়েছে। কিছু যদি আলু সে সংগ্রহ করতে পারত তাহলে কিছু শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে তাই দিয়ে সে সুন্দর ডিনার তৈরী করে নিত। কিন্তু চাষীরা সব আলু তুলে নিয়ে গিয়েছে, ফেলে রেখেছে কেবল শিকড়গুলো। আগের দিনের মত সেই কাঁচা শিকড়ই সে চিবোতে লাগল।

গত দু'দিন ধরে, পদক্ষেপ দ্রুত করার সঙ্গে-সঙ্গে, সে মনে-মনে যা ভাবছিল তাই চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছিল। এতদিন সে ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার সুযোগ পায় নি। তার সমস্ত চিন্তাকে সে তার কাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সে বেকার; অজস্র চেষ্টা করেও সে কোন কাজ যোগাড় করতে পারে নি; বার-বার ব্যর্থ হয়েছে; কেউ তার দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, কেউ ঘৃণার সঙ্গে তাকে দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে; তাকে অকেজো ভবঘুরে বলে অপমান করেছে। এই রকম একটা মানসিক অবস্থায় সে বার-বার নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে লাগল—তুমি বাড়িতে থাকলে না কেন? হাতের শক্তি থাকতেও যেকোন কাজ যোগাড় করতে পারছে না; তার আত্মীয়স্বজন কপর্দকহীন অবস্থায় যারা বাড়িতে বসে রয়েছে তাদের কথা তার মনে পড়ল; এই সব নানা দুশ্চিন্তা প্রতিটি ঘণ্টায়, প্রতিটি মুহূর্তে তাকে উন্মত্ত ক'রে তুলল; আর সমাজের এই জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সে জেহাদ ঘোষণা করতে লাগল।

পাথরের গায়ে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েই সে গজ-গজ করে উঠল—এরা কেউ মানুষ নয়—সব শুয়োরের বাচ্চা শুয়োর। এরা মানুষকে একজন ভাল ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ দিতে পারে না. অনাহারে শুকনো ক'রে মারে। ছুটো পেনিও দেয় না এরা। এখন কী করি? বৃষ্টি সুরু হল। সব শালা শুয়োর।

ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসে রেগে কাঁই হয়ে গেল। ভাগ্য সব সময়ে একচোখো, নিষ্ঠুর। তাই তার সব রাগ গিয়ে পড়ল মানুষের ওপরে। তারপরে দূরে একটা ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখল। এখন ডিনারের সময়। এই দেখে দাঁতে দাঁত চিপে সে গজগজ করে উঠল—'সব শালা শুয়োরের বাচ্চা!' এবং চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি অন্যান্য সামাজিক অন্যায়ের কথা চিন্তা না করেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সে সেই বাড়িটা লক্ষ্য করে এগোতে লাগল—ইচ্ছে হল সেই বাড়ির সবাইকে হত্যা করে সে নিজেই সেই খাবার টেবিলে বসে যাবে। কৈফিয়ৎ দিল—বেঁচে থাকার অধিকার আমার রয়েছে। ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চায়—তবু আমি কিছু কাজ চাই—শুয়োরের বাচ্চারা তা-ও আমাকে দেবে না।—আমার বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার রয়েছে—অধিকার রয়েছে নিঃশ্বাস নেওয়ার—এ-বাতাস কারও পৈত্রিক সম্পত্তি নয়—আমাকে খেতে না দেওয়ার কারও কোন অধিকার নেই।

বরফের মত ঠাণ্ডা কনকনে বৃষ্টি নামল বলে। বাড়ি ফিরে যেতে এখনও তাকে মাসখানেক এইভাবে হাঁটতে হবে। বর্তমানে সে বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছে। সে বুঝতে পেরেছে বাড়িতে ফিরে যাওয়াই তার পক্ষে নিরাপদ। সেইখানে সে সকলের পরিচিত। ছুতোর মিস্ত্রীরই হোক, শ্রমিকের কাজই

হোক—যেকোন কাজই যোগাড় করতে পারলেই তার চলবে। দৈনিক দশটা পেনী রোজগার করতে পারলেই কোনরকমে তার খাওয়া পরাটা চলে যাবে। সে বুঝতে পেরেছে এই বিদেশে অপরিচিত তাকে কেউ কাজ দেবে না—সবাই তাকে সন্দেহের চোখে দেখবে।

বৃষ্টি পড়তে লাগল। বৃষ্টির দাপটে তার জামা কাপড় ভিজে গেল। শীতের কাঁপুনি তার হাড়ের মধ্যে ঢুকে তাকে অস্থির করে তুলল। কোন্ আশ্রয়ে সে তার দেহটাকে রাখবে তা সে বুঝতে পারল না। এই বিরাট বিশ্বে মাথা গোঁজার মত স্থান তার কোথাও নেই। ধীরে-ধীরে রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবীটা ঢেকে গেল। মনে হল, দূরে মাঠে ঘাসের ওপরে কালো মত কী একটা জিনিস বসে রয়েছে। ওটা একটা গরু। সুতরাং সে খানা পেরিয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেল। কেন গেল নিজেই সে জানে না। কাছাকাছি যেতেই গরুটা তার মাথা তুলে রঁাদেলের দিকে তাকালো। রঁাদেল ভাবল—হায়রে, একটা যদি মগ-ও থাকত; তাহলে খানিকটা দুধ দুয়ে নিতে পারতাম। দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকাল; তারপরে তার গায়ের জোরে একটা লাথি মেরে সে বলল—ওঠ।

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল গরুটা। দুধে ভরা তার বিরাট বাঁটগুলি বেশ ঝুলে পড়েছে। সে তার পায়ের নীচে বসে হাত দিয়ে বাঁট টেনে-টেনে যতক্ষণ পারল পেট বোঝাই করে দুধ খেয়ে নিল। তারপরে পরিতৃপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

গরুটা আবার ধপাস করে শুয়ে পড়ল। রঁাদেল তার কাছে বসে গভীর স্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। বৃষ্টি আবার নামল জোরে। ঠাণ্ডা কনকনে বৃষ্টি। কোথায় আশ্রয় নেবে সেই কথাটাই ভাবতে লাগল রঁাদেল। তারপরে হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পোশাকটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সে গরুটার পেটের নীচে ঢুকে গেল। গরুর গাটা বেশ গরম। তারপরে সে সেইখানে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙলো সকালে। বৃষ্টি আর নেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। গরুটা তখনও শুয়ে রয়েছে। সে উঠে পড়ল। পোশাকটা ঠিক ক'রে নিল, জুতো পরল। তারপরে গরুর নাকে একটা চুমু খেয়ে হাঁটতে সুরু করল। টানা দুটি ঘণ্টা একটানা হাঁটার পরে আবার সে ক্লান্ত হয়ে ঘাসের ওপরে বসে পড়ল। দিনটা ছিল রবিবার। গির্জায় ঘণ্টা বাজছিল। রঙ-বে-রঙের পোশাক প'রে মেয়ে-পুরুষের দল—কেউ হেঁটে, কেউ গরুর গাড়ীতে চড়ে গির্জার দিকে যাচ্ছিল এগিয়ে।

হঠাৎ সে দেখল একটা হৃষ্ট-পুষ্ট চাষী একপাল মেষ নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে রয়েছে পাহারাদার একটা কুকুর। সে কাছাকাছি আসতেই রঁাদেল তার মাথার টুপীটা খুলে বলল—আমি না খেতে পেয়ে মরছি।

আমাকে একটা কাজ করে দিতে পারেন ?

লোকটি চোখ পাকিয়ে বলল—রাস্তার লোককে আমি কোন কাজ দিইনে।

রঁাদেল ফিরে গিয়ে আবার সেই থানার ধারে একটা পাথরের ওপরে গিয়ে বসে রইল। চুপচাপ বসে রইল। কত লোকই তো তার পাশ দিয়ে এল আর চলে গেল। সব বসে-বসে দেখল সে। তারপরে একজন এলেন। তাঁর সাজ-পোশাক দেখে তাঁকে বেশ সম্ভ্রান্ত বলেই মনে হল। রঁাদেল তাঁর সামনে উঠে গিয়ে বলল—দুটি মাস ধরে আমি কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি। একটা কাজও যোগাড় করতে পারি নি। অথচ আমার পকেটে আধ পেনিও নেই।

সেই ভদ্রলোক বললেন—গ্রামে ঢোকার মাথায় একটা নোটিশ রয়েছে বোধহয় দেখেছ। তাতে লেখা রয়েছে—এই অঞ্চলে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ। আমি এখানকার মেয়র। তুমি যদি এই অঞ্চল থেকে এখনই চলে না যাও তাহলে তোমাকে আমি হাজতে পুরব।

রাগ বাড়ছিল রঁাদেলের ; সে বলল : তাহলে আমাকে হাজতেই পুরুন। তাহলে আমাকে অন্তত না খেয়ে মরতে হবে না।

এই বলে সে যথাস্থানে গিয়ে আবার বসে পড়ল। মিনিট পনের পরে দু'জন পুলিশ ধীর গতিতে তার দিকে এগিয়ে এল। তাদের পোশাক চকচকে। রোদের আলোতে চকচক করছে। উদ্দেশ্য—যেন তাদের সেই চকচকে পোশাক দেখে দুষ্কৃতকারীরা দূরে সরে থাকবে। রঁাদেল জানত ওরা তার জন্যে এসেছে। তবু সে উঠল না। তাদের অগ্রাহ্য করার কেমন যেন একটা গোঁ জন্মে গেল তার। ব্রিগেডিয়ার তার কাছে এসে বলল—তুমি এখানে কী করছ ?

বিশ্রাম নিচ্ছি।

কোথা থেকে আসছ ?

লা মঁাচি।

ওখানেই থাক ?

হ্যাঁ।

দেশ ছাড়লে কেন ?

কাজ জোগাড় করার জন্যে।

কোন কাগজপত্র রয়েছে ?

রয়েছে।

দেখি, দাও।

পকেট থেকে বার করে রঁাদেল তার সার্টিফিকেট আর ছেঁড়াখুড়া কাগজগুলি বার ক'রে ব্রিগেডিয়ারের হাতে দিল। ব্রিগেডিয়ার সেগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন, তারপরে সেগুলি দিলেন তাকে ; তাঁর চেহারা দেখে

মনে হল তাঁর চেয়ে বেশী চতুর কোন লোক যেন তাঁর সঙ্গে রসিকতা করেছে।

একটু ভাবলেন তিনি; তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কাছে কোন টাকা-কড়ি আছে?

না।

কিছুই নেই?

কিছুই নেই।

তুমি বেঁচে আছ কী করে?

লোকের দয়ায়।

তাহলে তুমি ভিক্ষে কর?

রাঁদেল এবার বেশ রেগেই বলল—হ্যাঁ, সম্ভব হলে করি বইকি।

আমি রাস্তায় তোমাকে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। জীবিকা নির্বাহ করার মত তোমার কোন সঙ্গতি নেই। সুতরাং আমার সঙ্গে আসতে আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি।

চলুন। এই বলে সে উঠে পড়ল। আমাকে হাজতে পুরে দেবেন চলুন। তাহলে অন্তত বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পারব।

গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল তারা; যখন গ্রামের ভেতরে এসে পৌঁছল তখন গির্জায় প্রার্থনা সভা সুরু হয়েছে। চারপাশে লোকে লোকারণ্য। দু'জন পুলিশের মধ্যে রাঁদেলকে দেখে অনেকেই তাদের চারপাশে জড় হল, ঘৃণার সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা যে একজন ক্রিমিন্যাল সে বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না। তাদের ইচ্ছে গেল তার দিকে ঢিল ছুঁড়তে; তাদের মনে হল লোকটার চামড়া ছিঁড়ে ফেলে, পায়ের তলায় মাড়িয়ে তাকে পিষে ফেলে। লোকটা ডাকাতি করেছে, না, খুন করেছে—এই কথাটা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করল তারা। কসাই বলল, লোকটা সৈন্যবাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছে। তামাক বিক্রীর দোকানদার বলল, সেদিন সকালেই লোকটা তাকে একটা অচল ফ্রাঁ দিয়ে গিয়েছে। লোহার দোকানদার বলল লোকটা ম্যালেট-এর বিধবাকে খুন ক'রে পালিয়েছিল। ছ'মাস ধরে পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

মিউনিসিপ্যাল কাউনসিলে সেই মেয়রের সঙ্গে দেখা হল রাঁদেল-এর। তাকে দেখেই মেয়র বললেন—আ; তুমি? তোমাকে যে হাজতে পোরা উচিৎ সে কথা আগেই তোমাকে আমি বলেছিলাম। ব্রিগেডিয়ার, লোকটার অপরাধ কী?

লোকটার কোন ঘরবাড়ি নেই স্যার; জীবিকা রোজগার করার মতও ওর কোন সংস্থান নেই। ভিক্ষে করছে এরকম অবস্থায় ওকে আমরা গ্রেপ্তার করি। কিন্তু লোকটার ভাল প্রশংসাপত্র রয়েছে; আর যে সব কাগজ রয়েছে সেগুলিও সব খাঁটি।

কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা ক'রে মেয়র তো হতভম্ব হয়ে গেলেন ; তারপরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ সকালে রাস্তার ওপরে বসে তুমি কী করছিলে ?

কাজ খুঁজছিলাম।

কাজ ? বড় রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে ?

আপনি কী করে মনে করেন যে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকলে আমি কাজ পাব ?

তারা দু'জনে দু'জনের দিকে ভিন্ন জাতের হিংস্র জন্তুর মত তাকিয়ে রইল। তারপরে মেয়র বললেন—আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি ; কিন্তু আর যেন কেউ তোমাকে আমার সামনে হাজির না করে।

আপনি বরং আমাকে হাজতে ক'টা দিন আটকিয়ে রাখুন। গ্রামের পথে ঘুরে-ঘুরে আমি ক্লান্ত।

চুপ কর। ব্রিগেডিয়ার, গ্রাম থেকে দু'শ গজ দূরে নিয়ে গিয়ে একে ছেড়ে দাও। ও চলে যাক।

রঁাদেল বলল—আমাকে অন্তত কিছু খেতে দিন।

হা-হা করে হেসে উঠলেন মেয়র—তাই বটে ! খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ?

রঁাদেলও নাছোড় বান্দা। বলল—আপনি যদি আমাকে অনাহারের মুখে ঠেলে দেন তাহলে কোন অন্যায় কাজ করতে আমাকে বাধ্য করবেন। ওই দুটি মোটা লোকের কাজ তাহলে বাড়বে।

মেয়রের সেই এক কথা—ওকে নিয়ে যাও।

দুটি পুলিশ তার দুটো হাত ধরে টানতে-টানতে তাকে বার করে নিয়ে গেল। কোন বাধা দিল না রঁাদেল। নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হয়ে ব্রিগেডিয়ার বললেন—দূর হও। আবার যদি আমাদের হাতে পড় তাহলে মজাটা বুঝতে পারবে বাছাধন।

হাঁটতে শুরু করল রঁাদেল। কোথায় যাচ্ছে তাও সে জানে না। মিনিট কুড়ি ধরে সে একটানা হাঁটতে লাগল। এতই বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল যে কোন কিছু চিন্তা করার শক্তিও তার ছিল না। একটা ছোট বাড়ির পাশ দিয়ে সে যাচ্ছিল ; হঠাৎ সুগন্ধ খাবারের গন্ধে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল জানালা অর্দ্ধেকটা খোলা রয়েছে। রান্না মাংসের গন্ধ ছাড়ছে ঘরের ভেতর থেকে। খিদের জ্বালায় সে এমনই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে বন্য পশুর মত সে দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। দরজায় ধাক্কা দিল। কোন সাড়াশব্দ পেল না। চীৎকার করে ডাকল। কেউ উত্তর দিল না। মনে হল, বাড়িতে যেন কেউ নেই। তখন সে খোলা জানালাটার কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। তারপরে এক-লাফে ভেতরে ঢুকে গেল। হ্যাঁ, চমৎকার-চমৎকার খাবার রান্না হচ্ছে।

টেবিলের ওপরে দু'জনের খাবার জায়গা করা হয়েছে। নিশ্চয় ওরা গির্জায় গিয়েছে। ফিরে এসে খাবে। এই সুযোগে সে খেতে শুরু করল। প্রথমে রুটিটায় গোগ্রাসে কামড় দিল; সঙ্গে-সঙ্গে গিলে ফেলল। তারপরে মাংস খেল পেট ভরে; তারপরে শেষ করল ক্যাবেজ, ক্যারট আর পেঁয়াজ। বেশ কিছুটা খাওয়ার পরে তার তেষ্টা পেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা ব্র্যানডির বোতল দেখতে পেল। বোতল থেকে গ্লাসে ভর্তি করে সেই ব্র্যানডি ঢক ঢক করে গলায় ঢাললো আর খেতে লাগলো খাবার। মনে হল এবারে তার পেট ফেটে যাবে। তার কপালে ঘাম জমে উঠল। হঠাৎ গির্জায় বেল বাজতে লাগল। প্রার্থনাসভা ভাঙবে এবার। বাকি রুটিটা একটা পকেটে আর ব্র্যানডির বোতলটা আর এক পকেটে ঢুকিয়ে জানালা টপকে সে রাস্তার ওপরে লাফিয়ে পড়ল। তারপর নির্জন রাস্তা ছেড়ে সে সোজা মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। ভরা পেটে মনের আনন্দে সে মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকল; গাছের ছায়ায় হাঁটতে-হাঁটতে সে ব্র্যানডির বোতলটা খুলে চুমুক দিতে লাগল; হালকা মন আর দেহ নিয়ে সে পুরানো একটা গান গাইতে শুরু করল।

হাঁটতে-হাঁটতে সে হঠাৎ একটা নীচু রাস্তার ধারে গিয়ে হাজির হল; দেখল একটি মেয়ে, বেশ লম্বা চেহারা, বোধহয় কোন বাড়ির চাকরানীই হবে, দুটো দুধের ভাঁড় নিয়ে আসছে। শিকারী কুকুরের মত নীচু হয়ে সে তাকে দেখতে লাগল। কিন্তু মেয়েটি তাকে দেখতে পেল না; মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করল—কী গান গাইছিলে তুমি? সে কোন উত্তর না দিয়ে প্রায় ছ' ফুট নীচে খাতের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। রঁাদেলকে হঠাৎ তার সামনে লাফিয়ে আসতে দেখে মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল—ওঃ! কী ভয়ই না পেয়েছিলাম।

তার কোন কথাই রঁাদেলের কানে গেল না। সে তখন অন্য ক্ষুধায় বুভুক্ষু, গত দুটি মাস তার যৌনক্ষুধা অতৃপ্ত রয়েছে। সেই ক্ষুধা অন্য ক্ষুধার চেয়ে অনেক বেশী তীব্র, অনেক বেশী যন্ত্রণা তার। একে সে যুবক, তার ওপর মদে সে তখন চুর হয়ে রয়েছে; তারও ওপরে প্রকৃতিদত্ত ক্ষুধা তাকে অস্থির করে তুলল। তার অর্দ্ধ উন্মুক্ত মুখ আর প্রসারিত বাহুর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি চমকে উঠল। রঁাদেল তার ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি দিতেই তার দুধের ভাঁড় দুটি ছিটকে মাটিতে সশব্দে পড়ে গেল। সব দুধ ছড়িয়ে পড়ল। তারা দুজনেই জড়াজড়ি ক'রে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। মেয়েটি চীৎকার করে উঠল; কিন্তু চীৎকার করা অর্থহীন মনে ক'রে এবং সাহায্যের জন্যে কেউ তার ডাকে সাড়া দেবে না এই ভেবে, সে রঁাদেলের আকাঙ্খা পূর্ণ করল। এই কাজে সে খুব একটা রাগে নি; কারণ যুবক রঁাদেলের চেহারা ভালই, আর প্রকৃতির দিক থেকে সে মোটেই গুণ্ডাজাতীয় ছিল না।

উঠে দাঁড়িয়ে দুধের ভাঁড়ের অবস্থা দেখে মেয়েটি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল; দুধের

দাম তার কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে একখানা আস্ত কাঠের টুকরো সে রঁাদেলের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। রঁাদেল মনে করল এই বলাৎকারের জন্যেই মেয়েটি তার ওপর চটেছে। সে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হ'ল; তারপরে, বলাৎকার করার জন্যে ভয় পেয়ে সে ছুট দিল। তাই দেখে মেয়েটি ঢিল ছুড়তে লাগল; দু'চারটে ঢিল এসে তার পিঠেও পড়ল।

রঁাদেল অনেকক্ষণ ধরে ছুটে-ছুটে শেষপর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আস্তার ধারে বসে পড়ল। কোথায় যাচ্ছে, কী করছে বা কী করবে কিছুই সে বুঝতে পারল না। মাথাটা কেমন তার গুলিয়ে গেল। সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে তার ক্লান্তি আর কোনদিনই তাকে এমনভাবে অভিভূত করে নি। আর কিছু ভাবতে পারল না সে। অচিরে সে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই দুটি লোকের সেই দুটি ঝাঁকুনিতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চোখ মেলে দেখল—সকাল বেলাকার পুলিশ তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার ঠাট্টা করে বললেন—জানতাম, আবার তোমাকে ধরব।

কোন উত্তর না দিয়ে রঁাদেল উঠে পড়ল; তারপরে পুলিশের পিছু-পিছু হাঁটতে লাগল। শরৎকালের সন্ধ্যা ভারি কালো হয়ে আসছিল জনপদের ওপরে। আধ ঘণ্টার মধ্যে তারা গ্রামের মধ্যে এসে হাজির হল। ঘটনাটা ইতিমধ্যে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের প্রতিটি ঘরের সামনেই লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি পুরুষ মনে করল লোকটি তাদের সম্পত্তি অপহরণ করেছে, প্রতিটি নারী ভাবল, লোকটি তাদের ওপরে বলাৎকার করেছে। অপমান আর গালাগালি দেওয়ার জন্যে সবাই তাকে তাদের কাছে পেতে চায়। বিদ্রূপ করতে-করতে লোকেরা, পিছু-পিছু এগিয়ে গেল।

তাকে দেখে মেয়র খুব খুশি হয়ে হাতে-হাত ঘষতে-ঘষতে বললেন—'বটে, বটে! আবার এসেছ? তোমাকে রাস্তায় দেখেই সেকথা আমি বলেছিলাম যে এখানেই তোমাকে আসতে হবে।' তারপরে আরও খুশি হয়ে বললেন—ওরে নোংরা হতভাগা জানোয়ার, এবার তোকে কুড়ি বছরের জন্যে ঘানি টানতে হবে।

ভাঁড়

[The mounte banks]

ইডেন রুনিস থিয়েটারের চতুর ম্যানেজার কমপারদি—থিয়েটারের সমালোচকরা ওই নামে তাকে ডাকতো। কিছুদিন ধরে তার থিয়েটারে

লোক হচ্ছিল না। দুর্ভাগ্য তার পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তা সত্বেও, পরের দিনের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই আগামী দিনের চাঞ্চল্যের সাফল্য অর্জন করার উদ্দেশ্য নিয়ে সে তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খরচ করে বসল। প্রায় একটি সপ্তাহ ধরে পরবর্তী অভিনয়ের বিজ্ঞাপন সে চারপাশে ছড়িয়ে দিল—দেওয়ালের গায়ে, দোকানের সামনে, চলন্ত গাড়ীর পেছনে, গাছের ডালে—সর্বত্র এই বিজ্ঞাপন দেখা গেল। এই বিজ্ঞাপন ছিল দুটি স্বাস্থ্যবান যুবকের। মনে হবে দু'জনেই কুস্তিগীর। এদের মধ্যে যার বয়স কম দেখাচ্ছিল সেই ছোকরাটি হাত দুটি মুড়ে দাঁড়িয়েছিল। পথের ধারে নানারকম ওষুধপত্রের শিশি বোতল ছড়িয়ে ক্যানভাসারেরা যেমন অর্থহীন শূন্য হাসিটি ফুটিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে, ছোকরাটির মুখের ওপরে সেই রকমের একটি অন্তঃসারশূন্য হাসি ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় যুবকটির হাতে একটি রিভলভার। মেকসিকো দেশের ট্র্যাপারের মত সে তার পোশাকটি পরেছে। সব জায়গাতেই বিরাট-বিরাট বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে যে আগামী সোমবার ইডেন কনিস থিয়েটারে এই দুটি কুস্তিগীরের সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাৎকার হবে।

গোটা শহর সরগরম হয়ে উঠল ; কারণ, জোরাল বিজ্ঞাপনই মানুষকে আকর্ষণ করে বেশী। এই দু'জন মনতিকিয়োররা [যাদের বিজ্ঞাপন অতটা কলোয়া ক'রে চারপাশে প্রচার করা হয়েছে] অনেকটা ক্যাশন্যাবল খেলনার মত। কিছুদিন আগে রোজ পিটি নামে যে ভ্রষ্টা নারীটি 'ওসকা ইনকার' নাটকে অভিনয় করতে করতে তৃতীয় আর চতুর্থ অঙ্কের মাঝখানে কেটে পড়েছিল এরা স্টেজে নেমেছিল ঠিক তারই পরে। প্রেমশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্যে অভিনেত্রীটি সতের বছরের একজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল। এ কাজে যে বিপদ রয়েছে, রক্তপাত এমন কি মৃত্যুরও সম্ভাবনা রয়েছে তা জেনেই তারা পালিয়ে গিয়েছিল। এককথায়, কোন বিপদকেই তারা গ্রাহ্য করে নি। এই বেপরোয়া মনোবৃত্তিটাই মহিলাদের চিরকাল খুশী ক'রে এসেছে। এই রকম একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতিই এক নিষ্ঠুর আনন্দে তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, ভাবাবেগে বিবর্ণ হয়ে পড়ে তারা। ফলে হই-হই করে টিকিট বিক্রী হ'তে লাগল—অনেকদিনের অগ্রিম বুকিং-ও হয়ে গেল। ম্যানেজার তো আনন্দে ডগমগ! তিল ধারণের আর জায়গা নেই।

কাউনটেস রেজিনা দি ভিলেগবি তাঁর খাস কামরায় সোফার ওপরে শুয়ে শুয়ে অলসভাবে পাখার হাওয়া খাচ্ছিলেন। চারপাশে ঘিরে ছিল তাঁর তিন চার জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁরা হলেন সেন্ট মার্স মতার্লভি, টম ক্ষেকিল্ড এবং তাঁর সম্পর্কে এক ভাই, আর মাদাম দি রোহেল। শেষোক্ত ভদ্রমহিলা পাখীর গানের মত অবিশ্রাম হাসছিলেন। সন্ধ্যে হয়-হয়। ফুলের বেশ মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। ঘরের মধ্যে তখনও আলো জ্বালা হয়নি। সকলের

গল্পগুজব হাসি ঠাট্টায় কামরার মধ্যে একটা তালগোল পাকানো শব্দ গমগম করছিল।

সেণ্ট মার্স উচ্ছৃঙ্খল প্রেমের একটা গল্প শুরু করতে যাবেন এমন সময় কাউনটেস হঠাৎ তাঁর আঙুলে হাত দিয়ে বললেন—চা ঢেলে দাও দেখি। ভদ্রলোক ছোট-ছোট চায়না কাপে চা ঢালতে-ঢালতে জিজ্ঞাসা করলেন—মিথ্যাবাদী খবরের কাগজ যেরকম উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছে, মনটিফিয়োররা কি সত্যিই অত ভাল অভিনয় করে?

টম শেফিল্ড আর অন্য সবাই তৎক্ষণাৎ আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন, এমন সুন্দর অভিনয় আগে তাঁরা দেখেন নি।

কাউনটেস রেজিনা চুপচাপ বসে তাঁদের আলোচনা শুনছিলেন এবং একটা গোলাপের পাপড়ী নখ দিয়ে ছিঁড়ছিলেন।

আলোচনা শুনেই মাদাম রোহেলের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তিনি বললেন—ওদের অভিনয় দেখতে কী ইচ্ছেই না আমার যায়?

ধর্মযাজকের মত গম্ভীর স্বরে কাউনটেস বললেন—আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি বোন যে ওটা এমন একটা জায়গা যেখানে কোন সম্ভ্রান্ত মহিলারই যাওয়া উচিৎ নয়।

সবাই একবাক্যে তাঁকে সমর্থন জানাল। তবু দিনদুই পরে কাউনটেস রেজিনা নিজেই একদিন ওই অভিনয় দেখতে গেলেন। কালো পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে, কালো ঘোমটা দিয়ে তিনি পেছনের একটা বক্স নিয়ে বসলেন।

কাউনটেস রেজিনার অনুভূতি বলতে কিছুই ছিল না। কনভেণ্ট থেকে পাশ ক'রে বেরোনোর পরেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল; স্বামীকে তিনি ভালও বাসতেন না; এমন কি স্বামীকে তিনি ঠিক পছন্দও ক'রে উঠতে পারেন নি। রবিবার দিন তিনি যখন প্রার্থনা শেষ করে গির্জার ধাপ দিয়ে নীচে নেমে আসতেন তখন তাঁর সেই শান্ত মুখের দিকে তাকালে মনে হোত ভদ্রমহিলা একেবারে অনূঢ়া—ভাজা মাছটিও উলটে খেতে তিনি জানেন না।

বেশ ভয়ে-ভয়েই তিনি একটু আড়মোড়া ভাঙলেন· কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলেন একটু; উদ্দাম সুর-ঝঙ্কৃত বেহালার তারের মত কাঁপতে লাগলেন; তারপরে হাত দুটো মুঠো করে তিনি সেই বহুপ্রশংসিত দুটি ভণ্ড অভিনেতার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীর দিকে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই তাকিয়ে দেখলেন। বেশ ঘৃণা আর দম্ভের সঙ্গে তিনি ওই দুটি স্বাস্থ্যবান মুক্ত আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত জানোয়ারের সঙ্গে রোগা ডিগডিগে কুৎসিত দেখতে ইংরেজ পরিচালকের তুলনা করলেন।

কাউনটেসের স্বামী জেনারেলের নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্যে তিনি গ্রামে গেলেন। যেদিন তিনি গ্রামের পথে রওনা হলেন সেদিন সন্ধ্যাতেই কাউনটেস আবার থিয়েটারে হাজির হলেন।

কামনার জ্বালায় দগ্ধ হ'য়ে তিনি ছোট্ট একটা কাগজে দু'ছত্র লিখে ফেললেন। এই সব ক্ষেত্রে মহিলারা সাধারণতঃ যা লিখে থাকে, তিনিও অবিকল সেই ক'টি কথাই লিখলেন—'অভিনয়ের পরে স্টেজের দরজার কাছে একটি গাড়ী আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে। আপনাকে পুজো ক'রে এমন একটি অজ্ঞাত রমণী'।

তারপরে যে অভিনেতাটি পিস্তল ছোঁড়ায় দক্ষ তার হাতে দেওয়ার জন্যে চিঠিটা তিনি একজন কর্মচারীর হাতে দিলেন। এদের হাতেই বক্সের চাবি-কাঠি থাকে।

হায়রে, সেই দুর্গন্ধময় ঘোড়ার গাড়ির ভেতরে, উদ্দাম আসঙ্গলিপ্সায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে প্রতিনায়কের জন্যে চুপচাপ বসে থাকাটা কি কম কষ্টকর? গাড়ির ওপরে গাড়োয়ান বসে-বসে ঝিমুচ্ছে; তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিজের বাড়ির ঠিকানা দেওয়াটা কি লজ্জার কথা! জানালার ধারে মুখটা চিপে তিনি বসে রইলেন; অভিনেতাদের "প্রবেশ পথে" যে গ্যাসের আলো জ্বলছিল সেই আলোতে অন্ধকার পথের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। এই পথের ওপর দিয়েই পুরুষেরা পোড়া সিগারেট চিবোতে-চিবোতে অনবরত যাতায়াত করছে।

অভিনেতাটি ব্যাপারটাকে রসিকতা বলে মনে করেছিল। সে গাড়ীর কাছে এগিয়ে এল; কিন্তু কাউনটেস একটি কথাও বলতে পারলেন না; কারণ, অসৎ আনন্দ ভেজাল মদের মতই উত্তেজিত করে মানুষকে। তিনি তার কাছে নির্লজ্জভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। এই দেখে অভিনেতার মনে হল সে একটি পথচারিণী বারবণিতার সামনে এসে পড়েছে। সারা শরীরে রেজিনার কেমন যেন অদ্ভুত-অদ্ভুত শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল। তিনি তার গা ঘেঁষে বসলেন; তিনি যে কত সুন্দরী এবং লোভনীয়া সেই সংবাদটা তাকে দেওয়ার জন্যেই বোধহয় তিনি মাঝে-মাঝে ঘোমটা তুলতে লাগলেন। মল্লযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে কুস্তিগীররা যেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তারাও সেই রকম নির্বাক হয়ে বসে রইল। রেজিনার প্রবল ইচ্ছে হল তাকে জড়িয়ে ধরতে, তার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে; আর সতী স্ত্রী হওয়ার ফলে এতদিন তিনি যে অপরিচ্ছন্নতার স্বাদ পান নি এখন সেই স্বাদটা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে। কামার্ত হরিণের মত হোটেলে কয়েক ঘণ্টা একসঙ্গে কাটানোর পরে পুরুষটি নিজেকে টেনে তুলল; তারপরে অন্ধের মত হাতড়াতে-হাতড়াতে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। রেজিনা হাসতে লাগলেন; তাঁকে দেখে মনে হল তিনি এখন অপাপবিদ্ধা অনূঢ়া তরুণী; প্রার্থনা ভাঙার পরে প্রতিটি রবিবার সকালে যেমন তাঁকে মনে হয় ঠিক তেমনি।

এরপরে তিনি দ্বিতীয়টিকে অধিকার করলেন। এই যুবকটি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ; তার মাথার মধ্যে রোমান্স গিজগিজ করছে। যে নারীটি

তাকে নিয়ে নিছক খেলা করছে, সে বিশ্বাস করেছিল সেই নারীটি তাকে সত্যিকার ভালবাসে। ফলে, এই ধরনের চোরা-মিলনে সে মোটেই খুশী হয় নি। এ নিয়ে সে তাঁকে অনেক প্রশ্ন করেছিল, অনুরোধ করেছিল অনেক; কিন্তু কাউনটেস তাকে নিয়ে কেবল করেছিলেন মস্করা। তারপরে এই দুটি কুস্তিগীরকে তিনি পর্যায়ক্রমে দেহ দিতে লাগলেন। তিনি তাদের বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এ ব্যাপার নিয়ে তারা যেন তৃতীয় কারও সঙ্গে আলোচনা না করে, অন্যথায় তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দেবেন এই বলেও তিনি শাসিয়েছিলেন তাদের। ফলে, তিনি যে তাদের দু'জনকেই আনন্দ দিচ্ছেন সেকথা তারাও জানতে পারেনি। একদিন রাত্রিতে তাদের মধ্যে অল্প'বয়সের ছোকরাটি তাঁর পায়ের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বলল—তুমি যে আমাকে ভালবাস, আমাকে পেতে চাও—এতে তোমার উদারতাই প্রকাশ পাচ্ছে। ভেবেছিলাম এই ধরনের প্রেম বোধহয় নভেল-নাটকেই দেখা যায়, আর তোমার মত ধনী কাউনটেসরা আমাদের মত ভাঁড়দের নিয়ে চিরকাল রসিকতাই করেন।

রেজিনা তাঁর গৌরবর্ণ ভ্রূদুটি কুঞ্চিত করলেন।

সে বলল—রাগ করো না। আমি তোমার পিছু-পিছু গিয়ে তোমার বাড়ি দেখে এসেছি, তোমার আসল নাম কী তাও আমি জেনেছি, তুমি যে বিরাট ধনী তাও আর অজানা নেই।

রাগে কাঁপতে-কাঁপতে রেজিনা চীৎকার ক'রে উঠলেন—মূর্খ কোথাকার! শিশুদের মানুষ যেমন সহজে বুঝিয়ে দেয় তোমাকেও তারা সেইভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে।

না; আর ওকে ভাল লাগছে না তাঁর। ছোকরাটা তাঁর নাম জেনে ফেলেছে, এবার হয়ত তাঁর সঙ্গে একটা হিসাব-নিকাশ করতে বসবে। নির্বাচনের আগে কাউনটেরও ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া, এদের দু'জনকেই তিনি করায়ত্ত ক'রে ফেলেছেন। ওদের ওপরে তাঁর আর কোন আকর্ষণ নেই। এখন অন্য স্থানে আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করতে হবে তাঁকে।

পরের দিন রাত্রিতে তিনি চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীরকে বললেন—শোন; তোমার কাছে গোপন ক'রে লাভ নেই। আমি তোমার সঙ্গীটিকে পছন্দ করি; তাকে আমি আমার সর্বস্ব দিয়েছি। তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে আর আমি রাজি নই।

আমার বন্ধু!

হ্যাঁ। তাতে দোষটা কী? পাত্র পরিবর্তন করতে আমার ভালই লাগে।

এই কথা শুনে সে উন্মত্ত আক্রোশে ফেটে পড়ল; হাত দুটো মুঠো ক'রে

রেজিনার দিকে ছুটে গেল সে। মনে হল রেজিনাকে বোধহয় সে মেরেই ফেলবে। রেজিনা চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললেন। কিন্তু যে দেহটাকে সে এত আদর করেছে তাকে আঘাত করতে সে পারল না; মাথা নীচু ক'রে আহত গলায় বলল—বেশ। তুমি যখন চাও না তখন আমাদের আর দেখা হবে না।

ইডেন রুনিস থিয়েটারে আবার যথারীতি খেলা সুরু হয়েছে। প্রায় বার গজ দূরত্বের মাথায় দাঁড়িয়ে দু'জন কুস্তিগীর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ছোট কুস্তিগীরের মুখের ওপরে ইলেকট্রিকের আলো পড়েছে; সে বেশ বড় সাদা একটি লক্ষ্যের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর অপরজন ধীরে ধীরে, খুব আস্তে-আস্তে তার ছায়া লক্ষ্য ক'রে বুলেট ছুঁড়ছিল। অদ্ভুত দক্ষতা আর একাগ্রতার সঙ্গে কাঠের বোর্ডের ওপরে গুলির আঘাত হানছিল সে। দর্শকদের প্রচুর করতালির শব্দে অর্কেস্ট্রার সুর চাপা পড়ে গেল; আর ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ একটা ভয়ার্ত আর্তনাদে প্রেক্ষাগৃহের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত বিদীর্ণ হয়ে গেল। মূর্ছা গেল মহিলারা। বেহালা গেল থেমে। দর্শকরা ছোট ছোট দলে হইচই করতে লাগল। বয়সে ছোট কুস্তিগীরটি প্রাণহীন অবস্থায় একতাল মাংস-পিণ্ডের মত মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়ল। একটা বুলেট তার কপালের ওপরে গভীর ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। অন্য কুস্তিগীরটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের ওপরে একটা উন্মত্ত ক্রোধের কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। কাউনটেস তাঁর বক্সের গায়ে হেলান দিয়ে বসে নির্বিকারভাবে হাতপাখা নাড়তে লাগলেন। দেখে মনে হল, তিনি যেন প্রাচীন পুরাণের একটি নিষ্ঠুর দেবী ছাড়া কিছু নয়।

পরের দিন বিকাল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কাউনটেস যথারীতি তাঁর জাপানী কায়দায় সুন্দরভাবে সাজানো খাস কামরায় বসেছিলেন। এমন সময় যেরকম উদাসনীভাবে তিনি কথা বললেন তা শুনলে অবাক লাগে—শুনছি নাকি ওই বিখ্যাত ভাঁড়দের একজন হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে—ওই যে মনটা, না, মনতি—কী নাম ওদের ?

মনতিফিয়োর, মাদাম।

কুৎসিত

[Ugly]

সত্যিকথা বলতে কি আধুনিক যুগটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত মানুষের স্বর্ণযুগ ; এ যুগে সব মধ্যবিত্তরাই সাম্যবাদে বিশ্বাসী। এডগার অ্যালেন পো বলেন, যুগটাই হচ্ছে ঘৃণিত একটি আয়তক্ষেত্রের মত। এই মনোরম যুগে সবাই সাম্যবাদের স্বপ্নে মশগুল। ফলে এখন কোন দেশের প্রেসিডেণ্ট আর একটি চাপরাশির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাটা কঠিন ব্যাপার। এই দিনগুলি সুন্দর আগামী একটি দিনের সূচনা করছে—যেদিন পৃথিবীর সব জিনিসই নিরানন্দ হয়ে যাবে, কারও ওপরে কেউ কোন পক্ষপাতিত্ব দেখাবে না—এই যুগে সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য হবে কুৎসিত হওয়া।

এই বিশেষ গুণটি নিখুঁত প্রত্যয়ের সঙ্গে বাস্তবে রূপায়িত করার অধিকার নিশ্চয় লেবুর ছিল। ভয়ঙ্করতম বীঃত্বের সঙ্গে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন। এমন কি আমাদের যুগে যাঁরা কুৎসিত বলে নিজেদের সুনাম কিনেছিলেন আমাদের আত্মনিয়াস লেবু তাঁদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ কুৎসিত বলে পরিচিত করেছিলেন নিজেকে এবং এই কুৎসিত বলে পরিচিত হওয়ার জন্যে জীবনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, যদিও অবশ্য মিরাবুর মত ভয়ঙ্কর রকমের কুৎসিত হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি।

না ; সে সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। কুৎসিতের সৌন্দর্য তাঁর ছিল না। তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা হচ্ছে তিনি কেমন কুৎসিত ছিলেন—এককথায় যাকে বলা হয় কুৎসিত রকমের কুৎসিত। তাঁর পিঠে কুঁজও ছিলনা, হাঁটুও বাঁকা ছিল না। ভুঁড়িও ছিল না তাঁর। তাঁর পা দুটো চিমটের মত ছিল না, হাত দুটি খুব একটা বড়ও নয় ছোটও নয়। তবু সারা শরীর জুড়েই কোথায় যেন তাঁর একটা অসামঞ্জস্য ছিল। কেবল চিত্রকরের চোখেই নয়, যে-কোন সাধারণ লোকের চোখেও সেটা ধরা পড়ত। রাস্তায় চলার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই ঘুরে না তাকিয়ে যে-কোন লোকই ভাবতে বাধ্য হোত—হায় ভগবান, একখানা চেহারা বটে! কী কদর্য! কী কদর্য!

তাঁর মাথার চুলগুলিও বিশেষ কোন রঙের ছিল না। কিছুটা তামাটে—তার সঙ্গে মেশানো কিছুটা হলুদ রঙ। অবশ্য চুল বলতেও বিশেষকিছু ছিল না তাঁর। তবে তার অর্থ এই নয় যে তিনি টেকো ছিলেন,'ওই যা একটুখানি টাক—মাথার চাঁদির কিছুটা অংশ বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল—ঘি রঙের চাঁদি। ঠিক ঘি-ও নয় ; নকল মাখনের রঙের মত—তাও বিবর্ণ। তাঁর মুখের রঙটাও ওই ভেজাল মাখনের মত—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তাঁর মাথার খুলিটিও তথৈবচ। তাঁর মুখটিও তথৈবচ। একেবারে ভয়ঙ্কর রকমের কুৎসিত। তবে ভাববেন না এই ক'টা কথাতেই আমি তাঁকে বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলাম। তাঁর রূপ বর্ণনায় একটি কথাই কেবল প্রযোজ্য সেই কথাটি হল তাঁকে বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু আপনারা ভুলে যাবেন না যে আস্তনিয়াস লেবু কুৎসিত; এমন কুৎসিত চেহারার মানুষ আপনারা কোনদিন দেখেছেন বলে মনে করতে পারবেন না। আর সব-চেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি যে কুৎসিত তা তিনি নিজেই জানতেন।

এই থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন তিনি মোটেই মূর্খ ছিলেন না, অথবা এই নিয়ে তিনি আক্ষেপ অভিযোগও করতেন না। তবে নিশ্চয় তিনি অসুখী ছিলেন। অসুখী মানুষ সাধারণত তার নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই চিন্তা করে। লোকে তার নাইটক্যাপকে মনে করে মূর্খের টুপী বলে। আবার প্রফুল্লতাকেই মানুষ শ্রদ্ধা করে। আস্তনিয়াস লেবুও সেইরকম সকলের কাছে মূর্খ ব'লে প্রতিপন্ন হলেন—প্রতিপন্ন হলেন বদমেজাজী ব'লে। কুৎসিত বলেই কেউ তাঁকে করুণা দেখাল না।

তাঁর জীবনে কেবল একটিমাত্র আনন্দ ছিল; সেটি হচ্ছে রাত্রিতে সবচেয়ে অন্ধকার রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো আর অন্ধকার-পথযাত্রীদের কাছ থেকে শোনা—ও সুন্দর অন্ধকারের মানুষ, তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে এস।

হায়রে, এ আনন্দটাই তিনি সকলের সামনে প্রকাশ করতে পারতেন না; তিনি জানতেন, এটিও ক্ষণস্থায়ী। কারণ, মাঝে-মাঝে আহ্বানকারিণীটি বৃদ্ধা এবং মাতাল হলে কিছুটা লাভবান তিনি হতেন বটে; কিন্তু, চিলে-কোঠার ঘরটিতে বাতি জ্বালানোর সঙ্গে-সঙ্গে কেউ তাকে সুন্দর অন্ধকারের মানুষ ব'লে সম্বোধন করত না। তারা তাঁকে দেখামাত্র আরও বৃদ্ধা হয়ে যেত; মাতাল মেয়েদের নেশা কেটে যেত, এবং বেশ মোটা রকমের বকশিস হারানোর ঝুঁকি নিয়েও যারা তাঁকে মুখের ওপরে বলত—তুমি যাচ্ছেতাই কুচ্ছিৎ—তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। তারপরে সেই শোচনীয় আনন্দও তাঁকে শেষপর্যন্ত পরিত্যাগ করতে হল যেদিন কোন একটি মেয়ের সঙ্গে তার ঘরে যেতে যেতে তিনি তার চেয়ে শোচনীয় কথাটাও শুনতে পেলেন —আমার নিশ্চয় আজ ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে।

হায়রে, ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন তিনিই; হতভাগ্য মানুষ, একটুখানি প্রেম আর ভালবাসা—এ জগতে যার অস্তিত্ব নেই—তাই পাওয়ার জন্যে তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আর তিনি রাস্তার ঘেয়ো কুকুরের মত বাঁচতে চাইলেন না; কুৎসিত চেহারার জন্যে নির্বাসিতের জীবন যাপন করতেও চাইছিলেন না তিনি। যে-কোন কুৎসিততম নারীকেও তিনি সুন্দরী বলে গ্রহণ করতে পারতেন যদি সেই নারীটি তাঁকে কুৎসিত ব'লে না ভাবত, অথবা

ভাবলেও মুখের ওপরে সেই কথাটা স্পষ্ট ক'রে না বলত। ফলে একদিন তিনি একটি বারবণিতার ঘরে গেলেন। মেয়েটার চোখে ছানির মত পড়েছিল; মুখটা ভরা ছিল ব্রণে; মদে চুর হয়ে পড়েছিল মেয়েটা: মুখ দিয়ে লালা ঝরছিল তার, পরনে তার ছেঁড়া আর নোংরা পেটিকোট। বেশ মোটা ধরনের বকশিস পেয়ে মেয়েটা তাঁর হাতে চুমু খেল। এই দেখে, তিনি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলেন, যত্ন নিলেন, প্রথমে তাকে চাকরাণী করলেন; তারপরে সংসারের ভার দিলেন; তারপরে করলেন রক্ষিতা; শেষকালে বিয়ে করলেন তাকে।

মেয়েটিও প্রায় তাঁরই মত কুৎসিত, তাঁরই মত নয়; তাঁর চেয়েও ভয়ঙ্করী এবং কদাকার। তবে এই ভয়ঙ্করী মূর্তির সৌন্দর্য এবং আকর্ষণ নিশ্চয় ছিল, এমন একটা আকর্ষণশক্তি ছিল যা দিয়ে এরা পুরুষদের কুক্ষিগত করে। তাঁকে প্রতারণা করে সে তার নিজের শক্তিটা প্রমাণ করল। এবং আর একজনের অঙ্কশায়িনী হ'য়ে সেই কথাটা সে তাঁকে দেখিয়েছিল।

লোকটা, সত্যিকথা বলতে কি, তাঁর চেয়েও আর একধাপ উঁচুতে। লোকটা কেবল চেহারার দিক থেকে অবর্ণনীয় কুৎসিত নয়, চরিত্রের দিক থেকেও তাই, ভবঘুরে, জেল-কয়েদী; ছোট-ছোট মেয়েদের চুরি করে নিয়ে ব্যবসা চালাতো। নোংরা, ব্যাঙের মত থপথপ করে চলত, বেবুনের মত মুখ, আর কবন্ধের মত যার দুটো নাকের বদলে দুটো গর্ত বসানো। এই লোকটাকে সে মাঝে-মাঝে নিজের ঘরে আগের জীবনে নিয়ে আসত।

সেই হতভাগ্য স্ত্রী-প্রতারিত মানুষটি একদিন তাকে বললেন—তুমি ওই রকম একটা অপদার্থ হতভাগাকে দেহ দিয়ে আমার প্রতি অবিচার করেছ। এবং আমারই বাড়িতে। হতচ্ছাড়া, বদমাইশ—কেন, কেন করেছ? তুমি জান সে আমার চেয়েও কুৎসিত।

মেয়েটা চীৎকার করে বলল—আমি বেশ্যা, নোংরা বেশ্যা। আমাকে তুমি যা ইচ্ছে তাই বলতে পার। কিন্তু একথা বলো না যে সে তোমার চেয়েও কুৎসিত।

মেয়েটার শেষ ক'টি কথা শুনে ত্রস্ত, বিভ্রান্ত, আর পরাজিত হয়ে তিনি নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। মেয়েটা শেষ করল তার কথা—কারণ, সে কুৎসিত হলেও বিশেষ রকমের কুৎসিত, আর তুমি অন্য সমস্ত কুৎসিত মানুষের মতই কুৎসিত। তোমার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই; তুমি অতি সাধারণ।

কোন এক কৃষক বালিকা

[A farm girl]

সেদিন আবহাওয়াটা বেশ ভাল ছিল বলে অন্যদিনকার থেকে দুপুরের খাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরে নিয়েছিল খামারবাড়ির লোকেরা বড় রান্না-ঘরটায়। তখন উঠোনে একটা বড় পাত্রে জল গরম হচ্ছিল আর সেই জল নিয়ে বাসনপত্রগুলো পরিষ্কার করছিল খামারবাড়ির ঝি রোজ। সূর্যের দুটো রশ্মি আধখোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে চওড়া টেবিলটার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাসনমাজা ও ঝাড়া মোছার যাবতীয় সব কাজ শেষ করে রান্নাঘরের বাইরে গিয়ে লম্বা-লম্বা ঘাসে ঢাকা উঠোনটার মাঝখানে ক্লান্ত হয়ে বসল রোজ। সামনে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল রোজ। দেখল বসন্তের সবুজ আপেলগাছ-গুলোতে সাদা সাদা কুঁড়ি ধরেছে। অদূরের মাঠ থেকে হাওয়া ছুটে আসছে। একটা ঘোড়ার বাচ্চা ছুটে বেড়াচ্ছিল সারা উঠোনময়। ক্লান্ত রোজের সহসা মনে হলো সেও এমনি করে ঐ মাঠভাঙা হাওয়ার মত অশান্ত অশ্বশাবকটার মত ছুটে বেড়াবে সারা খামারটায়।

উঠোনের একদিকে মুরগীর ঘর, গোয়াল ঘর, আস্তাবল, গ্যারেজ ঘর। গ্যারেজের পাশে একটা খাল। খালের ধারে ভায়োলেট ফুল ফুটে আছে। তার ওধারে মাঠ। মাঠে চাষীরা কাজ করছিল। দূর হতে তাদের পুতুলের মত দেখাচ্ছিল।

লম্বা লম্বা ঘাসের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রোজ। ফুলগাছঘেরা খালটার দিকে চলে গেল। একটা চালার নিচে খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল। কেমন যেন মিষ্টি আরামের একটা আমেজ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল তার ক্লান্ত অবসন্ন দেহের শিরায় শিরায়। ঘুমের ঘোর আসছিল চোখে। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আপনা হতে কখন।

সহসা বুকের উপর কার হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে বসল রোজ। দেখল জ্যাক কখন চুপিসারে এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। পিকাডি থেকে আসা কৃষক যুবক, জ্যাক ভেড়া চরায় এই খামারে। প্রায় বছরখানেক আগে প্রেম নিবেদন করে জ্যাক রোজের কাছে। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে দেখা হয় দুজনের মধ্যে। জ্যাক রসিকতা করে। মন মেজাজ ভাল থাকলে রোজ তার প্রত্যুত্তর দেয়।

রোজ খড়ের গাদার উপর উঠে বসতেই তাকে চুম্বন করতে গেল জ্যাক।

রোজ কিন্তু তার মুখটা হাত দিয়ে সজোরে সরিয়ে দিল। তখন জ্যাক তার পাশে বসল।

দুজনে সুখদুঃখের কথা বলতে লাগল। তাদের মালিকের কথা, আবহাওয়ার কথা, তাদের ফেলে আসা গ্রাম আর অতীত জীবনের কত সব কথা। রোজ একসময় বলল, আমি আমার মাকে কতদিন দেখিনি।

জ্যাকের কিন্তু মাথায় ছিল এক চিন্তা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে রোজের পানে। তার ফুলো-ফুলো লাল গাল, লাল ঠোঁট আর স্ফীত বুকের উপর তার স্থির লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে ছিল। লোভ সামলাতে না পেরে একসময় রোজকে জোর করে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতেই রোজ এক ঘুষি মেরে দিল জ্যাকের মুখে। ঘুষিটা তার নাকে লাগতেই নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। রোজ তখন লজ্জায় পড়ে গেল। জ্যাকের হাত ধরে সামনের পথটা ধরে এগিয়ে চলতে লাগল ধীর গতিতে। এবার এক সময় হঠাৎ জড়িয়ে ধরে রোজই চুম্বন করল। দীর্ঘক্ষণ ধরে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে থাকল।

এরপর থেকে তারা প্রায়ই গোপনে মিলিত হত। কখনো-কখনো রাতের অন্ধকারে কোন গোপন স্থানে। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে রোজ একদিন আবিষ্কার করল তার প্রতি আর কোন আগ্রহ নেই জ্যাকের। গোপনে তার সঙ্গলাভের জন্য আগের মত আর লালায়িত হয় না জ্যাক। ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে গেলে এমনি দু'একটা কথা বলে। কিন্তু কোন উত্তাপ থাকে না তার সে কথায়। কোন লালসার আগুন থাকে না তার দৃষ্টিতে।

একদিন আর একটা জিনিস আবিষ্কার করল রোজ। সে মা হতে চলেছে। জ্যাক একদিন তাকে কথা দিয়েছিল তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু আজ পিছিয়ে যাচ্ছে দায়িত্বহীন জ্যাক। অথচ জ্যাকই পারে এই লজ্জা ও অপমান-জনক গর্ভের কলঙ্ক হতে তাকে মুক্ত করতে।

একদিন রাত্রিবেলায় গোপনে জ্যাকের কাছে চলে গেল রোজ। আস্তাবলে খড়ের গাদায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল জ্যাক। তাকে উঠিয়ে তার গলাটা রাগের মাথায় সজোরে টিপে ধরল রোজ। জ্যাক দেখল তার থেকে রোজের গায়ের জোর বেশী। সে পেরে উঠবে না। তাই সে আপোষ করতে চাইল। রোজের কথা আপাততঃ মেনে নিয়ে তাকে বিয়ে করবে বলে ঈশ্বরের নামে শপথ করল। সঙ্গে-সঙ্গে তার গলাটা ছেড়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রোজ।

কিন্তু এত করেও কিছু হলো না। দিন ছয়েকের মধ্যেই রোজ জানতে পারল খামারের কাজ ছেড়ে দিয়ে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে জ্যাক। তার জায়গায় নিযুক্ত হয়েছে নতুন লোক। একবার ভাবল রোজ চার্চে বিশপের কাছে গিয়ে স্বীকারোক্তি করবে। কিন্তু ভয়ে যেতে পারল না। তার

কেবলি মনে হল বিশপ সাধারণ মানুষ নন, তিনি এমনই একজন অতিপ্রাকৃত লোক যিনি তার মুখপানে তাকিয়েই তার জীবনের সব ত্রুটিবিচ্যুতি ও চরিত্রের সব দুর্বলতার কথা ধরে ফেলবেন।

একদিন তার বাড়ি থেকে আসা একখানা চিঠি পেল রোজ। তার মার খুব অসুখ। চিঠিখানা দেখিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ছুটি নিল মালিকের কাছে। খামারের মালিকের বয়স পঁয়তাল্লিশ। দুবার স্ত্রী মারা যাওয়ায় আর বিয়ে করেনি। রোজের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে তাকে বাড়ি যাবার অনুমতি দিল।

বাড়ি গিয়ে রোজ দেখল মা তার মৃত্যুশয্যায়। মার মৃত্যুর পর সাত মাসের এক অপুষ্ট পুত্রসন্তান প্রসব করল রোজ। কোনরকমে বেঁচে গেল ছেলেটা, কিন্তু মাসখানেক পর প্রতিবেশীদের কাছে ছেলেটিকে রেখে ফিরে গেল তার কাজের জায়গায়।

সেই খামারবাড়িতে ফিরে এসে রোজ বলল বাড়ি গিয়ে সে বিয়ে করে এসেছে। তার স্বামী দেশেই আছে। তার সহকর্মীরা তার কথা শুনে ঠাট্টা করে। নানারকম প্রশ্ন করে।

এদিকে মালিকের মন তুষ্ট করে মাইনে বাড়াবার আশায় আগের থেকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে থাকে রোজ। একদিন ঝিকে ছাড়িয়ে দিয়ে তার কাজ করতে থাকে। মালিক নিজের মুখে স্বীকার করে রোজ একাই একশো।

কিন্তু এত খাটলেও মাইনে বাড়ে না তার। সে বছরে পায় মাত্র দুশো ফ্রাঁ। একদিন মাইনে বাড়াবার আবেদন নিয়ে মালিকের কাছে দেখা করতে গেল রোজ। কিন্তু সেকথা না বলে বলল অন্য কথা। এক সপ্তার ছুটি চাইল বাড়ি যাবার জন্য।

ইতিমধ্যে আট মাস কেটে গেছে। ছেলেটার জন্য প্রায়ই মন খারাপ করে রোজের। তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তার নরম তুলতুলে দেহের উত্তাপ নিজের গায়ে স্পর্শ করার এক প্রবল ইচ্ছা জাগে তার। মালিক রোজের পানে তাকিয়ে বলল, তুমি বাড়ি থেকে ঘুরে এলে একটা কথা বলব তোমায়।

ছেলেটাকে দেখে অতিরিক্ত আদরের দ্বারা তার নরম দেহটাকে বারবার পীড়িত করে যথাসময়ে ফিরে এল রোজ। একদিন মালিক তার নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল রোজকে। রোজ ভয়ে-ভয়ে দাঁড়াল মালিকের সামনে।

মালিক বলল, আচ্ছা রোজ, তুমি আজও বিয়ে করনি কেন? তোমার মত কর্মঠ সৎ মেয়ে স্ত্রী হিসাবে পাওয়া ত যেকোন লোকের পক্ষে ভাগ্যের কথা

কোন উত্তর দিল না রোজ। রোজকে চুপ করে থাকতে দেখে মালিক বলল, একজন গিন্নী না থাকলে খামার চালানো যায় না। আমি বলছিলাম

তোমার পক্ষে আমার গৃহিণী হওয়া কি সম্ভব হবে ?

রোজ ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, তা কি করে হয় মালিক ?

মালিক বলল, কেন, কেন তুমি আমায় বিয়ে করতে পার না রোজ ? শোন, ছেলেমানুষি করো না। আমি কাল পর্যন্ত তোমায় ভাববার সময় দিলাম।

সে রাতে বিছানায় গিয়ে ঘুমোতে পারল না রোজ। এক ফোঁটাও ঘুম এল না চোখে। এত দুঃখে চোখে এক ফোঁটা জলও এল না। চেষ্টা করেও কাঁদতে পারল না রোজ।

একদিন পর রোজ স্পষ্ট জানিয়ে দিল তার মালিককে সে তাকে বিয়ে করতে পারবে না। মালিক তখন জেদ ধরল, তোমাকে খুলে বলতে হবে ব্যাপারটা। তুমি কি অন্য কাউকে ভালবাস অথবা কাউকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছ ?

কিন্তু রোজ শুধু একটা কথাই বারবার বলতে লাগল, আমি তা বলতে পারব না মালিক।

গ্রাম অঞ্চলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ বছরের ব্যবধান এমন কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। খামারবাড়ির মালিক আর সেই খামারের চাষী মেয়েদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারটাও এমন কিছু নতুন নয়। রোজ ভাবছিল অন্য কথা। সে জ্যাকের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ও তার সন্তানের কথা কোন-ক্রমেই পরিষ্কার করে বলতে পারছিল না। বলতে পারলে হয়ত হালকা হত, মুক্ত হত সে।

মালিক তাকে আবার সময় দিল। তখনকার মত পরিত্রাণ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রোজ। রাত্রিতে বিছানায় গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল সারা দিনের খাটুনির পর।

সহসা মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল রোজের। মনে হলো কে যেন তার ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। রোজ উঠে বসতে না বসতেই মালিক গম্ভীর গলায় বলল, ভয় পেয়ো না রোজ, আমি কিছু কথা বলব তোমার সঙ্গে।

বাতির আলোয় মালিকের মুখপানে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল রোজ। নিজেকে অসহায় মনে হতে লাগল তার। এবার মালিক কোন কথা না বলে রোজের দেহটাকে জড়িয়ে ধরল সমস্ত শক্তি দিয়ে। রোজ প্রথমে বাধা দিল। কিন্তু সে বাধার মধ্যে কোন বলিষ্ঠতা ছিল না। যে প্রবৃত্তি নিজে অতিমাত্রায় বলিষ্ঠ হয়েও অপর এক অনুরূপ প্রবৃত্তির আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে না সেই প্রবৃত্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হলো রোজ। তার দেহটা ক্রমে নিথর নিস্পন্দ হয়ে উঠল মালিকের আলিঙ্গনের চাপে।

পরদিন থেকে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করতে লাগল দুজনে। দিন কতকের

মধ্যেই বিয়েটা হয়ে গেল।

এইভাবে পর পর কয়েকটি বছর কেটে গেল। তবু তার ছেলের কথাটা তার নতুন স্বামীর কাছে বলতে পারল না রোজ। এদিকে রোজ হঠাৎ বুঝতে পারল তার স্বামী যেন প্রায়ই কি ভাবে। কি একটা গোপন চিন্তায় তার দেহটা বয়সের অনুপাতে বেশী বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তার মেজাজটা হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক রকমের খিটখিটে। কথায়-কথায় রেগে যায় রোজের উপর। একদিন পাড়ার একটি ছেলেকে রোজ বকতেই রেগে গেল তার স্বামী। বলল, ও তোমার নিজের ছেলে হলে ওকে এভাবে বকতে পারতে?

সে রাত্রিতে খাবার সময় কোন কথা হলো না দুজনের মধ্যে। রাত্রিতে বিছানায় শুয়েও কেউ কাউকে স্পর্শ করল না।

পরদিন আর থাকতে না পেরে হঠাৎ একসময়ে তার স্বামীর পা দুটো জড়িয়ে ধরল রোজ। কাতর কণ্ঠে বলল, কেন তুমি আমার উপর রাগ করেছ, কি আমার দোষ আমায় বল।

মুখ ভার করে তার স্বামী বলল, দোষ আর কি, আজ পাঁচ ছ' বছর বিয়ে করেছি তোমাকে, কিন্তু একটি সন্তান হলো না আমাদের। এর থেকে দুঃখের আর কি থাকতে পারে। গাই গরুর বাচ্চা না হলে তার যেমন কোন দাম নেই তেমনি কোন বিবাহিতা নারীর সন্তান না হলেও তার কোন দাম নেই।

তেমনি কাতর কণ্ঠে উত্তর করল রোজ, এর জন্যে কি আমি দায়ী?

তার স্বামী বলল, আমি তা ঠিক বলছি না। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই খুব দুঃখের।

এরপর থেকে আর একটি সন্তান লাভই তার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে উঠল রোজের। অনেকে কথাটা বলল। অনেকে অনেক পরামর্শ দিল। অনেক ওষুধ খেল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। একদিন রাত্রিতে শোবার পর তার স্বামীর রাগটা চরমে উঠল। সে সবকিছুর জন্য একমাত্র রোজকে দায়ী করে তাকে গালাগালি দিতে লাগল। পরে মারতেও শুরু করে দিল। থাকতে না পেরে রোজও তার স্বামীকে দেয়ালে চেপে ধরল। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বলল,' ছেলে চাও? ছেলে আমার আছে। হ্যাঁ, জ্যাকের ঔরসজাত আমার গর্ভের সন্তান।

জ্যাক আমাকে বিয়ে করব বলে পরে পালিয়ে যায়। আমার সেই সন্তান আমার গাঁয়ের বাড়িতে রেখে এসেছি। একমাত্র তার মুখ চেয়েই তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হইনি প্রথমে।

হঠাৎ তার স্বামীর রাগটা পড়ে গেল। আগ্রহের সঙ্গে নরম সুরে বলল, তোমার ছেলে আছে! আগে বলনি কেন? আমি এদিকে পরের কোন ছেলেকে পোষ্য হিসাবে নেবার জন্য চেষ্টা করছি। আমাদের বিশপকেও বলেছি। তোমার ছেলের বয়স কত?

রোজ খুশী মনে বলল, হুয় ।

তার স্বামী বলল, তাহলে ত খুব ভালই হয় ।

সেদিন তার স্বামীর কাছে রোজের দামটা হঠাৎ আশ্চর্য রকম ভাবে বেড়ে গেল। পরদিন রোজকে জড়িয়ে ধরে তার স্বামী বলল, চল আমরা দুজনে একসঙ্গে গিয়ে তোমার সে সন্তানকে নিয়ে আসব। তোমার সন্তান মানে আমারও সন্তান। আজ আমার কী আনন্দ যে হচ্ছে তা বুঝিয়ে বলতে পারব না তোমাকে।

মঁসিয়ে পেরেন্ত

[Mousieur Parent]

পার্কের একধারে ছোট্ট জর্জ যখন বালি দিয়ে একটা পিরামিড গড়ে তার মাথায় একটা বাদাম পাতা চাপিয়ে দিচ্ছিল তার বাবা পেরেন্ত তখন একটা লোহার চেয়ারে বসে একদৃষ্টিতে তা লক্ষ্য করছিল। ক্য সাঁ লাজারের বাড়ি-গুলোর ওধারে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল আর তার হলুদ রশ্মিগুলো তির্যকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল পার্কের বাদাম গাছগুলোর পাতায় পাতায়।

রোজ বিকালে এই পার্কটায় ছেলেটাকে নিয়ে বেড়াতে আসে পেরেন্ত। অন্য ছেলেদের মত বেশ কিছুক্ষণ প্রাণ ভরে খেলা করে জর্জ আর সেইদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পেরেন্ত। তারপর তাকে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। অন্যদিনকার মত আজও পার্কের একটা লোহার চেয়ারে বসে জর্জের খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ কি মনে করে উঠে পড়ল পেরেন্ত। জর্জকে কোলে নিয়ে পা চালিয়ে দিল বাড়ির দিকে। সে চাইছিল তার স্ত্রী হেনরিয়েত্তে বাড়ি ফেরার আগেই বাড়ি ফিরবে। শুধু আজ নয়, সব দিন, সব ব্যাপারেই স্ত্রীকে খুব ভয় করে পেরেন্ত।

পেরেন্তের বয়স চল্লিশ। মোটাসোটা গড়ন। এই অল্প বয়সেই চুলে কিছু কিছু পাক ধরেছে। চাকরি বা কাজ কারবার কিছু করে না। পৈত্রিক সম্পত্তির আয় থেকে বছরে যা পায় তাতে ভালভাবেই সংসার চলে যায়। বছরকতক আগে বিয়ে করেছে। একটিমাত্র সন্তান জর্জের বয়স তিন। স্ত্রীকে ভালবাসে পেরেন্ত। কিন্তু স্ত্রী তাকে ভালবাসা দূরে থাক, মোটেই তাকে দেখতে পারে না।

বাড়ি গিয়ে পেরেন্ত দেখল ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা। বাড়ির বুড়ী আয়া জুলি দরজা খুলে দিল। পেরেন্তের এক প্রশ্নের উত্তরে কড়া গলায় উত্তর করল,

মাদাম সাড়ে ছ'টার সময় কোনদিন ঘরে ফেরে তা বলতে পার? যাই হোক, রাত্রি আটটার আগে আমি রাতের খাবার দিতে পারব না তা বলে দিচ্ছি।

রান্নাবাড়ার কাজ সব জুলিই করে। অন্যান্য কাজকর্মের জন্য একজন ঝি আছে। পেরেস্তের আর একটা অস্বস্তি ও অশান্তির কারণ হলো জুলি। জুলি তার স্ত্রীকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। আজ ছ'মাস হলো জুলি বেশী ক্ষেপে উঠেছে। দিনে বারবার তার নামে অসংখ্য অভিযোগ আনে।

হেনরিয়েত্তে বলে, ওকে তাড়িয়ে দাও। তবু ওকে তাড়াতে পারে না পেরেস্ত মানবতার খাতিরে। কারণ জুলি তাদের বাড়িতে বরাবর আছে। তার জন্মের পর থেকে তাকে মানুষ করেছে। তার মার মৃত্যুকালে জুলি তাঁর সেবা করেছে। আজ তার বয়স হয়েছে। এ সময় তাকে তাড়ানোর কথা তাই ভাবতে পারে না পেরেস্ত।

জর্জকে ঝিয়ের হাতে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল পেরেস্ত। মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে ভাবতে লাগল আকাশ পাতাল। তার মনে হলো সমস্ত সংসারটাই বিরোধিতা করছে তার। সমস্ত সংসারটা একটা জ্বালাময়ী মরুভূমি তার কাছে। এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে জুলি আর হেনরিয়েত্তের অহেতুক পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চায় সে। এই জ্বলন্ত মরুভূমির দুঃসহ উত্তাপ থেকে এক সবুজ মরুদ্যানের মত একমাত্র জর্জ টেনে নিয়ে যায় তাকে মাঝে মাঝে। ক্ষণিকের জন্য কিছু নির্মল আনন্দ লাভ করে।

তার পুরনো বন্ধু পল লিমোসিনের কথা মনে হলো পেরেস্তের। তার স্ত্রী যখন অকারণে যখন তখন ঝগড়া করে তখন পল তার পক্ষ অবলম্বন করে তার স্ত্রীকে তিরস্কার করে। কিন্তু পল আবার জুলিকে দেখতে পারে না। তাই জুলির কথা তার কাছে বলতে গেলে বলবে ওকে তাড়িয়ে দাও। হেনরিয়েত্তেকে নিয়ে ঘর করতে মন আর চায় না। শুধু জর্জের খাতিরেই স্ত্রীর সব লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান মুখ বুজে সহ্য করে চলে পেরেস্ত।

সাড়ে সাতটার সময় একবার জুলি ঘরে এল। রাতের খাওয়া তৈরী হয়েছে কি না জানতে চাইল পেরেস্ত। কিন্তু জুলি ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, আটটার আগে হবে না।

পেরেস্ত বলল, আমাদের কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আটটার সময় বাচ্চা ছেলেটা খেলে ওর পাকস্থলীটা যে একেবারে যাবে। আর এই নিয়ে ওর মাও রাগারাগি করবে। ওর মা আর যাইহোক তার ছেলের খাওয়া পরা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন।

জুলি মুখ ভেংচে বলল, খুব হয়েছে, ওর আর মাগিরি ফলাতে হবে না। এমন মা যেন আর কারো না হয়।

পেরেস্ত গম্ভীরভাবে বলল, দেখ জুলি, গৃহকর্ত্রীর সম্বন্ধে এই ধরনের অপমান-

কর কথা আমার সামনে আর কোনদিন বলবে না।

জুলি আর কোন কথা না বলে ঘরের দরজাটা জোরে বন্ধ করে চলে গেল ঘর থেকে। এমন সময় জর্জ তার ঘরে এল। জর্জকে কোলে নিয়ে তাকে গল্প শোনাতে লাগল পেরেস্ত। কিন্তু তার মনটা এক অজানা অথচ আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ভরে রইল। এখনি হেনরিয়েত্তে এসে রাতের খাওয়া নিয়ে ঠিক জুলির সঙ্গে তুমুল ঝগড়ার ঝড় তুলবে। আর তার সঙ্গে সেও জড়িয়ে পড়বে স্বাভাবিকভাবেই। সে ঝড় কেমন করে কাটবে, কেমন করে সে মুক্তি পাবে তা কে জানে। ছেলেকে গল্প শোনাতে শোনাতে তাই সে বারবার দেয়াল ঘড়িটার পানে তাকাতে লাগল।

দেখতে দেখতে আটটা বেজে গেল। কিন্তু হেনরিয়েত্তে এল না। আশ্চর্য হয়ে গেল পেরেস্ত। তবু আসন্ন ঝগড়ার ঝড়ের আশঙ্কাটা মন থেকে গেল না তার। যেকোন মুহূর্তেই এসে পড়তে পারে হেনরিয়েত্তে আর আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের থেকেই কারণে অকারণে তুলবে বাকবিতণ্ডা আর ঝগড়ার একটা প্রচণ্ড ঝড়।

হেনরিয়েত্তের পরিবর্তে জুলি এল। জুলি এসে গম্ভীরভাবে বলল, মঁসিয়ে তুমি জান আমি দীর্ঘদিন তোমার মার কাছে কাজ করেছি। তোমার জন্মের পর থেকে তোমাকে মানুষ করে আসছি। দীর্ঘদিন তোমাদের পরিবারের সেবা করে আসছি। সে শুধু টাকার জন্য নয়। আমি তোমাকে স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি, তোমার সঙ্গে কোনদিন কোন ব্যাপারে আমি প্রতারণা করিনি। একটাও জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলিনি।

পেরেস্ত গম্ভীরভাবে বলল, তা ঠিক জুলি। সেকথা ত সবাই জানে।

জুলি কিন্তু থামল না। সে যেন এতক্ষণ শুধু একটা ভূমিকা প্রস্তুত করেছে। আসল কথা বলা তার এখনো হয়নি। জুলি বলল, কিন্তু মঁসিয়ে আর এভাবে চলে না, এর একটা বিহিত করতেই হবে। এতদিন তোমাকে আমি কিছুই বলিনি, সব কথা গোপন করে এসেছি। কিন্তু আর চলে না। পাড়ার সব লোক সেকথা জানে এবং সবাই হাসাহাসি করছে, তোমার প্রতি বিরূপ হচ্ছে। আমি বলছি আমার মাদামের কথা। উনি যখন তখন বাড়ি ফেরেন তার মানে এই যে উনি পরপুরুষের সঙ্গে ইচ্ছামত বিহার করে বেড়ান। এবং এই নোংরামির তুলনা হয় না। আর সেটা বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

বিরক্ত হয়ে পেরেস্ত বলল, আমি তোমাকে একদিনই বলে দিয়েছি এসব কথা আমার সামনে বলবে না।

জুলি দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে বলল, না, আজ আমি সব বলব। সব কথা খুলে বলব। তুমি শুনতে না চাইলেও বলব। জেনে রাখ, উনি তোমাকে শুধু ওঁর নিজের স্বার্থের জন্য তোমার টাকার জন্য বিয়ে করেছিলেন।

কিন্তু বিয়ের পরদিন থেকেই উনি প্রতারণা করে আসছেন তোমার সঙ্গে। তোমাকে একদিনের জন্তেও ভালবাসেননি। তোমার সারা জীবনটাকে দুঃখে ভরিয়ে তুলেছেন। সেকথা ভাবলে দুঃখে বুকটা ফেটে যায় আমার।

হাত দুটো মুঠো করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল পেরেস্ত। একসময় বলল, যাও যাও, চুপ করো। আর কিছু বলতে হবে না।

সহসা জুলির সঙ্গে তার বাবার কথা কাটাকাটি দেখে কেঁদে উঠল জর্জ আর তা দেখে জুলির দিকে ছুটে গেল পেরেস্ত। হাত উঁচু করে বলল, চুপ করবে কি না বল। দেখছ না ছেলেটা ভয়ে কাঁদছে।

জুলি বলল, আমি তোমাকে ছেলের মত মানুষ করেছি। তা সত্ত্বেও আজ তুমি আমাকে ধরে মারতে পার। তবু আমি আসল কথা, সত্যি কথাটা বলে যাবই। খুব ত ছেলে ছেলে করছ। কিন্তু ও ছেলে কার তা জান? ও ছেলে পল লিমোসিনের। আমি নিজে দেখেছি তোমার স্ত্রী পলকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করছে।

কোল থেকে ছেলেটাকে নামিয়ে পেরেস্ত জুলির কাঁধ দুটো দু' হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, হিংসুক কুটিল কোথাকার। দূর হয়ে যা ঘর থেকে, তা না হলে তোকে আমি খুন করব।

এই বলে জুলিকে ঘরের বাইরে নিয়ে ঠেলে দিতেই খাবার টেবিলের উপর পড়ে গেল জুলি। টেবিলের কাঁচ আর তার উপর রাখা প্লেটগুলো পড়ে ভেঙে গেল। তবু উঠে দাঁড়িয়ে জুলি বলে যেতে লাগল, আমার কথা বিশ্বাস না হয় আজই তার প্রমাণ নিজের চোখে দেখতে পার। রাতের খাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্ত বাইরে গিয়ে ফিরে এসে দেখবে কি কাণ্ড হয়। দেখবে আমি মিথ্যা কথা বলছি কিনা।

এই বলে জুলি তার নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল। কিন্তু পেরেস্তও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, আমি বলছি এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে তুমি দূর হয়ে যাও। আমি তোমাকে আর চাই না।

ভিতর থেকে জুলি উত্তর করল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার মঁসিয়ে, আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই এ বাড়ি ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যাব।

পল তার ঘরের মধ্যে ফিরে এল। জর্জ তখন একটা চেয়ারে বসে কাঁদছে। ছেলেটাকে চুপ করিয়ে তাকে মেঝের কার্পেটের উপর বসিয়ে তার পানে তাকিয়ে দেখতে লাগল পেরেস্ত সে লিমোসিনের মত দেখতে হয়েছে কিনা। দেখতে লাগল আসলে জর্জ কার ঔরসজাত সন্তান—তার না লিমোসিনের। লিমোসিনের মুখটা একবার মনে করল পেরেস্ত। কিন্তু তার মুখে একটু

দাড়ি আছে। তাই ঠিক বুঝতে পারল না। অথচ জুলি তাকে বারবার বলেছে একটা কানা লোকও ছেলেটার মুখের পানে তাকিয়ে বুঝতে পারবে সে লিমোসিনের ছেলে।

একটা বড় আয়নার সামনে জর্জের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দু'জনের মুখের মধ্যে একটা সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করল পেরেন্ত। কিন্তু চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসছিল তার দৃষ্টি। সব যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। পেরেন্ত কিছুই বুঝতে পারল না।

এমন সময় বাড়ির কলিং বেলটা বেজে উঠল। প্রথমবার শুনেও শুনল না পেরেন্ত। দ্বিতীয়বার বেজে উঠতেই এগিয়ে গেল। জুলি এর আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

ঘরে ঢুকে পেরেন্তকে দরজা খুলতে দেখে হেনরিয়েত্তে আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি! জুলি কোথায়?

পেরেন্ত কোন কথা বলতে পারল না। রেগে গিয়ে হেনরিয়েত্তে বলল, তুমি কি হঠাৎ বোবা হয়ে গেলে নাকি?

পেরেন্ত বলল, আমি জুলিকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কারণ সে জর্জের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। কারণ সে তোমার নামে যা তা বলেছে।

হেনরিয়েত্তে বলল, আমার নামে কি বলেছে বল?

পেরেন্ত বলল, সে বলেছে তুমি নাকি স্ত্রী ও মা হিসাবে কোন কর্তব্যই পালন করো না।

হেনরিয়েত্তে রাগের মাথায় আমতা আমতা করে বলল, তুমি বলছ আমি—

পেরেন্ত বলল, আমি বলছি না। বলেছে জুলি। শুনতে চাইলে বলে বললাম।

হেনরিয়েত্তে বলল, তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

পেরেন্ত বলল, না। তার আগেই সে চলে গেছে।

কাপড় ছেড়ে হেনরিয়েত্তে খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই সবকিছু এলোমেলো ও কাঁচভাঙা দেখে চমকে উঠল। এসব কি?

জর্জ তখন বলল, জুলি বাবাকে মারছিল।

হেনরিয়েত্তে হেসে লিমোসিনকে বলল, শুনলে পল আমার স্বামী কেমন বীরপুরুষ, জুলির হাতে মার খেয়েছে।

পেরেন্ত বলল, না। আমিই বরং ওকে মেরেছি। ওকে ঠেলে ফেলে দিয়েছি। ও পড়ে যেতেই এই অবস্থা হয়েছে।

হেনরিয়েত্তে বলল, সে যা ক্ষতি করেছে তাতে তোমার পুলিশ ডেকে তাকে ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, এখন খাওয়ার ব্যবস্থা করো।

ঝিকে ডেকে খাবার ব্যবস্থা করল পেরেন্ত। লিমোসিন তাকে সাহায্য

করতে লাগল। সকলে একসঙ্গে খেতে বসল। খেতে খেতে একসময় পেরেস্ত বলল, খাওয়ার পর আমি একটু বেরোব। তোমরা থাক। অর্জকে ওঘরে শুইয়ে দেবে। জুলি চলে গেছে, তার জায়গায় একজন লোক ত চাই।

হেনরিয়েত্তে সঙ্গে সঙ্গে বলল, ঠিক আছে। তাই যাও।

বাইরের দরজায় চাবি দিয়ে গেল পেরেস্ত।

পেরেস্ত চলে গেলে লিমোসিন বসার ঘরে গিয়ে একটা ঈজি চেয়ারে বসে বলল, কারণে অকারণে তুমি পেরেস্তকে বক কেন? ও ত আমাদের মেলামেশার ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করে না।

হেনরিয়েত্তে বলল, আমি ওর মত কাপুরুষদের মোটেই দেখতে পারি না। একটা অপদার্থ। তুমিও দেখছি কাপুরুষদের মত কথা বলছ। ওর মত লোককে ভয় করার কি আছে?

লিমোসিন বলল, কিন্তু কেন তুমি ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে না? তুমিই ওকে ঠকাচ্ছ। ওর সঙ্গে প্রতারণা করছ। কিন্তু তার জন্য ও ত তোমাকে মারেও না, গালমন্দও করে না।

লিমোসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হেনরিয়েত্তে কাতর কণ্ঠে বলল, আমি ওর সঙ্গে প্রতারণা করি সে ত তোমার জন্যে। তুমি একথা আমাকে বলতে পারলে পল?

লিমোসিন হেনরিয়েত্তেকে জড়িয়ে ধরে বলল, আরে, আমি বললাম আমাদের দু'জনের ভালর জন্যই। আমাদের ভালর জন্যেই ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা দরকার। ও যেন আমাদের সন্দেহ না করে।

লিমোসিনকেও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগল হেনরিয়েত্তে। এই নিবিড় চুম্বন ও আলিঙ্গনে দু'জনে আবদ্ধ হয়ে কতক্ষণ ছিল তা ওরা কেউ জানে না। সহসা একটা চীৎকার করে লিমোসিনকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল হেনরিয়েত্তে। দেহমিলনের আনন্দে এমনই আচ্ছন্ন হয়ে ছিল ওদের চেতনা যে পেরেস্ত কখন চাবি খুলে তাদের ঘরে এসে ঢুকেছে তা ওরা কেউ টেরই পায়নি।

পেরেস্ত প্রথমে ওদের এই অবস্থায় দেখে হতভম্ব ও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। তারপর সে ছুটে গিয়ে লিমোসিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা টিপে ধরল। বলল, বিশ্বাসঘাতক, আজ তোকে শেষ করে ফেলব।

লিমোসিনকে বেকায়দায় দেখে হেনরিয়েত্তে ছুটে গিয়ে পেরেস্তের ঘাড়ে তার আঙুলের নখগুলো বসিয়ে দিয়ে তার ঘাড়টাকে কামড়ে ধরল।

পেরেস্তের ঘাড় থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। সে তখন পলকে ছেড়ে দিল। সে তখন ওদের দু'জনকেই বলল, তোমরা দু'জনে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও। তা না হলে তোমাদের দু'জনকেই আমি খুন করব।

এই বলে একটা চেয়ার উচিয়ে লিমোসিনের মাথার উপর তুলে ধরল

পেরেন্ত। তখন হেনরিয়েত্তে তাড়াতাড়ি লিমোসিনের কাছে গিয়ে তার একটা হাত ধরে বলল, চল পল, এখান থেকে চলে যাই। লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

লিমোসিনের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হেনরিয়েত্তে। যাবার আগে শেষবারের মত একটা আঘাত দিয়ে যেতে চাইল সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পেরেন্তের মুখের ওপর নির্মমভাবে ছুড়ে মারল একটা ভয়ঙ্কর কথার ঢিল। আমি আমার ছেলেকে নিয়ে যাব।

পেরেন্তের বুকের ভিতরটায় কে যেন হাতুরীর ঘা দিল। ছেলে! কোন্ সাহসে তুমি ছেলের কথা বলছ!

হেনরিয়েত্তে বলল, হ্যাঁ, ও আমার ছেলে। ওর উপর তোমার কোন অধিকার নেই। ও আমার আর পলের ছেলে।

গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল পেরেন্ত। তুই মিথ্যা কথা বলছিস। হতভাগী বদমাস।

হেনরিয়েত্তে গলার স্বরটা কমিয়ে বলল, তুমি বড় বোকা। একমাত্র তুমি ছাড়া একথা সবাই জানে।

পরমুহূর্তেই একটা জ্বলন্ত বাতি নিয়ে পাশের ঘর হতে ঘুমন্ত জর্জকে কোলে করে নিয়ে এল পেরেন্ত। শেষবারের মত একবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে হেনরিয়েত্তের কোলে তাকে তুলে দিল। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখল পেরেন্ত। জর্জ তার শেষ সম্বল। সে সম্বল হাতছাড়া করতে চাইছিল না। সে তাই কাতর কণ্ঠে লিমোসিনকে বলল, বল পল, তুমি ত জান। বল, জর্জ কার ছেলে—তোমার না আমার?

লিমোসিন কোন কথা বলল না। নীরবে হেনরিয়েত্তের সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পেরেন্তের তখন দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। ওরা সবাই চলে গেলে কোন-রকমে দরজাটা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে চলে গেল সে।

মামলা মোকদ্দমা করার ইচ্ছে ছিল না পেরেন্তের। তাতে কেলেঙ্কারীর কথাটা ছড়িয়ে পড়বে। ওদের উকিলের কথামত একটা বাৎসরিক বৃত্তি দেবার প্রস্তাব মেনে নিল পেরেন্ত। আসলে লিমোসিন বেকার। সেই বৃত্তিতে ওদের ছোট্ট সংসারটা চলে যাবে।

ঘরের মধ্যে সম্পূর্ণ একা পেরেন্ত। বাইরে একটা হোটেল থেকে খেয়ে আসে। ঠিকে-ঝি ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। কিন্তু সারা দিনরাতের মধ্যে একটু শান্তি পায় না পেরেন্ত। সব সময় শুধু জর্জের কথা মনে পড়ে। রাত্রিতে মাঝে মাঝে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যায়। মনে হয় জর্জ তাকে ডাকছে। জর্জের চিন্তা এমনভাবে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে তুলল যে পেরেন্তের মনে হলো এইভাবে কিছুকাল চললে সে পাগল হয়ে যাবে। আবার এক

একসময় জর্জের পিতৃত্ব সম্বন্ধে সেই কুটিল সন্দেহটাও মাথা তুলে ওঠে। এ-বিষয়ে বিভিন্ন কাল্পনিক যুক্তি তর্কের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে চায় সে। কিন্তু পারে না।

অবশেষে নিজের বাড়িটা একদিন বন্ধ করে দিয়ে একটা হোটেলের একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে থাকতে লাগল পেরেস্ত। সেখানে অন্ততঃ অনেক মানুষ আছে। হাঁপ ছেড়ে কিছুটা বাঁচল পেরেস্ত। অজস্র অবাঞ্ছিত বাসি স্মৃতির কঙ্কালে ভরা একটা নির্জন বাড়ির শূন্য নীরব ঘরগুলো আর তাকে একা পেয়ে গিলে খেতে আসবে না। তার মন প্রাণের সব আবেগ সব অনুভূতি শুধু একটা চিন্তার উপর আর কেন্দ্রীভূত হতে পারবে না।

এইভাবে বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল। তবু কোন বৈচিত্র্য দেখা দিল না পেরেস্তের নিঃসঙ্গ জীবনে। এই ভাবে কেটে গেল পাঁচটি বছর। হঠাৎ একদিন এক বিকেলে পথে যেতে যেতে ওদের দেখতে পেল পেরেস্ত। ওদের মানে, ওদের তিনজনের সেই শান্ত সুখী সংসারটাকে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল পেরেস্ত। পল লিমোসিনের লম্বা চওড়া চেহারা, গালে লম্বা জুলপি। গোলগাল বেঁটে ধরনের চেহারার হেনরিয়েত্তে আর আট বছরের ছেলে জর্জ।

পেরেস্তের একবার মনে হলো ছুটে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে। ওদের দেখে খুব সুখী মনে হলো। স্বামী স্ত্রী আর একটি সন্তান—ওদের তিনটি মানুষের সংসারটা খুবই সুখের। ওদের সুখ দেখে বুকটা জ্বলে যায় পেরেস্তের। আরো বেড়ে যায় তার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা। বেড়ে যায় সব পেয়েও সব হারানোর জ্বালাটা। এইভাবে এই জ্বালা আর বেদনার মধ্য দিয়ে আরো কয়েকটা বছর কেটে যায়। এই অবিচ্ছিন্ন দুঃখের জীবনে মাঝে মাঝে একটি মেয়ের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে একটু শান্তি ও সান্ত্বনা পায় পেরেস্ত। সে হলো ম্যাদময়জেল জো নামে একটি তরুণী। পেরেস্ত যে হোটেলে থাকে সেই হোটেলেই কাজ করে। একদিন জো পেরেস্তের শরীরের অবনতি দেখে বলল, আপনার কিছুদিন বাইরে কোথাও যাওয়া দরকার। জলবায়ুর পরিবর্তন চাই।

ঠিক হলো সাঁ জার্মেন নামে একটা গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যাবে পেরেস্ত। সেখানে একটি পান্থনিবাসে কিছুদিন থাকবে। দেহমনের পরিবর্তন হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে বেশীদিন থাকা সম্ভব হলো না তার পক্ষে।

হোটেলে খাবার সময় হঠাৎ একদিন সন্ধ্যের কিছু আগে দেখল তার অদূরে লিমোসিঁনরা খাচ্ছে। জর্জ এখন বেশ বড় হয়েছে। হেনরিয়েত্তে তেমনি শক্ত আছে। শুধু লিমোসিনের বয়সটা একটু বেশী দেখাচ্ছে। ওরা উঠে হোটেল থেকে নিকটবর্তী একটা বনপথ ধরল।

পেরেস্তও উঠে পড়ে ওদের পিছু নিল। আজ ও তাদের সামনে গিয়ে

সরাসরি প্রশ্ন করবে, কেন ওরা ওর জীবনকে এমন করে এক সীমাহীন দুঃখ আর ব্যর্থতার মধ্যে ঠেলে দিল।

বয়সের তুলনায় বেশী বুড়ো দেখাচ্ছিল পেরেন্তকে। মুখে দাড়ি ছিল। পোশাকটাও ময়লা ছিল। পেরেন্ত সরাসরি হেনরিয়েত্তের কাছে গিয়ে বলল, চিনতে পারছ? আমার নাম হেনরি পেরেন্ত। আমাকে ঠকিয়ে গিয়ে ভেবেছিলে খুব সুখভোগ করবে। কিন্তু আজ সবকিছুর কৈফিয়ৎ চাই। সমস্ত প্রতারণার পূর্ণ প্রতিশোধ চাই।

হেনরিয়েত্তে ও লিমোসিন দু'জনেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। জর্জ ভাবল লোকটা পাগল। তাই উঠে গিয়ে পেরেন্তের জামার কলারটা ধরে ফেলল। পেরেন্ত তখন হেনরিয়েত্তেকে লক্ষ্য করে বলল, বল আমি কে। জর্জকে বল, ওর পিতা কে।

তারপর হঠাৎ জর্জের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি জান তোমার পিতা কে? আমি হচ্ছি তোমার পিতা। সত্যিকারের পিতা। তোমার মা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে যাবার সময় আমাকে চরম আঘাত দেবার জন্য তোমাকে নিয়ে যায়। মিথ্যা করে বলে যায় লিমোসিন তোমার পিতা। এবার তুমি তার বিচার করবে, তুমি এখন বড় হয়েছ। তারপর আমাকে জানাবে। আমি থাকি হোটেল দ্য কন্তিনেন্তে।

এই কথা ক'টি বলে ঝড়ের বেগে সেখান থেকে চলে এল পেরেন্ত। সেই রাতেই প্যারিসে ফিরে আসার জন্য ট্রেণ ধরল।

পেরেন্তকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল জো। প্রশ্ন করল, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কেন? আপনাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?

কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একমনে মদ খেয়ে যেতে লাগল পেরেন্ত। সে-রাতে পেরেন্ত এত বেশী মদ খেয়েছিল যে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যেতে হয়েছিল তার শোবার ঘরে।

মাকু´ই দ্য ফিউমেরল

[The Marquis De Fumerol]

আমার বাবা রোজার দ্য তুমভিল তখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বসে ডিনার খাচ্ছিলেন। এমন সময় একটা চিঠি এসে তাঁর হাতে পড়ল। তোমরা সবাই

জান বিপ্লবোত্তর ফরাসী দেশে যখন রাজনৈতিক অবস্থাটা খুব বিক্ষুব্ধ ছিল, যখন বুর্বন ও অর্লিয়ান্স দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল, আমার বাবা তখন নিজেকেই দেশের রাজা বলে মনে করতেন এবং আমার মা এবিষয়ে তাঁকে প্রেরণা দান করতেন।

চিঠিখানা পড়ে বাবা মাকে বললেন, তোমার দাদার খুব অসুখ। বাঁচার কোন আশা নেই। কথাটা শুনে মার মুখটা মলিন হয়ে গেল। বাবা আবার বললেন, আমার একটা সামাজিক মর্যাদা আছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমার একটা কর্তব্য আছে।

আমার মামা মার্ক্ুই দ্য ফিউমেরল আগে অভিজাত সমাজের একজন কর্ণধার ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন লর্ড এবং বড়দরের একজন সামরিক অফিসার। কিন্তু তিনি নিঃসঙ্গ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। বিশেষ করে নারীসংসর্গে তিনি বহু অর্থ উড়িয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত দুটি নিচু সমাজের মেয়েকে বাড়িতে রেখে দেন। আমার বাবাকে চিঠিখানা লিখেছে মেলানি নামে আমার মামার এক রাঁধুনি।

আমার বাবা আমার মাকে বললেন, তোমার দাদার শেষকৃত্যটা কিভাবে করা যাবে তা ঠিক করো।

আমার মা বললেন, আমি আমাদের যাজক সাহেব আব্বেকে ডাকতে পাঠাচ্ছি। আমি মনে করছি রোজার আর যাজক আব্বেকে নিয়ে আমিই যাব। তোমাকে আর যেতে হবে না। তোমার একটা সামাজিক মর্যাদা আছে। তোমার সেখানে যাওয়া চলে না।

আমার বাবা তা সমর্থন করে বললেন, ঠিক বলেছ।

অবশেষে আমাকে ও যাজক আব্বেকে সঙ্গে নিয়ে মা রওনা হলেন। মামার বাড়িতে পৌঁছতেই মোটা চেহারার মেলানি দরজা খুলে দিল। আমরা ঘরে ঢুকলে মেলানি আমাদের বসার জন্য চেয়ার দিল। কিন্তু আমার মাকে মামার কাছে যেতে দিল না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি মেলানিকে আমার আগমন সংবাদটা দিতে বললাম।

মেলানি এসে আমাকে ঘরে নিয়ে গেল। আমি দেখলাম, মামাকে খুবই রুগ্ন ও ক্ষীণ দেখাচ্ছে। তাঁর দুদিকে দুটি বারবণিতা শ্রেণীর যুবতী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের অনাবৃত হাত আর নোংরা পোশাক দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল তারা কোন্ শ্রেণীর মেয়ে। মামা একটা ঈজি চেয়ারে শুয়ে ঝিমোচ্ছিলেন। তাঁর বিছানার খাটের পাশে টেবিলের উপর কিছু খাবার নামানো ছিল। বোঝা গেল ঐ মেয়ে দুটির খাবার।

আমাকে দেখে আমার মামা চিনতে পারলেন। বললেন, কিরে তোর মা আসতে পারল না?

আমি বললাম, আমার মা এখানে কি করে আসবে?

আমি মেয়ে দুটিকে লক্ষ্য করেই একথা বললাম। এমন সময় আমাদের যাজক আব্বে ঘরে ঢুকতেই রেগে উঠলেন মামা। বললেন, বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। তোমরাই মানুষ না মরতেই তার আত্মা চুরি করে নিয়ে যাও। তোমাদের দেখলেই মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। তোমাকে কোন প্রয়োজন নেই। আমি আরো বাঁচতে চাই।

আব্বে চলে গেল। আমিও আব্বের পিছু পিছু মার কাছে চলে গেলাম। মামার মৃত্যুর আগে ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড কি করে করা যাবে তার উপায় খুঁজতে লাগলাম তিনজনে। সহসা একটা চীৎকার শুনে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। মেলানি ব্যস্ত হয়ে আমাকে ডাকতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে দেখলাম আর একজন প্রোটেস্ট্যাণ্ট যাজক ঘরে ঢুকতেই তাকে দেখে মামা চীৎকার করছেন। আমি গিয়ে যাজককে সরিয়ে দিলাম।

এর একটু পরেই মামা পড়ে গেলেন বসে থাকতে থাকতে। আমার মা ছুটে গিয়ে মেয়ে দুটিকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। বললেন, তোমাদের কাজ এবার ফুরিয়ে গেছে। এখন আসতে পার।

মেয়ে দুটিও ঘর থেকে বিনা প্রতিবাদে বেরিয়ে গেল। আব্বে গিয়ে ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড করতে সুরু করে দিল। অন্তিমকালে মামার একটু জ্ঞান ফিরে এল। এক তৃপ্তিসূচক আবেগের সঙ্গে বললেন, হা ভগবান, কী আনন্দ, কী পরম শান্তি।

মামার মৃত্যুর পর তাঁর শোকযাত্রায় সমাজের অনেক বিশিষ্ট লোক অংশগ্রহণ করলেন। একজন ব্যারণ ও সিনেটের সদস্য বললেন, অভিজাত বংশের লোকেরা সাময়িক ভুলবশতঃ পাপ কাজ করলেও মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেন। তাদের পাপকর্মের সময় ঈশ্বর যেমন তাদের আত্মা ছেড়ে চলে যান, মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাদের আত্মার মাঝে আবার নেমে আসেন।

পরিত্রাণ

[The Saved]

রেনেডেনের মার্ক'ইপত্নী তীরবেগে এসে গ্র্যাঞ্জেরির ব্যারণপত্নীর ঘরে ঢুকল। সে হাসছিল। এত হাসছিল যে হাসির আবেগে কথা বলতে পারছিল না। ঘরের মধ্যে ঢুকে সে কোনরকমে হাসি চেপে বলল সে তার স্বামীর উপর প্রতিশোধ নিয়েছে।

গ্র্যাঞ্জেরির ব্যারণপত্নী তার দিকে কৌতূহলভরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, এখন কি হয়েছে ভাই বল।

মার্কুইপত্নী বলল, কি করেছি ? বড় মজার কাজ করেছি। আর তার ফলে আজ আমি মুক্ত। একবারে মুক্ত এবং চিরদিনের মত।

ব্যারণপত্নী আশ্চর্য হয়ে বলল, কিসের থেকে মুক্ত ?

মার্কুইপত্নী বলল, আমার অত্যাচারী ঈর্ষাপরায়ণ স্বামীর হাত থেকে।

ব্যারণপত্নী বললেন, তোমাদের বিবাহবিচ্ছেদ কি হয়ে গেছে ?

মার্কুইপত্নী উত্তর করল, এখনো হয়নি। তবে তার জন্য প্রয়োজনীয় অভ্রান্ত প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি। কিন্তু তার জন্য আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।

ব্যারণপত্নী এবার হাতের বইটা ফেলে উঠে বসল ; বলল, ভাল করে খুলে বল ব্যাপারটা।

মার্কুইপত্নী বলল, আমার স্বামীর কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলাম অনেকদিন হতে। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কারণ আমার উপর অনেক অত্যাচার অবিচার করলেও তার কোন প্রমাণ রাখত না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব সময় ও বিরক্ত করত আমায়। কথায় কথায় আঘাত দিত আমার মনে। যখন আমি ঘরে থাকতে চাইতাম ও আমায় বাইরে যেতে বলত, আবার যখন বাইরে যেতে চাইতাম তখন ঘরে আটকে রাখত। আমি চাইতাম ও আমাকে ধরে মারুক। কিন্তু গায়ে কোনদিন হাত দিত না। আমি ভাবতাম এভাবে আর চলতে পারে না। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পেতাম না। তারপর সহসা একসময় একটা উপায়ের কথা মাথায় এল আমার। ওর একজন রক্ষিতা ছিল। কিন্তু ও খুব সতর্কতার সঙ্গে সেখানে যেত। ফলে কেউ কিছু টের পেত না। তারপর অতিকষ্টে একদিন আমার ভাইকে দিয়ে বেশকিছু টাকা খরচ করে সেই মেয়েটার একটা ফটো যোগাড় করলাম। তারপর সেই ফটোটা নিয়ে একটা দালালের কাছে গেলাম। গিয়ে বললাম এই মেয়েটার মত দেখতে একটা সুন্দরী ঝি চাই যে আমার বাড়িতে কাজকর্ম করবে। বেশ ভাল দেখে একটা মেয়ে।

দালালটা বলল, আপনি কি চরিত্রের দিক থেকেও ভাল চান ?

আমি বললাম, না তা ঠিক না, কারণ আমি বিশেষ করে আমার স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই চাইছি।

সে আমার কথা বুঝতে পেরে হাসিমুখে বলল, ঠিক আছে। এক সপ্তার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। পেলে তবেই টাকা দেবেন।

তিন দিনের মধ্যেই একটি লম্বা সুন্দরী মেয়ে আমাদের বাড়িতে এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। তার সঙ্গে কথা বলে দেখলাম সে রাজি আছে। আমার স্বামী কি খেতে ভালবাসেন, কি ধরনের সেন্ট ভালবাসেন তা জেনে নিল। সে বলল, এই ধরনের দশ দশটি বিবাহবিচ্ছেদ এইভাবে সে ঘটিয়েছে।

আমি বললাম, এ কাজে সফল হতে তোমায় কতদিন লাগবে ?

মেয়েটি বলল, সেটা নির্ভর করছে আপনার স্বামীর মেজাজের উপর। আমি তাঁকে একবার দেখলেই তা বলে দেব। আমাকে আপনি রোজ বলে ডাকবেন।

সেইদিনই আমার স্বামী বাড়ি ফিরে রোজকে দেখে অবাক হয়ে গেল। আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটি বেশ সুশ্রী ত! কোথায় পেলে?

আমি বললাম গ্র্যাঞ্জেরির ব্যারণপত্নী আমার জন্ত যোগাড় করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমার স্বামী খুশি হলো। সেদিন থেকে আমাকে ইচ্ছামত বাইরে বেরিয়ে যাবার স্বাধীনতা দিল। আমি সারাদিন বাইরে থাকলেও কিছু বলত না আমায়। আমিও চাইতাম ওদের মধ্যে দ্রুত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠুক আমার অনুপস্থিতিতে। একদিন রোজ আমায় বলল, আমার স্বামী ওর নাম জিজ্ঞাসা করেছে। তার মানে তার গলার স্বরটা কেমন জানতে চেয়েছে। আর একদিন এসে বলল, হয়ে গেছে। আজ সকালে।

আমি জিজ্ঞাসা করতে বলল, তিন চার দিন ধরে আমার স্বামী ওকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এসব ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হতে নেই। তাই আমি তিন চারদিন ওঁকে এড়িয়ে গিয়েছি। অবশেষে আজ সকালে রাজী হই।

আমি তখন বললাম, তাহলে এবার দেরী না করে একটা দিন ঠিক করে ফেল। যেদিন আমি তোমাদের এ কাজে হাতেনাতে ধরে ফেলব, তাহলেই সব কাজ হাসিল।

অবশেষে ঠিক হলো আগামী বৃহস্পতিবার ঠিক বেলা পাঁচটার সময় আমার ঘরে আমার বিছানাতেই আমি ওদের ধরে ফেলব। অর্থাৎ আমি তখন বাইরে থাকব। আর ঠিক সময়ে উপযুক্ত সাক্ষীদের সঙ্গে করে এসে ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকব।

তার কথা শেষ করে ব্যারণপত্নীর ঘরের মধ্যে আনন্দে নাচতে লাগল মার্কুইপত্নী।

ব্যারণপত্নী শুধু একবার হতাশার সুরে বলল, ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখার জন্ত আমাকে ডাকতে পারলে না! আমাকে আগে জানাতে হত।

বানিজার ভেনাস

[The Venus of Baniza]

কিছুকাল আগে বানিজায় এক ইহুদী পণ্ডিত ছিল। সে যেমন ধর্মভীরু ছিল তেমনি ধর্মশাস্ত্রে তার ছিল বিশেষ বুৎপত্তি। বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে ও

শাস্ত্রীয় বিচার উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে মাঝে মাঝে ডাক পড়ত তার। তবে তার নিজের শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তার স্ত্রীর অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথাটাও ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে।

সাধারণতঃ পণ্ডিতদের স্ত্রীরা কুৎসিত হয় এই ধরনের একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই প্রবাদের ব্যাখ্যা করে ইহুদী পণ্ডিতটি বলত, পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান। ঈশ্বর জানের পণ্ডিতরা নারীর রূপটাকে বড় করে দেখবে না। তাই যে সব কুরূপা নারীদের সাধারণ অশিক্ষিত বা স্বল্প-শিক্ষিত মানুষরা গ্রহণ করবে না ঈশ্বর তাদের পণ্ডিতদের দান করেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে ঈশ্বর তাঁর এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেছেন। তিনি এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী স্ত্রী হিসেবে দান করেছেন এই ইহুদী পণ্ডিতকে। তার সৌন্দর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে স্থানীয় লোকেরা বলত বানিজার ভেনাস। লম্বা চেহারার অপূর্ব মুখশ্রী, টানা টানা কালো চোখ, ফর্সা ঘাড়ের দুপাশে ছড়ানো কালো চুলের গোছা। শুভ্র মসৃণ হাতদুটো দেখে মনে হত হাতীর দাঁত থেকে কুঁদে কুঁদে নির্মাণ করা হয়েছে। এক কথায় সে সৌন্দর্যের তুলনা পাওয়া যায় না অন্য কোন নারীর মধ্যে। অন্ততঃ বানিজার লোকেরা তা পায়নি।

ইহুদী পণ্ডিতের কিন্তু সেদিকে খুব একটা উৎসাহ ছিল না। সে প্রায় দিনের সব সময় শাস্ত্রপাঠ আর পূজা অর্চনা নিয়েই থাকত। আর তার স্ত্রী ভেনাস বারান্দায় একটা চেয়ার পেতে বসে রাস্তায় লোক চলাচল দেখত। তাদের অবস্থা ভাল ছিল বলে বাড়িতে কাজকর্ম করার লোকের অভাব ছিল না। ভেনাসের হাতে ছিল তাই অফুরন্ত সময়। সারা দিনরাতের মধ্যে একমাত্র খাওয়া আর ঘুমোন ছাড়া অন্য কোন কাজ হাতে না থাকায় ভেনাস সাজগোজ করে পথের উপর তার শূন্য স্বপ্নালু দৃষ্টি ছড়িয়ে বসে থাকত। আর মাঝে মাঝে তার পানে তাকিয়ে তার মুনির মন টলানো, রাজার সিংহাসন কাঁপানো, কবি চিত্রকরের প্রেরণা যোগানো রূপসৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে যেত পথচারিরা।

একদিন বিকালের দিকে একটা প্রকাণ্ড ঝড় বয়ে গেল সারা শহরটার উপর দিয়ে। সহসা একসময় ভেনাস তার স্বামীর পূজোর ঘরে গিয়ে প্রশ্ন করল, আচ্ছা বলতে পার ডেভিডের পুত্র মেসিয়া কখন আসবে ইহুদী জাতির মাঝে?

পণ্ডিত বলল, যখন সমগ্র ইহুদী একেবারে পুণ্যবান ও ধর্মাত্মা হয়ে উঠবে অথবা একেবারে পাপাত্মা হয়ে উঠবে একমাত্র তখনি তাদের মাঝে আবির্ভূত হবে ডেভিডপুত্র মেসিয়া।

ভেনাস তখন আবার প্রশ্ন করল, তুমি কি বিশ্বাস কর ইহুদীরা কোনদিন সম্পূর্ণরূপে পুণ্যাত্মা হয়ে উঠবে একযোগে?

পণ্ডিত উত্তর করল, সেকথা আমি কি করে বলব বল।

ভেনাস বলল, তাহলে তারা যখন সম্পূর্ণরূপে পাপিষ্ঠ হয়ে উঠবে তখনি আসবে মেসিয়া।

কথাটাকে তুচ্ছভাবে উড়িয়ে দিয়ে আবার পুজোয় মন দিল পণ্ডিত। বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। ঝড় থেমে গিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে সেই বৃষ্টি দেখতে দেখতে আপন দেহের পোশাকের উপর আনমনে হাত বোলাতে লাগল ভেনাস।

একদিন পাশের এক শহরে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শাস্ত্র বিচারের কাজে ডাক পড়ল পণ্ডিতের। বাড়িতে বলে গেল পরদিন সকালে আসবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ মিটে যেতে সেইরাত্রেই বাড়ি ফিরল পণ্ডিত অপ্রত্যাশিতভাবে।

বাড়ির সামনে এসে আশ্চর্য হয়ে গেল পণ্ডিত। দেখল তার বাড়ির সদর দরজার সামনে কোন পদস্থ সরকারী অফিসারের এক আর্দালি পাহারা দিচ্ছে। বাড়ির ভিতরটা আলো দিয়ে ভালভাবে সাজানো হয়েছে।

পণ্ডিত প্রহরীকে বলল, তুমি এখানে কি করছ ?

লোকটি বলল, আমি দেখছি সুন্দরী ভেনাসের স্বামী হঠাৎ এসে পড়ে কি না।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে না পেরে বাগানবাড়ির দিকের পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকল পণ্ডিত। উপরে যেতে যেতে দেখল খাবার টেবিলে দুজনের খাবার সাজানো হচ্ছে, দেখল তার স্ত্রী বারান্দায় তেমনি সাজগোজ করে বসে আছে।

পণ্ডিত রাগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, আমার অবর্তমানে কে এই বাড়িতে এসেছে ?

ভেনাস কোন কথা বলল না। কোন জবাব দিল না। তখন পণ্ডিত বলল, আমি জানি, সৈন্যবিভাগের এক ক্যাপ্টেন এসেছে তোমার সঙ্গে এ বাড়িতে রাত্রিবাসের জন্যে।

শান্তকণ্ঠে ভেনাস উত্তর করল, কেন আসবে না বলতে পার ?

পণ্ডিত বলল, বউ, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

তার স্ত্রী উত্তর করল, আমার পূর্ণ জ্ঞান আছে।

ভেনাসের সুন্দর ঠোঁট দুটোর মাঝখানে এক রহস্যময় হাসির রেখার একটা ঝিলিক খেলে গেল। সে হাসি মুখ হতে মিলিয়ে যেতে না যেতেই সে বলল, ভুলে যেও না অধঃপতিত হতভাগ্য ইহুদী জাতির উদ্ধারের জন্য যাতে মেসিয়ার আবির্ভাব ঘটে তার জন্য আমারও কিছু করার আছে।

লা মোরিলনি

[La Morillonne]

মেয়েটাকে গাঁয়ের সবাই লা মোরিলনি বলে ডাকত। তার কালো চুল আর শরতের ঘনকৃষ্ণ গাছের পাতার মত গায়ের রংএর জন্য এ নামে তাকে ডাকত না তারা। ডাকত তার পুরু নীল ঠোঁটের জন্য।

এ অঞ্চলের সব লোকই শ্বেতকায়। তাদের চুলগুলো বাদামী রংএর। এখানকার লোকেরা তাই বলাবলি করত মোরিলনির বংশের কোন মেয়ে কোন কৃষ্ণকায় নবাগতর প্রেমে পড়ে। সেই রক্ত আজ আত্মপ্রকাশ করেছে মোরিলনির মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে মোরিলনির গায়ের রংটাই শুধু কালো নয়, তার মনটাও কালো, কুটিল আর হিংস্র প্রকৃতির।

গায়ের রংটা কালো হোক, দেহের মধ্যে একটা শ্রী থাকতে পারে। কিন্তু মোরিলনি দেখতে একেবারে বিশ্রী, কুৎসিত। চেহারাটা রোগা-রোগা, মুখটা কালো, দেখতে খারাপ, চোখের মধ্যে কোন বাহার নেই। মাথার চুলগুলো মোটা আর অপরিচ্ছন্ন।

অথচ তার এই কদাকার চেহারা সত্ত্বেও গাঁয়ের বহু লোক পাগল তার জন্য। মোরিলনির বয়স যখন মাত্র বারো তখন থেকেই সে বহু ছেলের মাথা খেয়ে আসছে।

গাঁয়ের অল্পবয়সী যুবকদের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া হলো, গাঁযের যারা বয়োঃপ্রবীণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ ভূতপূর্ব পৌরপিতা, ধনী চাষী, স্কুলমাষ্টার প্রভৃতিরাও মোরিলনিকে একবার করে কাছে পাবার জন্য আকুল। পুলিশের বড়বাবু কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না এবিষয়ে; কারণ অনেকে বলে তিনি নিজেও নাকি সমান্ দোষে দোষী। তবে মোরিলনির কাছে যারা যায়, তাকে যারা কাছে একবার করে পায় তারা কিন্তু কেউ কারো প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ নয়। তারা যেন সবাই সমানভাবে ভাগ করে উপভোগ করতে চায় মোরিলনিকে। সে যেন গ্রামের সাধারণের সম্পত্তি।

কিন্তু মোরিলনি কারো কাছে কোনদিন ধরা দেয়নি সম্পূর্ণরূপে এবং জীবনে কোনদিন দেবেও না। গাঁয়ের এমন কোন পুরুষের ক্ষমতা নেই যে মোরিলনিকে নিয়ে তার নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে ভোগ করে। একথা কেউ ভাবতেই পারে না।

একমাত্র ক্রু নামে গাঁয়ের এক মেষপালকের ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম দেখা গেল। ক্রু ছিল এক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে মাঠের ধারে

একটা স্থাবর কাঠের কুঁড়েতে বাস করত সে। সারাদিন ভেড়া চড়িয়ে বেড়ানোই তার কাজ ছিল। গাঁয়ের লোকেরা তাকে ভয় করত, কেউ কাছে যেতে চাইত না। কারণ ক্রুর তিনটে ভয়ঙ্কর কুকুর ছিল যারা ক্রুর নির্দেশে মানুষকে জীবন্ত ছিঁড়ে খেত। তাছাড়া ক্রু চোখ দিয়ে বাণ মেরে কোন গরু-ভেড়াকে পঙ্গু করে দিতে বা কারো তৈরী ফসল নষ্ট করে দিতে পারত।

গাঁয়ের সব লোক যখন মোরিলনির জন্যে পাগল একমাত্র ক্রুই তার প্রতি একেবারে উদাসীন। আশ্চর্যভাবে নির্বিকার। মোরিলনির অহঙ্কারে স্বাভাবিকভাবে আঘাত দিল ক্রুর এই ঔদাসিন্য।

একদিন একা পেয়ে মোরিলনি ক্রুর পিছু নিয়ে গাঁয়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ক্রু একবার পিছন ফিরে বলল, কি চাস?

মোরিলনি বলল, আমি চাই তোকে।

ক্রু সঙ্গে সঙ্গে মোরিলনিকে জড়িয়ে ধরে তার কুঁড়েতে নিয়ে গেল। পুরো এক সপ্তা ধরে মোরিলনি সেইখানেই রয়ে গেল। একটিবারের জন্যেও গাঁয়ের ভিতরে গেল না। নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল গাঁয়ের লোকেরা। অবশেষে বহুবল্লভা বহুভোগ্যা মোরিলনি একা ক্রুর মত একটা গরীব রাখালের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে গেল। কথাটা ভাবতে অপমান বোধ করল অনেকেই, আশ্চর্যও হলো তারা। যে ক্রুর চোখকে সবাই ভয় করে, জংলী বর্বর যে লোকটার কাছে যেতে সাহস পায় না সেই লোকটাকে দিব্যি বশ করে ফেলল মেয়েটা। মোরিলনিও হয়ত যাদু জানে।

একদিন গাঁয়ের এক সাহসী যুবক একটা বন্দুক নিয়ে ক্রুর কুঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল। ক্রুর কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠল। যুবক তখন চীৎকার করে ক্রুকে ডেকে বলল, তোমার কুকুরগুলোকে বাঁধ, তা না হলে আমি ওদের গুলি করে মেরে ফেলব।

ক্রুর পরিবর্তে মোরিলনি বেরিয়ে এসে উত্তর করল, তোমার ভয়ের কোন করণ নেই। কুকুরগুলোকে আমি শান্ত করব।

ক্রু গর্জন করে উঠল, লোকটা কি চায়?

মোরিলনি বলল, লোকটা চায় আমাকে। আমি যাব ওর সঙ্গে।

ক্রু ওদের পিছনে কুকুর তিনটে লেলিয়ে দিল। কিন্তু মোরিলনি তার হাতটা বাড়িয়ে দিতেই হিংস্র কুকুরগুলো শান্ত হয়ে তার সেই হাতটা আদর করে চাটতে লাগল। মোরিলনি ক্রুকে ডেকে বলল, দেখ, ক্রু, এখন থেকে কুকুরগুলো আমার। আমি ওদের প্রভু।

একপাত্র মদ দাও

[Wanted a bock]

আজকের এই শীতের সন্ধ্যায় কেন আমি এই মদের দোকানে এসে ঢুকে পড়লাম তার কারণটা ঠিক আমি নিজেই বলতে পারব না। তার সত্যি সত্যিই কোন কারণ নেই বলেই তা বলতে পারব না। এখানে আসব বলে আগে থেকে তৈরী হয়ে আসিনি, মদের প্রয়োজনেও আসিনি। আসলে পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঢুকে পড়েছি।

বাইরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। কুয়াশায় ঢেকে ছিল চারদিক। ভীষণ ঠাণ্ডা। পথে যেতে যেতে আমি একটা বড় কাফে দেখতে পেলাম। কিন্তু সেটাতে ভিড় দেখে গেলাম না। আসলে আমি চাইছিলাম একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গা যেখানে বসে এই বর্ষণঘন শীতের সন্ধ্যাটা কাটাতে পারি।

মদ খাবার আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। তবু দোকানটায় কোন ভিড় ছিল না বাইরে থেকে দেখে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে একজন লোকের পাশে বসে পড়লাম। লোকটিকে একনজরে বৃদ্ধ মনে হচ্ছিল আমার। তার জামাকাপড় মলিন। একটা পাইপ মুখে ছিল তার। সামনে সাত আটটা মদের খালি বোতল পড়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। লোকটা কি এত মদ সব একা খেয়েছে ?

যাই হোক, আমি তার পাশে বসে পড়ে এই সব ভাবছি এমন সময় লোকটা আমাকে সোজা প্রশ্ন করল পরিচিত ব্যক্তির মত, কেমন আছ ? আমাকে হয়ত তুমি চিনতে পারছ না।

আমি বললাম,, না চিনতে পারছি না।

সে তখন বলল, আমি ব্যারেৎস্।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম অপার বিস্ময়ে। বললাম, কাউণ্ট জাঁ দে ব্যারেৎস্ আমার কলেজবন্ধু !

আমি তার হাতটা ধরে বললাম, এখন কি করছ ?

সে শান্তভাবে বলল, তুমি দেখছ আমি কি করছি।

আমি বললাম, আমি বলছি তোমার পেশার কথা। অন্যদিককার কথা।

সে তার পাইপ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমার কাছে সবদিনই সমান।

ব্যারেৎস্ দোকানের বয়কে ডেকে বলল, দু গ্লাস মদ দিয়ে যাও।

একজন বয় এসে একটা বোতল থেকে মদ ঢেলে দুটো গ্লাসে ভরে দিয়ে

গেল। ব্যারেৎস্ একচুমুকে তার গ্লাসটা শেষ করে ফেলল। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, নতুন খবর কি বল ?

আমি বললাম, নতুন খবর আর কি, আমি এখন ব্যবসা করি।

ব্যারেৎস্ বলল, তুমি যদি নিজের জন্য কাজ করো তাহলে নিশ্চয়ই তাতে আনন্দ আছে, তার একটা অর্থ আছে। কিন্তু যদি পরের জন্য কাজ করো তাহলে তার কোন অর্থ থাকতে পারে না। শুধু সময় নষ্ট, আর তাতে পাবে শুধু অকৃতজ্ঞতা।

আমি তাকে তখন বললাম, আচ্ছা কিছু একটা না করে কি করে তুমি সময় কাটাও ?

আবার এক গ্লাস মদ শেষ করে ব্যারেৎস্ বলল, আমি এখান থেকে রাত প্রায় একটার সময় উঠি। তারপর বেলা বারোটায় ঘুম থেকে উঠে প্রাত-রাশ খাই। তারপরে মদ। সন্ধ্যেয় রাতের খাওয়া সেরে আবার মদ। এই দোকানের বাইরে আমার জীবনের কোন সত্য কোন অর্থ নেই। আমার স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, কোন ভালবাসার বন্ধন নেই। কিছুই নেই।

আমি বললাম, তোমার এখন বয়স কত ?

ব্যারেৎস্ বলল, মাত্র তিরিশ, কিন্তু দেখে মনে হয় পঁয়তাল্লিশ।

আমি তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। মাথায় টাক পড়ে গেছে। এক-মুখ দাড়ি-গোঁফ।

আমি তাকে বললাম, নিশ্চয় তুমি জীবনে বড়রকমের একটা দুঃখ, আঘাত বা আশাভঙ্গের বেদনা পেয়েছ। তার জন্যই সমগ্রভাবে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছ তুমি। তুমি বিয়ে করেছ ?

ব্যারেৎস্ বলল, না। কখনো কোন মেয়ের প্রেমে পড়িনি। তবে আমার বাল্যকালে আমি একটা নিদারুণ আঘাত পাই মনে। তবে শোন বলি। কিন্তু তোমার পিপাসা পায়নি ? এক গ্লাস মদ খাও।

আমি বললাম, না। আমি বেশী মদ খাই না।

ব্যারেৎস্ বলতে শুরু করল, আমার বয়স তখন মাত্র তের। তার কিছু-দিন পরেই আমি স্কুলে ভর্তি হই। আমাদের সাদা রঙের বিরাট বাড়িটা তুমি দেখেছ। আমরা যেখানে থাকতাম সেখানকার সকলেই আমার বাবাকে ভয় করত, খাতির করত। আমার বাবা ছিলেন একজন কাউন্ট।

তখন সেপ্টেম্বর মাস। একদিন বিকালের দিকে পার্কের একটা গাছে উঠে একা একা খেলা করছিলাম আমি। হঠাৎ দেখলাম সেই পার্কের নিকটবর্তী একটা রাস্তা দিয়ে আমার বাবা মা পাশাপাশি বেড়াচ্ছেন। আমি ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে তাদের কাছাকাছি গিয়ে তাদের কথা শুনতে লাগলাম। দেখা দিলাম না। হঠাৎ আমার বাবা একসময় আমার মাকে বললেন, তোমাকে এ কাগজে সই করতেই হবে।

মা বললেন, এ সম্পত্তি তাঁর। তুমি তা হাতে পেলে মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করে উড়িয়ে দেবে।

তখন আমার বাবা হঠাৎ মাকে ধরে মারতে মারতে ফেলে দিলেন। মা পড়ে গেলেও মারতে লাগলেন। আমি প্রথমটায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। তারপর সামনে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে লাগলাম। আমার বাবা তখন মাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে তেড়ে এল। আমার মনে হলো আমাকে পেলে বাবা আমাকে খুন করে ফেলবে। তাই আমি তখন বন-বাদাড় পার হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে চলে গেলাম। অজানা একটা জায়গায় গিয়ে একটা গাছের তলায় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্ষুধা ও ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম আমি। পরের দিন সকালে রোদ উঠলে আমার ঘুম ভাঙল। তারপর একটা লোক আমাকে দেখতে পেয়ে বাড়ি নিয়ে গেল। আমাকে বাবা মার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার মা বললেন, সেদিন তুমি হঠাৎ ঐভাবে চীৎকার করায় আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। রাতে ঘুমোতে পারিনি।

আমি কোন কথা না বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। বাবা কোন কথা বললেন না। গম্ভীরভাবে চুপ করে রইলেন। তার সাত আট দিন পরেই আমাকে স্কুল বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

সেদিন জীবনের যে খারাপ দিকটা দেখেছিলাম আমি তা কোনদিন ভুলতে পারিনি আর পারবও না। সেদিন থেকে জীবনের কোন ভাল দিক দেখতে পাইনি আমি। এর কারণ কি। তখন আমার বালক মনে কি চিন্তা ঢুকেছিল তা বলতে পারব না। তবে সেই থেকে আমি কোন কিছুর আশা করিনি। কোন আশা আকাঙ্ক্ষা বা প্রেমানুভূতি জাগেনি আমার মনে। আমার মনে শুধু ভেসে উঠত একটা ছবি—আমার মা মাটিতে পড়ে রয়েছেন আর বাবা তাঁকে মারছেন। এ ছবিটা ঘুরে ঘুরে আজ আসে আমার মনে। সেই ঘটনার বছরকতক পরেই আমার মা মারা যান। বাবা এখনো বেঁচে আছেন। কিন্তু সেই থেকে তাঁকে আর চোখে দেখিনি আমি।

কথা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ব্যারেৎস্।

বিবাহবিচ্ছেদের অজুহাত

[The sequel to a divorce]

নামকরা কৃতী ব্যারিস্টার মান্‌প্রে গেরুলিয়ার বদেমন্তএর কাউন্টপত্নীর সব কথা শুনে চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন। যেকোন মামলায় বিশেষ করে,

বিবাহবিচ্ছেদসংক্রান্ত মামলায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সাধারণতঃ তিনি যে সব মক্কেলের হয়ে লড়াই করেন তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই গেরুলিয়ারের মত দুর্দান্ত আইনবিদ ঘাবড়ে গেলেন। বসে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন কাউন্টপত্নীর কথা শুনে।

গেরুলিয়ার দেখলেন কাউন্টপত্নী সত্যিই সুন্দরী। তার সে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যেকোন লোক যেকোন অসাধ্য সাধন করতে ছুটবে, সে পর্বতপ্রমাণ বাধাকে অপসারিত করতে যাবে অথবা তার আপন আত্মাটাকে শয়তানকে বিলিয়ে দেবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গেরুলিয়ার লক্ষ্য করলেন কাউন্টপত্নী বড় ভাবপ্রবণ। বাস্তববুদ্ধির একান্ত অভাব তার মনে। পাখির মতই উড়ু উড়ু এক ভাব নিয়ে সব বাধাবিপত্তি কল্পনার পাখা দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলো। হীরের পিন দিয়ে আঁটা মুক্তা বসানো দামী কালো পোশাক পরে বসে সোনালী চুলগুলো ছড়িয়ে সে যখন আবেগের সঙ্গে কথা বলছিল তখন তার নাসারন্ধ্রটা কাঁপছিল।

গেরুলিয়ার একমনে তার সব কথা শুনে যেতে লাগলেন। তার আবেগ ও উত্তেজনায় কোন বাধা দিলেন না। তবু সে সব কথার পুরো অর্থ বুঝতে পারলেন না তিনি। শুধু একটা কথা বুঝতে পারলেন, কাউন্টপত্নী বিবাহ-বিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এসেছে তাঁর কাছে। আর সেই বিচ্ছেদসংক্রান্ত মামলা রুজু করায় সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো তার উকিলের কাছে ব্যক্ত করছে। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যে হয়েছে। কাউন্ট তখন হয়ত ক্লাবে ফেন্সিং খেলা শিক্ষায় মন দিয়েছে।

কাউন্টপত্নীর সব কথা শেষ হলে গেরুলিয়ার বললেন, আপনি আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগের কথা বললেন তা বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। বিবাহবিচ্ছেদ ব্যাপারটা ত আর ছেলেখেলা নয়।

কথাটা শুনে মুখটা ম্লান হয়ে গেল কাউন্টপত্নীর। কোন শিশুর হাত থেকে খেলনাটা কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে দিলে সে যেমন হতাশ হয়ে পড়ে তেমনি হতাশ আর বিষণ্ণ হয়ে পড়ল কাউন্টপত্নী।

যাই হোক, কাউন্টপত্নীকে আশ্বস্ত করার জন্য গেরুলিয়ার শেষকালে বললেন, হতাশ হবার কিছু নেই। আমার সঙ্গে আবার দেখা করবেন। সব মানুষেরই কিছু না কিছু দুর্বলতা বা ত্রুটি বিচ্যুতি আছেই। দেখতে হবে কি করা যায়।

গেরুলিয়ারের কথামত চলে তাঁর নির্দেশমত কাজ করে কয়েক মাসের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় জিতে গেল বদেমস্তের কাউন্টপত্নী। কাউন্টের কাছে এটা ছিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। তিনি ভাবতেই পারেননি তাঁর স্ত্রী বিনা দোষে এ মামলা দায়ের করবে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এক অপ্রত্যাশিত আঘাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কাউন্ট।

প্রথমে খুব রেগে গেলেন কাউন্ট। তাঁর স্ত্রীর উকিলের কাছে গিয়ে তার কান কেটে নেবেন বলে ভয় দেখালেন। তারপর রাগটা পড়ে গেলে বললেন, ওর যা খুশি হয়েছে করেছে। ও সুখে থাকুক।

এরপর ভারত ও সিংহলে বেড়াতে যাবার জন্য এক দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পরিকল্পনা করলেন কাউন্ট। ভাবলেন মনটার পরিবর্তন হবে। সব দুঃখ ও আঘাতের ক্ষতটা পূরণ হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। এমন অবস্থায় শূন্য বাড়িতে থাকা কোনমতেই সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

এদিকে বিবাহবিচ্ছেদের পর সব বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন কাউন্টপত্নী। তার মনে হলো সে যেন তার সেই অনেকদিনের হারানো বাধাবন্ধনহীন সেই শৈশব-জীবন ফিরে পেয়েছে। এখন সে ইচ্ছামত যেকোন জায়গায় যেতে পারে যেকোন কাজ করতে পারে। তবু অল্প দিনের মধ্যেই সেই অবাধ অফুরন্ত মুক্তিতে ক্লান্তি অনুভব করতে লাগল কাউন্টপত্নী। অবাধ মুক্তির সীমাহীন শূন্যতায় বেশীদিন থাকতে পারে না বাঁচতে পারে না কোন মানুষ। ঘর চাই। সেই ঘর বাঁধার জন্য আবার বিয়ে করল সে।

ওদিকে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় মনে কোন শান্তি পেলেন না কাউন্ট। যার স্মৃতি মন থেকে মুছে দেবার জন্য ঘর ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন দূর সমুদ্রে তার স্মৃতি অহোরহঃ পীড়িত করে তুলেছে তাঁর মনটাকে। তাছাড়া তাঁর স্ত্রীর ছবিটাও তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বারবার সে ছবিটা দেখতেন তিনি। স্ত্রীর সব দোষের কথা ভুলে গেছেন তিনি। তাঁর শুধু মনে হয়েছে এই বিবাহবিচ্ছেদের সব দোষ তাঁর নিজের। তাঁর স্ত্রীর রূপগুণের মর্যাদা হয়ত ঠিকমত দিতে পারেননি তিনি।

দুর্মর স্মৃতির অবিচ্ছিন্ন পীড়ন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে এক একসময় মৃত্যুর কথা ভেবেছেন কাউন্ট। অকারণে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কোন জায়গায় গিয়েছেন। তবু মৃত্যু হয়নি। জলপথে বহু দেশে ঘুরে অবশেষে দেশে ফিরে এলেন কাউন্ট। অথচ কোন পরিবর্তন হলো না মনের। দুঃখের ভারী পাথরটা বুকের ভিতরে যেখানটায় ছিল সেখানেই রয়ে গেল।

দেশে ফিরে একদিন কাউন্টপত্নীকে দেখতে পেলেন কাউন্ট। কোন কথা বলার সুযোগ ছিল না। তবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন সেও সুখী নয়। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিয়ে করেও সুখী হতে পারেনি।

একথা শুনে উৎসাহিত হয়ে কাউন্টপত্নীকে আবেগের সঙ্গে একটা চিঠি লিখলেন কাউন্ট। লিখলেন তাকে ছেড়ে তিনি জলহীন মীনের মত মৃতপ্রায় হয়ে আছেন। তাকে ছাড়া তাঁর জীবন বৃথা, দুঃসহ। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে দেখা করার এক প্রার্থনা জানালেন।

অল্প দিনের মধ্যেই চিঠির উত্তর পেলেন কাউন্ট। কাউন্টপত্নী দিন ধার্য করে জানিয়েছে ঐদিন সে এসে দেখা করবে কাউন্টের সঙ্গে। অধীর আগ্রহে নির্দিষ্ট সময়ে প্রতীক্ষায় বসে রইলেন কাউন্ট। যথাসময়ে এসে তাঁর বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে তাঁর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাউন্টপত্নী। কাউন্টের মনে হলো দীর্ঘ নির্বাসনের পর তিনি তাঁর বহুআকাঙ্খিত ঘরে আবার ফিরে এসেছেন। সেই পরিচিত শান্তির নীড়ে।

কৃত্রিম বিচ্ছেদের মাধ্যমে কোন স্বামীর হৃদয় জয় করার এই কৌশলের কথা শুনে গেরুলিয়ার বললেন, এমন আশ্চর্য ঘটনার কথা তিনি কখনো শোনেননি।

খৃস্টোৎসব

[Epiphany]

ক্যাপ্টেন কাউন্ট দ্য গ্যারেন বলল, প্রুশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জানুয়ারী মাসের ষষ্ঠ দিনে খৃস্টোৎসব উপলক্ষে আমরা যে নৈশ ভোজন করেছিলাম তার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমি এক অশ্বারোহী দলের কোয়ার্টার মাস্টার ছিলাম। আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় একটা ছোটখাটো যুদ্ধে আমরা জনকতক শত্রুসৈন্যকে খতম করি। আমাদের পক্ষের তিনজনকে হারাই। তাদের মধ্যে একজন হলো জোশেপ রদেভিন। তাকে হয়ত তোমরা চেন।

সেদিন আমার উর্ধ্বতন অফিসার হুকুম দিলেন মাত্র দশজন সৈন্য নিয়ে আমাকে পোর্তেরিণ গাঁটাকে দখল করতে হবে। এই গাঁটায় গত তিন সপ্তার মধ্যে পাঁচ পাঁচবার যুদ্ধ হয়ে গেছে। গাঁটাকে দখল করে বাকি রাতটা সেখানেই কাটাতে হবে।

তখন শেষ রাত। মাত্র দশজন সৈন্য নিয়ে ভোর চারটের সময় পোর্তেরিণ গাঁয়ের পথে রওনা হলাম আমি। তখনও ঘন অন্ধকার চারদিকে। গাঁয়ের প্রথম বাড়িটার সামনে এসে পীয়ের দ্য মার্কাসকে আমি হুকুম করলাম সে যেন প্রথমে একা গিয়ে গাঁয়ের অবস্থা দেখে এসে তার বিবরণ দেয়। সারা গাঁটার মধ্যে তখন মাত্র পনের থেকে বিশটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে'। লোকজন নেই বললেই চলে।

মার্কাস ছিল খেঁকশেয়ালের মত ধূর্ত আর সাপের মত সতর্ক। সে যেন শত্রুসৈন্যদের গন্ধ পেত দূর থেকে। তাই অন্য সৈনিকদের থেকে তাকেই বেছে

নিলাম আমি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল মার্কাস। বলল, আজ তিন দিন হলো এ গাঁ হতে প্রুশীয়রা সব চলে গেছে। আর আসেনি। চার্চের একজন সিস্টারের সঙ্গে দেখা হলো। সে তিন-চারজন আহত সৈনিকের সেবা করছে। এবার আমার সঙ্গে আপনারা চলুন।

সে বলল, থাকার মত একটা সুন্দর বাড়ি আছে। সেখানে গিয়ে আমরা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেব।

তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখলাম বাড়িটা সত্যিই ভাল। সামনে এক-ফালি বাগান। পিছনে আস্তাবল। সেখানে আমাদের ঘোড়াগুলো রাখা হলো। আমি পাঁচজন সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। মার্কাসের কাছে রয়ে গেল চারজন। তাদের সাহায্যে আমাদের জন্য খাবার তৈরী করতে লাগল সে।

আমি আমার সঙ্গে পাঁচজন সৈনিককে গাঁয়ের চারদিক প্রহরায় নিযুক্ত করে ফিরে এসে দেখলাম মার্কাস বসার ঘরে একটা ঈজি চেয়ারে বসে আরাম করে সিগারেট খাচ্ছে। আমাকে দেখে বলল, আজ রান্নার জন্য দুটো মুরগী, একটা হাঁস আর তিনটে কালো পায়রা পেয়েছি। রান্না হচ্ছে। কয়েক বোতল মদও পেয়েছি। এক জায়গায় লুকোন ছিল। এবার দরকার মেয়ে-মানুষের। আজ জানুয়ারীর ছয় তারিখ। খৃস্টের উৎসব। কিন্তু কোন একজন বিবাহিতা নারী ছাড়া এ উৎসব উদ্‌যাপিত হবে কি করে? তুমি আমাদের দলের অধিনায়ক। তোমাকেই যোগাড় করতে হবে।

আমি বললাম, কোথায় পাব, এ গাঁয়ে একটিও লোক নেই।

মার্কাস বলল, তুমি গাঁয়ের চার্চে গিয়ে আব্বেকে বল। সে আমাদের সঙ্গে এখানে নৈশভোজন করবে। তাকে বল দুএকজন মেয়ে সে ঠিক যোগাড় করে দেবে।

যেতে মন আমার চাইছিল না। তবু মার্কাস বলল, দেখবে যুদ্ধের শেষে আমরা গল্প করব এই ঘটনার। আমি এক ছন্দোবদ্ধ কবিতায় এ অভিজ্ঞতার কথা লিখে রাখব।

মার্কাসের পীড়াপীড়িতে আমি চার্চে গিয়ে যাজককে সব কথা বললাম। সব কথা শুনে সে ভাবতে লাগল। তারপর বলল, কোন মেয়ে এ গাঁয়ে নেই। বিবাহিত অবিবাহিত সব মেয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

আমি তবু জেদ ধরলাম। যেকোনভাবে দু-একজনকে অন্তত: খুঁজে বার করতেই হবে। তিনি স্থানীয় লোক। অনেক জানাশুনা। হাসপাতালের নার্স হলেও হবে। যাজক অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল। অবশেষে একসময় হাসতে হাসতে বলল, আচ্ছা তুমি যাও, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিন চারজন মেয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি বিজয়গর্বে ফিরে মার্কাসকে সব কথা বললাম। আমাদের নয় দশজনের মত খাবার টেবিলে সাজানো হলো। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। অবশেষে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতে একজন সৈনিক দরজা খুলে দিল। যাজক আবে এসে গেছে। সঙ্গে চারজন মহিলা।

প্রথমে এল নার্স সিস্টার অফ মার্সি। রোগা-রোগা চেহারার ভীরু প্রকৃতির একটি মেয়ে। বয়স হয়েছে। গায়ের মাংসগুলো প্রায় জড়ো জড়ো হয়ে পড়েছে। সে আমাদের প্রত্যেককে নমস্কার করে দাঁড়িয়ে অপর তিনজন মহিলার পরিচয় দান করল। অপর তিনজন মহিলার মধ্যে দুজন খুবই বৃদ্ধ। ঠিকমত চলতে পারছিল না।

সিস্টার প্রথমে আমাকে বলল, আপনি যে আমাদের এই উৎসবে স্মরণ করেছেন এজন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। প্রথমে বলি মাদার পমেলের কথা। এঁর বয়স ষাট। এঁর স্বামী ও পুত্র দুজনেই আফ্রিকার এক যুদ্ধে নিহত হয়। দ্বিতীয় মহিলাটি হলেন জঁা জিয়ান, এঁর বয়স সাতষট্টি। ইনি প্রায় অন্ধ। এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এঁর মুখ আর ডান পাটা পুড়ে যায়। আমাদের দলের তৃতীয় মহিলাটি হলেন লা পুতয়, এঁর বয়স মাত্র চুযাল্লিশ।

খাবাব টেবিলে সবাই বসে খেতে খেতে ঠাট্টা রসিকতা করতে লাগল। আমাদের দলের অন্যেরা বেশ উপভোগ করতে লাগল। বৃদ্ধারা বেশ মজা পাচ্ছিল। রসিকতার উত্তর দান করছিল। একমাত্র মার্কাসই কোন কথা বলছিল না। ঘরের ভেতরটা খুব গরম হচ্ছিল। তাই আমি মার্কাসকে বললাম, একটা জানালা খুলে দাও।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। বেশ ঠাণ্ডা। হঠাৎ একটা গুলির শব্দে জেগে উঠলাম আমি। আমি চীৎকার করে বললাম, মার্কাস, তুমি এখনি দুজন সৈনিক নিয়ে ঘোড়ায় করে বেরিয়ে যাও। দেখ ব্যাপারটা কি, নিকটে কোথাও শত্রু আছে কিনা।

সঙ্গে সঙ্গে তিনজন ঘোড়া ছুটিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল। আমি ও দুজন সৈনিক বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখলাম। কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্কাস ফিরে এল। এসে বলল, একজন চাষীলোক প্রহরারত সৈনিকদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় ও তাদের কথার কোন জবাব না দেওয়ায় তারা গুলি করেছে তাকে। লোকটাকে এখনি ওরা নিয়ে আসছে।

আমাদের উৎসব স্থগিত রইল। বাধা পড়ল আমাদের আহার ও আনন্দের কাজে। গুলিবিদ্ধ চাষী লোকটাকে ধরাধরি করে ঘরের ভিতরে

নিয়ে এলে দেখা গেল তার ক্ষতস্থান থেকে তখনো রক্ত ঝরছে। যাজক আবে দেখে বলল, এ ত বোবা কালা। ওকে মারতে গেলে কেন? আহা বেচারা! সিস্টার বলল, আর কোন উপায় নেই।

আমি বললাম, বোবা কালা বলেই লোকটা ওদের কথার উত্তর দিতে পারেনি।

যাই হোক, আমাদের বড় খারাপ লাগছিল। বৃদ্ধারা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘরের কোণে বসেছিল। সিস্টার তাদের নিয়ে আমাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গেল। আমি সেই উৎসবের কথা কখনো ভুলব না।

বিদূষক

[The clown]

দুর্গের সম্মুখস্থ প্রান্তরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ফেরিওয়ালাদের ছোট্ট কুঁড়েটা। নামেমাত্রই শুধু ওরা ফেরিওয়ালা। ওদের মধ্যে কয়েকজন করে মদ কেনাবেচা। আর বাকিরা সুযোগ পেলেই চুরি করে বেড়ায়। কয়েক-জন জেলও খেটেছে বেশ কয়েকবার।

ওরা মানে আঠারোজন পুরুষ আর একজন মাত্র নারী। একটামাত্র ঘরে ওরা থাকে। একটা উনোনে ওদের সকলের জন্য রান্না হয়। লোক-গুলোর বয়স হয়েছে। কিন্তু ওরা বেশ শক্ত সমর্থ আছে এখনো। মেয়েটার বয়স চল্লিশ। ওদের সকলের থেকে তার বয়স অনেক কম।

ওরা সবাই খাতির করে ওই মোটা মেয়েটাকে। সকলে মিলেই ওর সঙ্গ লাভ করে। কিন্তু কেউ কাউকে ঈর্ষা করে না। ওদের মধ্যে ব্রিয়াগনি একটু সঙ্গতিসম্পন্ন পয়সার দিক থেকে। তাই তার খাতির ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। লোকটার পা দুটো অশক্ত বলে খুঁড়িয়ে চলে। তবু হাতে বেশ জোর আছে।

ব্রিয়াগনি বলে, আমাদের এই আঠারো জনের সাধারণতন্ত্র ভালভাবেই চলছে। আমরা সবাই সুখী। তবু যদি কোনদিন রাজা করার প্রশ্ন আসে আমাদের মধ্যে তাহলে ওরা সবাই আমাকেই করবে দলের রাজা।

ব্রিয়াগনির বিচারবুদ্ধি আছে। তার কাছে খাঁটি বিচার। সে বলে, এখানে কার পয়সা বেশী বা কম সেটা বড় কথা নয়। এই মেয়েটি আমাদের সকলের ভোগ্যা। সকলে সমানভাবে এর সঙ্গ লাভ করবে। মেয়েটা যদি এক ডিশ খাবার হয় তাহলে সকলের ভাগ্যেই জুটবে এক চামচ করে। মাত্র এক চামচ করেই সকলে পাবে। তার বেশী না। কোনক্রমেই না।

মেয়েটার নাম ব্রোলোপ। ব্রোলোপও ভালভাবে মানিয়ে নিয়েছিল সকলের সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ একদিন কোথা থেকে একটা লোককে নিয়ে এল ব্রোলোপ। তারপর ওদের বলল, দেখ, এই লোকটা আমার পেয়ারের লোক। এ কিছু করবে না। তোরা একে খাওয়াবি পরাবি সকলে মিলে। এটা তোদের সকলের দায়িত্ব। এ শুধু বসে বসে খাবে আর থাকবে। এর বয়স তোদের সকলের থেকে কম। আমি তোদের মত বুড়োদের নিয়ে এত-দিন ঘর করেছি। এবার আমি ওকে নিয়ে থাকব। এ হবে তোদের রাজা। তোরা যদি একে না চাস তাহলে আমি একে সঙ্গে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।

তখন ওরা সবাই মিলে যুক্তি করে রাজী হলো ব্রোলোপের কথায়। তার পেয়ারের লোককে মেনে নিল সবাই। লোকটা খুব হাসাতে পারত বলে ওরা সবাই বলত ভাঁড়। লোকটার বয়স বড়জোর চল্লিশ। সবেমাত্র জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। গায়ে দারুণ ক্ষমতা। একটা মেয়েকে জোর করে ধরতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে যায়।

প্রথম প্রথম ভাঁড় চুপচাপ থাকত। কিন্তু ওরা যখন মাত্রাতিরিক্তভাবে ঠাট্টা করে ওকে জ্বালাতন করতে লাগল, ওর খাবারের মধ্যে ধুলো দিতে লাগল তখন ভাঁড়ও ওদের মারধোর করতে লাগল। ও একাই ওদের খুব মারতে লাগল। ওরা বুড়ো বলে কেউ ওর সঙ্গে পেরে উঠত না।

ওদের আঠারো জনের মধ্যে কখনো ঈর্ষা জাগেনি ব্রোলোপকে নিয়ে। কিন্তু এবার প্রথম ঈর্ষা জাগল ওদের মনে। কারণ ব্রোলোপ ওদের সামনে রাত্রে ভাঁড়কে নিয়ে শুত। ভাঁড় আসার পর থেকে ব্রোলোপ ওদের কাউকে পাত্তা দিত না। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রিয়াগনি পর্যন্ত হার মেনে গেল। কোন ফন্দী এঁটে কিছু করতে পারল না।

অবশেষে একদিন ওদের ঈর্ষা চরমে উঠল। সেদিন গভীর রাতে ব্রোলোপ ভাঁড়ের গলা জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। ঘরের একপাশে তখন ওরা সবাই একযোগে পরামর্শ করে ওদের দুজনকে বেঁধে প্রহার করতে লাগল।

জেগে উঠে ভাঁড় অবাক হয়ে গেল। বুড়ো ব্রিয়াগনি বলল, এই হচ্ছে আমাদের রাজার শাস্তি। আমরাই একদিন আমাদের রাজাকে গিলোটিনে চড়িয়ে তার মাথা কেটেছিলাম। কিন্তু আমাদের রাজাকে প্রাণে না মেরে শাস্তি দিলাম। কারণ আমরা ন্যায়পরায়ণ প্রজা।

প্রেমের জাগরণ

[Love's awakening]

বরকনে দেখে সবাই খুশি হলো। এমন সাজন্ত বড় একটা দেখা যায় না। মঁসিয়ে সাইমন লেক্রমেস্ত যখন প্যারিস থেকে এসে ম্যাদময়জেল জিয়ানিকে বিয়ে করল তখন হৈ হৈ পড়ে গেল সারা বোত্তিগান অঞ্চলে। সকলেই প্রশংসা করতে লাগল পরস্পরের রুচির।

বিয়ের পর ঠিক হলো সাইমন লেক্রমেস্ত দিনকতক শ্বশুরবাড়িতে থাকবে। তারপর তার স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিসে চলে যাবে। সে বলেছে সে নাকি প্যারিসে বড় কাজকারবার করে।

দুটিতে যেন একটি। এমন গভীর ভালবাসা সচরাচর দেখাই যায় না। জিয়ানি বাড়িতে একমুহূর্তও স্বামীকে চোখের আড়াল করে থাকতে পারে না। বলে, সব সময় বাড়িতে থাক।

একএকবার স্বামীর কোলে বসে স্বামীকে বলে, চোখ বন্ধ করে হাঁ করো।

লেক্রুমেস্ত তা করলে তার মুখে মুখ দিয়ে এক দীর্ঘ চুম্বনে ঢলে পড়ে জিয়ানি। এইভাবে সকাল সন্ধ্যে কোনদিকে কেটে যায় বুঝতেই পারে না দুজনে।

এক সপ্তা এইভাবে কেটে গেলে লেক্রুমেস্ত একদিন তার স্ত্রীকে বলল, এবার আমি প্যারিসে যেতে চাই। তোমার কোন আপত্তি না থাকলে আগামী সপ্তার মঙ্গলবারেই প্যারিসে যাব।

জিয়ানিও খুশি হয়ে বলল, ঠিক আছে। তাহলে খুব ভাল হয়।

লেক্রুমেস্ত বলল, তাহলে তোমার বিয়ের সব যৌতুক তোমার বাবাকে ঠিক করে রাখতে বলবে। আমি যাবার সময় নিয়ে যাব।

জিয়ানি বলল, আমি কাল সকালেই বাবাকে বলব।

নির্দিষ্ট দিনে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলো লেক্রুমেস্ত। স্টক ও নগদে মিলিয়ে তিন লক্ষ ফ্রাঁ যৌতুক পেয়েছে সে। নগদ টাকা সব সে নিয়ে যাবে। তার শ্বশুর পাগিলন বলল, এত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাবে ?

লেক্রুমেস্ত বলল, কাজকারবারের ব্যাপারে আমাদের এসব অভ্যাস আছে। আপনি ভাববেন না।

প্যারিসে ট্রেন থেকে নেমে লেক্রুমেস্ত বলল, চল প্রথমে বাজার থেকে প্রাতরাশ সেরে আসি। তারপর কোন একটা হোটেলে গিয়ে উঠব।

বাজারের কোন একটি রেস্তোরাঁয় যাবার জন্য জিয়ানি বলল, একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করো। দুজনে যাওয়া যাবে।

লেক্রুয়েস্ত তার পরিবর্তে তিনঘোড়াটানা একটা বড় যাত্রীবাহী বাস থামিয়ে উঠল। জিয়ানিকে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে উপরে উঠল। বলল, আমি সিগারেট খাব বলে উপরে উঠছি।

প্যারিসের পথ ঘাট কিছুই চেনে না জিয়ানি। সে এ শহরে প্রথম আসছে। কখন বুলভার্ড অঞ্চল পার হয়ে গেছে সে কিছুই বুঝতে পারেনি। একে একে সব লোক নেমে গেল। কনডাকটার চীৎকার করে জিয়ানিকে বলল, নেমে যান।

জিয়ানি বলল, উপরে আমার স্বামী আছে।

কনডাকটার বলল, গাড়ির উপরে কেউ নেই।

জিয়ানি গাড়ি থেকে নেমে দেখল সত্যিই কেউ নেই। দু-একজন লোক জড়ো হলো। কনডাকটার সবাইকে বলতে লাগল, ওঁর স্বামী ওঁকে ছেড়ে চলে গেছে।

কিন্তু এ কি করে সম্ভব ? জিয়ানি তা ভাবতে পারে না। তার চোখে জল আসছিল। মাথাটা ঘুরছিল, এই বিরাট শহরে কোথায় কার কাছে সে গিয়ে উঠবে। তার কাছে মাত্র দু ফ্রা আছে। সব টাকা আছে তার স্বামীর কাছে।

হঠাৎ তার মনে পড়লো হেনরির কথা। তাদের গ্রাম ও জ্ঞাতি সম্পর্কের ভাই হেনরি এই শহরেই নৌবিভাগের অফিসে কাজ করে। একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে তাতে উঠে হেনরির বাসায় চলে গেল জিয়ানি। হেনরি তখন সবেমাত্র অফিসে বার হচ্ছিল। জিয়ানির কাছে সব কথা শুনে হেনরি বলল, সব যৌতুকের টাকা নিয়ে তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে গেছে তোমার স্বামী।

হেনরি তার বাসার মধ্যে জিয়ানিকে নিয়ে গিয়ে তার ঝি সোফিকে হোটেল থেকে প্রাতরাশ আনার জন্য পাঠিয়ে দিল। বলল, আজ আমি আর অফিসে যাব না।

বেড নম্বর ২৯

[Bed no 29]

ক্যাপ্টেন এপিভেঁত যখন রাস্তা দিয়ে চলে যেত তখন চারদিক হতে মেয়েরা তার পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। তার মত সুদর্শন সামরিক অফিসার

বড় একটা দেখাই যায় না। তার লম্বা সবল সুগঠিত দেহ আর সুন্দর টানা মোচের জন্য অহঙ্কার ছিল তার মনে। সামরিক পোশাক পরে থাকলে তাকে সত্যিই খুব ভাল দেখাত।

এপির্ভেঁতের একটা দোষ ছিল। সে একমাত্র সামরিক বিভাগের পদস্থ অফিসার ছাড়া আর কাউকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করত না। আবার এই অফিসারদের মধ্যে যারা ছিল বেঁটে আর মোটা তাদেরও ও দেখতে পারত না দুচোখে।

শহরের মেয়ে মহলে যেমন বেশ নাম ছিল ক্যাপ্টেন এপির্ভেঁতের তেমনি পুরুষ মহলে তার ছিল চরম দুর্নাম। বাজারের-মেয়ে থেকে শুরু করে শহরের গৃহবধূরা পর্যন্ত এপির্ভেঁতকে কাছে পেতে চাইত, লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত তার দিকে। তেমনি শহরের ধনী ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীর পুরুষরা ঈর্ষার বশে তাকে ঘৃণার চোখে দেখত, বলত একটা জঘন্য প্রকৃতির লম্পট।

এপির্ভেঁতের মাথায় একটু টাক ছিল। কিন্তু মোচটার জন্য তাকে মানিয়ে যেত, টাকের কথা মনে হত না। অন্তত: এপির্ভেঁত তাই মনে করত। লাম্পট্য-দোষ ও উচ্ছৃংখলতা সত্যিই ছিল তার চরিত্রে। কিন্তু সেটা এমন কিছু দোষের বলে মনে করত না সে। কোন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বসে নৈশভোজন করতে গিয়ে তাকে ভাল লাগলে তাকে নিয়ে রাত্রিবাস করত এপির্ভেঁত। তাতে যদি কেউ তাকে লম্পট বলে ত বলুক। তবু আশ্চর্যের কথা এই যে, তার এই লাম্পট্যের কথা জেনেও মেয়েরা তাকে খাতির করে চলত।

এপির্ভেঁত যখন রাস্তা দিয়ে তার সামরিক পোশাক পরে গর্বের সঙ্গে হেঁটে যেত তখন দুপাশের বাড়ির বিবাহিত অবিবাহিত ভদ্র গৃহস্থ মেয়েরাও এপির্ভেঁতের একটু কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য তার মুখপানে তাকাত। এপির্ভেঁতকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহের শিরায় শিরায় একটা গোপন জারজ লালসার কাঁপন জাগত। এপির্ভেঁত তাদের পানে না তাকালেও তারা তাদের মুগ্ধ নীরব দৃষ্টির মাধ্যমে, অনেক কথাই ব্যক্ত করত।

কিন্তু যেসব মেয়েরা এপির্ভেঁতকে পছন্দ করত, তার একটুখানি কৃপাদৃষ্টি পাবার জন্য লালায়িত হত তাদের স্বামীরা কিন্তু এপির্ভেঁতকে দেখতে পেলেই গাল দিত। একদিন এক ধনী ব্যবসায়ী তার দোকানের সামনে দিয়ে এপির্ভেঁতকে যেতে দেখে বলল, লোকটা অফিসার বলে অহংকার করে। কিন্তু আসলে একটা অপদার্থ। আমি ওর থেকে একটা কশাইকে বেশী শ্রদ্ধা করি। কারণ সে পেটের দায়ে কতকগুলো পশু হত্যা করে আর ও গর্বের সঙ্গে মানুষ হত্যা করে যুদ্ধ করতে গিয়ে।

ঐ ব্যবসায়ী তার স্ত্রীকে একদিন বাড়িতে বলল, ঐ অপদার্থ নিষ্ঠুর নররক্তপিপাসু লোকটার পানে যারা তাকায় তারা হচ্ছে মহামূর্খ।

তখন ১৮৬৮ সাল। এপিভেঁত তার অধীনস্থ সেনাদল নিয়ে রুয়েন শহরের সৈন্যনিবাসে থাকত। সারা রুয়েন শহরের প্রায় সকলেই তাকে চিনত। রোজ বিকাল পাঁচটা বাজতেই বুদো মলের সন্নিকটস্থ কমেডি নামে একটি বড় রেঁস্তোরায় সন্ধ্যাকালীন চা ও মদ্যপান করতে আসত এপিভেঁত। মাঝে মাঝে শহরের বারবণিতাদের মহলেও যেত মন হলে। সে দেখতে ভাল ছিল। তার উপর বড়দরের সামরিক অফিসার। তাই তাকে কে তার ঘরে নিয়ে যাবে, কে তার মন জয় করবে এই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত তাদের মধ্যে।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সন্ধ্যের সময় কমেডিতে সুন্দরী ইর্মা এসে হাজির। নিটোল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের দিক থেকে ইর্মা ছিল শহরের মধ্যে সেরা। তার বিয়ে হয়নি আবার সে সাধারণ বারবণিতাও ছিল না। সে মঁসিয়ে তেমপ্লিয়ারের রক্ষিতা হিসাবে থাকত। আবার অনেকে বলত সে ছিল স্বাধীন রূপোপজীবিনী; তবে সে নিজের থেকে কাউকে মনোনীত না করলে কেউ যেতে পারত না তার কাছে।

সেই ইর্মা একদিন নিজে থেকে এসে আলাপ করল এপিভেঁতের সঙ্গে। ইর্মাকে দেখে এপিভেঁতের উপরওয়ালা একজন কর্ণেল তাকে নিচু গলায় বলল, মেয়েটাকে হাত করো। এ সুযোগ ছেড়ো না।

সেই রাতেই দুজনে দুজনের মধ্যে পেয়ে গেল তাদের মনের মানুষ। দুজনে যেন দুজনকে অনেকদিন ধরে খুঁজছিল। এরপর থেকে দেখা গেল দুজনে দুজনকে ছেড়ে আর কোথাও যায় না। ইর্মা এমন কি তেমপ্লিয়ারের কাছে যাওয়াও ছেড়ে দিল। এপিভেঁতও আর কোন মেয়ের কাছে যেত না। সারা শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তাদের প্রেমকাহিনী। প্রায় একটি বছর ধরে সারা শহর জুড়ে উড়তে লাগল তাদের বিজয়ী প্রেমের পতাকা। ইর্মার মত শহরের সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে পেয়ে গর্ব করে বেড়াত এপিভেঁত। কথায় কথায় বলত, ইর্মা চায় আমি এটা করি। বলত, ইর্মা আমাকে একমুহূর্তও ছেড়ে থাকতে চায় না। আবার ইর্মাও এপিভেঁতের মত সুদর্শন অফিসারকে পেয়ে খুশিতে টগবগ করে বেড়াত। বড়াই করে বেড়াত।

হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলো। যুদ্ধ বাধল ফ্রান্স আর প্রুশীয়র সঙ্গে। এপিভেঁতের ডাক পড়ল। তাকে তার সেনাদল নিয়ে রণাঙ্গনে যেতে হবে। তাকে বিদায় নিতে হবে আজ রাতেই।

ইর্মার সে কি কান্না! ইর্মার ঘরে এপিভেঁত বিদায় নিতে যেতেই পাগলের মত চুল ছিঁড়তে লাগল ইর্মা। কখনো কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ে মাথা ঠুকতে লাগল। তাকে অনেক করে বোঝাতে লাগল এপিভেঁত। বলল, কেঁদো না ইর্মা। আমাকে সহজভাবে বিদায় দাও। আমি যুদ্ধ শেষ করেই ফিরে আসব তাড়াতাড়ি। ফিরে আসব তোমার কাছে বিজয়ী

বীরের মত।

তবু শান্ত হয় না ইর্মা। ইর্মার ভালবাসায় অবাক হয়ে গেল এপিভেঁতের মত কড়া অফিসার। কোন বিবাহিত স্ত্রীও তার স্বামীকে বিদায় দেবার সময় এমন দুঃখে ভেঙে পড়ে না। এপিভেঁতের মনে হলো, ইর্মা শুধু টাকার জন্যেই তাকে চায় না। তার হৃদয় বলে একটা জিনিস আছে। আর সে হৃদয়ে সে সম্রাটের মত এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। যুদ্ধ শেষ করে আবার রুয়েন শহরের সেনানিবাসেই ফিরে এল এপিভেঁত। তারা জয়লাভ করেছে। তার সেনাদল কৃতিত্ব দেখিয়েছে যুদ্ধে। সত্যিই বিজয়ী বীরের মত যুদ্ধশেষে ফিরে এসেছে এপিভেঁত। কিন্তু ফিরে এসে ইর্মাকে দেখতে পেল না। অনেক খোঁজ করেও কোথাও সন্ধান পেল না তার।

কেউ বলল, ইর্মা কোন প্রুশীয় অফিসারকে বিয়ে করে কোথাও চলে গেছে। কিন্তু সঠিক কথা তার সম্বন্ধে কেউ বলতে পারেনি। এপিভেঁতও তার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিল।

এমন সময় একদিন সকালে তার মেসে একটা কাগজের চিরকুট পেল এপিভেঁত। তাতে লেখা আছে, প্রিয়তম, আমি হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় দীর্ঘদিন আছি। তুমি যদি আমাকে একদিন দেখতে আস তাহলে আমি বড় আনন্দ পাব। ইতি ইর্মা।

চিঠিতে তার বেড নম্বর দেওয়া ছিল। তার বেড নম্বর উনত্রিশ। কোনরকমে প্রাতরাশ সেরেই বেরিয়ে পড়ল এপিভেঁত। ইর্মা তাহলে তাকে এখনো ভোলেনি।

হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ করে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ যেমনি ইর্মা যে ওয়ার্ডে আছে সে ওয়ার্ডে ঢুকতে যাবে, ঢোকার মুখে দেখল বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে 'সিফিলিস'। দেখে ভয়ে আঁতকে উঠল এপিভেঁত। ওষুধ আর পঁচা ঘায়ের দুর্গন্ধ চার দিকে। অবশেষে দেখা পাওয়া গেল ইর্মার। দেখে চেনা যাচ্ছিল না। সারা দেহটা কাপড়ে জড়ানো। শুধু কালসিটেপড়া শীর্ণ মুখটা দেখা যাচ্ছিল।

সেই উনত্রিশ নম্বর বেডের সামনে শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এপিভেঁত। মুখে কথা সরছিল না তার। এদিকে তাকে দেখে মড়ার মত পড়েথাকা ইর্মা যেন হঠাৎ প্রাণ পেল। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আমি আর ভাল হব না। ডাক্তার বলছে, খুব সিরিয়াস হয়েছে আমার রোগটা। তবু তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগছে। তোমার হাতে সম্মানের ক্রশ। তুমি জয়ী হয়েছ। আজ আমার কী আনন্দ।

এপিভেঁত এবার কথা বলল। বলল, এ রোগ কি করে ধরল? তুমি সাবধান হওনি কেন আগে থেকে?

ইর্মা বলল, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কয়েকজন প্রুশীয় অফিসার আমাকে ধরে নিয়ে যায়। আমি ছাড়া পাওয়ার পর দূরে পালিয়ে গেলে হয়ত বাঁচতে পারতাম। কিন্তু আমি সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য বেছে বেছে প্রুশীয় অফিসারদের মধ্যে আমার রোগটা ছড়িয়ে দিতে লাগলাম। আজ আমার সেইটাই বড় সান্ত্বনা। আমি মরছি। কিন্তু অনেক শত্রুকেও আমি ঘায়েল করেছি এইভাবে।

এপিভেঁত যেতে চাইলে ইর্মা বলল, আমাকে একটা চুম্বন দেবে?

এপিভেঁত তার মাথার কাছে গিয়ে তার কপালে একটা চুম্বন করল আর ইর্মা আবেগের সঙ্গে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল তার রোগা রোগা হাত দিয়ে। তারপর বলল, আবার কবে আসবে? বৃহস্পতিবার এসো।

অফিসারদের মেসে ফিরে এসে এপিভেঁত বলল, ইর্মার হার্টের অসুক। আসল কথাটা গোপন করে গেল। কিন্তু অন্যান্য অফিসাররা বলাবলি করতে লাগল। রুয়েনে সবাই এখন ঘৃণা করে ইর্মাকে। কারণ সে শত্রুপক্ষের অনেক প্রুশীয় অফিসারকে বিয়ে করে। তার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতে অনেকেই দেখেছে।

বৃহস্পতিবার যথাসময়ে হাসপাতালে গেল এপিভেঁত। কিন্তু তীব্র ভৎর্সনার সুরে বলল, ছিঃ ছিঃ, শত্রুপক্ষের কোন প্রুশীয়কে তুমি বিয়ে করেছিলে?

ইর্মা বলল, আমি ত আগেই বলেছি। ওরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাই আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। আমি কাউকে বিয়ে করিনি, আমি ত আপোষ করিনি। তোমরা যুদ্ধে শত্রুসৈন্য মেরে বিজয়ী বীরের সম্মান পেয়েছ। কিন্তু সে সম্মান আমি না পেলেও আমিও সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে তখন কম শত্রু মারিনি। তোমার থেকে দেশপ্রেম আমা‹ কম নয়।

এপিভেঁত বলল, প্রুশীয়দের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা সারা শহরের মধ্যে লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমি আসতে পারব না।

ইর্মা তখন পাগলের মত বলতে লাগল—তুমি যত শত্রুসৈন্য মেরেছ তার থেকে বেশী শত্রু আমি হত্যা করেছি। তোমার থেকে আমার দেশপ্রেম কম নয়।

সেখানে আর না দাঁড়িয়ে একরকম ছুটে পালিয়ে গেল এপিভেঁত। পরদিন শুনল ইর্মা মারা গেছে।

স্ত্রীর স্বীকারোক্তি

[Wife's confession]

আমাদের বাড়িটা ছিল নির্জন গ্রামাঞ্চলে। ধারে কাছে লোকালয় বলতে কিছু ছিল না। পুরনো আমলের বিরাট প্রাসাদকে ঘিরে শ্যাওলাধরা মোটা মোটা গুঁড়িওয়ালা গাছ। সামনের দিকে ছিল একটা পার্ক। পার্কের ওধারে ছিল পানা আর দলদামে ভর্তি দুটো বড় বড় পুকুর। একটা লম্বা টানা খাল পুকুর দুটোকে যোগ করে দাঁড়িয়েছিল তাদের মাঝখানে। সেই খালটার উপরে বুনো হাঁস শিকারের জন্য একটা কুঁড়ে তৈরী করেছিল আমার স্বামী।

তখন শরৎকাল। এই সময়ে খালে বিলে প্রচুর বুনোহাঁস ও পাতিহাঁস পাওয়া যায়। আমাদের এই এষ্টেট ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলে শিকার করতে যেতাম আমরা। বাড়িতে আমি আর আমার স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না। কয়েকজন চাকরবাকরের মধ্যে আদিম বন্য মানুষের মত দেখতে একজন দারোয়ান ছিল আমাদের। সে আমার স্বামীর বড় ভক্ত ও বাধ্য ছিল। আমার একমাত্র সহচরী ছিল ষোল বছরের একটি স্পেনীয় মেয়ে। তার বয়স ষোল হলেও তার স্বাস্থ্য ভাল ছিল বলে দেখে মনে হত কুড়ি।

সাধারণতঃ শিকারের সময় আমি আমার স্বামী আর দু একজন চাকর-বাকর যেত। আমি নিজেও ভাল বন্দুক চালাতে পারতাম। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে এক যুবক আসত। আমার স্বামীর সূত্রে আলাপ। সে ছিল কোথাকার ব্যারণ; তার এষ্টেট ছিল। সে খুব বেশী যাওয়া আসা করতে লাগল। তারপর হঠাৎ সে আসা বন্ধ করে দিল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম তারপর থেকেই আমার প্রতি স্বামীর আচরণটা কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠল।

সব সময় সে যেন কি ভাবত। আমাকে আর আগের মত চুম্বন বা আদর করত না। আমার ঘর থেকে অনেক দূরে একটা ঘরে শুত। কিন্তু রোজ রাত্রি গভীর হলে আমি কার পায়ের শব্দ শুনতে পেতাম। মনে হত কে যেন আমার ঘরের কাছে এসে আবার চলে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে অন্ধকারের মাঝে একটা মানুষের ছায়ামূর্তি দেখেছি। আমার স্বামীকে সেকথা বলতে সে উদাসীনভাবে বলেছে, ও কেউ নয়, দারোয়ান।

একদিন সন্ধ্যের সময় হঠাৎ আমার স্বামী হার্ডে এসে আমায় কৃত্রিম খুশির সঙ্গে বলল, নৈশভোজনের পর আমার সঙ্গে শিকারে যেতে পারবে? ঘণ্টা-তিনেক লাগবে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম বিস্ময়ে। হার্ভে বলল, একটা শেয়াল রোজ সন্ধ্যেবেলায় এসে আমার বাড়ির মুরগী ধরে নিয়ে যায়। আজ আমি ওকে মারবই। তোমার ভয় করবে না ত?

আমি উত্তর করলাম, ভয়! কত নেকড়ে ও বন্য শুয়োর আমি মেরেছি, একটা শেয়াল ত কিছুই নয়।

খাওয়ার পর আমরা রওনা হলাম রাত্রি প্রায় দশটার সময়। কিন্তু হার্ভেকে অত্যন্ত অশান্ত ও চঞ্চল দেখাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় গুলিভরা বন্দুক নিয়ে নির্জন বনপথ ধরে এগিয়ে চলছিলাম শুধু আমরা দুটি প্রাণী। অবশেষে আমরা সাঁকো পার হয়ে সেই কুঁড়েটাতে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু কোথাও কোন শেয়াল দেখতে পেলাম না। শরতের সেই স্তব্ধনীরব রাত্রির ছায়ায় আধ ঘণ্টা চুপ করে বসে রইলাম আমরা। মৃত্যুর মত এমন স্তব্ধনিথর রাত্রি দেখা যায় না। একটা ব্যাঙ্ বা পেঁচার চীৎকারও শোনা যাচ্ছিল না। আমি একবার হার্ভেকে বললাম, তুমি জান এই পথ ধরেই শেয়ালটা যাতায়াত করে?

হার্ভে বলল, হ্যাঁ আমি জানি।

হঠাৎ হার্ভে আমাকে বলল, ঐ গাছের তলায়।

গাছের ফাঁক দিয়ে পড়া চাঁদের আলোয় কোনরকমে দেখলাম গাছতলায় একটা লোক বসে রয়েছে। হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজে সমস্ত বনভূমি কেঁপে উঠল। আমি দেখলাম একটা লোক কুঁজো হয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু না পেরে ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ল। আমি ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চীৎকার করে উঠলাম। সহসা দেখলাম আমার স্বামী পাগলের মত আমার গলাটা চেপে ধরল। তারপর দুহাত দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘাসের উপর লুটিয়েপড়া সেই মৃত লোকটার উপর আমাকে ফেলে দিল। আমি দেখলাম মৃত ব্যক্তি আমাদের বাড়ির দারোয়ান।

ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে একটা জিনিস বুঝলাম আমার স্বামী আমাকে হত্যা করতে যেন বদ্ধপরিকর।

হঠাৎ আমার সহচরী পরকুইতা কোথা হতে এসে সেই মৃতদেহটাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে চুম্বন করতে লাগল আবেগের সঙ্গে। তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার কাছে ক্ষমা চাইল হার্ভে। আমার পা ধরে ক্ষমা চেয়ে হার্ভে বলল, আমি তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম। সন্দেহের বশবর্তী হয়েই দারোয়ানকে হত্যা করেছি। কিন্তু এখন বুঝছি ও ছিল এই মেয়েটার প্রেমিক।

আমার কিন্তু সে কথায় কান ছিল না। হার্ভের উপর আমার দৃষ্টি ছিল না। আমি শুধু একমনে, একদৃষ্টিতে দেখছিলাম কিভাবে একজন জীবন্ত যুবতী নারী একটি মৃত লোকের দেহকে বারবার চুম্বন করছে। দেখতে দেখতে

ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে হলো আমার স্বামী ছাড়া অন্ত কোন মানুষকে আমি যদি এইভাবে ভালবাসতে পারতাম। এইভাবে চুম্বন করতে পারতাম।

কোন এক মৃত নারীর গোপন কথা

[A dead woman's secret]

তার লম্বা লম্বা সাদা চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল মাথার চারদিকে। রক্তহীন ফ্যাকাশে দেহটা নিথর হয়ে পড়ে ছিল বিছানায়। দেখে মনে হচ্ছিল এক পুণ্যবতী গুণবতী নারী তার নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক দীর্ঘ জীবন যাপনের পর এক প্রশান্ত চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে।

স্বামীহারা এক বিধবা নারীর মাত্র ছুটি সন্তান—একটি পুত্র আর একটি কন্যা। পুত্রটি বর্তমানে একজন জেলাশাসক। ন্যায়বিচার ও প্রশাসনের কাজে সমান দক্ষ। কন্যাটি পবিত্র কৌমার্য জীবন যাপন করছে ধর্মের আশ্রয়াধীনে থেকে। সে নিজেকে ঈশ্বরের সেবাদাসী বলে মনে করে। ঈশ্বরই যেন তার স্বামী। ছেলেটি মার পায়ের কাছে বসে ছিল আর মেয়েটি তার মার বিছানার পাশে তার মার শুচিশুভ্র হাতীর দাঁতের মত একটি হাত ধরে চুম্বন করছিল।

পুরনো দিনের যত সব কথা ছেলেবেলাকার যত সব ঘটনার কথা ভিড় করে আসতে লাগল তাদের দুজনের মনে। তারা বেশ বুঝতে পারল একমাত্র মার চেষ্টাতেই তারা মানুষ হয়েছে। তাদের জীবনে যতকিছু নীতিবোধ ও বিচারবুদ্ধি তা তাদের মার শিক্ষাতেই গড়ে উঠেছে।

তাদের চার্চের যাজক নৈশভোজন সেরে এসে বলল, আমি আজ রাতে তোমাদের কাছে থাকব বৎস। রাত্রি জাগরণে সাহায্য করব তোমাদের।

কিন্তু তারা তাতে রাজী হলো না। বলল, আজ সারারাত ধরে মাকে আমরা দেখব। আর ত জীবনে কখনো দেখতে পাব না। সুতরাং একা থাকতে চাই। আপনি যেতে পারেন।

যাজক চলে গেলে ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল আবার। তাদের দুজনের মনে হলো নৈশ প্রকৃতির অনন্ত শান্তি, এক স্বর্গীয় বিষাদ আর প্রশান্ত নীরবতা মূর্ত হয়ে উঠেছে এই ঘরে আর বিশেষকরে তাদের মার মুখের মধ্যে। ছেলে ও মেয়ে দুজনেই হঠাৎ হাঁটুগেরে বসে আকুলভাবে কাঁদতে লাগল মার জন্য। মা তাদের কখন কি কথা বলেছিলেন তা মনে পড়ল তাদের। তারা যেন

স্পষ্ট তাদের মার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তাদের বাবাকে তারা দেখেনি। শুনেছে তার বাবা তাদের মাকে ত্যাগ করে কোথায় চলে যান। মাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাদের বংশধারার একমাত্র যোগসূত্র। সেই মাকে হারিয়ে স্বভাবতই তারা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ল জীবনে। অসহায়-বোধ করতে লাগল।

অবশেষে সিস্টার ইউলেনি তার ভাইকে বলল, মার ড্রয়ার খুলে চিঠি-গুলো বার করে পড়া যাক। সময় কেটে যাবে। আমাদের বংশপরিচয়ের অনেককিছু জানাও যাবে। পড়ার পর এই সব চিঠিগুলোও আমরা মার কবরে দেব।

হঠাৎ ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা চিঠি খুলে পড়তে লাগল ইউলেনি, 'হে প্রিয়তমা, আমি তোমাকে পাগলের মত ভালবাসি। গতকাল হতে তোমার স্মৃতির জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে ছারখার হচ্ছে আমার মন। তোমার ওষ্ঠাধরের মিষ্টতা এখনো অনুভব করছি আমার ওষ্ঠে। তোমার দেহের রক্তমাংসের উত্তাপ এখনো অনুভব করছি আমার ওষ্ঠে। তোমার ভালবাসা আমাকে পাগল করেছে। তোমাকে আবার পাবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছে আমার মন। তোমার চুম্বনের মাধুর্যে এখনো সিক্ত হয়ে আছে আমার অধরোষ্ঠ। আমার সমগ্র দেহ তার সমস্ত নিবিড়তা নিয়ে তোমারই জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে তার বোনের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে তার তলায় স্বাক্ষর দেখল। নাম রয়েছে হেনরি। অথচ তাদের বাবার নাম হলো রেনে। তারা বেশ বুঝতে পারল এটি তাদের মাকে লেখা তাঁর কোন প্রেমিকের আবেগতপ্ত অবৈধ প্রেমপত্র। এর উত্তরে একটি চিঠির একটি লাইন পাঠ করল ছেলেটি। তাতে লেখা আছে, তোমার চুম্বন ও আদর ছাড়া আমিও আর থাকতে পারছি না।

সহসা বিচারকের কঠোরতা ফুটে উঠল জেলাশাসকের মুখে। সে একবার তার মার মুখপানে তাকাল। আর ইউলেনি তার ভাইএর মুখপানে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। এইভাবে রাত্রি শেষ হয়ে কখন সকাল হয়ে গেল তা তারা বুঝতেই পারল না।

সকাল হতেই আর তাদের মার মুখপানে না তাকিয়ে ঘর হতে বেরিয়ে গেল দুজনে।

হিপ্পোলিটের দাবি

[Heppolyte's claim]

আদালতের জজসাহেব একটি জমির দখলিস্বত্বসংক্রান্ত মামলার শুনানী শেষ করে হিপ্পোলিটের মামলাটি ধরলেন। মামলাটি বড় অদ্ভুত ধরনের। এই মামলার বাদীপক্ষ হচ্ছে হিপ্পোলিট ল্যাঙ্কার। হিপ্পোলিটের অভিযোগ হলো এই যে বিবাদী মাদাম লিনো একশত ফ্রাঁ কোন একটি কাজের জন্য দেব বলে দেয়নি। তাই সেই টাকা আদায়ের জন্য মামলা রুজু করেছে আদালতে বিচারের আশায়।

বিবাদী পক্ষের ছয়জন সাক্ষী প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে আদালত গৃহে। জজসাহেব প্রথমে বাদী হিপ্পোলিটকে ডাকলেন। হিপ্পোলিট প্রথমে বলল, হুঁজুর, আজ হতে ঠিক নয় মাস আগে এ্যাবর্থিমে লিনোর বিধবা পত্নী মাদাম লিনো কোন এক সন্ধ্যায় আমার কাছে এসে তার বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার জন্য একটি সন্তান চায়।

জজসাহের কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে বললেন, ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বল।

হিপ্পোলিট বলল, হুঁজুর, সে একটি সন্তান চায় আমার কাছে।

জজসাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, তার মানে? সে কি কোন সন্তান পোষ্য নিতে চেয়েছিল?

হিপ্পোলিট বলল, না হুঁজুর। সে আমাকে তার গর্ভে একটি সন্তান উৎপাদন করতে বলেছিল আর বলেছিল তার জন্য সে আমাকে একশত ফ্রাঁ দেবে।

জজসাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন, কি উদ্দেশ্যে সে এই অস্বাভাবিক অনুরোধ তোমায় করে তা জান?

হিপ্পোলিট বলল, হুঁজুর, আমিও প্রথমে তার কথার আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারিনি: পরে জিজ্ঞাসা করায় সে খুলে বলে। মাদাম আমার কাছে আসার মাত্র এক সপ্তা আগে তার স্বামী হঠাৎ মারা যায়। মাদাম লিনো তখন তার স্বামীর সম্পত্তির দখল সম্বন্ধে উকিলের পরামর্শ নেয়। উকিল বলে, আজ হতে দশ মাসের মধ্যে যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে লিনোর সন্তান বলেই আইনতঃ গৃহীত হবে এবং সেই সন্তানই মঁসিয়ে লিনোর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। কারণ তার স্বামী তার বাড়ির অমতে তাকে বিয়ে করেছিল, তা না হলে লিনোর সব সম্পত্তি তার পরিবারের আত্মীয়স্বজনেরা পাবে। তাই সন্তানের জন্য পাগল হয়ে আমার কাছে ছুটে

আসে মাদাম লিনো। কারণ সে জানত আমি আটটি সন্তানের জনক এবং সে সন্তানরা আজও জীবিত আছে।

জজসাহেব বললেন, সংক্ষেপে বল।

হিপ্পোলিট বলল, মাদাম লিনো তখন বলল, আজ হতে দুমাসের মধ্যে ডাক্তার যদি আমি অন্তঃস্বত্বা বলে রিপোর্ট দেয় তাহলে আমি তোমাকে এক-শত ক্রাঁ দেব। আমি দুমাস পরে জানতে পারি মাদাম লিনোর গর্ভে আমারই ঔরসজাত সন্তান বেড়ে উঠছে। আমি তখন তার কাছে সেই প্রতিশ্রুত টাকা চাই। কিন্তু বারবার চাওয়া সত্বেও সে টাকা দেয়নি সে।

জজসাহেব বললেন, বিবাদী, তোমার কিছু বলার আছে?

মাদাম লিনোর চেহারাটা যেমন মোটা, গলার স্বরটাও তেমনি মোটা। লিনো পরিষ্কার বলল, ও মিথ্যাবাদী হুঁজুর, আমি আমার মৃত স্বামীর নামে শপথ করে বলছি এ সন্তান তার নয়।

জজসাহেব তখন তাকে প্রশ্ন করলেন, কেমন করে প্রমাণ করবে তুমি যে সন্তান গর্ভে ধারণ করছ সে সন্তান তার নয়।

মাদাম লিনো আমতা আমতা করে বলল, কেমন করে প্রমাণ করব? আমার ঐ দুজন সাক্ষীকে ডাকুন হুঁজুর, তারা সবাই বলবে। আসলে ওর সন্তান উৎপাদনের কোন ক্ষমতাই নেই। ওর আটটা সন্তানও ওর নিজের নয়। ওসব সন্তার ওর স্ত্রীর গর্ভে অন্যদের দ্বারা উৎপন্ন হয়।

জজসাহেব বললেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ বাদ দিয়ে তোমার বক্তব্য বল।

মাদাম লিনো বলল, প্রথমে আমি ওর কাছে এ প্রস্তাব করেছিলাম ওর যোগ্যতার কথা জানতে না পেরেই। তারপর আমি এই দুজনের কাছে যাই। এদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

জজসাহেব এবার সাক্ষীদের একে একে জিজ্ঞাসা করলেন। সকলকে একই প্রশ্ন করলেন। আচ্ছা তুমি কি মনে করো মাদাম লিনোর গর্ভস্থ সন্তান তোমার ঔরসজাত?

সকলেই এক উত্ত দেয়, হ্যাঁ, হুঁজুর।

অবশেষে জজসাহেব তাঁর রায়ে বললেন, সন্তান যারই হোক, যেহেতু মাদাম লিনো প্রথমে হিপ্পোলিটের কাছে গিয়ে তাকে অনুরোধ করে এ কাজে সেই হেতু হিপ্পোলিটকে পারিশ্রমিকস্বরূপ পঁচিশ ক্রাঁ দিতে হবে।

তামাকের দোকান

[Tobacco shop]

আমি একবার বারভিলারে একটা যাদুঘর দেখতে যাই। যাদুঘরটা ঘুরে দেখার পর ছোট মফঃস্বল শহরের সবচেয়ে বড় রাস্তাটায় বেড়াতে লাগলাম একা একা। ঘড়িতে তখন বেলা চারটে বাজে।

একা একা কি করব, কোথায় যাব খুঁজে পাচ্ছি না। এমন সময় হঠাৎ একটা সিগার খাবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু কাছে সিগার না থাকায় একটা সিগারেটের দোকান খুঁজতে লাগলাম। এদিক ওদিক তাকাতেই একটা দোকান দেখতে পেলাম। কিন্তু দেখলাম দোকানের বিক্রেতা একজন মেয়েলোক। কয়েকটা বাক্স সে আমার সামনে তুলে ধরল। কিন্তু দেখলাম সবগুলোই বাজে। আমি তখন সেই মেয়েটির মুখপানে তাকালাম।

তার বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। মোটাসোটা চেহারা। মুখখানা বেশ গোল-গাল। মাথার চুলগুলো কালো। আমার মনে হল মেয়েটাকে কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না। তাই তাকে চেনার জন্য বারবার তার মুখপানে তাকাতে লাগলাম। সে যাতে সন্দেহ করে তার জন্য তাকে বললাম, ক্ষমা করবেন মাদাম। বারবার এভাবে তাকাবার জন্য কিছু মনে করবেন না। বহুদিন আগে আপনাকে হয়ত কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

সে বলল, এটা অবশ্য আশ্চর্য কথা। তবে আমারও তাই মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, তুমি কি সেই? তুমি কি আমাদের সেই 'হঠাৎ দেখা'? মেয়েটি এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, তুমি জর্জ না! কিন্তু সাবধান, কেউ যেন শুনতে না পায়।

সেখানে অবশ্য অন্য কেউ ছিল না। আমি তাকে চিনতে পারলাম। সেই রোগা মেয়েটা কেমন মোটাসোটা ঘরণী গৃহিণীর মত হয়ে উঠেছে। আমরা তখন লারণ নামে একটা গ্রামাঞ্চলে একটা নদীর উপর নৌকায় বেদের জীবন যাপন করতাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম প্রায় বারো তের জন। তার মধ্যে কয়েকজন যাওয়া-আসা করত। আর পাঁচ ছয় জন বরাবর একটানা থাকত। আমাদের 'হঠাৎ দেখা' সেই মেয়েটি হঠাৎ এসে জোটে এবং আমরা যে পাঁচ ছয়জন একসঙ্গে থাকতাম তাদের সঙ্গে থাকতে শুরু করে দেয়। আমাদের মধ্যে অনেকে আবার ওকে জায়রা বলে ডাকত। কারণ অনেকে মনে করত সে নাকি ইসরায়েলের মেয়ে। জায়রা থেকে পরে তার নামটা জারাতে পরিণত হয়।

আমি তাকে বললাম, এখন কেমন চলছে ?

সে বলল, আগের থেকে কিছু ভাল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেখান থেকে কি করে এলে ? তুমি কি সেই লারণ থেকে সোজা এসেছ ?

সে বলল, না প্যারিস থেকে।

আমি বুঝতে পারলাম না সে আগে কি করত এবং কোথা হতে কিভাবে এল। তাই কৌতূহলবশে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, প্যারিসে কি করতে, কোথায় থাকতে ?

সে বলল, আমি থাকতাম মাদাম ব্যাভেলেতের কাছে। উনি পোশাক তৈরী করতেন। ওঁর একটা দোকান ছিল আর আমরা পাঁচ ছয়জন মেয়ে সেখানে কাজ করতাম। কত রকমের চরিত্রের কত সৌখীন মেয়ে আসত আমাদের দোকানে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমাদের রোজগার তখন মোটেই ভাল ছিল না। কিন্তু মাদাম ব্যাভেলেত ওরফে ইর্মা একদিন আমাদের বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলেই তোমাদের রোজগার বাড়াতে পার।

আমরা প্রথমটায় তাঁর কথা বুঝতে পারলাম না। পরে উনি বললেন, এটা ত খুব সোজা কথা। আমি যখন অপেরায় চলে যাব তখন তোমরা চারজন এক একটা ঘোড়ার গাড়িতে অপেক্ষা করবে সাজগোজ করে। দেখবে কোন না কোন ভদ্রলোক তোমাদের এক একজনের গাড়িতে উঠে পড়বে আর উঠে পড়লেই তাকে জড়িয়ে ধরবে নিবিড়ভাবে। পরমুহূর্তেই তাকে ছেড়ে দিয়ে বলবে ভুল হয়ে গেছে। বলবে তোমরা ভেবেছিলে তোমাদের পরিচিত ও, বাইরের কোন লোক। তখন লোকটা কিন্তু উত্তেজিত হয়ে তোমাদের ফাঁদে পড়বে এবং তোমাদের ছাড়তে চাইবে না। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমরা তার সঙ্গে কোন হোটেলে গিয়ে নৈশভোজনটা সেরে আসবে আর ক্ষতিপূরণস্বরূপ বেশকিছু টাকাও পাবে।

আমাদের থেকে ইর্মা দেখতে ভাল ছিল এবং মন্ত্রিসভার এক সদস্য নাকি তাঁর প্রেমিক ছিল। তিনি এমন একটা ভাব দেখাতেন যাতে মনে হতো কোন রাজা মহারাজা তাঁকে দেখলেই তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠবে। আমরা নিজেদের মধ্যে একথা অনেক সময় বলাবলি করতাম।

একদিন ইর্মা অপেরায় গেলে তাঁর কথামত আমরা বাইরে গাড়িতে সাজগোজ করে লোকের জন্য বসে অপেক্ষা করছি। এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে আমার গাড়িতে ঢুকতেই আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম নিবিড় আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে। পরে ভুল হয়েছে বলে কাঁদতে লাগলাম। তখন সে দারুণ অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হয়ে উঠল। অনেক করে বোঝাতে লাগল। আমি কান্না থামাতেই সে খুশি হলো। সে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। তারপর আমি শান্ত হলে সে আমার কোমরে হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল।

তারপর আদর করে আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে গেল।

কিন্তু প্যারিসে এই ধরনের ক্ষণপ্রণয়ের ছলনাময় অভিনয়ে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠলাম আমি। এ জীবনের পরিবর্তন চাইছিলাম।

আমি তখন বললাম, কিন্তু এই দোকানটা করলে কেমন করে?

সে বলল, আমি প্যারিসে যেখানে থাকতাম সেইখানে আমার ঘরের সামনে একটা ঘরে একজন ছাত্র থাকত। সেই ঘরে থেকে সে পড়াশুনো করত। কিন্তু পড়ায় মন ছিল না তার। তার সঙ্গে আমার দেহসংসর্গের ফলে রোজার নামে একটি পুত্রসন্তান হয়। সে আমাকে এই সন্তান পালনের জন্ত কিছু টাকা দেয়। পরে সে সরকারী একটা উচ্চ পদ পেলে এই দোকানটার ব্যবস্থা করে দেয়।

তারপর সে তার ছেলে রোজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। লম্বা চেহারার ভদ্র একটি যুবক। তার মা বলল, মেয়রের অফিসে এখন কেরাণীর কাজ করে। পরে সামরিক বিভাগে যোগ দেবে।

আমি তার সঙ্গে করমর্দন করে হোটেলে ফিরে গেলাম।

একটি গরীব মেয়ে

[A poor girl]

সত্যিই, সেই রাত্রির স্মৃতি আমি কখনই ভুলতে পারব না। কোন মানুষ ডুলিতে করে খনির অন্ধকার গর্তে নামার সময় তার মধ্যে ভীতিসিক্ত যে একটা শিহরণ জাগে আমারও তেমনি মনে হচ্ছিল আমি যেন মানবজীবনের দারিদ্র্যের অতল অন্ধকার গর্তের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি। আমি বুঝতে পারলাম মানুষ অনেক সময় এমন অবস্থার মধ্যে পড়ে যেখানে তার সততা রক্ষা করে চলতে পারে না। শত ইচ্ছা সত্ত্বেও তা পারে না।

সেদিন সন্ধ্যে থেকে দারুণ বৃষ্টি নামে। সারা শহরের সমস্ত পথঘাট জলে ভেসে যায়। তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তবু জল থামেনি। সবাই ছাতা মাথায় দিয়ে পথ হাঁটছিল। আমি যাচ্ছিলাম বদেভিল থেকে ক্রুয়ত স্ট্রীটের দিকে। পথের ধারের ঘরগুলোয় বারবণিতারা হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক তুলে দাঁড়িয়েছিল। মাঝে মাঝে চলমান পুরুষ পথিকদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিল। সহসা দেখলাম সেখানে তাদের দলের তিনটি মেয়ে প্রাণভয়ে ছুটছে। দুহাতে পরনের পোশাকটা ধরে ছুটছে। সহসা আমি অনুভব করলাম কে পিছন থেকে এসে আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরল। ঘুরে দেখলাম সেই তিনটি মেয়ের একটি কাতরকণ্ঠে আমাকে বলছে, আমাকে বাঁচান স্যার, আমাকে বাঁচান।

আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে বললাম, ঠিক আছে। দাঁড়াও, শান্ত হও।

সে বলল, আপনি কি আমাকে আপনার ঘরে একবার নিয়ে যাবেন ?

আমি বললাম, না আমার বাড়িতে স্ত্রী আছে।

আমি তাকে কিছু পয়সা দিয়েছিলাম। তাই সে কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে আমাকে সেবাদান করতে চাইছিল। আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, আপনার এই দান আমি কখনো ভুলব না। এ জীবন আমার আর ভাল লাগে না।

আমি বললাম, এ জীবনে কেন এলে ?

মেয়েটি বলল, সেটা আমার দোষ না।

কেমন একটা কৌতূহল পেয়ে বসল আমায়। রাত্রি বেশী হলেও আমি তার কথা শুনতে চাইলাম। আমি বললাম, তোমার সব কথা বল। আমি শুনব।

সে বলতে শুরু করল, আমার বয়স তখন মাত্র ষোল। আমার বাবা মা কেউ ছিল না। আমি তখন ইভেতৎ নামে এক জায়গায় মঁসিয়ে লেরেবল্ নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে কাজ করতাম। মঁসিয়ে লেরেবল্ ছিল বয়সে প্রবীণ ও ধর্মভীরু। প্রতি রবিবার, ভক্তিভরে চার্চে যেত ধর্ম করতে। তবু আমার দিকে কেমন কটমট করে তাকাত। একদিন আমাকে ধরে একটা নির্জন ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে আমার শালীনতা নষ্ট করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

আমি যে বাড়িতে থাকতাম সেই বাড়ির উল্টো দিকে এক মুদিখানার দোকানে একটি সুন্দর যুবক কাজ করত। তাকে আমার ভাল লাগত। একদিন রাত্রিতে আমার শোবার ঘরের দরজা খুলে রেখে তাকে আসতে বলি। সে আসে। কিন্তু আওয়াজ পেয়ে বুড়ো লেরেবল্ উঠে পড়ে আমার ঘরে ঢুকে আমার প্রেমিককে আক্রমণ করে। আমি ছুটে পালিয়ে যাই। পরে শুনতে পাই লেরেবল্ সেই ছেলেটাকে খুন করেছে। আমি ভয়ে রুয়েনের পথে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকি। পথে একদল পুলিশ আমাকে বনের ভিতরে নিয়ে গিয়ে একে একে আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। অবশ্য আমি ভয়ে তাদের কুৎসিত প্রস্তাবে বাধ্য হয়ে রাজী হয়েছিলাম। তাছাড়া সেই নির্জন বনপথে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা এবং আমার রাজী হওয়া বা না হওয়ার কোন অর্থ ছিল না। তারা শুধু আমাকে এক গ্লাস মদ ছাড়া আর কিছুই দেয়নি।

তারপর আমি অতিকষ্টে রুয়েনে আসি। একটি লম্পট লোক আমাকে কপট আশা দিয়ে নদীর ধারে নিয়ে যায়। আমার ক্লান্তি সত্ত্বেও আমার দেহটাকে ভোগ করে আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যায়। পুলিশরা আমাকে সন্দেহ করে থানায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে আদালতে নিয়ে

যায়। আদালতের জজ আমাকে মুক্তি দেয়। হঠাৎ আমি একদিন বুঝতে পারি আদালতের জজ হচ্ছে সেই মঁসিয়ে লেরেবল্‌। লেরেবল্‌ও আমাকে চিনতে পারে। আমি তার বাড়ি যাই। সে আমাকে একশো টাকা দিয়ে সপ্তায় দুদিন করে তার বাড়িতে যেতে বলে। আমি আবার বাইরের লোকও ধরতাম। আমি বাধ্য হয়ে এই ব্যবসায় চলে এলাম। এছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

একদিন পঁচাত্তর বছরের এক ধনী বৃদ্ধ আমাকে নিয়ে ফূর্তি করার জন্য এক হোটেলে নিয়ে যায়। সেখানে সে আমার ঘরে মারা যায়। তাতে আমার তিন মাস জেল হয়। কারণ আমি কারো অধীনে থেকে এই ব্যবসা করতাম না বলে সেটা বেআইনী।

এরপর আমি প্যারিসে চলে আসি। কিন্তু এখনো আমি কোন ঘরভাড়া করতে পারিনি। এখানে এ ব্যবসায় প্রতিযোগিতা অনেক বেশী বলে কিছুই হয় না। খাবার জোটে না সব দিন। তার উপর যখন বৃষ্টি হয় তখন আমাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়।

মেয়েটি আবার তাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করল। আমি তাকে সেই একই উত্তর দিলাম, বাড়িতে আমার স্ত্রী আছে।

তখন আমি দেখলাম মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই বুড়ী হয়ে যাওয়া সেই মেয়েটি তার কালিমাখা বিষণ্ন মুখখানা নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তখনো সমানে বৃষ্টি পড়ছিল।

একটি প্রেমাবেগ

[A passion]

সমুদ্রে তখন ঢেউ ছিল না। কোন বিক্ষোভ বা চঞ্চলতা ছিল না। শান্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে কতকগুলো জাহাজ ও ষ্টীমার ধোঁয়া ছেড়ে ভেসে যাচ্ছিল।

বন্দরের জেটিতে জঁা রেনোল্ডি আর পল দ্য হেনরিকত নামে দুজন অফিসার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। এমন সময় পল তার বন্ধু রেনোল্ডিকে বলল, ভাল করে মনে করে দেখ, মাদাম পয়েনকত তোমাকে দেখেছে।

রেনোল্ডি দেখল মাদাম পয়েনকত সত্যিই তার স্বামীর হাত ধরে সেই-দিকেই আসছে। তার দুটি মেয়ে—একটির বয়স বারো আর একটির পনের। তাদের আগে আগে আসছিল।

মাদাম পয়েনকতের বয়স বর্তমানে চল্লিশ হলেও এখনো তার দেহে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দুটোই আছে। তার বান্ধবীরা তাকে রূপে গুণে দেবী বলে ডাকে। সত্যিই মাদাম পয়েনকতের মত এমন সতীলক্ষ্মী ও গুণবতী মহিলা দেখাই যায় না। আজ পর্যন্ত তার নামে কোথাও কোন কলঙ্ক শোনা যায়নি।

তবু গত মাস থেকে পল তার বন্ধুকে বারবার বলে আসছে মাদাম পয়েনকত তার প্রেমে পড়েছে। সে প্রায়ই বলে, আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি না। উনি সত্যিই তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসেন। চল্লিশ বছরের কোন সতী রমণী হঠাৎ এমনি করে প্রেমে পড়ে যায়। এই বয়সটা তাদের পক্ষে খারাপ। এই সময় তাদের ইন্দ্রিয়চেতনাটা যেমন হঠাৎ খুব প্রবল হয়ে পড়ে তেমনি তাদের বুদ্ধিটা কমে যায় এবং হঠাৎ বোকার মত হয়ে যায়। মাদাম পয়েনকতেরও ঠিক তাই হয়েছে। উনি দেখছি শরাহত পাখির মত তোমার হাতের উপর পড়ে যাচ্ছেন। এখন ধরলেই হলো।

মাদাম পয়েনকত সত্যিই তাদের কাছে এসে অভিবাদন জানাল দুই বন্ধুকে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ রেনোল্ডির দিকে। মনে হলো মাদাম যেন তখন তার স্বামী ও সন্তানদের কথা ভুলে গেছে একেবারে। তার প্রেমাহত দৃষ্টি দেখে রেনোল্ডির মনেও আর কোন সন্দেহ রইল না এ বিষয়ে। রেনোল্ডি স্বীকার করল, ভদ্রমহিলা সত্যিই সুন্দরী।

রেনোল্ডি কিন্তু এই ধরনের ভালবাসা চায়নি। এই ধরনের অভিজাত ঘরের মধ্যবয়সী মহিলারা প্রেমের ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠা, যে একাগ্রতা তাদের প্রেমিকদের কাছ থেকে আশা করে রেনোল্ডির তা ছিল না। তার মতে প্রেম মানুষের জীবনের স্থায়ী কোন অন্তর্বৃত্তি নয়। মাঝে মাঝে মানুষের অন্তরে জাগে প্রেমের আবেগ। কাউকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে। তাদের সে আবেগের উচ্ছ্বাসটা ক্রমে থিতিয়ে যায় স্বাভাবিকভাবে। তাই অন্যান্য যুবক অফসারদের মত মাঝে মাঝে সে কোন মেয়েকে দুচারদিনের জন্য ভোগ করেই ছেড়ে দিত।

সেদিনের পর থেকে মাদাম পয়েনকতের সঙ্গে ইচ্ছে করেই আর দেখা করেনি রেনোল্ডি। এড়িয়ে গেছে ইচ্ছে করে। কিন্তু একদিন এক পার্টিতে দেখল তার পাশেই বসে রয়েছে মাদাম পয়েনকত। সুযোগ পেয়ে তার হাতে চাপ দিল মাদাম পয়েনকত। হাবেভাবে প্রেম নিবেদন করল।

রেনোল্ডি দেখল আর কোন উপায় নেই। মাদাম পয়েনকত ইতিমধ্যেই তার প্রেমে ডুবে গেছে। তার প্রতি তার প্রেমাবেগ প্রবল হয়ে উঠছে দিনে দিনে। একটা নির্জন জায়গা ঠিক করে সেখানে রেনোল্ডিকে এক নির্দিষ্ট সময়ে যেতে বলল মাদাম পয়েনকত।

রেনোল্ডি সেখানে যেতেই তাকে পাগলের মত জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে থাকে মাদাম। বলে, আমি তোমাকে আমার সব দিতে চাই। তুমি

আমার সব নাও।

কিন্তু তার এই উচ্ছ্বসিত প্রেমাবেগ মোটেই ভাল লাগে না রেনোল্ডির। তার বলতে ইচ্ছে হয় 'আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই চাই না। চাই শুধু মুক্তি।' কিন্তু কোনরকমে সামলে নেয় নিজেকে।

এইভাবে ছয় মাস কেটে যায়। একদিন বিরক্ত হয়ে বন্ধু পলের কাছে পরামর্শ চায় রেনোল্ডি। পল বলে, 'ভাল না লাগে ছেড়ে দাও।' কিন্তু রেনোল্ডি বলে, কি বলছ, ছাড়া কি এতই সোজা?

এমন সময় একটা সুযোগ পেয়ে গেল রেনোল্ডি। হঠাৎ খবর এল, মাস দুইএর মধ্যেই তাদের অন্য সেনানিবাসে চলে যেতে হবে। কিন্তু এদিকে খবরটা পেয়েই ছুটে এল মাদাম পয়েনকত। পাগলের মত কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরল রেনোল্ডিকে। বলল, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। যেখানে যাবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমার জন্য আমি আমার স্বামী সন্তান ঘর বাড়ি সব ছাড়তে পারব।

এদিকে চিন্তায় মুখখানা ঘেমে উঠল রেনোল্ডির। সে তার সব কথা শুনেও কোন উত্তর না দেওয়ায় মাদাম পয়েনকত বলল, তুমি কি একটা আস্ত কাপুরুষ! একটা মেয়ের সর্বনাশ করে তাকে ত্যাগ করতে চাও?

রেনোল্ডি শুধু এককথা বারবার বলছিল, এ কি করে সম্ভব হয়? মাদাম পয়েনকত তখন হঠাৎ রেগে বলল, 'ঠিক আছে, আমার জন্য তোমাকে কিছু করতে হবে না।' এই কথা বলে রেগে চলে গেল।

পরের দিন রেনোল্ডি শুনল, সেই রাতেই বাড়িতে গিয়ে বিষ খেয়েছে মাদাম পয়েনকত। অবশ্য প্রাণে বেঁচে গেছে। কথাটা জানাজানি হয়ে গেল সারা শহরে। মাদাম পয়েনকত ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা সইতে না পেরে বিষ খেয়েছে আত্মহত্যার জন্য। কথাটা শুনে পল তার বন্ধু রেনোল্ডিকে তিব্র ভাষায় ভৎ'সনা করতে লাগল, ছিঃ ছিঃ রেনোল্ডি, একটা মেয়ের জীবন নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলছ।! এটা সত্যিই লজ্জার কথা।

পলের কথায় রেগে গেল রেনোল্ডি। দুই বন্ধুতে এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি হলো প্রচুর। তারপর ডুয়েল লড়ল দুজনে। রেনোল্ডি আহত হয়ে দিন-কতকের জন্য শয্যাগত হয়ে থাকল।

মাদাম পয়েনকত বেঁচে গেলেও দীর্ঘদিন শয্যাগত হয়ে রইল। কিন্তু মাদাম যখন শুনল তার জন্য ডুয়েল লড়েছে রেনোল্ডি তখন শত দুঃখের মাঝেও সান্ত্বনা পেল। যে প্রেমিকের দ্বারা একদিন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে আজ তাকেই আবার দেখতে ইচ্ছে করল।

একদিন ভাল হয়ে উঠে রেনোল্ডি মাসতিনেকের জন্য লিলি নামক এক জায়গায় বেড়াতে গেল। একদিন হঠাৎ তার বাসায় মাদাম পয়েনকতের বোন এসে হাজির। তার মারফৎ মাদাম পয়েনকত তার ইচ্ছা জানিয়েছে।

মাত্র এক মিনিটের জন্য শুধু চোখে একবার দেখতে চায় তাকে।

একদিকে ঘটনাচক্রে রেনোল্ডির মনটাও বদলে গেছে অনেকখানি। তার পর কতকগুলি ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে সে অনেককিছু তলিয়ে দেখতে শিখেছে। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল মাদামের কথায়। সে হার্ভারে চলে এল সঙ্গে সঙ্গে।

যে ঘরে মাদাম পয়েনকত তার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছিল সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো রেনোল্ডিকে। সে ঘরে আর কেউ ছিল না। মাদাম পয়েন-কতের শীর্ণ চেহারা ও চোখমুখ দেখে ভয় পেয়ে গেল রেনোল্ডি। তার কেবলি মনে হতে লাগল মাদামের অবস্থার জন্য সে নিজেই দায়ী। বারবার ধিক্কার দিতে লাগল নিজেকে। মাদাম পয়েনকতের ক্ষীণ কণ্ঠ শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রেনোল্ডি। তাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চুম্বন করতে লাগল। বারবার বলল, না না, তোমাকে মরতে দেব না। আমরা দু'জনে দু'জনকে চিরদিন ভালবেসে যাব।

মাদাম পয়েনকত আশ্বস্ত হয়ে বলল, তাহলে তুমি আমায় সত্যিই ভালবাস?

রেনোল্ডি মাদাম পয়েনকতের শীর্ণ হাতটা বারবার চুম্বন করে বলল, তুমি সেরে না ওঠা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। তারপর আমরা একজায়গায় থাকব দুজনে।

পরের দিন তার কাজের জায়গায় চলে গেল রেনোল্ডি। মাস দেড়েক পরে হঠাৎ একদিন মাদাম পয়েনকত এসে হাজির। তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল রেনোল্ডি। যেন চেনাই যায় না। আর কোন রোগ নেই তার দেহে। হারানো স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য আবার ফিরে পেয়েছে। মাদামকে পেয়ে দারুণ খুশি হলো রেনোল্ডি। তার ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে লাগল দু'জনে। তাতে তার বন্ধু দল একদিন আপত্তি করল। বলল, এতে সেনাবাহিনীর বদনাম, এটা অবৈধ প্রেম। মাদাম অপরের স্ত্রী।

রেনোল্ডি চাকরি ছেড়ে দিল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এক গাঁয়ের শেষ প্রান্তে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে মাদাম পয়েনকতকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে লাগল। এইভাবে তিনটি বছর কেটে গেল নির্বিঘ্নে।

ইতিমধ্যে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল রেনোল্ডি। অকালে বুড়ো হয়ে গেল যেন সে। মাথার চুল পাকতে শুরু করেছে তখন। অথচ মাদাম পয়েনকত যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই আছে।

হঠাৎ একদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে মঁসিয়ে পয়েনকত এসে দেখা করতে চাইলেন রেনোল্ডির সঙ্গে। বাগানবাড়িতে গিয়ে রেনোল্ডি দেখা করল তাঁর সঙ্গে। কারণ তিনি বাড়ির ভিতরে ঢুকতে চাননি।

রেনোল্ডিকে বললেন মঁসিয়ে পয়েনকত, আমি আপনাদের প্রেমের ব্যাপারে কোনদিন কোন বাধা সৃষ্টি করিনি। কারণ আমি জানতাম, তাতে কোন ফল হবে না। জোর করে মেয়েমানুষের মনকে আটকে রাখা যায় না। কিন্তু আজ একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আমার দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়েটি বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে। সে একটি ছেলেকে ভালবাসে। বিয়ের সব ঠিক। কিন্তু ছেলের বাবা আপত্তি করছে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে। আজ যদি আমার স্ত্রী আমার বাড়ি ফিরে যায় তাহলে সব ঝামেলা মিটে যায়। ওদের কোন আপত্তি আর টিকবে না। আমার মেয়ের মুখ চেয়ে এই উপকার-টুকু আপনাকে করতে হবে।

রেনোল্ডি খুশি হয়ে বলল, আমি রাজী আছি।

আসলে রেনোল্ডিও মুক্তি চাইছিল। মুক্তির যে উপায় সে মনে মনে খুঁজছিল সে উপায় সে হঠাৎ পেয়ে গেল। সে তখন বাড়ির ভিতরে গিয়ে মাদাম পয়েনকতকে সব কথা বলল।

কিন্তু মাদাম পয়েনকত গম্ভীর মুখে তার স্বামীর কাছে বলল, আমি ফিরে যাব না।

মঁসিয়ে পয়েনকত অনেক করে বোঝালেন, ও তোমারও মেয়ে। মেয়ের জন্য তোমাকে যেতেই হবে।

মাদাম পয়েনকত রেনোল্ডির দিকে তাকিয়ে বলল, আসলে ও আমায় বন্দী করে নিয়ে যেতে চায়।

রেনোল্ডি আবার বলল, এ ক্ষেত্রে তোমার যাওয়া উচিত।

কিন্তু মাদাম পয়েনকত ওদের দু'জনের সব অনুরোধ অগ্রাহ্য করে ওদের মুখের উপর একটা কথা ছুঁড়ে দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। বলে গেল, তোমরা দু'জনেই বাজে লোক।

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপচাপ বসে থেকে রেনোল্ডি যাবার সময় বলল, আমরা দু'জনেই বড় হতভাগ্য মঁসিয়ে।

ধরাপড়া

[Caught]

গত গ্রীষ্মের সময় ভিয়েনার অভিজাত পরিবারের এক সুন্দরী বিবাহিতা যুবতী তার স্বামীকে না নিয়ে একাই বেড়াতে গিয়েছিল অস্ট্রীয়ার কার্লসবাদ অঞ্চলে। একটা ঘর ভাড়া করে একা একাই থাকে।

ভদ্রমহিলা আসলে তার পরিবারের চাপে পড়ে টাকার জন্য এক ধনীকে

বিয়ে করে। বিয়ের পর তাদের একটি সন্তানও হয়। তারপর আপনা থেকেই কেমন যেন শিথিল হয়ে যায় ওদের দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনটা। স্বামীও যেমন ইচ্ছামত ক্লাবে ঘুরে বেড়ায়, রাত পর্যন্ত স্ত্রীও তেমনি খুশিমত যেখানে সেখানে বেড়াতে যায়।

কার্লসবাদে এসে ভদ্রমহিলা এক সুদর্শন পোল যুবকের প্রেমে পড়ে যায়। যুবকটি ভদ্রমহিলার নির্জন ঘরে দিনকতক আসতে থাকে পরপর। কিন্তু কোন নিঃসঙ্গ মহিলার বাড়িতে কোন অনাত্মীয় যুবক বারবার এলে স্বভাবতই সেটা সন্দেহের কারণ হয়ে ওঠে প্রতিবেশীদের চোখে। তাই ভদ্রমহিলা কৌশল করে একটা মতলব খাটাল।'

পোল যুবকটি দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। কিন্তু তার চেহারা ও চোখ মুখের মধ্যে নারীসুলভ একটা কমনীয়তা ছিল। ভদ্রমহিলা তাই তাকে পরামর্শ দিল তুমি মেয়ে সেজে মাথায় একটা ওড়না চাপিয়ে গাড়িতে করে আসবে। তাহলে কেউ সন্দেহ করবে না।

পোল যুবকটি তার প্রেমিকার নির্দেশমত মেয়ে সেজে আসতে লাগল। তার মেয়ে সাজাটা এমনি নিখুঁত ছিল যে সবাই তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তাকে বেশ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী এক যুবতীর মতই মনে হত। একদিন সে সন্ধ্যের সময় মেয়ের সাজপোশাক পরেই বাজারের ভিতর দিয়ে থিয়েটার দেখতে যায়। অসংখ্য কৌতূহলী মুগ্ধদৃষ্টি যখন তার উপর নিবদ্ধ হয় তখন তার বড় ভয় লাগে। সে যখন তার বক্সে বসে থিয়েটার দেখছিল তখন এক ভদ্রলোক পাশ থেকে একটি কাগজের চিরকুট তার হাতে গুঁজে দেয়। তাতে লেখা ছিল, 'তুমি বিশ্বের অন্যতমা সেরা সুন্দরী। তোমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি।'

পোল যুবকটি থিয়েটার ভেঙে গেলে তার গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে যে ভদ্রলোকটি তার হাতে সেই কাগজটা দেয় সে গিয়ে সেই গাড়িতে ওঠে। পোল যুবকটি তাদের বাড়ি পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যায়। তারপর তাকে নামিয়ে দেয়। পোল যুবকটি সেই লোকটিকে বলে, তার নাম ভ্যালেস্কা।

একদিন পোল যুবকটি যখন সেই ভদ্রমহিলার ঘরে ছিল তখন হঠাৎ ভদ্রমহিলার স্বামী এসে হাজির। ভদ্রমহিলা ভয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে। এদিকে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তার স্বামী একটা ধারাল ছোরা দিয়ে পোল যুবকটিকে কাটতে যায়। এমন সময় যুবকটি সেই মেয়ের পোশাক পরে পালাবার চেষ্টা করে। আর তাকে সেই পোশাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে ভদ্রমহিলার স্বামী বলে ওঠেন, ভ্যালেস্কা তুমি ?

পোল যুবকটি বলে, হ্যাঁ আমি আপনার স্ত্রীর কাছে আপনার লেখা কিছু প্রেমপত্র দেখাতে এসেছিলাম।

তখন স্বামী ভদ্রলোক বিপদে পড়েন। বলেন, ঠিক আছে, তার আর দরকার হবে না। আমাদের মধ্যে সন্ধি করাই ভাল। তুমি চলে যাও। আমি কিছু করব না। তবে আবার যদি এদিকে আস তাহলে এই ছোরা দিয়ে তোমাকে শেষ করব।

তারপর থেকে স্বামী-স্ত্রীতে ওরা নাকি সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে।

আর্দালি

[Orderly]

বিভিন্ন পদের সামরিক অফিসারে ভর্তি হয়ে পড়েছে কবরখানাটা। চারিদিকে শুধু ফুল আর ফুল। একটা সদ্য-খোঁড়া কবরের তলদেশে এক সুন্দর যুবতীর মৃতদেহটাকে এইমাত্র নামানো হয়েছে। সেই কবরের তলদেশে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন কর্ণেল লিমোসিন। পুকুরে চান করতে গিয়ে ডুবে মারা যায় তাঁর সুন্দরী যুবতী স্ত্রী। সীমা পরিসীমা নেই তাঁর সেই শোক দুঃখের। তাঁর মনে হচ্ছিল সেই কবরের কোন তল নেই। তার অতল অন্ধকার গর্তে তাঁর অন্তরটাও হারিয়ে গেছে চিরদিনের মত।

কবরের মুখটায় দাঁড়িয়ে তার তলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন কর্ণেল লিমোসিন। তিনি শোকে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে সেখান থেকে কিছুতেই যেতে চাইছিলেন না। অবশেষে জেনারেল গুরমঁত নামে একজন অফিসার তাঁর হাত ধরে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। কর্ণেল লিমোসিন আর কোন আপত্তি না করে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। হঠাৎ তাঁর যেন চোখ পড়ল টেবিলের উপর তাঁর স্ত্রীর হাতে লেখা ঠিকানাসহ একখানা খাম পড়ে রয়েছে।

কর্ণেল লিমোসিন খামটা তুলে দেখলেন চিঠিটা। কর্ণেল লিমোসিনের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তাঁর লম্বা রোগা রোগা চেহারা দেখলেই বুড়ো বলে মনে হয়। তাঁর চোখটা একেবারে বসে গেছে। আজ বছর তিনেক হলো তিনি এক তরুণী যুবতীকে বিয়ে করেন। মেয়েটি তাঁরই এক সহকর্মীর। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুতে মেয়েটি অনাথা হয়ে পড়ে। পরে তাঁর মেয়ের বয়সী সেই অনাথা মেয়েটিকে বিয়ে করেন লিমোসিন।

দু'জনের বয়সের মাঝে এতই ফারাক যে বিয়ের পর প্রথম প্রথম মেয়েটি তার স্বামীকে পিতা বলে ডাকতে থাকে। আর লিমোসিনও তাকে কথায় কথায় 'বৎসে' বা 'বাছা' বলে সম্বোধন করতে থাকেন। স্ত্রী হয়েও মেয়ের মত তার স্বামীর কোলে মাঝে মাঝে বসে পড়ত মেয়েটি, কত আবদার করত।

চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করলেন সিমোসিন। তাতে লেখা ছিল, আমায় ক্ষমা করো পিতা। আগে তোমায় যেমন পিতা বলে ডাকতাম তেমনি আজও পিতা বলে ডাকছি। আমি কিন্তু তোমার কাছে কোন দয়া চাইছি না। আমার পাপ স্খালন করতেও বলছি না। আমি আসল সত্যটা প্রকাশ করে যেতে চাই। কারণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভবলীলা সঙ্গ করে পরলোকে চলে যাব আমি।

যখন তুমি উদারতার বশবর্তী হয়ে আমায় বিয়ে করেছিলে তখন আমি সত্যিই তোমাকে ভালবেসেছিলাম। আমার সে ভালবাসার সঙ্গে ছিল কৃতজ্ঞতা। আমি তোমাকে আমার নিজের পিতার মতই দেখতাম। কিন্তু শহরে আসার পর কি হয়ে গেল। আমি একজনের প্রেমে পড়ে গেলাম।

আমি প্রথমে এটা চাইনি। নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠিনি। হার মানতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার অধঃপতন ঘটে গেল। কিন্তু সে যাই হোক, আমার সেই প্রেমিক কে জানতে চেয়ো না পিতা। তাকে ঘৃণা করো না। সে কে তা তুমি বুঝতে পারবে না। কারণ প্রায় ডজনখানেক অফিসার আমার চারদিকে ঘুরঘুর করত। তাদের মধ্যে কে সেই ব্যক্তি আন্দাজ করতে পারবে না।

একদিন বেকাসে দ্বীপের এক জায়গায় আমরা দু'জনে মিলিত হব বলে ঠিক করি। ঠিক হয় আমি সাঁতার কেটে সেখানে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে তার জন্য অপেক্ষা করব। অথবা সে আগে থেকে সেখানে অপেক্ষা করবে আমার জন্য। আমি সেইভাবে গিয়ে সেই ঝোপের মাঝে তাকে দেখতে পেলাম। কিন্তু হঠাৎ তোমার আর্দালি ফিলিপ্পিকে অদূরে দেখতে পেয়ে ভয়ে আঁতকে উঠলাম আমি।

ফিলিপ্পি আমাকে বলল, ভয় নেই, আপনি সাঁতার কেটে বাড়ি চলে যান। পরের দিন ফিলিপ্পি এসে বলল, কোন চিন্তা নেই আপনার, কোন চিঠি থাকলে দিতে পারেন, আমি পৌঁছে দেব যথাস্থানে।

আমি তাকে বিশ্বাস করে অনেক চিঠিপত্র দিই। এইভাবে দু'মাস কেটে যায়। তারপর একদিন সেই দ্বীপে আবার মিলনের ব্যবস্থা করি। ফিলিপ্পি তা জানতে পেরে সে আগে হতে সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে আমার জন্য। সে আমার প্রেমিককে কোন খবর দেয়নি ইচ্ছে করে। সে আমাকে দেখে আমার দেহটা ভোগ করতে চায়। আমাকে ভয় দেখিয়ে বলে সে আমার সব চিঠি রেখে দিয়েছে, আমি কথা না রাখলে সে সব কথা তোমাকে বলে দেবে। আমি তোমার ভয়ে কাপুরুষের মত তার কথায় বাধ্য হয়ে রাজী হই। একটি পাপ হতে আর একটি পাপের গর্ভে চলে যাই। এইভাবে সে আমার অসহায়তার সুযোগটা নিয়ে বারবার দেহভোগ করে।

কিন্তু এইভাবে আর চলে না। মৃত্যু ছাড়া আমার কোন গত্যন্তর নেই

পিতা। তাই ঠিক করেছি চান করতে গিয়ে ডুবে মরব। আমার এই চিঠি তুমি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি মৃত্যুবরণ করব। আমি আমার প্রেমিককে সব কথা জানিয়ে একখানি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি। একই সময়ে সেও সে চিঠি পাবে।

তোমাকে বলার আর কিছু নেই পিতা। আমাকে ক্ষমা করো। তোমার যা খুশি করো। জীবনে যে কথা বলতে পারিনি ভয়ে মৃত্যুকালে সে কথা বলতে কোন ভয় নেই। কারণ একমাত্র মৃত্যুতেই মানুষ সব ভয় হতে উত্তীর্ণ হতে পারে। বিদায় পিতা।

চিঠিখানা পড়া শেষ হলে তাঁর আর্দালি ফিলিপ্পিকে ডেকে পাঠালেন লিমোসিন। ফিলিপ্পি এলে তাঁর ড্রয়ারটা খুলে বললেন, আমার স্ত্রীর প্রেমিকের নাম বল।

ফিলিপ্পির চতুর মুখখানা সহসা কালো ও কুটিল হয়ে উঠল। লিমোসিন রিভলবারটা বার করে তার দিকে ধরে বললেন, তুমি জান, বল শীগগির।

ফিলিপ্পি বলল, ক্যাপ্টেন আলবার্ত।

তার কথা শেষ হতে না হতে রিভলবারের একটা বুলেট ছুটে গিয়ে তার কপালটা বিদ্ধ করল। সামনে মুখ গুঁজে পড়ে গেল ফিলিপ্পি।

কালা-বোবা

[The deaf and mute]

হে আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি জানতে চেয়েছ কেন আমি প্যারিসে ফিরছি না। আমি যদি তার কারণ তোমাকে জানাই তাহলে হয়ত তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে। '

তার মানে এই নয় যে আমি শহর ভালবাসি না, প্যারিসে থাকতে আমি ভালবাসি না। প্যারিসে থাকতে আমি ভালবাসি ঠিকই। তবে শরৎকালটা আমি বনে বনে ঘুরে শিকার করেই কাটাতে চাই। আর একটা ঘর আর ঘরের বাইরে থাকাটার মধ্যে পার্থক্য যে কত তা তুমি এখানে এলে বুঝতে পারবে। প্যারিস শহরে পথে ঘাটে সব সময় এত লোক যে সব পথগুলোই মনে হবে দেয়ালহীন এক একটা ঘর। অবশ্য বর্তমানে প্যারিসে না ফেরার এটা কোন কারণ নয়। এখন আমি প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি না তার কারণ এখন প্রচুর সংখ্যক বনমুরগী উড়ছে এখানে।

এখানে আমি আছি একটা পাহাড়ের উপত্যকা প্রদেশে অবস্থিত নরম্যাক

যুগের পুরনো আমলের একটা বিরাট বাড়িতে। বাড়িটার সামনেই একটা নদী বয়ে গেছে। এই বাড়ি থেকে শিকার করা খুব সহজ ব্যাপার। যেদিন শিকারের কাজ থাকে না সেদিন ভাল ভাল বই পড়ে সময় কাটাই। এখানে আমার সঙ্গী বলতে শু ওরগেমন আর তার ভাই। ওরাই আমার এখন একমাত্র বন্ধু আর অবিরাম সহচর। এখানে বরফ পড়তে শুরু করলেই আমরা চলে যাব এখান থেকে। এখান থেকে আমরা যাব ক্যাম্নেতভে।

ওরগেমন আর তার ভাইকে দেখতে ঠিক দৈত্যের মত। ওদের দেহে নরম্যান রক্ত আছে। ওরা দুজনেই খুব সাহসী।

একদিন ওরগেমনের ভাই বলল, বরফে চারদিক সাদা হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

এর দুদিন পরেই আমরা একটা হান্টিং ওয়াগনে করে ক্যাম্নেতভের পথে রওনা হই। পথে বরফ পড়তে থাকায় ভীষণ শীত করছিল। সারাটাদিন শেষ করে বেলা পাঁচটায় আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌছলাম।

মাষ্টার পিকত নামে এক চাষীর বাড়িতে আমরা উঠলাম। পিকত ছিল বেঁটেখাটো ধরনের শক্ত কাঠামোর এক মানুষ। মুখে হাসি সব সময় লেগেই আছে। কিন্তু হাসিখুশিতে ভর্তি থাকলেও মুখখানা দেখলেই বেশ চতুর মনে হয়।

আসলে বাড়ি মানে খামারবাড়ি। খামারটার মালিক হচ্ছে ওরগেমনরা, পিকত সেটা দেখাশোনা করে। আমি পনের বছর ধরে বছরে একবার প্রতি শরৎকালে যাই সেখানে আমার বন্ধু ওরেগমনদের সঙ্গে। আর শরৎকালে বনমুরগী শিকারের সময়টা এলেই পিকতের খামারে যেন উৎসবের ধুম লেগে যায়। খামারের মধ্যে সার দিয়ে লাগানো আপেল আর বীট গাছের মাঝে একটি পাকা বাড়ি। অদূরের সমুদ্র থেকে ছুটেআসা দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে সারা বছরই লড়াই করে যেতে হয় গাছগুলোকে।

রান্নাঘরের পাশে খাবার ঘরে খেতে গিয়ে দেখলাম পিকতের স্ত্রী খুব হিসাবী মেয়ে। শক্ত ও লম্বা চেহারার মাদাম পিকতের সব সময় সজাগ দৃষ্টি থাকে ঝি চাকরদের উপর।

পরদিন সকালে আমরা শিকারে বার হলাম। শীতের সকালে যখন নীল বাতাসে সোনারোদ কাঁপতে থাকে তখন আলোছায়ায় ভরা বনে গিয়ে শিকার করতে বড় ভাল লাগে। পিকত আমার সঙ্গে ছিল। আসলে আমরা নেকড়ে শিকারের জন্য তৈরী হয়েই বেরিয়েছিলাম। শুধু বনমুরগী শিকার করতে বার হলে বনমুরগী পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা বনমুরগী এসে যায়।

হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম বনের ধারে মাঠের এককোণে গার্গন বসে বসে ভেড়া চড়াচ্ছে আর কি একটা বুনছে। ওর বয়স খুবএকটা বেশী না

হলেও মুখে লম্বা দাড়ির জন্ম ওকে বুড়ো বুড়ো দেখায়। ও কালা আর বোবা দুই-ই। ও বরাবরই ভেড়া চড়ায় এই খামারে। আর আশ্চর্য, ভেড়াগুলো ওকে এতই ভালবাসে যে ও কোন কথা না বললেও ওর প্রতিটি ইশারা যেন তারা বুঝতে পারে।

হঠাৎ পিকত ওর দিকে হাত বাড়িয়ে একসময় আমাকে বলল, জানেন, ওর স্ত্রীকে ও নিজের হাতে খুন করেছে।

আমি চমকে উঠলাম, তাই নাকি! ওই কালা-বোবা লোকটা খুন করেছে তার স্ত্রীকে!

পিকত বলল, হাঁা, গত বছর শীতকালে। রুয়েনে মামলা চলল তার জন্য। অনেককরে ওকে ছাড়িয়ে এনেছি। সব বলব আপনাকে।

গার্গন হচ্ছে পিকতের বাবার আমলের লোক। পিকতের বাবা ওকে ভেড়া চড়াবার কাজ দেয়। ও জন্ম থেকেই বোবা-কালা। কিন্তু ভেড়া বা গরু চড়াবার কাজে ও নাকি খুব ভাল। ভেড়ার পাল থেকে একটি ভেড়া কোথাও পালিয়ে গেলেও তাকে খুঁজে বার করবেই। তার বাবার মৃত্যুর পর পিকত খামারের ভার নেয় যখন তখন গার্গনের বয়স তিরিশ। কিন্তু তার লম্বা দাড়িটা আর রোগা-রোগা লম্বা চেহারাটার জন্য চল্লিশ বছরের মত মনে হতো। এই সময় ঐ অঞ্চলে মাদাম মার্তেন নামে এক গরীব মহিলা তার পনের বছরের এক অনাথা মেয়েকে রেখে মারা যায়। মেয়েটা ঘুরতে ঘুরতে খামারে এসে জোটে। তবে ও নিয়মিত খামারের কাজটাজ করত না। ওর কোন শোবার জায়গা ছিল না বলে প্রায়ই ও খামারের খড়ের গাদার উপর যেখানে সেখানে যার তার কাছে শুয়ে থাকত। মেয়েটা ছিল আধপাগলা মত। মদের প্রতি অত্যধিক ঝোঁক ছিল ওর। এক বোতল বা দু-এক পাত্র মদের জন্য ও যে-কোন পাপ কাজ করতে পারত। যেকোন লোককে দেহদান করতে পারত অবলীলাক্রমে।

কিন্তু দেখা গেল ওই মেয়েটা বোবা-কালা গার্গনকে বেশী পছন্দ করছে। গার্গনকে ও কেন বেশী পছন্দ করতে লাগল এবং তার কাছে শুতে লাগল তা কেউ বলতে পারে না। গার্গনও মেয়েটাকে ভালবাসতে শুরু করল। ওরা এই খামারেই স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে থাকে। পরে চার্চে নিয়ে গিয়ে ওদের বিয়ে দেওয়া হয়। যেমন পাত্র তেমনি পাত্রী।

বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটার স্বভাব বদলালো না। সেই মদ আর মদ। মদের ফোঁটা গলায় না পড়লে ওর যেন গলাটা শুকিয়ে যেত। তাই ওকে দেখলেই ছেলে বুড়ো সবাই 'মদের ফোঁটা' বলে চীৎকার করত। ওর অনুপস্থিতিতেও সবাই একজায়গায় জড়ো হলে ওর কথা আলোচনা করত।

গার্গন কিন্তু ওসব কিছু লক্ষ্য করত না। সে শুধু একমনে ভেড়া চড়াত। তার স্ত্রী মদের জন্য কার সঙ্গে কোথায় কি করছে সে সম্বন্ধে কোন ভাবনাই

ছিল না ওর।

একদিন একটা ঘটনা ঘটল সাংঘাতিক রকমের। মেয়েটার দেহে নতুন যৌবনের জোয়ার দেখে নারীলোলুপ লোকগুলো প্রায়ই ঘুরঘুর করত তার চারদিকে। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মদের বোতল দেখিয়ে কোন-একটা নির্জন জায়গায় তাকে নিয়ে যেত। ইচ্ছামত তার দেহটা ভোগ করত। একদিন সামোভিলের একটা ছোকরা এসে একটা মদের বোতল দেখিয়ে মেয়েটাকে নিযে যায় একটা মিলের পেছনে। দিনের বেলা। কাছেই কোথাও ভেড়া চড়াচ্ছিল গার্গন। হঠাৎ চোখে পড়তেই ছুটে যায়। গার্গনকে দেখে ছোঁড়াটা পালিয়ে যায়। গার্গন তখন তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে মেয়েটার গলা টিপে ধরে। চীৎকার শুনে আশেপাশের জায়গা থেকে লোকজন ছুটে আসার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। মেয়েটার জিবটা বেরিয়ে আসে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বার হতে থাকে।

পুলিশে ধরে নিয়ে যায় গার্গনকে। মামলা হয় রুয়েনের আদালতে। মামলার কাহিনী শুনতে শুনতে আদালত-ঘরের সব লোক হাসতে থাকে। কারো জেরা বা কথার কোন উত্তর দিত না গার্গন। একমাত্র আমার প্রশ্নের উত্তরে ও চোখে মুখের ভাব ও অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ওর মনের ভাবটা প্রকাশ করত। গার্গন কেন এবং কিভাবে তার স্ত্রীকে হত্যা করে পুরো কাহিনী সে আদ্যোপান্ত তার হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ করে। সেটা সত্যিই দেখার মত। ওর স্ত্রী সামান্য মদের জন্য কিভাবে একজন পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাও অকপটে বুঝিয়ে দিল। কারণ ওর মনে ত লজ্জা বা গোপনীয়তা বলে কোন জিনিস নেই। তারপর দেখাল কিভাবে ওর স্ত্রীর গলাটা টিপে ধরেছিল। ও এমনভাবে দেখাল, মনে হলো সত্যি সত্যিই ও যেন কাউকে গলা টিপে মারছে।

অবশেষে বেকসুর খালাস পেল গার্গন। আগের মতই ও কাজ করে যাচ্ছে। ওর মনে কোন বিকার নেই। এতবড় ঘটনাটা যেন ও একেবারে ভুলে গেছে অনায়াসে।

হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে হুঁস ফিরে পেলাম। হয়ত বনমুরগীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

এবার বুঝতে পারছ বন্ধু, কিভাবে আমি বনমুরগীর সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছি, বুঝতে পারছ হয়ত কেন আমি এখন প্যারিসে ফিরছি না।

মন্ত্রশক্তি

[Magnetism]

সেদিন এক ডিনার পার্টিতে খাওয়ার পর মন্ত্রশক্তির অলৌকিকত্ব এবং এ বিষয়ে দোনাতোর কলাকৌশল আর চরকোতের অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল। সে পার্টিতে যারা উপস্থিত ছিল তারা সকলেই সুখী ব্যক্তি, ধর্মে তাদের বিশ্বাস নেই। তবু তারা প্রত্যেকেই এমন এক-একটা ঘটনার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিল যা অবিশ্বাস্য এবং অলৌকিক মনে হলেও সত্য।

তাদের মধ্যে একজন যুবক সবচেয়ে বেশী নাস্তিক। সে কোন ঘটনার অলৌকিকতায় বিশ্বাস করত না। ধর্মকর্মে কোন মতিগতি ছিল না তার। তখনো সে বিয়ে করেনি, কিন্তু অবাধে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করত আর মাঝে মাঝে শিকার করে বেড়াত।

নাস্তিক যুবকটি সকলের কথা শুনে বলল, সব বাজে। মঁসিয়ে চারকোতের ওসব কথা এডগার এল্যান পোর গল্পের যত সব মনগড়া ঘটনার মতই বাজে। অনেক সময় মানুষ জটিল স্নায়বিক ক্রিয়াসঞ্জাত অনেক ঘটনার কারণ বুঝতে না পেরে যাজক পুরোহিতদের কাছে যায় আর তাদের ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করে।

একজন বলল, প্রাচীনকালে সত্যি সত্যিই অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটত।

নাস্তিক বলল, আগে যদি ঘটত তবে এখন ঘটে না কেন?

তখন নাস্তিকের ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য একে একে অনেকে অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে আপন আপন অভিজ্ঞতার কথা বলল। বলল, আজও অলৌকিক ঘটনা অনেক ঘটে। মহাশূন্যে পরলোকগত আত্মায় আত্মায় কথা হয়। একজন গোপনে অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করে অন্যের উপর।

কিন্তু নাস্তিক অবিশ্বাসের সুরে বলল, সব বাজে কথা। অলৌকিক বলে কোন কিছু নেই। অবশেষে সে তার মুখ থেকে সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, আমি দুটো ঘটনার কথা বলে তার কারণ ব্যাখ্যা করে দেব। আপাততঃ সে ঘটনা অবশ্য অলৌকিক মনে হবে। ঘটনা দুটো এই: এত্রিয়াতের গ্রামাঞ্চলে মৎসজীবী এক সম্প্রদায় বাস করে। তারা প্রতি বছর কড মাছ ধরতে যায় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে। একদিন নিশীথ রাতে এক জেলের ছেলে ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, মা মা, বাবা জলে ডুবে গেল। একমাস পরে সত্যি সত্যিই খবর পাওয়া গেল ঐ ছেলেটির বাবা সেইদিনই জলে ডুবে মারা যায়। এই কথাটা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীরা এটা অলৌকিক ঘটনা ভাবল।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন তখন বলল, কিন্তু তুমি কি করে ব্যাখ্যা করবে?

নাস্তিক তখন বলল, আমি এর রহস্য খুঁজে বার করেছি। আমি ঐ অঞ্চলের জেলেদের পরিবারে খোঁজ নিয়ে জেনেছি জেলেরা বাড়ি থেকে চলে গেলে তাদের স্ত্রী, ছেলে বা মায়া প্রতিদিনই তাদের স্বপ্নে দেখে। শুভ অশুভ সব রকম স্বপ্নই দেখে। তাদের মধ্যে কিছু স্বপ্ন সত্যি হয়, কিছু হয় না। যে স্বপ্ন সত্যি হয় না সে স্বপ্নের কথা তারা শীঘ্রই ভুলে যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি স্বপ্নের কথা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে অকস্মাৎ মিলে যায় তার কথা মুখে মুখে অলৌকিক ঘটনা হিসাবে প্রচারিত হয়।

শ্রোতাদের মধ্যে আর একজন বলল, তোমার দ্বিতীয় ঘটনাটা বল এবার।

নাস্তিক বলল, হ্যাঁ বলছি। আমাদের সমাজে আমার সঙ্গে যে সব মেয়ের আলাপ আছে তাদের মধ্যে একজনকে আমি মোটেই দেখতে পারতাম না। সে দেখতে খুব-একটা খারাপ না হলেও তাকে দেখলে কোন কামনাই জাগত না আমার। একদিন রাত্রিতে শোবার কিছু আগে আমি আগুনের পাশে বসে কতকগুলো চিঠি লিখছিলাম। নির্জন চিন্তার সেই অলস অবকাশে কতকগুলো ছবি ভেসে উঠল আমার মনে। কলমটা আমার হাতেই স্থির হয়ে রইল। বুকের ভিতরটায় কেমন যেন শিহরণ খেলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো আমার একান্ত অবাঞ্ছিত সেই মেয়েটি হঠাৎ এসে হাজির হলো আমার সামনে। মনে হলো তার অনাবৃত দেহটা আমি স্পর্শ করছি যার কথা একদিন মনে ভাবতেও ঘৃণা বোধ হতো আমার। যার মধ্যে কোন ভাল কিছু খুঁজে পাইনি, হঠাৎ মনে হলো সে যেন রূপগুণের খনি।

আমি উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নেও আবার তাকে দেখলাম। তারপর অবিরাম আদর আলিঙ্গন ও চুম্বনের নিবিড়তায় ও তীব্রতায় দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠল আমাদের সেই স্বপ্নঘটিত মিলন।

পরদিন সকালে উঠেও তার কথাই ভাবতে লাগলাম। আমি সোজা তার কাছে চলে গেলাম। সে তখনো বিছানায় শুয়ে ছিল। তাকে উঠিয়ে সব কথা বললাম। আমার কেবলি মনে হতে লাগল গত রাত্রিতে সত্যি সত্যিই আমি মিলিত হয়েছিলাম তার সঙ্গে। মনে হলো তার চুম্বনরসে এখনো সিক্ত হয়ে রয়েছে আমার ওষ্ঠাধর। আমার হাতের প্রতিটি আঙুলে এখনো লেগে রয়েছে তার স্পর্শনের শিহরণ। তার দেহভোগের এক অনাস্বাদিতপূর্ব আস্বাদ এখনো সজীব হয়ে রয়েছে আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের পরতে পরতে।

সেও যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই সে উঠে বসল বিছানায়। আমি তাকে সব কথা বলতে বলতেই তাকে দুহাত দিে

জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগলাম পাগলের মত।

এরপর হতে পুরো দুটি বছর আমি মেয়েটিকে নিয়ে একসঙ্গে বাস করি।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলল, এর থেকে কি সিদ্ধান্তে তুমি এলে?

আমার মনে হয় অনেক সময় আমরা সচেতন মনে যে বস্তু বা ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করি তার প্রতি একটা গোপন আসক্তি বা আগ্রহ আমাদের মনের কোণে কোথায় যেন রয়ে যায়। সেই আসক্তি বা আগ্রহই স্মৃতি হয়ে কোন অসতর্ক মুহূর্তে অবচেতনার সিঁড়ি বেয়ে আমাদের মনের উপর উঠে আসে। সেই সংশ্লিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে জীবন্তরূপে উপস্থাপিত করে আমাদের সামনে।

গল্প শেষ হলে শ্রোতাদের একজন নাস্তিককে বলল, এর পরেও যদি অলৌকিকে বিশ্বাস না করো তাহলে বলব তুমি অকৃতজ্ঞ।

বহুরূপে

[In various roles]

আমার যে সব পূর্বস্মৃতিগুলি আমি বর্ণনা করব তার মধ্যে এমন একটি নারীর কথা বারবার এসে পড়বে যে ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত এ দেশের পুলিশবাহিনীর ইতিহাসে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। তার নাম হলো ওয়ান্দা ভন শেবার্ত। তার বয়স যখন মাত্র ষোল তখন সে প্রেমে পড়ে তার ইচ্ছামত একজন অফিসারকে বিয়ে করে।

কিন্তু দুটি বছর যেতে না যেতেই ওয়ান্দার স্বামী মারা যায়। ওয়ান্দার মত বিলাসপ্রিয় ও আমোদপ্রিয় মহিলা দেখাই যায় না। বিলাসব্যসন ও আমোদ আহ্লাদ ছাড়া একমুহূর্তও থাকতে পারত না। আর একটা দোষ ছিল ওয়ান্দার, সে আবার একজায়গায় খুব একটা বেশীদিন থাকতে পারে না।

তার স্বামীর মৃত্যুর দু-চার দিনের মধ্যেই আবার একজনের প্রেমে পড়ে ওয়ান্দা। তখনও স্বামীর শোকপালনপর্ব শেষ হয়নি। আগের মতই তেমনি বিলাসবহুল উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে লাগল। হঠাৎ ওয়ান্দা তার নতুন প্রেমিককে নিয়ে কোথায় চলে গেল। বোধহয় তারা গিয়েছিল ইতালি। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তাদের সম্পর্ক। দুবছর পার হতেই উত্তর ইতালির একটা শহরে তাকে ফেলে রেখে তার প্রেমিক পালিয়ে যায়।

ওয়ান্দা তখন সত্যিই খুব বিপদে পড়ে। হাতে বিশেষ টাকাপয়সা ছিল না। জীবিকা অর্জনের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু চতুর ওয়ান্দা এবার

প্রেমিকের পরিবর্তে একটা কাজ যোগাড় করে নেয়। সেখানকার পুলিশের গোপন সংবাদ সংগ্রহ বিভাগে চাকরি নেয় সুন্দরী ওয়ান্দা এবং অল্পদিনের মধ্যেই পুলিশের উঁচু মহলে বেশ মর্যাদার আসন পেয়ে যায়। তার কারণও ছিল। ওয়ান্দা শুধু যে দেখতে সুন্দরী ছিল এবং তার সুন্দর চোখের মায়ার দ্বারা যেকোন মানুষকে অল্প সময়ের মধ্যে মোহগ্রস্ত করে ফেলতে পারত তা নয়, সে পোল, ফরাসী, জার্মান, ইংরাজি, ইতালীয়, রুশীয় প্রভৃতি ছয় রকম ভাষায় অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে পারত। তার আর একটা গুণ ছিল। সে যেকোন জায়গায় থাকতে পারত, যেকোন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারত। এবং দরকার হলে যেকোন মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে যেতে পারত।

একবার ওয়ান্দা যখন জেনেভার কাছে লেকের ধারে ভিভে নামক এক জায়গায় কিছুদিনের জন্য বাস করছিল তখন একদিন হোটেলে হঠাৎ ডন এসকোভেদো নামে ব্রাজিলদেশীয় এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়। যুবকটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ান্দার মনে হলো অত সুন্দর মানুষ সে যেন জীবনে কখনো কোথাও দেখেনি। লম্বা সুগঠিত চেহারা, ঘন কোঁকড়ানো কালো চুল, টানা টানা কালো চোখ, ফর্সা ধবধবে গায়ের রং। একই সঙ্গে এত সুক্ষ্মতা, সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতার সমন্বয় কোন পুরুষের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।

প্রথম আলাপের দিনই তাকে আপন করে নিল ওয়ান্দা। পরদিন দুজনে পরস্পরের প্রেমের গভীরে ডুবে গেল নিঃশেষে।

কিন্তু ক্রমশই একটা সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল ওয়ান্দার মনে। এসকোভেদো কিছুই করে না। তার আয়ের উৎস কোথায় তার কিছুই বুঝতে পারল না একসঙ্গে বেশকিছুদিন থেকেও। পর পর দুবার এসকোভেদো তার কাছে টাকা ধার করতে সে সন্দেহ আরও বেড়ে গেল।

তারপর হঠাৎ একদিন ওয়ান্দাকে একা ফেলে এক বয়স্কা ধনী মহিলাকে নিয়ে কোথায় চলে গেল এসকোভেদো তার আর কোন খবর পায়নি ওয়ান্দা। বছরখানেক পর লুক্কাতে ওয়ান্দা রোগা রোগা চেহারার এক ইংরেজ মহিলার হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াতে দেখে এসকোভেদোকে।

তার প্রেমিককে ওয়ান্দা' চিনতে পারলেন কিন্তু ওয়ান্দাকে চিনেও চিনল না তার ভূতপূর্ব প্রেমিক। দুচারদিন পর ওয়ান্দা স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানতে পারল সেখানে এসকোভেদো অন্য নামে পরিচিত। লুক্কাতে তার নাম হলো রোমানেসকো

একদিন ওয়ান্দা সমুদ্রস্নানের জন্যে হেগলোল্যাণ্ড নামে একটি দ্বীপে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে একটি হোটেলে একজন রুশমহিলার সঙ্গে বসে গল্প করতে দেখে এসকোভেদোকে। তার চেহারাটা আগের মত ঠিকই আছে। তবে মাথার চুলগুলো একটু পাতলা হয়ে গেছে। ওয়ান্দা বলল,

আপনার মাথার চুলগুলো আগে খুব ভাল ছিল।

এসকোভেদো তাকে না দেখার ভান করে বলল, তাই নাকি? কিন্তু আপনি হয়ত আমাকে অন্য কেউ ভেবে ভুল করছেন। আপনি কার কথা বলছেন?

ওয়ান্দা বলল, ডন এসকোভেদোর কথা।

এসকোভেদো বলল, মাফ করবেন, আমার নাম কাউন্ট দেমবিৎস্কি। আমার বাড়ি খানকিমিয়া।

ওয়ান্দা অবাক হয়ে বলল, তা হবে হয়ত।

বছরখানেক পর ওয়ান্দা এসকোভেদোকে আবার দেখল ভিয়েনার কাছে বেডেন নামে এক জায়গায়। সেখানে ওয়ান্দা দেখল এসকোভেদো এক গ্রীক রাজকুমার হিসাবে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। তার নতুন নাম হলো এ্যানাস্তেমিও মরোকরদাতোস। ওয়ান্দা দেখল তার চুলগুলো তেমনি কালো আছে। তবে মুখে দাড়ি রেখেছে।

এবার ওয়ান্দাকে দেখে তার পরিচয় আর গোপন করল না এসকোভেদো। ওয়ান্দা ঠাট্টা করে বলল, এরপর কি কোন নিগ্রো রাজা সাজবে?

এবার ওয়ান্দার কাছে আত্মসমর্পণ করল এসকোভেদো। কাতরভাবে অনুরোধ করল ওয়ান্দাকে সে যেন কাউকে তার আসল পরিচয় না দেয়।

এসকোভেদো তখন অস্ট্রিয়ার এক কাউন্টের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলছিল। মেয়েটি তখন এক স্থানীয় অফিসারকে ভালবাসত। কিন্তু এই সুদর্শন গ্রীক রাজকুমারকে পেয়ে তাকে ছেড়ে দেয়।

সেই অফিসারের সঙ্গে ঘটনাক্রমে ওয়ান্দার আলাপ হতেই ওয়ান্দা তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এদিকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কাউন্টকন্যার প্রেমের জন্য বিরোধ দেখা দেয় এবং একদিন ডুয়েল লড়ার ব্যবস্থা হয়।

কিন্তু সে ডুয়েল আর লড়তে হয়নি। তার আগেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এসকোভেদো। কাউন্টকন্যা তার প্রেমিকের কাছেই ফিরে আসে।

শয়তান কাউন্টপত্নী

[Countess Satan]

ওদের মধ্যে তর্ক হচ্ছিল নানা বিষয়ে। ডিনামাইট, সমাজবিপ্লব, শূন্যতাবাদ প্রভৃতি কত বিষয়ে ওদের তর্কের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে পড়ছিল।

ওদের মধ্যে একজন ভাল বক্তা ছিল। সে যেকোন ঘটনা সুন্দরভাবে বলতে পারত। সে বলল, তোমরা যাই বল, শূন্যতাবাদী বাকুনিনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যেভাবে হয় তার কথা বললে সেটা অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হবে। তবে শোন ব্যাপারটা।

কাউন্টপত্নী নিকোসার সঙ্গে আলাপ হয় নেপলস্ শহরে। নিকোসা ছিল রুশ দেশের মেয়ে। তার চেহারাটা রোগা-রোগা হলেও হাড়গুলো খুব শক্ত ছিল। তার চোয়ালগুলো ছিল উঁচু উঁচু। তার কথা বলার ভঙ্গিমাটি ছিল বড় চমৎকার।

দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিক পণ্ডিতের মত অনেক বড় বড় কথা বলত নিকোসা। কিন্তু মনটা ছিল বড় দূষিত আর তার মতবাদ ছিল উগ্র আর ধ্বংসাত্মক। সে কারো কোন ভাল দেখতে পারত না। সে শুধু জীবনের অনিত্যতা, হতাশা আর ধ্বংসের তত্ত্বে বিশ্বাস করত।

আমি তাকে খুশি করে হাত করার জন্যে প্রায়ই বলতাম, আমিও লেখক হিসাবে তোমার কথাই লিখে বইগুলোতে যে কথার বিষ ছড়াই সেই কথা অনুসারেই অনেকে চলে।

নিকোসাই একদিন আমাকে বলে বাকুনিনের কথা। বাকুনিন জীবনে যে সব দুঃসাহসিক কাজ করেন, মৃত্যুদণ্ডকে এড়িয়ে প্রাগ, ড্রেসডেন প্রভৃতি এক দেশ হতে অন্য দেশে কিভাবে তিনি ঘুরে বেড়ান এবং বর্তমানে তিনি লণ্ডনে থেকে কেমন করে শূন্যতাবাদের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তার একটা ফিরিস্তি দেয় নিকোসা আমাকে। নিকোসার মতে বাকুনিনই একমাত্র জগতে আদর্শ পুরুষ। আর আমিও যদি তার মত বাকুনিনকে আদর্শ পুরুষ বলে মেনে নিতে পারি তাহলেই সে আমাকে গ্রহণ করতে পারে। তার প্রতি আমার আসক্তি দেখে সে একদিন আমায় স্পষ্ট জানিয়ে দিল, মনে-প্রাণে বাকুনিন হও, তাহলেই আমাকে পাবে।

লণ্ডনে বাকুনিনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য একদিন রওনা হলাম দুজনে। পিমনিকো অঞ্চলে একটা ছোট্ট একতলা বাড়িতে থাকতেন বাকুনিন। বাড়িটির সামনে ছিল ছোট্ট এককালি বাগান। আমরা দুজনে গিয়ে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি তাঁকে জীবনে কখনো দেখিনি।

অবশেষে তিনি এসে গেলেন। শূন্যতাবাদী দর্শনের আপোষহীন প্রবক্তা ও বর্তমান মানবজাতির ত্রাণকর্তা বাকুনিনের চেহারাটা সত্যিই দেখার মত। মনে হলো তাঁর গায়ে বোধ হয় এ্যাটিলা, চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুর লঙের রক্ত আছে। মোটা চেহারা, হাঁড়ির মত বড় মুখ। চোখগুলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মনে হলো ঈশ্বরবিশ্বাসী কোন আর্যজাতি হতে জন্ম হয়নি বাকুনিনের।

নাস্তিক কোন যাযাবর দলই হলো তাঁর পূর্বপুরুষ।

শূন্যতাবাদের ধারণাটা কিন্তু বাকুনিনের নিজস্ব নয়। এটা তিনি পেয়েছেন তুর্গেনিভের কাছ থেকে। তিনি শুধু সে ধারণাকে রূপ দিতে চলেছেন বীরের মত। তিনি হার্জেনের কাছ থেকে কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদ ও পউগাৎশেভের কাছ থেকে ধ্বংসাত্মক বিপ্লববাদের দুটো আদর্শও বার করেছেন। হার্জেন চেয়েছিলেন শ্লাভ কৃষকদের উন্নতি আর পাউগাৎশেভ চেয়েছিলেন পথের সব কাঁটা বিপ্লবের মাধ্যমে সরিয়ে নিজে সম্রাট হতে। কিন্তু বাকুনিন চেয়েছিলেন সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে ভাঙতে। শুধু সব ভাঙার কথা, গড়ার কথা তাঁর মুখে বা মনে নেই।

বাকুনিনের সঙ্গে দেখা করে আসার পর নিকোসা কেমন যেন ঝিমিয়ে গেল। তার প্রতি আমার আসক্তিও কমে গেল। একটা প্রদীপ থেকে কোন অগ্নিকাণ্ড হলে যেমন সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পাশে সেই প্রদীপটি নিষ্প্রভ লাগে তেমনি বাকুনিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নিকোসাকে কেমন যেন নিস্তেজ এবং নিষ্প্রাণ মনে হলো আমার। আগুন জ্বলে উঠলে যেমন আর প্রদীপের কোন প্রয়োজন থাকে না তেমনি বাকুনিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নিকোসার প্রতি আর কোন উৎসাহ রইল না আমার। তার সব প্রয়োজন যেন ফুরিয়ে গেল আমার কাছে।

আমি একদিন তাকে ফেলে চলে গেলাম।

দরকারী বাড়ি

[A useful house]

উপস্থিত বন্ধুদের একটা গল্প শোনাতে গিয়ে গল্পের কথাটা মনে করে নিজেই হাসতে লাগল রোয়ামঁত। হাসির ঝোঁকে দুলে দুলে উঠতে লাগল তার মোটা দেহটা।

রোয়ামঁত বলল, আজ আমি তোমাদের এক মজার কথা বলব। বলব কিভাবে একটা বোকা বুদ্ধি খাটিয়ে ফন্দী করে তার বন্ধুর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে পাওনাদারদের হাত হতে রেহাই পায়।

তার এক বন্ধু বলল, ওসব ভূমিকা বাদ দাও। আসল গল্পটা বল।

রোয়ামঁত বলল, বলছি। যে বর্দেলেভের হাতে একটা পয়সা ছিল না সে আবার একটা বই প্রকাশ করতে যাচ্ছিল। বইটা তারই জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা আর বদেভিলের এক নামকরা লেখক তার

ভূমিকা লিখতে রাজী হয়েছিলেন। এই বর্দেলেভ আর কুইলানেভের মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। দুই বন্ধুতে এমন যেন দেখাই যায় না। অথচ দুই বন্ধুর আর্থিক অবস্থার মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল তফাৎ। কারণ বর্দেলেভ ধনী ঘরের ছেলে হলেও তার বিষয় সম্পত্তি সব দেনার দায়ে বন্ধক আছে। তার নিজের বলতে কিছু নেই। অথচ তার বন্ধু কুলানেত ছিল প্রচুর ধনী। তার বাৎসরিক আয় ছিল আট লক্ষ ফ্রা। সে আবার সামরিক বিভাগে কণ্ট্রাক্টারি নিয়েও প্রচুর টাকা রোজগার করে।

কুইলানেত ছিল কেমন যেন গম্ভীর প্রকৃতির লোক। একেবারে যাকে বলে নীরস। কিন্তু বর্দেলেভ ছিল ঠিক তার উল্টো। সে যতক্ষণ তার বন্ধু কুইলানেতের কাছে থাকত ততক্ষণ হাসিখুশিতে মাতিয়ে তুলত তাকে। এজন্য কুইলানেতও মনে মনে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ ছিল তার বন্ধুর প্রতি। বর্দেলেভের মত না নিয়ে কিছু করত না কুইলানেত। কখন কোন্ মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করবে কুইলানেত, কোন্ মেয়ের সঙ্গে তার রুচি ও স্বভাবের খাপ খাবে তা বলে দিত বর্দেলেভ। বর্দেলেভ ছিল তার এমনই অন্তরঙ্গ আর বিশ্বস্ত।

এই কুইলানেত গত বছর বিয়ে করে। প্যারিসের এক নামকরা সুন্দরী সুজেত্তে মার্লিকে অবশেষে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে কুইলানেত। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাড়ি ভাড়া করে বন্ধুদের পরামর্শে। বাড়িটার সামনে উঠোন, পিছনে বাগান। নিরিবিলি বাড়িটা নববিবাহিত দম্পতিদের প্রেমচর্চার পক্ষে চমৎকার।

বাড়িটার উপরতলায় থাকত কুইলানেত আর তার স্ত্রী আর নিচের তলায় থাকত বর্দেলেভ একা।

একবার তার একতলার বাসায় এক ভোজসভার আয়োজন করে। বর্দেলেভ তাতে তার বন্ধু কুইলানেত ও তার স্ত্রী ছাড়াও আরো অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল। খাওয়ার পর মদপান করতে করতে অতিথিরা যখন আপন আপন স্ত্রী বা প্রণয়িনীকে কোলে বসিয়ে ফূর্তি করছে তখন বর্দেলেভ একা একা বসে একটা সিগারেট খাচ্ছিল। এমন সময় চাকর এসে বর্দেলেভকে বলল, একজন ভদ্রলোক বাইরের ঘরে আপনাকে ডাকছেন।

বর্দেলেভ রেগে বলল, বলগে এখন দেখা হবে না।

চাকর বলল, উনি জোর করছেন দেখা করার জন্য। বলছেন আপনি দেখা না করলে পুলিশ ডাকবেন।

ব্যাপার বুঝে বর্দেলেভ বাইরের ঘরে গিয়ে দেখেন একজন ভদ্রলোক তার অপেক্ষায় বসে রয়েছেন। তাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, এই দেখুন, এই চুক্তিপত্রে আপনি সই করেছিলেন। এ সই কি আপনার?

বর্দেলেভ বলল, হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বললেন, কিন্তু আপনি টাকা দেননি। আপনি যদি এখনি সব

টাকা না দেন আমার হাতে তাহলে এই বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র নিয়ে যাব আমি। আদালতের দুজন লোক বাইরে অপেক্ষা করছে।

আসলে বাড়িটা তারই, কুইলানেতকে সে ভাড়া দেয়। কোন উপায় না দেখে কুইলানেতকে ডেকে সব কথা বলে বর্দেলেভ। তার যতসব সুন্দর সুন্দর ছবি, সৌখিন আসবাবপত্র, তার স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবদের চোখের সামনে দিয়ে সব টেনে নিয়ে যাবে এ কথা ভেবে বাধ্য হয়ে সব টাকা মিটিয়ে দিল কুইলানেত।

এইভাবে সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল বর্দেলেভ।

দুটি তরুণ সৈনিক

[Two little soldiers]

প্রতি রবিবার তারা এখানে আসত। ওদের ব্যারাকবাড়ি থেকে বার হয়ে শহরের শেষ প্রান্তে সেন নদীর সেতু পার হয়ে একটা মাঠ অতিক্রম করে অবশেষে বনের ধারে এই জায়গাটায় বসত ওরা। খাদ্য ও পানীয় যা সঙ্গে করে নিয়ে আসত তাই ওরা খেত এইখানে বসে।

ব্রেঁতো থেকে আসা এই দুই সৈনিক যখন শহরটাকে ছাড়িয়ে নদী পার হয়ে মেঠো পথে হাঁটতে শুরু করত তখন তাদের নিজেদের গাঁয়ের কথা মনে পড়ত। মনে পড়ত বাড়ির কথা।

সেন নদীর সেতুটা পার হয়ে একটা দোকান থেকে ওরা কিছু রুটি আর মদ কিনত। তারপর আবার পাশাপাশি পথ চলতে শুরু করত ওরা। সবুজ ফসলে ভরা মাঠটার ভিতর দিয়ে পথ চলতে চলতে চোখ জুড়িয়ে যেত ওদের। জাঁ কার্নেদেন একসময় তার বন্ধু লুক লে গ্যানিদেককে বলত, দেখ দেখ, ঠিক আমাদের গাঁ প্লাউনিদনের মত দেখতে লাগছে।

দূর সমুদ্র থেকে ছুটেআসা লবণাক্ত বাতাস যখন কচি সবুজ ফসলগুলোকে দুলিয়ে দিত মাঠে তখন ওদের শৈশবের অনেক ঘটনার ঝাপসা স্মৃতি ভিড় করে আসত ওদের মনে। তারপর ধীরে ধীরে সেই মাঠটা পার হয়ে ওরা একটা বনের ধারে এসে একটা গাছের তলায় বসত।

আর ঠিক সেই সময়ে গরু চড়াতে আসত একটি তরুণী চাষী মেয়ে। হৃষ্টপুষ্ট দেহ আর সরল মন দেখে তাদের গাঁয়ের চাষী ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ে যেত।

মেয়েটির হাতে থাকত একটি টিনের কৌটো। তাতে করে একটা গাই

দুইযে সে দুধ এনে ওদের দুজনকে খেতে বলত। তার থেকে লুক অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা বন্ধু জাঁকে দিত।

এক-একদিন ওদের খাওয়া শেষ হলে মেয়েটি আসত। আবার এক-এক-দিন খাওয়ার আগে। খাওয়ার আগে এলে তাকেও কিছু ভাগ দিত ওদের খাবার থেকে। মেয়েটি এসে সেই গাছের তলায় ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে ওদের কাছে বসত, কত সুখ দুঃখের গল্প বলত।

প্রতি রবিবারই নিয়মিত ওরা সেখানে যেত। এক রবিবার যাবার সময় মেয়েটার জন্য কিছু জিনিস কিনে নিয়ে যাবার কথা ভাবল ওরা। অনেক ভেবে ওরা কিছু লজেন্স কিনে নিয়ে গেল।

ওরা সেই গাছের তলায় গিয়ে প্রাতরাশ সারল। মেয়েটি তখনো না এলেও তার জন্য কিছু রুটি ও মদ রেখে দিল। তারপর জাঁ তাকে দূরে দেখতে পেয়ে বলল, ঐ আসছে। মেয়েটির সঙ্গে গরুর পাল থাকত না। মাত্র একটি গরু নিয়ে চড়াতে আসত।

তাদের কাছে এসেই মেয়েটি তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ সব ?

ওরা বলল, ভাল। তুমি কেমন আছ ?

লুক বলল, আমরা তোমার জন্য দেখ কি এনেছি।

মেয়েটি পরম আনন্দে তাদের দেওয়া লজেন্স এ গাল ও গাল করে চুষতে লাগল।

রবিবার ছাড়া ওরা কোথাও যেত না অবসর সময়ে। দুজনে সঙ্গছাড়া হতো না কখনো। কিন্তু কোন এক বৃহস্পতিবার দুপুরে খাওয়ার পর লুক তার বন্ধু জাঁর কাছে কয়েক ঘণ্টার জন্য বাইরে যাবার অনুমতি চাইল। ঠিক পরের বৃহস্পতিবারও তাই করল। লুক একা একা কোথায় যায় কি করে তার কিছুই বুঝতে পারল না জাঁ। মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও পারত না। কারণ তার মনে হলো ব্যাপারটা যখন লুক গোপন রাখতে চাইছে তখন সেটাকে খুঁচিয়ে বার করে লাভ হবে না।

তারপর রবিবার আসতে যথারীতি ওরা সেখানে গেল। কিন্তু সেদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করল জাঁ। মেয়েটি এসে তার দিকে না তাকিয়ে সোজা লুকের দিকে এগিয়ে গেল এবং তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগল।

জাঁ আশ্চর্য হয়ে গেল। মেয়েটি তাকে দেখেও দেখল না। তারপর তারা দুজনেই বনের ভিতর চলে গেল। তাদের পিছনে যতদূর সম্ভব বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল জাঁ। ওরা গাছপাতার আড়ালে চলে গেল, হারিয়ে গেল কোথায়, আর কিছুই বুঝতে পারল না জাঁ। অনেকক্ষণ পরে ওরা ফিরে এল। তারপর কিছুক্ষণ বসে থেকে মেয়েটি জাঁর পানে তাকিয়ে শুধু একটু

মুচকি হেসে চলে গেল।

মেয়েটি চলে যাবার পরও ওরা তুজনে বসে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু কোন কথা হলো না। জঁা এবার সব কিছু জলের মত বুঝতে পারল। ওরা কোন কথা না বললেও ওদের মুখের উপর ওদের মনের যত সব কথা যেন লেখা ছিল।

অবশেষে উঠে পড়ল ওরা। মন্থর গতিতে এগিয়ে যেতে লাগল ব্যারাকের দিকে। কিন্তু ওরা তুজনেই যেন অন্য মানুষ। সেন নদীর সেতুর উপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল জঁা। সে কি ভাবছিল। রেলিংএর উপর ঝুঁকে নদীর প্রবহমান জলধারার পানে তাকিয়ে সে যেন কি দেখছিল। দেখছিল একদৃষ্টিতে অন্যমনস্কভাবে। কিন্তু লুকের সাহস হলো না সে অত কি দেখছে বা ভাবছে সেকথা একবার জিজ্ঞাসা করতে।

রেলিংএর উপর ঝুঁকতে ঝুঁকতে জাঁর মাথাটা অনেক নিচু হয়ে পড়ল। তবু ও যেন তাকিয়ে আছে জলের পানে। কি যেন দেখছে। দেখার যেন শেষ নেই।

হঠাৎ একটা ডিগবাজি খেয়ে উল্টে গেল জঁা। তার পাতুটো উপরে উঠে গেল। আর কিছু দেখতে পেল না লুক। নদীর জলস্রোতের মধ্যে জঁার দেহটা তলিয়ে গিয়ে একবার উঠে পড়ল জলের উপরে। একবার দেখা দিয়েই আবার ডুবে গেল।

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে এই কথাটা অতি কষ্টে ব্যারাকের সহকর্মীদের কাছে ব্যক্ত করল লুক।

প্রেত

[*Ghosts*]

একদিন এক যুবক থানায় এসে পুলিশ ডিরেক্টরের কাছে সাহায্য চাইল একটি বিষয়ে। সে বলল, আমাকে আমার বাবা তাঁর সম্পত্তির অধিকার হতে বিচ্যুত করছেন। যদিও আমি দেশের প্রচলিত কোন আইন ভঙ্গ করিনি, আমি তাঁর প্রতি কোন অন্যায় বা নীতিবিগর্হিত কোন কাজ করিনি, তথাপি তিনি উইল করে তাঁর সব সম্পত্তি চার্চকে দিয়ে যাচ্ছেন। আমার একমাত্র দোষ ক্যাথলিক চার্চ আর তার যাজকদের রীতিনীতি আমার ভাল লাগে না।

আমার এই দোষের জন্য আমার বাবা আমাকে নাস্তিক বলেন এবং তাঁর

সব সম্পত্তি জেস্যুট ফাদারদের দিয়ে যাচ্ছেন। আমার যতদূর মনে হয় এ ব্যাপারে চার্চের পুরোহিতরা আমার বিরুদ্ধে বাবাকে উত্তেজিত করছে। বছরখানেক আগেও আমার বাবার সঙ্গে আমার সদ্ভাব ছিল। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। কিন্তু পুরোহিতদের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে মেলামেশা করতে শুরু করার পর থেকে আমার উপর বিরূপ হয়ে পড়েছেন আমার বাবা।

পুলিশ অফিসার বললেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমি কি করতে পারি বলুন। আপনার পিতা মনের দিক থেকে সুস্থ আছেন। তাঁর সম্পত্তি ইচ্ছামত কোন ব্যক্তিকে দান করার অধিকার তাঁর আছে।

যুবকটি তখন বলল, তাহলেও আপনারা আমায় অবশ্যই সাহায্য করতে পারেন। কারণ চার্চের যাজকরা আমার বিরুদ্ধে এক চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। গতকাল আমি যখন বাবার কাছে তাঁর উইলের প্রতিবাদ করি তখন তিনি বলেন আমার মার প্রেতাত্মা নাকি তাঁর সামনে এসে তাঁকে বলেছে আমার মত নাস্তিক সন্তানকে সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত না করলে তাঁর মুক্তি হবে না। সেই ভয়ে আমার বাবা নাকি এ কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ভূত প্রেতে মোটেই বিশ্বাস করি না।

পুলিশ অফিসার বললেন, আমিও না। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণ না পেলে আমরা এগোতে চাই না এ কাজে। আপনি জানেন চার্চের ক্ষমতা কত বেশী। কোন চার্চের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে গিয়ে আমি যদি ব্যর্থ হই অর্থাৎ অপরাধযোগ্য কোন কাজের প্রমাণ না পাই তাহলে আমারও চাকরি যাবে। তাই বলি, আপনি এ ব্যাপারে আরো কিছুটা এগিয়ে কোন অকাট্য তথ্য ও প্রমাণ হাতে নিয়ে আমার কাছে আসবেন। আমি অবশ্যই সাহায্য করব।

একমাস যুবকটির দেখা পাওয়া গেল না। একমাস পর সে থানায় এসে অফিসারকে বলল, আমি প্রমাণ পেয়েছি। আমাদের বাড়ির এক পুরনো চাকর আমাকে খুব ভালবাসে। সেই প্রথমে আমাকে বাবার গোপন উইলের কথা জানায়। পরে আমি জানতে পারি বাবা পুরোহিতের সঙ্গে আমাদের গাঁয়ের কবরখানায় আমার মার কবরের কাছে এক একদিন গভীর রাতে যান। সেখানে মার প্রেতাত্মার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। আমার মার ক্ষয়-রোগে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। মৃত্যুর পর মাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। আমি খবর নিয়ে জেনেছি আমার বাবা আজ রাতেই আবার চার্চের যাজকের সঙ্গে সেখানে যাবেন।

অতএব এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। আপনাকেও সেই রহস্য ও চক্রান্তের কথা ফাঁস করতে হবে।

অফিসার বললেন, আজ আমি যাব। কারণ আজ আপনার কথার মধ্যে

যথেষ্ট যুক্তি আছে। আপনি সন্ধ্যে আটটা বাজলেই তৈরি হয়ে আমার অফিসে চলে আসবেন। কাউকে কোন কথা বলবেন না।

রাত্রি ঠিক এগারোটার সময় ওরা চারজন একটি ঢাকা গাড়িতে করে রওনা হলো সেই গাঁয়ের দিকে। ওরা মানে অফিসার বা পুলিশ ডিরেক্টর, যুবকটি, একজন পুলিশ সার্জেণ্ট আর একজন কনষ্টেবল।

কবরখানায় যখন ওরা পৌছল তখন ঘড়িতে বাজে রাত্রি এগারোটা। অন্ধকার রাত। যুবকটি কোনরকমে তার মার কবরটা কোথায় দেখিয়ে দিল। কবরখানার ভিতরে যে প্রার্থনা-ঘর ছিল সেই ঘরের ভিতরে এক কোণে অফিসার আর যুবকটি লুকিয়ে রইল। বাকি দুজন পুলিশ একটা খালের মধ্যে বসে রইল লুকিয়ে।

সাড়ে এগারোটা বাজতেই যুবকটির বাবা আর চার্চের যাজক একটা লণ্ঠন হাতে এসে প্রার্থনার ঘরে গিয়ে প্রথমে মৃতের জন্ম নির্দিষ্ট প্রার্থনা করল। তারপর কবরখানায় গিয়ে যুবকটির মার কবরটাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করল। তিনবার পবিত্র ধর্মীয় জল ছিটিয়ে যাজক কিছুটা দূরে গিয়ে বসে তিনবার কি একটা উচ্চারণ করল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সেই কবরটার উপর ধোঁয়া উঠছে। তারপরেই এক প্রেতমূর্তির আবির্ভাব হলো সেখানে। যাজক চীৎকার করে বলল, তোমার নাম কি?

প্রেতমূর্তি বলল, জীবিতকালে আমার নাম ছিল এ্যানা মেরিয়া।

যাজক বলল, তুমি এখনো পার্গেটারি বা পরিশুদ্ধি রাজ্য থেকে মুক্তি পাওনি?

প্রেতমূর্তি বলল, না, আমার নাস্তিক পুত্র শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমি মুক্তি পাব না।

যাজক বলল, কিন্তু সে ত শাস্তি পেয়েছে। তোমার পুত্রকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন তোমার স্বামী।

প্রেতমূর্তি বলল, এটা যথেষ্ট নয়। সেই উইল আদালতে জমা দিতে হবে আর পুত্রকে ঘর থেকে তাড়াতে হবে।

যাজক বলল, কিন্তু তা কিরূপে সম্ভব?

এ কথার কোন উত্তর দেবার আগেই পুলিশের বাঁশি বেজে উঠল। আর সেই প্রেতমূর্তি চীৎকার করে উঠল। পুলিশ ডিরেক্টর নিজে গিয়ে তার ঘাড় ধরে ফেললেন। অন্যান্য পুলিশরা ছুটে এল। যাজককে তাদের বিভাগীয় বিচারের অধীনে রাখা হলো। যুবকটির বাবা সেদিন থেকে ক্যাথলিক চার্চের উপর হতে সব বিশ্বাস হারিয়ে প্রোটেস্ট্যাণ্ট হয়ে যান। তিনি সব ভুল বুঝতে পারেন এবং তাঁর ছেলের কাছে ক্ষমা চান।

এক অভিনব সংবেদন

[A strange sensation]

মাদাম দ্য অরমন্দের মাথায় যেন ঠিক একটা শয়তান বাস করত। কত যে অদ্ভুত খেয়াল খুশি সব সময় কিলবিল করত তার মাথায় তার কিছু ঠিক ছিল না। সে যে কিসে খুশি হয় আর কিসে অখুশি হয় তা কেউ বুঝে উঠত না।

মাদাম অরমন্দের গড়নটা বেশ ছিপছিপে ধরনের। একটা সুক্ষ্মমেদুর সৌন্দর্যের ঢেউ খেলে যেত তার সারা দেহে। তার রোগা-রোগা সুন্দর হাতের আঙুলগুলোতে সব সময়ে একটা সুগন্ধি লেগে থাকত। অনেকে সে আঙুল চুম্বন করার জন্য পাগল হয়ে উঠত। তার মাথার চুলগুলোর রং ছিল সোনালী আর তা ছিল রেশমের মত নরম। হাসার সময় যখন তার ছোট মুখটা খুলত অরমন্দে তখন মনে হত সকালের আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে প্রসন্ন সূর্যালোক।

কোন একটা বিশেষ বস্তুতে যদি প্রীত হত মাদাম অরমন্দে তাহলে তাকে তুষ্ট করা বা খুশি করা সহজ হত অনেকের পক্ষে। কিন্তু অরমন্দের মনের আসল ঠিকানা আজও কেউ খুঁজে পায়নি। কেউ ঠিক ধরতে পারেনি সে কি পেলে সন্তুষ্ট হয়, তৃপ্ত হয়। আর একথাটা জানতে না পারার জন্যই হয়ত তার ভক্তের দল বেড়ে যেত। যে সব শক্ত ধাতের পুরুষ মেয়েদের কাছে কখনো ধরা দেয় না বলে বড়াই করে বেড়াত তারাও মাদাম অরমন্দেকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করত।

কিন্তু সে চেষ্টার দিক থেকে জেভিয়ার দ্য ক্রন্তেন স্বচ্ছন্দে হার মানিয়ে দিয়েছিল আর সবাইকে। মাদাম অরমন্দের মন তাকে জয় করতেই হবে। অরমন্দে যেন তার কাছে ছিল এক সাধনার বস্তু। যে অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে তীর্থযাত্রী তার উপাস্য দেবতার মন্দিরের পানে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এগিয়ে যায় সে প্রতিজ্ঞা জেভিয়ারের মনেও ছিল। তার বাসনা পূরণ না করে সে ছাড়বে না।

অরমন্দের ছোট বড় যেকোন ইচ্ছা বা বাসনাকে পূরণ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকত জেভিয়ার। অরমন্দে যা চাইত তাই সে এনে দিত। অথবা দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত।

ক্রমে সত্যি সত্যিই অরমন্দের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল জেভিয়ার। তার নিরন্তর সাধনার তাপে অরমন্দের পাথরের মত শক্ত অন্তরটা গলতে শুরু করল। মাদাম অরমন্দে একদিন তাকে বলল, আমি একসঙ্গে বেশীক্ষণ ভালবাসার কথা ভাবতে পারি না। যদি পাঁচ মিনিট ধরে কখনও কাউকে ভালবাসতে পারি একসঙ্গে একটানা তাহলে জেনে রেখো তোমাকেই ভালবাসব।

কিন্তু এত করেও মাদাম অরমন্দের একটা বাসনা মেটাতে পারেনি জেভিয়ার। জেভিয়ার ছিল অবিবাহিত। সে যে ফ্ল্যাটটায় ভাড়া থাকত মাদাম অরমন্দের সেটা পছন্দ হল না। সেখান থেকে চারদিকের শহরটা দেখা যেত। নানা কলরব কানে আসত। মাদাম চাইত দূর নির্জন কোন গ্রামাঞ্চলে একটা সাজানো বাড়িতে গিয়ে মিলিত হবেন দু'জনে। মাদামের মতে প্রেমিক প্রেমিকাদের মিলনের স্থান হবে যেমন নির্জন তেমনি মনোরম। মিলনের সময় এমন এক মধুর অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, এমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব রস আস্বাদন করবে যার কথা সারা জীবনে তারা কখনো ভুলতে পারবে না।

একদিন সন্ধ্যের সময় একটা মেলায় বেড়াতে গিয়েছিল দু'জনে। হঠাৎ এক ভ্রাম্যমান জ্যোতিষের গাড়ি দেখতে পেয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জ্যোতিষ মাদাম অরমন্দের কাছে এসে বলল, আমি আপনার জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব বলে দেব। একটা প্রশ্নের উত্তর চাইলে আমি নেব পাঁচ ফ্রাঁ, আর সারা জীবনের সবকিছু জ্ঞাতব্য বলে দিলে নেব কুড়ি ফ্রাঁ। গাড়ির ভিতর নির্জন বসার জায়গা আছে। পরীক্ষা করতে পারেন।

জেভিয়ার অরমন্দেকে বলল, তোমার ভাগ্য গণনা করে নাও।

মাদাম অরমন্দে আপত্তি করল না। জেভিয়ার গাড়ির দরজা খুলে দিল। দু'জনে ঢুকে পড়ল। ভিতার ঢুকে অবাক হয়ে গেল অরমন্দে। এই রকম একটা সাজানো নির্জন ঘর যেন সে চাইছে দীর্ঘদিন ধরে। মাঝখানে পাতা সারা টেবিলটা শুধু গোলাপে ভর্তি। চারদিকে চারটা চেয়ার। চমৎকার এক সুগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে মন। একদিকে একটা বিছানা। খাবার ব্যবস্থা।

জেভিয়ার নিচু গলায় বলল, কী, পছন্দ হয়েছে?

কোন কথা না বলে চুম্বনের জন্য তার ঠোঁটদুটো জেভিয়ারের মুখপানে এগিয়ে দিল মাদাম অরমন্দে।

গুণ

[Virtue]

বেলা এগারোটা বাজতেই সে প্রতি শুক্রবারে আসত। ব্যারাকবাড়ির মত বিরাট বাড়িটার মাঝখানে উঠোনে এসে প্রথমে সে মাথার টুপীটা খুলে রাখত। তারপর সিটারটা হাতে তুলে নিয়ে গান ধরত। আখ্যানমূলক ভাল ভাল গীতি-কবিতা। অপূর্ব তার কণ্ঠের মাধুর্য।

তার গান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকের ঘর হতে মেয়েরা জানালা দিয়ে উঁকি মারত। কতজন পয়সা ফেলে দিত তার টুপীটা লক্ষ্য করে।

তার গানের সুরের মধ্যে একটা আশ্চর্য কল্পলোকের ছবি যেন স্পষ্ট ভেসে উঠত। সে ছবি যেন হাতছানি দিয়ে চারদিকের ঘর হতে মেয়েগুলোকে ডেকে বলত, এস, এস তোমরা। সে এক অপূর্ব মায়াময় জগৎ যেখানে সৌন্দর্যের ফুল কখনো শুকোয় না, যেখানে প্রেমের মালা কখনো ছিঁড়ে যায় না।

ঐসব মেয়েরা যে জগতে বাস করত সে জগৎটা ভীষণ নোংরা এবং অবাঞ্ছিত বলেই হয়ত গানের সুরে ভেসে ওঠা সেই কল্পনায় গড়া সুন্দর জগতের ছবিটা এত ভাল লাগত ওদের। তাই বোধহয় তার গানের আবেদনটা এত গভীর হয়ে উঠত ওদের কাছে। ওরা যে প্রেমের স্রোতে পা দিতে পারে না, সেই চিরন্তন ও চিরবাঞ্ছিত প্রেমের এক নিবিড় আশ্বাস যেন স্পষ্ট ফুটে ওঠে ওর গানে।

ওই অন্ধ ভিক্ষুক যখন গান গায় তখন ও দেখতে পায়না সেই সব মেয়েদের চোখে বিদ্যুতের মত চকিতে খেলে যায় এক অলৌকিক প্রেমের আগুন। মেয়েরা বলাবলি করত, লোকটি সত্যিই সুন্দর। সুন্দর সুঠাম চেহারা, সুন্দর চোখ।

প্রতি শুক্রবার ও আসে, গান গেয়ে চলে যায়। পয়সাগুলি সব কুড়িয়ে টুপীতে ভরে নেয়। একদিন ওর যাবার আগে একটি মেয়ে সাহস করে এগিয়ে এসে বলল, তুমি আমার ঘরে এস। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের ঘর হতে অসংখ্য কণ্ঠ জানালা দিয়ে ভেসে এল, আমার ঘরে, আমার ঘরে।

তখন একজন বলল, ওকে বেছে নিতে দাও কার ঘরে যাবে।

কিন্তু গায়ক বলল, আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারো ঘরে যাওয়া। আমি একজনের বা একে একে সবার ঘরে যেতে পারব না।

তখন সেই মেয়েটি বলল, কেন যেতে পারবে না, তার কারণ বল ?

গায়ক বলল, তোমাদের দয়া আমি ভুলব না। কিন্তু আমি তোমাদের কারো ঘরেই যেতে পারব না। কারণ আমার ঘরে তোমাদের মত আমার নিজের দুটি মেয়ে আছে।

এই বলে সোনা ও রূপোর মুদ্রাগুলি সব কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল গায়কটি।

চোর

[The thief]

ডাক্তার সবিয়ার বললেন, আমি মনে করি কোন নিষ্পাপ নির্দোষ তরুণীর শালীনতা নষ্ট করা যেকোন হীন অপরাধযোগ্য কাজের মতই দণ্ডনীয়। মেয়েদের এমন একটা বয়স থাকে যখন তাদের দেহে আসে প্রথম যৌবনের উন্মাদনা আর তার ফলে তাদের দেহ-মন এমনই দুর্বল থাকে যে তারা তখন কোন চতুর পুরুষের প্রলোভন প্রতিরোধ করতে পারে না। তখন অনাঘ্রাত পুষ্পের মত তার কামনাচঞ্চল দেহটি ভীত হরিণশিশুর মত কাঁপতে থাকে। তখন সামান্য উত্তেজনায় সে যেকোন নায়কের মুখের দিকে চুম্বনের জন্য তার অধরোষ্ঠ দুটি বাড়িয়ে দেয়। তখন তার কাজের পরিণাম সম্বন্ধে কোন চৈতন্য থাকে না মনে।

ডাক্তার আরও বললেন, কোন বাড়িতে তালা ভেঙে চুরি করা যেমন অপরাধ, ছলনাময় কথার দ্বারা ধীরে ধীরে কোন নির্দোষ তরুণীকে প্রলুব্ধ করে তার সতীত্ব নষ্ট করাও তেমনি অপরাধ।

অনেকে অবশ্য বলবে, এ সব কাজে মেয়েরাও কম পাপী নয়। অর্থাৎ অনেক সময় মেয়েরাও অগ্রণী হয়ে পুরুষকে বাধ্য করে এই ধরনের পাপকাজে। অনেক সময় অনেক পুরুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নারীরা তাদের প্রলুব্ধ করে, তাদের ছলনার দ্বারা মুগ্ধ করে কুপথে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রেও আমি পুরুষদের একেবারে নির্দোষ নিরপরাধ সাব্যস্ত করি না। এই সব ক্ষেত্রেও পুরুষেরা একটা দোষ বা দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে পারে না।

কাজটা অবশ্য খুবই কঠিন। ইউলিসেস যেমন তার সমুদ্রযাত্রাকালে সাইরেনদের মায়াময় গান শুনে আকৃষ্ট হয়েছিল তেমনি পুরুষরাও মেয়েদের না দেখে বা তাদের কথা না শুনে পারে না। সে সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে আপন নীতিবোধ ও যুক্তিবোধের পরিচয় দেওয়া যেকোন পুরুষের পক্ষেই কঠিন কাজ। কোন সুন্দরী নারীর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কোন পুরুষ যখন কামনার স্রোতে ভেসে যায় তখন তার অপরাধের গুরুত্ব ও পরিণাম বিচার করে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না তার পক্ষে। আমার মত পক্ক-কেশ-বিশিষ্ট বয়োঃপ্রবীণ লোকও হয়ত শেষ পর্যন্ত তা পেরে উঠবে না।

আমি একজনকে চিনি যে এই ধরনের এক কাজে জড়িয়ে পড়ে এক ভয়ঙ্কর পরিণামের সম্মুখীন হয়। আমি যার কথা বলছি সে ছিল বড়ই

আমোদপ্রিয় এবং মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে সে বহু টাকা জীবনে নষ্ট করে। আমার থেকে তার বয়স অনেক কম ছিল, তাই আমি তাকে স্নেহ করতাম। প্রেমের ব্যাপারে তার উদ্যমের অন্ত ছিল না। এ ব্যাপারে অসংযত অর্থহীন আতিশয্য দেখেও তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারিনি আমি। অথচ সে নিজেও প্রেম কি জিনিস তার আস্বাদ পায়নি এত মেয়ের সংস্পর্শে এসেও।

একবার সে একটি ভদ্রঘরের তরুণীর সংস্পর্শে এল। তাদের মধ্যে ভালবাসা গড়ে উঠল। যুবকটি এতদিনে বুঝল প্রকৃত ভালবাসা কি জিনিস।

মাঝে মাঝে এখানে সেখানে ক্ষণিকের জন্য মিলন ঘটত তাদের। কিন্তু তাতে তাদের তৃপ্তি হত না। তারা চাইত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কোন নির্জনে বসে অবাধে প্রেমালাপ করতে। তাই মেয়েটি গভীর রাত্রিতে তাদের বাড়ি যাবার জন্য অনুরোধ করল যুবকটিকে। কিন্তু যাতায়াত করতে হবে গোপনে যাতে বাড়ির কেউ জানতে না পারে। মেয়েটি দরজা খুলে রাখবে। তবে তার প্রেমিককে বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে অন্ধকারে তাদের বাড়ি ঢুকতে হবে।

যুবকটি প্রথমে একাজে রাজী হয়নি। এত বিপদের ঝুঁকি সে নিতে চায়নি। কিন্তু মেয়েটির দ্বারা বারবার প্ররোচিত হয়ে সে ঠিক থাকতে পারেনি শেষ পর্যন্ত।

কিছুদিন সে এইভাবে যাতায়াত করতে থাকে। কিন্তু একদিন গভীর রাত্রিতে এইভাবে চোরের মত বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগান পার হয়ে বাড়ি ঢুকে একটি ঘরের আসবাবের উপর সে অন্ধকারে ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। আসবাবের কাঁচ ভেঙে যায়। সেদিন ঘটনাক্রমে মেয়েটির মা তখনো জেগে ছিলেন। তিনি শব্দ পেয়ে তাঁর স্বামী ও চাকরদের ডেকে তোলেন। যুবকটি তখন ভেবে ঠিক করে, এমত অবস্থায় সে চোর অপবাদ নেবে। নিজের চুরির কথা স্বীকার করবে তবু তাদের প্রেমের কথা বলে তার প্রেমিকাকে লোকচক্ষে হেয় করবে না।

এই কথা ভেবে সে পালানো অসম্ভব দেখে বসার ঘরের ভিতরে একটা পিয়ানোর আড়ালে লুকিয়ে রইল। চাকররা আলো নিয়ে বাড়ির সর্বত্র খুঁজতে খুঁজতে তাকে পেয়ে গেল। তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। যুবকটি থানায় গিয়ে স্বীকার করল সে সত্যিই চুরি করতে গিয়েছিল।

বিচারে যুবকটির কারাবাস হয়। কারাগারেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে সে পুরোহিত ডেকে উইল করে তার অবশিষ্ট সম্পত্তি সব আমাকে দিয়ে যায় আর একটি চিঠি লিখে সমস্ত ঘটনা যথাযথভাবে বিবৃত করে যায়।

আমার ধারণা মেয়েটি হয়ত পরে ভাল জায়গায় বিয়ে করে সতীনারীর

আখ্যা পায়, এবং তাদের ছেলেদের সততার শিক্ষা দেয় নিজেদের অতীত জীবনের দৃষ্টান্ত তুলে।

শোচনীয় সাদৃশ্য

[Unfortunate likeness]

যে রংঝরা গোধূলির আলোয় সুন্দরী নারীদের অনাবৃত গ্রীবাদেশগুলি ফুটন্ত ফুলের মত দেখায় সেই রকম কোন এক রংঝরা গোধূলিতে পেসকারেন আমাকে তার জীবনের একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনিয়েছিল।

পেসকারেন বলল, শহরের সবাই জানত আমি মেয়েটির খপ্পরে পড়ে গেছি। কোন কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে কোন পাখিশিকারী যেমন অপরিণামদর্শী পাখিদের ধরে ফেলে তেমনি মেয়েটি আমাকে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তার ছলনার জালে ধরে ফেলে। সে জাল প্রথমে ছিঁড়তে পারিনি আমি। কারণ মেয়েটির বিড়ালের মত নরম দেহ, সুন্দর চোখের আবেশজড়ানো স্বপ্নালু দৃষ্টি, তার মিষ্টি হাসি, তার নীল শিরাওয়ালা শুভ্র নিটোল হাত পাগল করে তুলত আমায়। তখন আমার মনে হত তার মত সুন্দরী মেয়ের ভালবাসা পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। কথাটা শুনে তোমরা এখন আশ্চর্য হবে। কারণ এখন আমি তোমাদের বিজ্ঞের মত অনেক নীতি উপদেশ দিই। সাবধান করে দিই তোমাদের প্রেমের ব্যাপারে।

কিন্তু এখন আমি যাই বলি তখন কিন্তু সেই সুন্দরীর রূপলাবণ্যের প্রভাব হতে মুক্ত করতে পারিনি নিজেকে। তার ডাকনাম ছিল লুসি। ভাল নাম পনেল।

থিয়েটারে একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথম দিনেই আমি লুসিকে নিয়ে সে নাটক দেখতে গেলাম। তার মাও সঙ্গে গেল। লুসি আর তার মা পাশাপাশি এক জায়গায় বসল। আমি বসলাম ওদের পিছনের একটি আসনে।

আমি লুসির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। মঞ্চের দিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। সেদিকে আমার কোন আগ্রহ ছিল না। মঞ্চের কোন অভিনয়ের কথাও আমার কানে আসছিল না। আমি শুধু লুসিকে দেখছিলাম। তার অনাবৃত গ্রীবা, মাথার চুল, মুখের পার্শ্বদেশ আমি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখ পড়ল লুসির পাশে বসে থাকা তার মায়ের উপর। দেখে মনে হলো অবিকল লুসি। মনে হলো আসলে লুসিই

যেন তার হঠাৎ যৌবন হারিয়ে বয়োপ্রবীণ হয়ে তার মার রূপ ধারণ করেছে।

আমার হঠাৎ মনে হলো লুসি আমাকে ঠকিয়েছে। সে যে রূপের ফাঁদ পেতে আমাকে ধরেছে, লাবণ্যের যে কপট ছলনার দ্বারা মুগ্ধ করে এসেছে তা সব মিথ্যা, তা সব ভুল। আসলে তার ঐ বিগতযৌবনা মার বর্ষীয়সী রূপ-টাই লুসির আসল রূপ। দুদিন পরে তার ক্ষণজীবী যৌবনসৌন্দর্যের কপট জালটাকে ছিঁড়ে দিয়ে তার ঐ আসল রূপটাই উপহাস করতে থাকবে আমাদের।

আমি এইভাবে লুসির আসল রূপটাকে তার মার দেহাবয়বের মধ্যে দেখতে পেয়ে তাদের কোন কিছু না বলে ধীরে ধীরে সেই প্রেক্ষাগৃহ হতে বেরিয়ে এলাম।

আমার কথা শুনে এক যুবতী বলেছিল, আমি কখনো আমার মার সঙ্গে কোন থিয়েটারে যাব না।

সাদা গীর্জায় এক রাত্রি

[A night in the white chapel]

আমি আর আমার বন্ধু নেজাস্তে দুজনেরই বয়স পঁচিশ। আমরা তখন লণ্ডনে বেড়াতে গিয়েছিলাম দুজনে। লণ্ডন ভ্রমণ জীবনে আমাদের এই প্রথম।

সেদিন ছিল ডিসেম্বরের এক সকাল। দারুণ ঠাণ্ডা। পথে বরফ পড়ছে। ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। এত ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পারার জন্ত আমরা দুজনেই খুব বেশী করে মদ খেয়েছিলাম। আমরা কেউ কোন কথা বলতে পারছিলাম না। বলার প্রয়োজনও ছিল না। আমরা যেন পরস্পরের মুখ দেখে পরস্পরের মনের কথা সব বুঝতে পারছিলাম।

আমরা প্রথমে একটা মদের দোকানে ঢুকেছিলাম। কারণ আমাদের ধারণা ছিল সেখানে আমরা বিভিন্ন রকমের মানুষের আচার আচরণ ও বেশ-ভূষার সঙ্গে পরিচিত হব। কিন্তু সেখানে গিয়ে হতাশ হলাম আমরা।

হতাশ হয়ে আমরা আর একটা দোকানে গেলাম। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। পরে দেখলাম আমরা তার মধ্যে যা যা দেখেছি শুনেছি তার কিছুই মনে নেই। শুধু আমাদের মনের ধোঁয়াটে পটটার উপর অসংখ্য অস্পষ্ট ছবি একের পর এক করে ভেসে যাচ্ছিল।

কুয়াশাচ্ছন্ন পথে আমরা টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বুকের

উপর একটা ধাক্কা লাগায় আমি চমকে উঠলাম। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম আমরা একটা বাড়ির দরজার সামনে এসে পড়েছি। বাড়ির সদর দরজার অর্ধেকটা খোলা আর আধখোলা দরজা দিয়ে এককালি আলো এসে পড়েছিল কুয়াশাচ্ছন্ন প্রায়ান্ধকার পথটার উপর। হঠাৎ এবার আমাদের নজরে পড়ল একটি মেয়ে আমাদের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, ভাল করে দেখলাম মেয়েটি যুবতীই বটে। তার ছেঁড়া ময়লা পোশাকের ফাঁক দিয়ে স্ফীত বক্ষস্থলটা দেখা যাচ্ছিল। তার গালের চামড়াটা ছিল মসৃণ। সে যখন হাসছিল তখন তার সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু একটা জিনিস কোনমতে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মেয়েটির চুলগুলো একেবারে সাদা। তবে কি ভিন্ন জাতির রক্তের মিশ্রণে জন্ম হয়েছে ওর? আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম মেয়েটির চোখের উপর কোন ভ্রূ নেই। ওর দেহে যত যৌবনই থাক ওর মাথার চুল আর চোখের দিকে তাকালে ওকে বুড়ী বলে মনে হবেই। মনে হত সুদীর্ঘ দিন ধরে ক্রমাগত দুঃখ দারিদ্র্য আর দুশ্চিন্তা ভোগ করে মেয়েটি এমন এক অকাল বার্ধক্যের মাঝে এসে পড়েছে যে বার্ধক্য আজও ওর দেহটাকে আক্রমণ ও জব্দ করতে না পারলেও ওর মাথার চুলে আর চোখে এক অভ্রান্ত চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে আছে।

আমার বন্ধু লুদান্তেক আর আমি মেয়েটির চেহারা দেখে নানারকম চিন্তা করতে লাগলাম। ওর এই অদ্ভুত চেহারার সম্ভাব্য-কারণ সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবলাম। তারপর দুজনেই একবাক্যে বলে উঠলাম, হায় বেচারী!

তার ছিন্নমলিন পোশাকের দীনতা তার বয়সটাকে যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার পায়ে কোন জুতো ছিল না। মাথায় ছিল বেতের টুপী, গায়ের শেমিজটা ছেঁড়া। তবু মদের নেশার অপরিহার্য নিবিড়তায় আমাদের যুক্তিবোধ এমনই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে আমরা মেয়েটার মোহ থেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না নিজেদের। উল্টে তার হাসি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তার বয়সের কথা ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে। ভুলে গিয়েছিলাম তার দাঁতগুলো ঝকঝকে হলেও তার ঠোঁটদুটো বুড়ো মানুষের মতই মলিন।

আর একটা কথা মনে হলো আমার। মনে হলো মেয়েটি যেন আমাদের থেকেও বেশী মদ খেয়েছে। আমরা তবু দুই-একটা কথা বলতে পারছিলাম। কিন্তু মেয়েটা একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেনি মুখ থেকে। তবু আমরা তার শুধু হাসিটা দেখে আসক্ত ও বেশ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

একসময় থাকতে না পেরে আমরা দুজনেই দুদিক থেকে মেয়েটির একটি করে হাত ধরে ফেললাম। কিন্তু মেয়েটা প্রথমে আমাদের কবল থেকে নিজের হাত দুটো একঝটকায় ছিনিয়ে নিয়ে পিছনে চলে গেল কিছুটা। কিন্তু পরক্ষণেই এগিয়ে এসে আমাদের হাত ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল।

কোথা হতে কি ঘটে গেল আমরা তার কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমাদের চেতনার মধ্যে এমন কোন স্বচ্ছতা ছিল না যার দ্বারা সব ঘটনা ও আচরণের তাৎপর্য ঠিকমত বুঝতে পারি। আমরা বুঝলাম একটা ঘরের মধ্যে মেয়েটির সঙ্গে গিয়ে বসে পড়লাম। আমরা দুজনেই ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম। মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাদের বন্দী করে কোথায় নিয়ে এসেছে। তবু আমাদের দুঃখ বা অভিযোগটা কি তার কিছুই জানতে পারিনি।

সেই ঘরেই আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সারা রাত ধরে ঘুমিয়েছিলাম আমরা। ভোরের আলো ফুটে উঠতে লুদাস্তেক আমায় ধাক্কা দিয়ে জাগাল। আমি আর মেয়েটা মরার মত পড়ে রয়েছি। তার মাথাটা বালিশ থেকে ঢলে পড়েছে। তার সাদা চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। লুদাস্তেক বলল, মেয়েটা মরে গেছে। চল আমরা পালিয়ে যাই।

আমি মেয়েটির বিছানায় গিয়ে ভাল করে তাকে দেখলাম। তার মাথাটা বালিশের উপর তুলে দিলাম। দেখলাম সে মরে যায়নি। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার সাদা চকচকে দাঁতগুলো তবু দেখা যাচ্ছিল। তার দাঁত আর বুকের গড়ন দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার বয়স ষোলর বেশী ত হবেই না বরং কম হবে।

আমার মনে হলো লুদাস্তেকের নেশা তখনো ছোটেনি। সে আমার একটা হাত ধরে বলল, চল চলে যাই। মেয়েটার পাশে আমি শুয়েছিলাম। ও বুড়ী নয়। আমি আজ রাতেই তিন চারটে ছেলেমেয়ের জন্ম দান করেছি এবং খুঁজে দেখ এই ছেলে মেয়েগুলো সব এখানেই আছে।

এই বলে এখানে সেখানে কাঁথাঢাকা শুয়ে থাকা ছেলেমেয়েগুলোকে টেনে বার করল লুদাস্তেক। একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটার ঘুমন্ত দেহের উপর উঠে বসল।

আমি পকেট থেকে একটা মুদ্রা বার করে ঘরের মেঝের উপর ফেলে দিয়ে চলে এলাম ঘর থেকে। লুদাস্তেককে বললাম, ওই সব ছেলেমেয়েগুলি মেয়েটির ভাইবোন। ও তাদের প্রতিপালন করে।

শেষ চিহ্ন

[The relies]

বিরাট সমারোহ সহকারে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হলো। এক জাতীয় শোকে যেন ফেটে পড়েছে সমস্ত শহরটা। যে বীর সৈনিক দেশের জন্য আপন জীবন দান করে এক নূতন অধ্যায় সংযোজন করে গেছে সেই বীর সৈনিকের

মত সমান মর্যাদা দান করা হলো তাকে। তাঁর মৃতদেহটাকে কফিনে করে সমাধিক্ষেত্রে সেই সব সেনানায়কদের সমাধির পাশে রাখা হলো যাদের প্রত্যেকের নাম আর সামরিক কৃতিত্বের একটি করে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা আছে প্রস্তরফলকে।

রাত্রি সেদিন অন্ধকার হলেও আকাশ ছিল উজ্জ্বল। সেই উজ্জ্বল নীল আকাশে নক্ষত্ররা কিরণ দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ছিল দু-একটা নক্ষত্র আর তাই দেখে অনেকে মানবাত্মার দেহত্যাগের কথা ভাবছিল হয়ত। একদল অশ্বারোহী মৃতদেহটির কফিনটি পাহারা দিচ্ছিল নিষ্ঠার সঙ্গে।

তাঁর নাম ছিল রামেল। তিনি বই লিখতেন। রাজনীতির বই। সে বইয়ে থাকত মানুষের মুক্তির বাণী। সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতা—যে তিনটি শব্দ মন্ত্রের মত কাজ করত সাধারণ মানুষের মধ্যে। এক স্বর্ণযুগের সন্ধান দিত সকলকে। সেই তিনটি শব্দের গৌরবময় তাৎপর্যটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতেন তিনি। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলি ধর্মশাস্ত্রের মত পরিগণিত হল দেশবাসীর কাছে। তাই তাঁর মৃত্যুতে তাঁকে দেওয়া হলো রাষ্ট্রনেতার মর্যাদা।

তিনি একজন বিশুদ্ধচরিত্র চিন্তাশীল দার্শনিকের মত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন। জীবনে বিবাহ করেননি অথবা কোন নারীর ছলনার ফাঁদেও কখনো পা দেননি। সাধারণতঃ কোন কোন নিঃসঙ্গ সাধু সন্ন্যাসীদের জীবনে এমন এক একটি ছলনাময়ী নারীর আবির্ভাব ঘটে যারা তাদের চোখে জ্বলন্ত কামনার এক নির্লজ্জ আগুনের অন্ধ আলোয় তাদের অন্তরের নগ্নতাটাকে উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত করে তোলে। তাদের ফাঁদে পা না দিয়ে পারে না সেই সব সাধু সন্ন্যাসীরা।

তবে রামেল অবশ্য একটি ভুল করেছিলেন। সারা জীবনের মধ্যে মাত্র একটি ভুল। রামেল তখন যে আদর্শ তাঁর লেখার মধ্যে বক্তৃতার মধ্যে প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন সারা দেশ জুড়ে সেই আদর্শকে রূপায়িত করতে গিয়ে একেবার নির্বাসনদণ্ড ভোগ করেন। দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি তখন বাস করতেন ইতালির এক ছোট্ট গাঁয়ে। সেই গাঁয়ের পেপা নামে কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেলেন রামেল। অকস্মাৎ দেহমিলন হয় তাঁদের আর তার ফলে এক পুত্রসন্তান জন্ম নেয় পেপার গর্ভে।

রামেল কিন্তু এ ঘটনা গোপন রাখেন। পেপাকেও বলতে দেননি। অবশ্য রামেল যখন জাতীয় সরকারে সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত তখন তাঁর সন্তানের ভরণপোষণ ও উপযুক্ত প্রতিপালনের জন্য পেপাকে প্রতি মাসে মোটা রকমের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। পেপা সত্যিই শ্রদ্ধা করত রামেলকে। রামেলকেই সে তার স্বামী বলে জানত এবং আর বিয়ে করেনি। তার সন্তানকে মানুষ করে তোলাই ছিল তার জীবনের ব্রত। রামেলের বই খাতা কলম আসবাবপত্র প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্নগুলি অতি যত্ন করে রেখে দিয়েছিল তার ঘরে।

তার ছেলেকে মানুষ করার জন্য মোটা টাকা দিয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করেছিল। দেখাশোনার জন্য দু'তিনজন চাকর রেখেছিল।

কিন্তু রামেলের পুত্র হয়ে উঠল তার ঠিক বিপরীত। বাল্যকাল থেকে সে হয়ে উঠল যেমন উদ্ধত তেমনি বিলাসী। সে মোটেই মার কথা শুনত না বা মার কাছে বাবার কথা শুনেও তার বাবাকে শ্রদ্ধা করত না।

এত চেষ্টা করেও ছেলেকে কোনরকমে মনেরমত করে গড়ে তুলতে পারেনি পেপা। দীক্ষিত করে তুলতে পারেনি তাকে স্বামীর আদর্শে। যৌবনে পা দিতে না দিতেই পেপা ও রামেলের কত সাধের সন্তান এমন একটি চটুল প্রকৃতির মেয়েকে ভালবেসে ফেলে যে তার কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়েও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে কোন এক রাজকুমারের বাহু-বন্ধনে ধরা দেয়।

একটি বিচ্ছেদ

[A rupture]

জেনে রাখ যা তোমাদের বলছি তা সব সত্যি। এই দুটি প্রেমিক প্রেমিকা যারা একদিন কপোতের মত কুজন করত দুজনে, যারা একদিন কত প্রেমের কথা শোনাত দুজন দুজনকে, আজ তারাই গভীরভাবে ঘৃণা করে পরস্পরকে। সত্যিই তাদের মধ্যে ঘটে গেছে পূর্ণ বিচ্ছেদ। অথচ যে কারণে এ বিচ্ছেদ ঘটেছে সেটা তুচ্ছ। সে তুচ্ছতাটা যদি ওরা ধরতে পারত তাহলে ওরা বিচ্ছেদের পরিবর্তে আরো ঘনীভূত করে তুলত ওদের জীবনটাকে।

আসল কথা হলো ঈর্ষা। সেই কুটিল ঈর্ষা যখন একবার কোন মানুষের মনের ভিতর ঢুকে পড়ে তখন সে কি আর কোন কথা শোনে? তার অভিযোগের উত্তরে তার স্ত্রী তখন যাই বলুক সে শুধু বলবে, 'তুমি মিথ্যা-বাদী। তুমি মিথ্যা কথা বলছ।' তখন স্ত্রীর কোন কথাই সে গ্রাহ্য করবে না, শুনবে না। এমন কি তার স্ত্রীর কোন কথা বলার সুযোগ দেবে না আত্মপক্ষ সমর্থনে। এমন কি রাগের মাথায় সে তার স্ত্রীকে আঘাত করতে যাবে। সুতরাং এতে তার স্ত্রী অবশ্যই রেগে যাবে। দুজনের রাগ ধীরে ধীরে চরমে উঠবে। অথচ রাগটা পড়ে গেলেও কেউ যেচে কাউকে কোন কথা বলতে পারবে না। কেউ আগে কথা বলবে না। ছোট হতে চাইবে না কেউ কারো কাছে। কাগজে লিখেও মনের কথাটা জানাবে না। ফলে এমন একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে যার থেকে ওরা কেউ বেরিয়ে আসতে

পারবে না। আর তার ফলে বিচ্ছেদ হয়ে উঠবে অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য। আর ঠিক তাই হয়েছিল আমাদের জোসিনে গাজেলেত্তে আর সারভাঁসের ক্ষেত্রে।

এই পর্যন্ত বলে লানী স্প্রিং আমার সামনে বসে তার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। সিগারেটের নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা তার মুখ আর চুলের চারপাশে যেন খেলা করে বেড়াতে লাগল। তার একটা হাতের উপর গালটা রেখে সে বলল, সত্যিই ব্যাপারটা বড় দুঃখের।

আমি বললাম, জোসিনে তোমাকে সব কথা বলেছে?

সে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা মজার। তুমি জান সারভাঁসে এমনই একজন লোক যার রসিকতার কোন শেষ নেই। সব সময়ই ঠাট্টা বিদ্রূপ আর রসিকতা করত। একবার শুরু করলে তার আর শেষ হবে না। তার এই রসিকতার ঠেলায় অস্থির ও পাগল হয়ে উঠল জোসিনে। তাকে ভাল করে খেতে বা ঘুমোতে দিত না সারভাঁসে। তবু জোসিনে অসহ্য সারভাঁসেকে একেবারে ছেড়ে যেতে চায়নি। তাদের সম্পর্কটা বজায় রাখতে চেয়েছিল। শুধু বাড়িতে তার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটায় সে শহরের একটা নির্জন অঞ্চলে একটা ঘর ভাড়া করেছিল। সে সেখানে দিনের বেলায় প্রায়ই গিয়ে বিশ্রাম করত। প্রাণ ভরে সাধ মিটিয়ে ঘুমোত। ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল সে তার স্বামীর কাছে।

জোসিনে তার ভাড়াবাড়িতে যখন বিশ্রাম করতে যেত তখন তার স্বামীকে বলে যেত সে মফঃস্বলের এক শহরে তার বৃদ্ধা পিসিকে দেখতে যাচ্ছে। তার পিসি নাকি হার্টের অসুখে ভুগছেন। এবং সে ছাড়া তাঁর কোন আত্মীয় নেই। প্রথম প্রথম কোন সন্দেহ করেনি সারভাঁসে। কিন্তু একদিন দুপুরে বাড়ি ছেড়ে সেখানেই গিয়ে ঘুমিয়ে যায় জোসিনে। তার ঝি. তাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেয়নি। তার ফলে বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় দুপুর হয়ে যায়। দীর্ঘ নিদ্রার ফলে তার চোখ দুটো লাল হয়ে পড়ে ও ফুলে যায়। তাকে দেখে সন্দেহ হয় সারভাঁসের। তার প্রশ্নের ঠিকমত জবাব দিতে পারছিল না জোসিনে। আসল কথাটা গোপন রাখার জন্য নানা মিথ্যা কথা বানিয়ে বলতে হচ্ছিল। 'কিন্তু তাকে মনে হচ্ছিল সে যেন মদ খেয়ে কোন বেশ্যালয় থেকে আসছে।

পরদিন সারভাঁসে কথাটা বন্ধুবান্ধবদের বলে। বন্ধুরা তখন তাকে জোসিনের বিরুদ্ধে নানারকম মিথ্যা অভিযোগ করে। বলে জোসিনের চরিত্র খারাপ। সে তারই কোন অবিবাহিত বন্ধুর ঘরে গিয়ে.ফূর্তি করে তার পয়সায়। সারভাঁসে নিজে তদন্ত না করে কোন বিষয়ে খোঁজ খবর না নিয়ে বন্ধুদের কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। একদিন সে স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন জোসিনে রেগে যায়। তখন সারভাঁসেকে আঘাত

দেবার জন্য সে মিথ্যা কথা বলে। সে বলে তার মত স্বামীকে সে ঘৃণা করে এবং সে সত্যিই আর একজনকে ভালবাসে। তখন সারভাঁসে ঘুষি পাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলে ওঠে, তার নাম কি বলতে হবে তোমায়।

জোসিনেও মিথ্যে করে বলে, তুমি তাকে ভালভাবেই জান।

আমি যদি ঠিক সেই সময়ে তাদের কাছে গিয়ে না পড়তাম তাহলে ব্যাপারটা চরমে উঠত।

এই ঘটনার পর ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ওদের দুজনেরই দেহে যৌবন আছে আর এ বয়সে সাথী পেতে বা তা খুঁজে নিতে দেরী হয় না। ওরা দুজনেই আবার ওদের মনোমত জীবনসঙ্গী খুঁজে নিয়ে ঘর করছে।

প্রমোদ ভ্রমণ

[A country excursion]

অবশেষে সেই আকাঙ্খিত দিনটি এসে গেল। আজ মঁসিয়ে দুফোরের জন্মদিন। আজ ওরা প্যারিস থেকে বেশকিছু দূরে গ্রামাঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে কোন এক রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খাবে। এ কথা আজ ওরা প্রায় পাঁচ ছ'মাস ধরে ভেবে আসছে।

মঁসিয়ে দুফোর একটা ঘোড়ার গাড়ি যোগাড় করলেন। তিনি নিজেই চালিয়ে নিয়ে যাবেন। উজ্জ্বল পোশাক পরে মাদাম দুফোর বসলেন স্বামীর পাশে। তাঁর ছত্রিশ বছর বয়সেও যৌবন ফেটে পড়ছিল তাঁর বলিষ্ঠ দেহে। তাঁদের একমাত্র সন্তান আঠারো বছরের তরুণী যুবতী ম্যাদময়জেল দুফোর বসেছিল তার প্রণয়ী হলদে চুলওয়ালা এক যুবকের পাশে। তার বুড়ি ঠাকুরমাও সঙ্গে ছিল তাদের।

সেন নদীর সেতুর উপর গাড়িটা গিয়ে উঠলে মঁসিয়ে দুফোর তাঁর স্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন, এবার আমরা শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে এসে পড়লাম।

সত্যিই দৃশ্যটা সুন্দর, দেখার মত। আবেগে ফেটে পড়লেন মাদাম দুফোর। সেতু পার হয়ে গাড়ি কুরবিভয়ের পথ ধরল। ডান দিকে সান্নয় পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আর্জেন্তিউল গীর্জা। সারবন্দী পাহাড়গুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে শুরু হয়েছে একালে গড়া কর্মেইন দুর্গের সীমানা। সামনে পথের প্রান্তে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে মাঠ আর সবুজ বন।

সকালের সূর্যের নরম রোদটা তখনো গরম হয়ে ওঠেনি। সূর্যের নরম ছটা-

গুলো যখন তাদের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ছিল তখন তাদের ভালই লাগছিল।
পথের ধারে একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত গাঁ দেখল। গাঁটা হয়ত কোন মহা-মারীতে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ভাঙাচোরা বাড়িগুলোর ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। আবার একবার সেন নদীর সেতু পার হতে হলো। সেতুর উপর গাড়িটা উঠতেই ওদের খুব ভাল লাগছিল। সূর্যের আলোয় মুক্তোর মত চকচক করছিল নদীর প্রবাহমান জলধারা। বাতাস এখানে আরো স্বচ্ছ, কোনদিকে কোন চিমনির ধোঁয়া নেই।

পথের ধারে পৌলিন নামে এক রেস্তোরাঁ পাওয়া গেল। মঁসিয়ে দুফোর তাঁর স্ত্রীকে বললেন, এটা তোমার পছন্দ?

সকলের পছন্দ হতেই রেস্তোরাঁটার উঠোনে গাড়ি থামানো হলো। পিছনের দিকটা আরো চমৎকার। ঘাসে ঢাকা উঠোন। মাঝে মাঝে গাছের ছায়া। এদিকে একটা খাল নদীর থেকে বেরিয়ে এসে একটা বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। নৌকাভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। খালের জলে একটা দুটো নৌকা বাঁধা আছে।

এদিকটা নির্জন বলে এখানেই এক জায়গায় বসে খাওয়ার কথা জানিয়ে দিল। একটা গাছের তলায় চেয়ারে বসে দুজন যুবক খাচ্ছিল। ওরা সেখানে যেতেই ওদের সম্মানে যুবক দুটি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘাসের উপর বসে খেতে লাগল। কারণ চেয়ারের সংখ্যা কম ছিল।

উঠোনটার একাদিকে একটা দোলনা ছিল। তাতে উঠে কিছুক্ষণ দুললেন মাদাম দুফোর। তারপর খাবার তৈরী হতেই খেতে বসলেন। যুবক দুটি গেঞ্জি পরে থাকায় তাদের পেশীবহুল হাতগুলো সব দেখা যাচ্ছিল। ব্যায়াম করা সবল সুগঠিত স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যে ভরা ছিল ওদের দেহ। কেমন যেন লজ্জা অনুভব করছিল ম্যাদময়জেল দুফোর। লজ্জায় সেদিকে তাকাতে পারছিল না। কিন্তু মাদাম দুফোর মাঝে মাঝে তাদের সেই অনাবৃত পেশীবহুল সুন্দর হাতগুলোর পানে তাকাচ্ছিলেন। মঁসিয়ে দুফোর তত আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। কিন্তু মাদাম দুফোর যেচে আলাপ করলেন তাদের সঙ্গে। বললেন, আপনারা কি এখানে প্রায়ই আসেন?

একটি যুবক বলল, হ্যাঁ, আমরা এখানকারই লোক। আপনারা?

মাদাম দুফোর বললেন, বছরে একবার দুবার।

যুবক দুটি যখন এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের নিখুঁত বিবরণ দিল তখন তা শুনে সত্যি লোভ লাগছিল মাদাম দুফোরের। কারণ জনবহুল প্যারিস শহরের এক ঘিঞ্জী এলাকার একটা দোকান ঘরের মধ্যে সারাদিন আবদ্ধ থাকতে হয় তাঁদের। দোকানটা নিজেদের হলেও সেটা নিজেদেরই দেখতে হয়। সারা বছরের মধ্যে মাত্র একবার কি দু' বার এইভাবে কোথাও বেড়াতে যান একটা দিনের জন্য।

মাদাম ডুফোর একসময় যুবকদের বললেন, সামান্য একটা গেঞ্জি পরে তোমাদের ঠাণ্ডা লাগে না ?

একটি যুবক বুক চাপড়ে বলল, আমরা যেকোন কষ্ট সহ্য করতে সব সময় প্রস্তুত। দারুণ গরম বা শীতে আমরা কখনই কাবু হই না। অসম্ভব রকমের পরিশ্রম করতে পারি আমরা।

মঁসিয়ে ডুফোর বললেন, তোমাদের স্বাস্থ্য সত্যিই খুব ভাল। ম্যাদময়জেল ডুফোর অর্থাৎ হেনরিয়েত্তের হলদে চুলওয়ালা প্রণয়ীর গলায় মদ লেগে যাওয়ায় সে কাশছিল।

ওরা সকলেই বেশীপরিমাণ মদ খেয়েছে। সবশেষে কফি খেল। তখন বেশ বেলা হয়েছে। রোদের তাপ অনেক বেড়ে গেছে। জলন্ত আগুনের মত দেখাচ্ছিল নদীর জলটা। কিছু কিছু নেশার ঘোর আসছিল ওদের সকলের মাথায়। যুবক দুটি হঠাৎ বলল, আমরা যাচ্ছি। আপনারা যদি কেউ নৌকায় করে খানিকটা বেড়িয়ে আসতে চান তাহলে চলুন আমাদের সঙ্গে।

মাদাম ডুফোর খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন কথাটা শুনে। তিনি স্বামীকে ডাকলেন। কিন্তু মঁসিয়ে ডুফোর তখন নেশার ঝোঁকে একটা গাছের তলায় বসে ঝিমোচ্ছিলেন। তার পাশে হলদে চুলওয়ালা যুবকটি একরকম ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখন অগত্যা মা ও মেয়ে যুবক দুটির সঙ্গে পৃথক দুটি নৌকায় চেপে জলবিহার করতে গেলেন।

মাদাম ডুফোরের নৌকাটা তীরবেগে নিমেষের মধ্যে চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু যে যুবকটি হেনরিয়েত্তের নৌকাটা চালাচ্ছিল সে শুধু বারবার মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে হেনরিয়েত্তেকে দেখছিল। তাই ধীর গতিতে দাঁড় বাইছিল।

হেনরিয়েত্তে কিন্তু তখন ভাবছিল শুধু নিজের কথা। এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে এধরনের নৌকাবিলাস এই প্রথম। অভূতপূর্ব এই অভিজ্ঞতার আনন্দে শিহরণ খেলে যাচ্ছিল তার দেহে। এই অজানিত উত্তেজনায় টগবগ করে যেন ফুটছিল তার গায়ের রক্ত।

খালটার দুধারেই ঘন বন। খালের শান্ত নিস্তরঙ্গ জলের উপর নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছিল তাদের নৌকাটা। বনের ভিতর কোথায় যেন পাতার আড়ালে একটা নাইটিঙ্গেল পাখি ডাকছিল। যুবকটি বলল, চলুন বনে গিয়ে একটু বসা যাক।

নৌকা থেকে নেমে ওরা বনের ভিতর চলে গেল। ওদিকে মাদাম ডুফোর ও সেই যুবকটিও হয়ত এমনি এক বনভূমির শান্ত সবুজ নির্জনতা উপভোগ করছিলেন। তাদের নৌকাটা চোখে দেখতে পেল না ওরা। যুবকটি হেনরিয়েত্তেকে তার নাম জিজ্ঞাসা করল। হেনরিয়েত্তে তার নাম বলল। ছেলেটি বলল তার নাম হেনরি।

ওদের মাথার উপরে একটা গাছে নাইটিঙ্গেল পাখি গান গাইছিল। পাখি-টার কণ্ঠে যেন যাদু ছিল। তবু গানের মধ্যে যেন একটা মধুর আবেশ ছিল এবং সে আবেশে ভালবাসার নেশা ছড়িয়ে দিচ্ছিল ওদের মনে। ছেলেটি হেনরিয়েত্তের কোমরটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। হেনরিয়েত্তে কিছু বলল না। তাকে আরো একটু কাছে টেনে নিল যুবকটি। হেনরিয়েত্তে বাধা দিল না। তখন ছেলেটি হেনরিয়েত্তের গলাটা জড়িয়ে ধরে তার মুখে একটা চুম্বন করল।

এবার হঠাৎ কি মনে করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ল হেনরিয়েত্তে। ছেলেটিও লজ্জায় পড়ে গেল। দুজনেই উঠে পড়ল। ধীরপায়ে এগিয়ে যেতে লাগল নৌকার দিকে। দুজনেই চুপ; কারো মুখে কোন কথা নেই। যেন এক অঘোষিত শত্রুতা আর ঘৃণার একটা অনতিক্রম্য ব্যবধান গড়ে উঠেছে ওদের দুজনের মধ্যে।

বন থেকে বেরিয়ে এসে হেনরিয়েত্তে দেখল তার মাও একটি বনের ঝোপের ভিতর থেকে তাঁর যুবক সঙ্গীটির হাত ধরে বেরিয়ে আসছে। যুবকটির মুখে হাসির ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

ওরা সকলে আপন আপন নৌকায় গিয়ে উঠে বসল। যুবকটি দাঁড় বেয়ে যথাস্থানে ফিরে এল। এসে দেখল মঁসিয়ে দুফোর তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। হেনরিয়েত্তের প্রণয়ী যুবকটি এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠে যাবার আগে কিছু খেয়ে নিচ্ছিল।

মাসদুই পরে হেনরিয়েত্তে যে যুবকটির সঙ্গে নৌকা বিহার করতে গিয়ে-ছিল সেই যুবকটি মাদাম দুফোর বাড়িতে এসে হাজির হলো একদিন। কি কাজে প্যারিসে এসেছিল। তাই খবর নিতে এল। দোকানে তখন মঁসিয়ে ছিলেন না। হেনরিয়েত্তের কথা জিজ্ঞাসা করতে মাদাম দুফোর বল-লেন সেই যুবকটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে।

যুবকটি চলে যাচ্ছিল। এমন সময় মাদাম দুফোর কিছুটা লজ্জার সঙ্গে তাকে বললেন, তোমার বন্ধুর খবর কি?

যুবকটি উত্তর করল, ভাল। এই বলে চলে গেলে সে।

প্রিয়তমার তকমায়

[In his sweet hearts livery]

বর্তমানে উনি এক অভিজাত বুদ্ধিমতী মহিলা, নামকরা অভিনেত্রী। কিন্তু ১৮৪৭ সালে অর্থাৎ যখন আমাদের কাহিনীর সূত্রপাত হয় তখন উনি ছিলেন এমনই এক সুন্দরী তরুণী যার নীতিবোধ খুব একটা দৃঢ় ছিল না।

তখন সেই তরুণ প্রতিভাবান হাঙ্গেরীয় কবিটিই প্রথমে ওর যে অভিনয় প্রতিভা আছে তা আবিষ্কার করে। এ বিষয়ে প্রথম সচেতন করে তোলে তাকে।

একটি ছিপছিপে চেহারার সুন্দরী তরুণীর বাদামী রঙের চুল আর নীল চোখ দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল হাঙ্গেরীয় কবিটি। সে তখন সত্যিই তাকে ভালবেসেছিল। তার সেই অকৃত্রিম ভালবাসার তাপে তার কুমারী জীবন প্রস্ফুটিত ফুলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

হাঙ্গেরীর রাজধানী ড্যানিয়ুব শহরের একটি ঘরে ওরা তখন থাকত স্বামী-স্ত্রী হিসাবে। কবির আয় খুবই কম ছিল। তবু বিশ্বস্ত নিষ্ঠাবতী স্ত্রীর মত সেই অল্প আয়েই চালিয়ে নিত তাদের ছোট্ট সংসারটা। স্বামীর প্রতিভা ও কৃতিত্বে গর্ব অনুভব করত।

এমন সময় এল বিপ্লব, এল যুদ্ধ। ওরা ছিটকে পড়ল দুজনে দুদিকে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমে পড়ল কবি। তার কোন খবর না পেয়ে কান্নাকাটি করতে করতে কোনরকমে নিজের পথ বেছে নিল তার স্ত্রী। সে আবার বিয়ে করল। এবার তার দ্বিতীয় স্বামীও তাকে বলে তার অভিনয় প্রতিভা আছে এবং মঞ্চে গেলে সে সাফল্য অর্জন করবে। ও তখন নতুন নাম গ্রহণ করে ফ্রঁ ভন কুবিনি।

কুবিনি সত্যি সত্যিই মঞ্চে নামল। নামার সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করল এক অপ্রত্যাশিত সাফল্য। হাতে টাকা পেয়ে ওর রূপ যৌবনের জৌলুষ আরো বেড়ে যায়। দিনে দিনে বাড়ে ভক্তের সংখ্যা। কত বড় বড় ধনী ওর কাছে এসে পদানত হয়।

হাঙ্গেরি তখন বিদেশীদের কবলে। এক বিদেশী সেনাপতির হাতে ছিল হাঙ্গেরী শহরের শাসনভার। তার দ্বিতীয় স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে সেই ক্ষমতা-শালী বিদেশী সেনাপতিকে বিয়ে করল কুবিনি।

একদিন তার নতুন স্বামী সেই শহরের সর্বময় কর্তা সেই জেনারেলের পাশে বসে ঘোড়ার গাড়িতে করে বেড়াতে যাচ্ছিল কুবিনি। হঠাৎ এক সামান্য অস্ট্রীয় সৈনিকের বেশে তার প্রথম স্বামী সেই হাঙ্গেরীয় কবিকে দেখতে পেল কুবিনি। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণ শব্দে চীৎকার করতে লাগল কুবিনি। কিন্তু কবি তা শুনল না বা বুঝতে পারল না ব্যাপারটা।

তখন সব অস্ট্রীয় সৈনিক সেই জেনারেলের অধীনস্থ। তারা সকলেই বন্দী এবং বন্দী হিসাবে জেনারেলের হুকুমে যেকোন কাজ করতে হতো।

দুদিন পর কবির ডাক পড়ল জেনারেলের কাছে। জেনারেল তাকে পাঠিয়ে দিল বাড়িতে মেমসাহেবের কাছে। বাড়ির খানসামা তাকে একটা তকমা দিয়ে বলল, এটা হলো মেমসাহেবের তকমা। তুমি হলে মেমসাহেবের খাস খানসামা। তিনি যা হুকুম করবেন তুমি তাই করবে।

এই বলে তাকে একটি ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হলো। কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে আর অপেক্ষা করতে হলো না, অল্পক্ষণের মধ্যেই সামনের পর্দাটা সরিয়ে রাণীর বেশে জমকালো পোশাক পরে কুবিনি তার সামনে এসে দাঁড়াল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কবি বলে উঠল, ইর্মা তুমি?

তার পুরনো নাম শুনে কুবিনিও কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কবির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল কবি। তার স্ত্রী আবার বিয়ে করেছে এতে সে এমনকিছু মনে করেনি, কিন্তু একমাত্র দুঃখ এই সব বিলাসব্যসন ও ঐশ্বর্যের লোভে সে এক বিদেশী শত্রুর হাতে সঁপে দিয়েছে নিজেকে।

কুবিনি বলল, এভাবে আমাদের আবার দেখা হবে ভাবতেই পারিনি।

কবি বলল, দেখা না হলেই ভাল হত।

কুবিনি বলল, আমার কোন দোষ নেই। অনেকদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করে চোখের জল ফেলেছি। তারপর কোন খবর না পেয়ে তবে বিয়ে করেছি।

কবি কড়াভাবে বলল, যাই হোক, একদিন তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম। সেইজন্যেই কি আজ আমাকে তোমার তকমা পরিয়ে চাকর সাজিয়ে তোমার হুকুম তামিল করাতে চাও?

কুবিনি বলল, আমি তোমার সব দুঃখ দূর করতে না পারলেও সে দুঃখের বেশকিছুটা এইভাবে লাঘব করতে চাই।

এই বলে পাশের ঘরে চলে গেল কুবিনি।

জেনারেল যখন স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভোজসভায় বসে তখন কবিকে তাদের খাবার পরিবেশন করতে হতো। একদিন ভোজসভায় খাবার পরিবেশন করতে গিয়ে কুবিনির চোখে চোখ পড়ায় এবং তার চোখে কেমন যেন এক অজানা বিষাদের ছাপ দেখতে পাওয়ায় সে কেমন আনমনা হয়ে একটা ভুল করে ফেলল। জেনারেল বলল, এ কাজের জন্য ওর জন্ম হয়নি দেখে মনে হচ্ছে।

কুবিনি বলল, কিন্তু সৈনিকের কাজের জন্যও নয়।

কবি দেখল কুবিনি সত্যিই তার পক্ষ অবলম্বন করে তাকে বাঁচিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে তার রাগ হলেও তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাটা তার অন্তরের গভীরে একেবারে অস্বীকার করতে পারল না। একই সঙ্গে ঘৃণা, ভালবাসা ও ঈর্ষার এক গোপন অথচ বিচিত্রজটিল অনুভূতির দোলায় অনুক্ষণ দুলতে লাগল তার মনটা।

এদিকে কুবিনি কোন হুকুম করে না কবিকে। কোন কাজ করতে হয় না তাকে। কখনো কখনো কুবিনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তার চোখে একটা বিষাদের ছায়া দেখে।

মাস দুই পর একদিন জেনারেল তার অফিসে ডেকে মুক্তি দিল কবিকে। কবি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল প্রথমে। তারপর আমতা আমতা করে বলল, কিন্তু আমার কাছে কোন টাকা নেই।

জেনারেল বলল, ত্রু ভন কুবিনি টাকা দিয়ে তোমার মুক্তি কিনে দিযেছে তোমায়।

আনন্দে চোখে জল আসছিল হাঙ্গেরীয় কবির। তার স্ত্রী তাহলে আজও তাকে ভালবাসে। তার কথা ভাবে এত ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও। তার স্ত্রীর সঙ্গে একবার শেষবারের মত দেখা করতে গেল বাড়িতে। কিন্তু প্রধান খানসামা বলল, মেমসাহেব কিছুক্ষণ আগে প্যারিসে চলে গেছেন। দেখা হবে না।

মার্গটের বাতি

[Murgats tapers]

মধ্যনিদাঘের কোন এক মনোরম সন্ধ্যায় জীবনে প্রথম ভালবাসার এক মধুর মাদকতার ফাঁকে স্বেচ্ছায় ধরা দিল মার্গট। অন্যান্য যুবকযুবতীরা যখন এক প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে নাচছিল মার্গট ক্রেসকুইন তখন তার প্রেমিক তেম্নুর সঙ্গে এক নির্জন বনপথে হেঁটে চলেছিল হাত ধরাধরি করে। জীবনে আজ প্রেমের প্রথম আস্বাদ গ্রহণ করল মার্গট, এ এক আশ্চর্য অনণুভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

মার্গটের বাবার ময়দার কল ছিল। মাসকতক আগে সেই কলে একটা চাকরির খোঁজে এসেছিল তেম্নু। সেই প্রথম দিন মার্গটের যৌবনভরা দেহটা একবার দেখে তার প্রেমে পড়ে যায় সে। তারপর থেকে কতভাবে প্রেম নিবেদন করে তেম্নু। তেম্নুকে যখনি দেখেছে মার্গট তার দুচোখের তারায় কামনার দুটো ক্ষুধার্ত পশুকে যেন প্রতিফলিত দেখেছে। চাষীঘরের অশিক্ষিত ছেলে। মনের ভাবকে সরলভাবে সাদামাটা ভাষায় প্রকাশ করে ফেলে। কোনকিছু গোপন করতে পারে না তেম্নু।

তেম্নুকে মার্গটেরও ভাল লেগে গেলেও মিল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি এতদিন। বাবার ময়দার কলটায় ভূত সেজে তাকেও কাজ করতে হয়। বাবা বড় কড়া মানুষ। তাই মধ্যনিদাঘের এই উৎসরের সন্ধ্যাটির জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে তাদের নীরবে।

সান্ধ্য বনপথের এই নরম অন্ধকারটাকে কেমন যেন কাঁপিয়ে দিয়ে শীতল

বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। এই বাতাস আর অন্ধকার দুটোই ভাল লাগছিল ওদের। কিন্তু ওরা শুধু সেই অন্ধকার নির্জন বনপথে হেঁটে চলেছিল ধীর গতিতে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলছিল না। ওরা যেন জানে না ওরা কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

হঠাৎ মার্গট বলল, আমরা কি এই জন্যই এসেছি এখানে? আমাকে কি তোমার আর কোন প্রয়োজন নেই?

তেন্নু সংকোচের সঙ্গে বলল, তোমাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু এর বেশী কিছু করতে ভয় হয়। কারণ আমি আমার জন্ম-পরিচয় জানি না। আমার অজ্ঞতনামা বাবা মা আমাকে পথে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। অপরে মানুষ করে। তোমার বাবা যখন শুনবে আমার মত অজ্ঞাতপরিচয় একটা ছেলে তার মেয়েকে ভালবেসেছে তখন আমাকে তাড়িয়ে দেবে।

মার্গট তেন্নুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি। আর আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না।

এইভাবে ভালবাসাবাসির সেই আদিম পাপের মায়াজালে জীবনে প্রথম স্বেচ্ছায় জেনেশুনে ধরা দেয় মার্গট ফ্রেসকুইন।

আবার সেই মিলের ভিতর শুরু হয় মার্গটের একটানা বন্দী জীবন। সারাদিনের মধ্যে একটিবারের জন্যও বাইরে আসতে দিত না তার বাবা। মার্গটের ভালবাসার ব্যাপারটা তার বাবা জানত কিনা তা কেউ বুঝতে পারেনি। তবে তার শাসনের কড়াকড়িটা কিন্তু বেড়ে যায় যেন দিনে দিনে।

সেই উৎসরের সন্ধ্যার পর থেকে আর একটিবারের জন্যও দেখা হয়নি তেন্নুর সঙ্গে। একবাও দেখা না হওয়ার ফলে দেখার বাসনা বেড়ে যায় ক্রমশঃ। তীব্র হয়ে ওঠে আরো দিনে দিনে। রাত্রিতে শুয়ে ঘুম হয় না মার্গটের। বিছানায় ছটফট করে। তন্দ্রার ঘোরে তেন্নুর নাম করে। বিছানার বালিশ আর চাদরটাকে আঁকড়ে ধরে তেন্নু ভেবে।

এদিকে হঠাৎ যুদ্ধে যোগদানের জন্য তেন্নুর ডাক পড়ে। যাবার আগে মার্গটের সঙ্গে একবার দেখা করতে চায় সে। একদিন সকালে মার্গটের বাবা যখন কলের চাকা মেরামৎ করছিল তেন্নু কোনরকমে ভিখারির ছদ্মবেশে মার্গটের সঙ্গে দেখা করে। বলে, আজ রাত্রিতে আমি তোমার জন্য সেইখানে অপেক্ষা করব। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। পাঁচ বছর দেখা হবে না আমাদের। আজ যদি তুমি রাত্রিতে সেখানে না যাও তাহলে আমি নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরব।

মার্গট আবেগের সঙ্গে বলল, তেন্নু, আমি নিশ্চয় যাব।

নিশীথ রাতের অন্ধকারে মার্গটের বাবার ময়দার কল আর তার চার পাশের বস্তিটা যখন জলছিল তখন ওরা দুজনে সেই জঙ্গলের নির্জন অন্ধকারে বসে ছিল পাশাপাশি। মার্গট বলল, আমি আজ নিজের হাতে বাতি দিয়ে

বাবার মিলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। এ ছাড়া এখানে আমার আসার কোন উপায় ছিল না। দেখ, দেখ, এই আগুন দেখে মনে হচ্ছে যেন হাজারটা বাতি একসঙ্গে জ্বলছে। তুমি যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে, যখন আমাদের বিয়ে হবে তখন অত বাতি নিশ্চয় জ্বলবে না।

এই বলে তেম্নকে জড়িয়ে ধরল মার্গট। এইভাবে ফ্রেসকুইন দ্বিতীয়বার সব জেনেশুনে স্বেচ্ছায় ধরা দিল ভালবাসার সেই আদিম পাপের ফাঁদে।

মা স্যাভেজ

[The mother Savage]

ভিরেলোনে পনের বছর আমি আর যাই নি। শরৎকালের একটি দিনে আমার বন্ধু সারভ্যাল-এর সঙ্গে শিকার করার জন্যে আবার আমি সেখানে গেলাম। আমার বন্ধুর সেখানে একটি বাগানবাড়ি ছিল। প্রাশিয়ানরা সেই বাড়িটি ধ্বংস ক'রে ফেলেছিল। সেই বাড়িটি আমার বন্ধু আবার তৈরী করেছিলেন।

সারা দেশের মধ্যে এই অঞ্চলটি আমার খুব ভাল লাগত ; আমার চোখের ওপরে স্বপ্নের ছোঁওয়া বুলিয়ে দিত। এই জায়গাটির অরণ্য আর আঁকাবাঁকা নদী কী ভালই লাগত আমার। সেই নদীতে আমি মাছ ধরতাম, শিকার করতাম সেই বনে।

সেবারে-ও ছাগলের মত হালকা পায়ে আমি দ্রুত এগিয়ে চললাম ; আগে-আগে চলল আমার শিকারী কুকুর দুটি। চলতে-চলতে হঠাৎ ধ্বংসপ্রায় একটা বাড়ির ওপর নজর পড়ল আমার। বেশ মনে রয়েছে ১৮৬৯ সালে আমি ওখানে শেষবারের মত গিয়েছিলাম। তখন বাড়িটি বেশ পরিচ্ছন্ন ছিল। দ্রাক্ষালতায় ছিল ভরা। উঠোনে ঘুরে বেড়াত মুরগীর দল। মরা-ঘরের চেয়ে করুণ দৃশ্য আর কী রয়েছে ? এক বাঁশ-বাখারি ছাড়া ওটার এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

আমার বেশ মনে রয়েছে এই বাড়িতে আমি একটি মহিলাকে দেখেছিলাম। একদিন আমি যখন বিশেষ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম তখন তিনি আমাকে এক গ্লাস মদ খেতে দিয়েছিলেন। এই বাড়ির কর্তা পরের জমিতে রাত্রির অন্ধকারে চুরি করে বেড়াতো। একদিন সেপাই-এর গুলি খেয়ে সে মারা যায়। তার ছেলেকে আমি কোনদিন দেখি নি ; তবে শুনেছি, লম্বা-চওড়া সেই মানুষটি ; দুর্দান্ত শিকারী ছিল। লোকে এদের বলত স্যাভেজ।

সারভ্যালকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—এরা সব কোথায় গেল ?

সারভ্যাল তার কাহিনী সুরু করল।

"যুদ্ধ ঘোষণা করার পরে মাকে একলা বাড়িতে রেখে যুবক স্তাভেজ যুদ্ধে নাম লেখালো। তখন তার বয়স তেত্রিশ। বুড়ীর টাকা পয়সা রয়েছে এটা জানত ব'লেই নিঃসঙ্গ বুড়ীকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। গ্রাম থেকে দূরে বনের ধারে সেই নির্জন বাড়িতে বুড়ীটি একাই থাকতেন। ভয় ব'লে কোন পদার্থ তাঁর জানা ছিল না। কেউ তাঁকে কোনদিন হাসতে দেখে নি। খেটে-খাওয়া দেহাতি পুরুষদের স্ত্রীরা কোনদিনই হাসতে জানে না; বুড়ীটি ছিল শক্তসমর্থ, দীর্ঘ, রোগাটে এবং ভারিক্কী মেজাজের। কেউ তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি-ফাজলামিও করত না।

নিজের বাড়িতে বুড়ীটি যথারীতি বাস করতেন। বাড়িটি বরফে ঢেকে যেত। সপ্তাহে একবার মাত্র তিনি গ্রামের দিকে যেতেন· কিছু কেনাকাটা করে নিয়ে আসতেন। নেকড়ের উপদ্রব হোত বলে তিনি তাঁর ছেলের পুরানো মরচে-ধরা বন্দুকটি কাঁধে চাপিয়ে কুঁজো হ'য়ে হাঁটতেন। মাথার চুল তাঁর সব সাদা হ'য়ে গিয়েছিল।

একদিন প্রাশিয়ানরা হাজির হল। গ্রামের সকলের বাড়িতেই তারা ছড়িয়ে পড়ল। সবাই জানত বড়ীর টাকা পয়সা যথেষ্ট আছে। তাই তাঁর ভাগে পড়ল চারটি প্রাশিয়ান, চারটি সুন্দর চেহারার নাদুস-নুদুস যুবক—যুদ্ধেও তাদের স্বাস্থ্যহানি হয় নি। বৃদ্ধার যাতে কষ্ট না হয়, অযথা খরচা না হয় সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিল যথেষ্ট। তারা তাঁর রান্নাঘর পরিষ্কার করত, ঘর মুছে দিত, কাঠ কেটে দিত, জামা কাচতো; মনে হোত, বুড়ী-মাকে সাহায্য করার জন্যে চারটি ছেলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে।

বৃদ্ধাটি কিন্তু সব সময়েই তাঁর নিজের ছেলের কথা চিন্তা করতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা তেইশ নম্বর ফ্রেঞ্চ ইনফ্যানট্রি এখন কোথায় রয়েছে তোমরা তা জান? আমার ছেলে ওরই সঙ্গে রয়েছে।

তারা উত্তর দিত—না, জানিনে। সে-সম্বন্ধে কোন ধারণাও আমাদের নেই।

তাঁর দুঃখ আর উদ্বেগের কথা স্মরণ করে ওই চারটি যুবক তাঁর যথাসম্ভব সেবাযত্ন করত। দেশে তাদের-ও মা রয়েছে। বিদেশে এই শত্রুদের দেশে তাঁকেও তারা মায়েরই সম্মান দিয়েছিল। বৃদ্ধাটিও তাদের নিজের ছেলের মত ভালবেসে ফেলেছিলেন। যদিও যুদ্ধে বড়লোকদের চেয়ে দরিদ্ররাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী, যদিও তারা অকারণে বেশী সংখ্যায় মারা যায়, যদিও তাদের উপর দিয়েই ঝড়-ঝাপটা প্রচণ্ড বেগে বয়ে যায়, ধূলিসাৎ করে ফেলে তাদের, তবুও তারা শত্রুদের ঘৃণা করতে পারে না। যুদ্ধবাজ বড়লোকদের সঙ্গে দরিদ্রদের পার্থক্য এইখানেই।

একদিন সকালে তিনি দেখতে পেলেন অনেক দূর থেকে একটা দীর্ঘ

চেহারার মানুষ তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। তিনি জানতেন এই লোকটিই পাড়ায়-পাড়ায় চিঠি বিলি করে যায়। লোকটি এসে তাঁর হাতে একখানা বন্ধ-করা চিঠি দিয়ে গেল। পুরানো একটা চশমা নাকে লাগিয়ে চিঠিটা তিনি পড়লেন—

স্তাভেজের মা, আপনাকে আমি একটি দুঃখের সংবাদ দিচ্ছি। গতকাল কামানের গোলা লেগে আপনার ছেলে ভিক্টর নিহত হয়েছে। আমরা দু'জনে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলাম। ভিক্টর আমাকে আগেই বলেছিল তার কিছু হলে আমি যেন আপনাকে সংবাদ দিই।

তার পকেটে যে ঘড়িটা ছিল আমি সেটা রেখে দিয়েছি। যুদ্ধশেষে বাড়ি ফিরে গিয়ে সেটা আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব। ইতি—

চিঠিটার লেখার তারিখ তিন সপ্তাহ আগে।

চিঠিটা পড়ে বৃদ্ধাটি চুপ ক'রে রইলেন। চোখ থেকে জলও গড়ালো না, চীৎকার ক'রে কাঁদলেনও না তিনি। পাষাণীর মত চুপচাপ বসে রইলেন। তারপরে ধীরে-ধীরে তাঁর চোখের পাতাগুলি ভিজে উঠল। সেই দীর্ঘদেহী ছেলেটির কথা মনে পড়ল তার। কামানের গোলায় তার দেহটা দু'খণ্ড হয়ে গিয়েছে। সেপাইরা তার স্বামীকে মেরেছে; প্রাশিয়ানরা মারলো তার এক-মাত্র সন্তানকে। স্বামীর দেহটা তারা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল, ছেলের মৃতদেহটাও যদি তারা পাঠিয়ে দিত।

এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন সেই চারটি যুবক চেঁচাতে-চেঁচাতে বাড়ির দিকে আসছে। তারা একটা খরগোস ধরে এনেছে। তারই আনন্দে তারা মাতোয়ারা।

তাদের আসতে দেখেই বৃদ্ধাটি চিঠিটা ভাঁজ করে বুকের মধ্যে লুকোলেন; চোখের জল মুছে ফেলে আবার শান্তভাব ধারণ করলেন।

খরগোসটি জবাই করে রান্নার জন্যে বৃদ্ধার হাতে তুলে দেওয়া হল। বৃদ্ধা সেটিকে পরিপাটি করে রান্না করলেন। তারপরে সবাই মিলে ডিনার খেতে বসলেন। বৃদ্ধাটি একগ্রাসও খেতে পারলেন না। যুবকগুলি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ-মাত্র না ক'রে মহা আনন্দে তাদের ডিনার খেতে লাগলেন। বৃদ্ধার মুখটি তখন ভাবলেশহীন।

হঠাৎ তিনি বললেন—আমরা প্রায় একমাস একসঙ্গে রয়েছি। তবু তোমাদের নামগুলি পর্যন্ত আমি জানলাম না।

বৃদ্ধাটির কথা তারা বুঝতে পেরে নিজেদের নাম বলল; কিন্তু তাতেও হল না। তিনি তাদের দিয়ে তাদের নাম-ধাম, দেশের ঠিকানা সব লিখিয়ে নিলেন। সেই অপরিচিত অক্ষরে লেখা তালিকাটি ভাঁজ ক'রে তিনি বললেন —তোমাদের জন্যে আমি কিছু কাজ করতে যাচ্ছি।

এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তারপরে যেখানে ছেলেরা ঘুমোত সেই

ঘরটিতে প্রচুর খড় নিয়ে জমাতে লাগলেন। ব্যাপারটা কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে তারা তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তিনি বললেন ঘরটাকে গরম ক'রে রাখার জন্যেই এই ব্যবস্থা। গরমে তারা বেশ আরামে ঘুমোবে। কথাটা শুনে তারাও তাঁর সঙ্গে খড়-কুটো বয়ে এনে ঘর বোঝাই করতে সুরু করে দিল। পাটাতন পর্যন্ত খড়ে বোঝাই হ'য়ে গেলে সবাই থামল।

রাত্রিতেও বৃদ্ধাটি কিছু খেলেন না দেখে সবাই বেশ মনোক্ষুণ্ণ হল। বৃদ্ধাটি বললেন—তাঁর শরীর ভাল নয়—হাতে-পায়ে খিল ধরছে।

রাত্রির খাওয়ার পরে তিনি নিজেকে সেঁকতে বসলেন। তারপরে চারটি যুবক সিঁড়ি বেয়ে সেই খড়ে-বোঝাই ঘরের পাটাতনে শুয়ে পড়ল। সত্যিই ঘরটা বেশ গরম হয়েছে। ঘুমটা ভালই হবে। চারপাশে বেশ একটা মিষ্টি সোঁদা-সোঁদা গন্ধ ছাড়ছিল।

সবাই ওপরে উঠে গেলে বৃদ্ধাটি ধীরে-ধীরে মইটা নামিয়ে নিলেন; তার পরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তিনি ঘরের বাইরে এসে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিলেন। খড়গুলি জ্বলতে সুরু করলে সেই জ্বলন্ত খড়গুলিকে চারপাশে ছড়িয়ে দিয়ে ঘরে তালা দিয়ে দিলেন।

ঘরের মধ্যে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠল আগুন। সেই লেলিহান অগ্নিশিখা গোটা ঘরটাকে গ্রাস করে ফেলল। ভেতরে যুবকগুলির মর্মভেদ আর্তনাদ শোনা গেল। তারপরে বিকট গর্জন করে ঘরের ছাদ ধ্বসে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সব আর্তনাদ থেমে গেল। তখন কেবল আগুনের গর্জন; ঘরের দেওয়াল, জানালা, দরজা ভস্মীভূত ক'রে লেলিহান অগ্নিশিখা উন্মত্তের মত তখন আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা আকাশ হয়ে উঠেছে লাল।

বৃদ্ধাটি তাঁর ছেলের বন্দুকটি বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন সামনে। উদ্দেশ্য, ওদের মধ্যে কেউ যদি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তাকে গুলি করে মারবেন। সব শেষ হয়ে গেলে, বন্দুকটা তিনি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন। দুম্ ক'রে একটা শব্দ হয়ে বন্দুকটা আগুনের মধ্যে ফেটে গেল। সব শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে কয়েক গজ দূরে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে শান্তভাবে বসে রইলেন।

চারপাশ থেকে দৌড়ে এল লোকজন—দৌড়ে এল প্রাশিয়ান সেনানীরা। একটি প্রাশিয়ান সৈন্যাধ্যক্ষ বৃদ্ধার কাছে গিয়ে প্রাশিয়ান যুবকদের কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি আসল কাহিনীটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। তাঁর পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই যে চারটি যুবককে তিনি পুড়িয়ে মেরেছেন সে কথা বলতেও দ্বিধা করলেন না। পাছে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর কথাটি বিশ্বাস না করেন এই জন্যে বুকের ভিতর থেকে দুটি চিরকুট বার ক'রে তাকে তিনি দেখালেন। তাদের মধ্যে একটিতে ভিক্টরের মৃত্যু সংবাদ রয়েছে;

আর একটিতে রয়েছে চারটি মৃত যুবকের নামধাম—আর তাদের বাড়ির ঠিকানা। চিরকুট দুটি দেখিয়ে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষটিকে বললেন—তোমরা ওদের বাড়িতে সংবাদ দিয়ে দাও যে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে আমিই তাদের আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি।

এরপরে সৈন্যাধ্যক্ষের কোনরকম সন্দেহ হয়নি। সে মাতৃভাষায় কী যেন একটা বল্ল। সঙ্গে সঙ্গে জনকতক প্রাশিয়ান সৈন্য তাঁকে গাছের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলল। কোনরকম ভাবান্তর দেখা গেল না তাঁর। তারপরে কুড়ি গজ দূর থেকে বারজন সেনানী বন্দুক তুলে একেসঙ্গে গুলি ছুঁড়লো। বৃদ্ধাটি লুটিয়ে পড়লেন না, মনে হল বসে পড়লেন। একটি গোলা এসে তাঁকে প্রায় দু'খানা করে ফেলেছিল।"

বন্ধুর কাহিনী শেষ হল। আমি কেবল ভাবছিলাম সেই নির্দোষ চারটি যুবকের মায়েদের কথা আর তাঁর কথা যিনি প্রাশিয়ান সৈন্যদের হাতে প্রাণ দিলেন।

খেতাব

[The decoration]

এ পৃথিবীতে কিছু লোক রয়েছে যারা বিশেষ একটি প্রবৃত্তি নিয়ে জন্ম-গ্রহণ করে। কথা বলার অথবা চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের মনে প্রচণ্ড একটা কামনা জাগে।

মঁসিয়ে স্যাক্রিমেণ্টেরও ছেলেবেলা থেকে রাজকীয় অলঙ্কারে নিজেকে ভূষিত করার একটা প্রচণ্ড বাসনা ছিল। অন্যান্য ছেলেরা যেমন সেনানীর টুপী পড়তে ভালবাসে তিনি শিশুকাল থেকে "লিজন অফ অনার"-এর দস্তার ক্রশ বুকের ওপরে ঝোলাতে ভালবাসতেন।

কিন্তু লেখাপড়া তিনি শিখতে পারেন নি। এমন কি একটা প্রাথমিক পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। পয়সাকড়ি তাঁর ভালই ছিল; সুতরাং কী করবেন কিছুই ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত একটি সুন্দরী মেয়েকে তিনি বিয়ে ক'রে ফেললেন। উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের মতই তিনি প্যারিসে বাস করতে লাগলেন। সোসাইটিতে না গিয়ে নিজেদের সমাজের ভেতরেই লাগলেন ঘোরাফেরা করতে। ভবিষ্যতে মন্ত্রী হ'তে পারেন এমন একজন ডেপুটি আর দুজন স্থায়ী সেক্রেটারীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। এতেই তিনি নিজেকে বেশ গর্বিত মনে করতেন। তবুও যে বাসনাটি

শৈশবে তাকে অস্থির ক'রে তুলেছিল সেটির হাত থেকে তিনি মুক্তি পেলেন না। সেটি হচ্ছে তাঁর বোতাম লাগানোর ঘরে একটি রঙিন ফিতে—লিজন অফ অনার-এর প্রতীক।

পথে-প্রান্তরে ঘুরে-ঘুরে তিনি কেবল লাল ফিতে জড়ানো মানুষদেরই দেখে বেড়াতেন আর হিংসাতে জলেপুড়ে মরতেন। এই জাতীয় এত লোককে তিনি দেখতে পেলেন যে মনে হল সরকার পাইকারী দরে সব খেতাব ছড়িয়ে দিয়েছেন। খেতাবধারীদের দেখতে-দেখতে একটি জিনিস তাঁর চোখে পড়ল। তিনি দেখলেন কিছু লোক মাথা উঁচু ক'রে ধরাকে সরাজ্ঞানে হাঁটছে ; আর কিছু লোক সাধারণ মানুষের মত হেঁটে চলেছে। প্রথম শ্রেণীর মানুষদের দেখে মনে হল যে তাঁরা সবাই "লিজন অফ অনার" খেতাবধারী। চলতে-চলতে এই জাতীয় মানুষদের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি স্বাভাবিকভাবেই সম্মান দেখানোর জন্যে মাথার টুপীটা খুলে ফেলতেন।

কিন্তু এই সমস্ত খেতাবধারীদের দেখলেই তাঁর মেজাজটা হট ক'রে গরম হয়ে যেত। তখনই তাঁর মন এই সব মানুষদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ঘৃণায় ভরে যেত। উত্তেজিতভাবে তিনি ঘরে ফিরে আসতেন। অজস্র দোকানে রাশি-রাশি খাবার দেখে দরিদ্র অভুক্তরা যেভাবে কাতরায় তিনিও সেইভাবে কাতরে বাড়িতে ফিরে বেশ চেঁচিয়েই বলতেন—এই রকম হতচ্ছাড়া সরকারের পতন কবে হবে।

তাঁর স্ত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—তোমার আজ কী হল ?

তিনি বলতেন—অনাচার অবিচার দেখে আমি ক্ষিপ্ত হয়েছি।

কিন্তু ডিনারের পর আবার তিনি রাস্তায় বেরোতেন ; যে সব দোকানে খেতাব সাজানো রয়েছে সেই সব দোকানের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। কত হরেক রকমের খেতাবই না সে-সব জায়গায় স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। এক-একবার তাঁর মনে হোত, ওই সব খেতাব নিয়ে তিনি বুকে পরে বিরাট একটা শোভাযাত্রার পুরোভাগে কদম-কদম এগিয়ে যাবেন।

কিন্তু হায়, এই খেতাব অর্জন করার মত কোন গুণই যে তাঁর নেই। তিনি নিজের মনে-মনেই বললেন—"লিজন অফ অনার" পেতে গেলে সিভিল সার্ভেন্ট হ'তে হবে। কিন্তু আমি যদি অ্যাকাডেমীর অফিসার হই তাহলে ?

অথচ, কেমন ক'রে যে অ্যাকাডেমীর চাকরিটা পাওয়া যায় তা তিনি জানতেন না। স্ত্রীর কাছে প্রস্তাবটা তুলতেই ভদ্রমহিলা ক্ষেপে উঠে বললেন—অফিসার ? তোমার কী গুণ রয়েছে যে অ্যাকাডেমীর অফিসার হবে ?

তিনিও রেগে বললেন—আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা কর। কী ক'রে হওয়া যায় সেই কথাটাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। মাঝে-মাঝে তুমি এমন বোকার মত কথা বল··· না···

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন—সত্যি ! কী বলব তা-ই আমি জানিনে।

তাঁর মগজে হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি বললেন—ধর, তুমি এবিষয়ে মঁসিয়ে রোজেলিনের সঙ্গে যদি একবার কথা বল। তিনি ডেপুটি। এবিষয়ে নিশ্চয় একটা পথ তিনি আমাকে বাতলে দিতে পারবেন। আমি নিজে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারি; কিন্তু সেটা ভাল দেখাবে না। তোমার কথা আলাদা।

ভদ্রমহিলা ডেপুটির সঙ্গে কথা কইলেন। তিনি জানালেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে এবিষয়ে তিনি আলোচনা করবেন। তারপর থেকে স্যাক্রিমেণ্টের তাগিদ খেয়ে-খেয়ে একদিন তিনি বললেন—তোমার কী কী যোগ্যতা রয়েছে সেই সব দিয়ে সরকারের কাছে তোমাকে একটা দরখাস্ত করতে হবে।

কিন্তু বিপদ হচ্ছে তাঁর সত্যিকার কোন যোগ্যতা নেই। যাই হোক সেই যোগ্যতা অর্জন করার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে তিনি একটি পুস্তিকা লিখতে বসলেন। পুস্তিকার নাম হবে—"শিক্ষায় জনসাধারণের অধিকার।" কিন্তু এবিষয়ে কোন ধারণা না থাকায় লেখা বন্ধ করতে হ'ল তাঁকে। সেটা ছেড়ে আর একটা পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করলেন। এই পরিকল্পনার প্রথমটি হ'ল—"দেখার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা।" কোনরকমে নিবন্ধটি শেষ ক'রে নিজের পয়সায় সেটি ছাপালেন; দশ কপি পাঠালেন মন্ত্রীর কাছে। পঞ্চাশ কপি প্রেসিডেণ্টের কাছে; প্যারিসের প্রতিটি সংবাদপত্রে দশটি ক'রে, মফঃস্বল সংবাদপত্রের প্রতিটিতে পাঁচটি ক'রে। তারপরের নিবন্ধটি হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের ওপরে। এই নিবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখলেন—মানুষ আনন্দে মাততে চায়। এবং যেহেতু তারা শিক্ষার খোঁজে যায় না সেইহেতু শিক্ষাকেই তাদের দরজায় পৌঁছে দিতে হবে। ইত্যাদি।

এই সব পুস্তিকাতে কাউকে নড়াতে পারলেন না তিনি। কিন্তু তবু তিনি সরকারের কাছে দরখাস্ত পাঠাতে ছাড়লেন না। অনুসন্ধান ক'রে জানতে পারলেন যে তাঁর প্রস্তাবটি পঠিত হচ্ছে। তিনি খুব আশান্বিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করেও কিছু হ'ল না দেখে তিনি সরকারী অফিসে তদ্বির করতে গেলেন। সরকারী কর্মচারীটি তাঁকে বিনীতভাবে বললেন—আপনার দরখাস্তটি পঠিত হচ্ছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

আবার কাজ সুরু করলেন মঁসিয়ে স্যাক্রিমেণ্ট। মঁসিয়ে রোজেলীন তাঁকে এদিকে যথেষ্ট বাস্তব উপদেশ দিলেন। এর ভেতরে রোজেলীন নিজেই খেতাব পেয়ে গেলেন। কোন্ বিশেষ যোগ্যতার বলে তিনি খেতাবটি পেলেন তা কেউ বলতে পারল না।

মঁসিয়ে রোজেলীন তাঁকে বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত করলেন, নতুন নতুন বিষয়ে লেখার জন্যে উপদেশ দিলেন; এবং মন্ত্রীর কাছেও তাঁর সম্বন্ধে লিখিত-ভাবে দরখাস্ত করলেন। একদিন তিনি তাঁর একটি বন্ধুর বাড়িতে লাঞ্চ

যাচ্ছিলেন এমন সময় বন্ধুটি তাঁর করমর্দন করে বললেন—"কমিটি ফর হিস্টোরিক্যাল স্টাডিস" তোমাকে একটা কাজের ভার দিয়েছে হে। ফ্রান্সে যত লাইব্রেরী রয়েছে সেই সব জায়গায় তোমাকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

শহর থেকে শহরান্তরে পুরানো বই-এর তালিকা ঘাঁটতে লাগলেন তিনি। ধূলোতে বোঝাই বই-এর স্তূপ ঘাঁটতে ঘাঁটতে অভিশাপ কুড়োলেন সকলের। এক সপ্তাহ পরে মধ্যরাত্রিতে স্ত্রীকে অবাক করে দেওয়ার জন্যেই একদিন তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন। 'ল্যাচ কী' দিয়ে দরজা খুলে নিঃশব্দে তিনি ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঘর ভেতর থেকে বন্ধ দেখে তিনি ডাকলেন—জিনি, দরজা খোল ; আমি এসেছি।

এই ডাকে ভদ্রমহিলা নিশ্চয় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তা নাহলে তিনি হঠাৎ লাফিয়েই বা উঠবেন কেন আর স্বপ্নের কথাই বা বলবেন কেন? তারপরে ভদ্রমহিলা তাঁর ড্রেসিংরুমে দৌড়ে গেলেন ; দরজা খুললেন, বন্ধ করলেন ; তারপরে আবার শোওয়ার ঘরে ফিরে এসে দরজায় নাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আলেক্সাণ্ডার, সত্যিই তুমি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি। দরজা খোল।

দরজাটা খুলে ভদ্রমহিলা স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন—কী আনন্দ, কী আনন্দ।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে ধীরেসুস্থে পোশাক খুলে ফেললেন ; তারপরে একটা চেয়ার থেকে তাঁর কোটটা তুলে নিলেন। কোটটা সাধারণতঃ তিনি হ্যাঙারেই টাঙিয়ে রাখতেন। হঠাৎ সেটা ওখানে এল কি করে তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তার চেয়ে অবাক হলেন কোটের বোতামে একটা লাল ফিতে দেখে। তাঁর স্ত্রী দৌড়ে গিয়ে কোটটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন ; বললেন—না—তুমি ভুল করছ।—ওটা আমাকে দাও।

কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। কোটটা ধরে রইলেন ; বারবার একই প্রশ্ন করতে লাগলেন—কী ?—কেন—কেন—এই কোটটা কার ? এটা তো আমার নয় ; করণ, এই লাল ফিতেটার ওপরে যে "লিজন অফ অনার" লেখা রয়েছে।

আতংকে অস্থির হ'য়ে ভদ্রমহিলা বললেন—শোন, শোন। এটা একটা গোপন কথা। ওটা আমাকে দাও।

উহুঁ। আমি জানতে চাই এটা কার ওভারকোট।

এই কথা শুনে ভদ্রমহিলা চীৎকার করে বললেন—তাহলে শোন—কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর—আসল কথাটা হচ্ছে তুমি খেতাব পেয়েছ।

অ্যাঁ !

হ্যাঁ। সেইজন্যেই তো এই কোটটা আমি তৈরী করিয়ে আনলাম।

কিন্তু কাউকে বলো না ; কারণটা হচ্ছে এটা ঘোষণা করতে এখনও এক মাস থেকে ছয় সপ্তাহ লাগবে। মঁসিয়ে রোজেলীনই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না তাঁর—কী বললে—রোজেলীন—ও হো—

এক গ্লাস জল খেলেন তিনি। তারপরেই আনন্দে কাঁদতে সুরু করলেন।

এক সপ্তাহ পরে সরকারী ঘোষণা বেরোল—মূল্যবান কাজ করার জন্যে মঁসিয়ে স্যাক্রিমেণ্টকে "লিজন অফ অনার"-এর খেতাব দেওয়া হল।

সম্পদলাভের উপায়

[A way to wealth]

আচ্ছা লেরেমির কথা তোমার মনে আছে ? তার কি হলো ?

সে এখন এক সেনাদলের ক্যাপটেন হয়েছে।

তার পিপসন।

সে এখন সাবপ্রিফেক্ট পদে আছে।

আর রেকোলেত্ ?

মারা গেছে।

এইভাবে আমরা দুই বন্ধুতে মিলে বন্ধুদের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ পেসেন্সের কথা উঠল। আমার বন্ধু বলল, সেই মহান পেসেন্সের কথা মনে আছে তোমার ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, শুনতে চাও তার কথা ? তাহলে শোন। মাত্র চার পাঁচ সপ্তাহ আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। ইনস্পেক্টরের কাজে আমাকে একবার লিমোজেস যেতে হয়েছিল। আমি ওখানে উঠেছিলাম গ্র্যাণ্ড কাফে নামে একটি হোটেলে। একদিন সন্ধ্যের সময় হোটেলে একা একা সময় কাটছিল না। একা একা পথে বেড়াতে গেলেও ভাল লাগবে না। সাধারণতঃ একটা অব্যক্ত বিষাদ নিঃসঙ্গ পথিকদের পেয়ে বসে—এই ভেবে আমি হোটেলেই বসার ঘরে বসেছিলাম।

এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে কড়া গলায় হোটেলের বয়কে ডেকে বলল, বয়, আমার কাগজটা দেখি।

বয় এসে টাইম্‌স্‌ পত্রিকাটা তার হাতে দিল। আমি ভাবলাম ভদ্রলোক যখন এমন গুরুগম্ভীর মনোযোগ দিয়ে পত্রিকা পাঠ করছে, তাহলে নিশ্চয় উনি একজন চিন্তাশীল লোক হবেন।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে। অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম আমি। বললাম, আপনি কি আমায় চেনেন?

ভদ্রলোক হঠাৎ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, আরে তুমি কোঁত্রাত লার্দোয় নও?

আমি বললাম, আপনি ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু আপনি?

ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে এসে আমার হাত ধরে বলল, আমি হচ্ছি পেসেন্স। তোমার কলেজবন্ধু সেই রবার্ট পেসেন্স।

পেসেন্স বলল, তুমি এখানে কি কাজে এসেছ?

আমি বললাম, অর্থদপ্তরের পরিদর্শক হিসাবে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয় বিভিন্ন জায়গায়।

পেসেন্স তখন জিজ্ঞাসা করল, তাহলে বেশ ভালই আছ? জীবনে বেশ উন্নতি করেছ।

আমি বললাম, মোটামুটি তা বলতে পার। কিন্তু তুমি কি কর?

পেসেন্স উত্তর করল, আমি ব্যবসা করছি।

আমি তখন তাকে বললাম, তাহলে অনেক টাকা করেছ।

পেসেন্স উত্তর করল, হ্যাঁ, অনেক টাকা করেছি। সত্যিই আমি ধনী। আগামীকাল দুপুরে আমার বাড়িতে খাবে তুমি। তুমি স্বচক্ষে সবকিছু দেখবে। বিয়ে করেছ?

আমি উত্তর করলাম, না।

পেসেন্স বলল, সুন্দরী তরুণীর প্রতি আগ্রহ আছে ত?

আমি বললাম, একেবারে নেই তা ঠিক বলতে পারি না।

পেসেন্স বলল, ঠিক আছে, তাহলেই হবে।

আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি বিয়ে করেছ?

পেসেন্স বলল, দশ বছর হলো বিয়ে করেছি এবং চারটি সন্তানের জনক হয়েছি। আগামীকাল অবশ্য দেখতে পাবে আমার স্ত্রী আর সন্তানদের। আমার বাড়ির ঠিকানা হলো ১৭ নম্বর কক ফি শান্তে স্ট্রীট। কাল দুপুরে আসা চাই।

রাতটা কাটিয়ে সকাল হতেই উন্মুখ হয়ে রইলাম পেসেন্সের বাড়ি যাবার জন্য। অফিসের কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে বসে কিছু কাজ সারলাম সকাল থেকে। তারপর তাকে বললাম, আমার বন্ধু নিমন্ত্রণ করেছে তার বাড়ি যাবার জন্য।

কোষাধ্যক্ষ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে পেসেন্সের বাড়ি পর্যন্ত এসে দেখিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে বিদায় দিয়ে বাড়ির কলিং বেল টিপলাম। একজন

মেয়েলোক দরজা খুলে দিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম মঁসিয়ে পেসেন্স আছে কিনা। সে বলল আছে।

তারপর আমাকে সঙ্গে করে সে বসার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটার সব দেওয়ালগুলো বড় বড় ছবিতে ঢাকা। দামী আসবাবপত্রে ভর্তি ঘরখানা। বেশীর ভাগ ছবিই যতসব নগ্ন বা অর্ধনগ্ন মেয়েদের। একটি ছবিতে রয়েছে এক অর্ধনগ্ন নায়িকা তার নায়কের আকস্মিক আবির্ভাবে অপ্রস্তুত হ'য়ে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছে। একটি ছবিতে নায়িকা তার গোপনাঙ্গে হাত দিয়ে তার স্বাধিকারপ্রমত্ত নায়ককে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। সমস্ত ঘরখানা নানা রকম সুগন্ধে মাতোয়ারা হ'য়ে আছে। মনে হলো, এ যেন সম্পূর্ণ এক আলাদা জগৎ। বাড়ির পিছনে বাগান। বাগানটা এজনজরে দেখার জন্য আমি জানালার ধারে গেলাম। জানালার ভিতর দিয়ে দেখলাম, তিনটি মেয়ে সাদা পোশাক পরে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে দুজন সুন্দরী যুবতী এবং একজন বয়স্কা।

এমন সময় পেসেন্স ঘরে ঢুকে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। তারপর আমার মুখপানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বল এখন কি চাও, এই সুসজ্জিত ঘরে বসে গল্প করবে নাকি ঐ বাগানে বেড়াবে অথবা ঐ মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবে? ওরা হলো আমার স্ত্রী আর দুটি সুন্দরী শ্যালিকা।

জেরোবোয়াম

[Jeroboam]

কেউ যদি বলে সেন্ট স্যাম্পসন চার্চের ভিকার রেভারেণ্ড উইলিয়ম গ্রীনফিল্ড তাঁর স্ত্রী এ্যানাকে সুখী করতে পারেনি তাহলে বলতে হবে সে হিংসুটে। কারণ উইলিয়ম তাদের বারো বছরের বিবাহিত জীবনে তার স্ত্রীকে বারোটি সন্তান দান করেছে। একটা মানুষ তার স্ত্রীকে এর থেকে বেশী আর কি দিতে পারে?

গুণবতী স্ত্রী হিসাবে তুলনা ছিল না এ্যানার। কিন্তু গুণের মত রূপ ছিল না তার দেহে। তার চেহারাটা দেখে মনে হয় চামড়া ঢাকা একটা কঙ্কাল। মনে হয় সে আগে মোটা ছিল এবং অসুখে রোগা হয়ে গেছে। গায়ের রংটা বালির মত তামাটে। মাথায় চুল বেশী নেই। দাঁতগুলোর গায়ে হলদে ছোপ ধরেছে।

অথচ এই দেহের বেদীমূলে রেভারেণ্ড উইলিয়ম দীর্ঘ বারো বছর ধরে বারোবার অর্ঘ্য দান করেছে। বারোটি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেছে। তার স্ত্রী একথা অস্বীকার করতে পারবে না। কারণ বারোটি সন্তানই জীবিত আছে।

কিন্তু আশ্চর্য! আজ চার বছর এই সন্তান উৎপাদনের পবিত্র কর্তব্যকর্ম হ'তে বিরত আছে উই লিয়ম। আর এইটাই হলো এন্যার দুঃখের একমাত্র কারণ। সে অনেক ভেবে দেখেছে তার স্বামী তাকে পরিপূর্ণ সুখদান করতে পারেনি। এ্যানা যখন তার দ্বাদশ সন্তান প্রসব করে তার কিছুকাল পর রেভারেণ্ড উইলিয়ম একদিন তাকে ডেকে বলে, দেখ এ্যানা, আমরা ইস্রায়েলের সেই দ্বাদশ জাতির মত বারোটি সন্তান উৎপন্ন করেছি। এর পরেও যদি আমরা দেহসংসর্গে লিপ্ত হই তাহলে সেটা হ'বে ব্যভিচারের সমতুল্য। তুমি কি আমাকে সেই ব্যভিচারের পথে ঠেলে দিয়ে আমার পবিত্র ধর্মজীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাও?

গুণবতী স্ত্রী এ্যানা তা করেনি। এই চার বছর তার স্বামীর সংযম সাধনার ক্ষেত্রে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি সে। কোনদিন কোন অভিযোগ করেনি। শুধু নীরবে নিভৃতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে এসেছে, ঈশ্বর যেন তার স্বামীর মনে নূতন করে আবার এক দ্বাদশ জাতির উৎপাদনের পবিত্র বাসনা জাগরিত করেন। কিন্তু ঈশ্বর তার স্বামীর মনে এই ধরনের কোন বাসনা জাগ্রত না করায় সে বিচিত্রভাবে সে বাসনা জাগাবার চেষ্টা করে। সে তার স্বামীর জন্য সেই সব উত্তেজক খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থা করে যা সাধারণতঃ ইংরেজদের শুষ্ক শীতল রক্তকে তপ্ত ও সোচ্চার করে তোলে। উইলিয়মের রক্ত কিন্তু তবু তপ্ত হয় না।

এ্যানার গায়ে আগের থেকে কিছু মাংস জমল। তাকে আগের থেকে বেশকিছুটা মোটা দেখালো। কিন্তু দুঃখে মনটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে লাগল। স্বামীর যে ভালবাসা সে হারিয়ে ফেলছে জীবনে সে ভালবাসা নূতন ক'রে ফিরে পাওয়াই তার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে উঠল। সে তার স্বামীর যুক্তির কথা মোটেই ভুলতে পারেনি। তার শুধু মনে হয়েছে তার স্বামী মিথ্যা যুক্তি খাড়া করে তাকে এড়িয়ে গেছে। আসলে তাকে আর ভালবাসে না। নিশ্চয় শয়তান ঢুকেছে তার স্বামীর মনের মধ্যে।

হঠাৎ একদিন একটা বুদ্ধি এল এ্যানার মাথায়। সে ঠিক করল প্যারিসে এক প্রদর্শনী দেখতে যাবে। সেখানে আলজীরিয় মেয়েদের কাছে সে একটা

কৌশল শিখে নেবে। ব্যাপারটা খুবই নোংরা, তবু নিশ্চয় সেটা তার স্বামীকে উত্তেজিত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

প্যারিস থেকে লণ্ডনে ফিরে একদিন রাত্রিতে সোজা তার স্বামীর শোবার ঘরে চলে গেল এ্যানা। একে একে সব পোশাক খুলে ফেলে শুধু একটা অন্তর্বাস পরে নগ্নপ্রায় অবস্থায় কুৎসিতভাবে কোমর দুলিয়ে নাচতে লাগল।

উইলিয়ম হঠাৎ কিছু বুঝতে না পেরে প্রথমে অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার স্ত্রীর দিকে। তারপর শান্তকণ্ঠে বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

তার নগ্ন দেহের কুৎসিত অঙ্গভঙ্গির দ্বারা তার স্বামীকে মুগ্ধ করতে চেয়েছিল এ্যানা। তার স্বামী শুধু একবার বলল, হা ভগবান, আবার বারোটি সন্তান উৎপন্ন করার কথা ভাবাই যায় না।

এদিকে অনেকক্ষণ ধরে নেচে ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল এ্যানা। উইলিয়ম তাকে তখন বলল, তুমি যদি কোন মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে থাক তাহলেই তোমাকে তোমার এই ঘৃণ্য কাজের জন্য ক্ষমা করতে পারি। যাও ঠাণ্ডা জলে এখনই হাতমুখ ধুয়ে এস।

এ্যানা বলল, হ্যাঁ উইলিয়ম, আমাকে ক্ষমা করো।

উইলিয়ম গম্ভীর গলায় বলল, মনে রেখো, তুমি এখন মিসেস গ্রীনফিল্ড। আমরা এখন যে সংযম দুজনেই পালন করছি তার থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। ভুলে যেও না তুমি ইসরায়েলদের সেই জিজেবেল।

তার স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়ে তাদের ঝি পলির সঙ্গে প্রেম করতে গেল উইলিয়ম। আজ চার বছর ধরে স্ত্রীর সংসর্গ ত্যাগ করে গোপনে ঝি পলির সঙ্গে প্রেম ক'রে আসছে সে। সে সোজা তখন পলির ঘরে গিয়ে বলল, মিসেস গ্রীনফিল্ডের কাছে সোজা চলে যাও। তোমার সমস্ত পোশাক খুলে তার সামনে নগ্ন দেহে দাঁড়াবে। তাকে এমন শিক্ষা দেবে যাতে সে এভাবে আমার সামনে আর কোনদিন না আসে। আর কোনদিন যেন সে এ কাজ করতে সাহস না পায়।

পলি তার মালিকের কথামত তাই করল। আর তাই দেখে এ্যানা পেল চরম শিক্ষা। তারপর থেকে সে আর কোনদিন তার স্বামীকে তার গর্ভে ত্রয়োদশ সন্তান উৎপাদন করতে প্ররোচিত করেনি।

নর্তকীর প্রেম

[Virtue in the ballet]

ভিয়েনার অপেরা হাউসে যখনি কোন যুবতী নর্তকী আসত এবং যদি যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে একটু লাবণ্য থাকত তাহলে স্থানীয় ধনী অধিবাসীরা যেন পাগল হ'য়ে ছুটত তার পিছনে। সেবার শীতের শেষে একটা খবর প্রচার হ'য়ে গেল, এবার ভিয়েনা অপেরায় এমন একজন সুন্দরী নর্তকী আসছে যার রূপে চোখ ঝলসে যাবে।

নাম তার সাতানেলা। মেয়েটার বয়স খুবই কম এবং সে তার কৌমার্যের শুচিতা আজও হারায়নি। কিন্তু সাতানেলা বড় শক্ত মেয়ে। সে এই অল্প বয়সেই এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে। তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনকিছু করানো একটা কঠিন কাজ।

প্রথম দিনেই দর্শকের মন জয় করে ফেলল সাতানেলা। সারা শহরে জয়জয়কার পড়ে গেল তার। পরদিন সে দেখল শহরের অপরিচিত কত সব ধনী ব্যক্তিরা কত মণিমুক্তার উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রথমে অতসব বুঝতে পারেনি সাতানেলা। কিন্তু পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখল এসব উপহার গ্রহণ করায় বিপদ আছে। তাই সে তার মাকে বলে দিল এসব উপহার যারা এনেছে, যারা পাঠিয়েছে তাদের সব ফেরৎ দিয়ে দাও। আমি এসব কিছুই নেব না।

তার মা বলল, টাকা পয়সা হাত পেতে না নিলেই হ'লো। উপহার নিতে দোষ কি।

একদিন তাদের বাসায় সোনারূপোর এক বড় ব্যবসায়ীর আগমন ঘটল। তার মা খুব খুশী হ'লো তার উপহারের বহর দেখে। কিন্তু সাতানেলা তার মাকে রেগে বলল, আচ্ছা মা, এসব দামী জিনিস পেলে কোথা হ'তে? তুমি কি কোন লটারির পুরস্কার পেয়েছ?

তার মার কাছ থেকে আহ্বান পেয়েই সোনারূপোর সেই কারবারী রোজ একবার করে তাদের বাসায় আসে। একদিন সাতানেলা তার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করায় সে অস্বস্তি অনুভব করল। এইধরনের মেয়েরা সাধারণতঃ যে ব্যবহার করে সে তাতেই অভ্যস্ত। এইরকম ভদ্র ও শালীনতাপূর্ণ আচরণ সে প্রত্যাশা করেনি।

কোন লোককে পছন্দ না করার একটা কারণ ছিল সাতানেলার। সে একটি

ছেলেকে গোপনে ভালবাসত। একটি যুবক তাকে দিনকতক দেখার পর সলজ্জ কুণ্ঠার সঙ্গে তার সঙ্গে একদিন আলাপ করে। তাকে দেখে ভাল লাগে সাতানেলার। যুবকটি বলে আমি গরীব, তোমার ঘরে ঐসব বিলাস ব্যসন ও ঐশ্বর্যের মাঝে কেমন করে যাব? সাতানেলা বলল, তাতে কি হয়েছে, তুমি নিশ্চয় যাবে। আমি তোমাকে ভালবাসি।

যুবকটি বলল, কিন্তু তুমি নিশ্চয় কারো অধীনে আছ?

সাতানেলা বলল, আমি কারো হাতে এখনো পর্যন্ত বিলিয়ে দিইনি নিজেকে।

কিন্তু যুবকটিকে দেখে সাতানেলার মা খুশী হ'তে পারল না। তারিফ করতে পারল না তার মেয়ের রুচিকে। কিন্তু যখন শুনল যুবকটি নিজের আসল পরিচয় দেয়নি এবং সে এক কাউন্টের ছেলে তখন খুশী হলো। যুবকটি একদিন স্বীকার করল সাতানেলার কাছে। বলল, আমি তোমার ভালবাসাকে পরীক্ষা করার জন্যই গোপন রেখেছিলাম আমার পরিচয়।

এদিকে তার প্রেমিক ধনী কাউন্টের ছেলে জেনে সাতানেলা প্রায়ই তার কাছে নানারকম উপহার চাইতে শুরু করল। তার বাবার কাছে প্রায়ই টাকা চাইত যুবকটি। দামী উপহার কিনতে অনেক টাকার দরকার হোত। একদিন তার বাবার সন্দেহ হ'তে খোঁজ নিয়ে জানল তার বাবা, তার ছেলে এক নর্তকীর প্রেমে পড়েছে। কাউন্ট তখন সোজা ভাষায় ছেলেকে ব'লে দিল, তাকে যদি ত্যাগ না করো তাহলে বাড়ি ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে।

বাবার কথাটা সোজা গিয়ে সাতানেলাকে জানাল যুবকটি। সাতানেলা বলল, আমি তোমার কোন উপহার চাই না। তোমার কাছ থেকে কোন কিছুই আর চাইব না। আমি শুধু তোমাকে চাই। তোমাকে আমি কোন কিছুর বিনিময়েই হারাতে পারব না।

তখন বাধ্য হ'য়ে তার বাবাকেই ছাড়ল যুবকটি। বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সাতানেলার বাড়িতে এসে উঠল। প্রথমে সাতানেলা তার বাড়ির দামী আসবাবপত্র ও গয়না বিক্রি করে সংসার চালাতে লাগল। পরে যুবকটি কোন উকিলের অধীনে এক মুহুরির কাজ পেল। এতেই তাদের ভালভাবে চলে যেত। সাতানেলা ঠিক করলো সে আর নাচবে না কোন অপেরায়। নাচের কাজ ছেড়ে দিল।

অবশেষে একদিন কাউন্টের কানেও উঠল কথাটা। কাউন্ট খোঁজ খবর নিয়ে, সবকিছু জেনে আশ্চর্য হয়ে গেল। বুঝল, ওদের ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা নিছক ছেলেমানুষি নয়। ওদের ভালবাসার মধ্যে আছে এক আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা আর মহত্ব যাকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

রোজালি প্রুডেন্ট

[Rosalie prudent]

আদালতে রোজালি প্রুডেন্টের মামলাটা উঠতেই সকলে ঘাবড়ে গেল। তার ব্যাপারটা এমনই রহস্যময় যে বিচারক, জুরি ও সরকার পক্ষের উকিল সবাই হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কেউ কোন কূলকিনারা খুঁজে পেল না।

ব্যাপারটা উপর থেকে দেখে খুব সহজ ব'লে মনে হয়। বার্মারত পরিবারে কাজ করত রোজালি। সহসা এক রাত্রিতে সে মালিকপক্ষের অজ্ঞাতসারে এক অবৈধ সন্তান প্রসব করে সেই সন্তানকে হত্যা করে এবং বাগানে ফেলে দিয়ে আসে।

নীতিবাগীশ বার্মারত এই ঘটনায় ভীষণ রেগে যান। তিনি বলে দেন যে, রোজালির এই জঘন্য অপরাধের দ্বারা তাদের বাড়ির পবিত্রতা নষ্ট করেছে সে, এবং রোজালিকে কোনমতেই ক্ষমা করবেন না।

অনেক বড় বাড়ির ঝি এই ধরনের অপরাধ করে থাকে। সেদিক দিয়ে রোজালি অমার্জনীয় এমনকিছু একটা করেনি। কিন্তু রোজালি যে ঘরটায় থাকত সে ঘরটা খানাতল্লাশি করে দেখা গেছে সে তার ছেলের জন্য অনেক কষ্ট করে কতকগুলো কাঁথা তৈরী করে রেখেছিল। আরও একটা ব্যাপার জানা গেল। সে প্রায় তিন মাস ধরে রাত্রেতে ঘুমোয়নি। কতক-গুলো পোশাক রোজ কেটেছে আর সেগুলো সারারাত ধরে সেলাই করেছে। যে মুদীর দোকান থেকে সে বাতি কিনেছে দিনের পর দিন সে মুদীও একথা স্বীকার করেছে। আরও একটা কথা জানা গেল, শহরের ধাত্রীর কাছ থেকে প্রসবককালে করণীয় সম্বন্ধে সবকিছু জেনে এসেছে রোজালি। আর সেই ধাত্রী রোজালির জন্য পসিতে একটা চাকরিও ঠিক করে রেখেছে। রোজালিই তাকে এই চাকরির কথা বলে কারণ সে জানত এই ঘটনার জন্য বার্মারত পরিবারে তার স্থান হবে না।

আদালতে রোজালিকে হাজির করা হয়েছে এবং বার্মারত পরিবারের কর্তা ও গিন্নী দুজনে সশরীরে সাক্ষী দিতে এসেছেন। তাঁরা শুধু রোজালিকে মুখে গালাগালি করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁদের ইচ্ছা হচ্ছিল রোজালিকে যেন বিনা বিচারে গিলোটিনে চড়িয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়।

আসামী রোজালিকে সুন্দরী বলা যায়। লম্বা সুঠাম সুগঠিত চেহারা। নর্ম্যাণ্ডির নিম্ন অঞ্চলে তার বাড়ি। দাসীবৃত্তির কাজে সবদিক দিয়ে সে পটু। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে শুধু অবিরাম কাঁদছিল। কোন কথার জবাব

দেয়নি। বিচারক জুরিদের সঙ্গে একমত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে রোজালি সত্যিই তার সন্তানকে হত্যা করেছে। তবে সে যা করেছে তা ক্ষণিকের এক উন্মাদনা ও তীব্র হতাশার বশবর্তী হয়েই করেছে। তবে রোজালি যাতে নিজের মুখে দোষ স্বীকার করে তার জন্য বিচারক আর একবার চেষ্টা করলেন। আসল কথাটা এখনো জানা যায়নি। আর সেকথা রোজালিই একমাত্র বলতে পারে। রোজালি নিজের হাতে তার সন্তানকে হত্যা করলেও আগে হতে এ হত্যা সে করতে চায়নি। কারণ সাক্ষ্য প্রমাণ হতে জানা গেছে সে তার সন্তানের জন্য কাঁথা ও পোশাক তৈরী করেছে রাত জেগে।

বিচারক অনেক বুঝিয়ে রোজালিকে বললেন, জুরিরা তাকে দয়া করে তার অপরাধ মার্জনা করতে চান। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না যদি সে সব কথা পরিষ্কার করে বলে।

বিচারকের কণ্ঠে করুণার পরিচয় পেয়ে মুখ খুলল রোজালি। বিচারক তাকে প্রথমে প্রশ্ন করলেন, বল কে তোমার সন্তানের জনক ?

রোজালি তার মালিকদের পানে তাকিয়ে বলল, জোশেফ বার্মারত। মালিকের ভাইপো।

বার্মারত ও তাঁর স্ত্রী শুনে চীৎকার করে আপত্তি জানিয়ে বললেন, মিথ্যা কথা।

বিচারক তাঁদের থামিয়ে রোজালিকে সাহস দিয়ে বললেন, তুমি সব কথা বলে যাও। বল, কেমন করে এ ঘটনা ঘটে।

অভয় পেয়ে রোজালি বলল, আমি যে বাড়িতে কাজ করতাম সেখানে একবার জোশেফ বার্মারত গ্রীষ্মের ছুটি কাটাবার জন্য বেড়াতে আসে।

বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, মঁসিয়ে জোশেফ বার্মারত কি করেন ? তার পেশা কি ?

রোজালি উত্তর করল, সৈন্য বিভাগে চাকরি করে। একজন আণ্ডার অফিসার। গত গ্রীষ্মে ছ'মাস সে বাড়িতে ছিল। আমার কোনদিকে কোন দৃষ্টি না থাকলেও সে আমার দিকে প্রায়ই তাকাত। তারপর একদিন প্রেম নিবেদন করে আমাকে। সে বলে আমি দেখতে খুব সুন্দরী।

আমাকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। তাকে দেখেও অবশ্য আমার পছন্দ হয়েছিল। আমাকে কেউ ভালবাসতে পারে, আমার প্রতি কেউ সহানুভূতি জানাতে পারে সেকথা আমি জীবনে ভাবতেই পারতাম না। মনের কথা বলার কোন লোক ছিল না আমার—মা বাবা, ভাই, বোন, বন্ধুবান্ধব কেউ না। তাই জোশেফের কথা আমার খুব ভাল লাগত। সে একদিন আমাকে নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে যায় সন্ধ্যের সময়। আমার কোমরটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। আমি এসব চাইনি। আমি চীৎকার করে প্রবল আপত্তি

জানাতে চাইছিলাম। কিন্তু পারলাম না। মৃদুমন্দ বাতাস আমার সারা গায়ে যেন হাত বুলিয়ে আমাকে চুপ করিয়ে দিল। নীল আকাশ থেকে নদীর জলের উপর ঝরেপড়া চাঁদের স্বচ্ছ আলো যেন আমার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিল। কেমন যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমি জোশেফকে বাধা দিতে পারলাম না। সে আমার দেহটাকে ইচ্ছামত উপভোগ করতে লাগল। এই ভাবে তিন সপ্তা চলল। তারপর সে একদিন চলে গেল। তার সঙ্গে আমি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারতাম। কিন্তু সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল না। প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি। মাস দুই পরে বুঝতে পারলাম আমি মা হতে চলেছি।

এই বলে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রোজালি। বিচারক আবার তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, বলে যাও বৎসে।

রোজালি আবার বলতে শুরু করল, একথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে শহরের ধাত্রী মাদাম বোদিনকে বললাম। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলাম। ছেলেটার জন্য রাত জেগে পোশাক বানালাম। আর একটা চাকরির চেষ্টা করতে লাগলাম। কারণ আমি জানতাম ওরা আমায় বরখাস্ত করবে। আমার সন্তানকে পালন করার জন্য, কিছু কিছু করে সঞ্চয় করতে লাগলাম। একদিন রাত্রিকালে শোবার সময় প্রসব বেদনা উঠল আমার। আমি মেঝের উপর শুয়ে পড়লাম। মাদাম বোদিনের কথামত সবকিছু করলাম। দু-তিন ঘণ্টা যন্ত্রণার পর আমার সন্তান ভূমিষ্ট হতেই তাকে বিছানার উপর শুইয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর আবার একবার প্রসব বেদনা উঠল আমার এবং আর একটি সন্তান ভূমিষ্ট হলো। প্রথম সন্তানকে দেখে আমি খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর দুশ্চিন্তায় কালো আর কুটিল হয়ে উঠল আমার মনটা। আমার সব মাতৃস্নেহ উবে গেল কোথায়। মাসে যার মাত্র কুড়ি ফ্রা মাইনে সে দুটি সন্তানকে কেমন করে মানুষ করতে পারে। কেমন করে পালন করতে পারে বলুন? আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল। চোখে সব অন্ধকার দেখতে লাগলাম আমি। একে কলঙ্কের বোঝা, তার উপর অর্থ চিন্তা। আমার কি হলো, আমি ছেলে দুটির উপর বালিশ চাপা দিয়ে তার উপর বসে পড়লাম। শুয়ে পড়লাম, গড়াগড়ি দিতে লাগলাম আর কাঁদতে লাগলাম। এমনি করে কোনদিকে রাতটা কেটে গেল। ভোরের আলো উঁকি মারতে লাগল রুদ্ধ জানালায়। আমি উঠে বালিশ সরিয়ে দেখলাম তারা নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। আমি একটা কোদাল নিয়ে তাদের মৃতদেহ দুটি বাগানের একধারে যতটা সম্ভব খাল করে দুজনকে দু জায়গায় কবর দিলাম।

রোজালি যখন তার কথা বলছিল তখন জুরিরা বার বার চোখের জল মুছছিল। মেয়েরা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। বিচারক রোজালিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর একটি ছেলেকে বাগানের কোনখানে কবর দাও?

রোজালি বলল, কুয়োতলার কাছাকাছি।

এই বলে রোজালি খুব জোরে কেঁদে উঠল। বিচারক তাকে মুক্তি দিলেন।

মিথ্যা ভয়

[False alarm]

ফ্রেমিকোর্ত বলল, পিয়ানো আমি মোটেই দেখতে পারি না, কেন জানি না মেহগনি কাঠের বাদ্যযন্ত্রটার প্রতি আমার আছে একটা দারুণ ভীতি। কোন পিয়ানো দেখলেই আমার মনে হয় কোন এক সুন্দরী যুবতী চাঁপার কলির মত তার সুন্দর আঙুল দিয়ে সেটা বাজিয়ে চলেছে আর তার পানে তাকিয়ে আছে জনকতক অদৃশ্য শ্রোতা। কত মেয়েকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অযথা আটকে রেখে দেওয়া হত ঐ পিয়ানোতে।

পিয়ানোর প্রতি কোনদিন আমার কোন মোহ ছিল না। তবু একটা পিয়ানো আমায় বাধ্য হয়ে কিনতে হয়েছিল। কিনতে হয়েছিল আমার প্রেয়সী লালীর জন্য। লালীর মত সুন্দরী প্রেয়সী যদি কিছু চায় তা না দিয়ে পারা যায় না। পিয়ানো ত সামান্য কথা, আমি আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতে পারতাম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় পিয়ানোটা আমার বড় অপয়া। মাসিক কিস্তিতে টাকা শোধ দেওয়ার শর্তে মোটা দাম দিয়ে পিয়ানোটা কিনেছিলাম। কিন্তু কোন ফল হলো না। তাতে চারখানা গান শিখতে না শিখতেই একদিন হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে গেল লালী। সে যেমন হঠাৎ একদিন আমার জীবনে এসে হাজির হয়েছিল, আমার অন্তরের সব ভালবাসা কেড়ে নিয়েছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল সে। আমি তার কারণটা ঠিক বলতে পারব না। হয়ত সে অন্য কাউকে ভালবেসেছিল অথবা সে হয়ত একজনের সঙ্গে বেশীদিন ঘর করতে পারে না।

যাই হোক, লালী আমাকে ফেলে চলে যাওয়ায় বাড়িখানা আমার শূন্য হয়ে গেল। এত সুন্দর করে সাজানো ঘরগুলো খাঁ খাঁ করতে লাগল। আমার মনের শূন্যতাটা হয়ে উঠল আরো দুঃসহ। কারণ লালীর অভাবটা হঠাৎ

কাউকে দিয়ে কোনভাবে পূরণ করতে পারলাম না। সেটা সম্ভবও নয় বোধ হয়। আমি তখন বেশ বুঝতে পারলাম কোন পুরুষের জীবনে প্রেমের পশরা নিয়ে কোন এক নারী আবির্ভূত হওয়ার পর হঠাৎ যদি সে চলে যায় তাহলে সে পুরুষ এক নিদারুণ অসহায়তাবোধে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তাকে আবার নূতন করে জীবন শুরু করতে হয়। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমাকে সহসা হারিয়ে যে চলমান জীবন হতে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে, সে জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অনেক সময় লাগে তার।

এমন সময় আমি কিছুদিনের জন্য ভেনিসে গিয়ে কাটাবার মনস্থির করে ফেললাম। চমৎকার শহর ভেনিস। বায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনেরও পরিবর্তন হবে। অতীতের কত ধ্বংসাবশেষ তার চারদিকে। ভেনিসে নাকি আমেরিকান, শ্লাভ, ভিয়েনীজ, ইতালীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে এসে ভিড় জমায়। অতীতের ইতিহাসের এক বিষণ্ণ নীরবতার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা ভেনিসের মধ্যে যেন নতুন করে প্রাণসঞ্চার করেছে সেইসব মেয়েরা। বলা যায় না, তাদের মধ্যে একজনকে আমি আমার জীবনসঙ্গিনী হিসাবে নির্বাচিত করে নিতেও পারি।

ঠিক হলো, আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘর দেখাশোনা করবে মাদাম পিকুইগনোল। সে আমার ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম একাই করত। গৃহকর্মে পটু পিকুইগনোল একাই একশো। এমন সময় একদিন আমার বন্ধু স্ট্যানিস এসে একটা অনুরোধ করল। আমি যতদিন ভেনিসে থাকব সে ততদিন আমার ঘরে বাস করবে। আসলে ব্যাপারটা হলো এই যে সে মাদাম ক্রেজুস নামে এক বিবাহিতা মহিলাকে ভালবাসত। কিন্তু স্ট্যানিসের নিজস্ব কোন ঘর ছিল না। সে কোন হোটেলে থাকত। মাদাম ক্রেজুসের স্বামী মঁসিয়ে ক্রেজুস ওথেলোর মত দারুণ ঈর্ষাপরায়ণ ও সন্দেহবাতিক লোক। সেজন্য স্ত্রীর কোন পুরুষ বন্ধু তার বাড়িতে যেতে পারত না। স্ট্যানিস তাই আমাকে বলল তার অবর্তমানে সে আমার বাড়িতে তার প্রণয়িনীর সঙ্গে নির্বিঘ্নে মিলিত হতে পারবে।

প্রথমে আমি তার কথায় রাজী হতে পারিনি। যে ঘরের বাতাসে আমার বিগত প্রেমের কত স্মৃতি কত চুম্বন আজও ভেসে বেড়াচ্ছে সেই ঘরে অন্য এক প্রেমিক প্রেমিকা এসে তাদের প্রেমমিলনের নিবিড়তা দিয়ে আমার সেই প্রেমের অশরীরী শুচিতাকে নষ্ট করে দেবে, তার স্মৃতিকে নিষ্পেষিত করে দেবে, এটা আমি চাইনি। কিন্তু স্ট্যানিস কোনমতেই ছাড়ল না। তাই আমি রাজী হয়ে গেলাম।

কিন্তু পরে জানলাম, আমার পিয়ানোটার জন্য একদিন ওরা বিপদে পড়ে যায়। একদিন যখন আবার সেই সুসজ্জিত সুন্দর ঘরে ওরা স্বামী-স্ত্রীর মতই মিলিত হয়েছিল, মাদাম ক্রেজুস তখন সবেমাত্র ঠাণ্ডা জলে স্নান করে প্রসাধন

সেরে স্ট্যানিসের প্রেমালিঙ্গনে ঢলে পড়েছিল, এক আকর্ষণীয় স্বপ্নের আবেশে চোখের পাতা মুদ্রিত হয়ে আসছিল মাদাম ক্রেজুসের ঠিক তখনি হলো বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। দু-তিনজন লোক এসে আমার অর্থাৎ বাড়ির মালিক ক্রেমিকোর্তের খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু ব্যাপারটা না বুঝেই পিকুইগনোল কোনমতে স্ট্যানিসকে পিছনের দরজা দিয়ে বার করে দিয়ে বলল, তুমি চলে যাও, মাদামের ভার আমি নিলাম।

লোকগুলো ক্রেমিকোর্তের খোঁজ করতে পিকুইগনোল বলল, এখানে এখন ক্রেমিকোর্ত থাকে না। তখন লোকগুলো বলল, তাহলে পুলিশ নিয়ে আসব।

এই কথা শুনে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল মাদাম ক্রেজুস। তার সুন্দর গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল নীরবে। সে ভাবল, নিশ্চয় ওরা পুলিশ নিয়ে এসে ওর অবৈধ গোপন প্রেমচর্চা ধরে ফেলবে। চারদিকে প্রচারিত হয়ে যাবে ওর কলঙ্কের কথা আর ওর স্বামী মামলা রুজু করবে আদালতে।

এমন সময় পিকুইগনোল এসে মাদাম ক্রেজুসকে বার বার বুকের উপর টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল মাদাম ক্রেজুস। হঠাৎ জোর চেঁচা-মিচিতে ঘুমটা ভেঙ্গে যায় তার। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে কে ডাকছে। পরে ভাল করে দেখল অন্য কেউ না। স্ট্যানিস ডাকছে।

পিকুইগনোল দরজা খুলে দিতেই স্ট্যানিস বলল, যাক ভয়ের কিছু না। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম আমার বন্ধু ক্রেমিকোর্ত কিস্তিতে যে পিয়ানোটা কিনেছিল সেই পিয়ানোর মাসিক কিস্তি আদায় করতে এসেছিল লোকগুলো, অন্য কিছু নয়।

পিকুইগনোল রেগে বলল, চুলোয় যাক পিয়ানোটা।

এইভাবে যে বাঁকাচোরা পথ ধরে স্ত্রী হিসাবে তার সুনামটা অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিল মাদাম ক্রেজুস সে সব তাকে সঠিক লক্ষ্যতেই পৌঁছে দেয়। তার জন্য তাকে পুরস্কার দান করা উচিত।

প্রেমের একটি দিক

[One phase of love]

পাগলাগারদের একটি ঘরে একটি বেতের চেয়ারে একটি পাগল আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। ঘরখানার একদিকের দেওয়ালের উপর একটামাত্র জানালা ছিল। পাগলটা ছিল রোগা-রোগা চেহারার, মাথার চুলে পাক ধরেছে। মুখখানা শুকনো এবং বিষাদে ভরা। দেখলেই বোঝা যায় একটা প্রবল দুশ্চিন্তা ওর দেহের সব সুষমাকে অনবরত কুরে-কুরে খাচ্ছে, ওর দেহের সব রক্তকে শোষণ করে নিচ্ছে, ওর জীবনের দীপটাকে নিবিয়ে দিচ্ছে।

কী আশ্চর্য! কীটদষ্ট একটা সুন্দর ফলের মত এই লোকটা শুধু একটা অদৃশ্য চিন্তার দংশনে মারা যাবে। কিন্তু সেই ভয়াবহ চিন্তাটা কি যা তার সারা মুখটাকে বিধ্বস্ত ও জর্জরিত করে দিয়েছে?

পাগলাগারদের ডাক্তার আমাকে বললো, একধরনের ব্যর্থ প্রেমের আঘাতেই ও পাগল হয়ে গেছে। তবে ও ওর জীবনের সেই ভয়ঙ্কর প্রেমের সব কথা লিখে রেখেছে। লেখাটা ইচ্ছা করলে আপনি দেখতে পারেন।

ডাক্তারের কাছ থেকে খাতাটা নিয়ে আমি একমনে পড়তে লাগলাম।

'আমার জীবনের বত্রিশটা বছর বেশ ভালভাবেই কেটে যায়। কোন ভালবাসার নেশা কখনো জাগেনি আমার মনে। কিন্তু কোন মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় যে একেবারে ছিল না তা নয়। তবে কাউকে বিশেষ আপন করে একান্তভাবে ভাববার কোন বাসনা কোনদিন জাগেনি আমার মধ্যে। নিতান্ত শান্ত সহজ ও সরলভাবে কেটে যাচ্ছিল আমার জীবনটা।

আমার আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল এবং আমাকে ধনী বলা চলে। জীবিকা অর্জনের জন্য আমাকে কোন কাজ করতে হত না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি খুশিমত ঘুরে বেড়াতাম। তবে আমার একটা নেশা ছিল। পুরনো সৌখীন কোন আসবাবপত্র দেখলেই আমি তা কিনে নিতাম। পুরনো সেই-সব আসবাব বাড়িতে নিয়ে এসে আমি ভাবতাম তাদের কথা যারা সেগুলো একদিন ব্যবহার করত। অতীতের সেই সব অপরিচিত লোকদের মূর্তিগুলো কল্পনা করে নিয়ে তাদের কথা ভাবতে ভাল লাগত আমার। একবার অর্ধ শতাব্দীর আগেকার একটি অতি সৌখীন হাতঘড়ি কিনে এনে আমি কত

কথা ভাবতাম। মেয়েটি নিশ্চয় খুব সৌখীন ছিল। নিশ্চয় সে এটাকে খুব ভালবাসত। তার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে এই ছোট্ট ঘড়িটা টিক টিক করে চলত। তার সুন্দর চোখের দৃষ্টি কতবার নিবদ্ধ হয়েছে এর কাঁটার উপরে।

একবার একটা খুব সুন্দর ইতালীয় দেরাজ কিনে আনি। বাড়িতে এনে সেটার সব দিক দেখতে দেখতে একটা গোপন জায়গা খুঁজে পাই। তার মধ্যে একটা ছোট্ট ভেলভেটের বাক্সে একগাছি সোনালী চুল সযত্নে ভরা ছিল। সেটা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। চুলটা কোন নারীর; কিন্তু কেন এবং কে-ই বা এটা এখানে রাখল এই নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু করে দিলাম। মেয়েটির প্রেমিক অথবা স্বামী কি বিদায়ের দিনে তার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তার এই সোনালী একগাছি চুল কেটে রাখে? অথবা এমনও হতে পারে কোন প্রণয়ী বা স্বামী তার প্রিয়তমাকে কবর দেবার সময় তার মাথার একগাছি সোনালী চুল কেটে সযত্নে রেখে দেয়। সত্যিই কী অমূল্য অবিনশ্বর রত্ন এই চুল! সত্যিই মাথার মণি। মানুষের দেহ কত নশ্বর, তা যত সুন্দর হোক রাখা চলে না। কিন্তু একগাছি চুল মাথা হতে কেটে রেখে দিলে যুগ যুগ ধরে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সত্যি কথা বলতে কি, কার চুল তা আমি না জানলেও সেই অজ্ঞাতনামা মেয়েটার জন্য চোখে জল আসে আমার। যাই হোক, সেই ভেলভেটের বাক্সে চুলটাকে রেখে দিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমার মনে হতে লাগল আমি যেন সেই মেয়েটিকে না দেখেই ভালবেসে ফেলেছি। প্রথম প্রেমে পড়ার সময় মানুষের মনে যে অশান্ত অবস্থা হয়, সহসা নিরাশার দ্বন্দ্বে যেভাবে তার মনটা দুলতে থাকে আমারও তাই হচ্ছিল। হঠাৎ একটা কবিতার কথা মনে পড়ল আমার। কোথায় সেই সুন্দরী ফুলপরী? কোথায় হাসির আলো আর অশ্রুর ঝর্ণাঝরা মুখ···ইত্যাদি। বাড়ি ফিরে আবার সেই দেরাজ খুলে আবার সেই চুলটা দেখার ইচ্ছা হলো।

আমি চুলটাকে বার করে আদর ও চুম্বন করে আবার ভেলভেটের বাক্সটার মধ্যে রেখে দিলাম। সহসা মনে হলো এটা একটা চুল নয়, যেন একটা জীবন্ত মানুষ বন্দী হয়ে ভরা আছে এক গোপন স্থানে।

ঠিক যেমন কোন মানুষ কোন নারীকে ভালবাসে সেইভাবে আমি ভালবাসতে লাগলাম চুলটাকে। শুধু একগাছি সোনালী চুল। আমি কিন্তু সেই চুলটাকে হাতে ধরে আমার গালে রেখে তাকে চুম্বন করার সময় তার স্পর্শের মধ্যে এক জীবন্ত নারীদেহের আস্বাদ পেতাম।

আমি আমার শোবার ঘরে বারোমাস শুতাম। একদিন রাত্রিতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো কোন মৃত নারী আমার ঘরে এসেছে। আমি উঠে গিয়ে বাক্স খুলে চুলটা বার করে চুম্বন করে সেটা রেখে দিলাম। কিন্তু তাতে আমার তৃপ্তি হলো না। চুলটাকে আমি আমার

বিছানায় নিয়ে এলাম। আমার ঠোঁটের উপর সেটাকে রেখে দিয়ে তার স্পর্শসুখ উপভোগ করতে লাগলাম।

তন্দ্রা আসতে না আসতেই কেবলি মনে হতে লাগল যার চুল সেই নারী এসেছে আমার ঘরে। এক নশ্বর নারীদেহ আমার গায়ে গা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। আমার মনে হলো মৃতরাও আসতে পারে। মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে।

এরপর থেকে আমি নিদ্রাহীনতায় ভুগতে লাগলাম। বাইরে খুব একটা বেরোতাম না। চুলটাকে নিয়ে দিন রাত ধরে ঘরেই থাকতাম। বাইরে বেরোলে চুলটাকেও সঙ্গে নিতাম। বার বার ভেলভেটের বাক্স খুলে দেখতাম। তাতে লোকের সন্দেহ হতে লাগল। এইভাবে একদিন পাঁচজনের চোখ পড়ায় আমার সেই চুলটা কেড়ে নেয়। আমার বহুমূল্যবান সেই সম্পদটা কেড়ে নিয়ে ওরা আমায় পাগলাগারদে দেয়।'

আমার পড়া শেষ হয়ে গেল। ডাক্তার উঠে গিয়ে একগাছি সোনালী চুল আমার হাতে এনে দেন। চুলটা দেখে আমার মনে হলো যেন একটা সোনালী পাখি আমার দিকে উড়ে আসছে। সেটাকে দেখে দু ধরনের ভিন্ন অনুভূতি জাগল আমার মনে। একবার রাগ হলো। কোন হত্যাকারীকে দেখলে যে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ জাগে মানুষের মনে সেই ক্রোধ জাগল আমার মধ্যে। কখনো কোন রহস্যময় বস্তু দেখলে সেটাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিবিড়তা দিয়ে জানায় ও তার আস্বাদ গ্রহণ করার যে মৃদুশিহরিত বাসনার একটা কাঁপন জাগে, আমার মধ্যেও তাই জাগছিল। সোনালী চুলটাকে আমারও চুম্বন করতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

ডাক্তার বললেন, মানুষ না পারে এমন কোন কাজ নেই।

কয়েকটি সুযুক্তি

[Good reasons]

সোলে ভিলা, জুলাই ৩০, ১৮৮৩

প্রিয় লুসি,

কোন নূতনত্ব নেই। সেই একঘেঁয়ে জীবন যাপন করছি। এখন বর্ষাঋতু চলছে। প্রায়ই একটানা বৃষ্টি নামে আর জানালা দিয়ে চোখ বার করে তাই দেখি। এছাড়া আর কি করব বল। তবে হাঁ, মাঝে মাঝে আর একটা কাজ করি। আমরা আজ কয়েকজন মিলে এক একটা মিলনাত্মক নাটক অভিনয় করি।

কিন্তু নাটকগুলো ভাল নয়। এই নাটকগুলো যারা লিখেছেন তাঁদের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। তাঁরা যে সব কথা লিখে আমাদের দেখিয়েছেন তাতে চমক আছে, কিন্তু সে সব কথার সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের কোন মিল নেই। আমাদের প্রচলিত জীবনযাত্রার উপর তাঁরা কটাক্ষ করুন, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু দুঃখের কথা আমাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁদের সম্যক জ্ঞান নেই। আর এই জ্ঞান অর্জন না করেই তার উপর নাটক লিখতে গেছেন।

আমরা বর্তমানে সত্যিই একটা নাটক মঞ্চস্থ করছি। কিন্তু আমাদের দলে মাত্র দুজন মেয়ে থাকায় আমার স্বামীকে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে মেয়ের অভিনয় করতে হচ্ছে। আর আমার স্বামী দাড়ি গোঁফ কামানোর জন্য এমনভাবে তার মুখটা বদলে গেছে যে তাকে চেনা যায় না। রাতে শুয়ে মনে হয় সে যেন অন্য মানুষ।

আসল কথা আমার মতে কোন পুরুষের দাড়ি না থাক ক্ষতি নেই, কিন্তু সে যেন কখনো তার গোঁফ না কামায়। আমার সেই তেলপারা মুখখানা দেখে মনে হয়েছিল ঠিক যেন কোন পাদ্রী।

তোকে সাবধান করে দিচ্ছি লুসি, তুই যেন কখনো এমন কোন লোককে চুম্বন করবি না যার কোন মোচ নেই। মোচ না-থাকা পুরুষের চুম্বনে কোন আস্বাদ নেই। কোন রোমাঞ্চ নেই। কোন পুরুষ আমাদের মুখে অথবা ঘাড়ে চুম্বন করার সময় তার মোচের চুলগুলো যখন আমাদের মুখে অথবা ঘাড়ের উপর লাগে তখন এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতির শিহরণ খেলে যায় আমাদের শিরায় শিরায়। এক এক সময় ওই মোচের চুলগুলোতে বিরক্ত লাগতে পারে কিন্তু তবু ভাল লাগে।

দাড়ি গোঁফ কামানো কোন পুরুষের মুখ দেখলে আমার বৃক্ষহীন অরণ্যের

কথা মনে পড়ে। মনে কর, কোন ক্লান্ত মানুষ অরণ্যসমাচ্ছন্ন কোন পার্বত্য ঝর্ণায় জলপান করতে গিয়ে দেখল কোথাও কোন গাছ নেই যার তলায় বসে বিশ্রাম করতে পারে। তেমনি পুরুষের মুখে যদি দাড়ি গোঁফ না থাকে তাহলে সেই ন্যাড়া ন্যাড়া মুখে মেয়েরা আশ্রয় পাবে কোথায় ?

তবে আমি দাড়ি রাখার কোন যুক্তি দেখিনা। কারণ মুখে একমুখ দাড়ি থাকলে মানুষের মুখের আসল গঠন বা আকৃতিটাই বোঝা যায় না ঠিকমত। আবেগ অনুভূতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মুখের ভাবের মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যায়, হর্ষ বা বিষাদকালে যে সব রেখা ফুটে ওঠে মুখের উপর দাড়ি থাকলে তা দেখা যায় না। কিন্তু মোচটা থাকলে এ ধরনের কোন অসুবিধা হয় না। বরং মোচই পুরুষের পুরুষত্বের লক্ষণ। নারীর মুখ থেকে পুরুষের মুখের পার্থক্য নির্দেশ করে এই মোচ।

তাছাড়া সব পুরুষের মোচ আবার এক নয়। আর এই মোচের তারতম্য অনুসারে পুরুষের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বোঝা যায়। যেমন ধর, একধরনের মোচ আছে যা স্বল্প বাঁকা আর লীলায়িত। যারা এই ধরনের মোচ রাখে সেই সব পুরুষরা বড় মেয়েন্যাওটা হয়। তারা বড় নারীলোলুপ হয়। আবার যাদের মোচটা স্বল্প ও সুঁচলো এবং সোজা তারা দুষ্ট প্রকৃতির হয়। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ আর মদ-মাংস ভালবাসে। আবার যাদের মোচগুলি বেশ বড় বড় এবং ঝুলে পড়ে তারা খুব ভালমানুষ হয়। তাদের চরিত্র ভাল হয়।

যাই হোক, এই মোচ আমাদের জাতীয় লক্ষণ। আমাদের দেশের পূর্ব-পুরুষরা মোচ রাখতেন। একবার এক যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের কতকগুলি মৃতদেহের মাঝখান থেকে মোচ দেখে ফরাসীদের চিনতে পারা গিয়েছিল। যাই হোক, বিদায়।

গিলেমত পাহাড়

[Guillemot rock]

গিলেমত শিকারের ঋতু সুরু হয়েছে।

এপ্রিল আর মে মাসে প্যারিস থেকে স্নানার্থীরা দল বেঁধে আসার আগেই ইত্রেতাতের সমুদ্রতীরে হঠাৎ কয়েকজন বৃদ্ধকে দেখা যাবে। তাঁদের পায়ে হিলতোলা জুতো আর গায়ে শিকার করার আটসাঁট পোশাক। হোটেল হ্যাভিলিতে তাঁরা চার পাঁচ দিন কাটান; তারপরে উধাও হয়ে যান। তিন সপ্তাহ পরে আবার তাঁরা ফিরে আসেন; কয়েক সেকেণ্ড পরে চিরকালের জন্যে চলে যান।

আবার পরের বসন্তে তাঁরা ফিরে আসেন। তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর আগে অনেক শিকারী এখানে আসতেন; এখন আর তাঁদের দেখা যায় না। বর্তমানে এই ক'জনই কেবল সেই ঐতিহ্যের শেষ প্রতিনিধি।

গিলেমত একজাতীয় অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বিদেশী পাখি। অদ্ভুত এদের অভ্যাস। সারা বছরই এরা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের আশে পাশে আর সান্ত পেইয়ী এবং মিকিলন দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। ডিম পাড়ার সময় আটলান্টিক পেরিয়ে প্রতিটি বছর তারা একই জায়গায় ফিরে আসে, ডিম পাড়ে, ডিমে তা দেয়। এই বিশেষ জায়গাটির নাম গিলেমত পাহাড়। আর কোথাও তারা বসে না। এইখানেই শিকারীরা তাদের গুলি ক'রে মারে। তবু বছর-বছর ঝাঁকে-ঝাঁকে এইখানেই তারা আসে। তারপরে বাচ্চারা উড়তে শিখলেই তারা উড়ে যায়। আবার ফিরে আসে এক বছর পরে। এদের সংখ্যা বেশী নয়—বড় জোর শ'য়েক খানেক। কবে যে এদের বৃদ্ধ প্রপিতামহেরা এখানে প্রথমে এসেছিল তা আমরা জানিনে। তাদের উত্তরাধিকারীরা এখনও সেই স্মৃতি স্মরণ করেই এখানে আসছে।

আর প্রতিটি বসন্তে তাদের সঙ্গে আসছে সেই সব শিকারীর দল। অঞ্চলের দেহাতী মানুষেরা তাদের চেনে তাদের সেই যৌবন থেকে। এখন সেই সব শিকারীরা বৃদ্ধ হয়েছে। তবু এই তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর ধরে তারা তাদের এই বাৎসরিক মিলন অটুট রেখেছে। কোন কিছুর লোভেই এই সুযোগটি তারা হারাতে রাজি নয়।

কয়েক বছর আগে এক এপ্রিল সন্ধ্যার কথা বলছি। তিনজন গিলেমত শিকারী আগেই হাজির হয়েছেন। একজন তখনও আসেন নি। তাঁর নাম মঁসিয়ে ত্য আরনেলস। তিনি এঁদের কাউকেই কোন সংবাদ দেন নি। অথচ অন্য শিকারীদের মত মারাও তিনি যান নি। মারা গেলে, এঁরা সে-সংবাদ পেতেন। অনাগতের জন্যে অপেক্ষা ক'রে-ক'রে ক্লান্ত হয়ে তিনজন খেতে বসলেন। এঁদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় হোটেলের চত্বরে গাড়ী ঢোকার শব্দ হল। তারই সামান্য একটু পরে শেষ শিকারীটি এসে পৌছলেন।

হাত ঘষতে-ঘষতে নবাগত মহানন্দে খেতে বসলেন; বেশ পেট ভরেই খেলেন। তাঁর গায়ে ফ্রককোট দেখে তাঁর একজন সঙ্গী অবাক হয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন—ওঃ জামা পালটানোর সময় পাই নি আমি।

খুব ভোরে ওঠার তাগিদেই তাঁরা ঘুমোতে চলে গেলেন। এই প্রভাত অভিযানের মত আরামের জিনিস আর নেই। তখনও প্রভাতের কোন চিহ্ন থাকে না; নক্ষত্ররা একটু নিষ্প্রভ হয়ে যায় এইমাত্র। সমুদ্রের ঢেউ-এ পাথরগুলো নড়তে থাকে। বেশ মোটা জামা গায়ে থাকা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা বাতাসে হাড়ের ভেতরে শিকারীদের কাঁপুনি ধরে যায়।

দুটি নৌকোর ওপরে তাঁরা চড়েন। নাবিকরা নৌকো দুটিকে জোরে ঠেলে দেয়। সেই ঠেলায় নৌকো দুটি ক্যানভাস ছেঁড়ার মত শব্দ করতে-করতে কুঁচো পাথরের ওপর দিয়ে হড়কাতে-হড়কাতে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ে। ঢেউ-এর ওপরে নাচতে-নাচতে নৌকো দুটি এগোতে থাকে ; পালগুলি বাতাসে থাকে কাঁপতে। তারপরে আধো আলো অন্ধকারে নদীর মোহনার দিকে এগিয়ে যায়। ধীরে-ধীরে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে—চোখের ওপরে দেওয়ালের মত ভেসে ওঠে শ্বেতবর্ণের দীর্ঘ তটরেখা। ধীরে-ধীরে এগোতে-এগোতে হঠাৎ তাঁরা একটি তটরেখার কাছে এসে পড়েন। এখানে অজস্র সামুদ্রিক চিলেরা ঝাঁকে-ঝাঁকে বসে থাকে। তারই পেছনে গিলেমত পাহাড়।

পাহাড় নয়, পাহাড়ের মাথার ওপরে ছোট একটা ঢিপির মত। তারই ভেতর থেকে পাখিদের মাথাগুলি উঁচু হ'য়ে নৌকো দুটির দিকে তাকিয়ে থাকে। চুপচাপ বসে থাকে তারা—অপেক্ষা করে। উড়ে যেতে সাহস করে না। ঘাড়টাকে উঁচিয়ে প্যাট প্যাট ক'রে তাকিয়ে থাকে তারা। দেখলে মনে হবে অজস্র বোতল বসে রয়েছে। ছোট-ছোট পা দিয়ে যখন তারা হেঁটে যায় তখন মনে হয় তারা গড়িয়ে যাচ্ছে। উড়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ তাদের গতিসঞ্চার হয় না। মাঝে-মাঝে টুকরো পাথরের মত তারা ধপাস ক'রে পড়ে যায়। তাদের এই দুর্বলতার কথা তারা জানে ; এর মধ্যে যে বিপদ রয়েছে তা-ও হয়ত তাদের অজানা নেই। এহেন অবস্থায় উড়ে যাবে কি না তা-ও তারা ঠিক করতে পারে না।

কিন্তু জেলেরা হইচই জুড়ে দেয় ; নৌকোর গলুই-এর ওপরে কাঠ ঠুকে ঠুকে শব্দ করে। পাখিগুলো ভয় পেয়ে একটা-একটা ক'রে উড়ে ঢেউ-এর ওপরে ভাসতে থাকে। তারপরে জলের ওপরে পাখার ঝাপটা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তীব্র বেগে উড়ে যায়। ঠিক এই সময়েই শিকারীরা তাদের লক্ষ্য ক'রে বন্দুক ছোঁড়ে।

এক ঘণ্টা ধরে এইভাবে গুলি খেয়ে তারা উড়ে যেতে বাধ্য হয়। কখনও-কখনও মাদী পাখিরা ডিমে তা দিতেই থাকে। এত গোলমালেও তারা উড়ে যেতে রাজি হয় না। ফলে তারাই গুলির পর গুলি খায়। তাদের প্রাণহীন দেহগুলি রক্তে লাল হ'য়ে ওঠে। ডিমের ওপরে তা দিতে-দিতেই তারা মারা যায়।

প্রথম দিনেই মঁসিয়ে দ্য আরনেলস তাঁর স্বাভাবিক উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে শিকার করলেন। কিন্তু বেলা প্রায় দশটার সময় শিকার ক'রে ফিরে আসার পথে তাঁকে কেমন যেন চিন্তাগ্রস্ত দেখা গেল। ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে কেমন যেন অস্বাভাবিক। হোটেলে ফিরে আসার পর কালো পোশাক-পরা চাকর-শ্রেণীর একটি লোক এসে তাঁকে ফিসফিস ক'রে কী যেন বলল। একটু ভাবলেন তিনি ; কিছুটা ইতস্ততও করলেন, তারপরে বললেন—না।

আগামী কাল।

পরের দিন আবার শিকারে গেলেন; কিন্তু মাঝে-মাঝে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে লাগলেন তিনি। এমন কি যে সব পাখি তাঁর বন্দুকের ডগায় পড়ল তাদেরও মারতে পারলেন না তিনি। তিনি প্রেমে পড়েছেন, না কোন দুশ্চিন্তা করছেন—বন্ধুরা ঠাট্টার ছলে তাঁকে এই প্রশ্ন করলে তিনি স্বীকার করলেন—হ্যাঁ; একটা দুশ্চিন্তাই তাঁকে বিমনা ক'রে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন তিনি—আসল কথাটা হচ্ছে, আমাকে এখান থেকেই সোজা চলে যেতে হবে। ভারি বিশ্রী লাগছে। তবুও উপায় নেই।

কী বললে! তুমি চলে যাবে? কেন?

ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী। আমার আর অপেক্ষা করা চলবে না।

লাঞ্চ শেষ হওয়ার পরে আবার সেই চাকরটি এসে হাজির হল। ম সিয়ে দ্য আরনেলস গাড়ী ঠিক করার নির্দেশ দিলেন তাকে। লোকটি চলে যাবে, এমন সময় তাঁর আর তিনটি শিকারী বন্ধু এসে থেকে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন। একজন বললেন—তুমি দুদিন এখানে রয়েছ। সুতরাং তোমার ব্যাপারটা মোটেই জরুরী নয়।

মঁসিয়ে দ্য আরনেলসকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। আনন্দ আর কর্তব্যের মধ্যে কোন্‌টা আগে দেখে মনে হ'ল তিনি তা ঠিক করতে পারছেন না।

কিছুক্ষণ রীতিমত চিন্তার পরে তিনি ইতস্ততঃ ক'রে বললেন—ব্যাপারটা—মানে—ব্যাপারটা কী জান? আমি একা আসি নি। আমার জামাইও রয়েছে আমার সঙ্গে।

সবাই প্রায় একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলেন—জামাই? কোথায়?

অস্বস্তি আর লজ্জা পেয়ে আরনেলস বললেন—কেন? তোমরা জান না? মানে—মানে—সে রয়েছে ঘোড়ার আস্তাবলে—মানে, তার মৃতদেহটা।

কেউ আর কথা বলতে পারল না।

আরও অস্বস্তির সঙ্গে আরনেলস বললেন—তাকে হারানো আমার পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। তার মৃতদেহটা নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলাম। মাঝপথে ঘুরে গেলাম। ভাবলাম—আমাদের এই বাৎসরিক মিলনে যোগ দিয়ে যাই একটু। এখন বুঝতে পারছ তো কেন আমি তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাই?

তখন আর সকলের চেয়ে দুঃসাহসী এক বন্ধু বললেন—কিন্তু—কিন্তু—জামাই তো মারা গিয়েছে—আর একটা দিন সে অপেক্ষা করতে পারে। তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।

এই কথা শুনে, বাকি দুজনেরও সৎসাহস ফিরে এল—যথার্থ, যথার্থ।

যেন বিরাট একটা বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেল এইরকম একটি দৃষ্টি দিয়ে মঁসিয়ে দ্য আরনেলস তাঁদের দিকে তাকালেন; কিন্তু তবু কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করলেন—তোমরা সত্যিই তাই মনে কর?

অবশ্য, অবশ্য। জামাই বাবাজীর এখন যা অবস্থা তাতে আরো দুই-একদিনে তার কিছু ক্ষতি হবে না।

পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শ্বশুর মশাই বললেন—এ ক্ষেত্রে আমি বরং পরশু যাব।

স্বীকারোক্তি

[The confession]

মার্গারেট ত্ত থেরলেস মৃত্যুশয্যায়। বয়স তাঁর মাত্র ছাপ্পান্ন; দেখলে মনে হবে কম ক'রে পঁচাত্তর। শ্বাসকষ্ট সুরু হয়েছে তাঁর। মাঝে-মাঝে তাঁর শরীরটা ভীষণভাবে কাঁপছে। চেহারা বিবর্ণ। চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে এদিকে-ওদিক তাকাচ্ছেন। মনে হ'ল, কিছু দেখে যেন তিনি ভয় পেয়েছেন।

তাঁর বড় বোনের নাম সুজেন। এঁর বয়েস বোনের চেয়ে ছ'বছর বেশী। তিনি বোনের বিছানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদছিলেন। মরণোন্মুখ মহিলার বিছানার পাশে ছোট একটি টেবিল টেনে আনা হয়েছে। তার ওপরে বসানো রয়েছে দুটি জলন্ত বাতি। পাদরীর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা।

মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে তৈরী হয়েছে ঘরটি। দেখলেই মানুষের মনে একটা আতংকের সৃষ্টি হয়। টেবিলের ওপরে নানা রঙের ওষুধের বোতল, ঘরের এককোণে জড় করা পোশাক-পরিচ্ছদ, মনে হচ্ছে কেউ যেন তাদের লাথি মেরে ছুঁড়ে দিয়েছে। সংসারে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। চেয়ারগুলি বিশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হবে, প্রাণের তাগিদে তারা খেয়ালখুশিমত ছুটে পালিয়ে গিয়েছে। কারণ, বিজয়ী মৃত্যু সেই ঘরেই নিজেকে লুকিয়ে রেখে অপেক্ষা করছে।

এই দুটি বোনের ইতিহাস বড় করুণ। সেই কাহিনী শুনে কেউ চোখের জল না ফেলে পারে নি।

সুজেনই বড় বোন। তিনি যৌবনে একটি যুবকের সঙ্গে প্রেমে পড়ে-ছিলেন। যুবকটিও তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তাঁদের বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই যুবক হেনরী হঠাৎ মারা গেলেন।

যুবতী সুজেনের অবস্থা তখন কী মর্মান্তিক! তিনি বললেন জীবনে তিনি আর বিয়ে করবেন না। সে-প্রতিজ্ঞা তিনি রেখেছিলেন। চিরজীবনই তিনি বিধবা হ'য়ে রয়েছেন।

মার্গারেটের বয়স তখন মাত্র বার। সে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বলল—দিদি, জীবনে তুমি অসুখী হও তা আমি চাইনে। সারাজীবন ধরে তুমি কাঁদ তা-ও আমি চাইনি। কোনদিনই আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। চিরদিন আমি তোমার কাছে থাকব। বিয়ে আমি কোনদিনই করব না।

সুজেন তাকে চুমু খেয়েছিলেন। এই শিশুর প্রীতি তাঁকে স্পর্শ করেছিল; কিন্তু তিনি তার কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি।

কিন্তু ছোট বোনটি তার কথা রেখেছিল। বাবা মায়ের অনুরোধ, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রেমিকদের অনুরোধ বিন্দুমাত্রও টলাতে পারে নি তাকে। সারা-জীবন ধরেই তারা একসঙ্গে ছিল; কেউ তাদের সরাতে পারে নি। কিন্তু মার্গারেট-ও যেন বেশ মুষড়ে পড়েছিল; হয়ত, তার এই আত্মবলিদানের জন্যে। তাড়াতাড়ি সে বুড়িয়ে যেতে লাগল; চুল পাকলো তিরিশ বছর বয়সেই। প্রায়ই সে অসুস্থ হ'য়ে পড়ত। মনে হোত, অদৃশ্য কোন পীড়াকীট তার জীবনীশক্তিটাকে যেন কুরে-কুরে খেয়ে ফেলছে।

এখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। দুটি বোনের মধ্যে তিনিই প্রথম মারা যাচ্ছেন।

গত চব্বিশটি ঘণ্টা তিনি কোন কথা বলেন নি। ভোরের বেলা তিনি কেবল বললেন—এবার পাদরীকে সংবাদ দাও; আমার সময় শেষ হ'য়ে আসছে।

পরে সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল। দরজা খুলে গেল। "কয়ার বয়" এল; তার পেছনে এলেন বৃদ্ধ পাদরী। পাদরীকে দেখেই মার্গারেট শরীরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে হঠাৎ বিছানার ওপরে উঠে বসলেন; ঠোঁট খুলে বিড় বিড় ক'রে কী যেন বলার চেষ্টা করলেন; তারপরে বিছানায় পড়ে নখ ছিঁড়তে লাগলেন; মনে হ'ল হাতের মধ্যে তিনি যেন গর্ত খুঁড়তে চান।

পাদরী তাঁর কাছে গিয়ে কপালে একটু চুমু খেয়ে মিষ্টি ক'রে বললেন—বৎসে, ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন; সাহস সঞ্চয় কর। সময় হ'য়ে এল।

বিছানার ওপরে সারা শরীরটা কেঁপে উঠল মার্গারেটের। তিনি বিড়-বিড় ক'রে বললেন—বোস বোন; শোন।

বলতে শুরু করলেন মার্গারেট। গলা থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে এল। সেই স্বর কর্কশ এবং দুর্বল।

বোন, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তটিকে আমি যে কত ভয় করতাম তা যদি তুমি জানতে।

সুজেন কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—তোমাকে ক্ষমা করার কী রয়েছে বোন? আমাকে তুমি সবই দিয়েছ, তোমার জীবনটা পর্যন্ত। তুমি একটি এনজেল।

মার্গারেট তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—থাম, থাম। আমাকে বলতে

দাও। বাধা দিয়ো না। হেনরীকে মনে রয়েছে তোমার…আমাকে বুঝতে গেলে আমি যা বলছি তা তোমাকে শুনতেই হবে। তোমার মনে রয়েছে, আমার বয়স তখন বার—মাত্র বার। কিন্তু আমি একেবারে বয়ে গিয়েছিলাম। আমার মাথায় যা আসত তা-ই আমি করতাম। …শোন, প্রথম যেদিন হেনরী আমাদের বাড়িতে এল সেদিন তার পায়ে ছিল উঁচু চকচকে জুতো। সে আমাদের ঘরের সামনে নেমে তার পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলল—বাবার কাছে একটা সংবাদ নিয়ে সে এসেছে। …কথা বলো না…শোন।…তাকে দেখে আমি একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। কী সুন্দরই না সে দেখতে। ড্রয়িংরুমের একটা কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তার কথা শুনছিলাম। শিশুরা কী অদ্ভুত…আর ভয়ঙ্কর…হ্যাঁ, হ্যাঁ…আমি তারই স্বপ্ন দেখেছি…

তারপরে সে অনেকবারই আমাদের বাড়িতে এসেছে। সব সময়ই আমি তাকে চোখ দিয়ে দেখেছি, আত্মা দিয়ে দেখেছি। বয়সের তুলনায় আমার স্বাস্থ্যটা ভালই ছিল; আর সেই বয়সে যতটা ছলাকলা জানা উচিত বলে মনে হোত, আমার ছলাকলা ছিল তার চেয়েও অনেক বেশী। সে আমার সারা চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল; আমি নিজের মনে বার বার তার নাম উচ্চারণ ক'রে বলতাম—আমার হেনরী…আমার হেনরী।

তারপরে শুনলাম সে তোমাকে বিয়ে করবে। সংবাদটা শুনে আমার কী কষ্টই যে হ'য়েছিল বোন সে আর তোমাকে কী বলব। তিনটি রাত আমি ঘুমোই নি। একটানা কেঁদেছিলাম। ময়দা, মাখন, আর দুধ দিয়ে তুমি তাকে প্রতিদিন কেক তৈরী করে খাওয়াতে। সে কেক খেতে খুব ভালবাসত। সে সব কথা মনে রয়েছে তোমার? তুমি কেমন করে কেক তৈরী করতে তা আমিই কেবল জানতাম। একএকটা কেক মুখে পুরে এক গ্লাস মদ গলায় ঢেলে দিয়ে সে বলত—আঃ কী চমৎকার!

আমার হিংসে হোত…তোমাদের বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। মাত্র পনেরটা দিন বাকি। মনে হোল, আমি পাগল হয়ে যাব। নিজের মনে মনেই আমি বলতাম—সুজেনকে ও কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না। না, না—এ বিয়ে কিছুতেই আমি হ'তে দেব না। বড় হ'য়ে আমিই ওকে বিয়ে করব। আর কোন পুরুষকেই আমি এত ভালবাসতে পারব না। তারপরে বিয়ের ঠিক দিনদশেক আগে একদিন চাঁদের আলোতে তোমরা বাগানে বেড়াতে বেরোলে…আর…আর সেই বড় পাইন গাছটার নীচে সে তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল…অনেকক্ষণ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রইল তোমাকে। সে কথা নিশ্চয় তুমি ভুলে যাও নি। সেই বোধহয় তার প্রথম চুম্বন…নিশ্চয়… ড্রয়িংরুমে ফিরে আসার পরে তাই সেদিন তোমাকে অত বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে সেদিন আমি তোমাদের দেখেছিলাম। রাগে

আমি একেবারে উন্মাদ হ'য়ে গেলাম। সম্ভব হ'লে সেদিন তোমাদের দুজনকে আমি মেরেই ফেলতাম।—হঠাৎ যেন আমি তাকে ঘৃণা করতে সুরু করলাম।

তখন আমি কী করলাম জান?—শোন তবে।—রাস্তার কুকুর মারার জন্যে আমাদের মালি একরকমের ছোট-ছোট গুলি তৈরী করত। পাথর আর কাঁচ গুঁড়িয়ে ছোট-ছোট মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে সেগুলি দিয়ে ছোট-ছোট গুলি তৈরী করত।

মায়ের ঘর থেকে আমি একটা ওষুধের বোতল বার ক'রে হাতুড়ি দিয়ে তাকে গুঁড়োলাম। মিহি চকচকে পাউডার তৈরী হ'য়ে গেল তা থেকে। পরের দিন তুমি কেক তৈরী করার পরেই আমি লুকিয়ে সেই কেকগুলোর পেট ছুরি দিয়ে কেটে তাদের ভেতরে পাউডার ঢুকিয়ে দিলাম। সে তিনটে কেক খেয়েছিল; আমি খেয়েছিলাম একটা। বাকি ছ'টা কেক আমি পুকুরে ফেলে দিয়েছিলাম। দুটো হাঁস তিনদিন পরে মারা গিয়েছিল। কথা বলো না—শোন।—কেবমাত্র আমিই মারা যাই নি। কিন্তু চিরকালই আমি অসুস্থ—সে মারা গেল—শোন—ওটা কিছু নয়—কিন্তু আসল যন্ত্রণাটা আমার সুরু হ'ল পরে—শোন—সারাটা জীবন ধরেই আমি যন্ত্রণা ভোগ করছি—নিজের মনেই আমি বললাম—আমার দিদিকে কোনদিনই আমি ছেড়ে থাকব না; এবং মৃত্যুর সময় তাকে আমি সব কথা বলে যাব। সেই সময় আজ এসেছে; তাই সেই কথা আজ আমাকে বলতে হবে।—সেই কথা বলা এখন আমার শেষ হ'ল। কিছু বলো না—কিছু বলো না—কী জ্বালা···কী যন্ত্রণা···উঃ। আমার বড় ভয় হচ্ছে। যদি এখনই তার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে যায়? মারা যাওয়ার পরে তার সঙ্গে যদি আমার দেখা হয়? তুমি কি তাকে স্বপ্নে দেখতে পাও? তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা? ভয় হচ্ছে··· কিন্তু দেখা আমার হবেই···আমি মারা যাচ্ছি···শুধু তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ফাদার, ওকে বলো আমাকে ক্ষমা করতে···ওর ক্ষমা না পেয়ে আমি মরতে পারব না···

চুপ করে গেলেন মার্গারেট। হাঁপাতে লাগলেন শুয়ে শুয়ে; নখ দিয়ে ছিঁড়তে লাগলেন বিছানার চাদর।

হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন সুজেন। নড়লেন না, চড়লেন না। যে-মানুষটিকে তিনি কতই না ভালবাসতে পারতেন সেই মানুষটির কথাই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। কী সুখেই না তাঁরা জীবন কাটাতে পারতেন। সেই অতীত যুগের ছায়াচ্ছন্ন স্মৃতির পটে আবার তিনি যেন তাঁকে দেখতে পেলেন। হায়রে, সেই চুম্বন···সেই তাঁর প্রথম আর শেষ চুম্বন। সেই স্মৃতিটিই তিনি আত্মার মধ্যে ধরে রেখেছেন···এ জীবনে তিনি আর কিছু পান নি।

হঠাৎ পাদরী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—ম্যাদময়জেল সুজেন, আপনার বোন মারা যাচ্ছেন।

অশ্রুতে ভেজা চোখ দুটি তুলে সুজেন মার্গারেটকে জোরে জোরে চুম্বন করে বললেন—আমি তোমাকে ক্ষমা করছি···ক্ষমা করছি··· বোন···

একটি সামান্য নাটক

[A humble drama]

বাইরে বেড়াতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা হলে বেশ ভাল লাগে। দেশ থেকে পাঁচশ' লীগ দূরে বেড়াতে গেলে সেখানে যদি কোন প্যারিসবাসীর সঙ্গে, অথবা কোন কলেজের বন্ধু বা দেশোয়ালী লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে কার না আনন্দ হয়? কোন স্টেজ-কোচে বিনিদ্র অবস্থায় একটি অপরিচিতা নারীর পাশে সারা রাত কাটিয়ে দিতে কার না ভাল লাগে? তারপরে সকাল হয়। সারা রাত্রি ধরে স্টেজ-কোচের খটখটানির শব্দে মাথার ভেতরটা অবশ হয়ে থাকে; জানালার ধারে অবিশ্রান্ত গোলমালে মাথাটা কেমন যেন ঝিম-ঝিম করে ওঠে। সেই অবস্থায় আপনার সঙ্গিনীটি ধীরে-ধীরে চোখ মেলে আপনার দিকে একবার মাত্র উদাসীনতার সঙ্গে তাকিয়ে নিজের বেশ-ভূষাটা একটুআধটু পরিচ্ছন্ন ক'রে নেন—স্কার্ট, জামা, চুল, মুখ একটু এদিক একটু ওদিক ক'রে নিতান্ত অপরিচিতার মত জানালা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকায়। একটি অজ্ঞাতপরিচয় রমণীর পাশে আপনি যে একটা রাত কাটিয়েছেন একথা ভাবতেই আপনার কেমন ভাল লাগে, তাই না?

আপনি ভাবতে সুরু করেন—ভদ্রমহিলাটি কে, কোথা থেকে এসেছেন, যাবেন কোথায়। ইচ্ছে ক'রে হয়ত নয়, তবু হঠাৎ অকারণ পুলকে আপনার মনটা নেচে ওঠে; অনেককিছু রোমান্টিক কল্পনা করতে সুরু করেন আপনি। নিজেকে মনে হয় সুখী···সুখটা কিসের তা হয়ত আপনি জানেন না, জানার কথাও নয়। মনে হয় মানুষের স্বপ্ন আর বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্যে এই-রকম অপরিচিতা একটি সঙ্গিনীরই প্রয়োজন বেশী।

এবং তারপরে সেই ভদ্রমহিলা যখন গন্তব্যস্থলে বিনা বিদায়ে গাড়ী থেকে নেমে যান—তখন-ও আপনার খারাপ লাগে; সেই বিদায়দৃশ্যও করুণ, দুঃখজনক। উঁকি দিয়ে আপনি দেখেন—রাস্তার ওপরে একটি ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন ; সঙ্গে তাঁর দুটি শিশু, এবং দুটি চাকর। তিনি তাঁকে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেন, গাড়ি থেকে নামার সময় ভদ্রমহিলাকে আদর করে চুমু খান। ভদ্রমহিলা বাচ্চা দুটির প্রসারিত হাত ধরেন ; তারপরে দ্বিতীয়বার পেছনে না ফিরে তাদের নিয়ে এগিয়ে যান।

বিদায়! সব শেষ। জীবনে আর হয়ত কোনদিনই তাঁর সঙ্গে আপনার আর দেখা হবে না। যে-রমণীর সঙ্গে পাশাপাশি বসে আপনি একটি রাত কাটিয়েছিলেন, যাঁকে আপনি আগে কোনদিনই দেখেন নি, যাঁর সঙ্গে একটা কথাও আপনি বলেন নি। তিনি চলে গেলেও আপনার দুঃখ হবে! মনে-মনে বলবেন—বিদায়!

আমার ভ্রাম্যমান জীবন এই ধরনের দুঃখের, আনন্দের, ভারি, হালকা অনেক স্মৃতিতে জড়িয়ে রয়েছে।

সেবার আমি অভারেন-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম ফরাসী পাহাড়গুলির পাদদেশে। এই পাহাড়গুলি বেশী উঁচু নয়, ভয়ঙ্করও নয়; বেশ বন্ধু ভাবাপন্ন ঘরোয়া পরিবেশ। সাঁসি থেকে নেমে নোতর-দামের সাধুসন্তদের একটি সরাইখানায় ঢুকতে যাব এমন সময় দেখলাম একটি বৃদ্ধা একা একা বসে খাচ্ছেন। চেহারাটা তাঁর অদ্ভুত রকমের। বয়স তাঁর সত্তরের কাছাকাছি ; দীর্ঘাঙ্গিনী ; অস্থিচর্মসারও বলা যায় তাঁকে। মাথার চুলগুলি সাদা ; পোশাক-পরিচ্ছদের ওপরে তাঁর বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নেই। কোনরকমে পরতে হয় তাই পরা। তিনি খাচ্ছেন ওমলেট আর জল।

চোখ মুখের চেহারাটা তাঁর কেমন যেন অদ্ভুত ; দৃষ্টিটি চঞ্চল। দেখলেই মনে হয় জীবনে তিনি সুবিচার পাননি। নিজের অজান্তেই তাঁর দিকে আমি তাকিয়ে দেখলাম। অবাক হয়ে ভাবলাম—ভদ্রমহিলাটি কে? এভাবে তিনি জীবন কাটাচ্ছেন কেন? কেনই বা এই পাহাড়ে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

দাম মিটিয়ে পরিচ্ছদটা ঠিক করে নিলেন তিনি। কাঁধের ওপরে অদ্ভুত ছোট একটা শাল—সেটাকে কাঁধের ওপরে গুছিয়ে নিলেন। পাহাড়ে ওঠার সময় আরোহণকারীরা যেরকম লোহার একটা ছড়ি ব্যবহার করে, কোণ থেকে সেই জাতীয় একটা ছড়ি তুলে নিলেন। মরচে-পড়া লোহার সেই ছড়িটির ওপরে দেখলাম অনেকগুলি নাম খোদাই করা রয়েছে। তারপরে ডাক-হরকরার মত লম্বা-লম্বা পা ফেলে সোজা আর শক্ত হয়ে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দরজার কাছে একজন গাইড অপেক্ষা করছিল। দুজনে চলতে সুরু করলেন।

ঘণ্টাদুই পরে আমি পাহাড়ের ওপরে পভি লেকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বড় মনোরম জায়গাটি, চারপাশে পাহাড়ের ক্রমবিস্তার ; অসংখ্য গাছ-গাছালি আর ঝোপে বোঝাই। লেকের জল একেবারে কাকচক্ষু, সেই পরিষ্কার জলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাটি একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। লেকের অনেক নীচে মৃত ভূমিকম্পের যে পাহাড়টি রয়েছে মনে হ'ল সেইদিকে তিনি রয়েছেন তাকিয়ে। তাঁর পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। মনে হল, তাঁর চোখ দিয়ে দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তারপরেই আবার সেই আগের মত লম্বা-লম্বা পা ফেলে তিনি এগিয়ে গেলেন।

সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

পরের দিন সন্ধ্যার কাছাকাছি একটা সময়ে আমি মুরল দুর্গে হাজির হলাম, দুর্গটি প্রাচীন, কিন্তু ধ্বংসপ্রায়, বিরাট পাহাড়ী উপত্যকার ঠিক কেন্দ্র-ভূমিতে দুর্গটি তার বিরাট গম্বুজ তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অনেক ধ্বংসপ্রায় পৌরাণিক প্রাসাদের চেয়ে এই দুর্গটি অনেক বিরাট, অনেক ভারিক্কী, অনেকটা বিষণ্ণ, এর ঘরগুলির ইঁট-কাঠ ঝরে পড়েছে, সিঁড়িগুলি নড়বড় করছে, আগাছায় ভরে গিয়েছে চারপাশ। অতীত কোন বিরাট একটা জানোয়ারের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না একে।

আমি একাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, একটা ভাঙা দেওয়ালের কাছে অশরীরীর মত সেই বৃদ্ধাটি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চিনতে পারলাম তাঁকে। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। একহাতে তাঁর একটি রুমাল।

ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই, লজ্জা পেয়ে তিনি আমাকে ডেকে বললেন —হ্যাঁ ; মঁসিয়ে, আমি কাঁদছিলাম···সব সময় মানুষ তো কাঁদে না···

কী উত্তর দেব বুঝতে না পেরে আমি বিভ্রান্ত হয়ে বললাম—আমাকে ক্ষমা করবেন মাদাম ; আমার বিশ্বাস, নিঃসন্দেহে আপনি কোন দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে পড়েছেন।

হ্যাঁ-ও বলতে পারেন, আবার না-ও বলতে পারেন ; বর্তমানে আমি পথ-হারানো একটি কুকুরের মত।

এই কথা বলেই রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন।

তাঁর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গেলাম। তিনি তখনই তাঁর জীবনের কাহিনী বলতে সুরু করলেন ; মনে হ'ল, এই দুঃখের বোঝা আর তিনি একা বইতে পারছেন না।

হায় মঁসিয়ে ; আপনি যদি জানতেন কী দুঃখে আমার দিন কাটছে··· জীবনে একদিন সুখ ছিল আমার···শহর থেকে দূরে নিজের বাড়িতেই থাকতাম আমি ; আমার নিজের বাড়ি। সেখানে আর ফিরে যাওয়ার শক্তি আমার

নেই। আর কোনদিনই সেখানে আমি ফিরে যাব না—বড় নিষ্ঠুর সেই বাড়ি।

আমার একটি ছেলে রয়েছে···এই সেই—সেই ছেলে। ছেলেরা জানে না—ক'দিনই বা মানুষ বাঁচে? এখন যদি তার সঙ্গে আমার দেখা হয় তাহলে হয়ত আমি তাকে আর চিনতে পারব না। তাকে আমি কত ভালবাসতাম—কত। তার জন্মের আগেই পেটের মধ্যে যখন সে নড়ে বেড়াত তখনই তাকে আমি আদর করতাম, মিষ্টি সুরে ডাকতাম। তার জন্যে কত রাতই যে আমি ঘুমোই নি তা যদি আপনি জানতেন। তার জন্যে আমি পাগল হ'য়ে য়েতাম। তার বয়স যখন আট তখন তার বাবা তাকে একটা বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। সেই শেষ। আর সে আমার থাকলো না—পর হ'য়ে গেল। হায় ভগবান! প্রতিটি রবিবার সে আসত। নয়ের ভাল বলতে কেবল ওইটুকুই।

তারপর, একদিন সে প্যারিসে একটি স্কুলে পড়তে গেল। সে বাড়ি আসত বছরে মাত্র চারবার। প্রতিবারই তার দিকে আমি অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতাম। তার চেহারায় কত পরিবর্তন হচ্ছে—আমার চোখের বাইরে সে বেড়ে উঠছে। তার ভালবাসা, তার যৌবন, তার দৈনন্দিন জীবনের আশা, আশঙ্কা, ভয়, বিভ্রান্তি, সাধ, আহ্লাদ—সবকিছু থেকে বঞ্চিত হলাম আমি। আমার অজান্তেই সে একটি ক্ষুদে মানুষ হ'য়ে গেল।

ভেবে দেখুন—বছরে মাত্র চারবার। তার হাসি, ঠাট্টা আনন্দের আর আমি অংশীদার নই, প্রতিবারই তার মনে, দেহে, চলা-ফেরায় কত পরিবর্তন হচ্ছে। অথচ, আমি তা দেখতে পাচ্ছিনে। শিশুদের পরিবর্তন কত তাড়াতাড়িই না হয়। আর যখন তুমি তা দেখার সুযোগ না পাও তখনই তোমার খারাপ লাগে, তোমার মন বিষাদে ছেয়ে যায়।

একবার সে এল। তার দাড়ি গজিয়েছে। আমি তো অবাক! তাকে চুমু খেতেও সঙ্কোচ লাগল আমার। একি আমারই সেই নধর, তুলতুলে শিশুটি? না, এ অন্য মানুষ। 'মা' বলে ডাকার একটা রীতি রয়েছে বলেই হয়ত সে আমাকে 'মা' বলে ডাকে।

আমার স্বামী মারা গেলেন। তারপরে দেহ রাখলেন আমার বাবা আর মা, দুটি বোনকে হারালাম আমি। মৃত্যু যখন কারও বাড়িতে ঢোকে তখন তাড়াতাড়ি আর যাতে তাকে সেই বাড়িতে ঢুকতে না হয় ওই জন্যে যত-গুলিকে পারে সে তাদের নিয়ে চলে যায়। শোক করার জন্যে সামান্য দু'-একজনকেই সে রেখে যায়।

আমি একা। আমার বিরাট শিশুটি অবশ্য তার কর্তব্য করেছিল। আমি ভাবতাম তারই কাছে থেকে আমিও একদিন মারা যাব। তার কাছে আমি গেলাম; রইলামও কিছুদিন। সে তখন যুবক; সে আমাকে পাকে-প্রকারে

বুঝিয়ে দিল আমি থাকলে তার অসুবিধে হবে। আমি ফিরে এলাম। আর তার সঙ্গে আমার বিশেষ দেখা হয় নি।

সে বিয়ে করল। খুব আনন্দ হল আমার। আবার আমরা সবাই এক-সঙ্গে থাকবো। আমার পৌত্র হ'বে। তাদের সঙ্গে ঘর বাঁধব আবার। সে একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেছিল। আমাকে পছন্দ করল না। সম্ভবত সে মনে করেছিল ছেলেকে আমি খুব ভালবাসি।

আবার আমি ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। আবার আমি একা।

তারপরে সে ইংলণ্ডে চলে গেল। সে তার শ্বশুরদের সঙ্গে রয়েছে। বুঝতে পারছেন মঁসিয়ে? তারাই আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে গেল। তারাই চুরি করে নিয়ে গেল আমার ছেলেকে। সে আমাকে প্রতি মাসেই চিঠি দেয় এখন। প্রথম প্রথম সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। এখন আর আসে না।

চার বছর[1] তাকে আমি দেখি নি; তার মুখে বলিরেখা বেরিয়েছিল, চুল গিয়েছিল পেকে। এও কি সম্ভব! আমার সেই ক্ষুদে শিশুটা অচিরেই বুড়ো হয়ে মারা যাবে? অনেকদিন আগেকার সেই ফুটফুটে শিশুটা। নিশ্চয় আর তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি এখন করি কী? সারা বছরই আমি এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াই—একা একা। আমি এখন ঘরহারা কুকুরের মত। আপনি চলে যান, মঁসিয়ে। আমার কাহিনী বলতে আমার কষ্ট হয়েছে।

পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় দেখলাম বৃদ্ধাটি একটা ভাঙা দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন · তাকিয়ে রয়েছেন দূর লেক চ্যাম্বনের দিকে।

তাঁর পোশাকের প্রান্ত আর কাঁধের আলোয়ান বাতাসে পতাকার মত উড়ছে।

প্রস্বর

[The accent]

অতীত ঐশ্বর্যের একরাশ ব্যর্থ স্মৃতির বোঝা বহন করে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো আমলের বিরাট বাড়িটা। অনেক মৃত্যু অভাব আর অবহেলার সকরুণ স্বাক্ষর স্পষ্ট ফুটে আছে তার প্রতিটি ভগ্ন পাঁজরে। চারদিকে আঙুর আর পাইন গাছের ছায়ায় ঘেরা বাড়িটার ছাদ থেকে সমুদ্র দেখা যায়।

বাইরের মত বাড়িটার ভিতরেও সমান দৈন্যদশা। অসংখ্য সিল্ক ও ভেলভেটের পোশাকের টুকরো আর ভাঙা চেয়ার টেবিল ছড়ানো পড়ে আছে বড় বড় ঘরগুলোয়। প্রতিটি দেওয়ালে মরচেধরা অসংখ্য পেরেক আজও পোঁতা আছে। বেশ বোঝা যায় একদিন ঐ সব দেওয়ালে এই বংশের পূর্বপুরুষদের বড় বড় ছবি টাঙানো থাকত। সে ছবিগুলো অভাবে ও দেনার দায়ে সব বিক্রি হয়ে গেছে একে একে। বসার ঘরটাও অগোছালো। ঘরখানার কোণে কোণে যতসব ভাঙা আসবাবপত্র, ছবি আর একটা ভাঙা পিয়ানো জমা হয়ে আছে।

এই ভগ্ন প্রাচীন প্রাসাদোপম বাড়িটিতেই বাস করেন একদা সুন্দরী মাদাম ম মরিলাক। তাঁকে দেখে আজ মনে হয় অনেক হাত ঘোরার পর একটি সুন্দর পুতুল পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটি নির্জন ঘরের কোণে। আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে এই বাড়িটিতেই বছরের বেশীরভাগ সময় বাস করেন মাদাম মরিলাক।

মঁসিয়ে মরিলাক যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁরা বছরের বেশীরভাগ সময় প্যারিসের বাড়িতেই থাকতেন। অমিত বিলাসব্যসন আর ঐশ্বর্যের মধ্যে দিয়ে কাটত তাঁদের সুখী জীবন। কিন্তু তাঁদের অমিতব্যয়িতার ফলে মঁসিয়ে মরিলাকের জীবদ্দশাতেই তাঁদের অনেক সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যায়। শেষ হয়ে যায় তাঁদের সঞ্চিত অর্থ। পাওনাদারদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন মরিলাক।

মঁসিয়ে মরিলাকের মৃত্যুর পর অবশিষ্ট সম্পত্তির সবটুকুই চলে যেত। কোন সদাশয় উকিলের সাহায্যে অনেক চেষ্টায় দেশের বাড়িটা আর সারা বছর কোন রকমে চলার মত সামান্য কিছু সম্পত্তি বাঁচাতে সমর্থ হন মাদাম মরিলাক।

প্রতি বছর যখন বসন্ত আসত, গাছে গাছে যখন ফুল ফুটত আর কলি গজাত, আর সেই ফুটন্ত ফুলের গন্ধ নিয়ে বাতাস ছুটে বেড়াত দিকে দিকে তখন মাদাম মরিলাক মেয়েকে নিয়ে ছুটতেন প্যারিসে। প্রতি বছর এই সময় কিছু খরচ করতেন। ভাবতেন এবার নিশ্চয় হয়ত কোন ধনী যুবক প্রেমে পড়ে

যাবে তাঁর মেয়ের। পাণিপ্রার্থী হবে তার এমন কি তাঁর নিজেরও হয়ত কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। কারণ তাঁর এখনো সে বয়স যায়নি এবং প্যারিসের ধনী অকৃতদার বা বিপত্নীকের অভাব নেই।

এই সময় প্যারিসে গিয়ে মাসখানেক থেকে সাধ্যাতীত বিলাসবহুল জীবন যাপন করার জন্তে সারা বছর ধরে তৈরী হতেন মাদাম মরিলাক। প্যারিসের অভিজাত সমাজের লোকেদের সঙ্গে কিভাবে মেলামেশা করবে তার জন্ত মেয়েকে তৈরী করতেন তিনি। একটি বিষয়ে বিশেষ করে যত্ন নিতেন তিনি। তিনি মেয়েকে তাদের গ্রামের বাড়ির ঝি চাকরদের সঙ্গে কথা বলতে দিতেন না। কারণ তাঁর ধারণা ছিল গ্রাম্য চাষী লোকদের সঙ্গে কথা বললে তাঁর মেয়ের প্যারিসের অভিজাতসমাজসুলভ উচ্চারণভঙ্গি নষ্ট হয়ে যাবে। তার উচ্চারণ-ভঙ্গিতে গ্রাম্যতাদোষ এসে যাবে। এজন্ত মেয়েকে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন তিনি। একমাত্র তাঁর সঙ্গে ছাড়া বাড়ির ঝি, চাকর বা বাগানের মালী, কারো সঙ্গে কোন কথা বলতে পারত না তাঁর মেয়ে।

অন্তবারকার মত সেবারও বসন্তে প্যারিসে প্রথমে আমেউন অঞ্চলে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ও পরে ক্রুভিলের সমুদ্রতীরে একপক্ষকাল করে কাটালেন মাদাম মরিলাক। পোশাক আশাকে ও ফ্যাসনের জৌলুস দেখাতে গিয়ে অনেক খরচপত্র করলেন। কিন্তু এবারও কোন ফল হলো না। কোন পাণিপ্রার্থী খুঁজে পেলেন না মেয়ের জন্ত।

তিনি তাঁর কন্তা ফেবিয়েনকে নিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। একা একা এই বিরাট গ্রাম্য বাড়িটাতে বন্দী থাকতে ভাল লাগত না ফেবিয়েনের। একা ভেবে ভেবে তার চোখের চারিদিকে একটা কালো বৃত্তাকার দাগ ফুটে উঠেছিল। তার গালদুটোর কমনীয়তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

কোনএক রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল মাদাম মরিলাকের। পাশের ঘরেই ফেবিয়েন থাকত। কি মনে হতে মেয়ের ঘরে গিয়ে মাদাম মরিলাক দেখলেন ফেবিয়েন ঘরে নেই। তখন পাগলের মত ফেবিয়েনকে ডাকতে ডাকতে বাড়ি ছেড়ে বাগানে চলে গেলেন। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে একাই এগিয়ে চললেন।

ফুটন্ত ফুলের গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছিল যেন বাগানের বাতাস। মাদাম মরিলাকের কম্পিত কণ্ঠস্বরটাকে যেন বেশীদূর বয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না সে বাতাস। সহসা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মাদাম মরিলাক। তাঁর সামনে একটা গাছের ছায়ায় তাঁর বাগানের মালীর গলাটাকে জড়িয়ে ধরে তাকে প্রেম নিবেদন করছিল ফেবিয়েন। সাধারণ এক গ্রাম্য নারীর উচ্চারণভঙ্গী ছিল তার কণ্ঠে।

পরে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় পাগল হয়ে গেছেন মাদাম মরিলাক, আর ফেবিয়েন সেই মালীকেই বিয়ে করেছে।

খৃস্টোৎসবের সন্ধ্যা

[Christmas Eve]

খৃস্টোৎসবের সন্ধ্যায় নৈশভোজন ? না না, কোনমতেই আমি যাব না সেখানে।

কথাটা এমনভাবে বলল হেনরি তেমপ্লিয়ের যাতে মনে হলো কেউ তাকে এক ভয়ঙ্কর অপরাধের কথা বলেছে। তাই তার কথাটা শুনে আর যারা উপস্থিত ছিল তারা হেসে বলল, তুমি এমনভাবে রেগে যাচ্ছ কেন ?

হেনরি বলল, কারণ এই ধরনের এক নৈশভোজের সময় এমন একটা ঘটনা ঘটে যাতে আমি দারুণ ভয় পেয়ে যাই। নিষ্ফল আনন্দের সেই রাত্রিটি ভয়ে কালো ও কুটিল হয়ে ওঠে আমার কাছে অস্বাভাবিকভাবে।

অন্য সকলে তখন একবাক্যে দাবি করল, তাহলে সব কথা বলতে হবে তোমায়।

হেনরি বলল, ঠিক আছে, যদি শুনতে চাও ত বলি।

তোমাদের হয়ত মনে আছে বছর দুই আগে খৃস্টোৎসবের দিন কিরকম শীত পড়ে। যাদের উপযুক্ত শীতবস্ত্র নেই তাদের পথে মরে যাবার উপক্রম। গোটা সেন নদীর জল বরফ হয়ে জমে গিয়েছিল। শুধু সেন নদী নয়, সারা পৃথিবীটাই মনে হচ্ছিল জমে যাবে।

সেদিন অনেক জায়গায় আমার নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু সন্ধ্যের সময় আমার হাতে প্রচুর কাজ থাকায় আমি কোথাও যাইনি। আমি কিছু খেয়ে নিয়ে আমার ঘরের টেবিলে বসেই কাজ করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আশ-পাশের বাড়িগুলো থেকে এত হৈ হুল্লোড় আর চীৎকারের শব্দ আসছিল যাতে আমার পক্ষে একমনে কাজ করে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। অগত্যা আমি উঠে পড়লাম। আমার রাঁধুনিকে ডেকে বললাম, দুজনের মত নৈশ-ভোজনের খাবার দাও। আমি একবার বাইরে যাচ্ছি। একজনকে নিয়ে আসছি। কিছুটা আশ্চর্য হয়ে আমার রাঁধুনি তাই করল।

কিন্তু আমি জানি না কাকে নিয়ে আসব, কে আমার সঙ্গে খাবে। পথে বেরিয়ে ভাবতে লাগলাম। সন্ধ্যে থেকে রাত পর্যন্ত প্যারিসের পথের ধারে প্রতীক্ষমানা অনেক গরীব মেয়ে পাওয়া যায়, যারা রাত্রির মত ভাল খাওয়া আর শোয়ার জায়গা পেলে চলে আসবে। এই ধরনের সুযোগ খোঁজে তারা। আমার আবার মোটা মোটা চেহারার মেয়েদের প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। তাই পথের দু'ধারে আমি মোটা চেহারার ও দেখতে ভাল একটি মেয়ের খোঁজ করতে লাগলাম। অবশেষে একটি মেয়েকে দেখে চোখে লাগল আমার। ওরই

মধ্যে মেয়েটির গায়ে পোশাক ছিল। তাকে বেশ মোটা আর তার বুকটাকে স্ফীত মনে হচ্ছিল। আমি তাকে ঘরে নিয়ে এলাম।

সে আমার সঙ্গে বসে খেল। তারপর পোশাক খুলে চলে গেল আমার বিছানায়। কিন্তু আমি বিছানায় শুতে যাবার আগেই তার একটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। এর আগে খাবার সময় আনমনা হয়ে সে কি ভাবছিল। আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় কিছু না বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। আমি তখন তার কাছে গিয়ে দেখি যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে বিছানার উপর। বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে হঠাৎ বলল, তার ছেলে হবে। প্রসববেদনা উঠেছে তার।

আমি ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলাম। আমার চীৎকার শুনে দু'চারজন প্রতিবেশীও এল। আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। করাণ এ ধরনের লজ্জাজনক ব্যাপার সাধারণতঃ ঘটে না। তাছাড়া সকলেই জানে আমি অবিবাহিত।

একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল মেয়েটি। প্রসবকালে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এজন্য দীর্ঘদিন শয্যাগত থাকতে হলো তাকে। তার সন্তানটিকে মাসিক পঞ্চাশ ফ্রাঁ বৃত্তি দেবার প্রতিশ্রুতিতে এক গ্রাম্য চাষী পরিবারে পাঠিয়ে দিলাম; কিন্তু প্রসবের পরেও মেয়েটি দেড়মাস রয়ে গেল আমার বাড়িতে। সে আমাকে ভালবেসে ফেলল। যেতে চাইছিল না। কিন্তু প্রসবের পরে সে রোগা হয়ে গেল। দেড়মাসের পরেও তার চেহারার পরিবর্তন না হওয়ায় আমি তাকে একদিন বাড়ি থেকে বার করে দিলাম। কিন্তু আজও সে আমার জন্য পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে এখানে সেখানে। আমাকে দেখতে পেলেই ছুটে এসে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে। ছাড়তে চায় না। তার জ্বালায় আমি পাগল হয়ে যাব।

এই জন্যই আমি খৃস্টোৎসবের সন্ধ্যাটা আর পালন করি না: সেদিনের সমস্ত ঘটনার স্মৃতি আমি কখনও ভুলব না।

মৃতদেহের কাছে পাওয়া চিঠি

[Letter found on a corpse]

তুমি হয়ত ভাববে মাদাম আমি তোমাকে উপহাস করছি। কারণ একটি মানুষ জীবনে কখনও ভালবাসায় আঘাত পায়নি একথা বিশ্বাস করতেই পারবে না। কিন্তু বিশ্বাস করো সত্যিই আমি কখনো কাউকে ভালবাসিনি।

কিন্তু এর কারণ কি? আমি তা বলতে পারবো না। অন্তরের যে

সর্ব বিস্মরণীগন্ধা মাদকতাকে তোমরা ভালবাসা বল আমি তার প্রভাব জীবনে কখনো অনুভব করিনি। কোন একটি নারী দুটি মানুষের মনের মধ্যে যে ভাবসমুন্নতি ও স্বপ্নের উন্মাদনার সৃষ্টি করে আমি তার মধ্যে কখনো পড়িনি। কোন একটি নারীকে পাবার চিন্তায় বিভোর হয়ে অথবা তাকে পেয়ে আমার একথা কখনো মনে হয়নি আমি হাতে স্বর্গ পেয়েছি, মনে হয়নি সে নারী জগতের সকল সুন্দর বস্তুর থেকেও সুন্দর। তার গুরুত্ব সারা জগতের থেকে বেশী। কোন নারীর কথা ভেবে অনিদ্রা বা অতন্দ্র রাত্রি যাপন করিনি। কোন নারীর মিলনাকাঙ্খার অমিত আশায় উন্মত্ত হয়ে উঠিনি আমি, আবার তার বিচ্ছেদকালে বেদনায় কাতর হয়েও উঠিনি।

সত্যি কথা বলতে কি আমি কখনো প্রেমে পড়িনি। এর কারণটা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে এর যে সব যুক্তি আমি মনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি তা এমনি সূক্ষ্ম যে তোমরা তা বুঝতে পারবে না। আমার মনে হয় আমি মেয়েদের কোন মোহে ধরা দেবার আগে খুব বেশী বিচার করি। আমার মতে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দুটো সত্তা আছে—নীতিগত ও দেহগত। আমার মনে হয় ভালবাসার ক্ষেত্রে এই দুটো সত্তার মধ্যে একটা সংগতি থাকা দরকার। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা সত্তা অন্য সত্তার উপর প্রভুত্ব করছে। দেহগত সত্তাটাই বেশী প্রভুত্ব করে।

আমরা মেয়েদের কাছ থেকে যে বুদ্ধিবৃত্তি আশা করি তা যেন তীক্ষ্ণ বা কুটিল না হয়। তার মন যেন উদার, সরল, পরিচ্ছন্ন ও সহানুভূতিশীল হয়। তার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা থাকে। তার দেহের মত মনের মধ্যেও থাকে যেন এক সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতা।

কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় সুন্দরী মেয়েদের তাদের দেহসৌন্দর্যের তুলনায় অন্তরের কোন সৌন্দর্য নেই। তাদের দেহে ও মনে আকাশ পাতাল তফাৎ। কোন নারীর দেহমনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না থাকলে আমার বড় খারাপ লাগে। অবশ্য জানি ভালবাসা মানেই একধরনের অন্ধত্ব। প্রেমিকের দোষত্রুটির কথা জেনে শুনেও তা বিচার করতে নেই। সেখানে যুক্তি-বিচারের কোন প্রশ্নই উঠবে না।

এই ধরনের অন্ধত্ব আমি কিন্তু মোটেই বরদাস্ত করতে পারব না। তাতে ভালবাসা হোক বা নাই হোক। দেহমনের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমার এমন একটা সূক্ষ্ম ও আদর্শ ধারণা আছে যা কারো সঙ্গে মেলে না। দেখবে এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের দৈহিক সৌন্দর্য ও আত্মিক সৌন্দর্য দুটোই আছে। যাদের দেহ ও মন দুটোই সুন্দর। কিন্তু তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। অর্থাৎ তারা তাদের দেহমনের সৌন্দর্য তাদের আচার আচরণের মধ্যে ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে পারে না। এসব বিষয়ে আমার দৃষ্টি শিকারী কুকুরের মতই তীক্ষ্ণ। আমার এসব কথা পাগলের প্রলাপ মনে করে হাসতে পার। তবু আমি নিরুপায়।

এসব সত্ত্বেও আমি একদিন কয়েকঘণ্টার জন্য একজনকে ভালবেসেছিলাম। বোকার মত পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রভাবে আমি আমার সত্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তখন জুন মাস। গ্রীষ্মের মনোরম এক সন্ধ্যা। একটি অতি উৎসাহী মেয়ে আমাকে বলল, আমার সঙ্গে সে নদীবক্ষে নৌকাবিহারে একটা রাত কাটাবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন দেহসংসর্গ হবে না। দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত যে প্রেম একমাত্র কবিকল্পনাতেই সম্ভব সেই কামগন্ধহীন প্রেমের এক বিশুদ্ধ নির্যাস সারারাত ধরে দুজনে পাশাপাশি থেকে উপভোগ করে যাব আমরা।

নদীর ধারের একটি পান্থশালায় রাতের খাবার খেয়ে একটি ছোট্ট ডিঙি নৌকায় করে রওনা হলাম আমরা। আমি নিজে দাঁড় বাইতে লাগলাম।

প্রথমে কাজটা বোকামি বলে মনে হলেও আমার চারদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। তাছাড়া আমার সঙ্গিনী মেয়েটিকে আমার ভাল লাগছিল। নাইটিঙ্গেল পাখির ডাকে মৃদুশিহরিত বনজ্যোৎস্নাভরা একটি ছোট্ট দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল আমাদের নৌকা। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল নদীর জলে। কুচো কুচো অসংখ্য রূপালি ঢেউ চকচক করছিল চাঁদের আলোয়। নদীর তটভূমিতে সেই সব ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ার জন্য একটানা একটা শব্দ হচ্ছিল। রাতপোকা আর ব্যাঙ ডাকছিল চন্দ্রালোকিত সেই নিশীথ রাতের নির্জন নদীবক্ষে, চারদিকের শব্দদৃশ্যের মিশ্রিত জটিল একটি প্রভাব কেমন যেন এক অজানা ভয়ের সঞ্চার করছিল আমাদের মনে।

আমার সঙ্গিনী একসময় বলল, একটা কবিতা আবৃত্তি করো। আমি তখন লুই বুইনেত্তের একটি কবিতা আবৃত্তি করলাম আবেগের সঙ্গে। কবিতাটির অর্থ হলো এই যে, এমন অনেক কবি আছেন যার সঙ্গে প্রেয়সী না থাকলে বা হৃদয়ে প্রেম না জাগলে প্রকৃতির শব্দদৃশ্যের মাঝে কোন মনমাতানো সৌন্দর্যের যাদু খুঁজে পায় না। কিন্তু যারা প্রকৃত কবি তারা প্রকৃতির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সৌন্দর্য খুঁজে পায়, তারা স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সব সময়।

আমার আবৃত্তি শুনে আমার সঙ্গিনী বলল, চমৎকার। সে আমার কবিতার অর্থ বুঝতে পেরেছে জেনে খুশি হলাম আমি। এমন সময় আমাদের নৌকাটা তীর ঘেঁষে যেতে যেতে হঠাৎ একটা উইলো গাছের নুয়ে-পড়া ডালে আটকে গেল। ঠিক সেই সময় আমার পাশে বসা সঙ্গিনীর কোমরটা জড়িয়ে ধরে মুখটা তার ঘাড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে চুম্বন করতে উদ্যত হতেই সে বাধা দিয়ে বলল, তুমি কিন্তু বড় স্থূল। বড় অভদ্র। আমার এখন শুধু স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করছে। স্বপ্নময় জ্যোৎস্নায় অমলধবল নিশীথ রাত্রির

সুখ এবং সৌন্দর্য যদি এইভাবে মাটি করে দাও তাহলে আমি কিন্তু নৌকাটা উল্‌টিয়ে দেব। তাছাড়া তুমি একটু আগে যে কবিতাটা আবৃত্তি করলে সেটা কি ভুলে গেলে এরই মধ্যে ?

আমি চুপ করে গেলাম। আমার ভুলটা বুঝতে পারলাম। আমার সঙ্গিনী তখন বলল, একটা প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবে ?

আমি বললাম, কি আগে তা শুনি।

সে বলল, আমরা পাশাপাশি দুজনে শুয়ে থাকব। কিন্তু তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না।

আমি তার কথা মেনে নিয়ে নৌকার তলায় পাটাতনে পাশাপাশি দুজনে চুপচাপ শুয়ে রইলাম। আমি চিৎ হয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে শুয়ে ছিলাম। আমাদের নৌকাটা নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছিল জলের উপর দিয়ে। শুধু একটা মৃদু কম্পন অনুভব করছিলাম সর্বাঙ্গে। সহসা আমি বুঝতে পারলাম আমার অঙ্কশায়িনী সঙ্গিনীকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করার একটা প্রবল দুর্দমনীয় ইচ্ছার আবেগ আমার দেহগত অস্তিত্বের গভীর থেকে উঠে এসে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় চেতনাকে, তবু তা করতে সাহস পেলাম না।

আমার সঙ্গিনী বলল, আমরা এখন কোথায় আছি ? কোথায় যাচ্ছি ? আমার মনে হচ্ছে আমি এই জগৎ ছেড়ে কোন অজানায় চলে যাচ্ছি। তুমি যদি আমায় একটু ভালবাসতে !

কিন্তু আমি তাকে কেমন করে বোঝাব যে আমি সত্যিই তখন তাকে ভালবেসেছিলাম। তার পাশে শুয়ে তার হাতে হাত দিয়ে তার সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলাম। তার প্রতি ভালবাসা ছাড়া আর কোন অনুভূতি তখন ছিল না আমার মধ্যে।

এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল। তবু নিথর নিস্পন্দভাবে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে রইলাম আমরা। আমি বেশ বুঝতে পারলাম ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দের সূক্ষ্ম অথচ বলিষ্ঠতর ও প্রবলতর একটি আবেগ আমার মধ্যে একটু আগে জেগেওঠা দেহমিলনের সেই ইচ্ছার বেগটাকে অবদমিত করে রেখেছে। মনে হলো তাই আমরা এমন শান্তভাবে শুয়ে থাকতে পারছি পাশাপাশি। মনে হলো সে আবেগ প্রকৃত ভালবাসার আবেগ। হয়ত একেই বলে ভালবাসা।

ধীরে ধীরে উষার আলো ফুটে উঠল পূর্বাচলে। আমাদের নৌকাটা গিয়ে ঠেকল একটা ছোট্ট দ্বীপের উপকূলভূমিতে। আমি আকাশে মুখ তুলে দেখলাম পূর্বদিগন্তে গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে আর সেই আভায় আমার সঙ্গিনীর চুল, মুখ, গাল সব গোলাপী হয়ে উঠেছে। আমার সঙ্গিনী হঠাৎ তার মুখটা তুলে চুম্বনের জন্ম বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমার মনে হলো

আমি যেন তাকে চুম্বন করছি না, চুম্বন করছি এমনই একটি স্বপ্ন, স্বর্গসুখ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আদর্শকে যা ঐ নারীমূর্তির মধ্যে লাভ করেছে এক অমৃত রূপ। আমার সঙ্গিনী আমার মাথার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার চুলের মধ্যে একটা কাঁকড়া বিছে।

সহসা আমার মনে হলো জীবনে আর আমার কোন আশা নেই।

এইখানেই আমার কাহিনী শেষ। তোমাদের হয়ত মনে হবে এসব পাগলামি। আমার কথাগুলো পাগলের প্রলাপোক্তি। কিন্তু আমার তখন সত্যি সত্যি মনে হয়েছিল তারপর থেকে আর কাউকে ভালবাসা অসম্ভব হয়ে উঠবে আমার পক্ষে।

"(গতকাল বুগিভাল আর মার্লির মাঝখানে সেন নদীর উপর একটি নৌকায় এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার পরিচয়ের জন্য তার পকেট খুঁজে নৌকার মাঝি এই চিঠিটি পায় এবং লেখকের কাছে তা এনে দেয়।)

কাঠের জুতো

[Wooden shoes]

গ্রামের চার্চের বৃদ্ধ যাজক যখন গ্রামবাসীদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছিলেন মঞ্চের উপর থেকে তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মাথার টুপীগুলো খোলা ছিল। চাষী মেয়েদের আপন আপন ঝুড়িগুলো তাদের পাশে নামানো ছিল।

যাজক মঁসিয়ে লে কুরের বয়স হয়েছে। তাঁর মাথার চুল সব পেকে গেছে। ধর্মীয় উপাসনার কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি গ্রামের খবরাখবরের কথা কিছু বললেন। গ্রামের দুজন রোগীর আরোগ্য কামনা করে তিনি একটা খবর দিলেন, মঁসিয়ে সিসেয়ার ওমঁতের বাড়ির কাজকর্ম করার জন্য একটি কর্মঠ মেয়ে দরকার।

লা সেবলিয়ের গ্রামের শেষ প্রান্তে ফুরভিল যাবার পথের ধারে যাজক লে কুরের বাড়িটা। বাড়িতে স্ত্রী আর একমাত্র কন্যা সন্তান এ্যাদিলদে ছাড়া আর কেউ নেই। খাবার টেবিলে বসে স্ত্রীকে খবরটা দিয়ে বললেন কুরে, আচ্ছা মঁসিয়ে ওমঁতের বাড়িতে এ্যাদিলদেকে পাঠিয়ে দিলে হয় না ? ওমঁতের টাকা আছে। তাঁর স্ত্রী নেই, পুত্রবধূ তার সেবা-যত্ন করে না। তাই একজন মেয়ের দরকার।

তাঁর স্ত্রী বললেন, আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

তাঁদের মেয়ে এ্যাদিলদের বয়স কুড়িতে পড়েছে সবেমাত্র। গোলগাল

পুতুল চেহারা। গালগুলো লাল আপেলের মত। কিন্তু একমাত্র ঘরসংসার ছাড়া বাইরের জগতের কোন জ্ঞানই তার নেই। মালিকের মন জুগিয়ে কি-ভাবে কাজকর্ম করতে হয় পরের বাড়িতে সেবিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন যাজক কুরে। খাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে মঁসিয়ে ওমঁতের বাড়ি চলে গেলেন।

মঁসিয়ে ওমঁতের বয়স পঞ্চান্ন হলেও চেহারাটা বেশ বলিষ্ঠ। তার আচার আচরণের মধ্যে কোন মার্জিত ভাব না থাকলেও তার স্বভাবটা সরল প্রকৃতির। মুখে হাসিখুশি লেগেই আছে। ওমঁত যখন হাসে তখন মনে হয় ঘরের দেয়ালগুলো কাঁপছে। কথায় কথায় বড় চীৎকার করত সে। মাঝে মাঝে কাঠের ভারী জুতো পরে সে মাঠময় ঘুরে বেড়াত। নিজের হাতে চাষ না করলেও সবকিছু দেখাশোনা করত। তার অনেক জমি জায়গা আছে। তার আয় উপসত্ব থেকেই তার ভালভাবে চলে যায়।

যাজকের স্ত্রী বললেন, আমার মেয়ে এ্যাদিলদেকে এনেছি। মঁসিয়ে লে কুরে বলছিলেন আপনার একটি মেয়ের দরকার।

ওমঁত বলল, ওর বয়স কত?

যাজকের স্ত্রী বললেন, মাত্র কুড়ি।

ওমঁত একবার এ্যাদিলদের চেহারাটা চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। চলবে। ও খাওয়া বাদে মাসে কুড়ি ফ্রাঁ করে পাবে। কাল থেকেই আসবে। কালই বেলা নটায় আমার স্যুপ তৈরী করবে।

পরদিন এ্যাদিলদে যথাসময়ে এলে ওমঁত ওকে বলে দিল, তোমার জুতোটা আমার এই কাঠের জুতোর কাছে রাখবে না। ও জুতো যেন আমার জুতোর সঙ্গে মিশে না যায়। এছাড়া আর কোন বিষয়ে কোন তফাৎ থাকবে না তোমার আমার মধ্যে।

দুপুরের খাওয়ার সময় খাবার টেবিলে বসেই ওমঁত চীৎকার করে উঠল। এ্যাদিলদে ভয়ে ছুটে এল রান্নাঘর থেকে। ওমঁত বলল, তোমার খাবার কোথায়? আমি একা একা খেতে পারি না তোমার খাবার নিয়ে এস। একটেবিলে একসঙ্গে বসে খেতে হবে। তা না হলে জাহান্নামে যেতে পার।

মালিকের হুকুম বাধ্য হয়ে তামিল করল এ্যাদিলদে। ওমঁত খেতে খেতে কত গল্প শোনাল। এ্যাদিলদে লজ্জায় মাথা নীচু করে খেয়ে যেতে লাগল। খাওয়ার পর ওমঁতকে কফি দিলে ওমঁত বলল, তোমাকেও খেতে হবে।

ইচ্ছা না থাকলেও কফি ও ব্র্যাণ্ডি দুইই খেতে হলো এ্যাদিলদেকে। তার-পর রান্নাঘরের কাজ সেরে শুতে গেল তার ঘরে। এদিকে ওমঁত সারা বাড়িটা কাঁপিয়ে চীৎকার করে ডাকতে লাগল এ্যাদিলদেকে। এ্যাদিলদে তার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই ওমঁত বলল, আমি একা শুতে পারি না। তুমি আমার বিছানায় শীগগির চলে এস। তা না হলে তুমি জাহান্নামে যেতে পার।

যাচ্ছি মালিক। এ্যাদিলদে ব্যস্তভাবে তার মালিকের শোবার ঘরের কাছে যেতেই তাকে কোলে তুলে নিল ওর্ম্যঁত। এ্যাদিলদের হালকা কাঠের জুতো দুটো তার মালিকের ভারী কাঠের জুতোর সঙ্গে মিলে গেল।

সেদিন থেকে রোজ রাতে মালিকের বিছানায় শুতে হত এ্যাদিলদেকে। ছ মাস পর এ্যাদিলদে বাড়িতে তার বাবা মার সঙ্গে দেখা করতে যেতেই মঁসিয়ে লে কুরে তাকে দেখেই বললেন, তুমি অন্তঃসত্বা হয়েছ। তুমি মালিকের কাছে শুয়েছিলে ?

এ্যাদিলদে বলল, সে মালিকের কথামত তার কাছে রোজ শোয়। কিন্তু তার ফল কি হবে না হবে জানত না।

তার মা একথা শুনে চেঁচামিচি শুরু করে দিল। এ্যাদিলদে কাঁদতে লাগল। সে যে অপরাধ করেছে সেকথা প্রথম এবার বুঝল।

যাই হোক, যাজক এসে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। পরের রবিবারই চার্চে ওদের বিয়ে হয়ে গেল।

আত্মহত্যা

[Suicide]

আজকাল এমন একটি দিনও যায় না যেদিন খবরের কাগজে একটা না একটা আত্মহত্যার বিবরণ প্রকাশিত না হয়। সে বিবরণে থাকে, অমুক অঞ্চলের অধিবাসীরা নিশীথ রাতে তাদের পার্শ্ববর্তী এক বাড়িতে বন্দুক বা রিভলবারের আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে ওঠে। তারপর তারা সেবাড়িতে গিয়ে যে ঘর থেকে সে শব্দ এসেছে সেই ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে দেখে একটি লোক রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে পড়ে রয়েছে। তার হাতে তখনো রিভলবারটা ধরা রয়েছে। মৃত ব্যক্তিটির বয়স প্রায় সাতান্ন। সে সম্পত্তিসম্পন্ন অর্থাৎ জীবনধারণোপযোগী কোন বস্তুরই অভাব ছিল না তার। সুতরাং এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কোন কারণ খুঁজে পায় না তারা।

সে কোন্ গভীর হতাশা বা অনন্ত দুঃখ যা এই সব আপাতসুখী ব্যক্তিদের আত্মহননের পথে ঠেলে নিয়ে যায় ? এই সব মৃত্যুর পশ্চাতে আর্থিক অনটন অথবা প্রেমগত ব্যর্থতার কারণ আছে বলে মনে ভাবেন অনেকে। কিন্তু যখন সঠিক কোন কারণ পাওয়া যায়নি আজও পর্যন্ত তখন এই সব আত্মহত্যার ঘটনা আশ্চর্যভাবে রহস্যময় বলতে হবে।

তবে এই ধরনের এক আত্মহত্যার ঘটনায় এক মৃত ব্যক্তির দ্বারা লিখিত একটি

চিঠি আমাদের হাতে এসেছে। ব্যক্তিটি আত্মহত্যা করার আগে চিঠিখানি লিখে যায়। অবশ্য তার আত্মহত্যার কারণস্বরূপ সে যা লিখে গেছে সে কারণ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার আত্মহত্যার কারণস্বরূপ সে তার দুঃখময় জীবনের একটানা পুনরাবৃত্তি, জীবনের দুঃসহ নিঃসঙ্গতা ও মোহমুক্তি প্রভৃতি যে সব ঘটনার উল্লেখ করেছে একমাত্র অতিসূক্ষ্ম সংবেদনশীল চেতনাসম্পন্ন মানুষেরাই তার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

চিঠিতে লেখা আছে 'তখন মধ্যরাত্রি। এই চিঠি লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজেকে শেষ করে ফেলব। কিন্তু কেন? তার কারণ আমি যথাসম্ভব বিশ্লেষণ করব। অন্য কারো জন্য নয়, এই বিশ্লেষণের দ্বারা আমার সংকল্প আরো দৃঢ় হয়ে উঠবে বলেই আমি তা করছি। আর আমার এই সংকল্প আজ কার্যে পরিণত না হলে অকারণ বিলম্ব ঘটবে শুধু।

আমি এমন এক পরিবারে মানুষ হয়েছি যে পরিবারের মানুষরা সবকিছুতে বিশ্বাস করত। এই সহজাত বিশ্বাসপ্রবণতা আমার মনের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় সহজে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিরাট এক পরিবর্তন দেখা দেয় আমার মনে। যে সব জিনিস আগে আমার ভাল লাগত পরে সে সব জিনিস আর কোন মোহ বা আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারত না আমার কাছে। জীবনের সব সত্য এক কঠোর বাস্তবতার আকারে দেখা দেয়। প্রেমের আসল সত্য পরিষ্কার হয়ে উঠত আমার কাছে। তার মধ্যে আর কোন কবিসুলভ কল্পনা বা আবেগানুভূতির কোন উৎস খুঁজে পেতাম না আমি।

আমরা যেন সবাই এক মোহিনী মায়ার হাতে খেলার পুতুল। সে মায়ার রঙিন ফুল বারবার শুকিয়ে যায়, আবার বারবার ফুটে ওঠে আমাদের চোখের সামনে।

প্রথম জীবনে এই মায়ার প্রভাবে আমি ধরা দিয়েছিলাম। আশার ছলনায় মুগ্ধ হতাম। পোশাক-আশাকের জৌলুসে আমার বেশ রুচি ছিল। মোট কথা প্রচলিত অর্থে যাকে সুখ বলে সে অর্থে আমি সুখী ছিলাম। তারপর তিরিশ বছর ধরে সেই এক জীবন যাপন করে আসছি। বৈচিত্র্যহীন, অর্থহীন এক জীবন। এই দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে আমি একই ঘরে বাস করে আসছি। একই আসবাবপত্র দেখে আসছি সে ঘরে। সে ঘরে যতবার ঢুকেছি একই গন্ধ অভ্যর্থনা জানিয়েছে আমায়।

বাইরে যাদের সঙ্গে আমি মেলামেশা করতাম তাদের সঙ্গও ক্রমে একঘেঁয়ে মনে হতে লাগল আমার কাছে। আমি তাদের কাছে গেলেই বলে দিতে পারতাম তারা কে কি বলবে বা করবে। ফলে মনে মনে বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে উঠতে লাগলাম আমি। নিঃসঙ্গ একাকীত্বের এক বিষাদ দিনে দিনে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল আমার মনকে। এই একটানা নিঃসঙ্গতাটাকে কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে আমি দেশভ্রমণে বার হতাম। কিন্তু বাইরে গিয়ে আমার

নিঃসঙ্গতার বেদনাটা আরো বেড়ে উঠত। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতাম।

আজ রাতে যখন এক ভয়ঙ্কর কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে যায় তখন আমার হতাশা চরমে ওঠে।

অসহ্য হয়ে ওঠে আমার সমগ্র জীবন। তার উপর আমি বদ হজমে ভুগছিলাম। ঠিকমত হজম না হলে মানুষ বোধ হয় সংশয়বাদী হয়ে ওঠে। আমিও তাই হয়ত হয়ে উঠেছিলাম।

হঠাৎ কি মনে হলো ড্রয়ার খুলে পুরনো চিঠিগুলো পড়তে লাগলাম। তিরিশ বছর ধরে আমার ঘরখানা ভাল করে গুছোইনি। কাগজপত্র চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। ইচ্ছে করেই তা গুছিয়ে রাখিনি। প্রথমেই আমার বিগত অন্তরঙ্গ বন্ধুর চিঠি পেলাম। তাকে শুধু ভালবাসতাম না। বিশ্বাস করে সব কথা বলতাম। আমার মনে হলো আমার সেই বন্ধু যেন হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এর পর আমি পেলাম আমার মার চিঠি। সিল্কের গাউন পরে আমার মা যেন আমার সামনে বেড়াচ্ছেন। যেন বলছেন, রবার্ট, সব সময় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

আর একটা ড্রয়ার খুলে আমার অতীত দিনের কিছু প্রেমের চিহ্ন পেলাম, যেমন কিছু শুকনো ফুল, কয়েকগাছি মেয়েদের লম্বা চুল, একটা ছেঁড়া রুমাল ইত্যাদি। যে সব মেয়েদের প্রথম যৌবনে একদিন ভালবেসেছিলাম তারা হয়ত এখন বুড়ী হয়ে গেছে। তাদের মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। প্রেমের সেই-সব চিহ্নগুলোকে আমি পাগলের মত চুম্বন করলাম। করে বড় বেদনা পেলাম।

হঠাৎ ঘাঁটতে ঘাঁটতে আর একটা চিঠি পেলাম। দু লাইনে আমার নিজের হাতের লেখা। আমার বয়স তখন মাত্র সাত। আমি মার কাছে লিখেছিলাম আমার শিক্ষকের নির্দেশে।

হঠাৎ সুদূর শৈশব থেকে বার্ধক্যে চলে এলাম আমি। এই নিঃসঙ্গ বার্ধক্য-জীবনের দুঃসহ বোঝা একা একা কেমন করে বইব ? ক্রমশ যখন দেহের সব শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলব একে একে তখন কে আমাকে দেখবে, কে আমার সেবা-যত্ন করবে ?

রিভলবারটা আমার টেবিলে নামানো রয়েছে। সেটাতে আমি এখন গুলি ভরছি। কেউ যেন পুরনো দিনের চিঠি আর না পড়ে।'

অলৌকিক

[A miracle]

কিছুক্ষণ ভেবে তার স্মৃতির কুটরিটাতে কিছু হাতড়ে বলে উঠলেন ডাক্তার বনেন ফাঁত, হ্যাঁ পেয়েছি। ক্রীস্টমাস দিনের কথা। সেদিন রাত্রিতে আমি সত্যিই এক অলৌকিক কাণ্ড দেখেছিলাম।

কথাটা শুনে হয়ত তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ। কারণ আমি এমনই একজন মানুষ যে স্বভাবতঃ কোন কিছুতে বিশ্বাস করি না। তবু আমি সত্যিই একটি অলৌকিক ঘটনা দেখেছিলাম আর সেই কথাই বলছি। তোমরা হয়ত প্রশ্ন করতে পার ঘটনাটা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম কি না। কিন্তু না। আমি মোটেই তা হইনি।

আমার বিশ্বাস আর তোমার বিশ্বাস এক নয়। ধর্ম যে অনেক সময় অসাধ্য সাধন করতে পারে আমি তা বিশ্বাস করি। তবে কোন কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করি না। আমি যে তার পর থেকে কোন অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি তা নয়, তবে যে ঘটনাটি আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম তার অলৌকিকত্বে আমি সেদিন বিশ্বাস না করে পারিনি।

আমি তখন নর্মাণ্ডির সমভূমিতে অবস্থিত রোনোভিল নামে এক গ্রামে ডাক্তারি করতাম। সেবার ভয়ঙ্কর রকমের শীত পড়ে। নভেম্বর শেষ না হতেই দারুণ বরফ পড়তে শুরু করে। স্পষ্ট দেখা যেত উত্তর দিক থেকে ঘন কুয়াশার আকারে বরফের মেঘ নেমে আসছে।

দেখতে দেখতে বরফে সাদা হয়ে উঠল সমস্ত প্রান্তরভূমি আর পথ ঘাট। গাছগুলো বরফের ভারে নুয়ে পড়ল। অনেক গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। কেউ বাড়ি থেকে বার হত না। চারিদিকে বিরাজ করত মৃত্যুর মত এক হিমশীতল স্তব্ধতা। একমাত্র জীবনের চিহ্নস্বরূপ রুদ্ধদ্বার বাড়িগুলো থেকে শুধু একবার করে ধোঁয়া বার হত।

আমি বেশ বুঝলাম সমগ্র গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা ভয় পেয়ে গেছে। তারা বলাবলি করল রাত্রিকালে অশরীরী আত্মাদের চীৎকার শুনতে পাওয়া যায়। কাদার ভাতিনেলের বাড়িটা ছিল গাঁয়ের শেষ প্রান্তে। একদিন গাঁয়ে এক কামার আসে কাজের খোঁজে।

একদিন সেই কামার বনের ধারে বরফের উপর সত্যপ্রসূত এক হাঁসের ডিম দেখতে পায়। সেটা তুলে ধরে পরীক্ষা করে দেখে সত্যিই সেটা টাটকা হাঁসের ডিম। সে সেটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে খাবার সময় খেতে বলে। কিন্তু ডিমটা সেখানে কিভাবে এল তা তখনো বুঝতে পারেনি সে।

তার স্ত্রীও প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গেল। এইরকম ভয়ঙ্কর আবহাওয়ায় ঐরকম জায়গায় কোথা হতে ডিমটা এল সেও বুঝে উঠতে পারল না। যাই হোক, ডিমটা সিদ্ধ করল। সিদ্ধ ডিমটা কামার তার স্ত্রীকেই খেতে বলল। ডিমটা যখন তার স্ত্রী খাচ্ছিল তখন কামার বারবার জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগছে? তার স্ত্রী সে কথার উত্তর দিল না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল।

কিন্তু ডিম খাওয়া শেষ হতেই সে চেয়ার থেকে মেঝের উপর পড়ে গিয়ে ভয়ঙ্করভাবে হাত-পা খিঁচতে লাগল। এমনভাবে চীৎকার করতে লাগল যা শুনে মনে হতে লাগল এ চীৎকার কোন মেয়েমানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।

কামার আমাকে ডাক্তার হিসাবে ডেকে নিয়ে গেল। আমি ওষুধ দিলাম। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। রোগীকে বেঁধে বিছানায় শুইয়ে রাখা হলো। কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেই আবহাওয়ার মাঝেও দলে দলে লোক আসতে লাগল। সবাই বলল, মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে।

অবশেষে খ্রীস্টমাসের উৎসবের দিন এসে গেল। সেদিন সকালবেলায় চার্চের পুরোহিত এসে আমাকে বলল, আজ রাত্রিতে চার্চে যাবেন। আমার মনে হয় আজই ঈশ্বর ঐন্দ্রজালিকভাবে সারিয়ে তুলবেন মেয়েটিকে।

আমি তখন বললাম, তাহলে এ জগতে ওষুধ ছাড়াই যেকোন রোগ সেরে যেতে পারে?

যাজক বলল, আপনি তাহলে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না ডাক্তার। যাই হোক, আপনি এসে আমাকে কিছুটা সাহায্য করবেন কাছে থেকে।

আমি সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে চার্চে গেলাম। নিঃশব্দ তুষারপাতের মধ্যে ঘড়ির শব্দটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। আকাশে তখন সবেমাত্র পূর্ণিমার গোলাকার চাঁদ উঠেছে। সে চাঁদের ধবধবে আলো বাইরের তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরের শুভ্র শূন্যতাটাকে প্রকট করে তুলছিল আরো যেন।

চার্চের ভিতরটাকে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। উপস্থিত সকলে হাঁটু গেরে প্রার্থনা করতে শুরু করল। একটি ঘরের মধ্যে রোগিনীকে রাখা হয়েছিল। প্রার্থনা শেষে কমিউনিয়নের কাজ হয়ে গেল। সকলেই আপন আপন মনের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করল এবং ঈশ্বরের বিধান মেনে চলার সংকল্প করল।

এমন সময় আমি দরজা খুলে রোগীকে বার করে আনতে বললাম। চার জন শক্ত লোক রোগীকে জোর করে ধরে আনল। আমি ভেবেছিলাম চার্চের এতসব আলো ও লোকজন দেখে তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু তা হলো না। সে তেমনি হাত পা খিঁচে চীৎকার করতে লাগল। তার চোখগুলো ঘুরছিল। তাকে দেখে ভয় লাগছিল। তবু তাকে ধরে রাখা হলো।

অবশেষে যাজক মন্ত্রঃপূত স্বর্ণখচিত একটি রূপোর পাত্র হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রোগিনীর মাথায় সেটি রাখলেন। রোগিনী কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। সে অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে সেই উজ্জ্বল পাত্রটি দেখতে লাগল। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর সে শান্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে ঢলে পড়ল। সে চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছিল। তারপর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে ওঠে।

এই হচ্ছে আমার চোখে দেখা সেই অলৌকিক ঘটনা।

এই বলে চুপ করলেন ডাক্তার বনেন ফাঁত। কিছুক্ষণ পরে বললেন, এ কথার সত্যতা আমি লিখিতভাবেও স্বীকার করতে পারি।

অভিশপ্ত রুটি

[The accursed bread]

বৃদ্ধ তেইলির কোন পুত্র সন্তান নেই। তাঁর তিনটি মেয়ে—এ্যানা, রোজ আর ক্ল্যারা। বড় মেয়ে এ্যানার কথা প্রায় শোনাই যায় না সংসারে। মেজ মেয়ে রোজের বয়স আঠারো আর ছোট ক্ল্যারার বয়স পনের। তেইলি বিপত্নীক এবং মঁসিয়ে লেক্রমঁতের বোতাম কারখানায় ফোরম্যানের কাজ করে।

বড় মেয়ে এ্যানা যেদিন বাড়ি থেকে হঠাৎ পালিয়ে যায় সেদিন রাগে আগুন হয়ে ওঠে বৃদ্ধ তেইলি। সেদিন থেকে এ্যানার নাম পর্যন্ত মুখে একবারও উচ্চারণ করেনি। কিন্তু লোকে যখন বলতে লাগল এ্যানা মঁসিয়ে ডুবয়ের ঘরণী হিসাবে ভাল আছে, সুখে আছে এবং মঁসিয়ে ডুবয় সরকারের বাণিজ্য সংক্রান্ত মামলায় একজন বিচারপতি যার অর্থ ও প্রতিপত্তি দুইই আছে, তখন সে শান্ত হল।

তেইলি ভাবল সে বছরে মাত্র পাঁচ ছ হাজার ফ্রাঁর জন্য তিরিশ বছর ধরে চাকরি করে আসছে। তবু সংসারে খাওয়াপরা ছাড়া কোন উন্নতি করতে পারেনি। কোন আসবাবপত্র কিনে ঘর সাজাতে পারেনি। কিন্তু এ্যানার সংসারে আজ কত উন্নতি, কত ঐশ্বর্য।

একদিন সকালে গাঁয়ের ধনী জোতদার তুচার্ডের ছেলে এসে তেইলির কাছে তার মেজ মেয়ে রোজের পাণিপ্রার্থী হয়ে বিয়ের প্রস্তাব করল। তেইলি দেখল এটা তার পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার, কারণ তুচার্ডরা অনেকবেশী সম্পত্তিসম্পন্ন তাদের তুলনায়।

বিয়ের দিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে গেল। ঠিক হলো বিয়ের পর ভোজসভা হবে মাদার লুসার রেস্তোরাঁয়।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে এ্যানা বাপের বাড়ি এসে হাজির। সে এসে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। বোনদেরও একে একে জড়িয়ে ধরল। তেইলি সানন্দে ক্ষমা করল মেয়েকে। সকলের আনন্দাশ্রুর মাঝে পুনর্মিলন ঘটল। সেই সঙ্গে এ্যানা প্রস্তাব করল রোজের বিয়ের ভোজটা হবে তার বাড়িতে। সে সব দায়িত্ব নিচ্ছে। তার বাবাকে একটি পয়সা খরচ করতে হবে না।

তেইলি ও তার মেয়েরা খুশি হলো। কিন্তু সমস্যা হলো তুচার্ডদের নিয়ে। যদি তারা কিছু মনে করে? রোজ বলল, তুচার্ডদের রাজী করাবার ভার সে নেবে।

মঁসিয়ে ডুবয়ের নাম শুনে তুচার্ডরাও রাজী হয়ে গেল।

বিয়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম শেষ হয়ে গেলে এ্যানা অতিথিদের তার

বাড়িতে নিয়ে গেল। অতিথির সংখ্যা মোট বারো জন দু পক্ষ মিলিয়ে। ড্রয়িং রুমটিকে সাজিয়ে খাবার ঘরে পরিণত করা হয়েছে। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্ত বিচিত্র রকমের সুস্বাদু খাবারের প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা দেখে খেতে খেতে সম্মানসিক্ত এক অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল অতিথিরা, কারণ তারা এ ধরনের ভোজসভায় কখনো অংশগ্রহণ করেনি এর আগে।

কেমন যেন একটা থমথমে গাম্ভীর্য বিরাজ করছিল বাড়িটাতে। দামী আসবাবপত্র সাজানো ঘরে বসে দামী খাবারের অমিত আয়োজন দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল তারা। ফলে ইচ্ছা থাকলেও প্রাণখোলা হাসিখুশিতে ফেটে পড়তে পারছিল না কেউ।

এমন সময় ফিলিপকে তার মা একটা গান করতে বলল। ওর গানের নাকি হাভারের সবাই প্রশংসা করে। ফিলিপ গাইল 'অভিশপ্ত রুটি' গানটি। গানটি তিনটি স্তবকে বিভক্ত। ফিলিপের গলা ভাল। প্রথম স্তবক দুটি শুনে সকলের চোখে জল এল। সৎ বা অসৎভাবে সব মানুষকেই অতি কষ্টে রুটি রোজগার করতে হয়। কিন্তু তৃতীয় স্তবকটি শুনে এ্যানা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। গানটির প্রথম চরণে আছে, বৎসগণ, তোমরা যেন অপমানের রুটি গ্রহণ করো না। যে সব মেয়েরা ধর্মের পথ ছেড়ে অধর্ম ও অসম্মানের পথে রুটি রোজগার করে গানটিতে তাদের ধিক্কার দেওয়া হয়েছে।

গানটি শুনে অন্তরে ব্যথা পেল এ্যানা সবচেয়ে বেশী। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভিজে গলায় কোনরকমে তার চাকরদের ডেকে মদ আনতে বলল অতিথিদের জন্য। ভৃত্যেরা যখন সোনালী কাগজে জড়ানো দামী মদের বোতলগুলো খুলছিল তখন অতিথিরা ফিলিপের গলার সঙ্গে সুর মিলিয়ে একসুরে গাইছিল, বৎসগণ, তোমরা যেন কখনো অপমানের রুটি গলাধঃকরণ করো না।

নদীবক্ষে

[On the river]

গত গ্রীষ্মকালে প্যারিস থেকে কয়েক মাইল দূরে সেন নদীর ধারে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। সেখানে আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম। সেই সূত্রে এক নূতন প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। লোকটির বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। এমন অদ্ভুত ধরনের লোক জীবনে আমি কখনো কোথাও দেখিনি।

লোকটি ছিল জলের পোকা। নদী আর নৌকা ছাড়া জীবনে যেন সে আর কিছুই জানত না। সব সময় মুখে লেগে ছিল তার শুধু নৌকার কথা।

কোন এক সন্ধ্যায় নদীর ধারে তার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে তাকে তার জলজীবনের দু-একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে বললাম।

সে বলল, কত বলব? নদী সম্বন্ধে কত কথা মনে ভিড় করে আসছে। তোমরা যারা শহরের মানুষ তাদের নদী সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। কিন্তু কোন জেলেকে জিজ্ঞাসা করে দেখবে। নৈশ শ্মশান বা কবরখানার মত রাত্রিতে নদীবক্ষে কত অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়, কত অদ্ভুত কথা শোনা যায়। সে সব কথা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে। যে নদীর গর্ভে কত লোক কত সময় সলিলসমাধি লাভ করেছে সেই নদীও ত এদিক দিয়ে এক বিরাট কবরখানা। আমার কিন্তু সমুদ্রের থেকে নদীকে ভয় করে বেশী। অন্ধকার রাত্রিতে নদীর বুকে থেকে মনে হয় নদীর শেষ নেই। অন্ধকার রাত্রিতে যে নদীর জল নিঃশব্দে বয়ে যায় তা মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার জীবন নিতে পারে। সমুদ্র তবুও গর্জন করে ঢেউএর ঘর্ষণে আগুন জ্বেলে সাবধান করে দেয় মানুষকে। কবিরা বলেন সমুদ্রের তলদেশে আছে নীল অরণ্য, আছে কত গুহা। কিন্তু নদীর তলদেশটা কালো কালো কাদায় ভরা। যাই হোক, তুমি যখন শুনতে চাও, এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বলি।

ঘটনাটা ঘটে আজ হতে বছর দশেক আগে। আমি তখন থাকতাম মাদাম লাফঁর বাড়িতে। একদিন সন্ধ্যের সময় আমি একা একটা বারো ফুট লম্বা নৌকা নিয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে বাসায় ফিরছিলাম। হঠাৎ কি মনে হলো নৌকাটাকে কিছুক্ষণ শিকল দিয়ে এক জায়গায় বেঁধে নোঙর করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব ভাবলাম। তীরে থেকে প্রায় পাঁচশত গজ দূরে সেই জায়গাটায় কতকগুলো নলখাগড়া গাছ ছিল।

তখন চাঁদ উঠেছে। আবহাওয়াটা ছিল চমৎকার। চাঁদের রূপালি আলো ছড়িয়ে পড়েছিল নদীর শান্ত নিস্তরঙ্গ বুকের উপর। কোথাও কোন শব্দ নেই। এমন কি ব্যাঙ্‌ বা জলপোকার কণ্ঠগুলোও নীরব ছিল একেবারে। চারদিকের এই জমাটবাঁধা স্তব্ধতায় কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করছিলাম আমি। আমি নৌকার উপর দাঁড়িয়ে চারিদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে একটা পাইপ ধরিয়ে খেতে লাগলাম। কিন্তু ধূমপানে কোন আস্বাদ পেলাম না। ক্রমশঃ আমার অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিল। আমি গুনগুন করে আপন মনে গান গাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার কণ্ঠ থেকে কোন গান বের হলো না।

কোথায় একটা ব্যাঙ্‌ লাফাতেই চমকে উঠলাম আমি। কোন কিছু ভাল না লাগায় নৌকার পাটাতনের উপর শুয়ে পড়লাম চিৎ হয়ে। আকাশের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। সহসা আমার

মনে হলো কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমার নৌকাটা দোলাচ্ছে। শুধু দোলাচ্ছে না, একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হলো, বিক্ষুব্ধ ঢেউএর উপর নৌকা যেমন ওঠানামা করে তেমনি আমার নৌকাটা ভীষণভাবে ওঠানামা করছে। ঠিক যেমন ঝড় উঠেছে। নানা-রকমের অদ্ভুত শব্দ কানে আসতে লাগল আমার। কিন্তু কিসের শব্দ ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমি উঠে পড়লাম। দেখলাম কোথাও কিছু নেই। আমি আর সেখানে কালক্ষেপ না করে নৌকা ছেড়ে দেবার মনস্থ করলাম। কিন্তু শত চেষ্টা করেও নোঙরের শিকল খুলতে পারলাম না। মনে হলো কে যেন জোর করে সে শিকল টেনে ধরে রেখে দিয়েছে।

আমি হতাশ হয়ে বসে পড়লাম। ভাবলাম কোন জেলের ডিঙি নৌকা দেখতে পেলেই ডাক দেব তাকে। কিন্তু সহসা সাদা ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল নদীর বুকটা। আমি নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম না সে কুয়াশা ভেদ করে। একটা অব্যক্ত অজানিত ভয় ধীরে ধীরে প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে আমার সমস্ত সাহসিকতাকে আচ্ছন্ন করে দিল। আমি গলা ফাটিয়ে একবার চীৎকার করলাম। কিন্তু দূরে নদীর পারে কতকগুলো কুকুর শুধু ডেকে উঠল। কোন জনমানবের শব্দ পেলাম না। একবার ভাবলাম সাঁতার দিয়ে কূলে গিয়ে উঠব। কিন্তু কুয়াশায় কিছু দেখতে না পাওয়ায় সাহস হলো না জলে নামতে।

কিছু কড়া মদ ছিল নৌকার ভিতরে। আমি তার থেকে কিছু মদ খেলাম আর ঝিমোতে লাগলাম। ক'ঘণ্টা এভাবে কেটে গেছে তা জানি না। সহসা দেখলাম কুয়াশা কেটে গেছে। নদীর বুকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই কুয়াশা সরে গিয়ে নদীর দুই কূলে জমে উঠে দুটো সাদা বরফের পাহাড়ের মত শোভা পাচ্ছে। দু'দিকে দুটো সাদা বরফের বিরাট পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রূপালি জলের চকচকে একটা নদী। চাঁদের আলোয় সমগ্র দৃশ্যটা চমৎকার দেখাচ্ছিল। এখানে সেখানে ব্যাঙ্‌ও জলপোকা ডাকছিল। আমি দেখলাম আমার সে ভয় আর নেই।

ক্রমে দেখলাম ভোর হয়ে আসছে। একটা জেলেডিঙি দেখতে পেয়ে তাকে ডাক দিলাম। সব কথা বললাম। কিন্তু তাতে আমাতে দুজনে চেষ্টা করেও শিকলটা ছাড়াতে পারলাম না। কিছু পরে আর একটা ডিঙি নৌকা দেখতে পেয়ে আবার ডাক দিলাম। এবার তিনজনে অনেক চেষ্টা করে কোন-রকমে নৌকাটাকে শিকলমুক্ত করলাম। যেখানে শিকলটা আটকে ছিল সেখানে গিয়ে দেখলাম একটা বুড়ীর মৃতদেহ। তার গলায় একটা ভারী পাথর। ভিজে ঢোল হয়ে উঠেছে মৃতদেহটা। তার উপর পাথরের ভার।

আমার পঁচিশ দিন

[My twentyfive days]

হোটেলের যে ঘরটায় আমি উঠেছিলাম তাতে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে গিয়ে সহসা টেবিলের ড্রয়ার খুলে তার মধ্যে একটা পাণ্ডুলিপি দেখতে পেলাম। আমার আগে এ ঘরে যিনি থাকতেন এ পাণ্ডুলিপি নিঃসন্দেহে তাঁর। তার উপর লেখা রয়েছে, 'আমার পঁচিশ দিন।'

যারা জীবনে কোনদিন বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায়নি তাদের যদি কোন উপকারে লাগে এই লেখাটি সেই ভেবে লেখাটি যথাযথভাবে তুলে দিচ্ছি আমি। মূল লেখা থেকে একটি বর্ণও বাদ দিইনি। ডায়েরীতে লেখা ছিল : শাতেল গিয়ন, জুলাই ১৫। প্রথম দর্শনে জায়গাটাকে মোটেই মনোরম বলা যাবে না। তবু আমাকে এই জায়গাতেই পঁচিশটা দিন কাটাতে হবে। কারণ আমার লিভার আর পাকস্থলীর অসুখটা সারাতে হলে এছাড়া কোন উপায় নেই।

চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়েযাওয়া গৈরিক জলে ভরা একটা পাহাড়ে নদীর পারে একটা উপত্যকার কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে শাতেল গিয়ন নামে এই স্বাস্থ্যনিবাসটা। এখানে হোটেল বলতে আছে একটা। হোটেলটা অবশ্য বেশ বড় আর অভিজাত ধরনের। এই স্বাস্থ্যনিবাসে যারা শরীর সারাতে আসে তারা সেই হোটেলটায় ওঠে। হোটেলটার চারদিকেই বাগান। গাছের ছায়ায় ঘেরা পথ। সেই হোটেলে যারা থাকে তারা সবাই রোগী, তাই সবাই চুপচাপ থাকে। এমন কি তারা যখন হোটেলটার বাইরের বাগানে বা ছায়াঘেরা পথগুলোতে ঘুরে বেড়ায় তখনো তাদের মুখগুলো এক নীরব ও নীরস গাম্ভীর্যে থমথমে হয়ে থাকে। এই জায়গাটার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো একটা ছোট্ট উষ্ণ প্রস্রবণ। লোকে বলে রোজ কয়েকদিন সেই প্রস্রবণের এক গ্লাস করে গরম জল পান করলে পেটের সব রোগ সেরে যায়।

প্রথম দিন এসে বেলা দুটোর সময় দুপুরের খাওয়ার পর জায়গাটা ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম বাঁ দিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। তার মাঝে একটা মৃত আগ্নেয়গিরিও দেখলাম। তার গায়ে আভাগুলো জমাট বেঁধে আছে আজও। ডান দিকে দেখলাম একটা উন্মুক্ত প্রান্তর একটা উপত্যকার ঢালু পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত চলে গেছে। ঘুরে ফিরে উষ্ণ প্রস্রবণ হতে দু তিন গ্লাস গরম জল খেলাম।

রাত্রিতে হোটেলে ফিরে খাওয়ার পর ডায়েরী লিখতে বসলাম। হোটেলটা একেবারে চুপচাপ। শুধু রাত্রি নয়, দিনে রাতে সব সময়। এখানে যারা থাকে তারা সবাই যেন রোগী, সবাই নির্জীব নিরানন্দ। রাত্রির সেই নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে মাঝে মাঝে কুকুর ডাকছিল।

১৬ই জুলাই। আমি আমার নির্ধারিত পঁচিশ দিনের প্রথম দিন যাপন

করলাম। উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। সারাদিন পার্কে আর পথে পথে ঘুরেছি। স্নান করেছি আর দু'তিন গ্লাস জল পান করেছি।

১৭ই জুলাই। দুজন সুন্দরী বিধবা নারীকে দেখলাম হোটেলে। তাদের স্নান খাওয়া সব লক্ষ্য করলাম। তাদের কেমন যেন রহস্যময়ী মনে হলো।

১৮ই জুলাই। কিছুই লেখার নেই।

১৯শে জুলাই। সেই বিধবা মেয়েদুটিকে আবার দেখলাম। তাদের বেশ সৌখীন মনে হলো। তাদের মধ্যে এক সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদার ভাব আছে। সেটা আমার ভাল লাগে।

২০শে জুলাই। অরণ্যসমাচ্ছন্ন এক সুন্দর উপত্যকায় অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালাম। সাঁ লুসির আশ্রম পর্যন্ত চলে গেলাম। সবুজ বনভূমির মাঝে মাঝে এক একটা গাঁ। পার্বত্য পথে মাঝে মাঝে খড় বোঝাই এক একটা গরুটানা গাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। জায়গাটা দেখতে মনোরম হলেও কেমন যেন এক শুষ্ক বিষাদে ভরা। এই সব উপত্যকার বাতাস বড় নির্মল। তবে গরম পড়লে এবং বাতাসের গতিটা মন্থর হয়ে পড়লে তাতে গোবরের গন্ধ পাওয়া যায়।

২১শে জুলাই। এনভাল উপত্যকায় বেড়াতে গেলাম। একটা খাড়াই পাহাড়ের পাদদেশে জায়গাটা। বড় বড় পাথরের মাঝখান দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। হঠাৎ নারীকণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে খোঁজ করে দেখলাম সেই সুন্দরী বিধবা দুজন বসে গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। ইতস্তত: না করে আমি তাদের সামনে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। তারাও আমাকে ভালভাবে কোনরূপ কুণ্ঠা না করে গ্রহণ করল। একসঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে হোটেলে ফিরলাম। প্যারিসের গল্প করলাম। দেখলাম আমি যাদের চিনি এমন দু-একজনকে তারাও চেনে। বড় ভাল লাগল। বিদেশে এই ধরনের আলাপ বড়ই আনন্দদায়ক। আবার আগামীকাল তাদের সঙ্গে দেখা হবে।

২২শে জুলাই। সারা দিনটাই একরকম সেই সুন্দরী বিধবাদের সঙ্গে কাটল। তারা সত্যিই সুন্দরী। একজনের একটু বয়স হয়েছে। আর একজন যুবতী। তারা বলল তারা দুজনেই বিধবা। আমি বললাম আগামী কাল আমরা একসঙ্গে রোয়াত বেড়াতে যাব। তারা রাজী হয়ে গেল। আগের থেকে শাতেল গিয়নকে সত্যিই বড় ভাল লাগছে।

২৩শে জুলাই। সারা দিনটা রোয়াতেই কাটল। ক্লারমঁত ফরান্দের কাছে একটা উপত্যকার তলায় জায়গাটা। অনেকগুলো হোটেল আর একটা পার্ক নিয়ে গড়ে উঠেছে ছোট শহরটা। কিন্তু অনেক ভাল ভাল লোক থাকে। আমি যখন দুদিকে দুজন সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে পথে যাতায়াত করছিলাম তখন পথচারীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছিল আমার দিকে। কত লোকের মধ্যে ঈর্ষা জাগছিল। এ জগতে সুন্দরী নারীই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। সবচেয়ে বড়

ঐশ্বর্য। কোন মানুষ কোন সুন্দরী নারীর হাত ধরে যখন সে অসংখ্য মুগ্ধ ও ঈর্ষান্বিত দৃষ্টির মাঝখান দিয়ে পথ চলে তখন সে যেন সবাইকে বলতে চায়, এই দেখ সুন্দরী নারীর যে মন জয় করা কত কঠিন কাজ সে মন আমি জয় করেছি। দেখ কত বড় ঐশ্বর্যে আমি ঐশ্বর্যবান।

২৪শে জুলাই। আমি সেই সুন্দরী বিধবাদের একবারও কাছছাড়া হইনি। তাদের আমি ভালকরে বোঝার চেষ্টা করেছি। তাদের জন্ম এই হোটেলে ও গোটা অঞ্চলটাকে বড় মনোরম লাগছে।

২৫শে জুলাই। একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে আমরা তিনজনে তাদেমত লেক দেখতে গেলাম। সেখানে একটা হোটেলে কোনরকমে খাওয়া শেষ করেই আমরা পাহাড় দিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ লেকের ধারে গিয়ে আমি বললাম, 'এই লেকের জলে স্নান করুন।' তারা বলল, 'মন্দ হয় না। কিন্তু বাড়তি পোশাক কোথায়?' আমি বললাম, 'এটা একেবারে জনমানবহীন জায়গা। কেউ দেখবে না।'

তারা তখন একে একে তাদের উলঙ্গ সুঠাম দেহ নিয়ে জলে নেমে পড়ল। লেকের স্বচ্ছ জলে তাদের সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেহগুলো ডুবিয়ে তারা যখন স্নান করছিল আমি তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে তাদের পানে তাকিয়ে ছিলাম। সে দৃশ্য জীবনে ভুলতে পারব না।

২৬শে জুলাই। সেই সুন্দরী বিধবাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা দেখে হোটেলের কিছু লোক আমাদের সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। তারা আমায় ঈর্ষা করতে লাগল। তারা আমার কাজটাকে নীতিবিগর্হিত মনে করতে লাগল। কিন্তু তারা জানে না জীবনে যেকোন আমোদপ্রমোদ ও আনন্দ উপভোগের মধ্যেই কিছুটা নীতিবিচ্যুতি আছে। কোন না কোন কর্তব্য বা নৈতিক দায়িত্ব হতে কিছুটা বিচ্যুত না হলে পরিপূর্ণভাবে কোন আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ সম্ভব হয় না।

২৭শে জুলাই। আনন্দের কথা। আমার ওজন ৬২০ গ্রাম কমে গেছে। শাতেল গিয়নের জল ভাল বলতে হবে। আমি সুন্দরী দুজনকে নিয়ে রিয়ন নামে একটা ছোট্ট শহরে ডিনার খেতে গেলাম।

২৮শে জুলাই। দুঃখের বিষয় দুজন ভদ্রলোক আমার সেই দুজন সুন্দরী সঙ্গিনীর কাছে এলেন। তাঁদের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় দুজন মহিলাই চলে গেলেন। যাবার সময় আমার নাম লিখে নিল।

২৯শে জুলাই। আবার আমি একা। সেই দুঃসহ নিঃসঙ্গতা। একা একা এক মৃত আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর দেখতে গেলাম। বড় চমৎকার দৃশ্য।

৩০শে জুলাই। লেখার কিছুই নেই।

৩১শে জুলাই। হাতে কোন কাজ নেই। যতসব জঞ্জাল আর আবর্জনায় এখানকার ছোট ছোট নদীগুলোর জল নোংরা ও দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে

আমি অভিযোগ জানালাম স্থানীয় পৌর অফিসে।

১লা আগস্ট। শ্যাটোনকে বেড়াতে গেলাম। সেটাও একটা স্বাস্থ্যনিবাস। সেখানে শুধু বাতের রোগীরা থাকে। শুধু পঙ্গু আর খোঁড়া লোকে ভরা সব পথঘাট। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

২রা আগস্ট। কোন কিছুই লেখার নেই।

৩রা আগস্ট। উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি।

৪ঠা আগস্ট। লেখার কিছুই নেই। শুধু ওষুধ আর পথ্য।

৫ই আগস্ট। লেখার কিছুই নেই।

৬ই আগস্ট। শুধু একটানা হতাশা। আমার ৩২০ গ্রাম ওজন বেড়ে গেছে।

৭ই আগস্ট। শাভেল গিয়ন থেকে ছেষট্টি কিলোমিটার দূরে গাড়িতে করে এক পার্বত্য গাঁয়ে চলে গেলাম। জায়গাটার নারীদের প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ আমি তার নাম করব না। গাড়ি থেকে নেমে কিছু ঘোরাঘুরির পর কাজু বাদামের গাছে ভরা এক জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া এক নদীর ধারে একটা পাহাড়ী গাঁয়ে গিয়ে উঠলাম। এত কাজুবাদামের গাছ আর কোথাও দেখিনি আমি। সাধারণতঃ পাহাড়ী এলাকার মেয়েদের নীতিবোধ তত দৃঢ় হয় না। সমতল ভূমির মেয়েদের থেকে তাদের মন বড় হালকা হয়। তাদের চুম্বন করা খুব একটা কঠিন কাজ নয় এবং আর একটু সাহসী হলেই যেকেউ আরো কিছু করতে পারে। এই গাঁয়ের মেয়েরাও ঠিক তাই। তবে এখানকার চার্চের যাজক এক নিয়ম করেছেন। এই গাঁয়ের কোন মেয়ে যদি ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত হয় তাহলে তাকে একটি কাজুবাদামের গাছ পুঁততে হবে। এইভাবে বেড়ে গেছে কাজুবাদামের বন। আবার রাত্রিতে এই কাজুবাদামের বনে গা ঢাকা দিয়ে মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় পথ চিনে নাগরেরা তাদের প্রিয়া সন্নিধানে যায়। এইভাবে কাজুবাদামের বনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধও যায় বেড়ে।

৮ই আগস্ট। কিছু নেই লেখার মত।

৯ই আগস্ট। তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার শাভেল গিয়নের হোটেলে ফিরে যাওয়ার জন্ম তৈরী হলাম। আগামীকালই আমি প্যারিসে চলে যাব। নীলচে কুয়াশায় ভরা লিমাগনের পাহাড় বন নদীকে বিদায় জানালাম।

এইখানেই ডায়েরী শেষ। আমি একবর্ণও বাড়িয়ে বলিনি।

হটট ও তার পুত্র

[Hatat and his son]

ধনী চাষীদের বাড়িগুলো যেমন হয় ঠিক সেই ধরনের বাড়িটা। বাড়িটাকে দেখলে অর্ধেক খামারবাড়ি, অর্ধেক বসতবাড়ি বলে মনে হয়। বাড়িটার সামনে

আপেলগাছে বাঁধা কতকগুলো শিকারী কুকুর শিকারের জিনিসপত্র জড়ো করতে দেখে ঘেউ ঘেউ করে চীৎকার করছিল। বড় রান্নাঘরটায় খাবার টেবিলের সামনে হটট, তার ছেলে, মঁসিয়ে বার্মত ; আর মঁসিয়ে মঁদার্ণ খেতে খেতে শিকারের কথা বলছিল।

আজ থেকে শিকারের সময় আরম্ভ হচ্ছে। খাওয়ার পরেই ওরা চারজনে শিকারে বার হবে। হটট তার শিকারে পারদর্শিতার জন্ত বড়াই করছিল এবং কিভাবে শিকার পাওয়া যাবে সেকথা গর্বের সঙ্গে তার অতিথিদের শোনাচ্ছিল। হটট হলো নর্ম্যানবংশীয় হাড়শক্ত বলিষ্ঠ চেহারার এমন এক মানুষ যে আপেলবোঝাই একটা গাড়ি তার কাঁধে তুলে নিতে পারে। আধা চাষী আধা ভদ্রলোক হটট তার ছেলেকে অল্প বয়সে পড়া ছাড়িয়ে চাষের কাজ শেখাতে শুরু করেছে। সে তাকে খাঁটি চাষী করে তুলতে চায়। তার ভয় ছিল তার ছেলে লেখাপড়া শিখলে চাষের কাজে তার মন বসবে না।

যুবক সেসার হটটও তার বাবার মতই লম্বা হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার চেহারাটা তার বাবার মত বলিষ্ঠ নয়। বাবার প্রতি আনুগত্য ও ভক্তিশ্রদ্ধা তার অপরিসীম।

বেঁটে মোটাসোটা চেহারার মঁসিয়ে বার্মত জিজ্ঞাসা করলেন, খরগোস আছে ত ?

হটট উত্তর করল, প্রচুর খরগোস আছে পুরাসভিয়েরের খালগুলোতে।

আঁট আঁট পোশাক পরা মোটা চেহারার মঁসিয়ে মঁদার্ণ বললেন, কখন রওনা হব আমরা শিকারের জন্ত ?

হটট উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঐ নীচু জায়গাটা দিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করব। আমরাই প্রথমে পাখিগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।

হটটের দেখাদেখি সকলেই তাদের আপন আপন বন্দুক পরীক্ষা করে নিল। সঙ্গে একজন চাকর আর শিকারী কুকুর নিয়ে যাত্রা শুরু করল সকলে। খামারবাড়ির সীমানা পার হয়ে খালবিলে ভরা একটা পতিত জমির উপর দিয়ে তারা এগিয়ে চলল। জায়গাটার মাঝে মাঝে ঝোপ জঙ্গলও আছে। এক জায়গায় গিয়ে থেমে পড়ল তারা। হটট ডান দিকে দাঁড়াল, তার ছেলে সেসার হটট বাঁ দিকে আর তাদের অতিথি দু'জন মাঝখানে দাঁড়াল।

হটট প্রথমে একটা গুলি করল। সকলে তাকিয়ে দেখল একটা উড়ন্ত বুনো হাঁস চীৎকার করে পড়ে গেল একটা ঝোপেঘেরা খালের মধ্যে। হটট সঙ্গে সঙ্গে হাঁসটিকে তুলে আনার জন্ত ঝোপের মধ্যে ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা গুলির শব্দ হলো। মঁসিয়ে বার্মত খুশি হয়ে বলল, হয়ত ঝোপের মধ্যে একটা খরগোস পেয়ে থাকবে। মঁসিয়ে মঁদার্ণ হাততালি দিয়ে চীৎকার করে উঠল, তোমার শিকার খুঁজে পেয়েছ হটট ?

কিন্তু কোন উত্তর এল না। কিছুক্ষণ কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে সেসার হটট

তাদের চাকর জোশেপকে বলল, যাও জোশেপ, ব্যাপারটা দেখে এস, আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

জোশেপ সাবধানে ঝোপ ঠেলে খালটায় নেমে গেল। নেমেই চীৎকার করে বলল, শীগ্‌গির আসুন সব, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

তারা সবাই তখন ছুটে গিয়ে দেখল হটট তার তলপেটটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। তার তলপেট থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে ঘাসের উপর। তারা এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল। হটটের বন্দুকটায় গুলি ভরা ছিল। সে গুলিভরা বন্দুকটা পাশে ফেলে দিয়ে খালে নামছিল মরা হাঁসটাকে তোলার জন্ত। শিকার পাবার আনন্দে গুলিভরা বন্দুকটার কথা ভুলেই গিযেছিল। কিন্তু সে যখন খালে নামছিল হেঁট হয়ে, ঠিক তখনই বন্দুকটা জোরে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে গুলিটা বেরিয়ে তার তলপেট বিদ্ধ করে।

হটটকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে গেল ওরা। তলপেট কাপড় দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ডাক্তার ডাকল। তারা বুঝল আঘাত গুরুতর। তাই তারা পুরোহিতকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

বাবার বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সেসার হটট। ডাক্তার তাকে সাহস দিয়ে বলল, এমন করে কেঁদোনা। এটা খারাপ দেখায়।

ডাক্তার রোগীর ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে দিলে রোগী তার ঘোলাটে চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে এবার বলল, আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেল।

ডাক্তার তাকে সাহস দিয়ে বলল, না না, দিনকতক বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে।

তবু হটট বলল, না আমি জানি, আমার এইখানেই সব শেষ। আমি আমার ছেলের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

সেসার হটট তখনো আকুলভাবে কাঁদছিল।

হটট ক্ষীণ অথচ দৃঢ় গলায় তার ছেলেকে বলল, এখন কান্না থামাও। কান্নার সময় নেই। আমার কাছে বস। তোমাকে কিছু কথা বলার আছে। তোমরা এখন যেতে পার।

অন্ত সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে হটট বলল, শোন বৎস, তোমার বয়স এখন চব্বিশ। এখন তোমার সবকিছু বোঝার মত সময় হয়েছে। আজ হতে সাত বছর আগে তোমার মার মৃত্যু হয়। আমার এখন বয়স হলো পঁয়তাল্লিশ। আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স ছিল মাত্র উনিশ। সুতরাং আজ হতে সাত বছর আগে তোমার মা যখন মারা যায় তখন আমার বয়স ছিল মাত্র সাঁইত্রিশ বছর। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে কেউ বিপত্নীক অবস্থায় থাকতে পারে কি?

সেসার হটট আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ ঠিক কথা বাবা।

হটট হাঁপাচ্ছিল। যন্ত্রণার তীব্রতায় তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু টেনে টেনে বলল, মানুষ ঐ বয়সে কখনো একা থাকতে পারে না। তবু আমি তোমার মাকে কথা দিয়েছিলাম বলে তার মৃত্যুর পর আর বিয়ে করিনি। বুঝতে পেরেছ ?

সেসার হটট বোকার মত উত্তর করল, হ্যাঁ বাবা।

হটট আবার বলতে লাগল, যাই হোক, রুয়েন শহরে আমারও এক রক্ষিতা আছে। ১৮, রু ত্ব লেপারস্থান-এ তিন তলায় দ্বিতীয় ঘরটায় মেয়েটি থাকে। মেয়েটি বড় ভাল, যাকে অনুরক্ত বলা যায়। যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে তার প্রতি আমার কিছু কর্তব্য তার আগেই পালন করে যেতে হবে। আমি বলছি মেয়েটি সত্যিই ভাল। তবু আমি শুধু তোমার মুখ চেয়ে আর তোমার মার কথা স্মরণ করে তাকে ঘরে আনতে পারিনি। তাকে ঘরে এনে তাকে বিয়ে করে স্বামী স্ত্রীর মত বাস করতে পারতাম। কিন্তু তা করিনি।—দলিল-পত্র বা উইলের কথা তুলো না। মামলা মোকদ্দমার পথে পা বাড়িয়ো না। আমি তা করলে কখনই সম্পত্তি ও ধন সঞ্চয় করতে পারতাম না। বুঝলে বাছা ?

সেসার মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ বাবা।

হটট বলল, শোন তাহলে। আমি কোন উইল করিনি। আমি জানি তোমার মনটা নরম, তুমি লোভী নও। আমি ভাবতাম শুধু আমার মৃত্যুকালে কথাটা বলে যাব তোমায়। বলব মেয়েটির কথা ভুলো না। তার নাম হলো ক্যারোলিন দোনেত। তার ঠিকানা হলো ১৮ নম্বর রু ত্ব লেপারস্থান, তিন-তলায় ডানদিকের দ্বিতীয় ঘর। সেখানে সোজা চলে যাবে। দেখবে তার যেন কোন অভাব না থাকে। তোমার প্রচুর আছে। তুমি তাকে কিছু দিতে পার। একমাত্র বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য কোনদিন গেলে তার দেখা পাবে না। সে খোড়াসিনেতে চাকরি করে। তাই আমি শুধু সপ্তায় ঐ একটি দিন তার কাছে যেতাম। আজ হতে ছয় বছর ধরে সেখানে যাচ্ছি। ঐদিন সে আমার জন্য পথ চেয়ে বসে থাকে। আমার মৃত্যুর কথা শুনলে বেচারা কত কাঁদবে। আমি তোমার মন জানি বলে একথা তোমাকে বলছি। আর একথা কাউকে বলো না। জানিও না। পুরোহিতকেও একথা বলবে না। এ ধরনের ঘটনা অনেকই ঘটে। কিন্তু সে ঘটনার কথা কেউ বলাবলি করে না। বুঝলে ?

সেসার হটট অনুগত পুত্রের মত বলল, হ্যাঁ বাবা।

আমার কাছে শপথ করে বলছ ?

হ্যাঁ বাবা।

আমার অনুরোধ, তার কথা ভুলো না। তার কাছে চলে যাবে। তারপর দেখবে সে কি চায়। একথা ভুলবে না। শপথ করে বলছ ত ?

হ্যাঁ বাবা।

এবার তাহলে আমাকে আলিঙ্গন করো। আমি আর বেশীক্ষণ বেঁচে

থাকব না। এবার ওদের আসতে বলতে পার।

জীবনে বাবার কথার কখনও অবাধ্য হয়নি সেসার। সে বাবার প্রতিটি কথা মেনে চলে যথাযথভাবে। এবারও তাই করল। বাবাকে আলিঙ্গন করার পর ঘরের দরজা খুলে দিল।

মন্ত্রপূতঃ পবিত্র তেল নিয়ে এসে ধর্মগত শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন পুরোহিত। হটট অনেকক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল। আর মুখ খুলতে পারল না। অবশেষে পুত্র, বন্ধুবান্ধব, পুরোহিত ও ভৃত্য পরিবৃত হয়ে মধ্য রাত্রিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল হটট। এর আগে চার ঘণ্টা ধরে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করেছে সে।

রবিবার মধ্যরাত্রিতে মারা যায় হটট। তাকে সমাহিত করা হয় মঙ্গলবার সকালে। কবরখানা থেকে বাড়ি ফিরে সারাদিন কান্নাকাটি করে কাটাল সেসার হটট। সারাদিন চোখে পাতায় করতে পারল না। সকালে উঠে সে ভাবতে লাগল সারা জীবন কিভাবে একা একা কাটাবে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সে ঠিক করল তার বাবার অন্তিমকালের ইচ্ছানুসারে আগামী কাল সকালেই রুয়েনে গিয়ে ক্যারলিনের সঙ্গে দেখা করবে। সে শুধু সব সময় তার ঠিকানাটা প্রার্থনার মন্ত্রের মত মুখস্থ করে যেতে লাগল।

পরদিন বেলা আটটা বাজতেই বাড়ির ঘোড়ার গাড়ি তৈরী করতে বলল সেসার হটট। গাড়ি এ্যানভিলের বড় রাস্তা দিয়ে রুয়েনের পথে এগিয়ে চলল। একটা কালো লম্বা কোট আর সিল্কের টুপী ও পায়জামা পরেছিল সেসার।

রুয়েনে গিয়ে তাদের জানাশোনা একটি হোটেলে গিয়ে প্রথমে উঠে অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাড়িটা বার করল সেসার। তারপর কুণ্ঠিত পদক্ষেপে তিনতলায় গিয়ে তার বাবার প্রেমিকার ঘরে ঢোকার আগে একবার থমকে দাঁড়াল। তাদের মত গৃহস্থ সঙ্গতিসম্পন্ন চাষী পরিবারের ছেলেমেয়েদের যতটুকু শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে জানতে পেরেছে সেসার এই ধরনের অবৈধ প্রেমের নায়িকা রক্ষিতারা ভাল হয় না। তাদের নাম শুনলেই তাদের প্রতি একটা ঘৃণা আর অবিশ্বাসের ভাব জাগে মনে। তার উপর তার বাবার প্রেমিকা বলে ক্যারলিন দোনেতের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে রীতিমত লজ্জাও অনুভব করছিল সে।

কলিং বেলের শব্দ শুনেই ঘরের দরজা খুলে সেসারের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল এক সুন্দরী যুবতী। সেসার কি বলবে তা খুঁজে পেল না। তখন যুবতীই তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি চান?

সেসার বলল, আমি হটটের পুত্র। আমার বাবা আমাকে আপনাকে একটা কথা বলার জন্য পাঠিয়েছেন।

দরজাটা সেসার নিজের হাতে বন্ধ করে দোনেতের পিছু পিছু ঘরের ভিতরে গেল। তারপর দোনেতের দেওয়া একটা চেয়ারে বসল। কিন্তু

প্রথমটায় কোন কথা বলতে পারল না সেসার। সারা ঘরখানায় চোখ বুলিয়ে দেখছিল সে। সামনের দেওয়ালে তার বাবার ছবি। ঘরের মাঝখানে খাবার টেবিলটাও হয়ত তার বাবার জন্য সাজানো হয়েছে। স্টোভে রান্না হচ্ছে। দোনেত হয়ত তার বাবার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। ঘরে চার পাঁচ বছরের একটি ছেলে খেলা করছিল।

এবার দোনেত মুখ তুলে বলল, তাহলে মঁসিয়ে সেসার?

অর্থাৎ কিজন্য সে এসেছে তা যেন সে এবার জানতে চায়। সেসারও সরাসরি সেই সাংঘাতিক কথাটা বলে ফেলল। 'বাবা গত রবিবার একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।'

সহসা মুখখনা সাদা হয়ে গেল দোনেতের। তার সারা দেহটা থরথর করে কাঁপছিল। তারপর বসে পড়ে সে বলে উঠল, না, না, তা হতে পারে না।

দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল দোনেত। তার মাকে কাঁদতে দেখে খেলা ছেড়ে ছেলেটি এসে তার মায়ের আঁচল ধরে কাঁদতে লাগল। আগন্তুক সেসারই তার দুঃখের কারণ ভেবে সেসারকে তার ছোট্ট হাত দিয়ে মারতে লাগল। সেসার বুঝল ছেলেটি দোনেতের। তাদের কান্না দেখে সেসারের চোখেও জল এল। সেসার আবার বলল, হ্যাঁ দুর্ঘটনাটা ঘটে রবিবার সকাল আটটার সময়।

দুর্ঘটনার সমস্ত বিবরণ দান করল সেসার। তারপর বলল মৃত্যুকালে তার বাবা দোনেতের জন্য কত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে।

কথাটা শুনে খুশি হলো দোনেত। সব কথা শেষ করে সেসার বলল, আমি বাবার ইচ্ছামত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে চাই। আমার অবস্থা ভাল। আমার অনেক সম্পত্তি আছে। আমি চাই না আপনার কোন কিছু অভাব বা অভিযোগ করার মত থাকে।

দোনেত বলল, অন্য সময় একথা হবে, এখন না। তবে যদি আমি কিছু নিই, তা ছেলের জন্যই নেব, আমার জন্য নয়।

সেসার বলল, এই ছেলেটি তাহলে—?

দোনেত বলল, হ্যাঁ, এ সন্তান তাঁর।

সেসার অন্য একদিন আসবে বলে উঠে যাচ্ছিল। কিন্তু দোনেত ছাড়ল না, কিছু খেয়ে যেতে হবে।

সেসারকে কিছু খেতে দিয়ে তার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসল দোনেত। তার বাবার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল। তারপর একসময় ছেলে এমিলকে কোলে নিয়ে বলল, ছেলেটা এবার অনাথা হলো।

সেসার বলল, আমিও তাই।

সেসার উঠে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, কবে আসব আবার?

দোনেত বলল, আগামী বৃহস্পতিবার এখানে এসে দুপুরের খাওয়া খাবে।

একটা মাত্র সপ্তা। কিন্তু তাও দীর্ঘ মনে হতে লাগল সেসারের। সময়

যেন আর কাটতে চায় না। অথচ আগে তার বাবা বেঁচে থাকার সময় ছায়ার মত সব সময় তার বাবার পিছু পিছু ঘুরে কাজ করে সময়টা কোনদিকে চলে যেত। একবার করে রোজ আজও মাঠে বের হয় সেসার, কিন্তু কেবলই মনে হয় মাঠের এক প্রান্তে টুপী মাথায় তার বাবা এগিয়ে আসছে অথবা এখনি এসে পড়বে কোথা থেকে।

ঘুরে ফিরে দোনেতের কথা প্রায়ই মনে পড়তে লাগল সেসারের। তার বাবা ঠিকই বলেছে দোনেত বড় ভাল মেয়ে। সেসার বেশ বুঝতে পারল দোনেত তার বাবাকে সত্যিই বড় ভালবাসত এবং তার বাবার মৃত্যুতে সত্যিই সে বড় রকমের একটা আঘাত পেয়েছে।

বৃহস্পতিবার আসতেই সকাল বেলাতেই রুয়েনে যাবার জন্য তৈরী হলো সেসার। দোনেতের ঘরে গিয়ে দেখল খাবার টেবিল আগেই সাজানো হয়েছে। দোনেত তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। দোনেতের হাতটা নিয়ে করমর্দন করে এমিলকে কোলে তুলে নিল সেসার। তার গালে চুম্বন করল। সেসার দেখল দোনেতের চেহারাটা কেমন রোগা হয়ে গেছে আগের থেকে। তার মুখ চোখ মলিন দেখাচ্ছিল। সেসার সব ঠিক করে এসেছে। সে বলল, সে বছরে এমিলের জন্য দু'হাজার ফ্রাঁ করে দেবে। দোনেত বলল, এত টাকার দরকার নেই। সে চাকরি করে। এমিলের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করে দিলেই হবে। কিন্তু সেসার তা শুনবে না। সে এ টাকা দেবেই। উপরন্তু এক হাজার ফ্রাঁ এখনই দেবে শোক পালনের জন্য।

দোনেতের ঘরে এসে বড় ভাল লাগছিল সেসারের। দুঃখের মাঝেও সান্ত্বনা পাচ্ছিল। খাওয়ার পর দোনেত তাকে জিজ্ঞসা করল, ধূমপান করো?

ধূমপান করে, কিন্তু পাইপটা আনতে ভুলে গেছে সেসার। দোনেত তখন তার বাবার পাইপটা এনে দিল। সেসার তাতে তামাক ভরে সেটাকে জ্বেলে ধূমপান করতে লাগল। তারপর এমিলের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করল। উঠতে মন চাইছিল না। তবু তিনটের সময় উঠে পড়ল সেসার।

দোনেত আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করল, আবার কবে আসবে?

সেসার বলল, যদি চান তাহলে আবার আসব।

দোনেত বলল, তাহলে পরের বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার সময় এখানে লাঞ্চ করবে।

সেসার বলল, অবশ্যই আসব ম্যাদময়জেল দোনেত।

আলুমা

[Allouma]

আলজিরিয়া বেড়াতে যাবার কথা হতেই আমার এক বন্ধু আমাকে বলে, সেখানে ঘুরতে ঘুরতে আমি যদি বোর্দ এব্বাবা নামক জায়গায় গিয়ে পড়ি

তাহলে যেন তার বন্ধু অবেলের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করি। অবেল এখন সেখানেই বসবাস করছে।

আলজিরিয়া ভ্রমণের সময় আমি কিন্তু সেই অবেলের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়।

আলজিয়ার্স হতে চেরশেল ও অলিয়ঁভিল পর্যন্ত বিস্তৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমি একটা মাস ধরে ঘুরে বেড়াই। সারা অঞ্চলটা পাহাড় প্রান্তর আর ঘন পাইন বনে ভরা। বনের মাঝে মাঝে এক একটা নদী বয়ে গেছে। পাহাড়ের পাশে খাদ। সেই সব খাদ আর ছোট ছোট নদীর উপর বড় বড় গাছ পড়ায় সাঁকোর মত হয়ে গেছে। আমার কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগল বিকাল-বেলায় পাহাড়ের উপর বেড়াতে। শেষ বিকেলের লাল রোদঝরা পাহাড়ের উপর যখন দেখতাম দূরের নীল সমুদ্র থেকে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেবদারু গাছের ছায়াঘেরা এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছড়িয়ে আছে তখন আমি সবকিছু ভুলে যেতাম। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম সেইদিকে। শেষ বিকেলের বাদামী আলোয় পাহাড়গুলোকে দেখে মনে হত সিংহের চামড়া দিয়ে ঢাকা একটা বিশাল উটের পিঠ।

পাহাড়ের রাজ্যে এলে হয়ত এমনিই মনে হয়। জীবনের সব কথা ভুলে যেতে হয়। একদিন বিকালে পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে আমিও সবকিছুই ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে আমি বুঝতে পারলাম আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। পাহাড় থেকে আমি লক্ষ্য করেছিলাম সামনের প্রান্তরের মাঝে মাঝে তাঁবুতে আরব দেশীয় কিছু লোক বাস করত। আমি পাহাড় থেকে কোনরকমে নেমে একজন আরবদেশীয় লোকের সঙ্গে দেখা করলাম। আমি তাকে কোনরকমে বোঝালাম আমি কি চাই। তার কথা আমি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারলাম না। তারপর তার একটা কথা আমার কানে বোধগম্য ঠেকল। সেটা হল বোর্দ একাবা। আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে দু ক্র। দেখিয়ে অবেলের বাড়িটা দেখিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। সে খুশি হয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। অন্ধকারে পথের উপর ছড়ানো পাথরে মাঝে মাঝে ঠোকর খেতে লাগলাম আমি।

অবশেষে দুর্গের মত এক বিরাট সাদা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। কোন জানালা নেই, সাদা দেওয়াল খাড়াই হয়ে উঠে গেছে। আমরা ডাকা-ডাকি করতে ভিতর থেকে ফরাসী ভাষায় একজন জিজ্ঞাসা করল, কে ডাকে? আমি তখন ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম, মঁসিয়ে অবেল এখানে থাকেন?

মঁসিয়ে অবেল নিজেই দরজা খুলে দিলেন। লম্বা চেহারার সুদর্শন এক ভদ্রলোক। আমি আমার পরিচয় দিতেই দুহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন আমায়। বললেন, আসুন, নিজের বাড়ি মনে করে আসুন।

ঘণ্টাখানেক পরে আমরা ডিনার খেতে বসলাম। আমি অবেলের জীবন-

কথার কিছুটা জানতাম। শুনেছিলাম তিনি নারীঘটিত ব্যাপারে বহু অর্থ ব্যয় করার পর তাঁর সব টাকা আলজিরিয়া গিয়ে কিছু জমি কিনে তাতে লগ্নী করেন। আঙুরের চাষ করে আজকাল তিনি প্রচুর লাভ করছেন এবং সুখে আছেন। কিন্তু সব জেনেও আমি বুঝতে পারলাম না একদা প্যারিসবাসী এক শহুরে ভদ্রলোক কিভাবে এই পার্বত্য অঞ্চলে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে পারছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম কতদিন এখানে আছেন ?

ম সিয়ে অবেল পাইপ খেতে খেতে বললেন, নয় বছর।

আমি আবার বললাম, মাঝে মাঝে একা একা খুব খারাপ লাগে ?

তিনি বললেন, থাকতে থাকতে সব ঠিক হয়ে যায়। শেষে জায়গাটাকে ভালই লাগে। প্রথম প্রথম আমাদের মন না চাইলেও এ দেশের জল, বাতাস পরিবেশ আমাদের দেহগত জৈব চেতনাকে মুগ্ধ আচ্ছন্ন করে ফেলে। তারপর, এখানকার জল বাতাসের বিশুদ্ধতা ক্রমশঃ মনটাকে বিশুদ্ধ করে তোলে। এখানকার নির্মল আকাশ থেকে ঝরেপড়া অবাধ স্বচ্ছ উজ্জ্বল সূর্যালোক মনের যতসব কুটিল অন্ধকার অপসারিত করে দেয়।

আমি বললাম, কিন্তু এখানে নারীসঙ্গের ত কোন সুযোগ নেই।

অবেল বললেন, বেশী নয়, নারীসঙ্গের কিছুটা অভাব বোধহয় হতে পারে।

আমি বললাম, তার মানে ?

অবেল বললেন, এখানেও কিছু আরবদেশীয় স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এমন কিছু মেয়ে পাওয়া যায় যারা দেশীয় রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় জীবনযাত্রার অনেক জিনিস নকল করতে চায়।

আমরা যখন কথা বলছিলাম, তখন লম্বা কালো চেহারার একজন দেশীয় ভৃত্য অপেক্ষা করছিল মালিকের হুকুমের জন্য। অবেল তাকে বললেন, এখন যাও মহম্মদ, দরকার হলে ডাকব।

মহম্মদ চলে গেলে অবেল বললেন, আমি আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলব। যে ঘটনার কথা বলব তাতে মহম্মদের একটা ভূমিকা আছে। ও ফরাসী ভাষা জানে। তাই ওকে যেতে বললাম।

অবেল তাঁর কাহিনী শুরু করলেন, বছরকতক আগের ঘটনা। আমি তখন সবেমাত্র এসেছি। এখানকার ভাষা আমতা আমতা করে কিছু কিছু বলতে পারি মাত্র। আমি তখন মাঝে মাঝে আলজিয়ার্স শহরে যেতাম কিছু আমোদ আহ্লাদ করতে। আমি এখানকার খামারবাড়িটা সব জমি জায়গা সমেত কিনে নিয়ে চাষ আবাদ শুরু করি। এই বাড়িটার বাইরে প্রান্তরের মাঝে তাঁবুতে যে সব স্থানীয় অধিবাসীরা বাস করে তারা আমার ক্ষেতে খামারে কাজ করে। মহম্মদ ওদেরই একজন এবং আমার ব্যক্তিগত ভৃত্য। সে বড় প্রভুভক্ত। আমার জীবনযাত্রা খুবই সহজ। সারাদিন আমি চাষের কাজ তদারক করি। তারপর সন্ধ্যের সময় আমি নিকটবর্তী স্টেশনের

কোন অফিসারের বাড়িতে ডিনার খেতে যাই অথবা সেই অফিসার আমার বাড়িতে আসে। আর আমোদ-প্রমোদের কথা যদি বল তাহলে বলব তার জন্য আছে আলজিয়ার্স। একদিন সেখানে অনেক ফূর্তি করেছি। আজকাল সেখানে আর যাই না। আজকাল এখানেই মাঝে মাঝে একজন স্থানীয় আরব আমাকে চুপি চুপি বলে কোন মেয়ের দরকার আছে কিনা। কখনো মন হলে আনতে বলি। তবে সাধারণতঃ এড়িয়ে চলি। কারণ তার ঝামেলা আছে। অনেকসময় মেয়ে নিয়ে অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়।

গত গ্রীষ্মকালে একদিন সন্ধ্যের সময় মাঠ থেকে এসে মহম্মদের খোঁজে তার তাঁবুর ভিতরে ঢুকে পড়ি হঠাৎ। ঢুকেই দেখি ছেঁড়া ময়লা কাপড় জড়ানো ফর্সা গোলগাল চেহারার একটি যুবতী মেয়ে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঘুমোচ্ছে। এখানকার মেয়েদের চেহারা অবশ্য খুবই ভাল। লম্বা, ফর্সা, সুন্দর চোখ মুখ। যাই হোক, তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। কিন্তু সেই ঘুমন্ত সুন্দরী যুবতীর কথা ভুললাম না। আমার স্বভাবের মধ্যে সহজাত যে নারীলিপ্সা একদিন ঘুমিয়েছিল ঐ ঘুমন্ত মেয়েটির দৃশ্য সে লিপ্সাটাকে জাগিয়ে তোলে। যদিও এই লিপ্সার আতিশয্যের ফলে আমাকে ফ্রান্স ছাড়তে হয় তথাপি এই নবজাগ্রত লিপ্সাটাকে দমন করতে পারলাম না কিছুতেই। সারাদিন ঘুমোতে পারলাম না। মহম্মদের তাঁবুর পানে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

পরদিন মহম্মদ আমার বাড়িতে এলে আমি তাকে বললাম, তুমি কি বিয়ে করেছ ?

সে বলল, না।

তখন আমি তাকে তার তাঁবুতে মেয়ে কোথা হতে এল তা জিজ্ঞাসা করলাম। মহম্মদ বলল, দক্ষিণ থেকে একটা খুব সুন্দরী মেয়ে এসে পড়েছে তার তাঁবুতে। আমি তখন তাকে বললাম, এবার এই ধরনের কোন মেয়ে এসে পড়লে আমার ঘরে তাকে যেন পাঠিয়ে দেয়।

যাই হোক, সেদিন সারাদিন ধরে মেয়েটার কথা মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসতে লাগল। খাওয়ার পর একবার তাঁবুটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলাম। রাত্রি নটার সময় বাড়ি ফিরে দোতলায় আমার ঘরে গিয়ে দেখি আমার টেবিলে একটা বাতি জ্বলছে আর তার সামনে একটি চেয়ারে পাথরে গড়া মূর্তির মত একটি মেয়ে বসে রয়েছে। তার হাতে পায়ে গলায় ও কোমরে রূপোর গয়না।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোথা হতে এসেছ ? কে তোমায় পাঠিয়েছে ?

সে বলল, মহম্মদ।

আমি বেশ বুঝলাম, এই সেই মহম্মদের তাঁবুতে ঘুমিয়ে থাকা সুন্দরী যুবতী। মহম্মদ তাকে তার প্রতি আমার আগ্রহ দেখে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার কাছে।

তাকে দেখে তার রূপলাবণ্যের প্রতি আমার লালসা জাগলেও তাকে নিয়ে কি করব তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাছাড়া সে কোথা হতে এসেছে, সে কোন জাতের মেয়ে, মহম্মদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি এসব জানা আমার দরকার। কিন্তু এত কথা এত প্রশ্ন করার পর সে যা উত্তর দিল তাতে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

অবশেষে আমি তাকে মহম্মদের তাঁবুতে ফিরে যেতে বললাম। কিন্তু সে তাতে হতাশ হয়ে দুহাত দিয়ে আমার গলাটাকে জড়িয়ে ধরল। তার মুখের উপর এক সকরুণ ভাব থাকলেও তার চোখের তারার মধ্যে জলজ্বল করছিল এক জলন্ত কামনা আর নারীসুলভ এক গোপন জিগীষা। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলাম। মুহূর্তের মধ্যে এক নীরব দৃষ্টিযুদ্ধ হলো আমাদের মধ্যে। এ যেন সেই নারী-পুরুষের শাশ্বত দৃষ্টিযুদ্ধ যা আদিমকাল হতে ঘটে আসছে এবং যাতে চিরকাল পুরুষরাই পরাজিত হয়।

আলুমা তার গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার হাত দিয়ে আমার ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে আমার মুখটাকে তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল। চাপ পড়ায় তার হাতের গয়নাগুলোতে শব্দ হতে লাগল। তার দেহে বন্যজন্তুর মত নিটোল স্বাস্থ্যশক্তি। তার চুম্বনে ভিন্ন দেশীয় অচেনা ফলের মত অনাস্বাদিতপূর্ব এক মধুর আস্বাদ। আলুমা আমার কাছে আমার বিছানাতেই শুল।

সকালের আলো ফুটে উঠলে ভাবলাম ওকে এবার যেতে বলব। বললাম, তুমি এবার যেতে পার আলুমা। কিন্তু ও বলল, আমার কোন থাকার জায়গা বা যাবার জায়গা কোথাও নেই।

আমি তখন ভাবলাম, মেয়েটাকে যখন আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন আমি ওকে বেসরকারী গৃহিণী বা রক্ষিতার মত রেখে দেব আমার এই বাড়িতে। কিন্তু তার সম্বন্ধে সবকিছু জানা দরকার। তাই তাকে বললাম, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে আশ্রয় দেব, কিন্তু কোথা হতে এসেছ তা তোমাকে বলতে হবে।

আমি জানতাম এ দেশীয় মেয়েরা বড় মিথ্যা কথা বলে। তারা তাদের স্বধর্ম সম্বন্ধে খুব বেশী মাত্রায় সচেতন এবং ভিন্ন জাতের ও ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার সময় তাদের ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে চায়।

আলুমা বলল, কোন আরবদেশীয় সুলতানের ঔরসে, কোন নিগ্রো ক্রীত-দাসীর গর্ভে তার জন্ম হয়। একথার সমর্থন একমাত্র পাওয়া যায় তার নীলচে চোখের তারায় আর ঠোঁটের রঙে। কিন্তু তার গায়ের রঙ ফর্সা, চোখদুটো টানা টানা। সে যা বলল তা হলো কাঠবিড়ালীর মত গাছের ডাল হতে ডালে তাঁবু হতে তাঁবুতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ানো বিচ্ছিন্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এক যাযাবর জীবনের কাহিনী। তার এলোমেলো শিশুসুলভ কথা থেকে আমি তার জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণা খাড়া করতে পারলাম না।

আলুমাকে কেন্দ্র করে একটা কথা না ভেবে পারলাম না। প্রকৃতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে কী এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়ে তুলেছে। আমরা বিজেতা ; আলুমারা বিজিত, আমাদের অধীনস্থ। তবু বিজেতাদের সকল অহঙ্কার আর সাবধানী দৃষ্টিতে ফাঁকি দিয়ে ওদের মিষ্টি মুখের হাসি আর আপাতশান্ত পরাভব স্বীকারের অন্তরালে এক রহস্যময় স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করে চলেছে ওরা। মনে হলো ওদের আত্মস্বাতন্ত্র্যের অপরাজেয় দুর্গটাকে ধ্বংস করে ওদের মনটাকে টেনে বার করে এসে তার সার্বিক বশ্যতা আদায় করার ক্ষমতা কোন বিজেতার নেই।

সকাল হলেও অলুমা তখনো আমার কাছে শুয়ে ছিল। মহম্মদ যথারীতি ঘরে ঢুকে আবার ঘর গোছাতে লাগল। আলুমা বলল, তার ক্ষিদে পেয়েছে। আমি মহম্মদকে আমাদের জন্য খাবার আনতে বললাম। আলুমার খাওয়া শেষ হলে আমি তাকে বললাম, তুমি আমার বাড়িতে থাকতে চাও ?

আলুমা আগ্রহভরে বলল, হ্যাঁ।

আমি তখন আমার বাড়ির দোতলাতেই তারজন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট করে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম। তার ফাইফরমাস খাটার জন্য একজন বৃদ্ধা আরব রমণীকে নিযুক্ত করলাম।

একটা মাস বেশ ভালভাবেই কাটল। আমি আলুমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। যখন যেখানে খুশি দিনের বেলায় বেড়াতে যেতে পারবে সে। আমি লক্ষ্য করলাম, সে মাঝে মাঝে বিকালের দিকে তাঁবুগুলোতে যেত। একদিন পাহাড় দিয়ে বিকালে বেড়াতে গিয়ে দেখি একটা ভাঙ্গা মসজিদে আলুমা একটা প্রাচীন কবরের সামনে প্রার্থনা করছে আর বিড় বিড় করে কি বকছে। সন্ধ্যের সময় সে আমার জন্য কেকজাতীয় কিছু খাবার নিয়ে এল। আমাকে নিজের হতে খাওয়াতে লাগল। আমি তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে সে সরে গেল। সে বলল, এটা তাদের রমজানের মাস। সারাদিন উপোস করে সময় খায় তারা। এ মাসে তাকে স্পর্শ করা যাবে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় আলুমাকে তার ঘরে পাওয়া গেল না। মহম্মদকে তার তাঁবু থেকে ডাকলাম। তার খোঁজ করতে বললাম। চারদিকে লোক পাঠালাম। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। মহম্মদ আলুমার ঘরে ঢুকে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র পরীক্ষা করে বলল, সে চলে গেছে। পালিয়ে গেছে।

আলুমাকে আমি ঠিক ভালবাসিনি। আমাদের মত শহুরে শিক্ষিত লোক আর আলুমাদের মত আদিম সরলতাসম্পন্ন অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে কোন হৃদ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। তাদের লোভনীয় দেহসম্ভারের মধ্যে যে মাদকতাশক্তি আছে সে শক্তি তাদের মনের মধ্যে নেই। তাদের আচরণ ও আবেগানুভূতি খুবই স্থূল। প্রেম বলতে যে সূক্ষ্ম মানসিকতা, যে ভাবসমুন্নতি বোঝায় তাদের দেহগত সান্নিধ্য ও আচার আচরণ তা জাগাতে পারে না আমাদের মধ্যে।

তবু আলুমার অভাব আমি অনুভব করছিলাম এবং আমার মন চাইছিল সে আমার বাড়িতে বাস করুক।

তিন সপ্তা পর একদিন হঠাৎ মহম্মদ এসে আমাকে খবর দিল আলুমা ফিরে এসেছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, কোথায়?

মহম্মদ জানালা দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে বলল, একটা গাছতলায় বসে আছে। আপনার ভয়ে এখানে আসতে পারছে না। আমি তার সঙ্গে আলুমার কাছে গিয়ে দেখি ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে সে জড়োসড়ো বসে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গিয়েছিলে?

সে কোন উত্তর দিল না। আমি বারবার তাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে আমতা আমতা করে বলল, আমি বাড়ির ভিতর একসঙ্গে বেশীদিন থাকতে পারিনি। তাই চেয়েছিলাম—

তার চোখে জল দেখে আমার দয়া হলো। আমি তাকে সঙ্গে করে আমার বাড়িতে দিয়ে এলাম। তারজন্য নির্দিষ্ট সেই ঘরে ঢুকে আলুমা খুশি হয়ে বলল, আবার ফিরে এসেছি। খুব ভাল লাগছে।

আমি বললাম, তোমার যখন কোথাও যাবার ইচ্ছা হবে আমাকে বলবে। আমি তোমাকে অনুমতি দেব।

আমার হাতটা টেনে নিয়ে কৃতজ্ঞতার বশে চুম্বন করল আলুমা। সে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, মাঝে মাঝে তার ঘর ছেড়ে তার যাযাবরী জীবনে ফিরে যাবার একটা অদম্য ইচ্ছা জাগে তারমধ্যে। ইচ্ছা হয় সে তাঁবুতে গিয়ে ঘুমোয়। মরুভূমির অনন্তপ্রসারিত বালির উপর ছোটাছুটি করে, গড়াগড়ি দেয়। বুঝলাম, মাঝে মাঝে বাধাবন্ধহীন প্রকৃতির সন্তান হয়ে উঠতে চায় আলুমা। দূর নৈশ আকাশের হলুদ নক্ষত্র আর তার চোখের নীল তারার মাঝখানে স্বচ্ছ বাতাস ছাড়া আর কোন ব্যবধান বা যবনিকার আচ্ছাদন থাক এটা সে চায় না।

আমি দেখলাম আলুমা তার ঘরে ঢুকে বড় আয়নাটার সামনে ছুটে গিয়ে বলল, একটু দাঁড়াও, পোশাকটা পরে নিই।

সিল্কের পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিফলিত মূর্তির সঙ্গে যেন অভিনয় করতে লাগল আলুমা। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

ছয় মাস ভালভাবেই কেটে গেল। তারপর একদিন দিনকতকের জন্য ছুটি চাইল আলুমা আমার কাছে। আমার পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত তাকে সানন্দে অনুমতি দিলাম, সে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল কোন অজানায়। ঠিক তিন সপ্তা পর সে আবার ফিরে এল। আমি তাকে আবার সানন্দে গ্রহণ করলাম। কোন ঈর্ষা জাগল না আমার মনে। জানতে ইচ্ছা করল না এতদিন কোথায় কার কাছে ছিল। কারণ যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে কখনো ঈর্ষা

জাগতে পারে না। আমি জানতাম এক অবাধ্য কুকুরকে মারা যা কোন কারণে আলুমাকে আঘাত করাও তাই।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আলুমা আমাকে না বলেই চলে গেল। মহম্মদ এসে আমাকে একদিন বলল, এবার আলুমা চিরদিনের মত চলে গেছে।

মহম্মদ বলল, আমাদের খামারবাড়ির নতুন রাখালটাকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

দিনকতক আগে তাকে ভেড়া ও গবাদি পশু চড়াবার কাজে নিযুক্ত করা হয়। আমি মনে করে দেখলাম লোকটা ছিল লম্বা হাড়শক্ত চেহারার এক বেদুইন। তার চোয়ালগুলো উঁচু উঁচু আর চোখগুলো শেয়ালের মত শয়তানিতে ভরা।

মঁসিয়ে অবেল একটু থেমে বললেন, কিসের সূক্ষ্ম প্রভাব নারীসত্তার গোপন গভীরে লুকিয়ে থেকে তাদের পলাতক মনোবৃত্তিটাকে তুলিয়ে দেয়, তাদের চটুল প্রেমানুভূতির রংটাকে মাঝে মাঝে বদলে দেয় তা কেউ জানে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আলুমা যদি ফিরে আসে আপনি তাকে গ্রহন করবেন ?

মঁসিয়ে অবেল বললেন, হ্যাঁ।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার রাখালকে ক্ষমা করবেন ?

মঁসিয়ে অবেল বললেন, হ্যাঁ। নারীদের ব্যাপারে মানুষকে চিরদিন ক্ষমা করে যেতেই হবে।

কুমারী লুসি রক

[Little Louise Roque]

এ অঞ্চলের ডাকপিওন মেন্দারির রম্পেলকে সবাই মেন্দারি বলেই ডাকে। ক্ল্য লে তর্স পোস্টাপিসে সে কাজ করে। কিন্তু চিঠি বিলি করতে তাকে বিন্দেল নদীর পার হয়ে কার্ভেলিন গাঁ থেকে শুরু করে অনেকগুলো গাঁ ঘুরতে হয়।

ছোট্ট ব্রিন্দেল নদীটা বড় শান্ত ; এঁকেবেঁকে একটা বনের ধার ঘেঁষে বয়ে গেছে। তার মাঝে মাঝে আছে কাঠের সাঁকো আর আছে গলার মালার মত বড় বড় পাথরের ঢিবি। অন্যদিনকার মত আজও সকালে নদী পার হয়ে কার্ভেলিন গাঁয়ে ঢুকল মেন্দারিক চিঠি বিলি করতে। মনে মনে মুখস্থের মত বলতে লাগল, এই গাঁয়ে প্রথম চিঠি বিলি করব পয়রণ পরিবারে। তারপর মেয়র রেনার্দেতকে। তার গায়ে আছে একটা লম্বা নীল ফ্রক। কোমরটা বেল্ট দিয়ে আঁটা। কাঁধে চামড়ার চিঠিভর্তি ব্যাগ।

গাঁয়ে ঢুকে প্রথমেই পড়ে মঁসিয়ে রেনার্দেতের বিরাট বাগান। মোটা

গুঁড়িওয়ালা অসংখ্য প্রকাণ্ড গাছেভরা মস্তবড় বাগানটা বাড়ি থেকে নদীর ধার পর্যন্ত চলে গেছে। বেলা এখন আটটা না বাজলেও রোদটা এরই মধ্যে গরম হয়ে উঠেছে। সেই গরম রোদেভরা মাঠ পার হয়ে এসে এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মেন্দারিক। সে তাই ছায়াভরা বাগানের মধ্যে ঢুকেই কপালের ঘাম মুছে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল। হঠাৎ সেই গাছের তলায় একটা ছোট ছুরি আর একটা স্থচ রাখার কৌটো দেখতে পেল। সে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ভাবল মেয়রের কাছে জমা রাখবে। কিন্তু তার মনে হলো আরো যেন কোথাও কিছু পড়ে আছে। এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে সে হঠাৎ দেখতে পেল অদূরে একটা গাছের তলায় বারো তের বছরের একটি মেয়ে চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মোটা দেহটা সম্পূর্ণ নগ্ন ; পায়ের কাছে কিছু রক্ত লেগে রয়েছে আর মুখটা রুমাল দিয়ে ঢাকা।

এক তীব্র কৌতূহলের বশে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে মেন্দারিক দেখল মেয়েটা মরে গেছে। এ অঞ্চলের সব ছেলেমেয়ের সে চিনলেও মেয়েটার মুখে রুমাল থাকায় চিনতে পারল না। হাত পাগুলো নেড়ে দেখল সেগুলো ভীষণ ঠাণ্ডা ; পাছে খুনের মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এজন্য বেশীক্ষণ মৃতদেহের কাছে না থেকে মেয়রকে খবর দেওয়ার জন্য সে ছুটতে লাগল।

মেয়র মঁসিয়ে রেনার্দেত তখন অফিসে আসেননি। ঘরের মধ্যে কাগজ পড়ছিলেন। চাকরকে দিয়ে খবর পাঠাত চাকর এসে মেন্দারিককে সঙ্গে করে নিয়ে গেল মেয়রের ঘরে। মেয়রকে খবরটা দিতেই মেয়র বললেন, তুমি যাও. যথারীতি কাজ করো। আমি চাকর পাঠিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিসের কর্তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পোশাক ও টুপী পরে বেরিয়ে পড়লেন মেয়র। অল্প দু-একজন চাকর নিয়ে ঘটনাস্থলে চলে গেলেন। চাকরকে দিয়ে মৃতদেহের মুখের উপর হতে রুমালটা তুলতেই সকলে দেখল লুসি রক। এ গাঁয়ের লা রক নামে এক বিধবার মেয়ে। মেয়েটার দেহে যৌবন না এলেও বাল্য থেকে কৈশোরে পা দেওয়ায় দেহটা অনেকখানি পরিণত হয়ে উঠেছিল।

সবাই ভাবল কোন ভবঘুরে বা দুষ্ট প্রকৃতির পথিক মেয়েটাকে বনের ভিতরে একা পেয়ে তার উপর পাশবিক অত্যাচার করে তাকে গলাটিপে হত্যা করে গেছে। তার ফলে তার জিবটা বেরিয়ে এসেছে এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে।

ডাক্তার ও ম্যাজিস্ট্রের আগে এল। তারপর পুলিস এল। ডাক্তার এসে মৃতদেহটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বলল, আর কোন উপায় নেই, সব শেষ। কোন ব্যক্তি মেয়েটির উপর পাশবিক অত্যাচার করার পর গলা টিপে হত্যা করে চলে গেছে।

মেয়র গম্ভীরভাবে বললেন, হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতেই হবে। এত

সাহস কার হলো ?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, মৃতের জামা বা পোশাকগুলো কোথায় গেল ?

মেয়র তাঁর একজনকে তার পোশাকের খোঁজ করতে বললেন। চাকর এদিক সেদিক খোঁজার পর এসে জবাব দিল, কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে ডাকপিওন মেদ্দারিক চিঠি বিলি করতে গিয়ে গাঁয়ের ঘরে ঘরে খবরটা দিয়ে দিয়েছে। খবরটা শুনেই সবাই বলাবলি করতে লাগল মেয়েটা লুসি রক, কারণ গতকাল রাত থেকে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। খবর শুনে ওর মা লা রক কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলো।

নগ্নদেহটার ওপর একটা লিনেনের কাপড় চাপা দিয়ে দিয়েছিলেন মেয়র। লুসির মা মধ্যবয়সী এক মহিলা এসে কাপড়টা তুলে তার মেয়ের বিকৃত মুখটা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল। মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল। কখনো হাত দিয়ে মাটিটাকে আঁচড়াতে লাগল। সহসা দেখা গেল গাঁয়ের লোকেরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে চারদিকে। ওরা কাছে এসে মৃতদেহকে দেখে চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল চারদিকে ভিড় করে। তখন মেয়র ওদের তাড়া করে সরিয়ে দিলেন।

মেয়রকে ওরা সবাই ভয় করত। পরে তিনজন পুলিস আসায় জনতা চলে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট মৃতদেহটি পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু লা রক পাগলের মত বলতে লাগল, আমি আমার মেয়েকে ছাড়ব না। ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই সারা জগতে। আমি বিধবা। আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর কত কষ্টে সৎ পথে থেকে ওকে মানুষ করেছি।

যাজক এসে লা রককে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। অবশেষে মেয়র তার কাছে গিয়ে বললেন, আমি কথা দিচ্ছি তোমার মেয়ের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করে তোমার হাতে তুলে দেব। কিন্তু এই লাস পুলিস না নিয়ে গেলে হত্যাকারী সম্বন্ধে কোন কিছুই জানা যাবে না। তাই তোমার মেয়েকে ছাড়তে হবে।

এই কথায় শান্ত হলো লা রক। যাজকের সঙ্গে চলে গেল ঘটনাস্থল থেকে। মেয়র, যাজক ডাক্তার, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস অফিসারকে তাঁর বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন।

খেতে খেতে হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনেক কথা হলো। খাবার পর যে যার কাজে চলে গেল। সেদিন আর বিকালে তাঁর বাগান দিয়ে বেড়াতে বার হলেন না মেয়র। সন্ধ্যার পর রাতের খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন। কিন্তু রাতে ঘুম হল না।

পরদিন সকালেই তাঁর বন্ধু ম্যাজিস্ট্রেট এসে হাজির। তাঁর ঘরে ঢুকে বললেন, তুমি এখনো ঘুমোচ্ছ ? খবর আছে।

ব্যস্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসলেন মেয়র। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, তোমার মনে আছে, লা রক তার মেয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তার টুপী বা কোন পোশাক চাই-

ছিল পাগলের মত। গতকাল রাতে কে তাকে তার ঘরে লুসি রকের ছুটো কাঠের জুতো ফেলে দিয়ে গেছে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে হত্যাকারী এ অঞ্চলের লোক। এখন এ অঞ্চলের দাগী কুখ্যাত লোকগুলোকে বাছাই করে দেখতে হবে। দরকার মনে করলে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে।

মেয়র তখন নিজের নাম থেকে শুরু করে প্রথমে গাঁয়ের বিশিষ্ট লোকেদের নাম করলেন। পরে প্রায় দু ঘণ্টা ধরে নীতির দিক থেকে ভাল মন্দ লোকদের নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। অবশেষে কেভাল, ক্লোভিস আর পেকার নামে তিনজন জেলে চাষী ও পশুপালকের নাম করা হলো।

এইভাবে সমস্ত গ্রীষ্মকালটা ধরে তদন্ত চলল। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের কোন কূল কিনারা পাওয়া গেল না। হত্যাকারীর কোন হদিশ পাওয়া গেল না। যাদের সন্দেহ করা হয়েছিল তারা তাদের নির্দোষিতার প্রমাণ দেওয়ায় ছাড়া পেল।

পুলিস কর্তৃপক্ষ তখন বিরক্ত হয়ে তদন্তকার্যে ইস্তাফা দিল। কিন্তু সমগ্র অঞ্চলে এই হত্যাকাণ্ডের পর থেকে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করতে লাগল। কেউ আর মেয়রের বাগান দিয়ে যেত না। আগে প্রতি রবিবার দুপুর বেলাটা গাঁয়ের বহু লোক ঐ বাগানে গিয়ে বসে থাকত ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করত গাছের তলায়। কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ডের পর থেকে বাগানটাকে পরিত্যাগ করেছে সবাই। একটা থমথমে ভীতিসিক্ত বিষাদ আগের থেকে অনেকখানি কালো করে তুলেছে যেন বাগানের ছায়াটাকে।

একমাত্র মেয়র নিজে আজও রোজ বিকালে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছড়ি হাতে বেড়াতে যান তাঁর সে বাগানে। গাছপালার তলায় একা একা সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান। কখনো ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধার দিয়ে চলে যান। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এলে বাড়ি ফিরে যান। সারা সন্ধ্যেটা ঘরের মধ্যে একা একা কাটান। আরপর কোনরকমে খাওয়াটা সেরেই শুয়ে পড়েন। কিন্তু ঘুমোতে পারেন না ঠিকমত।

অবশেষে গ্রীষ্ম গিয়ে শরৎ আসে। ঘন উইলো বনের পাশ দিয়ে বয়েযাওয়া শীর্ণ ব্রিন্দেল নদীটা সহসা যৌবনবতী নারীর মত হলদে জলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বনের মাথায় আবছা কুয়াশা নেমে এসেছে। বিকালের দিকে অসংখ্য কালো কালো দাঁড়কাক উড়ে বেড়ায় গাছগুলোর উপরে। কর্কশ চীৎকারে মুখরিত করে তোলে সারা বনভূমিটাকে।

হঠাৎ একদিন সকালে একটা খবর শুনে অবাক হয়ে গেল কার্ডেলিন গাঁয়ের সকলে। মেয়র নাকি তাঁর বাড়ির পিছনদিকের নদীর ধার বরাবর গোটা বাগানটাকে কেটে ফেলছেন। অনেক কাঠুরিয়া নিযুক্ত হয়েছে মোটা মোটা দাড়িওয়ালা আদ্যিকালের প্রকাণ্ড গাছগুলোকে কাটার জন্য। এ সিদ্ধান্ত মেয়র কেন নিয়েছের তা কেউ বুঝতে পারল না।

কুড়িজন কাঠুরিয়া নিযুক্ত হলো। একদিন সকাল থেকে শুরু হলো গাছ কাটা। যে গাছটা কাটা হয় তার উপরের ডালে একটা মোটা লম্বা দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর দুজন কাঠুরিয়া কুড়ুল দিয়ে সেই গাছের গোড়াটা কাটতে থাকে। অনেকটা কাটা হয়ে গেলে অনেকগুলো লোক একসঙ্গে একদিকে দাঁড়িয়ে সেই দড়ি ধরে টানতে থাকে। অবশেষে পতন ঘটে সেই বিরাট মহীরুহের। গাছ কাটার প্রতিটি খুঁটিনাটি কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সর্বক্ষণ লক্ষ্য করেন মেয়র। প্রতিটি গাছের ডালপালাগুলো আগে কেটে নেওয়া হয়; তখন শাখাপ্রশাখাহীন বিরাট অর্ধমৃত গাছগুলো এক একটা বিরাট দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে থাকে শেষ পতনের আশায়। এক একটা গাছ কাটা হয়ে যায় আর তার পরমুহূর্ত হতে আর একটা গাছের পতনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন মেয়র। যেন কোন এক বিরাট রহস্যের চূড়ান্ত উদ্‌ঘাটন নির্ভর করছে এই বন উৎসাদনের উপর।

একদিন একটি মজার ব্যাপার ঘটল। একটি গাছ যখন কাঠুরিয়াদের টানাটানিতে মড়মড় শব্দ করে পড়ে যাচ্ছিল তখন ইচ্ছে করে মেয়র যেন চাপা পড়ার জন্যই সেই গুঁড়ির দিকে ছুটে যান। কোনরকমে একটুর জন্য বেঁচে যান। কাঠুরিয়ারা ভয়ে চৎকার করে উঠে। পরে তাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন, কেমন যেন বেশ মজা লাগছিল। ছোট ছেলেরা যেমন অনেক সময় চলন্ত গাড়ি দেখেও রাস্তা পার হয়ে যায়, তেমনি মানুষও অনেক সময় অকারণে বিপদের ঝুঁকি নিতে যায়।

পড়ন্ত যে গাছটার তলায় ছুটে গিয়েছিলেন মেয়র সেটি ছিল সেই বিরাট বীচ গাছ তার তলায় লুসির মৃতদেহটা পাওয়া যায়।

সেদিন সন্ধ্যের সময় নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন মেয়র। দেখলেন মাত্র ছটা বাজে। রাতের খাওয়া খেতে এখনও অনেক সময় বাকি। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি। যতদূর সম্ভব গলাটা চেপে কাঁদতে কাঁদতে রিভলবারটা ড্রয়ার থেকে বার করে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলেন। আলো পড়ে চকচক করতে লাগল রিভলবারটা। হঠাৎ কি মনে হলো, মেয়র উঠে পড়ে রিভলবারটা হাতে তুলে তার নলটা নিজের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে তার ট্রিগারের উপর আঙুলটা চাপিয়ে রাখলেন। কিন্তু টিপতে পারলেন না শেষপর্যন্ত। অবশেষে রিভালবারটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। চাকর এসে দরজার বাইরে ডাকাডাকি করলে খেতে গেলেন নিচে।

খেয়ে এসে শত চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারলেন না। সারারাত প্রায় জেগে কাটালেন। ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা আসে। আবার জেগে ওঠেন। নানারকমের চিন্তা আসে।

পরদিন সারাদিন ঘরের মধ্যে কখনো, বসে কখনো পায়চারি করে কাটালেন। বিকালের দিকে একবার বেড়াতে গেলেন নদীর ধার দিয়ে। প্রায়ই তাঁর মনে হতে লাগল, কে যেন তাঁর পিছু পিছু আসছে। কার পথ চলার

নরম শব্দ হচ্ছে পিছনে। নদীর ধরে সেই জায়গাটার দিকে তাকালেন। সেই জায়গাটা যেখানে উইলো গাছের ডালগুলো নুয়ে পড়েছে জলের উপর। যেখানে তিনি একা একা স্নান করতে থাকা লুসির নগ্ন দেহটা দেখে প্রলুব্ধ হন এবং তাকে চেপে ধরেন আর সে প্রাণপণে চীৎকার করতে থাকলে তাকে টাকা দিয়ে বশীভূত করার চেষ্টা করেন। স্পষ্ট সব আছে রেনার্দেতের। কিন্তু তিনি ত মারতে চাননি লুসিকে। তাকে বারবার নিষেধ করেছিলেন চীৎকার করতে। কত লোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটা তা শোনেনি আর একটা ছোট্ট মেয়ে পাঁচজনকে বলে বেড়িয়ে তাঁর এতদিনের সুনাম মান সম্মান সব নষ্ট করে দেবে এটা কোনমতেই সহ্য করতে পারেননি রেনার্দেত।. তাই অগত্যা তাকে চুপ করবার জন্য তার গলাটা চেপে ধরেছিলেন। তার কণ্ঠ রোধ করার জন্য ধীরে ধীরে চাপটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে তার জিবটা বেরিয়ে এসে-ছিল। তার কণ্ঠটা নীরব হয়ে গিয়েছিল চিরদিনের মত। তার নিস্পন্দ দেহটা সেই গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেন, তার পোশাকগুলো জলে ফেলে দেন। ফলে শত তদন্ত করেও কোন কিনারা করতে পারেনি পুলিস।

অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভয় বাড়ছিল রেনার্দেতের। তিনি ধীর পায়ে বাড়ি ফিরে গেলেন কিন্তু ক্ষণিকের উন্মাদনার কেন একাজ তিনি করতে গেলেন? তার বয়স এখনও কম। তিনি ত বিয়ে করতে পারেন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছয় মাস পর্যন্ত দেহ ও মনের দিক থেকে এক পবিত্র নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে এসেছেন তিনি। কোন নারীকে স্পর্শ করেননি।

হঠাৎ মনে হলো রেনার্দেতের তাঁর ঘরের বাইরের দিকের জানালার পর্দাটা নড়ছে। কে যেন আসতে চাইছে। তিনি উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে অন্ধকারে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন। যেখানে লুসির মৃতদেহটা পড়েছিল সেই জায়গাটা দেখার চেষ্টা করলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না অন্ধকারে। তবু মনে হলো সেখানে যেন একটা ছোট্ট আলোকবিন্দু জ্বলছে। তারপর নিজের জায়গায় এসে বসতেই তাঁর মনে হলো লুসির নগ্ন মূর্তিটা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে এগিয়ে আসছে তার দিকে। রেনার্দেত ছোট ছেলের মত ছুটে বিছানার গিয়ে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে রইলেন। এইভাবে সকাল হয়ে গেল।

মুখ হাত ধুয়ে নিচে নেমে গেলেন। কিন্তু কিছুই খেতে পারলেন না। দিনের পর দিন অনিদ্রায় তাঁ শরীর খারাপ হয়ে গেছে। চোখের কোণে কালো দাগ পড়েছে।

আহারনিদ্রা জুটোই গেল রেনার্দেতের। সারাদিনের মধ্যে কোন কাজ নেই। তবু একবারও বিশ্রাম করতে পারেন না। সন্ধ্যে হতেই ভয় করতে লাগল তাঁর! মনে হলো আজ রাতেও যদি লুসি আসে। নগ্ন মূর্তিতে এসে যদি জড়িয়ে ধরে তাঁকে।

সন্ধ্যের কিছু আগে ছাদে উঠে গেলেন রেনার্দেত। হঠাৎ একটা পরিকল্পনা

এল তাঁর মাথায়। তিনি ঠিক করলেন আজ রাতে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চিঠি লিখবেন তিনি। তাতে সবকথা জানিয়ে অনুরোধ করবেন এসব কথা যেন কাউকে না বলেন। তারপর কাল সকালে এই ছাদের উপর উঠে এখান থেকে লাফিয়ে পড়বেন। আত্মহত্যার সহজ উপায় এর থেকে আর কিছু হতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর পর এতে কেউ কিছু মনে করবে না। তাঁর সুনামও নষ্ট হবে না।

এই বিরাট উঁচু বাড়িটার ছাদ থেকে এর অঞ্চলের বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। নদীএঁকে বেঁকে মাঠের ভিতর দিয়ে উইলো গাছের বনের পাশ কাটিয়ে বয়ে গেছে শান্তভাবে। মাঝে মাঝে ছোট বড় পাথর ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। কিন্তু কোন কিছু দেখতে ভাল লাগল না রেনার্দেতের।

সন্ধ্যের পর ঘরের ভিতর ঢুকে চিঠি লিখতে লসলেন রেনার্দেত। চিঠি লেখার কাজে মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ল নিবিড়ভাবে। ফলে আজ আর লুসির কোন প্রেতমূর্তি দেখতে পেলেন না। তার কোন কথাও মনে হলো না। ভোরে উঠে চিঠিটা তাঁর নিজের অফিস ঘরের চিঠির বাক্সতে ফেলে দিয়ে এলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধুকে লেখা একটি খাম। তাঁর নিজের হাতে লেখা ঠিকানা।

সেখান থেকে সোজা ছাদের উপর উঠে গেলেন রেনার্দেত। কিন্তু সকালের স্নিগ্ধ আলো-হাওয়ার স্পর্শে আবার বাঁচার আকাঙ্খা জাগল তাঁর মনে। মনে হলো কেন তিনি মরবেন। তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য প্রচুর শাস্তি ভোগ করেছেন সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে। আর না। এবার থেকে মনটাকে শক্ত করবেন। বিয়ে করবেন। আবার নতুন করে বাঁচবেন। ঘর সংসার করবেন।

হঠাৎ নজরে পড়ল ডাকপিওন মেন্দারিক আসছে। এখনি চিঠিগুলো নিয়ে যাবে ডাক ঝেড়ে। চিঠিটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চলে গেলেন তিনি সব জেনে যাবেন। তখন আর বেঁচে থাকার কোন অর্থ হবে না। তাই দ্রুত পায়ে নেমে অফিস ঘরে চলে গেলেন রেনার্দেত। গিয়ে দেখলেন মেন্দারিক বাক্স হতে চিঠিগুলো ঝারছে। রেনার্দেত তাকে হঠাৎ বললেন, আমার লেখা একটা চিঠি আমি ফেলেছি ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখা। চিঠিটা আমাকে ফেরৎ দাও মেন্দারিক।

মোন্দারিক প্রথম ফেরৎ দিতে যাচ্ছিল চিঠিটা বেছে নিয়ে। কিন্তু মেয়রের মুখ চোখের অবস্থা দেখে তার সন্দেহ হলো। ভাবল হয়ত কোন রাজনৈতিক চক্রান্তের কোন গোপন তথ্য আছে চিঠিতে। তাই সে বলল, এ চিঠি আর দেওয়া হবে না।

রেনার্দেত প্রথমে ভয় দেখিয়ে বলল, জান তোমার চাকরি আমি যেকোন সময়ে শেষ করে দিতে পারি?

কিন্তু মেন্দারিকের মাথায় জেদ চেপে গেল। সে বলল, আমার কর্তব্যকর্ম

আমাকে করতে হবে।

মেয়র তখন তার হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মেন্দারিক তার লাঠিটা উঁচিয়ে সাবধান করে দিল মেয়রকে, খবরদার।

মেন্দারিক ব্যাগের ভিতর চিঠিটা ভরে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। মেয়র তার পিছু পিছু এগিয়ে চললেন। অনুনয় বিনয় করে বললেন, আমি তোমাকে একশো ফ্রাঁ দেব।

তাতে মেন্দারিক রাজী না হওয়ায় বললেন একহাজার ফ্রাঁ দেব। দরকার হলে একলক্ষ দেব। আমাকে চিঠিটা ফেরৎ দাও মেন্দারিক।

কিন্তু পিছন ফিরে না তাকিয়ে ছুটতে লাগল মেন্দারিক। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে রেনার্দেত সেই ছাদের উপর উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কৌতূহলের বশে পিছন ফিরে দেখল মেন্দারিক, মেয়রের চিলেকোঠার ছাদ থেকে একটা লোক দুহাত বাড়িয়ে শূন্যে সাঁতার কাটতে কাটতে অবশেষে নদীর ধারে একটা পাথরের উপর গিয়ে পড়ল। ছুটে গিয়ে দেখল মেন্দারিক, মেযরের মাথাটা পাথরে লেগে থেঁতো হয়ে গেছে।

আমার বাড়িওয়ালা

[My landlady]

জর্জ কার্ভেলেন বলল, আমি তখন রু দ্য সাঁতে পেরের একটা ভাল বোর্ডিং হাউসে থাকতাম। আমার বাবা যখন ঠিক করলেন আমি প্যারিসে আইন পড়তে যাব তখন আমি সেখানে কোথায় থেকে পড়াশুনো করব তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয় আমার বাবা মার মধ্যে। আমার ভাতা ঠিক হয় বছরে আড়াই হাজার ফ্রাঁ করে। আমার মা বলেন আমি যদি কোন হোটেলে থেকে টাকাটা বাজে খরচ করে উড়িয়ে দিতে থাকি তাহলে খাওয়ার ব্যাপারে আমার টাকা কম পড়ে যাবে। ফলে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা কোন ভাল বোর্ডিং হাউস খুঁজতে লাগলেন।

অবশেষে আমার এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে সন্ধান পেয়ে বাবা মাদাম কার্গেরনাকে চিঠি লিখলেন। তাঁর জবাব পেয়ে তাঁর কথামত কোনএক সন্ধ্যায় তাঁর বেডিং হাউসে গিয়ে উঠলাম আমার মালপত্র নিয়ে।

বাড়িটা পাঁচতলা। মাদাম কার্গেরান আর তাঁর চাকর থাকত একতলায়। দোতলায় ছিল রান্নাঘর আর খাবারঘর। ব্রিতানি থেকে আসা চারজন ছাত্র থাকত তিন আর চারতলায়। আমি পেলাম পাঁচতলায় দুখানি ঘর। জাহাজের সুদক্ষ ক্যাপ্টেনের মত গোটা বাড়িটার একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত সমস্ত ঘরগুলো তদারক করে বেড়াতেন কার্গেরান। প্রতিটা ঘর দিনে

দশবার করে ঘুরে দেখতেন। মায়ের মত সকলের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখতেন। সকলেই ভয় করে চলত মাদাম কার্গেরানকে। কিন্তু এবিষয়ে আমিই হলাম একমাত্র ব্যতিক্রম।

তোমরা হয়ত জান ছোট থেকেই আমার একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল। আমি মাদাম কার্গেরানের মুখের সামনে বললাম তার একটা নির্দেশ মানতে আমি বাধ্য নই। তিনি নিয়ম করেছেন রোজ রাত্রি বারোটার মধ্যে বোর্ডিং-এর মধ্যে না ফিরলে তাকে বাইরে থাকতে হবে সেই রাতের মত। আমি বললাম, যদি কোন কারণে রাত বেশী হয়ে যায় কারো, আপনি আইনতঃ ঘর খুলে দিতে বাধ্য।

মাদাম কার্গেরান বললেন, তাহলে পুলিস ডাকব। তোমার কথার সাক্ষ্য রেখে দেব। তুমি ঘর খুঁজে নেবে। আমার এখানে জায়গা হবে না।

অবশেষে আমি জেদ ধরলে মাদাম আমার কথা মেনে নেন। তবে এই শর্তে যে আমি একথা আর কাউকে বলব না এবং এই ব্যতিক্রমটা শুধু আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সেই ঘটনার পর থেকে আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন মাদাম কার্গেরান। তাঁর বয়স তখন চল্লিশ। বয়স অনুপাতে দেহটা বেশী পুষ্ট ও বলিষ্ঠ। কিন্তু বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা দুজনে বন্ধু হয়ে উঠলাম। এক্এক্সময় আমি তাঁকে চুম্বন করতাম আর তিনি আমার কান মলে দিতেন।

একবার সেইসময় একটি তরুণী সঙ্গে আমার আলাপ হয়। পথেই আলাপ। ভালবাসাটা ক্রমশঃ বেশকিছুটা নিবিড় হয়ে উঠলে আমি তাকে একদিন রাতে আমার বোর্ডিংএর ঘরে আসতে বলি। মেয়েটি প্রথমে রাজী হতে পারেনি। পরে আমার পীড়াপীড়িতে রাজী হয়।

বেশী রাতে বোর্ডিংএ ঢোকার জন্য একটি বিশেষ দরজা ঠিক করা ছিল আমার জন্য। আমি সেইদিক নিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে ঢুকলাম। অন্ধকারে পা টিপে টিপে নিচশব্দে পাঁচতলায় উঠে গেলাম। আমার খুব ভয় করছিল। পাছে মাদাম কার্গেরান জানতে পারে এবং অন্যান্য ছাত্ররা জেনে ফেলে এজন্য প্রতি-মুহূর্তে একটা তীব্র উদ্বেগ অনুভব করছিলাম।

যাইহোক, আমরা নির্বিঘ্নে উপরে উঠে গেলাম। সমস্ত বাড়িটা যেন অন্ধকারে ঘুমোচ্ছে নিথর নিস্পন্দ অবস্থায়। আমরা ঘরে ঢুকে দরজাটা ঠেসিয়ে দিয়ে আলো জেলে স্পিরিট ল্যাম্পে চা করে দুজনে খেলাম। তারপর মেয়েটির গা হতে তার সব পোশাক একে একে খুলে ফেললাম। সে শুধু একটি পেটি-কোট পরে রইল। সে বিছানায় চলে গেলে আমি বিছানায় উঠব এমন সময় ভেজানো দরজা হঠাৎ ঝড়ের বেগে খুলে মাদাম কার্গেরান ঘরে ঢুকলো হাতে একটা বাতি নিয়ে। মাদাম কার্গেরানের পরনেও একটা পেটিকোট ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আমি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল মেয়েটি। মাদাম কার্গেরান চীৎকার করে বলল, আমার বাড়িটা বেশ্যা-খানা নয়। এইমুহূর্তে ওকে পোশাক পরিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে এস। কোন কথা শুনতে চাই না।

কথা না বাড়িয়ে তাই করলাম। পোশাক পরে চটিতে পাটা ঢুকিয়ে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল এম্মা। আমি তাকে ডাকলেও সে আর পিছন ফিরে তাকাল না।

আমি তাকে বাড়ির বাইরে দিয়ে ফিরে এলাম। মাদাম কার্গেরান তার ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমি বললাম, যৌবনে মানুষ এরকম করেই থাকে মাদাম। তোমার একটা বোঝা উচিত। রেগো না।

মাদাম কার্গেরান বললেন, কিন্তু মনে রাখবে আমার বোর্ডিংএর একটা সুনাম আছে। এখানে এসবকিছু হবে না।

সেই থেকে যতদিন সেখানে ছিলাম এই ধরনের কাজ আমি করিনি।

ঘণ্টা

[Bell]

সে জন্মদুঃখী হলেও একদিন তার এত কষ্ট ছিল না। তার মা বাবা, বাড়ির ঘর কোথায় তা সে কখনো জানে না। শুনেছে তাকে নাকি সদ্যজাত এক শিশুরূপে এক খালের ধারে এক যাজক কুড়িয়ে পান। তিনি মানুষ করেন। তারপর পনেরটা বছর তার একরকমভাবে কেটে যায়। তখন কোন না কোন একটা কাজ সে করত।

কিন্তু তার বয়স যখন মাত্র পনের তখন বড় রাস্তার উপর এক পথদুর্ঘটনায় গাড়ি চাপা পড়ে তার পা দুটো চলে যায়। তখন সে জীবিকা অর্জনের জন্য কোন কাজ আর করতে পারত না। তখন ভিক্ষা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রইল না।

তবে তখন ভিক্ষে করলেও সময়ে সময়ে ব্যারণপত্নী দাভেরি তাকে দয়া করে কিছু খেতে দিতেন। তাঁর খমারবাড়ির এখানে সেখানে শীতকালে শোবার জায়গা দিতেন। যেদিন কোন ভিক্ষা জুটত না, খাবার কোনকিছু পেত না সেদিন সে ব্যারণপত্নীর কাছে গেলেই তিনি কিছু না কিছু খেতে দিতেন। কিন্তু সেই দয়াবতী ব্যারণপত্নী আজ আর নেই।

আজ ও দুটো ক্রাচের উপর ভর দিয়ে চলে। এইভাবে চলে বগলের কাছে দুটো খাল হয়ে গেছে। হাত দুটো লম্বা হয়ে গেছে বেশী। এইভাবে

সারা গাঁটা ও রোজ ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় ভিক্ষার আশায়। ও এই কারভিল গাঁ ছেড়ে কোনদিন কোথাও যায় না। কারণ ও ভাল করে কথা বলতেও পারে না। পা দুটো যাবার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলার শক্তিও যেন চলে গেছে। কিন্তু দেহ থেকে সব কর্মক্ষমতা চলে গেলেও পেটে ক্ষুধা ঠিকই আছে। জঠরে তার অনির্বাণ এক ক্ষুধার আগুন জ্বলছে যেন দিনরাত। সে আগুন একবারও নেভে না। আর তার জ্বালায় সে শত কষ্ট সত্ত্বেও লোকের অপরিসীম অপমান সহ্য করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে গাঁয়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে দিগন্তজোড়া মাঠের ওপারে অন্য কোন গাঁয়ের পথে পা বাড়াবার ইচ্ছা হয়। . কিন্তু পারে না। কারণ সেখানে সত্যি সত্যিই কোন গাঁ আছে কি না জানে না ও।

ফলে আবার গাঁয়ের মাঝেই ফিরে আসে। মাঠের চাষীরা তাকে দেখেই রেগে যায়। ঠাট্টা করে তাকে বলে 'ঘণ্টা আসছে'। ঘণ্টার মতই ওর ক্রাচদুটো নিয়মিত গাঁয়ের পথে পথে শব্দ করে যায়। ওরা বলে, আর কোন গাঁ নেই? কোন বাড়িতে ভিক্ষে চাইতে গেলেই মেয়েরা বলে, রোজ রোজ তোকে ভিক্ষে দিতে হবে এমন কোন কথা আছে?

একটি গাঁয়ে এত লোক থাকা সত্ত্বেও সে যেন কাউকে চিনত না। কেউ তাকে চিনত না। গাঁয়ের কারো সঙ্গে কোন আন্তরিক সম্পর্ক ছিল না তার। সে যেন ছিল মানুষের মাঝে এক অবাঞ্ছিত জন্তু।

একবার পর পর দুদিন কোন ভিক্ষে পেল না ঘণ্টা। দুদিন সে কিছুই খেতে পেল না। সারা গাঁ বাড়ি বাড়ি ঘুরেও কিছুই যোগাড় করতে পারল না। যে বাড়িতে সে যায় সে বাড়ির মেয়ে পুরুষ সবাই এককথা বলে। বলে, রোজ রোজ এলে ভিক্ষে পাওয়া যায়? তোকে সারা বছর ধরে আমাদের খাওয়াতে হবে এমন কিছু কথা আছে?

তবু পেটের জ্বালায় সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে একটার পর একটা করে প্রতিটা বাড়ি ঘোরে। আশা করে যদি কিছু পেয়ে যায়।

তখন ডিসেম্বর মাস। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে সারা মাঠময়। তার উপর রোদ নেই। সারা আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ে। মাদাম আভেরি থাকতে থাকা-খাওয়ার কোন কষ্ট হত না। আজকাল তিনি না থাকায় রাত্রিটা অন্য কোন খামারবাড়িতে চোরের মত লুকিয়ে ঢুকে কোন আস্তাবলে খড়ের উপর শুয়ে থাকতে হয়। তা না হয় হল। কিন্তু আগে কিছু খাওয়া ত চাই! তারপর শোয়ার কথা।

বৃষ্টিতে পথের মাটি ভিজে যাওয়ায় ক্রাচদুটো মাটিতে বসে যাচ্ছিল। পথে যেতে কষ্ট হচ্ছিল ঘণ্টার। তারপর অসহ্য ক্ষুধায় একটা দুর্বলতা অনুভব করছিল সারা দেহে। গাঁয়ের সব বাড়ি ঘোরা হয়ে গেলে গাঁয়ের এক প্রান্তে মঁসিয়ে চিকেতের খামারবাড়ির ধারে গিয়ে ক্রাচদুটো পাশে ফেলে রেখে বসল ঘণ্টা।

ও জানে এখানে বসে থেকে কিছু হবে না। তবু ও ঠিক করল আর কোথাও যাবে না। ওর যাবার ক্ষমতা নেই। বাস্তব জগতে সব জায়গায় লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ হয়ে মানুষ এক এক সময় এমন করে মরিয়া হয়ে অলৌকিক ঐশ্বরিক সাহায্যের এক শূন্য প্রত্যাশায় নিজেকে সঁপে দিয়ে বসে থাকতে চায়। কোন দিকে কোন সাহায্য পাবার আশা থাকে না। তবু তার মনে হয় যদি অভাবনীয় কিছু একটা ঘটে যায় এবং কোন মানুষের মধ্য দিয়ে অযাচিতভাবে নেমে আসে ঈশ্বরের দয়া।

ঘণ্টা দেখল তার সামনে মাঠে একদল মুর্গীর ছানা খেলা করছে। মাটিতে খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হলো একটা মুরগীর ছানাকে মেরে ফেলতে পারলেই আগুনে কোনরকমে ঝলসে নিয়ে খেতে পারবে। এই মনে করে একটা ঢেলা দিয়ে একটা ছানাকে মেরে ফেলল ঘণ্টা। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে অন্য ছানাগুলো পালিয়ে গেল। মরা ছানাটা কুড়োতে যাবে এমন সময় একটা প্রবল ধাক্কা খেল সে। দেখল চিকেত স্বয়ং তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে।

তারপর মার। কিল, চড়, ঘুষি, লাথি। শুধু চিকেত নয়। তার খামারবাড়ির চাকর, গাঁয়ের বহু লোক এসে তাকে মারতে মারতে আধমরা করে দিল। চোরকে শাস্তি দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল সবাই ঘণ্টার আর বসে থাকার ক্ষমতা নেই। চিৎ হয়ে সে শুয়ে পড়ল। দুদিন জল পর্যন্ত পেটে পড়েনি। এমনিতেই উত্থানশক্তিরহিত। তার উপর এই মার।

এই মারের পরও পুলিসকে খবর দিয়েছিল চিকেত। তার খামারে ডাকাতি করতে এসেছিল ঘণ্টা পুলিস এসে শহরে নিয়ে গেল তাকে। থানায় নিয়ে গিয়ে আবার মারতে লাগল কিছু বলাতে না পারায়। ওরা বিশ্বাস করতে পারল না ঘণ্টা দু-তিন দিন কিছু না খেয়ে এবং প্রচুর আঘাত খেয়ে কোন কথা বলতে বা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা কোনকিছু বোঝাতে পারছে না। অবশেষে তাকে হাজতে দেওয়া হলো। কিন্তু সেখানেও কিছু তাকে খেতে দেওয়া হলো না।

পরদিন হাজত ঘর খুলে ঘণ্টার খোঁজ করতে গিয়ে পুলিস দেখল ঘণ্টা মরে পড়ে আছে। ঠাণ্ডা হিম আছে তার অসাড় দেহটা।

রাজার ছেলে

[A king's son]

বসন্তের কোনএক রংঝরা বিকেলে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। একটা সাদা মেঘের পাশ থেকে অস্তগতপ্রায় সূর্যের লাল আগুনের মত রোদ ঝরে পড়ছিল। সেই

আভায় হয়ে উঠেছিল আকাশটা।

পথে যেন জনতার স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। একটা কাফের পাশে দাঁড়িয়ে দুইজন সামরিক অফিসার গল্প করছিল নিজেদের মধ্যে। এই আফিসার দুজনের জমকালো পোশাক আর দেহসৌষ্ঠব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। সকলেই তাদের পানে তাকাচ্ছিল। এমন সময় কোথা থেকে লম্বা চওড়া একজন নিগ্রো পথ দিয়ে যেতে যেতে অফিসারদের দেখে ছুটে এসে চীৎকার করে ডাক দিল, সাহ্ব নমস্কার লেকটন্যান্ট।

অফিসার দুজনের মধ্যে একজন ছিল লেফটন্যান্ট আর একজন ছিল কর্ণেল। লেফটন্যান্ট বলল, আমরা তোমাকে চিনতে পারছি না।

নিগ্রো বলল, আমি কিন্তু তোমাকে বেশ চিনতে পারছি। মনে নেই, সেই বেজির অবরোধ, আমার আঙুর খাওয়া?

অবশেষে অফিসার বলে উঠল, ওঃ তুমি টিম্বাক্টো না?

এই বলে লেফটন্যান্ট তার হাতটা বাড়িয়ে দিতে টিম্বাক্টো হাতটা ধরে আফ্রিকার প্রথা অনুসারে চুম্বন করল।

অফিসার বলল, চল টিম্বাক্টো, এটা আফ্রিকা নয়। চল দোকানের ভেতরে গিয়ে বসা যাক। তারপর এখানে কেমন করে এলে?

টিম্বাক্টো বলল, এখানে আমি একটা রেস্তোরাঁ করেছি। অনেক টাকা পাচ্ছি। ভাল খাওয়া পাওয়া যায় সেখানে। প্রুশিয়ার লোকরা সেখানে খায়। একদিন স্বয়ং সম্রাটকে খাবার পরিবেশন করে ছিলাম। প্রচুর টাকা পেয়েছি।

টিম্বাক্টো আরও কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু লেফটন্যান্ট তার আগেই বলল, আজকের মত এই থাক টিম্বাক্টো। আবার আমাদের পরে দেখা হবে।

টিম্বাক্টো চলে গেলে কর্ণেল, এই অসভ্য লোকটা কে?

লেফটন্যান্ট বলল, শোন বলছি এর কথা।

১৮৭০ সালের যুদ্ধের কথা তোমার মনে আছে। আমার তখন বেজি শহরে আটকে পড়ি প্রুশীয়রা ঘিরে রাখে শহরটাকে। আমাদের রসদ ফুরিয়ে যায়। আমাদের উপর ওরা গুলি চালাল না। কিন্তু আমাদের রসদের কোন ব্যবস্থা করতে দিল না আমাদের। হাতে না মেরে এইভাবে আমাদের অনশনে শুকিয়ে মরার ফন্দী আঁটল ওরা।

আমি তখন লেফটন্যান্ট ছিলাম। আমার সৈন্যনিবাসে বিভিন্ন জাতের সৈন্য ছিল। একবার এগারো জন আফ্রিকান সৈন্য আমার সেনানিবাস থেকে কোথায় চলে যায়। একদিন তারা আবার ফিরে আসে। আমি দেখলাম তারা কোনদিন কোন নিয়ম শৃংখলার অধীন হয়ে থাকতে পারে না। তারা মদ খায়। কিন্তু তারা খুব সরল প্রকৃতির আর হাসিখুশি নিয়ে থাকত বলে তাদের আমি ক্ষমা করলাম। আমি আরো দেখলাল টিম্বাক্টো নামে একটা নিগ্রো হচ্ছে সেই দলের নেতা।

একদিন সকালে আমি দুর্গপ্রাকারের উপর দাঁড়িয়ে দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছি। এমন সময় আমার মনে হলো নিচে আঙুরক্ষেতে চোরের মত কারা সন্তর্পণে ঘোরাফেরা করছে। তারা গুপ্তচর ভেবে নিজে কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ধরতে গেলাম তাদের। তখন আঙুর পাকার সময়। পাকা আঙুরে ভরে আছে গাছগুলো। আমি গিয়ে দেখলাম টিম্বাক্টো হাতে পায়ে ভর দিয়ে চতুষ্পদ পশুর মত চলছে এবং আঙুর খাচ্ছে। তার মুখভর্তি আঙুর। অত্যধিক মদ খাওয়ার জন্য তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলেও সে দাঁড়াতে পারছিল না। সে খুব হাসতে লাগল। সে সবসময়েই হাসত এবং কোন সমস্যাকে সমস্যা বলে মনে করত না। সে নাকি কোন এক নিগ্রো রাজার ছেলে ছিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় দেখলাম টিম্বাক্টো তার দলের নয়জন অনুচর নিয়ে একটা কাঠের দোলার উপর আটটা প্রুশীয় শত্রুর রক্তমাখা কাটা মণ্ডু চাপিয়ে কোথা হতে নিয়ে আছে। পরে জানলাম পাশের গাঁয়ের পথে যেতে যেতে টিম্বাক্টোর দল হঠাৎ ছয়জন প্রুশীয় সামরিক অফিসার আর দুজন প্রহরীকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখতে পায়। প্রুশীয়রা না পালিয়ে একটি হোটেলে ঢুকলে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সকলকে হত্যা করে টিম্বাক্টোর দল। দেখলাম টিম্বাক্টো নিজেও আহত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হাসছিল।

মাঝে মাঝে শত্রুসৈন্যদের সুযোগ পেলেই হত্যা করত টিম্বাক্টো। কিন্তু সে কোন জাতীয় সম্মান বা সামরিক গৌরবের আশায় এ কাজ করত না। সে একাজ করত কিছু-না-কিছু লাভের আশায়। তার পা পর্যন্ত লম্বা একটা বিরাট ঢিলে জামা ছিল। তার পকেট দুটো বিরাট—পাছা থেকে পায়ের চেটো পর্যন্ত লম্বা। সেদিন সেই প্রুশীয় অফিসারদেরর মেরে তাদের পোশাক ও তকমায় যেসব সোনা তামা প্রভৃতি ধাতু পেয়েছিল সব পকেটে ভরেছিল। তাই দিয়ে সে মদ খেত। এইভাবে সে মদের খরচ জোটাত।

তবে তার মনটা বড় সরল ছিল এবং আমাকে খুব ভালবাসত। একদিন শীতের সময় আমরা কয়েকদিন যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমাদের রসদ ফুরিয়ে যায়। ক্ষুধা ও ক্লান্তির তীব্রতায় দারুণ কষ্ট হচ্ছিল আমার। এমন সময় টিম্বাক্টো আমার কাছে এসে বলল, তোমরা ক্ষুধার্ত। কিন্তু আমার কাছে খাবার আছে।

এই বলে সে আমায় মাংস এনে দিল। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলাম তখন ছাগল, ভেড়া, গরু বা ঘোড়ার মাংস যোগাড় করা কোনক্রমেই সম্ভব না। হঠাৎ আমার মনে হলো আফ্রিকার লোকেরা মানুষের মাংস খায় এবং যুদ্ধে চারিদিকে সৈন্য মরছে। মৃত সৈন্যের অভাব নেই। সেই কথা ভেবে তার দেওয়া কোন খাবার আমি খেলাম না।

একদিন রাতে বরফ পড়েছিল। ভীষণ ঠাণ্ডা। আমি তখন পাহারায় ছিলাম। শীতে কাঁপছিলাম আমি। হঠাৎ দেখলাম কোথা এসে টিম্বাক্টো

তার ভারী ওভারকোটটা চাপিয়ে দিয়েছে আমার উপর। আমি প্রতিবাদ করে কোটটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, তা হয় না। তুমি নাও। তোমারও প্রয়োজন আছে।

সে তখন একটা ছোরা বার করে কোটটাকে কেটে ফেলতে গেল। আমি তখন সেটা না নিয়ে পারলাম না।

দিনকতক পরে আমাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল। আমাদের দল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। যে যেখানে পারল পালাল। সারা শহরে আমাদের কোন লোক ছিল না। এমন সময় একদিন একটা দোকানে টিম্বাক্টোকে দেখলাম। দোকান মানে রেস্তোরাঁ। টিম্বাক্টো বলল, এই দোকানটা আমি করেছি। কারিগর রেখেছি। প্রুশীয়রা খায় এখানে। আমার কোন কষ্ট নেই।

দেখলাম দোকানের সামনে একটা প্লেটে লেখা রয়েছে। সম্রাটের নিকট অভূতপূর্ব খাদ্যপরিবেশনকারী মঁসিয়ে টিম্বাক্টোর দোকান। ন্যায্য মূল্য।

টিম্বাক্টো আমাদেরই শত্রুদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে তাদের মাঝে দোকান করেছে। এটা একধরনের বিশ্বাসঘাতকতা। মনে কষ্ট হচ্ছিল। তবু তার কথায় না হেসে পারলাম না এবং এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে সে আমাদের শত্রু প্রুশীয়দের যত কুখাদ্য ও বাজে জিনিস খাইয়ে তাদের উপর অদ্ভুতভাবে প্রতিশোধ নেবে।

সারমেয় পরিবৃত মানুষ

[The man with the dogs]

তার বাড়িতে তার স্ত্রী যখন তার সঙ্গে কথা বলত তখন তাকে বলত মঁসিয়ে বিস্তদ।' কিন্তু খিয়েবেশ শহরের বিশ মাইলের মধ্যে সবাই তাকে বলত কুকুরঘেরা মানুষ। কারণ সে সবসময় চার পাঁচটা ভয়ঙ্কর ধরনের কুকুর নিয়ে বেড়াত। বিস্তদকে মোটেই দেখতে পারত না এ অঞ্চলের মানুষ। তাকে সবাই ঘৃণা করত।

এর অবশ্য কারণও ছিল। এ শহরের বেশীরভাগ লোক হলো চোরাই চালানকারী। এই মফঃস্বল শহরে গাছপালা ঝোপঝাড় বেশী। আর দিনের বেলাতেও ছোট ছোট গলিপথগুলো অন্ধকার হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের পথে ঘাটে ঝোপেঝাড়ে প্রায়ই চোরাই মাল পাচার হয়। কেনাবেচা হয়। আর এ কাজের একমাত্র হাতিয়ার হলো একধরনের হিংস্র কুকুর। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোর গলায় বা পিঠে চোরাইমাল বেঁধে চালান করা হত এখানে সেখানে। কোন কাস্টম অফিসার তাদের ধরতে গেলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত

তাদের উপর, ঠিক যেমন করে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিকারের উপর।

চোরাইচালানকারী এই শিকারী হিংস্র ধরনের কুকুরগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যই বিস্তদকে নিযুক্ত করা হয়েছিল কাস্টম অফিস থেকে। এজন্য বিস্তদও পুষত কতকগুলো হিংস্র জাতের শিকারী কুকুর। সে তাদের এমনভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখত যাতে তারা চোরাইমাল চালানকারী কোন কুকুর দেখলেই তার উপর ঝাঁপ দিয়ে তার গলাটা কামড়ে দিতে পারে। এ কাজে বিস্তদ নাকি ছিল অদ্বিতীয়।

চোরাইচালানকারীরা সবাই তাই ছিল বিস্তদের শত্রু। কিন্তু তার কুকুরগুলোর জন্য কেউ কিছু করতে পারত না তার। আর বিস্তদ একা থাকত না কখনো। দুপাশে দুটো কুকুর অন্ততঃ দেহরক্ষী হিসাবে সবসময় থাকত তার সঙ্গে।

বিস্তদের চেহারাটা ছিল দেখতে খুবই খারাপ। তার চুলগুলো ছিল কিছু লাল কিছু হলদে। ভ্রূগুলো ঘন। একমুখ দাড়ি। চোখগুলো শয়তানের মত মিটমিটে। দেহটা রোগা রোগা এবং কেমন বিকৃত ধরনের। কিন্তু তার স্ত্রী ছিল সত্যিই সুন্দরী। তাদের ঘরের কাছে একটা দোকান ছিল। সেই দোকানে তার স্ত্রী বসত আর সে দোকানের একমাত্র খরিদ্দার ছিল যতসব কাস্টম অফিসার।

এ অঞ্চলের লোকেরা বলাবলি করত, বিস্তদ তার কুকুরগুলোর মত বউটাকেও অফিসারদের জন্য পোষে। সে তার বউকে বিকিয়ে দিয়েছে কাস্টম অফিসারদের কাছে। অফিসাররাও বুঝতে পারত না এমন সুন্দরী মেয়ে কি করে বিস্তদের মত কুৎসিত চেহারার লোককে নিয়ে ঘর করছে। বিস্তদের গায়ে সব সময় কুকুরের গন্ধ।

কিন্তু আসল রহস্যটা কেউ জানত না। এই রহস্যময় ব্যাপারটার কথা জানতে পেরে তারা বুঝল বিস্তদের স্ত্রী কেন এত বিশ্বস্ত। ঘটনাটা ঘটেছিল বছরকতক আগে। বিস্তদ একবার দেখেছিল কোনএক জায়গায় একটা যুবক তার বউকে চুম্বন করছে। সেখানে সে কিছু বলেনি। তারপর তার ঘরে তার স্ত্রীকে ডেকে দুটো শিকারী কুকুরের সামনে বলল, যদি এই কুকুরগুলোকে দিয়ে তোমার পেট থেকে নাড়ীভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে আনতে না চাও তাহলে আমার হুকুমমত হাঁটুগেড়ে বস।

তার স্ত্রী সেইভাবে বসলে বিস্তদ তার চাবুক দিয়ে নির্মমভাবে মারতে লাগল তার স্ত্রীকে। তার গায়ের পোশাক ভেদ করে তার গায়ের চামড়া কেটে গেল। রক্ত ঝরতে লাগল। অবশেষে যখন বিস্তদের হাত ব্যথা করতে লাগল তখন সে থামল। এত মার সত্ত্বেও একটুও চেঁচাতে দেয়নি বিস্তদ। সে একথা করে চাবুক মারছিল আর একবার করে বলছিল, টুঁ শব্দটি করবে না। কোন গোলমাল করবে না।

একথা তার স্ত্রী কাউকে কখনো বলেনি। সেই থেকে সে বিশুদের কুকুরদের মতই বিশ্বস্ত ছিল তার প্রতি। কিন্তু নীরবে সবকিছু হজম করলেও সে আঘাত ও অপমানের কথা ভুলতে পারেনি সে। শুধু সুযোগ খুঁজছিল তার স্বামীর উপর চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য।

অবশেষে সে সুযোগ পেয়ে গেল বিশুদের স্ত্রী। একজন সুদর্শন ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে ভাব হলো তার। এই ব্রিগেডিয়ারকে বিশুদ দিনকতক আগে চারটে কুকুর বিক্রি করে। এই ব্রিগেডিয়ার ছিল কাস্টম অফিসারদের একজন। একদিন সন্ধ্যার সময় দোকানে যখন একা ছিল তখন বিশুদের স্ত্রী তাকে সোজাসুজি বলল, যদি তুমি আমাকে চাও তাহলে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। আমার স্বামী আমার উপর দুর্ব্যবহার করে, তার প্রতিশোধ নিতে হবে।

এই বলে সে সবকথা খুলে বলে। অফিসার তার কথায় রাজী হয়ে সেই রাতেই চারটে বড় বড় শিকারী কুকুর নিয়ে বিশুদের বাড়ি গেল। বিশুদের স্ত্রী তার সঙ্গে ছিল।

অফিসার গিয়ে বিশুদকে বলল, তুমি আমাকে ঠকিয়ে বাজে কুকুর দিয়েছ।

বিশুদ বলল, তার মানে ?

অফিসার বলল, তার মানে এই যে এসব কুকুর চোরাইমাল চালানকারী কুকুরদের ঠিকমত কায়দা করতে পারবে না। আর তোমার 'বুড়ো' নামে ঘাতক কুকুরটার সঙ্গেও পেরে উঠবে না।

বিশুদের স্ত্রী চোখ টিপতেই অফিসার তার চারটে কুকুরকে লেলিয়ে দিল বিশুদের দেহরক্ষী ভয়ঙ্কর কুকুরটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিশুদকে মেঝের উপর একঝটকায় ফেলে দিয়ে চেপে ফেলল। কুকুরদের লড়াইয়ে বিশুদের কুকুরটা মরল আর অফিসারের দুটো কুকুর ঘায়েল হলো। বিশুদের সামনেই অফিসার তার স্ত্রীকে চুম্বন করল।

বিশুদ বলল, এর ফল তোমাদের ভোগ করতে হবে।

বিশুদের স্ত্রী অফিসারকে বলল, এতে হবে না। তুমি ওই ঘরে গিয়ে ওর পাঁচটা কুকুরকে গুলি করে মেরে এসো। তা না হলে ওইসব কুকুর দিয়ে আমাকে খাওয়াবে।

অফিসার গিয়ে পাঁচটা রিভলবারের গুলিতে পাঁচটা কুকুরকে মেরে ফেলল। কিন্তু এদিকে অফিসারের যে দুটো কুকুর বিশুদের কাছে ছিল তারা ততক্ষণে বিশুদকে চিনতে পারল। তারা এখন তাদের নতুন মনিবের বশীভূত হলেও বিশুদই তাদের লালনপালন করে একদিন। বিশুদ তাদের হুকুম করল তার স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। অফিসারের অনুপস্থিতিতে কুকুর দুটো বিশুদের স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা কেটে দিল।

অফিসার ফিরে এসে দেখে যার জন্য এত কাণ্ড তার সবকিছু শেষ হয়ে

গেছে। কুকুর দুটোকে নিয়ে বিষণ্ণ মনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অফিসার। বিস্তদ সেইভাবে বাঁধা রইল।

পরে দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। তবে বিচারে বিস্তদ বেকসুর খালাস পায় আর অফিসারের জেল হয়। সেই থেকে বিস্তদ চোরাই চালান-কারী কুকুরের কারবার করে। কাস্টম অফিসারদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছে সে।

এই ধরনের কাজে বিস্তদের আজও কোন জুড়ি নেই। বিস্তদ আজও মাঝে মাঝে বলে, পাপিষ্ঠা মেয়েদের কিভাবে শাস্তি দিতে হয় আমি তা জানি। আমার চোখের সামনে আমার সেই কুকুরদুটো যখন সেই বেশ্যা মাগীটার গলাটা কেটে তার মিথ্যাবাদী মুখটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছিল তখন তা দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

স্নায়বিক উত্তেজনা

[The Spasm]

এই স্বাস্থ্যনিবাসের হোটেলটায় রোজ সন্ধ্যের পর এখানকার বাসিন্দারা যখন রাতের খাওয়ার জন্য খাবার ঘরে ঢোকে তখন সকলে পরস্পরের পানে কৌতূহলভরে তাকায়। নতুন কেউ ঘরে ঢুকলেই তার পানে তাকায় আগ্রহ-ভরে। আগন্তুকদের মধ্যে কোন পরিচিত লোক বেরিয়ে পড়ে কিনা দেখে।

সেদিন সন্ধ্যার পর খাবার ঘরে খেতে গিয়ে দুজন আগন্তুককে ঘরে ঢুকতে দেখলাম। তারা হলো বাপ আর মেয়ে। দুজনেরই চেহারা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। বাপটির বয়স খুব বেশী নয়। কিন্তু বয়স অনুপাতে তিনি অত্যধিক বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁর মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে। তাঁর চেহারাটা খুব রোগা হওয়ার জন্য অস্বাভাবিক রকমের লম্বা দেখাচ্ছে। মেয়েটিও খুব রোগা এবং মাথায় একটু ছোট। তাকে দেখে এত দুর্বল দেখাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল সে নড়ে বসতে বা হাত পা নাড়তে পারছে না।

আর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম। ভদ্রলোক খাবার সময় যখনি হাত দিয়ে কোন পাত্র ছুঁতে যাচ্ছিলেন তখনি তার হাতটা কেঁপে উঠছিল এবং বস্তুটা স্পর্শ করার আগেই হাতটা এঁকেবেঁকে যাচ্ছিল।

খাওয়ার পর সন্ধ্যার সময় আমি অন্যদিনকার মত সেদিনও বেড়াতে বেরিয়ে ছিলাম একা একা। দুপাশে ছায়াঘেরা আমার পথটা গেছে একটা বিরাট পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সেই শিভেল গুহনের দিকে যেখানে আগ্নেয়গিরির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

আমি পথে পা বাড়াতেই দেখলাম সেই ভদ্রলোকও তাঁর মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আমি তাঁকে নমস্কার করতেই তিনি বললেন, ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে, এখানে একটু বেড়াবার জায়গা কোথায় আছে বলতে পারেন?

আমি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললাম কথা বলতে বলতে। স্বাস্থ্যনিবাসে যারা আসে তারা সবাই রোগী এবং আসে কোন না কোন রোগ সারাতে। ফলে এখানে খুব সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যায় বাসিন্দাদের মধ্যে। একটা সহানুভূতির সেতু রচিত হয় পরস্পরের মধ্যে।

ভদ্রলোক বললেন, আমার নিজের কোন রোগ নেই। আমার মেয়ের জন্যই আসা। কিন্তু তার রোগটা যে কি, তা কোন ডাক্তার ধরতে পারেনি। কেউ বলে তার হার্ট খারাপ, কেউ বলে এটা তার লিভারের রোগ। আবার কখনো বা কোন ডাক্তার বলে এটা তার মেরুদণ্ডের দোষ থেকে হচ্ছে।

আমি বললাম, আপনার মধ্যে মাঝে মাঝে যে স্নায়বিক উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায় সেটা কি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া?

তিনি উত্তর করলেন, না। একটা ঘটনার পর থেকে এর জন্ম। শুনলে আশ্চর্য হবেন, আমার মেয়েকে একবার জীবন্ত কবর দেওয়া হয়।

একথা শুনে বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না আমার। ভদ্রলোক তার কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

আমার জুলিয়েতের হার্টের রোগ ছিল। একদিন বাইরে গিয়ে সে পড়ে গিয়েছিল। তাকে যখন বাড়িতে আনা হল তখন তার হাত পা সব ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে। কোথাও কোন জীবনের উত্তাপ বা স্পন্দন নেই। ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করল। জুলিয়েত আমার একমাত্র সন্তান। সে ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি তার সমস্ত গয়না তার কফিনে দিয়ে দিলাম। বললাম, তার সব ধনেরও কবর দাও তার সঙ্গে। আমার পুরনো ভৃত্য প্রসপার আমাকে এ কাজে সাহায্য করল।

কবরখানা থেকে সোজা ঘরে ফিরে এলাম। অপরিসীম শোকে শুব্ধ ও অভিভূত হয়ে রইলাম আমি। রাতে ঘুম এল না চোখে। মাঝরাতে হঠাৎ সদর দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম আমি। এত রাতে কে এল। আমি বাতি হাতে নিচে নেমে গেলাম। চাকরেরা কেউ দরজা খোলেনি। আমি নিজের হাতে দরজা খুলে বললাম, কে?

অন্ধকারে প্রথমে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে গেলাম আমি। পরে দেখমাম সাদা একটা আবছা নারীমূর্তি :আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি বললাম, কে তুমি?

নারীমূর্তি বলল, আমি বাবা।

আমি তখন আমার কম্পিত হাতটা দিয়ে ভয়ে সেই নারীমূর্তিটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। আমি ভয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেলাম। সেই থেকে আমার

হাতটা কোন কিছুর দিকে বাড়িয়ে দিলেই কেঁপে ওঠে। আমার মেয়ে তখন বলল, ভয় করো না বাবা। আমি মরিনি। আমার কবর খুঁড়ে একটা চোর আমার গয়না চুরি করতে যায়। আমার আঙুল থেকে একটা দামী আংটি বার করার জন্য সে যখন আমার আঙুলটা কাটছিল তখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আর সেইসময় চোরটা পালিয়ে যায় কবরটা খুলে রেখে।

আমি তখন ভাল করে তার দিকে তাকালাম। তার আঙুলে সত্যিই রক্ত ঝরছিল। আমি তখন হাঁটু গেড়ে বসে আমার মেয়েকে জড়িয়ে ধরলাম। এমন ভয়ঙ্কর সৌভাগ্য কোন মানুষের জীবনে ঘটতে পারে তা আমার জানা ছিল না। আমি তাকে উপরে নিয়ে গেলাম। চাকরদের ডেকে আগুন জ্বালতে বললাম। তারা সবাই এ ঘটনায় অবাক হয়ে গেল। আমি বুঝলাম আমার পুরনো ভৃত্য প্রসপারই গয়না চুরি করতে গিয়েছিল। তবু আমি তাকে কিছু বললাম না। কারণ তার জন্যই আমি আমার হারানো মেয়েকে ফিরে পেয়েছি।

তাঁর সব কথা বলে থামলেন ভদ্রলোক। এদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছিল। আমি বললাম, চলুন, এবার হোটেলে ফেরা যাক।

ভয়ঙ্কর

[The horrible]

বাগানবাড়ির বসার ঘরটিতে তখন মেয়েরা বসেছিল। আর সেই ঘরের বাইরে বাগানে কতকগুলি চেয়ারে গোল হয়ে বসে পুরুষরা গল্প করছিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। ওরা একটা দুর্ঘটনার কথা বলছিল। এই বাগানটার সামনে দিয়ে যে একটা নদী বয়ে গেছে, গতকাল সেই নদীতে এক দুর্ঘটনায় দুজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা ডুবে গেছে। সবাই একবাক্যে বলতে লাগল, কী ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা!

কিন্তু পুরুষের মধ্যে একজন সামরিক অফিসার বলল, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু ভয়ঙ্কর নয়। কোন ঘটনা মানুষের মনে ভয় জাগালে অথবা তার অন্তরাত্মাকে দুঃখে অভিভূত করে তুললেই তা কিন্তু ভয়ঙ্কর হবে না। এই জন্য কোন যুদ্ধ বা মৃত্যু বা রক্তপাতের ঘটনামাত্রই ভয়ঙ্কর নয়। ভয়ঙ্কর হলো এমন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা যা অনভ্যস্ত ইন্দ্রিয়চেতনাকে অভিভূত করে তোলে। ভয়ঙ্কর ঘটনা কাকে বলে তা শোন।

আমি বলছি ১৮৭০ সালের যুদ্ধের কথা। প্রুশীয়দের কাছে হার মেনে

আমরা পশ্চাদপসরণ করছিলাম। আমাদের বিশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী অনাহার আর পরাজয়ের গ্লানিতে ছত্রভঙ্গ ও বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা তখন রুয়েন পার হয়ে হাভারের দিকে সেনাবাহিনীকে সুগঠিত করার জন্য যাচ্ছিলাম। প্রুশীয়রা আমাদের তখনো অনুসরণ করছিল। তখন শীত শুরু হয়েছে। নর্ম্যাণ্ডি অঞ্চলে শীত বড় ভয়ঙ্কর। গাছপালায় বরফ পড়তে শুরু করেছে। আমাদের দুদিন কিছু খাওয়া হয়নি।

ক্ষুধা, তীব্র শৈত্যপ্রবাহ ও তুষারপাত সহ্য করতে না পেরে কিছু সৈন্য পথেই মারা গেল। বাকিরা এগিয়ে চলল। আমি তখন একটি সৈন্যদলের পরিচালক ছিলাম। কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে। দিনেরাতে সমানে এগিয়ে চলেছিলাম আমরা।

একদিন দেখলাম দাড়িগোঁফ কামানো একটি বুড়ো সৈনিককে ঘিরে আমাদের একদল সৈন্য জটলা করছে। তারা তাকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করছে। কথাটা প্রচারিত হতেই আমার বিনা অনুমতিতেই সৈন্যরা তাকে গুলি করে মেরে ফেলল। যেসব সৈন্যরা ক্ষুধা ও দুর্বলতায় দাঁড়াতে পারছিল না তারা সহসা ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠে জিঘাংসা প্রবৃত্তিতে উন্মত্ত হয়ে উঠল। পরে সৈন্যরা শান্ত হলে আমার দুজন রক্ষীর সাহায্যে মৃত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে দেখলাম সে সৈনিকবেশী এক বৃদ্ধা নারী, তার কোন সন্তানের খোঁজে এসেছিল। তার অসহায় মৃতদেহের পানে তাকিয়ে তার মাতৃহৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা ও বেদনার কথা শুনে চোখে জল এল আমার।

তার কিছু পরেই 'প্রুশীয়' 'প্রুশীয়' বলে চীৎকার করে উঠল সৈন্যরা। দিগন্তে কোথায় কি দেখেছে তারা। সবাই ছোটাছুটি করতে লাগল ইতস্ততঃ।

বহুদলে বিভক্ত সৈন্যরা যে যেদিকে পারল পালাল। যারা কোনরকমে টিকে রইল তাদের মধ্যে দেখা দিল দারুণ খাদ্যাভাব। নতুন করে খাদ্য ও সৈন্য সরবরাহ আমাদের কাছে পৌছতে আরো কয়েকদিন সময় লাগবে।

অবশিষ্ট সৈন্যরা যখন দেখল এবার ক্ষুধার জ্বালায় তাদের পরস্পরের মাংস ভক্ষণ করতে হবে তখন তারা সকলে মিলে একটা নিয়ম খাড়া করল। সকলেই একসঙ্গে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কেউ কারো বন্দুকের গুলির সীমানার মধ্যে আসবে না। সকলেই সাবধানে দূরে দূরে পথ চলতে লাগল। কেউ যেন হঠাৎ গুলি করে অন্য কাউকে মেরে ফেলতে না পারে।

এমনি করে সারাদিন ধরে তারা পথ চলত। দিনের শেষে কোন নদী বা ঝর্ণার ধারে এসে তারা একজন একজন করে জল খেয়ে আসত। তারপর আবার পরস্পরের মধ্যে সমান দূরত্ব বজায় রেখে আবার পথ চলতে শুরু করত সেই বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে।

একদিন সকালে দেখলাম ভয়ঙ্কর এক ঘটনা যার থেকে ভয়ঙ্কর আর কিছু

হতে পারে না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ একটি সৈন্য নিয়ম ভঙ্গ করে অন্য একটি সৈন্যের কাছে এগিয়ে যেতে লাগল। তা দেখে সৈন্যটি পালিয়ে না গিয়ে শুয়ে পড়ে তার দিকে এগিয়ে আসা সৈন্যটিকে লক্ষ্য করে গুলি করল। কিন্তু গুলিটি তার গায়ে লাগল না। তখন সে শুয়ে থাকা সৈন্যটিকে গুলি করে হত্যা করল। তখন চারদিক হতে সৈন্যরা ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরল। হত্যাকারী সৈন্যটি তখন মৃত সৈনিকটির দেহটাকে কেটে খণ্ড বিখণ্ড করে সকলকে ভাগ করে দিল। আবার তারা আগেকার মত সমান দূরত্ব বজায় রেখে পথ চলতে লাগল। আবার এই ধরনের কোন হত্যাকাণ্ড ঘটলে তারা সবাই এক জায়গায় জড়ো হবে।

এইভাবে দুদিন তারা মানুষের মাংস অর্থাৎ আপন সহকর্মীর মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে। দুদিন পর আবার সেই জ্বালাময়ী ক্ষুধা অসহ্য হয়ে উঠল তাদের মধ্যে। তখন যে সৈন্যটি প্রথম একজনকে খাবার জন্য হত্যা করে, সে আবার একজনকে হত্যা করল। সেইভাবে তার মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে সকলকে বিলিয়ে দিল। তারপর পথ চলতে লাগল সেই মানুষখেকোর দল। অবশেষে খাদ্য সরবরাহ এসে পৌছল।

এবার আশা করি বুঝতে পারছ ভয়ঙ্কর ঘটনা বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি?

প্রথম তুষারপাত

[The first snowfall]

লা ক্রয়সেত নদীটা এঁকেবেঁকে দূর দিগন্তে নীল সমুদ্রের মাঝে গিয়ে মিশে গেছে। সেইখানে সেই মোহনার কাছে অভ্রভেদী শৃঙ্গের মুকুট মাথায় পরে দিগন্তটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে এস্তেরেল পাহাড়।

বাঁদিকে এক উপসাগরের মাঝে সেণ্ট মার্গারাইত ও সেণ্ট অনোরাত দ্বীপ। চারদিকে তার ফার গাছের বন। বাঁদিকে সেই উপসাগর আর ডানদিকে লম্বা পাহাড়টাকে ফেলে রেখে সূর্যের আলোয় যেন ঘুমোচ্ছিল সাদা রঙের বাড়িটা। শুধু একটা না, এখানে পাহাড়টার পা থেকে শুরু করে তার সারা গায়ে অনেক বাড়ি গড়ে উঠেছে। দক্ষিণের এই অঞ্চলটায় শীত-কালেও শীতের তীব্রতা তত অনুভূত হয় না। এসময় এখানকার প্রতিটি বাড়িতে, বাগানে গাছে গাছে সোনারবরণ কমলালেবু দোল খায়।

লা ক্রয়সেত নদীর ধারে এবং সমুদ্রের কাছে অবস্থিত ছোট্ট একটি বাড়ি থেকে এক যুবতী মহিলা বেরিয়ে এসে বাগানে একটা বেঞ্চের উপর বসল। তার মুখ মৃতপ্রায় কোন মানুষের মতই ম্লান। তার মুখের হাসিটা বড়ই করুণ। সে

কয়েক পা এসেই হাঁপিয়ে উঠেছে। সে খুব কাশছে এবং কাশিটা থামাবার এক বৃথা চেষ্টাস্বরূপ সে মুখের উপর একটি হাত চাপা দিল। সে জানে আর বেশীদিন সে বাঁচবে না। মৃত্যু তার অবধারিত। তবু সে একবার সমুদ্র আর একবার এস্তেরেল পাহাড়টার পানে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, আমি কত সুখী! কী আনন্দ!

সে ভাবল লা ক্রয়সেত নদীর মত জীবনের স্রোত আগের মত ঠিক বয়ে যাবে। শুধু সেই অকালে চলে যাবে পৃথিবী থেকে। তবু প্রাণভরে একবার এই বাগানের নির্মল বাতাস থেকে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে তার ক্ষয়রোগগ্রস্ত ফুসফুসটাকে পরিপূর্ণ করে তুলল। তারপর সে সেইখানে বসে বসেই দিবা-স্বপ্নে ঢলে পড়ল। অতীতের কথা ভাবতে লাগল।

আজ হতে চার বছর আগে কোন এক নর্ম্যান ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বেশ সরল সুগঠিত চেহারা। মুখে অল্প দাড়ি আছে। সব সময় হাসিখুশি নিয়ে থাকে। কিন্তু তার মনটা বড় সংকীর্ণ। অথচ সে নিজে শহরের মেয়ে এবং শহরের আদবকায়দা ও জীবনযাত্রা প্রণালীতে সে অভ্যস্ত। তার মনে কোন সংকীর্ণতা বা অহেতুক কৃপণতা নেই। তবু সে কেন যে এ বিয়েতে মত দিল তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি। হয়ত পিতামাতাকে খুশি করতে চেয়েছিল সে। তাঁদের কথার অবাধ্য হতে চায়নি।

যাইহোক, বিয়ের পর তার স্বামী তাদের গাঁয়ের বাড়িতে তাকে নিয়ে আসে। চাষের কাজ তদারকের জন্য বারো মাস সে সেইখানেই থাকে। নর্ম্যাণ যুগের পাথরের দেওয়ালওয়ালা বড় বড় পুরনো গাছে ঘেরা এক বিরাট বাড়ি। বাড়িটার সামনেটা একরাশ ফার গাছ জুড়ে রেখেছে। বাড়িটার ডান দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ খামারবাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটায় প্রথম পা দিয়েই কি ভেবে সে বলেছিল তার স্বামীকে, জায়গাটা ভাল মনে হচ্ছে না।

তার স্বামী হেসে উত্তর করেছিল, থাকতে থাকতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাড়িতে কিছু ঝি চাকর ছাড়া কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন নেই। সারাদিন সময় কাটতে চায় না। রাত্রি এলে আরো খারাপ লাগে। তার স্বামী সারাদিন মাঠে কাজকর্ম নিয়ে কাটায়। সন্ধ্যের সময় ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে। সারারাত গভীরভাবে ঘুমোয়। তার মুখে হাসি লেগেই আছে। সে চমৎকারভাবে নির্জন গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত।

বসন্ত ও গ্রীষ্মটা একরকম বেশ কাটল তার। সেও এক একদিন তার স্বামীর সঙ্গে মাঠে যেত। নির্মল বাতাস উপভোগ করতে করতে ফাঁকা মাঠে ঘুরে বেড়াত। তারপর শরৎকাল এল। তার স্বামী এইসময় রোজ তার কুকুর দুটো নিয়ে শিকারে চলে যেত। সন্ধ্যের সময় শিকারের গল্প করত তার কাছে। সে গল্প তার ভাল লাগত না। তবে মেডার আর মির্জা নামে

কুকুর ছুটোকে তার ভাল লাগত। তারা শিকার থেকে ফিরে এলে তাদের যত্ন করত মাতৃস্নেহে।

সবচেয়ে তার মুস্কিল দেখা দিল শীতকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে। এ অঞ্চলের শীত বড় তীব্র। বিকালটা কাক দেখে কাটাত সে। বিকাল চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে অসংখ্য কাক এসে তার বাড়ির বাঁদিকে আর কার গাছে ভিড় জমাত। কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করত। সন্ধ্যে হলে নিজের ঘরে চলে যেত সে। সে আলাদা ঘরে শুত। কিন্তু সারারাত শীত ভাঙত না। ডিসেম্বর মাসে শীত আরো তীব্র হয়ে উঠল। একদিন সে তার স্বামীকে বলল, রাত্রিতে শীতে বড় কষ্ট হয়। বাড়িতে হট এয়ার প্ল্যাণ্টের ব্যবস্থা করো। এখনো আসল শীত বাকি আছে।

তার স্বামী একথা শুনে হাসতে লাগল। বলল, ঠাট্টা করছ? এরপর বলবে কুকুরগুলোকে খাওয়াবার জন্য রূপোর থালা দরকার! আমরা শহুরে লোক নই। ওসব পাব কোথায়?

সেবার জানুয়ারী মাসে তাকে প্যারিসে চলে যেতে হলো ঘটনাক্রমে। কারণ এক দুর্ঘটনায় তার বাবা মা একসঙ্গে মারা যান। তাই প্যারিসে গিয়ে মাসকতক থাকতে হয় তাকে। তারপর আবার তাকে ফিরে আসতে হলো নর্ম্যাণ্ডির সেই গাঁয়ে। আবার সেই ভয়ঙ্কর শীত এল। সন্ধ্যের পর নিজের ঘরে জ্বলন্ত আগুনের সামনে যখন হাত ছুটো বাড়িয়ে আগুন পোহাত সে তখন মনে হত তার পিঠের হাড়ের ভিতর শীতের কনকনে হাওয়া ঢুকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে তাকে। রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে শত শীতবস্ত্র সত্ত্বেও শীত যেত না। শীতের তীব্রতার জন্য ঠিকমত ঘুম হত না। একদিন সে তার স্বামীকে বলল, চল, এক সপ্তা প্যারিসে বেড়িয়ে আসি।

তার স্বামী সেকথায় আশ্চর্য হয়ে বলল, প্যারিসে? সেখানে গিয়ে কি করব?

আশ্চর্য মানুষ তার স্বামী। জীবনে কোন পরিবর্তন চায় না। সে সবসময় সুখী। একদিন সে তার স্বামীকে বলল, আমার এখানে ভাল লাগছে না। আমার সর্দি করেছে!'

তার স্বামী বলল, এখানে আসার পর তোমার মাত্র একবার সর্দি করেছে।

রাত্রিতে শুয়ে যখন শীতে ঘুম আসছিল না তার তখন হঠাৎ তার স্বামীর সেই কথাটা মনে পড়ে গেল, তোমার মাত্র একবার সর্দি করেছে। তখন সে ভাবল সে ইচ্ছে করে ঠাণ্ডা লাগিয়ে সর্দি ও কাশি ধরাবে। তার অসুখ দেখে তার স্বামী হট এয়ার প্ল্যাণ্টের ব্যবস্থা করবে। বিছানা ছেড়ে ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারে সে বাগানে চলে গেল। তখন বরফ পড়ছে চারদিকে। সে খালি পায়ে বরফঢাকা মাটিতে হাঁটল। তারপর আবার ঘরে ফিরে এল। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন দারুণ জ্বর ও সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হলো সে। ডাক্তার এল। ডাক্তার এসে স্থান পরিবর্তনের কথা বলল। হট এয়ার প্ল্যাণ্টের কথা বলল। ডাক্তার বলল, রোগী এখানে থাকলে পরের বছর শীত আর তাকে দেখতে হবে না। তাই তার স্বামী হেনরী তাকে দক্ষিণাঞ্চলের এই সমুদ্রতীরবর্তী বাড়িটায় স্থান পরিবর্তনের জন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু সেই সর্দি কাশি আজও সারেনি তার।

হঠাৎ স্বামীর একটা চিঠি পেল সে। তার স্বামী লিখেছে—প্রিয়তমা, আশা করি তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ। এখানে কয়েকদিন আগে তুষারঝড় বইতে থাকে। তার ফলে এরপর বরফ পরবে। আমার অবশ্য কোন কষ্ট হয় না তাতে। বরং ভালই লাগে। তবে তোমাকে আর দুঃখ করতে হবে না। আমি বাড়িতে এবার হট এয়ার প্ল্যাণ্ট বসাচ্ছি।

আরো কি সব লেখা ছিল চিঠিতে। কিন্তু আর পড়ল না সে। এই খবরটায় মনে তার বড় আনন্দ হলো। কিন্তু এমন সময় তার কাশি এল। যে দুষ্ট কাশি তার বুকের ভিতরটা একটা অবাধ্য জন্তুর মত ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে সেই কাশিটা চাপা দেবার জন্য এক হাত মুখের উপর চেপে রাখল সে।

সব শেষ

[All over]

তাঁর সাজপোশাক শেষ করে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিফলনটার পানে তাকিয়ে হাসল কাউণ্ট লর্মেরিন। অস্ফুট স্বরে আপন মনে বলল, লর্মেরিন তাহলে এখনো বেঁচে আছে।

মাথার চুলে সামান্য পাক ধরলেও লর্মেরিনের চেহারাটা এখনো সুন্দর আছে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, মুখে অল্প মোচ।

প্রসাধনকক্ষ হতে বেরিয়ে সে সোজা চলে গেল বসার ঘরে। সেখানে অনেক চিঠি ও কাগজপত্র অপেক্ষা করছিল তার জন্য। টেবিলের উপর তিনটে খবরের কাগজের সঙ্গে প্রায় এক ডজন চিঠি পড়েছিল। রোজ এই চিঠিগুলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয় এগুলো ভগবানের কী অদ্ভুত সৃষ্টি। একই সঙ্গে চিঠিগুলোর বহিরঙ্গ এক অস্পষ্ট ভয়, উদ্বেগ এবং এক সানন্দ প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে মানুষের মনে। এগুলোর ভিতর আসলে তখন কি কথা লেখা থাকে তা বোঝা যায় না।

কোন বিশেষ চিঠি খোলার আগে লর্মেরিন আগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নেয় চিঠির উপর লেখা ঠিকানাগুলো। কোনটা কার হাতের লেখা তা দেখে বুঝতে পারে। একটু দেখেই সে বলে দিতে পারে কার হাতের লেখার ধরন

কেমন। অবশেষে একটি খামের চিঠি তুলে নিল লর্মেরিন। খামটা দেখে মনে হলো এই হাতের লেখাটা তার চেনা। কিন্তু অনেকদিন আগের দেখা। বহুদিন এই হাতের লেখা চিঠি ও প্রায়ই পেয়েছে। লর্মেরিনের মনে হলো কেউ হয়ত টাকা ভিক্ষে চেয়েছে তাঁর কাছে। যাইহোক, খামটা খুলে পড়তে লাগল।

প্রিয় বন্ধু, তুমি হয়ত আমায় নিঃসন্দেহে ভুলে গেছ। কারণ আজ হতে পঁচিশ বছর আগে আমাদের দুজনের মধ্যে শেষ দেখা হয়। আমি তখন যুবতী ছিলাম, এখন বৃদ্ধা। আজ হতে পঁচিশ বছর আগে তোমার কাছ থেকে শেষবারের মত বিদায় নিয়ে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর দেশে চলে গিয়েছিলাম। আমার সেই বৃদ্ধ স্বামী যাকে তুমি 'আমার হাসপাতাল' বলে ঠাট্টা করতে। তাঁকে তোমার আজও মনে আছে কি না জানি না। আজ হতে পাঁচ বছর আগে তিনি মারা যান। এখন আমি এই দেশের বাড়ি থেকে প্যারিসে যাচ্ছি আমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে। আমার একটি মেয়ে আছে। সে সুন্দরী, তার বয়স এখন আঠারো। সে যখন পৃথিবীতে আসে তখন সেকথা তোমায় জানিয়েছিলাম। কিন্তু এরকম একটা তুচ্ছ ঘটনায় তুমি কোন মনোযোগ দাওনি।

তুমি হচ্ছ চিরসুন্দর লর্মেরিন। তোমার সেই লিসে বা তুমি যাকে লিসঁ বলে ডাকতে তাকে আজও মনে আছে কি? যদি থাকে তাহলে আজ সন্ধ্যায় তার কাছে এসে একসঙ্গে খাবে। আজ সে বয়োপ্রবীণা ব্যারণী দ্য ভাঁসে। তোমার একজন অতি বিশ্বস্ত বান্ধবী হিসাবে আজ সে তার অনুরক্ত হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তোমার প্রতি যে হাত শুধু তুমি বন্ধুভাবে জড়িয়ে ধরতে পার, কিন্তু চুম্বন করতে পার না। হে আমার প্রিয় জ্যাকলেত। লিসে দ্য ভাঁসে।

চিঠিখানা পড়ে লর্মেরিনের বুকের ভিতরটা লাফাতে লাগল। তার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে উঠল। সে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়ল। চিঠিটা পড়ে রইল তার কোলের উপর। চোখের কোণে জল দেখা দিল। জীবনে যদি কোন মেয়েকে সত্যি সত্যিই একদিন ভালবেসে থাকে তাহলে সে হচ্ছে লিসে দ্য ভাঁসে।' কোন এক বাতরোগগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্যারণের ছিপছিপে চেহারার সুন্দরী স্ত্রী লিসে। লর্মেরিন তাকে সত্যিই ভালবাসে এবং সেও লর্মেরিনকে ভালবাসে। সেই লিসেই ভালবেসে তাকে আদর করে ডাকত জ্যাকলেত। এ নামটা তারই দেওয়া।

কত কথা ভিড় করে আসতে লাগল মনে। অসংখ্য মিষ্টি স্মৃতির মাঝে একটি বিশেষ দিনের কথা মনে আছে। তখন বসন্তকাল। বসন্তের কোনএক মনোরম সন্ধ্যায় কোনএক ভোজসভা থেকে বাড়ি ফেরার পথে লিসে হঠাৎ তার বাড়িতে চলে আসে। তাকে নিয়ে বেড়াতে যায় বোলনের লেক দিয়ে। তার গায়ের ও পোশাকের মিশ্রিত গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল মৃদু বাতাসে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে

চুঁয়ে চুঁয়ে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছিল লেকের জলে, তার স্পষ্ট মনে আছে। আনন্দে তখন কাঁদতে থাকে লিসে। লর্মেরিন এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, 'তা জানি না।' লর্মেরিন তখন আবেগের সঙ্গে লিসেকে জড়িয়ে ধরে বলে, হে আমার প্রিয় লিসে, তুমি কত সুন্দর।

এত সুন্দর একটি প্রেমের অকালমৃত্যু ঘটল অকস্মাৎ। লিসের বৃদ্ধ স্বামী লর্মেরিনের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ তাঁর সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল তার গাঁয়ের বাড়িতে। আর তার কয়েক মাসের মধ্যে সেকথা ভুলে গেল লর্মেরিন। প্যারিসের কোন অবিবাহিত যুবকের জীবনে কত নারী আসে যায়। তাদের রঙীন স্মৃতিরেখাগুলো বালুচরে জলের রেখার মত ধুয়ে মুছে যায় অতি অল্প-দিনের মধ্যে। তবু তার মনের কোণে লিসের জন্য একটুখানি জায়গা আজও রেখে দিয়েছিল লর্মেরিন।

অন্য চিঠিগুলো একবার দেখে নিয়ে লর্মেরিন ঠিক করে ফেলে আজই সন্ধ্যায় লিসের বাড়িতে যাবে। সারাটা দিন উত্তেজনার মধ্যে কাটাল লর্মেরিন। পঁচিশ বছর পর তাকে দেখে কি চিনতে পারবে সে?

প্রসাধন সেরে পোশাক পরে সন্ধ্যের আগেই রওনা হলো লর্মেরিন। লিসে-দের বাড়ি গিয়ে তাদের ড্রইংরুমে ঢুকেই দেওয়ালে টাঙানো তার একখানা ছবি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল লর্মেরিন। লিসে তাহলে আজও মনে রেখেছে তাকে। কিছুক্ষণ বসে থাকতে হলো তাকে। তারপর এক বৃদ্ধা নারী ঘরে প্রবেশ করতেই চমকে উঠল লর্মেরিন। লিসেকে চিনতে সত্যিই কষ্ট হয়। তার মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। তবু তার বাড়িয়ে দেওয়া হাত অনেকক্ষণ ধরে চুম্বন করল লর্মেরিন। তারপর তার মুখ থেকে আপনা হতে বেরিয়ে এল একটা কথা, লিসে তুমি!

লিসে বলল, হ্যাঁ আমি। অনেক দুঃখ সহ্য করে করে জীবনটা খাক হয়ে গেছে আমার; অকালে বুড়ো হয়ে গেছি। কিন্তু তুমি আজও কত সুন্দর আছ! লিসেকে পাশে বসিয়ে তার হাতখানা অনেকক্ষণ ধরে রইল লর্মেরিন। কিন্তু লিসের বুড়ী ঠাকুরমার মত মুখখানার পানে তাকিয়ে কি বলবে খুঁজে পেল না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর লিসে বলল, আমার মেয়ে রেণীকে ডাকছি।

রেণী এলে তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল লর্মেরিন। এ যেন তরুণী যুবতী লিসের অবিকল প্রতিরূপ। ঠিক যেন আগেকার দিনের সেই লিসে। লর্মেরিন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। লিসে বলল, তোমার আগেকার সেই উচ্ছল ছটফটে ভাব আর নেই।

লর্মেরিন বলল, আগেকার অনেক জিনিসই হারিয়েছি।

কিছুক্ষণ পর উঠে পড়ল লর্মেরিন। বাজারে কিছুটা বেড়িয়ে ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু বাতিটা নিয়ে ঘরের বড় আয়নাটার সামনে যেতেই হঠাৎ মনে

হলো লমে´রিনের তারও যেন বেশ বয়স হয়েছে। তার চুলেও পাক ধরেছে। এমন করে খুঁটিয়ে কোনদিন দেখেনি বলে ধরা পড়েনি। তার মুখেরও বার্ধক্যের কিছু কিছু অস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠেছে।

আয়নাটার উপর প্রতিফলিত নিজের মূর্তির পানে হতাশভাবে তাকিয়ে দুঃখিত চিত্তে আপন মনে বলে উঠল লমে´রিন, হায়, সবকিছু শেষ লমে´রিন।

একটি সন্ধ্যা

[One evening]

স্টীমার ক্লেবার গিয়ে থামলো। সামনেই আমাদের 'বাগী গালক'। সেই-দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। উঁচু পাহাড়গুলি ক্যাবিল অরণ্যানীতে ঢাকা পড়েছে। দূরে হলুদ রঙের বালি সোনালী আভায় নীল সমুদ্রের ধারে চকচক করছে। আর সেই ছোট শহরটির বাড়িগুলির ওপরে সূর্যের তেজ প্রচণ্ড বেগে আগুন ঢেলে দিয়েছে।

উষ্ণ আফ্রিকার মিষ্টি গন্ধ মরুভূমির ওপর দিয়ে আমার নাকে এসে লাগল; এটি হচ্ছে সেই রহস্যময় বিরাট মহাদেশ যার ভেতরে উত্তর পৃথিবীর মানুষেরা খুব কমই প্রবেশ করেছে। গত তিন মাস ধরে সেই বিরাট, অজ্ঞাত মহাদেশের কিনারে-কিনারে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি—এ সেই দেশ যেখানে ঘুরে বেড়ায় উট-পাখী, উট, গেজেল, গণ্ডার, গোরিলা, হাতি আর নিগ্রোর দল। আন্দোলিত পতাকার মত আমি এদেশের বাতাসে আরবদের ঘোড়ায় চড়ে ছুটে যেতে দেখেছি। আমি বেদুইনদের লালচে তাঁবুর নীচে ঘুমিয়েছি। এর আলো, ম্যাজিক, আর দীর্ঘায়ত দিকচক্রবালে আমি অভিভূত।

কিন্তু এই ভ্রমণের শেষে ফিরে যেতে হবে ফ্রান্সে, ফিরে যেতে হবে অলস পালগল্পে মুখরা, অতি সাধারণ কর্মচাঞ্চল্যে ভরা, আর বিরতিহীন করমর্দনের নগরী প্যারীতে। এই প্রিয়, এই অভিনব দেশটি ছেড়ে আমাকে চলে যেতেই হবে। দুঃখ হয় এই অল্প পরিচয়ের জন্যে।

অনেকগুলি ছোট ছোট নৌকো স্টীমারের চারপাশ ঘিরে ভাসছিল। তাদেরই একটার ওপর আমি লাফিয়ে পড়লাম। নৌকার মালিক একটি যুবক নিগ্রো। তারপরে এসে হাজির হলাম প্রাচীন সারাসেন সমুদ্রের উপকূলে। সুটকেসটির পাশে দাঁড়িয়ে আমি যখন পাহাড়-ঘেরা চারপাশের অপরূপ সৌন্দর্য মসগুল হ'য়ে দেখছিলাম এমন সময় আমার মনে হলো একটা ভারি হাত কে যেন আমার ঘাড়ের ওপরে রাখলো।

ঘুরে চেয়ে দেখি একটি বেশ দীর্ঘাঙ্গী ভদ্রলোক নীল দুটি চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ভদ্রলোকের দাড়িগুলি লম্বা, মাথায় স্ট্র হ্যাট, পরনে

সাদা ফ্ল্যানেল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার স্কুলের পুরানো সহপাঠী নন?

সম্ভবত। আপনার নামটি কি?

ত্রেমোলিঁ।

আরে, আরে, আরে। তুমি আমার ক্লাশে পড়তে না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেই তোমাকে আমি চিনেছি।

সে তার লম্বা দাড়ি দিয়ে আমার গাল ঘষে দিল।

পুরানো সহপাঠীকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে আমি তার হাতে মোচড়ের পর মোচড় দিতে লাগলাম।

চারটি বছর স্কুলে সে আমার প্রিয়তম বন্ধু ছিল। তখন সে ছিল রোগাটে, গোলাকার ভারি মাথা। হাঁটার সময় ঘাড়টাকে সে একবার ডানদিকে বাঁকাতো, আর একবার বাঁদিকে। আমাদের ক্লাশে সবচেয়ে বেশী প্রাইজ পেত সে। বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ—এই ছেলেটির মনটা সাহিত্যিকের। সে যে পরে বিখ্যাত কবি হ'য়ে উঠবে সেদিক থেকে কলেজে পড়ার সময় আমাদের কোনরকম সন্দেহ ছিল না। তার বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; তিনি ছিলেন একজন কেমিস্ট। ব্যাচিলার ডিগ্রী পাওয়ার পরে তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি।

আমি চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে তুমি করছ কী?

সে হেসে উত্তর দিল—আমি এখানেই থাকি।

কী! চাষ-আবাদ করছ এখানে?

হ্যাঁ।

কী চাষ কর?

আঙুর। আঙুর থেকে তৈরী করি মদ।

রোজগারপাতি ভাল হয়?

হ্যাঁ, নিশ্চয়।

শুনে খুশি হলাম।

তুমি কি হোটেলে উঠবে?

অবশ্যই।

তুমি আমার বাড়িতে এস।

কিন্তু।

কিন্তু-টিন্তু নয়। এস।

যে যুবক নিগ্রোটি আমাদের কথা শুনছিল তাকে লক্ষ্য ক'রে সে বলল, আলি, বাড়ি চল।

ত্রেমোলিঁ আমার হাত ধরে এগোতে লাগল। তার বাড়িটা হচ্ছে পুরানো মুরিশ ধাঁচের। ভেতরে উঠোন। রাস্তার ওপর কোন জানালা নেই। আশেপাশের বাড়ি থেকে অনেক উঁচু; সমুদ্র তীর, অরণ্যানী, পাহাড়তলী, আর



ছাড়িয়ে বাড়িটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খুশি হয়ে বললাম, আঃ, কী চমৎকার! একখানা বাড়ি বটে। প্রাচ্য দেশের সব মোহ আর আকর্ষণ এর মধ্যে জমায়েত হয়েছে। তোমার ভাগ্য ভাল যে এরকম একটা বাড়ি তুমি পেয়েছ। এই বারান্দার উপরে রাত কাটানো কি আনন্দের। তুমি কি এইখানেই ঘুমোও?

গ্রীষ্মকালে ঘুমোই। আজ সন্ধ্যের সময় আমরা বেড়াতে যাব। মাছ ধরতে ভাল লাগে তোমার?

কি ধরনের?

টর্চ লাইট জ্বেলে মাছ ধরা।

হ্যাঁ; ভালবাসি।

ঠিক আছে। ডিনার সেরেই বেরোব। ফিরে এসে ছাদের ওপরে বসে ঠাণ্ডা কিছু খাব।

তাই হল। উৎকৃষ্ট ডিনার খেয়ে মৎস্য শিকারে বেরিয়ে গেলাম আমরা।

বন্দরের কাছে আমাদের নৌকো অপেক্ষা করছিল। নৌকোতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক নৌকো বাইতে শুরু করল। ওইখানেই বসেছিল লোকটি; কিন্তু তার মুখ আমি দেখতে পাই নি। আমার বন্ধুটি আলো জ্বালানোর পাত্রটা হাতে নিয়ে বসল। সে বলল, বর্শা দিয়ে আমিই মাছ গেঁথে তুলি। এবিষয়ে আমার দক্ষতা কোন শিকারীর চেয়ে কম নয়।

বললাম, আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।

ভাসতে-ভাসতে আমরা সমুদ্রের এমন একটা জায়গায় এসে হাজির হলাম যেখানটা উঁচু-উঁচু পাহাড়ে বোঝাই হয়ে রয়েছে। তাদের ছায়াগুলি জলের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ বুঝতে পারলাম সমুদ্রের জল আলোতে চকচক করছে। দাঁড় ফেলার তালে-তালে আমাদের সামনে সমুদ্রের ওপরে অদ্ভুত আলো জ্বলতে লাগল; তারপর মিলিয়ে গেল জলের ভেতরে। নৌকো চলার সঙ্গে সঙ্গে যে ঠাণ্ডা আগুন জ্বলতে লাগল সেইসব আলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে আমি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলাম। জল শান্ত হয়ে গেলেই আলো নিভে যায়। অন্ধকারের ভেতরে আলোর স্রোতের মধ্যে দিয়ে আমরা তিনজন ভেসে চললাম।

আমরা চলেছি কোথায়? আমাদের সঙ্গীদের আমি দেখতে পাই নি। দাঁড়ের ঘা খেয়ে জলের ওপরে আলোর যে ছোট ছোট ঢেউ উঠছিল সেইগুলিই কেবল আমার চোখের ধরা পড়ছিল। প্রচণ্ড গরম, মনে হচ্ছিল অন্ধকারকে যেন উনানের ওপরে তাতানো হয়েছে। দূরে আরবদেশের কুকুর চীৎকার করছে। তাদের রঙ লাল; চোখ দুটো জলজলে। সমুদ্রের তীর থেকে মরুভূমির অন্তস্থল পর্যন্ত বেদুইনরা যেখানে তাঁবু খাটিয়ে থাকে ওরা তারই পাশে পাশে প্রতিদিন রাত্রিতে ওইরকম চীৎকার করে। সেই স্বর শুনে শেয়াল, খেঁকশিয়াল আর

হায়নারা পাল্টা চেঁচায়। আর নিঃসন্দেহে অনতিদূরে যে অ্যাটলাস পর্বত-মালা রয়েছে তাদের ভেতরের কোন জায়গা থেকে নিঃসঙ্গ সিংহ-ও একটা গর্জন করে উঠল।

হঠাৎ দাঁড়ী থেমে গেল। কোথায় এসেছি আমরা? আমার কাছেই একটা খসখস শব্দ শুনলাম। দেশলাই-এর আলোতে একটা হাত চোখে পড়ল আমার। শুধুমাত্র একটা হাত। হাতটা একটা ঝাঁঝরির দিকে একটা ক্ষীণ আলো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই ঝাঁঝরির ওপরে চিতার মত সাজানো একরাশ কাঠ। অবাক হয়ে এই অদ্ভুত বস্তুটির দিকে আমি তাকালাম। দেখলাম সেই ক্ষীণ বাতিটি একমুঠো শুকনো পলকা কাঠের ভেতরে ঢুকে গেল। কাঠগুলো জ্বলে উঠলো। সেই আলোতে দুটি মানুষ আমার চোখে পড়ল—একটি রোগা-প্যাটকা বৃদ্ধ—মাথার চারপাশে একটা রুমাল বাঁধা; আর এক-জন সাদা দাড়িওয়ালা ড্রেমলিঁ—আমার বন্ধু।

ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল নৌকোটি। জ্বলন্ত আলোয় সমুদ্রের তলা পর্যন্ত চোখে পড়ল আমার। জলের তলায় যেসব গাছপালা জন্মায় সেগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। লাল, নীল, সবুজ হলদে শরগাছের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলাম আমরা। মাঝে-মাঝে শরগাছগুলি জলের ওপরে জেগে উঠল। আমাদের ধীর গতিতে একটুও তারা হেলে পড়ল না।

সমুদ্রের সেই অরণ্যের মধ্যে রোগা-রোগা সাদা মাছগুলি তীব্রবেগে ছুটতে ছুটতে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কতকগুলি মাছ সেই ঘাসের বনে সুন্দরভাবে ভেসে উঠল। কিন্তু তাদের ধরা গেল না। তারপরে হঠাৎ সমুদ্রের জল আর দেখা গেল না। বনের আবছায়ায় হারিয়ে গেল। নৌকোর আলোতে অস্পষ্ট বিরাট-বিরাট পাথর আর বিবর্ণ সামুদ্রিক লতাগুল্ম ভেসে উঠল আমাদের চোখে।

নৌকোর গলুই-এর ওপরে ছিপের কাঁটা তুলে ড্রেমলিঁ ঘাড় নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছে সে যেন শিকারের খোঁজে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। হঠাৎ সে তার কাঁটাটাকে এমন তীব্র আর সাবলীল ভঙ্গিতে জলের ওপরে ছুঁড়ে দিল যে বিরাট একটা মাছের গায়ে সেটা বিঁধে গেল। বেচারা আমাদের এড়িয়ে তখন পালিয়ে যাচ্ছিল।

ড্রেমলিঁর এই অকস্মাৎ শরীর সঞ্চালন ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করিনি আমি। তারপরেই কানে এল তার অস্পষ্ট বিজয়ধ্বনি। তারপরেই দেখলাম লোহার কাঁটায় গাঁথা একটা বিরাট মাছ ধড়ফড় করতে-করতে ওপরে উঠে আসছে। আলোর সামনে ধরে নিজে দেখে আর আমাকে দেখিয়ে মাছটাকে সে নৌকোর খোলের মধ্যে ফেলে দিল। সেই সামুদ্রিক মাছটা পাঁচটা খোঁচা খেয়ে নিজের দেহটা জড়াতে লাগল; তারপরে আমার পাশে নীচেটায় গর্ত ভেবে আশ্রয় নিতে গিয়েই নৌকোর খোলের মধ্যে যে কালো জল ছিল

তারই ভেতরে গুঁড়ি দিয়ে ঢুকে গেল। সেইখানে মৃতপ্রায় অবস্থায় সে কেবল কুণ্ডলী পাকাতে লাগল। এইরকম ক'রে রাশি-রাশি মাছ ধরল ড্রেমলিং। এক-একটা ধরে, আলোর সামনে নিয়ে দেখে, তারপরে খোলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এইভাবে নানা শব্দমুখর অন্ধকার সমুদ্রের জলে ভাসতে-ভাসতে আমি তন্ময় হয়ে বসেছিলাম—হঠাৎ আমার বন্ধুটি চীৎকার ক'রে উঠল—তবে রে ব্যাটা!

বর্শাটা ছুঁড়ে দিল বন্ধু; তুলে আনলো বিরাট একটা মাংসপিণ্ড—লাল দেহটা তার থরথর ক'রে কাঁপছে। লোহার কাঁটাগুলো কাঠের বাঁট পর্যন্ত তার গায়ের চারপাশে বিঁধে গিয়েছে। বস্তুটি হচ্ছে একটি অকটোপাশ—সে তার শুঁড়গুলিকে একবার গুটিয়ে নিচ্ছে আর একবার ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই-গুলি দিয়েই সে রক্ত শুষে খায়।

বন্ধুটি সেই বিরাট সামুদ্রিক জানোয়ারটিকে শূন্যে তুলে ধরল। দেখতে পেলাম দৈত্যটার দুটো বিরাট চোখ আমার দিকে জুলজুল ক'রে তাকিয়ে রয়েছে। চোখ দুটি ভয়ঙ্কর; মনে হল, কোটরের ভেতরে দুটি আলু উঁচু হয়ে রয়েছে। নিজেকে মুক্ত মনে ক'রে জানোয়ারটা তার শুড়গুলোকে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। শুঁড়ের প্রান্তভাগটা সুতোর মত সরু। একটা শুঁড় আমার বসার জায়গাটাকে জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা শুঁড় ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। সেই সরু-সরু নরম শুঁড়ের কী প্রচণ্ড শক্তি। এই দেখে ড্রেমলিং তার ছুরি বার ক'রে জানোয়ারটার দুটো চোখের ওপরে প্যাট-প্যাট ক'রে বসিয়ে দিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলার একটা শব্দ কানে এল আমাদের; মনে হল, কতকটা হাওয়া যেন বেরিয়ে গেল। স্থির হ'য়ে গেল অকটোপাশ। মারা গেল না; তবে তার সমস্ত শক্তি নিংশেষিত হয়ে গেল। আর সে কারও রক্ত চুষতে পারবে না।

আর একটা কাজ করল ড্রেমিলং। বর্শার খোঁচা দিয়ে গেঁথে সে জানোয়ারের শক্তিহীন দেহটাকে ওপরে তুলে নিয়ে আগুনের সামনে ধরল; তারপরে তার শুঁড়ের প্রান্তভাগগুলিকে গনগনে আগুনের ওপরে ধরে আচ্ছা করে পোড়ালো। আগুনের সংস্পর্শে এসে তার শুঁড়গুলো কুঁকড়িয়ে-কুঁকড়িয়ে দলা পাকাতে লাগল—জানোয়ারটার সেই যন্ত্রণা দেখে আমার খুব কষ্ট হল। আমি চীৎকার ক'রে বললাম—কী করছ, কী করছ?

তার মনে কোনরকম ভাবান্তর দেখা গেল না। সে শান্তভাবে বলল—এই রক্তপিপাসু জানোয়ারটার কাছে কোন শাস্তিই নিষ্ঠুর নয়।

এই ব'লে সেই আহত ছিন্নবিছিন্ন বিকলাঙ্গ জানোয়ারটাকে সে খোলের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। সেইখানে কালো জলের মধ্যে হতভাগ্যাটা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মরা মাছগুলির মধ্যে প'ড়ে-পড়ে মরতে লাগল।

এইভাবে মৎস্য শিকার করতে-করতে একসময় আমাদের কাঠ শেষ হয়ে আসতে লাগল, নিবু-নিবু হ'য়ে এল আগুন। ভ্রেমলি তখন আগুনের চুল্লীটাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল; সঙ্গে-সঙ্গে নিটোল অনার্য একটি অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপরে। তারপরে ধীরে-ধীরে একসময় আমরা ফিরে এলাম।

বাড়িতে ফিরে ছাদের ওপরে বিশ্রাম করতে গেলাম আমরা। পাহাড়-তলীর পেছন থেকে কাস্তের মত চাঁদ ধীরে-ধীরে উঠতে সুরু করেছে। আফ্রিকার মৃদু উষ্ণ হাওয়া বইতে সুরু করেছে ধীরে-ধীরে। সেইসঙ্গে ভেসে আসছে ফুলের মৃদু সুবাস।

চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম আকাশ, পাহাড়তলী, সমুদ্র আর আশপাশের অজস্র নীচু বাড়ির দিকে, হঠাৎ মনে হল, সারা প্রাচ্যদেশের আত্মাটি যেন ধীরে-ধীরে আমাকে গ্রাস ক'রে ফেলছে। যেসব অজস্র কাহিনী, আর অ্যারাবিয়ান নাইটস-এর গল্প এই দেশটির প্রাচীন যুগকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিল আমার মন সেইখানে উড়ে গেল। আমি যেন শুনতে পেলাম নারীরা কত আশ্চর্য-আশ্চর্য যাদুকাহিনী বলে বেড়াচ্ছেন, সিল্কের পায়জামা পরে প্রাসাদ অলিন্দে রাজকুমারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা যেন আমি দেখতে পেলাম; দেখতে পেলাম রূপোর বাতিদানে সুগন্ধি ধূপ জ্বলছে; আর মায়াবী উপ-দেবতার মত সেই ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

বন্ধুকে বললাম—এমন দেশে থাকতে পেয়েছ তুমি। তুমি সত্যিই সৌভাগ্যবান।

সে বলল—হঠাৎ এসে পড়েছি এখানে।

হঠাৎ?

হ্যাঁ; সুযোগ আর দুর্ভাগ্য—দুই-ই বলতে পার।

আমার সামনে সে দাঁড়িয়েছিল। তার কথার সুর শুনে মনে হ'ল জীবনে সে অনেক দুঃখ পেয়েছে। একটু থেমে সে বলল—আমার দুঃখের কাহিনী তোমাকে বলতে পারি। আমার কষ্টও কিছু কমবে তাতে।

বল।

তাহলে শোন। কলেজে আমি কেমন ছিলাম তা তুমি জান। কেমিস্টের দোকানে আমি মানুষ হয়েছি; কিন্তু মনটা আমার ছিল কবির। বই লেখার স্বপ্ন আমার চিরকালের স্বপ্ন। কলেজ ছাড়ার পরে সে চেষ্টা আমি ক'রে-ছিলাম। কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হয় নি। একটা কাব্যগ্রন্থ লিখলাম, তারপরে একটা উপন্যাস। কোনটাই বিক্রী হয় নি। শেষকালে লিখলাম একটা নাটক। কোনদিনই তা মঞ্চস্থ হয় নি। তারপরে আমি প্রেমে পড়লাম। প্রেমে পড়ার বিস্তারিত বিবরণ তোমাকে আমি বলব না।

আমার বাবার দোকানের পাশে একটি দর্জির দোকান ছিল। সেই দর্জির

মেয়েকেই আমি ভালবেসেছিলাম। মেয়েটি বুদ্ধিমতী; হাইয়ার স্কুল পরীক্ষায় পাশ করেছিল, সপ্রতিভ—তার দেহের মত মনটাও ছিল তার পুষ্ট। বয়স তার বাইশ কিন্তু দেখতে পনেরো বছরের কিশোরীর মত। শারীরিক গঠনটাও তার বেশ সুন্দর; তন্বী, মুখের রঙ চকচকে, মোলায়েম, অনেকটা কমনীয় ওয়াটার-কলার-এর মত। তার নাক, মুখ, চোখ, কান, হাত, তার হাসি, চলন-বলন এত সুন্দর যে তার একমাত্র যোগ্যস্থান ছিল কাচের শো-কেস; বাস্তব জগতে ঘুরে বেড়ানোর যোগ্যতা তার কমই ছিল। তা সত্ত্বেও প্রাণময়ী বলতে যা বোঝা যায় সে ছিল তাই; চলনে—চঞ্চলা; এবং অবিশ্রান্ত কর্মঠ। মেয়েটিকে আমি খুব ভালবেসেছিলাম। প্রেমের উন্মাদনা কী জিনিস তা তুমি জান। নারী যখন কোন পুরুষের চিত্তকে অধিকার ক'রে বসে তখন তাকে উন্মত্ত ক'রে তোলে। প্রেমিকার কথা ছাড়া আর কিছুই সে চিন্তা করতে পারে না।

শীঘ্রই আমাদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তাকে জানালাম। আমার সেই পরিকল্পনাকে সে সমর্থন করল না। সে বিশ্বাস করল না যে কবি, ঔপন্যাসিক, অথবা নাট্যকার হ'য়ে আমি কিছু করতে পারব; তারচেয়ে সে ভেবেছিল ব্যবসাপাতি করলে আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। আমাকে অগত্যা সেই পরিকল্পনা ছাড়তে হল; আমার হাতে লেখা পুঁথিগুলি বিক্রী ক'রে দিয়ে আমি একটা বই-এর দোকান কিনলাম। দোকানটার মালিক মারা যাওয়ার ফলে দোকান বিক্রী হয়ে যায়। দোকানটা মার্সেলিস-এ। নাম ইউনিভার্সিয়েল লাইব্রেরী।

পরের তিনটি বছর আমাদের ভালই কেটেছিল। দোকানটাকে আমরা একটি পাঠাগারে পরিণত করেছিলাম। শহরের অনেক শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা সেখানে গল্প করতে আসতেন। ক্লাবে যেমন মানুষে যায় সেইভাবেই তারা এখানে আসত। বই নিয়ে আলোচনা করত, কবি—ঔপন্যাসিকদের নিয়ে আলোচনা করত; আলোচনা করত রাজনীতি নিয়ে। বই বিক্রী করার ভার ছিল আমার স্ত্রীর ওপরে। শহরে সে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আর আমি পাশের ঘরে বসে পড়াশুনা করতাম। তাদের গল্প করার শব্দ, হাসি-আলোচনার শব্দ আমার কানে আসত। মাঝে-মাঝে তাদের কথা শোনার জন্যে আমি লেখা বন্ধ ক'রে উৎকর্ণ হ'য়ে থাকতাম। আমি তখন একটা উপন্যাস লিখছিলাম—সেটা আর শেষ হয় নি।

যারা নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মঁসিয়ে মনভিনা; দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দর চেহারার অবস্থাপন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। কালো চুল; অহেতুক প্রশংসা করতে মানুষটি খুব দক্ষ ছিল। মঁসিয়ে বারবেত আসতেন। তিনি হচ্ছেন ম্যাজিস্ট্রেট। আসতেন মঁসিয়ে ফসিল, আর লাবারেগ—এঁরা ছিলেন ব্যবসাদার। রয়্যালিস্ট পার্টির নেতা মারকুই দি ফ্লেচি-ও আসতেন। ও

অঞ্চলের সবচেয়ে গণ্যমান্য মানুষ ছিলেন তিনি। বয়স তাঁর ছেষট্টি।

ব্যবসাপত্র ভালই চলছিল। আমিও খুব সুখী হয়েছিলাম। একদিন বেলা প্রায় তিনটের সময় বিশেষ একটা কাজে আমি এক জায়গায় গিয়েছিলাম এমন সময় একটা বাড়ি থেকে একটি মহিলাকে আমি বেরিয়ে আসতে দেখলাম। তাঁর সঙ্গে আমার স্ত্রীর সাদৃশ্য এত বেশী যে আমি যদি তাকে বাড়িতে রেখে না আসতাম তাহলে জোর গলায় আমি বলতে পারতাম ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ নয়।

ভদ্রমহিলা আমার সামনে দিয়ে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন একবারও তিনি পিছু ফিরে তাকান নি। শুধু অবাক হই নি; রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছিলাম আমি। তাই কোন কিছু চিন্তা না করেই আমি তার পিছু নিলাম। নিজেকে নিজে বললাম—এ সে নয়। কিছুতেই নয়। অসম্ভব; তার ভীষণ মাথা ধরেছে। তাছাড়া, ওই বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজনটাই বা কী তার?

তবু, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আমি তার পিছু-পিছু দ্রুত হাঁটতে লাগলাম, আমি যে তাঁর পিছু নিয়েছি এটা তিনি আন্দাজ করেছিলেন; অথবা, তিনি আমার পায়ের শব্দ চিনতে পেরেছিলেন কিনা জানিনে, কিন্তু হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ও হরি, এতো সে-ই। আমাকে দেখেই একটু লজ্জা পেয়ে সে থেমে গেল; তারপরে একটু হেসে বলল—আরে তুমি!

খুব খারাপ লাগল আমার। আমি বললাম—হ্যাঁ! তুমি তাহলে বাইরে বেরিয়েছিলে? কিন্তু তোমার মাথার যন্ত্রণা?

কমেছে। আমার একটা জরুরী কাজ ছিল।

কোথায়?

দোকানে; কিছু পেনসিলের অর্ডার দিতে।

আমার মুখের দিকে সে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকালো। এখন তার মুখের ওপরে লজ্জার কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। তার পরিবর্তে, মুখ কিছুটা বিবর্ণ হয়েছে। তার সেই ঝকঝকে পরিষ্কার দুটি চোখ, হায়—নারীর চোখ—দেখে মনে হল সে সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু আমার কেমন যেন একটা অস্পষ্ট সন্দেহ হল—সে আমাকে মিথ্যে কথা বলছে। সে যতটা সঙ্কুচিতা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী সঙ্কোচ লাগছিল আমার। সে যে মিথ্যে কথা বলছে সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম; কিন্তু সেকথা তার মুখের ওপরে বলতে আমি সাহস করি নি। একাজ সে করল কেন? সেবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিল না। তাই আমি ভাবলাম—শরীর ভাল থাকলে নিশ্চয় তুমি বেরোতে পার। এখন কি তুমি বাড়ি ফিরছ?

হ্যাঁ।

তাকে ছেড়ে দিয়ে একা-একা রাস্তায় বেশকিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম আমি। ব্যাপরটা কী? তার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি কেমন যেন বুঝতে

পেরেছিলাম সে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু এখন আর সেকথা ভাবতে পারছিনে। ডিনারের সময় বাড়ি ফিরে গেলাম। তাকে যে আমি একমুহূর্তের জন্তেও সন্দেহ করতে পেরেছি একথা ভাবতেই নিজের ওপরেই আমার কেমন রাগ হয়েছিল।

তুমি কি কোনদিন হিংসার আগুনে পুড়েছ? যাইহোক; হিংসা আর সন্দেহের প্রথম দোলাটি আমার হৃদয় স্পর্শ ক'রে গেল। স্পষ্ট কোন সন্দেহ তার ওপরে আমার ছিল না। আমি শুধু জানতাম সে মিথ্যে কথা বলেছে। একথা তুমি মনে রেখো পথে-প্রান্তরে, কাজ-অকাজে যখনই আমরা দু'জনে একলা থাকতাম তখনই তার কাছে আমার মনের সব কথাই খুলে বলতাম। কারণ তাকে আমি ভালবাসতাম। আমার বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা তারই কাছে আমি সমর্পণ করেছিলাম। সন্দেহটা পুরোপুরি কায়েমী হ'য়ে বসার আগে আমি কেমন মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। আহার এবং নিদ্রা কোন কিছুতেই আমার আর কোন স্পৃহা ছিল না।

সে আমাকে মিথ্যে কথা বলল কেন? ও-বাড়িতে ও করছিল কী? ব্যাপারটা জানার জন্তে চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারি নি আমি। ওই বাড়িটির দোতলায় যে থাকত তাকে জিজ্ঞাসা করেছি—তিনতলা—চারতলার যারা থাকত—তাদের কাছেও অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু কোন সূত্রই আমি খুঁজে পাই নি। একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত, সে ওই বাড়িটিতে গিয়েছিল, এবং আমার কাছে সেই সংবাদটি সে গোপন করেছে। সুতরাং নিশ্চয়ই ওখানে কোন রহস্য রয়েছে। কিন্তু সে-রহস্যটা কী? মাঝে মাঝে মনে হোত প্রত্যেকেরই ছোটখাট অন্তরঙ্গ নিজস্ব কোন গোপনীয়তা থাকে—আমারও হয়ত তা রয়েছে—যা থেকে বাইরের কারও কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য নয়—অপরপক্ষ তার যত নিকট সম্বন্ধই হোক না কেন। তোমার যদি কোন যুবতী স্ত্রী থাকে তাহলে তোমাকে না ব'লে কিছুই কি সে করতে পারবে না? বিবাহের অর্থ কি এই যে দম্পতিরা পরস্পরের কাছে নিজেদের বিলোপ ক'রে দেবে, জলাঞ্জলি দেবে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে? আমার চরিত্রের খুঁটিনাটি সে বেশ ভালভাবেই জানে। সে হয়ত মনে করেছে তার বিশেষ কোন কাজ—সেটা যত নিরপরাধই হোক না কেন—আমার হয়ত তা মনঃপুত হবে না। তার হাতের আঙুলগুলি বড় সুন্দর। হয়ত সে ওই সন্দিগ্ধ বাড়িতে নখ কাটতে গিয়েছিল। পাছে অমিতব্যয়ীতার জন্তে আমি কিছু বলি এই জন্তেই হয়ত আসল কথাটা সে আমাকে বলে নি। নারীহৃদয় স্বভাবতই কিছুটা জটিল এবং কুটিল।

কিন্তু যতই যুক্তি দেখাই না কেন, আশ্বস্ত কিছুতেই আমি হ'তে পারলাম না। একটা নাম-না-জানা দুশ্চিন্তা আর সেইসঙ্গে সন্দেহ আমাকে গ্রাস ক'রে বসল। ওর কি কোন প্রেমিক রয়েছে? ভেবে দেখ একবার ব্যাপারটা,

অসম্ভব, অসম্ভব। তা কি কখনও হ'তে পারে···কিন্তু···তবু···

সেই দীর্ঘ, সুবেশ চাটুকার মনস্তিনার মুখটা আমার মনে সবসময় ভাসছিল। আমি বিড়বিড় ক'রে বললাম—'এ সেই মনে-মনে একটা গল্পও তৈরি ক'রে ফেললাম। তার নিশ্চয় দোকানে ব'সে কোন প্রেমের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করে। তার পরিণামই হচ্ছে এই। তাদের হাতেনাতে ধরার জন্যে আমি তলায় রবার দেওয়া জুতো কিনলাম। ছল ক'রে অসংখ্যবার নিঃশব্দে পাশের ঘরে যাতায়াত করলাম। একবার আমি হামাগুঁড়ি দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোকানের দিকে এগোতে লাগলাম; তারপরে আবার সেইভাবে পিছিয়ে এলাম। একটা নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমার দিন কাটতে লাগল। আমার কাজ গেল, আমার আহার-নিদ্রা গেল, শান্তি গেল। মনের মধ্যে বিরাট একটা যন্ত্রণা নিয়ে অস্থির হ'য়ে বেড়াতে লাগলাম আমি। বাড়ি থেকে ছিটা বাইরে গেলেই মনে হোত—ওই সে এসেছে। মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে আসতাম আমি। ফিরে এসে দেখতাম—না, কেউ নেই। আবার বেরোতাম। আবার ফিরে আসতাম। না; এখনও সে আসে নি। এইভাবে দিনের পর দিন কাটতে লাগল।

রাত্রিটা আমার কাছে আরও অসহ্য হয়ে উঠল। কড়িকাঠের দিকে মুখ ক'রে আমি চুপচাপ শুয়ে থাকতাম। পাশে শুয়ে থাকত সে। কখনও ঘুমোত, অথবা, ঘুমোনোর ভান করত। আর মনের মধ্যে অজস্র জ্বালা আর যন্ত্রণা নিয়ে নিজের ভেতরেই ছটফট করতাম আমি। জানতাম, এ রহস্যের সমাধান আমি কোনদিনই করতে পারব না; করার সাধ্য আমার নেই। তার দিকে তাকিয়ে দেখ—সে তার পরিষ্কার নিটোল দৃষ্টি দিয়ে তোমার দিকে ফিরে তাকাবে। কিন্তু সব ভুল, সব ভুল; সব ঝুটা হ্যায়। মাঝে মাঝে মনে হোত তার সেই আপাত নিরপরাধ চোখ দুটির ভেতরে সূঁচ ফুটিয়ে দিই, তার প্রবঞ্চনাকে প্রকাশ ক'রে দিই বাইরে। আমি তার কব্জি দুটো মুচড়ে দিয়ে বলতে পারতাম—অপরাধ স্বীকার কর। করবে না? দাঁড়াও, তোমাকে আমি মজা দেখাচ্ছি। তাকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলতে পারতাম; কিম্বা পারতাম আগুনে তার আঙুলগুলি পুড়িয়ে দিতে। এবার বল—সত্যি কথা বল! বলবে না? গনগনে চুল্লীর ওপরে দাঁড় করিয়ে তোমাকে আমি দগ্ধ করব। তখন তুমি বলবে—বলতে বাধ্য হবে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে সে চীৎকার ক'রে তার কাহিনীটি বলতে লাগল। মনে হল, তার সেই চীৎকার শুনে পাশের বাড়িতে ঘুমন্ত নর-নারী জেগে বিছানার ওপরে উঠে বসেছে। আমার কথা যদি বলেন তার সেই কাহিনী শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। অন্ধকার চোখের সামনে আমি যেন সেই উদ্দাম, স্বাস্থ্যময়ী, কামনাময়ী, ছলাকলায় বিশেষ পারদর্শিনী সেই কামিনীটিকে দেখতে পেলাম।

শান্তভাবে আমার বন্ধুটি বলে গেল—তোমাকে এসব কথা বলছি কেন তা আমি জানিনে; সে কথা আমি আজ পর্যন্ত কাউকেই বলি নি। তবে গত দু'বছরের মধ্যে বলার মত কাউকেই আমি দেখি নি। কাউকে বলতে না পারায় আমার মনটা চোলাইকরা মদের মত ফুলে-ফুলে উঠছে। তোমার কাছে বলার ফলে আবার মনটা যেন হালকা হয়ে উঠেছে।

তবে আমি একটা ভুল করেছিলাম। ঘটনাটা শোন। তারপরে আমিও একটা চাল চাললাম। বাইরে যাওয়ার ভান করলাম আমি। বাইরে গেলেই আমার স্ত্রী বাইরে লাঞ্চ খেতে যেত। তাদের ধরার জন্যে একটি বিশেষ রেঁস্তোরার ওয়েটারকে আমি যে ঘুষ দিয়েছিলাম সে কথাটা বলাই বাহুল্য।

ঠিক হল, আমাকে ঠিক সময়ে "প্রাইভেট রুমের" দরজাটা সে খুলে দেবে। উপযুক্ত সময়ে হত্যা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গুলিভরা পিস্তল নিয়ে আমি সটাসট ভেতরে ঢুকে যাব। যা যা ঘটতে পারে কল্পনায় সেগুলি আমি একেবারে ছক ক'রে নিলাম। মনে হল, সমস্ত ঘটনাটা ছবির মত আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। গিয়ে দেখব ছোট একটা টেবিলের ওপরে গ্লাস, বোতল, আর খাবারের প্লেট সাজানো রয়েছে। তার একপাশে সে, আর একপাশে মনত্তিনা। আমাকে দেখে তারা অবাক হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত আমার দিকে ভয়ার্ত নেত্রে তাকিয়ে থাকবে। নড়াচড়ার শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলবে। একটিও কথা না বলে লোকটির মাথা লক্ষ্য ক'রে আমি গুলি করব। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে সে একগুলিতেই ধপাস ক'রে পড়ে যাবে। তারপরে আমি আমার স্ত্রীর দিকে ঘুরে দাঁড়াব। কী ঘটলো, আর কী ঘটতে পারে সেটা যাতে বুঝতে পারে তার জন্যে তাকে এক মিনিট সময় দেব। সহাস্য বদনে, দৃঢ় চিত্তে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াব তার সামনে। সে ভয়ে আর্তনাদ ক'রে আমার মার্জনা ভিক্ষা করবে। আমি তাকে একেবারে হত্যা করব না। দগ্ধে-দগ্ধে মারব। আমাকে তোমার খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু তুমি কি ভাবতে পার এই ব্যাপারে পুরুষ কত কষ্ট পায়। যে নারীকে সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, যাকে সে তার সর্বস্ব উজাড় ক'রে দিয়েছে সেই মেয়ে তোমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে আর একজনের অঙ্কশায়িনী হবে একথা তুমি ভাবতে পার? যে পুরুষকে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তার পক্ষে যেকোন কাজ করা সম্ভব। আমি অবাক হয়ে ভাবি, হত্যা করার নেশা কত কমে গিয়েছে আজকাল। কারণ, যারাই এইভাবে প্রতারিত হয়েছে তাদেরই মাথায় হত্যা করার নেশা জাগে; নিজের ঘরে, অথবা, পথে-প্রান্তরে হত্যার চিন্তায় মসগুল হ'য়ে থাকে তারা।

রেঁস্তোরায় হাজির হয়ে ওয়েটারের সঙ্গে চোখাচোখী হতেই বুঝতে পারলাম দু'জনেই যথাস্থানে হাজির হয়েছে। শক্ত হাতে রিভলবাটি ধরে আমি দৃঢ়পায়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

যথাসময়েই হাজির হয়েছিলাম আমি। তখন তারা পরস্পরকে চুমু খাচ্ছিল। কিন্তু একি! এতো মনতিনা নয়—এ যে সেই ছেষট্টি বছরের বুড়ো জেনারেল ঃক্লেচি। মনতিনাকেই যে দেখব সেবিষয়ে আমি এতই নিশ্চিৎ ছিলাম যে বৃদ্ধটিকে দেখে আমার সমস্ত পরিকল্পনা কেমন যেন ভেস্তে গেল। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

তা ছাড়া···তা ছাড়া···এ-ব্যাপার যে কেমন ক'রে ঘটতে পারে তা আমি আজও বুঝতে পারি নি। মনতিনাকে দেখতে পেলে রাগে আমি উন্মত্ত হয়ে উঠতাম ঠিকই; কিন্তু এ যে অন্য ব্যাপার? এই বৃদ্ধ, লম্বোদর, ঝোলা গাল চেহারার লোকটাকে দেখে বিরক্তিতে আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। আর ওই শিশুটা—দেখতে পনের বছরের কিশোরীর মত—সেই মেয়েটি এইরকম মৃত্যু-পথযাত্রী একটি বৃদ্ধের কাছে আত্মসমর্পণ করল! কারণ, লোকটা একটা মার্কুই, একজন জেনারেল, গদীচ্যুত রাজাদের আত্মীয় বলে? ওদের দেখে কী যে তখন আমার মনে হয়েছিল সেকথা আজ আর আমার মনে নেই। একটা বুড়ো মানুষকে আমি মেরে ফেলতে পারিনে। না, না—সে কাজটা মোটেই রুচি-সম্মত হবে না। আমার স্ত্রীকে হত্যা করার বাসনা আর আমার রইল না। সব মহিলারাই এই একই গোত্রের। আর কারও ওপরে আমার কোন বিদ্বেষ রইল না। এই চরম বীভৎসতায় জীবন সম্বন্ধে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম।

পুরুষদের সম্বন্ধে যা হয় তুমি ভাবতে পার; কিন্তু মনের দিক থেকে তারা এত নোংরা নয়। এরকম পুরুষ যদি কেউ থাকে তাহলে বিশ্বের উপহাস তাকে কুড়োতে হয়। কোন বৃদ্ধার স্বামী অথবা প্রেমিক চোরের চেয়েও বেশী উপহাসের পাত্র। সত্যি কথা বলতে কি পুরুষরা অনেক সভ্য; কিন্তু মেয়েদেয় হৃদয় কদর্য—তারা সব বারবণিতার দল। অতি ঘৃণ্য কারণে যুবক অথবা বৃদ্ধ যেকোন মানুষের কাছেই তারা আত্মবিক্রয় করতে পারে—কারণ এইটাই তাদের নেশা, তাদের পেশা—তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপাদান। জাতিগতভাবে এরাই হচ্ছে নির্বিকার বিবেকহীন বেশ্যা—প্রেম বিক্রী করাই এদের একমাত্র কাজ—তা পয়সা নিয়ে কোন বৃদ্ধের কাছেই হোক, অথবা, প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্যে কোন কামার্ত পুরুষের কাছেই হোক।"

প্রাচীন যুগের পয়গম্বরের মত ক্রুদ্ধকণ্ঠে নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠলো। মনের আগুনে জলতে-জলতে রাজাদের রক্ষিতাদের সম্ভ্রান্ত লজ্জাকর কাহিনী বর্ণনা করল; সেসব যুবতীরা প্রেমের উজ্জ্বলতায় বৃদ্ধদের বিয়ে করে তাদের সেই ঘৃণ্য কাহিনী বলতেও সে দ্বিধা করল না।

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কী করলে?

সে শুধু বলল—আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপরেই আমি এখানে এসেছি।

সেই সন্ধ্যাটি আজও আমি ভুলতে পারি নি।

মাদাম হারমেত

[Madame Hermet]

উন্মাদরা আমাকে অভিভূত করে। একটা উদ্ভট স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে রহস্যময় জগতে বাস করে তারা। সে-জগৎ দুর্ভেদ্য—বাতুলতার মেঘে ঘেরা। বাস্তব জগতে তারা যা দেখেছে এইখানে বসে তারা সেইসব জিনিসই নতুন চোখে দেখে। তাদের প্রেম, ভালবাসা, প্রত্যয়, সংশয়—বস্তুজগতের সবকিছু অনুভূতিই অদ্ভুতভাবে তাদের মনে ছায়া ফেলে-ফেলে আসে, আবার মিলিয়ে যায়। বাস্তব জগতের কোন চিন্তা দিয়েই তাদের বিশ্লেষণ করা যায় না। এদের কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছু নেই। এদের অভিধানে 'হ'তে পারে না'—এমন কোন শব্দ নেই। অবাস্তব জগৎই এদের কাছে বাস্তব, অতিপ্রাকৃতই প্রাকৃত। যুক্তিতর্ক যেটা প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সাবলীল কর্মপ্রচেষ্টাকে চিরকাল ব্যাহত ক'রে এসেছে—সেই প্রাচীনতম প্রাচীন যাকে আমরা বিচারবুদ্ধি বলি—আর শুভবুদ্ধি যা আমাদের জীবনের প্রাসাদকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখে—সে সমস্তই তারা ভেঙে চুরে একশা ক'রে দেয়। ফলে বল্গাহীন ঘোড়ার মত সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম ক'রে কল্পনাকে তারা বেপরোয়া ছুটিয়ে দেয়। তাদের জগতে সবকিছুই ঘটে, আর ঘটতে পারে। কল্পনার যাদুতে মুহূর্তের মধ্যে তারা রাজা—বাদশা হয়, দেবতা—দানব হয়; একচ্ছত্র অধিপতি হয় পৃথিবীর। কোন প্রতিবন্ধকতাকেই তারা গ্রাহ্য করে না। বিশ্বের সব আনন্দই তাদের কুক্ষিগত। বিশ্বে একমাত্র তারাই সুখী। কারণ, বাস্তব ব'লে তাদের কাছে কোন পদার্থ নেই। অজানা ঘূর্ণীর উত্তাল তরঙ্গের অতলে ঝাঁপিয়ে পড়ার উত্তেজনা নিয়ে আমি এইসব যাযাবর মনগুলির আশেপাশে দৌড়ে যাই—মিশে যাই তাদের সঙ্গে। এ-তরঙ্গের উৎস কোথায় তা আমি জানিনে, কোথায় এর মোহিমা তাও আমার অজানা।

কিন্তু এইসব পাহাড়ী খাদের ওপরে ঝুঁকে পড়ে কোন লাভ নেই; কারণ এর আদি অন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত। প্রকাশ্য দিবালোকই হোক, অথবা অন্ধকার গুহাই হোক, যেখানে দিয়ে এই স্রোত বয়ে যাক না কেন, তা স্রোত-ই; তার মধ্যে কোথাও কোন ইতর-বিশেষ নেই। তাছাড়া, উন্মাদদের

মনের গতি নিরূপণ করার চেষ্টাও ব্যর্থ। কারণ, সেটি কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এর মধ্যে কোন যুক্তি নেই। অবশ্য এটা নিঃসন্দেহ যে মাঝে-মাঝে ছোট একটা ঢিল ফেললে সেই স্রোতে কিছু-কিছু ঢেউ ওঠে। তবু তারা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। তাই আমি তাদের কাছে দৌড়ে যাই।

একদিন আমি একটি পাগলাগারদে গিয়েছিলাম। একজন ডাক্তার আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন—আসুন, আপনাকে আমি একটি অদ্ভুত রোগীকে দেখাব।

এই বলে একটা ছোট ঘর তিনি খুললেন। ঘরের মধ্যে একটি মহিলা বসেছিলেন। তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি—তখনও দেখতে তিনি সুন্দরী। ছোট একটি আয়নার দিকে তাকিয়ে একটা বেশ বড় আর্ম চেয়ারের ওপরে বসেছিলেন তিনি।

আমাদের দেখেই তিনি উঠে পড়লেন; দৌড়ে পেছনে গিয়ে চেয়ারের ওপর থেকে একটা ঘোমটা তুলে নিজের মুখের ওপরে ঢেকে দিলেন; তারপরে ফিরে এলেন আমাদের কাছে—মাথা নেড়ে আমাদের অভ্যর্থনার জবাব দিলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছেন আজ?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—ভাল নয়, ডাক্তার। মানে খুব খারাপ। মুখের দাগগুলো দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে।

উহুঁ। ভুল দেখেছেন আপনি—ডাক্তারের স্বরে দৃঢ় প্রত্যয়।

ভদ্রমহিলা তাঁর সামনে এগিয়ে এসে বিড়-বিড় ক'রে বললেন—না, ভুল দেখি নি। আজ সকালে দশটা নতুন দাগ আমি গুণেছি—তিনটে ডান গালে, চারটে বাঁ গালে, আর তিনটে কপালে। বিশ্রী, কী বিশ্রী দেখতে। কারও কাছে এই মুখ খুলতে আমার সাহস হয় না; না, না—কারও কাছে নয়—এমন কি আমার ছেলের কাছেও না। আমার শেষ হয়ে গিয়েছে। চির-জীবনের জন্যে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছি আমি।

চেয়ারের ওপরে লুটিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

দেখি, দেখি। আসুন। আমি বলছি, ও কিছু নয়। সামান্য একটু বরিক-লোশন দিয়ে এখনই আমি সব তুলে দিচ্ছি।

ডাক্তারের কথা শুনলেন না মহিলা। আঙুল দিয়ে মুখটাকে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে আঙুল সরানো বড়ই কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ালো। আবার ডাক্তার তাঁকে তোয়াজ করতে লাগলেন—হাতটা সরান, সরান। আপনি জানেন, কতবারই তো আপনার মুখের দাগ আমি মুছে নিয়েছি। হাত না সরালে রোগ সারাবো কেমন ক'রে?

কিন্তু ওই ভদ্রলোককে যে চিনিনে।

উনি-ও যে ডাক্তার; আমার চেয়ে বড় ডাক্তার।

এই শুনে তিনি ঘোমটা খুললেন। কিন্তু মুখটা দেখানোর জন্তে তিনি লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন। লজ্জায় তিনি মুখটা নামালেন একবার ডান দিকে একবার বাঁ দিকে মুখটা ঘোরালেন; তারপরে, বিড়-বিড় ক'রে বললেন—আপনাদের আমার এই বিকৃত মুখটা দেখতে দিতে বড় কষ্ট হচ্ছে। কী ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে, তাই না?

অবাক হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এ কি ব্যাপার! মুখের ওপরে তাঁর একটা দাগ-ও তো নেই।

চোখ দুটো নামিয়ে আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমার ছেলের শুশ্রূষা ক'রেই এই রোগটা আমার হয়েছে। তাকে আমি বাঁচালাম বটে; কিন্তু আমি বিকলাঙ্গ হ'য়ে গেলাম। সেই হতভাগ্য ছেলেটির জন্যে আমার সৌন্দর্য নষ্ট হল। যাই হোক, আমি আমার কর্তব্য করেছি; আমার বিবেক আজ শান্ত। আমি শান্তি পাচ্ছি কেন তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন।

ডাক্তার তাঁর পকেট থেকে সরু একটা বুরুশ বার ক'রে তাঁর মুখের ওপরে বুলিয়ে দিলেন। মনে হল, মুখের ওপরে ফোঁটা-ফোঁটা রঙ ঢেলে দিয়ে গাল দুটোকে তিনি পালিশ করিয়ে দিচ্ছেন। তারপরে তিনি বললেন—এবার দেখুন; আর একটা দাগ-ও নেই।

ভদ্রমহিলা আয়নাটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মুখের চারপাশটা দেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—না, নেই। ধন্যবাদ।

আমাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার; তারপরে বললেন—এই মহিলাটির ভয়ানক কাহিনী আমি আপনাকে বলব।

এঁর নাম মাদাম হারমেত। যৌবনে খুব সুন্দরী ছিলেন ইনি; প্রেমের ছলনায় ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। অনেকেই এঁকে ভালবাসত; জীবনকে ভোগ করার এঁর আকাঙ্খা ছিল অসামান্য। শরীরকে সুন্দর ক'রে রাখার চেষ্টায়, হাত, মুখ, দাঁতকে পরিচ্ছন্ন রাখার উন্মাদনায় তিনি একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। একটিমাত্র পুত্র-সন্তান নিয়ে তিনি বিধবা হন। বহু প্রশংসিতা রমণীর পুত্রের মত সেই ছেলেটিও মানুষ হ'য়ে উঠেছিল। ইনি নিজের সন্তানটিকেও বড় ভালবাসতেন।

ছেলেটির বয়স বাড়তে লাগল। সেই সঙ্গে বার্দ্ধক্যের দিকে এগিয়ে গেলেন মাদাম। সেই সংকটময় মুহূর্তটি তাঁর জীবনে এগিয়ে আসছে বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কি না তা আমি জানিনে। অন্য সকলের মত তিনিও কি প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতেন; বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চামড়াও যে ফ্যাকাশে হ'য়ে আসছিল, চোখের কোণে সামান্য কালির ছাপ পড়ছিল, কপালের ওপরে সূক্ষ্ম বলিরেখার আবির্ভাব ঘটছিল সেটা কি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন? আর এগুলিও যে ক্রমশ যত দিন যাবে ততই তাঁর দেহের ওপরে কায়েমী হয়ে বসবে সে-সম্ভা-

বনার কোন পদধ্বনিও কি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন ? অথবা, সেই নিষ্ঠুর অনিবার্য বার্দ্ধক্যের, যে-বার্দ্ধক্যের গতি কেউ রোধ করতে পারে না, বিলম্বিত তির্যক রেখাগুলি তিনি স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলেন ? ধীরে-ধীরে সৌন্দর্য-বিনাশের যন্ত্রণা তাঁকে কি দগ্ধ করত ? তিনি কি আয়নার মধ্যে নিজের দেহটাকে বারবার দেখতেন ? ক্রোধে আত্মহারা হয়ে কি সেই আয়নাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন সোফার ওপরে ? তারপরে আবার সেটিকে তুলে নিয়ে মুখ দেখতে শুরু করতেন ? তাঁর চোহারার ওপরে মহাকালের ছাপ পড়ছে দেখে আর্তনাদ ক'রে উঠতেন ? কোন কারণ না দেখিয়ে দিনের মধ্যে হাজার বার কি তিনি ড্রয়িংরুম থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিতেন ? দেহের কোন্ অংশে কাল গভীর রেখাপাত ক'রে তা তিনি জানতেন, কোথায় তার দাঁত গভীর ক্ষতচিহ্ন রেখে যায়। কালের এই আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই বুঝতে পেরে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন ; সেই ভগবানের কাছে, যে ভগবান তাঁর সৃষ্টিকে সুন্দর ক'রে সৃষ্টি করেন এবং তারপরে তাকে বিনষ্ট ক'রে চরম নির্দয়তার পরিচয় দেন—সেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার ভঙ্গীতে হাঁটু মুড়ে বসে চোখের জল ফেলতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দেহসুষমা অটুট রাখার জন্যে তিনি কি ভগবানের কাছে আর্জি পেশ করতেন ? এইসব মানসিক যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হোত।

তারপরে একদিন (বয়স তখন তাঁর পঁয়তিরিশ) তাঁর পনের বছরের পুত্রটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুখটা তার কী ডাক্তাররা তা ধরতে পারেন নি। ছেলেটি শয্যাশায়ী হল। তার শিক্ষক, একজন ফরাসী ধর্মযাজক তার বিছানার পাশে বসে-বসে তার পরিচর্যা করতে লাগলেন। সকাল-সন্ধ্যায় একবার ক'রে সেই ঘরে ঢুকে মাদাম তার খবরাখবর নিতেন।

সকালবেলা প্রসাধনপর্ব সেরে ড্রেসিং গাউন পরে তিনি আসতেন ; তারপরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করতেন—জর্জ, আজ একটু ভাল আছ ?

সেই সুবেশ দীর্ঘায়ত তরুণটির মুখটা ফুলে উঠেছিল ; কৃশ হয়েছিল জ্বরের প্রকোপে। সে বলত—হ্যাঁ, মা ; আজ একটু ভাল।

সেই ঘরে সামান্য কিছুক্ষণ তিনি দাঁড়াতেন, ওষুধপত্রের শিশিগুলি বিরক্তির সঙ্গে নাড়াচাড়া করতেন একটু ; তারপরে হঠাৎ ব্যস্ততা দেখিয়ে বলতেন—"হাই মা ! একটা বেশ দরকারী জিনিস ভুলে গিয়েছি।" এই বলে প্রভাতী প্রসাধনের সুবাস পেছনে ছড়িয়ে তিনি দ্রুত বেরিয়ে যেতেন ঘর থেকে।

সন্ধ্যার সময় সান্ধ্য গাউন চড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে তিনি আসতেন—কারণ এ ঘরে ঢুকতে সব সময়েই তাঁর দেরী হোত ; মনে হোত, সকালের চেয়েও

তিনি অনেক বেশী ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করতেন—ডাক্তার কী বলেন ?

ধর্মযাজকটি উত্তর দিতেন—ভাল নয়। এখনও রোগটা তিনি ধরতে পারছেন না।

এরপরেই একদিন সন্ধ্যায় ধর্মযাজকটি তাঁকে বললেন—মাদাম, আপনার ছেলের বসন্ত হয়েছে।

একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ ক'রে তিনি সেখান থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। পরের দিন সকালে পরিচারিকা তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলো তিনি জেগে রয়েছেন, ঘুমের অভাবে তাঁর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে; বিছানার ওপরে শুয়ে-শুয়ে তিনি কাঁদছেন।

দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—জর্জ কেমন আছে ?

ভাল নেই, মাদাম। মোটেই ভাল নেই।

দুপুরের আগে সেদিন তিনি আর বিছানা ছেড়ে উঠলেন না; এক কাপ চায়ের সঙ্গে মাত্র দুটি ডিম খেলেন। মনে হল, তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তারপরে কেমন ক'রে বসন্তের ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে বাঁচানো যায় এই উদ্দেশ্যে জনৈক কেমিষ্টের শরণাপন্ন হলেন তিনি। ডিনারের আগে সেদিন আর তিনি ফিরলেন না। নিয়ে এলেন এক-গাদা ওষুধপত্র। বসন্তের ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করার জন্যে নিজের শরীরটাকে ভিজিয়ে রাখলেন তিনি।

ডাইনিঙ রুমে ধর্মযাজকের সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছে ?

ভাল নেই। ডাক্তাররা বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

মাদাম কাঁদতে লাগলেন; কিছুই খেলেন না।

পরের দিন সকালে সংবাদ কী জেনে পাঠালেন। সংবাদ ভাল নয়, সেদিনটা তিনি আর বাইরে বেরোলেন না। সারা দিন ঘরের মধ্যে নানা-রকম তীব্র গন্ধ-দ্রব্য পোড়ালেন—ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার ঘর। তাঁর পরিচারিকার কাছে শোনা যায় সেদিনটা তাঁর ঘর থেকে চাপা গোঙানি শোনা গিয়েছিল।

এইভাবে একটা সপ্তাহ কেটে গেল। প্রতিটি ঘণ্টায় তিনি সংবাদ জানতে পাঠান। সংবাদ আসে রোগী ক্রমশঃ খারাপের দিকে চলেছে।

এগার দিনের দিন ধর্মযাজক তাঁর ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর থমথমে। বসার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তিনি বসলেন না, বললেন—মাদাম আপনার পুত্র ভয়ানক পীড়িত। সে আপনাকে একবার দেখতে চায়।

মাদাম চীৎকার ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে হাঁটু মুড়ে ব'সে বললেন—হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, আমার ওঘরে যেতে সাহস হচ্ছে না। হে ঈশ্বর, আমাকে তুমি শক্তি দাও।

যাজক বললেন—মাদাম, ডাক্তারেরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন। জর্জ

আপনার জন্তে অপেক্ষা করছে।

ঘণ্টা দুই পরে সময় ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে জর্জ আবার তার মাকে ডেকে পাঠালো।

তিনি চীৎকার করে বললেন—আমি পারব না; পারব না। আমার ভীষণ ভয় করছে।

ধর্মযাজক তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিছু হল না তাতে। বরং উন্মাদের মত চেঁচাতে লাগলেন তিনি। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার এসে সব শুনলেন। নিজে তিনি মাদামের কাছে গিয়ে মৃত্যুপথ-যাত্রী পুত্রের কাছে আসার জন্তে তাঁকে অনুরোধ করলেন। কোন ফল হল না। তিনি তাঁকে চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। পারলেন না আনতে। মাদাম ডাক্তারের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে চীৎকার ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—না, না; সে মারা যাচ্ছে না, সে মারা যাচ্ছে না। দয়া ক'রে তাকে বলুন, আমি তাকে ভালবাসি, খুব ভালবাসি।

ছেলেটির সময ঘনিয়ে এল। এতদিন মাকে দেখতে না পেয়ে সে-ও সত্যি কথাটা বুঝতে পারল যে বসন্ত রোগের ভয়ে তিনি আসতে ভয় পাচ্ছেন। তাই সে একটা শেষ অনুরোধ জানাল—মা যদি আসতে ভয় পান তাহলে একবার তাঁকে আমার জানালার সোজা বারান্দায় দাঁড়াতে বলুন। তাঁর কাছ থেকে আমি শেষ বিদায় নিয়ে যাই; কারণ এখন আর তাঁকে আমি চুমু খেতে পারব না।

রাজি হলেন মাদাম শেষ পর্যন্ত। গোটা গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে এক বোতল স্মেলিং সল্ট নিয়ে বারান্দার ওপরে তিন-পা এসেই আবার তিনি ভয়ার্ত চীৎকার ক'রে উঠলেন—না, না। ওর দিকে চেয়ে থাকতে পারব না আমি। না, না। আমি লজ্জিত; আমি ভয়ার্ত···না ··না···

সবাই মিলে তাঁকে টেনে আনতে চেষ্টা করল; কিন্তু দুটো হাত দিয়ে বারান্দার শিকগুলো এমন শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরলেন যে তাঁকে আর একটি পা-ও এগিয়ে আনা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ালো। তাঁর সেই মর্মভেদী চীৎকারে রাস্তায় লোক জমে গেল। ব্যাপারটা কী জানার জন্তে ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল তারা।

মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রটি সেইদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল; শেষবারের মত তার মায়ের সুন্দর মুখটি দেখার ব্যাকুলতা হয়ত তার মনের মধ্যে গুমরে-গুমরে উঠছিল; অনেকক্ষণ ব্যর্থ অপেক্ষার পরে রাত্রি নেমে এল। একটি দীর্ঘ করুণ নিঃশ্বাস ফেলে সে পাশ ফিরে শুলো। আর কারও সঙ্গেই সে কোন কথা বলে নি।

রাত্রি শেষ হয়ে প্রভাত হ'ল। ছেলেটি মারা গেল। পরের দিনই মাদাম উন্মাদ হ'য়ে গেলেন।

চিরনিদ্রার ঠিকানা

[The putter to sleep]

আমার বাড়ির সামনে দিয়ে সীন নদী সোজা বেরিয়ে গিয়েছে; কোথাও এতটুকু বাঁক নেই। প্রভাত সূর্যের রঙিন আভায় তার জল লালিমাময় হয়ে উঠেছে। রূপোর মত চকচকে জল; মাঝে-মাঝে একটু ঘোলাটে। নদীর ওপারে সবুজ বনানী অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রতিদিন সকালেই আমার খবরের কাগজ আসে। সেদিনও এসেছিল। সেই কাগজটা নিয়ে আমি নদীর বাঁধের ওপরে বেড়াতে বেরোলাম। শান্ত, নির্জন পরিবেশ। খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে হাঁটতে লাগলাম।

খবরের কাগজটা খুলতেই প্রথম যে ক'টি কথা আমার চোখে পড়ল—তা হচ্ছে "আত্মহত্যার হিসাব।" আমি দেখলাম এই বছরে সেই হিসাবমত আত্মহত্যার সংখ্যা হচ্ছে আট হাজার পাঁচশ'।

সেই মুহূর্তে আমি তাদের দেখতে পেলাম। জীবনে বীতস্পৃহ হ'য়ে যে অসংখ্য মানুষ মরিয়া হ'য়ে আত্মহত্যা করছে তাদের যেন আমি চোখের ওপরে দেখতে পেলাম। আমি সেই রক্তাক্ত মানুষদের দেখলাম, তাঁদের চোয়ালগুলি ভেঙে গিয়েছে, গুঁড়িয়ে গিয়েছে তাদের মাথার খুলি, বুলেট বিঁধেছে বুকে। হোটেলের ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে নিঃসঙ্গ এই মৃত্যুপথযাত্রীদের আর্তনাদ আমি শুনতে পেলাম। নিজেদের ক্ষত আর দুঃখ ছাড়া আর কিছুই তারা চিন্তা করতে পারে না।

কিছু লোককে আমরা দেখলাম—গলাকাটা অবস্থায় তারা প'ড়ে রয়েছে, নাড়িভুঁড়ি তাদের সব বেরিয়ে গিয়েছে। তাদের হাতে তখনও পর্যন্ত রুটি কাটা ছোরা অথবা দাড়ি-কামানো ব্লেড ধরা। আর কয়েকজনকে দেখলাম—লাল চিহ্ন-আঁটা ছোট-ছোট বোতল সামনে নিয়ে বসে রয়েছে। একদৃষ্টিতে সেই গ্লাসের দিকে রয়েছে তাকিয়ে। তারপরে মুখটা বিকৃত করবে তারা—ঠোঁট-দুটোকে কোঁচকাবে। মৃত্যু হওয়ার আগে কতটা যন্ত্রণা তাদের ভোগ করতে হ'বে তারা তা জানে না। অনাগত সেই ভয়ের ছায়া তাদের চোখের ওপরে ভেসে উঠেছে। তারপরে তারা উঠে দাঁড়াবে, যন্ত্রণাটাকে রুখবার জন্যে পেট চেপে ধরবে, সমস্ত দেহটা ভেতরে-ভেতরে জ্বলে যাবে; তারপরে অচৈতন্য হওয়ার আগে যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে তারা মাটির ওপরে গড়াগড়ি দেবে।

আর কিছু মানুষকে দেখলাম যারা দেওয়ালের পেরেক থেকে লম্বমান হ'য়ে

ঝুলছে ; অথবা, জানালায় দড়ি বেঁধে, অথবা ভেতরে ছাদ থেকে ; অথবা গাছের ডালে গলায় শক্ত সুতো বেঁধে অন্ধকারে ঝুলছে তারা। মৃত্যুর আগে, নিশ্চল হ'য়ে যাওয়ার আগে, গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়ার আগে তারা যে অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করত সে সবই আমি উপলব্ধি করছিলাম। দড়িটা বাঁধার আগে, দড়িটা শক্ত বাঁধা হয়েছে কিনা তা বোঝার আগে, গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ার আগে, তাদের শেষ দ্বিধার আগে তাদের হৃদয়ে যে নির্মম যন্ত্রণা হয়েছিল সে সবই আমি অনুমান করতে পারলাম। অভুক্ত বৃদ্ধদের মৃতদেহে, ব্যর্থ প্রেমিকার শক্ত মৃতদেহ—আমি বেশ দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম সেই মৃতার ঘরে দগ্ধ কয়লা থেকে যে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তা-ও।

আরও কাউকে-কাউকে দেখলাম। অন্ধকার রাত্রিতে পরিত্যক্ত নির্জন সেতুর ওপরে পায়চারি করছে। আত্মহত্যাকারীদের তালিকায় এরাই দুর্বৃত্ত শ্রেণীর। মৃদু-মৃদু শব্দ ক'রে পুলের নীচে দিয়ে নদীর স্রোত ব'য়ে চলেছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না তারা ; তবে বুঝতে পারছে সব যে নীচে নদী রয়েছে। ঠাণ্ডা কনকনে জল, এরই মধ্যে তারা ঝাঁপাতে চায় ; কিন্তু ভয় পাচ্ছে তারা। দূর থেকে সময় এগিয়ে যাওয়ার শব্দ হচ্ছে। তারপর হঠাৎ সর্বশক্তি সংহত ক'রে নিয়ে চোখ-কান বুজে ঝাঁপ দিল তারা ; ছলাং ক'রে শব্দ হ'ল একটা—ভয়ার্ত আর্তনাদ উঠল কয়েকটা—শব্দ হ'ল হাত দিয়ে জল টানার। কখনও-কখনও তা-ও হ'ল না ; হ'ল মাত্র একটি ঝাঁপ দেওয়ার শব্দ। তাদের হাত বা পা ভারি পাথর দিয়ে বাঁধা থাকায় পড়ামাত্র মুহূর্তের মধ্যেই তলিয়ে গেল তারা।

হায়, হতভাগ্য, দুঃস্থ, দুঃখ-জর্জরিত মানবআত্মা, তোমাদের সেই মর্মভেদী আর্তনাদ আমার মর্মে গিয়ে বিঁধেছে ; তোমাদের সঙ্গে আমিও মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করছি। তাদের দুঃখ কষ্ট, তাদের ওপরে যে অত্যাচার হয়েছে তা সবই একটি ঘণ্টার মধ্যে আমি সব ভোগ করছি। যে দুঃখ তাদের এইসব পথে পরিচালিত করেছে তাদের আমি জানি ; 'জীবনের এই অধঃপতন এর আগে আর কোনদিনই আমি এমন ক'রে অনুভব করি নি। এইসব ভাগ্যহত, বিড়ম্বিত মানুষ যারা কোনদিনই প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, মায়া সহানুভূতি পায় নি, যাদের আশা মরীচিকার নামান্তর মাত্র। যাদের জীবন নিষ্ঠুর ট্র্যাজিডি ছাড়া আর কিছু নয়, যাদের জীবনে কমেডি কেবল উপহাস-মাত্র—তাদের আমি চিনি।

আত্মহত্যা ! আত্মহত্যা করার শক্তি তাদেরই থাকে বেঁচে থাকার জন্যে যাদের কোন শক্তি থাকে না। জীবনে যাদের বিশ্বাস নেই, দুর্ভাগ্যকে পরাজিত করার দুর্জয় সাহস যাদের নেই, আত্মহত্যার ওপরে তাদের বিশ্বাস কী অগাধ ! হ্যাঁ ; এই দুঃখের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র দরজা ওই

আত্মহত্যা। এই একটিমাত্র করুণাই প্রকৃতি তাদের ওপরে দেখিয়েছে। আমাদের অন্ধকারায় বন্ধ ক'রে রাখে নি। এই হতভাগ্য মরিয়া মানুষদের, হে ঈশ্বর, তুমি দয়া করো। দুঃস্থ হতভাগ্যদের তুমি মুক্তি দাও, শান্তি দাও। এই জগৎ ছেড়ে চলে যাওয়ার শক্তি তাদের রয়েছে বলেই ভয় করার কিছু তাদের নেই, বিশেষ ক'রে যখন তাদের পিছনে এমন একটি দরজা রয়েছে যাকে ঈশ্বরও বন্ধ ক'রে দিতে পারেন না।

এইভাবে যারা মৃত্যু কামনা করেছিল সেই বিরাট মৃতের জনতা—বাৎসরিক সংখ্যা যার সাড়ে আট হাজারের কাছাকাছি—তাদের কথা আমি চিন্তা করলাম। মনে হল, এ-বিশ্বের দরবারে তারা একটি আর্জি নিয়ে হাজির হয়েছে। সেই সমস্ত আহত, নিহত, ছিন্নমস্তা, ছিন্নোদর—সেইসব মৃতেরা যারা বিষের জ্বালায় মরেছে, মরেছে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে, জলে ডুবে মরেছে, গলায় ফাঁস দিয়ে জীবনান্ত হয়েছে যাদের—তারা সবাই দলবদ্ধ হ'যে ভয়ঙ্কর চীৎকার ক'রে বলছে—আমাদের অন্ততঃ শান্তভাবে মরতে দাও; তোমরা আমাদের বাঁচতে সাহায্য কর নি; মরতে একটু সাহায্য কর অন্তত। আমাদের সংখ্যা কত তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই স্বাধীনতার যুগে, এই দার্শনিক মুক্তি আর সাধারণতন্ত্রের যুগে আমাদের জন্যে কথা বলার অধিকার আমাদের রয়েছে। যারা জীবন পরিত্যাগ করেছে মৃত্যুর করুণা থেকে তাদের বঞ্চিত করো না—এ-মৃত্যু বীভৎস-ও নয়, ভয়ঙ্করও নয়।

স্বপ্ন দেখলাম মুহূর্তের মধ্যে আমি একটি সুন্দর শহরে পৌচেছি। শহরের নাম প্যারিস; কিন্তু কবেকার প্যারিস? বসতবাড়ির দিকে তাকিয়ে, থিয়েটারের দিকে তাকিয়ে, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে তাকিয়ে আমি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছিলাম; হঠাৎ একটা পার্কের মধ্যে বিরাট, সুন্দর একটি প্রাসাদের সামনে হাজির হলাম। বাড়িটার সামনে জলজলে কি লেখা রয়েছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। লেখাটি হচ্ছে—'আত্মহত্যা করার প্রতিষ্ঠান।' অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখাটা কত মধুর! মানুষের আত্মা এই সময়ে অবাস্তব, অথচ, সম্ভাব্য বাস্তবের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। কোন কিছুই তাকে তখন অবাক করে না; কোন কিছুই ভয়ানকভাবে ধাক্কা দেয় না তার মনকে।

সামনে এগিয়ে গেলাম। মনে হ'ল ক্লাবের মত একটা জায়গা। সামনেই পায়জামা পরা কয়েকজন দরোয়ান বসে রয়েছে। আমাকে এপাশে-ওপাশে তাকাতে দেখে একজন জিজ্ঞাসা করল—স্যার, আপনি কিছু চান?

এই বাড়িটা কী তাই আমি জানতে চাই।

আর কিছু নয়?

না।

সম্ভবত, এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর কাছে আপনি আমার সঙ্গে যেতে

চান—তাই না স্যার?

একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি বিরক্ত হবেন না?

না, না, স্যার। মোটেই না। যাঁরা কিছু জানার জন্যে এখানে আসেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করাই তো তাঁর কাজ।

বহুৎ আচ্ছা। চল, যাচ্ছি।

একটা বারান্দা দিয়ে সে আমাকে নিয়ে গেল। দেখলাম সেখানে কয়েকটি বৃদ্ধ বসে-বসে গল্প করছেন। তারপরে কালো কাঠ দিয়ে সাজানো বেশ ভারিক্কিগাছের সুন্দর ছোট একটি ঘরে আমরা ঢুকলাম। সেইখানে মেদবহুল স্ফীতোদর একটি যুবক দামী সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে চিঠি লিখছিলেন।

আমাকে দেখেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। অভিবাদন প্রতি-অভিবাদন শেষ হ'ল আমাদের, দারোয়ানটি চলে গেল। তারপরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কীভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি?

বললাম—আমার এই অবিবেচনা আপনি ক্ষমা করবেন, স্যার। এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান আর কখনও আমি দেখি নি। বাড়ির সামনে ওই লেখাটি দেখেই আমি অবাক হয়েছি। ওই লেখাটির অর্থ কী?

তিনি একটু হাসলেন; তারপরে আমার প্রশ্নে সন্তুষ্ট হয়ে নীচু গলায় তিনি বললেন—ব্যাপারটা কী জানেন স্যার? যারা আত্মহত্যা করতে এইখানে আসে তাদের সুন্দরভাবে আর শান্তিতে হত্যা করা হয়; অবশ্য সেই হত্যা যে সুখের সেকথা আমি বলছিনে।

তাঁর কথা শুনে আমি বিচলিত হলাম না। আমি অবাক হলাম, এই কথা ভেবে যে আমাদের এই নিচুমানের বাস্তব জগতে মানুষের সত্যিকার মুক্তি-প্রয়াসী এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কী ক'রে এ সম্ভব হ'ল বলুন তো?

তিনি বললেন—১৮৮৯ সালের প্রদর্শনীর পর থেকে আত্মহত্যার সংখ্যাটা এত তাড়াতাড়ি বেড়ে গেল যে অনতিবিলম্বে এর একটা ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল। পথে-প্রান্তরে, পার্টিতে-রেঁস্তোরায়, রেলের কামরায়—যত্রতত্র মানুষের আত্মহত্যার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে মেতে উঠল। আমার মত যারা জীবনদরদী একমাত্র তাদের চোখেই যে এই দৃশ্যটা কুৎসিত দেখাল তাই নয়—শিশুদের কাছেও এটা একটা কুৎসিত দৃষ্টান্তে পরিণত হল। সেইজন্যে আত্মহত্যাগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

হঠাৎ আত্মহত্যার এত হিড়িক পড়ে গেল কেন বলুন তো?

সেবিষয়ে আমার ধারণা বেশ স্পষ্ট নয়। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীটা পুরনো হ'য়ে গিয়েছে। এ জীবনটাকে আর আমাদের ভাল লাগছে না। আমাদের ভাগ্যই বলুন, অথবা সরকারের ভবিষ্যতই বলুন—দুই-ই এক। আমরা বুঝতে পেরেছি সবাই আমাদের ঠকাচ্ছে। সেইজন্যেই আমরা এই

পৃথিবী ছেলে চলে যেতে চাই। যখন দেখি ভগবান-ও সাধারণ মানুষের মত আমাদের প্রতারণা করছেন—এবং আইনসভার প্রতিনিধিদের মত আমরা যখন তাঁকে অপদার্থ ব'লে সরিয়ে আনতে পারিনে তখন আমরা এই অধন্ত পৃথিবী থেকে পালিয়ে যেতে চাই।

বলেন কী ?

অন্ততঃ, এদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতিটা আমাকে বলবেন ?

নিশ্চয়। আমাদের সমাজে যাঁরা গণ্যমান্য ব্যক্তি—উচ্চশিক্ষিত, এবং অবিতর্কিত মেধা যাঁদের তাঁরাই এটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তারপরে হো-হো ক'রে হেসে তিনি বললেন—আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলতে পারি মানুষে এটিকে বেশ খুশি মনেই গ্রহণ করেছে। এইখানেই তারা মরতে চায়।

আপনি আমাকে অবাক করলেন।

না-না। অবাক হওয়ার কিছু নেই। মৃত্যুটা কদর্য, ভয়ানক। এখানে যাঁরা নাম লেখান তাঁদের কাছে এটা আদৌ ভয়ানক নয়।

কিন্তু যাঁরা মরতে চান না তাঁরা কি এখানকার সদস্য হওয়ার যোগ্য নয় ?

সেরকম কোন বাধ্যবাধকতা এখানে নেই।

কার নির্দেশে এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে ?

জেনারেল বোলাঞ্জারের নির্দেশে। কারও আর্জিকেই তিনি নাকচ ক'রে দিতে পারতেন না। সত্যি কথা বলতে কি এটাই তাঁর সবচেয়ে ভাল কাজ। প্যারিসের কেন্দ্রভূমিতে ঘৃণ্য মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাঁরা একটি মন্দির গড়তে চেয়েছিলেন সেইসব ভূয়োদর্শী, অকলঙ্ক চরিত্রের নাস্তিক মনীষিরাই এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করেছেন। প্রথম-প্রথম এখানে কেউ আসতে চাইত না; তাই দেখে উদ্যোক্তারা প্যারিসের মধ্যে যত গণ্যমান্য ব্যক্তি রয়েছেন, যত শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, রাজনীতিবিদ রয়েছেন সবাইকে নিয়ে বিরাট একটি জনসভা ক'রে এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত অর্থ টি সকলের কাছে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন; বেকির নাটক অভিনীত হল, প্রথমে অংশ্য নাটকগুলি ভাল জমে নি; কিন্তু পরে সেগুলি এতই জনপ্রিয়তা লাভ করছিল যে অনতিবিলম্বেই সারা প্যারিস শহরটি গম-গম ক'রে উঠল। তারপরে আস্থা এল জনতার, তখনই প্রতিষ্ঠা হল ক্লাবের।

সেই আনন্দোৎসবের ভেতরে কী নারকীয় উপহাস !!

মোটেই না, মোটেই না। মৃত্যুর মধ্যে বিষাদটা কোথায় ? মৃত্যুর বিষয়ে সবাই উদাসীন, আমরা মৃত্যুর বোঝা কমিয়ে তাকে প্রস্ফুটিত করেছি। তার গায়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে তাকে সহজ মনোগ্রাহী ক'রে তুলেছি।

মানুষ তা বিশ্বাস করে ?

আগে করত না; এখন করে। এখন তারা আসে ঝাঁকে-ঝাঁকে—গড়-পড়তা রোজ চল্লিশের ওপরে। আজকাল সীন নদীতে মৃতদেহ আর দেখাই যায় না।

প্রথমে কে এসেছিল?

আমাদের ক্লাবেরই একজন সদস্য—জুয়া খেলে-খেলে লোকটা ধ্বংসের প্রান্তসীমায় এসে পৌচেছিল। দ্বিতীয়টি হল একজন ইংরেজ—কেমন যেন এক-বগগা লোকটি। এরপরে খবরের কাগজে আমরা জোরসে প্রচার অভিযান চালালাম। কীভাবে মানুষকে আমরা হত্যা করি সেই প্রক্রিয়াটি লোকের কাছে আকর্ষণীয় ক'রে সবাইকে আমরা জানালাম। তবে এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের বেশীর ভাগই হচ্ছেন ওই নীচু স্তরের।

আপনাদের রীতিটি কী?

ঘুরে দেখতে চান?

খুশি হই।

একটার পর একটা ঘর তিনি আমাকে দেখাতে লাগলেন। প্রতিটি ঘরের মধ্যে লোকে আনন্দের সঙ্গে হই-চই করছে। এমন জীবন্ত ক্লাব—এত আনন্দে মুখর ক্লাব আমি খুব কমই দেখেছি।

আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন—মৃত্যুকে উপহাস করার জন্যে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ এখানে আনন্দ করতে আসে। একবার এখানে এসে পৌঁছলে তারা যে ভয় পায় নি সেটা প্রমাণ করার জন্যেই তাদের আনন্দ করতে হয়। সেইজন্যেই তারা হাসি-ঠাট্টা করে, আনন্দ করে, হইচই করে, ভাঁড়ামি করে। বর্তমানে প্যারিসের মধ্যে সবচেয়ে জম-জমাট জায়গা হচ্ছে এইটা। মহিলারাও এখানে তাঁদের জন্যে স্বতন্ত্র একটা জায়গা নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন আজকাল।

এবং তা-সত্বেও আপনাদের এখানে অনেক আত্মহত্যা হয়?

প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। উঁচু তলার মানুষ এখানে কমই আসেন। সবচেয়ে বেশী আসে দরিদ্রদের সমাজ থেকে; মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে যে বেশকিছু আসেনা সেকথা সত্যি নয়।

কীভাবে কাজটা সুসম্পন্ন করেন আপনারা?

শ্বাসরোধ করে।

যন্ত্রটা কী রকম?

আমাদেরই নিজস্ব তৈরি একজাতীয় গ্যাস দিয়ে। এ জিনিসটা যে কী বস্তু তা এক আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। এই বাড়ির অন্তদিকে তিনটে ছোট-ছোট দরজা আছে। সেখান দিয়ে আমাদের মক্কেলরা ঢোকে, কেউ দর-জায় ধাক্কা দিলেই আমরা তাকে নানারকম প্রশ্ন করি। তাদের জবাবে খুশি হ'লে তাদের আমরা গ্রহণ করি—এবং প্রায়ই তাদের আমরা উদ্ধার করতে

সমর্থ হই।

টাকা আসে কোথা থেকে ?

আমাদের নিজস্ব টাকা অনেক রয়েছে। সদস্যদেরও চাঁদার হার খুব বেশী। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে দান করাটাও উন্নত রুচির পরিচায়ক। প্রত্যেকটি দাতার নামই আমরা খাতায় ছাপিয়ে রাখি। তাছাড়া, প্রতিটি ধনীকে আত্মহত্যা করার সুযোগ দেওয়ার জন্যে আমরা এক হাজার ক্রাঁ দাবি করি: মাথা উঁচু ক'রেই তাঁরা আত্মহত্যা করেন। দরিদ্রেরা বিনা পয়সায় মরার সুযোগ পায় এখানে।

মানুষ দরিদ্র কিনা তা বোঝেন কেমন ক'রে ?

সেটা আমরা অনুমান করতে পারি স্যার। তাছাড়া, তারা যে দরিদ্র সে সম্বন্ধে পুলিশের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট-ও আমরা নিই। পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়া যে জঘন্য কাজ তা যদি আপনি জানতেন ? সেখানে এক বার মাত্র আমি গিয়েছিলাম। আর কখনও যাচ্ছিনে। ফাঁড়িটা একরকমই। কিন্তু লোকগুলি · !! এইসব দরিদ্রেদের যদি আপনি দেখতেন। ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরা, কতদিন খেতে পায় নি কে জানে, কেউ-কেউ হয়ত রাস্তায় ব'সে খা'য়, অসুস্থ মেয়েমানুষ, পেটের অন্ন তারা সংগ্রহ করতে পারে না। তারা তাদের করুণ কাহিনী বর্ণনা ক'রে বলে—দেখুন, এভাবে বেশী দিন চলতে পারে না। জীবিকা নির্বাহ করার শক্তি আমার নেই। তাদের অবস্থা দেখে কী কষ্টই যে হয়! কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করে—সে -জিনিসটা কোথায় ? তাদের আমরা ঢুকিয়ে নিই। তাইপরেই তার সব শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু জায়গাটা কোথায় ?

আসুন ; দেখাচ্ছি।

এই বলে তিনি আমাকে একটা সুন্দর ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন, চারপাশে তার বসার জায়গা। সুন্দর-সুন্দর ছবি দিয়ে দেওয়ালগুলি আঁটা ; মেঝেতে গালিচা পাতা ; সেখানে রয়েছে সুন্দর-সুন্দর দামী ডিভান, অদ্ভুত সুন্দর পাম গাছ, মিষ্টি গন্ধের ফুল—এসেন্সের শিশি, সিগারের বাক্স—আরও কত কী।

আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমার পথ প্রদর্শক বললেন—এখানে সদস্যরা গল্প করতে আসে কি না তাই ভাবছেন ?

কিন্তু এত গন্ধের সমাবেশ কেন ?

মৃত্যুকে তারা গন্ধে মাতোয়ারা ক'রে রাখতে চায়—সেইজন্যে। আপনি একটু শুঁকবেন ?

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—না, না। এখন নয়।

তিনি হাসতে-হাসতে বললেন—কোন ভয় নেই। আমি নিজেও পরীক্ষা ক'রে দেখেছি।

ভীরুর মত একটু হেসে বললাম—ঠিক আছে।

তাহলে এইখানে বসুন। এটার নাম হচ্ছে—চিরনিদ্রার ঠিকানা।

কিছুটা ভয় পেয়ে আমি সেইখানে বসে পড়লাম। তারপরে শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে। শুয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটা মিষ্টি গন্ধে আমার দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মনে হল, আমি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি। আমার হাতে জোরে একটা ঝাঁকানি লাগল।—শুনলাম তিনি বলছেন—আপনিও কিন্তু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্নের জগতের ডাকে নয়; একটি বাস্তব কণ্ঠস্বরে: নমস্কার স্যার। আশাকরি ভাল আছেন।

স্বপ্ন ভেঙে গেল আমার। সূর্যের আলোতে সীন নদীটিকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমি, সেই পথ দিয়ে স্থানীয় একটি পুলিশ যাচ্ছিল। এ-স্বর তারই।

বললাম—গুড-মর্ণিঙ, ম্যারিনেল। চলেছ কোথায় ?

জলে-ডোবা একটা মৃতদেহকে মরিলোঁর কাছে তোলা হয়েছে। সেইটাই রিপোর্ট করতে যাচ্ছি। আরও একটা লোক জলে ডুবে মরল। ডোবার আগে লোকটা ট্রাউজার খুলে নিজের পা দুটোকে আচ্ছা ক'রে বেঁধেছিল।

কে জানে ?

[Who knows ?]

হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর! শেষ পর্যন্ত এই কাহিনী আমাকেই লিখতে হবে ? কিন্তু আমি কি তা পারব ? লিখতে সাহস করব ? এত অদ্ভুত, এত দুর্বোধ্য, এত জটিল যে তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করাই যে কষ্টকর।

আমি যা দেখেছি তা যে ভুল নয়, আমার চিন্তার মধ্যে যে কোন ভ্রান্তি নেই, ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম আর নির্মম পর্যালোচনার ভেতরে আমার যে কোন ফাঁক নেই—এ-বিষয়ে যদি আমি নিশ্চিৎ না হতাম তাহলে আমি ভাবতাম যে আমি যা দেখেছি তা অবাস্তব···সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি বৈকল্য—মরীচিকা। অথবা, তাই যে নয় সেকথা কে-ই বা বলতে পারে ?

আজ আমি বেসরকারী একটি উন্মাদ আশ্রমে। ভীতির কবলে প'ড়ে আমি যে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি সেটা আমার বিজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। একটিমাত্র জীবন্ত মানুষই আমার এই কাহিনী জানেন; তিনি হচ্ছেন এখানকার ডাক্তার। সেই কাহিনীই এখানে আমি লিখছি। কেন লিখছি তা আমি জানিনে। বুকের মধ্যে এ-কাহিনী গুমরে গুমরে ওঠে; দুঃস্বপ্ন দেখার মত

আঁতকে উঠি আমি। এই কাহিনী প্রকাশ ক'রে দিলে ভেতরটা হালকা হয়ে যাবে। সেইজন্যেই এই কাহিনী আমি লিখতে বসেছি।

চিরকালই আমি লৌকিক সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি; মনটা আমার সর্বত্যাগী দার্শনিকের মত। মানুষ বা ভগবান—কারও বিরুদ্ধেই আমার কোন অভিযোগ নেই; চিরকাল অল্পেতেই আমি খুশি। চিরকালই আমি নিঃসঙ্গ; মানুষের সংস্পর্শ আমার ভাল লাগে না—কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করি আমি, কেন করি, তা আমি জানিনে: বলতেও তা আমি পারব না। লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে আমার কোন আপত্তি নেই; তাদের সঙ্গে আমি গল্পও করি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হোটেলে ব'সে খাওয়া-দাওয়াও করি। কিন্তু ওই পর্যন্ত—বেশীক্ষণ কারও কাছে ব'সে থাকলেই আমার গা ঘিন-ঘিন করে; এমন কি যারা আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ তাদেরও যেন বেশীক্ষণ সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ায়। তাদের তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠি, নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে চাই নিজেকে।

এই আকাঙ্খাটা নিছক আকাঙ্খা নয়—এটা ছিল অপ্রতিরোধ্য একটি প্রয়োজনীয়তা। যদি তাদের কাছ থেকে সরে আসতে না পারতাম, যদি আমাকে বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকতে হতো তাহলে মনে হোত এখনই একটা দুর্ঘটনা ঘটবে আমার। কী রকম দুর্ঘটনা? কে জানে? হয়ত, আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ব, হ্যাঁ। হয়তবা!

নির্জনতার ওপরে আমার এমন একটা টান ছিল যে আমার ঘরে শুয়ে কেউ ঘুমোচ্ছে এটা ভাবতেও আমার অস্বস্তি লাগত। প্যারিসে আমি থাকতে পারিনে, কারণ, সেখানে থাকতে আমার অবর্ণনীয় কষ্ট হয়। মনে হয় আমার আত্মিক মৃত্যু হয়েছে। মানুষের ভিড়ে সারা শহরটাই গম-গম করতে থাকে। সে-শব্দের যেন বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শহরটা যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখনও যেন সেই শব্দ বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে। জীবন্ত মানুষের আলাপের চেয়ে ঘুমন্ত মানুষের নির্বাক অস্তিত্ব আমার কাছে অনেকবেশী উপাদেয়। কেন আমাকে বিধাতা এমন ক'রে সৃষ্টি করলেন? কে জানে। এর কারণটা সম্ভবত সহজ। নিজের বাইরে অন্য কারও অস্তিত্ব আমি সহ্য করতে পারতাম না।

পৃথিবীতে দুই জাতের মানুষ রয়েছে। একদল নির্জনতাকে আদৌ সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, নির্জনতা তাদের বুকে পাষাণের মত চেপে বসে—তুষার-প্রবাহের মত বিরাট একটা স্তূপ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপরে। নির্জনতা শ্বাসরুদ্ধ ক'রে দেয় তাদের। আর একদল রয়েছে যারা নির্জনতার ফিরে পায় নিজেদের, স্বস্তির, মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। আসল কথাটা হচ্ছে—এমনকিছু মানুষ রয়েছে যারা বাইরের জগতে বাস করতে ভালবাসে; আর একদল রয়েছে যারা ভালবাসে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে। আমি সেই দ্বিতীয় জাতের।

ফলে, জীবন্ত প্রাণীর চেয়ে জড়দেরই আমার ভাল লাগত বেশী। আর সেইজন্যেই আমার বাড়িটাই হয়ে উঠেছিল আমার জগৎ; আমার ঘরের আসবাবপত্র, ছোট-খাট অসংখ্য জিনিসের সাহচর্য আমার কাছে কাম্য ছিল; তারাই নির্বাক সাহচর্যে আমার নিঃসঙ্গ দিনগুলিকে ভরাট ক'রে রেখেছিল। বাইরে থেকে দেখতে না পাওয়া যায় এইভাবে ঘরের উঠোনে একটা সুন্দর বাগান তৈরি করেছিলাম আমি। শহর থেকে কাছেই ছিল আমার বাড়ি। প্রয়োজনমত সহজেই শহরে যেতে পারতাম আমি। আমার ঘরের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে দূরে কিচেন-গার্ডেনের পাশে একটা ছোট বাড়ি ছিল। আমার চাকর-বাকররা রাত্রে সেইখানেই ঘুমাতো। বাগানের বিরাট-বিরাট গাছের ছায়ার নীচে রাত্রির অন্ধকারে গভীর সুষুপ্তিতে আমার বাড়িটি আচ্ছন্ন হ'য়ে আসত। অনেকক্ষণ ধরে সেই শুপ্তি উপলব্ধি করতে-করতে আমি বেশ দেরী ক'রেই ঘুমোতে যেতাম।

সেই বিশেষ দিনটির কথা বলছি। স্থানীয় একটি থিয়েটারে সে-রাত্রিতে "সিগার্ড" অভিনীত হ'ল। এত সুন্দর সঙ্গীতমুখর নাটক জীবনে আর আমি শুনি নি। মন আর প্রাণ আমার ভরে উঠেছিল একেবারে। মাথার মধ্যে সুরের সেই ঝঙ্কার নিয়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলাম আমি। চোখে তখন আমার স্বপ্নের মাদকতা; অন্ধকার, অন্ধকার! চারপাশে অন্ধকার নেমে এসেছে আলকতরার মত, এত অন্ধকার যে বড় রাস্তাটাও চিনতে পারা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ফলে, বারবার আমি পথ থেকে নেমে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ছিলাম। টোল-গেট থেকে আমার বাড়ি এক মাইলের কিছু কমই হবে; হাঁটাপথে মিনিট কুড়ির মত; তাও, ধীরে-ধীরে হাঁটলে, রাত্রি তখন হবে একটা কি দেড়টা। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদের স্তিমিত আলো প্রহেলিকার মত ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে। সেই আলোতে দূর থেকে আমার বাড়িটা দেখতে পেলাম আমি। যতই বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম, ততই কী জানি কেন—কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল আমার। চলার গতি কমিয়ে দিলাম আমি। সেই প্রাচীন অসংখ্য গাছপালার মধ্যে মনে হ'ল আমার বাড়িটা কবরের মধ্যে চুপ ক'রে শুয়ে রয়েছে।

গেটের দরজা খুলে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম। দুপাশে বড-বড় সাই-কামোর গাছের সারি। সেগুলি পেরিয়ে গেলেই আমার বাড়ি; তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য ছায়া, ফুল, আর গাছের খিলান। বাড়ির মুখে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। বিরাট একটা অস্বস্তি নেমে এল আমার ওপরে। কোথাও কোন শব্দ সেই, নড়ছে না গাছের কোন পাতা। মনে-মনে ভাবলাম—কী হ'ল আমার। গত দশটি বছর ধরে এই একভাবে রাত্রির অন্ধকারে, বৃক্ষ-পল্লবের অন্তরাল দিয়েই তো বাড়ি ফিরছিলাম আমি। কোনদিনই, কখনও কোন অন্ধকারে ভয় পাই নি আমি। কোন লোক অসৎ

উদ্দেশ্যে সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে বিদ্যুতের বেগে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতাম না আমি। তাছাড়া, আমার হাতে রিভলবার ছিল। কিন্তু রিভলবার ছুঁলাম না আমি। মনের মধ্যে যে আতঙ্ক উঁকি দিয়ে আমাকে গ্রাস করার জন্যে এগিয়ে আসছিল তারই সঙ্গে একটা মোকাবিলা করার জন্যে আমি প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ালাম।

কিন্তু এটা কী? স্বপ্ন মায়া, না মতিভ্রম? কী এটা? মনের মধ্যে অজানা একটা আতঙ্ক এইভাবে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে কেন? এ সেই রহস্যজনক রাত্রির প্রভাব ধীরে-ধীরে মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে মানুষকে গ্রাস ক'রে ফেলে! একে তো অগ্রাহ্য করা যায় না—বুদ্ধি দিয়েও বিচার করা যায় না যাকে—এইরকম উৎকট অনিবার্য একটা অনুভূতির উচ্ছ্বাস। হয়ত তাই হবে! কে জানে?

এক পা এক পা করে এগোই; আর আমার গায়ের রোঁয়াগুলি খাড়া হয়ে ওঠে। সেই বিরাট বাড়ির দেওয়ালের পাশে একটু দাঁড়ালাম। এর দরজা জনালা সব বন্ধ। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার আগে একটু অপেক্ষা করলাম। আমার ড্রয়িংরুমের পাশে একটা জানালা। তারই পাশে বাগান। সেইখানে বসার একটা বেঞ্চ। সেই বেঞ্চের ওপরে আমি একটু বসলাম। গাছের ছায়ার দিকে তাকিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম একটু। অস্বাভাবিক কোন কিছু প্রথমের দিকে নজরে পড়ে নি আমার। কানে ভেতরে কেবল ভোঁ ভোঁ ক'রে একটা শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু এরকম শব্দ আমার কানে প্রায়ই হয়। মাঝে-মাঝে মনে হয় ট্রেণ চলার শব্দ হচ্ছে, মনে হয় ঘড়িতে সময়জ্ঞাপক শব্দ হচ্ছে—মাঝে-মাঝে মনে হয় অনেক মানুষের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। তারপরেই সেই ভোঁ ভোঁ শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার ভুল হয়েছিল। ওই শব্দটা আমার বুক ধড়কড়ানির শব্দ নয়; ওই শব্দটা আসছিল আমারই ঘরের ভেতর থেকে—একটা অদ্ভুত ঘড-ঘড জড়ানো-জড়ানো শব্দ—ঠিক কিসের শব্দ তা আমি বুঝতে পারলাম না। ঠিক শব্দ না ব'লে তাকে আলোড়ন বলাই উচিৎ—অনেক জিনিস একসঙ্গে টানার শব্দ—মনে হ'ল, কে বা কারা যেন আমার চেয়ার-টেবিল-আলমারিগুলি ধরে টানাটানি করছে।

অনেকক্ষণ ধরে নিজের কানকেই আমি যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। কিন্তু জানালার শার্সির ওপরে কানটা চেপে দিতেই বুঝলাম ঘরের ভেতরে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে। ভয় পেয়েছিলাম সত্যি কথা; কিন্তু তার চেয়েও অবাক্ হয়েছিলাম অনেক বেশী। প্রয়োজন হ'বে না মনে ক'রেই আমি রিভালবারটা বার করলাম না। অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌছতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ মরিয়া হয়ে দরজার তালার মধ্যে একটা চাবি

ঢুকিয়ে ঘোরালাম। জোরে ধাক্কা দিলাম কপাটে।

কপাট খোলার শব্দটা মনে হল কেউ পিস্তল ছুঁড়েছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, যেন তারই উত্তরের প্রতিবাদে দোতলা, একতলা, বাড়ির সর্বত্র তুমুল একটা হট্টগোল সুরু হল। সেই শব্দ এত আকস্মিক, এত ভয়ঙ্কর, এত তীব্র যে ভয় পেয়ে আমি কয়েক পা পিছু হটে গেলাম ; এবং যদিও এখনও মনে করি যে কোন প্রয়োজন ছিল না তবু সেইসময় কোমর থেকে রিভলবারটা খুলে হাতে নিয়েছিলাম আমি।

অপেক্ষা করতেই লাগলাম আমি। কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। এতক্ষণে একটা অদ্ভুত শব্দ আমার কানে এসে লাগল—একটা অদ্ভুত ট্যাপ-ট্যাপ শব্দ সিঁড়ির ওপরে হ'তে লাগল ; সে শব্দ জুতো বা চটি পায়ে দিয়ে চলাফেরা করার শব্দ নয়। মনে হল, কাঠের ক্রাচ নিয়ে কে বা কারা যেন হেঁটে-হেঁটে বেড়াচ্ছে। তারপরে হঠাৎ দেখলাম আমার দরজার সামনে একটা আর্ম চেয়ার, ওই বড় চেয়ারটার ওপরে ব'সে আমি পড়াশুনা করতাম, হেলতে-দুলতে এগিয়ে এল। তারপরে বেরিয়ে গেল সোজা বাগানের দিকে। তাকে অনুসরণ ক'রে বেরিয়ে গেল আমার বসার ঘরের চেয়ারগুলি ; তারপরে এগিয়ে এল কুমীরের মত ছোট-ছোট পায়ে ভর দিয়ে আমার নীচু কোচগুলি। তারপরে ছাগলের মত লাফাতে-লাফাতে এল আমার ঘরের অন্যান্য চেয়ার ; তাদের অনুসরণ করল শশকের গতিতে আমার বাড়ির টুলগুলি।

আমার মনের অবস্থাটা কী একবার ভেবে দেখুন। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে রয়েছি আমি ; আর আমার চোখের উপর দিয়ে কদম-কদম এগিয়ে চলেছে আমার ঘরের আসবাবপত্রগুলি। পর-পর চলেছে—চেহারার অনুপাতে কেউ ছুটছে, কেউ বা আবার মন্থরগতিতে। আমার বিরাট পিয়ানোটা পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে বেরিয়ে গেল ; যাওয়ার সময় সুরের আমেজ ছড়িয়ে গেল চারপাশে। ছোট-ছোট জিনিসগুলো পিঁপড়ের মত গড়িয়ে-গড়িয়ে চলতে লাগল। ঘরের পর্দাগুলি অকটোপাশের মত শুঁড় বিস্তার ক'রে ছুটলো। তারপরে চোখে পড়ল আমার লেখার টেবিল। বেশ দামী, তার চেয়েও বড় কথা, আজকালকার দিনে ওরকম টেবিল একরকম দুষ্প্রাপ্য। ওর ভেতরে আমার অনেক গোপন চিঠি রয়েছে—রয়েছে আমার একান্ত গোপনীয় অনেক কাহিনী, অনেক ফটোগ্রাফও।

আর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হ'য়ে পড়ল। চোরকে মানুষ যেমন পাকড়ে ধরে আমিও সেইরকম তাকে আঁকড়ে ধরলাম। সে আমাকে মাটির ওপর দিয়ে ঘষড়াতে-ঘষড়াতে টেনে নিয়ে চলল। তার গতি রোধ করতে না পেরে একসময় মাটির ওপরে পড়ে গেলাম আমি। তার পেছনে অন্যান্য আসবাবপত্র যেগুলি আসছিল তারা আমার দেহের ওপর দিয়ে নির্বিবাদে এগিয়ে গেল। মনে হ'ল পরাজিত কোন সৈনিকের বুকের

ওপর দিয়ে বিজয়ী সেনানীরা যেন মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলেছে; ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। তারপরে আবার ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, আমার চোখের ওপর দিয়ে আমার বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র নির্বিবাদে বাইরে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তারপরে সেই শূন্য ঘরের মধ্যে আর একরকম শব্দ হ'ল—বাড়ির প্রতিটি ঘরের দেওয়ালে সেই বীভৎস শব্দগুলি প্রতিধ্বনিত হ'ল। সেই শব্দ হচ্ছে জানালা-দরজা বন্ধ করার শব্দ। প্রচণ্ড শব্দে কে বা কারা যেন বাড়ির অজস্র জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। সব শেষে বন্ধ হল সেই দরজাটা যেটা আমি বোকার মত প্রথম খুলে দিয়েছিলাম।

ভয় পেয়ে শহরে দিকে দৌড় দিলাম আমি; থামলাম একেবারে বড় রাস্তার ওপরে এসে। একটা পরিচিত হোটেলে গিয়ে বেল বাজালাম আমি। হাত দিয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে নিলাম; তারপরে হোটেলের মালিককে বললাম আমার ঘরের চাবিটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। তারা শোওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিল আমার। আমি চাদরে আপদমস্তক ঢেকে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে-শুয়ে সকাল হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম আমি। আমার নির্দেশ ছিল সকাল হলেই যেন আমার চাকরদের জানানো হয়।

সকাল সাতটা নাগাদ আমার দরজায় টোকা পড়ল। চাকরটির মুখ তখন উত্তেজনায় কাঁপছে।

সে বলল—কাল রাত্রিতে ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে স্যার। বাড়ির সব আসবাবপত্র চুরি হ'য়ে গিয়েছে। একরত্তি জিনিস বলতে আর কিছু নেই।

সংবাদটা শুনে আমি খুশি হলাম। কেন? কে জানে? মুখে আমি কিন্তু কিছু প্রকাশ করলাম না; কেবল বললাম—ওই লোকগুলিই তাহলে আমার চাবি চুরি করেছিল। এখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া উচিত। চল, আমিও যাচ্ছি।

পাঁচ মাস ধরে পুলিশের তদন্ত চলল। চোর বা জিনিসপত্র—কোন কিছুরই হদিস হ'ল না। হা ঈশ্বর! আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি তা যদি তাদের বলতাম তাহলে ডাকাতকে বাদ দিয়ে আমাকেই তারা গারদের মধ্যে আটকে রাখতো।

আমি চুপ করেই রইলাম। বাড়িতে আর আসবাবপত্র ঢোকাই নি আমি। কী দরকার। আবার তারা ওইভাবে একদিন পালিয়ে যাবে। ওমুখোও আর আমি হই নি।

প্যারিসের একটা হোটেলে আস্তানা নিলাম আমি। ডাক্তারকে সব খুলে বললাম। ডাক্তার আমাকে বিদেশ ভ্রমণ করার উপদেশ দিলেন। আমি বিদেশ ভ্রমণে বেরোলাম।

২

সুরু করলাম ইতালী দিয়ে। সেখানকার সূর্য আমার উপকারই করল। জেনোয়া থেকে ভেনিস, ভেনিস থেকে ফ্লোরেনস্, সেখান থেকে রোম, রোম থেকে নেপলস্—ছ'টি মাস ধরে কেবল ঘুরতে লাগলাম আমি। তারপরে গেলাম সিসিলিতে। দেশটা গ্রীক আর নরম্যান-বিজয়ের প্রাচীন ধ্বংস-প্রতীকে বোঝাই। তারপরে গেলাম আফ্রিকাতে।

মার্সেলিস দিয়ে ফিরে এলাম ফ্রান্সে, দক্ষিণ ফ্রান্সের উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও, মেঘলা আকাশ আমাকে যেন বিষণ্ণ ক'রে তুলেছিল। মনে হ'ল, আমার অসুখ একেবারে সারে নি। ফিরে এলাম প্যারিসে। মাসখানেকের মধ্যেই কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। তখন শরৎকাল, ঠিক করলাম, শীত আসার আগে আমি নরম্যানডির দিকে যাব। সুরু করলাম রাওয়েন দিয়ে। দেশটির চারপাশে গোথিক কীর্তিগুলি বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। সপ্তাহখানেক তাদেরই মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম আমি।

একদিন বিকাল প্রায় চারটে নাগাদ আমি একটি অদ্ভুত রাস্তার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই রাস্তার পাশ দিয়ে কালির মত কালো জলের একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। ওখানকার বাসিন্দারা স্রোতটির নাম দিয়েছিল "রোবেক ওয়াটার" তার চারপাশে পুরোন-পুরোন বাড়ি ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলির দিকে হঠাৎ নজর পড়ল আমার। চারপাশে ভাঙা চোরা টিনের দোকান, টালির ছাদ, ভাঙা ছাদ—তাদের একপাশে গলির মধ্যে কী অপূর্ব জায়গাই না খুঁজে বার করেছে ওরা। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দোকানগুলির মধ্যে নানানজাতীয় জিনিসপত্র, মাটি-পাথরের মূর্তি, গির্জার অলঙ্কার, মন্দির সারি-সারি ছড়ানো রয়েছে। কী আশ্চর্য নয়! সেইসব পরিত্যক্ত আবর্জনা—সংসারে যাদের প্রয়োজন শেষ হ'য়ে গিয়েছে—সেইসব জিনিস দিয়ে দোকানগুলি সাজানো।

এই পুরনো জিনেসের ওপরে আমার ঝোঁক চিরকালের। সেই ঝোঁকটাই হঠাৎ আমাকে ভেতরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই পচা তক্তার ওপর দিয়ে আমি স্টলের পর স্টল ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু এ কী! সেই পুরনো আসবাবপত্রের কবরখানার ওপরে কী দেখলাম? দেখলাম, আমার সবচেয়ে সুন্দর একটি "ওয়ার্ডরোভ" চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাঁপতে-কাঁপতে সামনে দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ভয়ে হাত-পা আমার এতই কাঁপতে লাগল যে তার গায়ে যে হাত দেব সে সাহসটুকু পর্যন্ত আমি হারিয়ে ফেললাম। না; এটি আমারই। তৃতীয় লুই-এর আমলের একটি অনবদ্য বস্তু। একবার যে দেখেছে সে-ই একে চিনতে পারবে। বিস্মিত নয়নে এদিকে-ওদিকে চাইতে লাগলাম। ওই…ওই যে আমার আর্ম চেয়ারগুলি; তাদের পেছনে

দ্বিতীয় হেনরীর আমলের আমার তুটি টেবিল মিট মিট ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এগুলিকে দেখার জন্ম প্যারিস থেকে মানুষ আমার বাড়িতে ছুটে আসত।

তখন আমার মনের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন।

অন্ধকার যুগের নাইটরা যেমন বীরের মত মায়ার রাজত্বে প্রবেশ করতেন আমিও তেমনি বীরের মত আসবাবপত্রের অরণ্যের মধ্যে প্রচণ্ড মানসিক বিভ্রান্তি নিয়ে ঢুকে গেলাম! হরি, হরি! যত ভেতরে ঢুকে যাই ততই আমার বাড়ির পালায়মান আসবাবপত্রগুলি আমার চোখে পড়ে। আমার সব আসবাব এইখানে এসে জমেছে!

আমি সে প্রায়ান্ধকার গ্যালারির ওপরে উঠতে লাগলাম। হ্যাঁ, সবই এখানে রয়েছে, একমাত্র আমার সেই খেলার টেবিলটি ছাড়া। তারই ভেতরে আমার চিঠিপত্র ছিল। সেটিকে আমি দেখতে পেলাম না। তাকিয়ে দেখলাম, আমি একা। কেউ কোথাও নেই। আমি চীৎকার ক'রে ডাকলাম। কেউ সাড়া দিল না। সেই বিরাট চৌহদ্দীর মধ্যে আমি একেবারে একা।

অন্ধকার নেমে এল। আমারই একটা চেয়ারের ওপরে আমি বসে রইলাম। ঠিক করলাম ওখান থেকে নড়ব না। মাঝে-মাঝে চীৎকার করে ডাকি—কে হে? কে আছ?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মনে হ'ল আমি যেন কার পায়ের শব্দ শুনলাম—খুব আস্তে-আস্তে কে যেন চলাফেরা করছে। কোন্ দিকে তা আমি বলতে পারব না। একবার মনে হ'ল পালিয়ে যাই। তারপরে সাহস ক'রে আর একবার হাঁক দিলাম আমি। দেখলাম পাশের দোকানে আলো জ্বলছে।

কে যেন জিজ্ঞসা করল—কে ওখানে?

বললাম—একজন খরিদ্দার।

এইভাবে এত দেরীতে দোকানে!

আমি একঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।

আগামীকাল আসতে পারতেন।

আগামীকাল এখান থেকে আমি চলে যাব।

আমিও এগিয়ে যেতে সাহস করলাম না; সে-ও সাহস করল না এগিয়ে আসতে। বললাম—আপনি আসছেন?

আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

তার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ঘরের মাঝখানে একটা ক্ষুদে রোগা, বীভিকিচ্ছি চেহারার লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। লম্বা হলদে দাড়ি; মাথায় একগাছিও চুল নেই; একটা বাতি নিয়ে সে আমার দিকে তাকাল। সেই আলোতে দেখলাম—তার মুখ কুঁচকে গিয়েছে; ফোলা-ফোলা; তার চোখ দুটো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না।

তিনটে চেয়ারের জন্যে, ওইগুলি আমারই ; দরকসাকসি ক'রে সেইখানেই তাকে অনেকগুলি টাকা দিলাম। নাম বললাম না ; শুধু বললাম আমার হোটেলের ঘরের নম্বরটি। ঠিক হ'ল পরের দিন সকাল ন'টার মধ্যে সেগুলি আমার হোটেলে সে পৌঁছে দেবে।

আমি বেরিয়ে এলাম। সে বেশ নম্রভাবেই দরজা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এগিয়ে এল।

বেরিয়ে এসে আমি সোজা পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে সব কথা বললাম। পুলিশের কর্তা তক্ষুনি যে বিভাগ চুরির তদারক ক'রে সে বিভাগে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করার জন্যে টেলিগ্রাম করলেন। উত্তরের জন্যে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। ঘণ্টাখানেক পরে যে উত্তর এল তাতে আমি সন্তুষ্ট হলাম। উত্তরটি হচ্ছে—আমি এখনই লোকটাকে গ্রেপ্তার করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতাম ; কিন্তু সম্ভবত, লোকটা কোনরকম সন্দেহ ক'রে জিনিস-পত্রগুলি নিয়ে কেটে পড়েছে। ঘণ্টা দুই পরে আপনি যদি নৈশ-ভোজ সেরে আমার সঙ্গে দেখা করেন তাহলে আমি তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে এনে আপনার সামনেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।

নিশ্চয়, নিশ্চয়…ধন্যবাদ।

হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি তাঁর সঙ্গে যথাস্থানে হাজির হলাম। চীফ ইনস্‌পেক্টর আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন—আমার লোকেরা তাকে এখনও ধরতে পারে নি।

বলেন কী !—আমার মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু তার বাড়িটা নিশ্চয় তারা খুঁজে পেয়েছে।

পেয়েছে। সে যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ বাড়িটার ওপরে আমরা লক্ষ্য রাখব। কিন্তু লোকটা যেন উঠে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

উঠে গিয়েছে ?

উঠে গিয়েছে। লোকটা একজন কাঠের ব্যবসায়ী। সাধারণত সন্ধ্যের দিকে সে পাশের দোকানে গল্প গুজব করে। পাশের দোকানদারের নাম উইডো বিদোইন। এ বেটিও ফার্ণিচারের ব্যবসাদার, বেটি ডাইনী বুড়ী। বুড়ীটা সন্ধ্যে থেকেই তাকে দেখে নি—সেইজন্যে তার কোন সংবাদ সে জানে না। আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

সেদিন রাত্রিতে আদৌ ঘুম হয় নি আমার। মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নে আঁৎকে আঁৎকে উঠেছি। কিন্তু বাইরে আমার অস্থিরতা প্রকাশ করতে আমি চাই নি। তাই পরের দিন সকাল দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আমি ইনস্‌পেক্টরের সঙ্গে দেখা করলাম। ইনস্‌পেক্টর বললেন—সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই আমরা গ্রহণ করেছি। চলুন ; আমরা দু'জনে দোকানে যাই ; সেইখানে আপনার জিনিস আপনি সনাক্ত করবেন।

তথাস্তু।

পুলিশ আর কামার সঙ্গে নিয়ে আমরা দোকানে হাজির হলাম। দোকান খোলা হল। কিন্তু একি! গত রাত্রিতে এইখানে আমার আসবাবপত্রের ভিড়ে এ এক-পাও আমি চলতে পারি নি। আজ তার একটাও নেই।

ইনস্পেক্টরও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আমি বললাম—হা ঈশ্বর। লোকটার সঙ্গে জিনিসগুলিও সব উধাও হয়ে গিয়েছে।

তিনি হেসে বললেন—সত্যি কথা। গতকাল টাকা দিয়ে আপনি ভুল করেছেন। লোকটা সাবধান হয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম : গত রাত্রিতে যেসব জায়গায় আমার জিনিসগুলি ছিল আজ দেখছি সেইসব জায়গায় অন্য ফার্ণিচার বোঝাই হয়ে রয়েছে। কেমন করে এ জিনিস ঘটতে পারে তা আমার মাথায় ঢুকছে না।

তিনি বললেন—এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সারা রাত ধরেই লোকটা জিনিস সরিয়েছে। যাই হোক; আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। যা করার তা আমরা তাড়াতাড়িই করছি। আমরা তার ফিরে আসার পথ বন্ধ করেছি। বদমাসটাকে ধরতে আমাদের বেশী সময় যাবে না।

হায়, অশান্ত হৃদয় আমার।

আরও দিন পনের আমি রাওয়েন-এ ছিলাম। লোকটা ফেরে নি। জীবন্ত কোন মানুষ কি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে? ষোল দিনের দিন আমার বাগানের মালির কাছ থেকে আমি এই চিঠিটা পেলাম—

স্যার, গত রাত্রিতে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আমাদের কথা দূরে থাক—পুলিশও পর্যন্ত হকচকিয়ে গিয়েছে। আপনার বাড়ির সমস্ত আসবাব-পত্র ফিরে এসেছে। চুরির রাত্রিতে যেসব জিনিস ছিল—তাদের সব ক'টি—মায় ক্ষুদে জিনিসগুলি পর্যন্ত, এটা হয়েছে শুক্র-শনিবার রাত্রিতে। বাইরে মাটির ওপরে দাগ দেখে মনে হয় কেউ তাদের প্রধান ফটক থেকে ঘসড়ে-ঘসড়ে ভেতরে নিয়ে এসেছে—আপনার ফিরে আসার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি। ইতি,

ভবদীয়
ফিলিপ।

না—না—না! আর ও বাড়িতে আমি কোনদিনই ফিরে যাব না।

চিঠি দেখে পুলিশ ইনস্পেক্টর বললেন—চোরটা ধূর্ত, সন্দেহ নেই। আমাদের যে আর কিছু করণীয় নেই—এইটাই বাইরে আমরা দেখাব। লোকটাকে শীগগীরই আমরা ধরে ফেলব।

না; লোকটাকে আজও তারা ধরতে পারে নি। আমার ভয় হচ্ছে একটা শিকারী জন্তুর মত সে অলক্ষ্যে আমার পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খুঁজে পাওয়া গেল না। আর তাকে পাওয়া যাবে না। আর সে তার

বাড়ি ফিরে যাবে না। তাতে তার যায় আসে কী? একমাত্র আমি তার মুখোমুখী দাঁড়াতে পারি। কিন্তু আমি তা দাঁড়াব না। না—না—কিছুতেই না।

যদি সে ফিরেই আসে তাতেই বা কী? কেউ কি প্রমাণ করতে পারবে যে আমার কার্পিচার তার দোকানে কোনদিন ছিল? তার বিরুদ্ধে সাক্ষী একমাত্র আমিই; আর আমার কথা যে পুলিশেও বিশ্বাস করে নি সেবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। না, না—এ জীবন আর সহ্য করা যায় না। আমি যা দেখেছি তার গোপন রহস্য আর আমি বুকের মধ্যে চেপে রাখতে পারছিনে।

একজন বেসরকারী ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমি সব খুলে বললাম। অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্ন ক'রে তিনি বললেন—কিছুদিন আপনি এখানে থাকতে চান?

খুব চাই।

সে সামর্থ্য আপনার রয়েছে?

রয়েছে।

আলাদা ঘর আপনার দরকার?

হ্যাঁ।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে চান?

মোটেই না। ওই রাওয়েনের লোকটা সেই সুযোগে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে আমার ঘরে ঢুকতে পারে।

মাস তিনেক আমি এখানে শান্তিতে রয়েছি। আমার কেবল একটিমাত্র ভয় রয়েছে। সেটি হচ্ছে যদি সেই পুরনো আসবাব-পত্রের ব্যবসাদারটি পাগল হয়ে এইখানে আশ্রয় নেয়···কারাগারও আজকাল নিরাপদ নয়।

শশক

[The Rabbit]

যথাসময়ে, অর্থাৎ সকাল পাঁচটা থেকে সওয়া পাঁচটার মধ্যে, বৃদ্ধ লিকাচির দরজার সামনে বেরিয়ে এলেন। এখন তাঁর লোকজনদের প্রাত্যহিক কাজ শুরু করার কথা। চোখ রগড়াতে-রগড়াতে ভুঁড়ির ওপরে কোনরকমে কোমর-বন্ধনীটা আঁটতে-আটতে চিরপরিচিত কার্মের চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখলেন। খালের ধারে যে বীচগাছের সারি রয়েছে তাদের ভেতর দিয়ে প্রভাত সূর্যের তির্যক কিরণ উঠোনের ওপরে এসে পড়েছে; তাই দেখে

আস্তাবলের পাশ থেকে মুরগীগুলি ডাকতে সুরু করেছে; ছাদের ওপরে সুর তুলেছে পায়রাগুলি। সকালের তাজা বাতাসে গোয়ালের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে; গোয়ালের পাশে ঘোড়ার আস্তাবল। তারই ধারে আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘোড়াগুলি ডাকছে।

ধড়াচূড়া প'রে লিকাচির প্রথমে মুরগীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সম্প্রতি ডিম চুরি যাচ্ছে ব'লে তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে। ডিম গুণতে হবে তাঁকে।

তাঁকে দেখেই চাকরানীটা হাত তুলে চেঁচাতে-চেঁচাতে তাঁর দিকে দৌড়ে আসতে আসতে বলল—মাস্টার, মাস্টার, কাল রাতে একটা খরগোস চুরি হয়েছে।

খরগোস!

হ্যাঁ। ডান পাশের ওই বাক্সটার ভেতরে যে ধূসর রঙের বড় খরগোসটি ছিল—সেইটা।

দেখি।

সত্যি বাক্সটা ভাঙা দেখা গেল। খরগোসটাও উধাও।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলেন তিনি; তারপরে চাকরানীকে বললেন—পুলিশকে সংবাদ দাও। এখনই আসতে বল তাদের।

স্থানীয় মেয়র ছিলেন লিকাচির। ক্ষমতা আর অর্থের দম্ভে তিনি তাঁর অধিকারটিকে জবরদস্ত দখল ক'রে রেখেছিলেন।

মেয়েটি গাঁয়ের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি কফি খাবার জন্যে বাড়ির দিকে রওনা হলেন; স্ত্রীর সঙ্গেও ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করা দরকার ছিল তাঁর। ভদ্রমহিলা তখন হাঁটু মুড়ে বসে উনোন ধরাচ্ছিলেন।

ঘরে ঢুকেই লিকাচির বললেন—একটা খরগোস চুরি হয়েছে।

চট করে মুখ ঘোরালেন ভদ্রমহিলা; ঘোরার চোটে হড়কে গেলেন তিনি। বললেন—কী ব্যাপার? খরগোস চুরি?

হ্যাঁ; সেই বড়টা।

কী লজ্জা, কী লজ্জা! কে চুরি করল?

কে চুরি করতে পারে সেবিষয়ে লিকাচির নিজেরই একটা অভিমত ছিল; বললেন—নিয়েছে ওই পোলাইত—আর কে নেবে?

এখন কী করবে ঠিক করেছ?

পুলিশ ডাকতে পাঠিয়েছি।

পোলাইত একজন শ্রমিক। কিছুদিন এখানে সে কাজ করেছিল; কিন্তু ঔদ্ধত্যের জন্যে তিনি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। লোকটা সেনাবাহিনীতে কাজ করত; আফ্রিকায় থাকার সময় সে লাম্পট্য আর হাতসাফাই দুটোই শিখেছিল। সব কাজেই সে হাত দিয়েছে। কিন্তু কোনটাতেই বেশীদিন টিকে

থাকতে পারে নি। তবে কাজের সন্ধানে দেশের নানা জায়গাতেই সে ঘুরে বেড়ায়। প্রথম দিন থেকেই ভদ্রমহিলা তাকে তেমন দেখতে পারতেন না। সেইজন্যে তিনি নিশ্চিৎ হলেন যে ওই লোকটাই চুরি করেছে।

প্রায় আধ-ঘণ্টার ভেতরেই লম্বা রোগাটে পুলিশ সার্জেন্ট একটি বেঁটে মোটা কনস্টেবল নিয়ে হাজির হলেন।

তাদের বসিয়ে লিকাচির আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা তাদের বললেন। ব্যাপারটা তদন্ত করার জন্যে সবাই অকুস্থানে হাজির হ'ল। সেখান থেকে ফিরে এলে গৃহকর্ত্রী পুলিশদের কয়েক গ্লাস মদ দিয়ে বেশ উদ্ধতভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন—চোর ধরতে পারবেন?

সার্জেন্টের কোমর থেকে খাপে ঢাকা তরোয়াল ঝুলছিল। তাকে চিন্তান্বিত দেখা গেল। অবশ্য চোরকে সনাক্ত ক'রে দিলে তাকে সে অবশ্যই ধরতে পারবে। অন্যথায়, সে যে অপরাধীকে ধরবেই এমন কোন কথা দিতে পারছে না। অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে সে একটা সোজা প্রশ্ন করল—কে চুরি করেছে তা আপনি জানেন?

গৃহস্বামী বললেন—তা আমি বলতে পারব না; কারণ, কাউকে আমি চুরি করতে দেখি নি। দেখলে, এক ফোঁটা মদ না দিয়ে হাড়, মাংস, পালক সব তাকে খাওয়াতাম। তবে সেই হতভাগা পোলাইত-ই যে একাজ করেছে সে-সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

সার্জেন্ট অধঃস্তন সহকারীটির দিকে তাকিয়ে কথার ছলে বলল—মেষ-পালক সেভারিন-এর বউ-এর বাড়িটা একবার খুঁজে দেখতে হবে আমাদের।

একটু হেসে কনস্টেবল উত্তরে বারতিনেক ঘাড় নাড়ল।

তারপরে মাদাম এলেন এবং মিষ্টি আর বুদ্ধি ক'রে সার্জেন্টকে নানা-রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। মেষপালক সেভারিন একটি জন্তু, মানুষ নয়। পাহাড়ের চারপাশে মেষ চরিয়েই সে বড হয়ে উঠেছে। মেষ চরানো ছাড়া অন্য কোন কাজই সে জানত না। তবুও চাষীদের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি অনুসারে সে কিছু সঞ্চয় করেছিল। সেইসঙ্গে পশুদের চিকিৎসা ক'রেও সে কিছু রোজ-গার করত। তারপরে একদিন তিন হাজার ফ্রাঁ খরচ করে সে কিছুটা জমি আর একটা কুঁড়ে কিনলো। তারই কিছুদিন পরে সে সরাইখানার একটি ঝি-কে বিয়ে করল। মেয়েটির স্বভাবচরিত্র একেবারে যাচ্ছেতাই। গ্রামের ছেলে-দের কাছে শোনা যায় সেভারিনের অবস্থা ভাল দেখে মেয়েটা রোজ রাত্রিতে তার বাসায় যেত; তারপর বিয়ে করতে বাধ্য করল ছোকরাটাকে। বিয়ের পরে সে তার নিজের বাড়িতে গেল; আর সেভারিন আগের মতই তার মেষের পাল নিয়ে দিনরাত্রি পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সার্জেন্ট বলল—পোলাইত গত তিন সপ্তাহ ধরে ওই মেয়েটার ঘরে ঘুমোচ্ছে। হতচ্ছাড়াটার থাকার আর কোন জায়গা নেই।

কনস্টেবল সাহস ক'রে বলল—লোকটা সেভারিনের কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকে।

বিবাহিতা নারীর এহেন দুষ্কর্মের প্রমাণ পেয়ে মাদাম ক্ষেপে লাল হয়ে উঠে বললেন—ওই মেয়েটারই কাজ। আপনি এখনই যান—তাকে ধরুন।

সার্জেণ্ট শান্তভাবে বলল—একটু ধৈর্য ধরুন। দুপুরে রোজই ও খেতে আসে। তখন মালশুদ্ধ তাকে আমরা গ্রেপ্তার ক'রে আনব।

বেলা বারোটা নাগাদ সার্জেণ্ট তার সহকারীটিকে নিয়ে বনের পাশে নির্জন ছোট একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল; গ্রাম থেকে এর দূরত্ব পাঁচশ' গজের মত। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে টোকা দিল তিনটে। ভেতর থেকে যাতে কেউ দেখতে না পায় এইভাবে একটা পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল তারা। ভেতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে মিনিট দুই অপেক্ষা ক'রে আবার টোকা দিল। মনে হল ভেতরে কেউ নেই; কিন্তু সার্জেণ্টের শ্রবণশক্তি বড় প্রখর। সে বেশ বুঝতে পারল ঘরের মধ্যে কে বা কারা যেন নিঃশব্দে ঘোরা-ফেরা করছে।

হঠাৎ রেগে উঠল সার্জেণ্ট। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব যার ওপরে তাঁকে এক সেকেণ্ডের জন্যে অগ্রাহ্য করার অধিকার কারও নেই।

দরজা খোল।

কাকস্য পরিবেদনা!

গর্জন করল সার্জেণ্ট—এক্ষুণি না খুললে ভেঙে ফেলব দরজা। আমি হচ্ছি পুলিশ সার্জেণ্ট—লিনিয়েণ্ট।

কথাটা শেষ করার আগেই খুলে গেল দরজা। দেখা গেল একটি স্থূলবপু মেয়েমানুষকে। তার মুখ লাল, ফোলা গাল, বিধ্বস্ত বক্ষদেশ, ঝোলা পেট; চওড়া পাছা, আর রুক্ষ চেহারা। মহিলাটি জন্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। এ-ই হচ্ছে মেষপালক সেভারিনের বউ।

সার্জেণ্ট বলল—আমি কিছু অনুসন্ধান করতে এসেছি—এখনই।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল সার্জেণ্ট। টেবিলের ওপরে খাওয়ার আয়োজন দু'জনের মত। গ্লাসের মধ্যে অর্দ্ধেক মদ থাকায় বোঝা গেল খানাপিনাটা সবেমাত্র সুরু হয়েছিল। চতুর কনস্টেবল তার মনিবের দিকে তেরচাভাবে তাকিয়ে বলল—খাসা খুসবাই ছাড়ছে। আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারি এটা খরগোসের স্টু ছাড়া আর কিছু নয়।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল—একটু ব্র্যাণ্ডি খাবেন?

না-না, ধন্যবাদ। তোমরা যে খরগোসের মাংস রান্না ক'রে খাচ্ছ আমি তার চামড়াটা চাই কেবল।

হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল মেয়েটি। যেন কিছু বলতে পারছে না—এই-রকম একটা ভাব; কিন্তু তার সারা অঙ্গ থরথর করে কাঁপছিল।

কোন্ খরগোসের কথা বলছেন ?

থাক থাক ! তুমি আমাকে নিশ্চয় বোঝাতে চাও না যে এতক্ষণ তোমরা ঘাস খাচ্ছিলে, এতক্ষণ কী খাচ্ছিলে তোমরা ?

আমি ? কিছু না, দিব্যি ক'রে বলছি—সামান্ত ; রুটিতে সামান্ত একটু মাখন…

রুটিতে সামান্ত একটু মাখন ! মরে যাই আর কি । অর্থাৎ তুমি কি বলতে চাও খরগোসের মাংসে একটু মাখন মাখিয়ে ? গোল্লায় যাও তুমি । তোমাদের মাখনের গন্ধ একেবারে মাতিয়ে দিয়েছে । নিশ্চয় সেরা মাখন ! ঘিয়ের মাখন । মাংস ভাজার মাখন—সাধারণ মাখন এ নয় ।

হাসতে-হাসতে কনস্টেবল বলল—না ; সাধারণ মাখন নয় ।

সার্জেণ্ট রসিকতা ক'রে জিজ্ঞাসা করল—বলি, মাখনটা রাখ কোথায় ?

আমার ?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তোমার ।

কেন ? মাখন যেখানে থাকে । এই যে !

এই বলে সে একটা কাপ বার ক'রে আনল । কাপটা নোংরা ; তার ভেতরে নুনের পলেস্তারা পড়েছে । তলায় একছিটে মাখন পড়ে রয়েছে । কাপটা শুকে সার্জেণ্ট বলল—না ; এ নয় । যে মাখনে খরগোসের গন্ধ ছাড়ছে আমি সেই মাখনটা চাই । এস, লিনিয়েণ্ট—আমরা একটু ঘুরে দেখি । তুমি কুলুঙ্গি দেখ ; আমি দেখি বিছানার নীচে ।

দরজা বন্ধ ক'রে সে বিছানার কাছে গিয়ে খাটে টান দিল ; কিন্তু সেটা দেওয়ালে এঁটে থাকার ফলে নড়ানো গেল না । গত পঞ্চাশ বছর ধরে এটাকে কেউ নড়ায় নি । তারপরে নীচু হ'য়ে বসতে গেল সার্জেণ্ট, ফলে তার পোশাক ছিঁড়লো, বোতামগুলো খুলে বেরিয়ে গেল । সে বলল—লিনিয়েণ্ট, এদিকে এস তো বৎস । আমি এত লম্বা যে নীচু হ'তে পারছিনে । আমি আশপাশে দেখছি ।

মোটা বেঁটে লিনিয়েণ্ট তার মাথার বর্মটা খুলে উপুড় হ'য়ে শুয়ে বিছানার তলায় যে অন্ধকার গর্ত রয়েছে সেইদিকে প্যাট-প্যাট ক'রে তাকালো । তারপরে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল—পেয়েছি, পেয়েছি !

কী পেয়েছ ? খরগোস ?—তার ওপরে ঝুঁকে পড়ল সার্জেণ্ট ।

না, চোর ।

চোর ! টানো, টানো—টেনে বার কর । জোরসে টান দাও ।

বিছানার তলায় দুটো হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কনস্টেবলটি প্রাণপণে একটা জিনিস টানতে লাগল, অনেক টানাটানির পরে, সে শেষপর্যন্ত একটা জুতা পরা পা টেনে আনলো । সার্জেণ্ট সেই পা-টা ধরে চীৎকার ক'রে বলল—মা ভেতব্যম । জোরসে টানো, জোরসে টানো ।

হাঁটু মুড়ে ব'সে কনস্টেবল লিনিয়েন্ট মায়ো-জোয়ান-হেইয়ো ব'লে আর একটা পা টেনে আনলো। কিন্তু বড় কঠিন হচ্ছিল কাজটা। বন্দী বেশ পরিকল্পনার সঙ্গে লাথি ছুঁড়তে লাগল। সেই সঙ্গে খাটের একটা পা আঁকড়ে ধরার ফলে তাকে বাইরে টেনে আনা বেশ কষ্টকর হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু সার্জেন্টের উৎসাহে মরিয়া হ'য়ে কনস্টেবল যাকে বাইরে টেনে আনলো সে আর কেউ নয়—আমাদের পোলাইত। রাগে আর ভয়ে তার মুখ তখন লাল হয়ে উঠেছিল।

আর একটা টান দিতেই বন্দীর আর একটা হাত বেরিয়ে এল—সেই-সঙ্গে বেরিয়ে এল খরগোসের রান্না মাংসসমেত একটা সসপ্যান। হুররে—হুররে ব'লে আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল সার্জেন্ট।

তারা যে চুরি করেছে তার অবিসংবাদিত প্রমাণ খরগোসের চামড়া। সেটা পাওয়া গেল মাদুরের তলায়। বামালশুদ্ধ চোরকে বেঁধে পুলিশ বুক ফুলিয়ে ফিরে এল গ্রামে।

সপ্তাহখানেক পরের কথা। মাষ্টার লিকাচির বিশেষ কাজে মিউনিসিপ্যাল হলে আসছিলেন এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন মেষপালক সেভারিন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্তে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে অপেক্ষা করছে। মেয়রের সঙ্গে দেখা হ'তেই সেভারিন সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতেই লিকাচির জিজ্ঞাসা করলেন—কী চাই তোমার?

গত সপ্তাহে আপনার বাড়ি থেকে একটা খরগোস চুরি হয়েছিল এটা কি সত্যি?

হ্যাঁ, সেভারিন—সত্যি।

কে চুরি করেছিল?

পোলাইত।

বেশ কথা। এটা কি সত্যি যে সেই খরগোসের চামড়া আমার বিছানার তলা থেকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল?

কোন্‌টা?

খরগোস আর পোলাইত দু'জনকেই?

হ্যাঁ। কথাটা সত্যি।

তাহলে কথাটা সত্যি?

হ্যাঁ। তোমাকে একথা কে বলল?

প্রায় সবাই। এবার আমি সব বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আপনি তো অনেকেরই বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের আইনকানুন নিশ্চয় তাহলে আপনার সব জানা রয়েছে? আমি অধিকারের কথা জিজ্ঞাসা করছি।

অধিকার বলতে?

এই স্বামী অথবা স্ত্রীর—এদের ব্যক্তিগত অধিকার।

হ্যাঁ; তা আছে।

তাহলে পোলাইতের সঙ্গে একবিছানায় শুয়ে রাত কাটানোর অধিকার কি আমার স্ত্রীর রয়েছে?

না—নিশ্চয় নেই।

তাহলে, আর যদি কখনও তাকে এই অবস্থায় আমি ধরতে পারি, তাহলে দু'জনকে ধোলাই দেওয়ার অধিকারও কি আমার থাকবে?

মানে—মানে—নিশ্চয়।

ঠিক আছে। ধন্যবাদ। —এবার যদি ওদের আমি ধরতে পারি তাহলে একসঙ্গে শুয়ে রাত কাটানোর মজাটা তাদের আমি বুঝিয়ে দেব।

দেনা

[The Debt]

'ওগো অন্ধকারের পথিক, আমার সঙ্গে এস। দেখতেই পাচ্ছ আমার চেহারা সুন্দর। এস। আর কিছু না পাও, এই শীতের রাত্রিতে আমার ঘরে আরাম পাবে; ঘরে আমি সুন্দর আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি।'

এই কথাগুলি বলতে-বলতে সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গিনী তেইশ বছরের যুবতী ফ্যানী রাত্রির অন্ধকারে পথ দিয়ে হাঁটছিল। ডিসেম্বর মাসের সেই কনকনে ঠাণ্ডার রাত্রিতে পথচারীদের সংখ্যা এমনিতেই কম ছিল। ফ্যানী সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগল; বৃদ্ধ, মোটা, মাতাল—কারও বিরুদ্ধে সে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব জানাল না। কিন্তু কেউ তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করল না, এমন কি অন্ধকারের সুপুরুষ বিশেষণে ভূষিত হ'য়েও না। আর ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই পথ নির্জন হয়ে যাবে; এবং দেরীতে-ফেরা কোন একটা মাতালকেও যোগাড় করতে না পারলে বেচারীকে শেষ পর্যন্ত একলাই ঘরে ফিরে আসতে হবে।

তবু, দীর্ঘাঙ্গিনী ফ্যানী সত্যিকারের সুন্দরী যুবতী। তেইশ বছরের এই প্রাণচঞ্চলা নারীর কাছে এই হতচ্ছাড়া পথের ক্লেদাক্ত পরিবেশের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আরও অনেক ভাল কাজ ছিল। পরের দিনের খরচার জন্যে পাঁচটি ফ্রাঁ-ও সে এখানে রোজগার করতে পারে না। কিন্তু বিপদটা ওই-খানেই। প্যারিসের মত জনাকীর্ণ জন-অরণ্যে চিত্রকরদের মত বারবণিতারাও অনেকবেশী বয়স ছাড়া সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এত বেশী। আর সেইজন্যেই সুন্দর চেহারা আর যৌবন থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘাঙ্গিনী ফ্যানী—অতীতে যে একদিন প্যারিসের নাট্যজগতে একটি সব-

চেয়ে ধনী অভিনেত্রী হিসাবে নাম কিনেছিল—সেই ক্যানী পাঁচটি ফ্রাঁ রোজগারের জন্যে সেই নিষ্ঠুর ডিসেম্বর মাসের একটি রাত্রিতে অসহায়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কাছে তার একটি কপর্দকও ছিল না।

যাইহোক; পথ নির্জন হ'য়ে গিয়েছে। কোন পথচারীর দেখা পাওয়ার আশা আর নেই। অকস্মাৎ বড়ো বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না; সেই বাতাসে কাঁপা গ্যাসের আলো ছাড়া আর কোন আশার আলো পড়ছে না তার চোখে। সেই আলোর শিখাগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে মরণোন্মুখ জোনাকির মত। এখন একা একা বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই তার।

কিন্তু হঠাৎ ক্যানীর মনে হ'ল পথের মোড়ে ফুটপাতের ওপরে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূর্তিটি কোন্‌দিকে যাবে তাই নিয়ে একটু ইতস্তত করছে। লোকটি দেখতে ছোট এবং রোগা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা লম্বা আলখাল্লা দিয়ে ঢাকা।

মেয়েটি নিজের মনে-মনে বলল—'সম্ভবত, লোকটা কুঁজো; এইজাতীয় লোকেরা লম্বা মেয়েমানুষ পছন্দ করে।'

এই বলেই সে সেইদিকে দ্রুত হাঁটতে লাগল; হাঁটতে-হাঁটতে তার পূর্বোক্ত কথাগুলি বলে গেল—'ওগো, অন্ধকারের মানুষ, আমার সঙ্গে এস।' একেই বলে কপাল। লোকটা পালিয়ে গেল না; বরং তারই দিকে ভীরু পদক্ষেপে এগিয়ে এল সে। তাকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে ক্যানীও ততক্ষণে তার দিকে এগিয়ে গেল। যেতে-যেতে সে লক্ষ্য করল লোকটা মাতালের মত টলতে-টলতে আঁকাবাঁকা পথ ধরে হাঁটছে। ক্যানী ভাবল···মাতালদের মরণ ওইখানেই। একবার বসে পড়লে আর ওদের ওঠানো যাবে না। সেইখানেই বসে-বসে ঘুমাবে। ও ঢলে পড়ার আগেই যদি ওকে ধরতে পারি তবেই মঙ্গল।

কপাল ভাল বলতে হবে, লোকটা পড়ে যাওয়ার আগেই ক্যানী তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল; কিন্তু জড়িয়ে ধরার সঙ্গে-সঙ্গে অবাক হয়। আর একটু হলেই সে তাকে ঝাঁকানি দিয়ে ফেলে দিয়েছিল আর কি! মানুষটি মাতালও নয়, কুঁজোও নয়; ওভারকোটে ঢাকা বার কি তের বছরের একটি ছেলে। ছেলেটি কাঁদতে-কাঁদতে করুণ স্বরে বলল—আমার কত খিদে পেয়েছে তা যদি আপনি জানতেন মাদাম; ঠাণ্ডা হাড়ের ভেতরে কাঁপুনি ধরেছে আমার। ওঃ মরে গেলাম।

ছেলেটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ক্যানী বলল—আহা রে! এই ব'লে সে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরল। ছেলেটিকে ক্রমাগত ফোঁপাতে দেখে সে যান্ত্রিকভাবেই বলতে লাগল···কেঁদ না বাছা। ভয় পেয়ো না। আমি কত ভাল তা তুমি দেখতে পাবে। আমার বাসায় বেশ ভাল আগুন রয়েছে। সেখানে তোমার শরীর তুমি গরম করতে পারবে।

কিন্তু তারা যখন ঘরে পৌঁছলো তখন চুল্লী নিবে গিয়েছে; তবে ঘরটা বেশ গরমই রয়েছে। ঘরে ঢোকামাত্র ছেলেটা বলল—আঃ! কী গরম। রাস্তার চেয়ে জায়গাটা অনেক ভাল। আজ ছ' দিন আমি রাস্তায় রাত কাটাচ্ছি। তারপরে সে বলল—আজ দু'দিন আমি খেতে পাই নি, মাদাম।

ফ্যানী তার কাবার্ডটি খুলে কিছু বিস্কুট বার করল। তারপরে, সামান্য একটু ব্র্যানডি, আর দু'টুকরো চিনির সঙ্গে জল মিশিয়ে এক গ্লাস সরবত তৈরী ক'রে সে তাকে দিল। ছেলেটা গোগ্রাসে তাই খেয়ে ফেলল। খেয়ে-দেয়ে ছেলেটা তার কাহিনী বলল।

আত্মীয় বলতে তার একমাত্র আপনজন ছিলেন তার ঠাকুরদা। সয়সোঁতে তিনি ঘরবাড়ি সাজানোর কাজ করতেন। মাসখানেক আগে তিনি মারা যান। মারা যাওয়ার সময় তিনি তাকে বলে যান—একখানা চিঠি রেখে গেলাম। এই চিঠি নিয়ে প্যারিসে তুমি আমার ভাই-এর কাছে যাবে। তিনিই তোমার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। যেমন ক'রেই হোক, তোমাকে প্যারিসে যেতেই হবে, একমাত্র সেইখানেই তোমার চিত্রকর হওয়ার আশা পূর্ণ হ'তে পারে।

বৃদ্ধটি মারা যাওয়ার পরে [তিনি হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন] সে চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্যারিসের দিকে। সঙ্গে তার ছিল মাত্র তিরিশটি ফ্রাঁ; ওইটুকুই ছিল বৃদ্ধের শেষ সম্বল। ঠিকানা নিয়ে বাড়িটা খুঁজে পেল বটে; কিন্তু ভদ্রলোকের দেখা পেল না। মাসছয়েক আগে তিনি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছেন তা কেউ জানে না। বেচারা একা। রাস্তা খরচ বাদ দিয়ে যেটুকু তার কাছে ছিল তাই দিয়ে সে কয়েকটা দিন কোনমতে চালালো: তারপরে সে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটু-আধটু শুকনো রুটি চিবিয়ে দিন কাটতে লাগল। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা সে একেবারে অনাহারে রয়েছে।

ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতে, ফোঁপাতে-ফোঁপাতে, আর হাই তুলতে-তুলতে সে তার কাহিনী শেষ করল। কৌতূহল হওয়া সত্ত্বেও ফ্যানী তাকে কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না। বরং সে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—আজ থাক। তুমি বরং ঘুমিয়ে পড। আবার কাল শুনব।

শুয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্যানীও তার পোশাক ছেড়ে তার পাশে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। কেন কাঁদতে লাগল তার কোন কারণ সে বুঝতে পারল না।

পরের দিন ফ্যানী কিছু ধার ক'রে তাকে নিয়ে বাইরে খেয়ে এল; তারপরে অন্ধকার হয়ে এলে সে ছেলেটাকে বলল—তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমার কাজ শেষ হ'লে তোমার কাছে আমি আসব। অবশ্য সে আগেই ফিরে এল—রাত্রি তখন দশটার কাছাকাছি। তার কাছে বারটা ফ্রাঁ

ছিল। ছেলেটার হাতে তা-ই দিয়ে ক্যানী হেসে বলল—আমার কপালটা ভাল। মনে হচ্ছে তোমার জন্তেই আমার কপাল আজ ফিরেছে। অস্থির হয়ো না। আমার জন্তে অপেক্ষা করো। আমি যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ তুমি বরং মশলা মেশানো কিছু দুধ খাও।

এই ব'লে ছেলেটিকে চুমু খেয়ে ক্যানী বেরিয়ে গেল। ছেলেটির ওপরে সত্যিই তার একটা বাৎসল্যরস পড়েছিল। ঘণ্টাখানেক পরে নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করার জন্তে পুলিশ ক্যানীকে গ্রেপ্তার ক'রে জেলে পাঠিয়ে দেয়।

ছেলেটির আবার সেই ভবঘুরে জীবন সুরু হয়।

পনের বছর পরে একদিন সকালে খবরের কাগজে একটি সংবাদ প্রকাশিত হল। সংবাদটি হল বিখ্যাত অভিনেত্রী ক্যানী ক্লালিয়েতকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো হয়েছে। এই সেই বিখ্যাত সুন্দরী অভিনেত্রী যার জন্তে তিনজন মানুষ আত্মহত্যা করেছে; যার অর্দ্ধনগ্ন অভিনয় দেখার জন্তে প্যারিসের লোকেরা প্রেক্ষাগৃহের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। রোগটা হঠাৎ আক্রমণ করে তাকে। রোগটা আর কিছু নয়, সাধারণ পক্ষাঘাত। ক্যানীর দেনা ছিল অনেক। দেনা শোধ হওয়ার পরে তার যাকিছু সম্পত্তি থাকবে তাতে তাকে অনাথ আশ্রমে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

এই সংবাদটি পড়ে চিত্রকর ফ্রাঙ্কোয় গিরল্যাণ্ড বললেন—'কিছুতেই তা হবে না। ক্যানীর জীবন ওইভাবে শেষ হবে না।' কারণ, এ সেই ক্যানী। সেদিক থেকে কোন সন্দেহ ছিল না তার। ক্যানী তার দুঃস্থ সময়ে তাকে যে একদিন সাহায্য করেছিল তা সে কোনদিনই ভুলতে পারে নি। শিশু অবস্থায় তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাও সে কম করে নি। কিন্তু বড় অদ্ভুত জায়গা এই প্যারিস। আর অনেক চেষ্টা এবং কষ্টের পরে তাকেও মানুষ হ'তে হয়েছে; এখন সে বেশ নাম করেছে। সে ক্যানীকে কেবল দূর থেকে দেখেছে; দেখেছে স্টেজের ওপরে, দেখেছে সে যখন স্টেজ থেকে বেরিয়ে তার সেই রাজকীয় গাড়ীতে উঠছে। সে-সময়ে ক্যানীর সামনে সে কি এগোতে পারে? সে কি তাকে তখন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে যে তখন তার দাম ছিল পাঁচ ফ্রাঁ। না; নিশ্চয় না। সেইজন্তেই সে তার পিছু-পিছু গিয়ে দূর থেকে তাকে ধন্তবাদ জানিয়ে ফিরে এসেছে।

কিন্তু সেই ঋণ শোধ করার সময় এসেছে আজ। এবং সেই দেনা সে শোধও করল। এখন সে চিত্রকর হিসাবে নাম করেছে সেকথা সত্যি; ভবিষ্যৎও যে তার যথেষ্ট রয়েছে সেকথাও মিথ্যে নয়; তবু সে ধনী নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? সেই ভবিষ্যৎ মর্টগেজ দিয়ে সে একটি আর্ট ডিলারের দোকানে চাকরি নিল। তারপরে সে সেই হতভাগ্য রমণীটিকে একটি বেশ ভাল উন্মাদ আশ্রমে নিয়ে গেল যেখানে তার সেরা চিকিৎসাই

কেবল হবে না, সেবাও হবে যথেষ্ট। কিন্তু হায়রে, পক্ষাঘাত কাউকেই ক্ষমা করে না। মাঝে-মাঝে বিড়ালের মত সে তার শিকারকে একটু ছেড়ে দেয় বটে; তারপরে আবার ভীষণভাবে কামড়িয়ে ধরে। ফ্যানীর অবস্থাও সেই-রকম দাঁড়াল। একদিন ডাক্তার তাকে বললেন—আপনি এঁকে নিয়ে যেতে চান? উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আবার এঁকে নিয়ে আসতে হবে। কারণ, এ-রোগ সারার নয়। বড়জোর মাসখানেক। তা-ও যদি মানসিক উত্তেজনা না দেখা দেয়।

দেখা দিলে?

মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া আর কিছু বলার নেই। তবে, আক্রমণ ত্বরান্বিত হোক অথবা না-ই হোক, ফলটা হবে মৃত্যু।

সেদিক থেকে আপনি নিশ্চিৎ?

একেবারে নিশ্চিৎ।

ক্রাস্কোয় ফ্যানীকে উন্মাদ-আগার থেকে বার ক'রে নিয়ে এল; তার জন্যে বেশ একটা চমৎকার অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া করল; আর তার সঙ্গে থাকার জন্যে উঠে গেল সেইখানে। বুড়ো হয়েছে ফ্যানী, মুটিয়ে গিয়েছে বেশ; চুলগুলো সব সাদা হয়ে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে আবোল-তাবোল কী সব চিন্তাও করে। অনেকদিন আগে যে শিশুটির ওপরে সে করুণা দেখিয়েছিল তাকেও সে আর চিনতে পারল না। সেও তাকে স্মরণ করিয়ে দিল না। সে তার মনে এই ধারণাই জাগিয়ে দিল যে একটি ধনী যুবক তাকে গভীর-ভাবে শ্রদ্ধা করে। কোন রক্ষিতাকে আজ পর্যন্ত তার প্রেমিক অত ভালবাসে নি। তিন সপ্তাহ পরেই আবার সে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হল; আর তাতেই মৃত্যু হল তার; কিন্তু এই তিনটি সপ্তাহই প্রেমিকের ভালবাসা আর অজস্র চুম্বনে সে মসগুল হয়ে ছিল।

সেদিন চিত্রকরদের ডিনারের শেষে ক্রাস্কোয়ের শেষ ছবিটি নিয়ে সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল। সেই সময় একজন বেশ ঘৃণার সঙ্গে মন্তব্য করল—হ্যাঁ, ওই সুদর্শন যুবক ক্রাস্কোয় গিরল্যানড।

দ্বিতীয় বক্তা প্রথম বক্তার অন্তর্নিহিত বক্তব্যটিকে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ ক'রে বলল—ঠিক, ঠিক। এ সেই সুদর্শন ছোকরা গিরল্যানড-ই বটে! ও ছোকরাই একটি রক্ষিতার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল।

একটি নরম্যানডি মস্করা

[A Normandy joke]

শোভাযাত্রাটি রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছিল। রাস্তার দু'পাশে গাছের ছায়া পড়েছে। দু'পাশের গাছগুলি সারিবন্দী হ'য়ে চড়াই বেয়ে 'ফার্ম' অবধি চলে গিয়েছে। নববিবাহিত দম্পতি চলেছে আগে; তাদের পেছনে চলেছে আত্মীয়-স্বজন; তাদের পেছনে নিমন্ত্রিতের দল; শেষে চলেছে গরীব লোকেরা। সেই সরু রাস্তার চারপাশে মাছির মত যে সব গ্রাম্য ছোকরারা ছড়িয়ে ছিল তারাই কেবল ছোটাছুটি করছিল; শোভাযাত্রাটিকে ভালভাবে দেখার জন্যে তারা শেষ পর্যন্ত গাছের ডালে চ'ড়ে বসল।

বরের নাম জাঁ পাতু; যুবক, সুদর্শন, আশপাশে বর্দ্ধিষ্ণু চাষী ব'লে পরিচিত। সবার ওপরে বেশ ভাল খেলোয়াড়। এই খেলার জন্যে সে পাগল; এই খেলার নেশা চরিতার্থ করার জন্যে সে কুকুর, মালি, আর বন্দুকের ওপরে অজস্র খরচ করত। কনের নাম রোজালি রোসেল। সম্ভাব্য সমস্ত যুবকই তার পাণিপ্রার্থী ছিল। তার কারণ ছিল দুটি: প্রথমত: তার হৃদয়গ্রাহী চেহারা; দ্বিতীয়ত: তার নিজস্ব কিছু সম্পদ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পাতুকেই বেছে নিল। তারও পেছনে কারণ ছিল ওই দুটো; প্রথমত:, সে পাতুকেই সকলের চেয়ে বেশী পছন্দ করত; দ্বিতীয়ত, আর এইটাই ছিল আগের চেয়ে বড় কারণ, বেশ বিচক্ষণ নরম্যান মেয়েদের মতই সে বুঝতে পেরেছিল পাতুর অবস্থা তার অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছল।

যখন তারা ফার্মের সাদা তোরণের মধ্যে ঢুকে এল ঠিক এমনি সময়ে চল্লিশবার বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ হল। কে বা কারা বন্দুক ছুঁড়লো তা কেউ দেখতে পেল না। বন্দুকধারীরা খাদের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। এই শব্দে পুরুষরা খুশি হল খুব। তারা সব তাদের বেশ ভাল-ভাল পোশাক পরে এসেছিল। স্ত্রীকে পেছনে ফেলে পাতু দৌড়ে গেল। তার চাকর একটা গাছের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। তার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে সে একবার ছুঁড়ল; তারপরে ঘোড়ার মত মাটিতে পা ঠুকতে লাগল। আপেল ফলে একেবারে নুয়ে পড়েছিল গাছগুলো। তাদের নীচে দিয়ে লম্বা-লম্বা ঘাস মাড়িয়ে শোভাযাত্রাটি আবার এগোতে লাগল। বাছুররা তাদের বড়-বড় চোখ তুলে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভোজনাগারের কাছাকাছি আসামাত্র পুরুষেরা সবাই সিরিয়াস হ'য়ে উঠল। তাদের মধ্যে যারা ধনী তাদের লম্বা চকচকে সিল্কের টুপী; অবশ্য ঠিক ওই জায়গায় টুপীগুলি খুবই বেখাপ্পা দেখাচ্ছিল। আর সবাই পুরনো চাদর

দিয়ে তাদের মাথা ঢেকে রেখেছে। তার ওপরে চাপিয়েছে টুপী। সব মহিলাদের গায়েই আলগা ক'রে জড়ানো শাল। তাদের সেই রঙচঙে শাল দেখে গোবরের গাদার ওপর থেকে কালো-কালো মুরগীগুলো অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল। পুকুরের ধারে হাঁস আর খড়ো-চালের ওপরে পায়রাগুলোও আশ্চর্য হয় নি। বিরাট ফার্মের ঘরগুলি নানারকম সুখাদ্যের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। শোভাযাত্রীরা ধীরে-ধীরে উঠোনের ওপরে এসে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। পরিখার ধারে গ্রামের ছেলেরা আর দরিদ্ররা সারি দিয়ে দাঁড়াল। বন্দুক ছোঁড়া বন্ধ হয় নি। বরং শোভাযাত্রীরা ভেতরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আবার চারপাশ থেকে বন্দুকের গর্জন উঠল, ধোঁয়া আর ধুলোতে ভরে উঠল চারপাশ।

বিরাট ডাইনিঙ হলে টেবিলের ওপরে খাবার সাজানো হয়েছে। এতবড় ঘর যে একসঙ্গে প্রায় একশ' লোক খেতে পারবে। বেলা দুটোর সময় তারা খাওয়া সুরু করল। রাত্রি যখন আটটা তখনও তারা একনাগাড়ে খেয়ে চলেছে। জামার হাতা তুলে, ওয়েস্ট কোটের বোতাম খুলে, মুখ লাল ক'রে পুরুষেরা গোগ্রাসে গিলছে; মনে হচ্ছে তাদের ক্ষুধা মেটানো একটা অসম্ভব ব্যাপার। পরিচ্ছন্ন এবং লাল গ্লাসগুলিতে সিডারের মদ ঝলসে উঠছে; এবং প্রতিটি ডিশ উদরস্থ করার পরে তারা একগ্লাস ক'রে ব্র্যানডি গলায় ঢালছে। ফলে, উত্তেজনার ঢল নামছে তাদের দেহে; মাথার ভেতরে মূর্খ চিন্তাগুলি সুড়সুড়ি দিতে শুরু করেছে। মাঝে-মাঝে এক-একজন অতিথি পিপের মত পেট ফুলিয়ে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্যে একএকবার কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাচ্ছে; তারপরে ফিরে আসছে দ্বিগুণ খিদে নিয়ে। তাদের স্ত্রীরা কিন্তু স্বামীদের অনুকরণ করছে না। তাদেরও মুখগুলি সব লাল হয়ে উঠেছে; অন্তর্বাসগুলি ফেটে যাওয়ার উপক্রম করেছে। তারপরে হঠাৎ একজনের ভীষণ অস্বস্তি লাগতে সে উঠে একটু বাইরে গেল। তাকে দেখে সব মহিলারাই পিছু-পিছু বাইরে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল তারা; নতুন মস্করায় গা ভাসিয়ে দিল। বিয়ের রাত্রিটা বর-কনে কীভাবে মধুনিশি যাপন করবে তাই নিয়ে সব্বাই টেবিলের ধারে বসেই নানারকম ঠাট্টা ইয়ার্কি জুড়ে দিল। তারপর একসময় সেগুলিও সব নিঃশেষ হ'য়ে গেল। গত একশ' বছর ধরে বিয়ের ভোজে এই একই ধরনের রসিকতা চলে আসছে; তবু প্রতিটি বিয়েতেই অতিথিরা সেই একই রকমের ঠাট্টা-ইয়ার্কী ক'রে চলেছে; সবাই তাই শুনে আগের মতই গড়িয়ে পড়ছে হেসে।

টেবিলের একেবারে শেষ প্রান্তে প্রতিবেশী যুবকরা নবদম্পতিকে নিয়ে কিছু বাস্তব রসিকতা করার পরিকল্পনা আঁটছিল। পরিকল্পনাটা ঠিক কি ধরনের হবে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিস-ফিস ক'রে আলোচনা করছিল আর হাসছিল। হঠাৎ একজন বলে উঠল—এই চাঁদনী রাতে পোকাদেরই

পোয়াবারো, তাই না জাঁ? এই কথা শুনে জাঁ, অর্থাৎ বরটি, ঝটিতি তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল—একবার ব্যাটারা আসুক না, তারপরে বোঝা যাবে। অপর যুবকটি হেসে বলল—কিন্তু তাই ব'লে তাদের জন্যে আজকের রাত্রিতে তোমার কর্তব্যে নিশ্চয় তুমি অবহেলা করবে না।

এই কথা শুনে সবাই এমন হো-হো ক'রে হেসে উঠল যে টেবিল কাঁপতে লাগল…ঝনঝন ক'রে উঠল টেবিলের ওপরে রাখা গ্লাসগুলি। কিন্তু ভীষণ চটে উঠল জাঁ। সুযোগ পেয়ে চোরের দল রাত্রিতে তার খেত-খামারে চুরি ক'রে পালাবে এটা সে সহ্যই করতে পারল না। সে-ও চেঁচিয়ে বলল—ব্যাটারা আসুক না একবার। মজাটা বুঝিয়ে দেব।

অতিথিরা সব বিদায় নিয়ে গেলে নবদম্পতি তাঁদের ঘরে ঢুকে গেল। এবারে রাত্রির মত তাদের বিশ্রাম। বেশ গরম থাকায় জানালাটা খুলে খড়-খড়িগুলি এঁটে দিল জাঁ। ড্রয়ারের ওপরে ছোট একটা বাতি জ্বলছিল। কনের বাবা এটি তাদের উপহার দিয়েছিলেন। শয্যা প্রস্তুতই ছিল। এই বিছানায় প্রথম শোওয়ার জন্যে সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা যে একটু দ্বিধা করে এদের সেরকম কোন দ্বিধা ছিল না।

যুবতীটি ইতিমধ্যেই তার গলার মালা খুলে ফেলেছে; খুলে ফেলেছে তার পোশাক; কেবলমাত্র সায়াটি পরে সে তখন তার জুতোর ফিতে খুলছে। আর জাঁ তার সিগারেটে শেষ টান দিয়ে তির্যকভাবে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। এই দৃষ্টির মধ্যে প্রেমের চেয়ে কামনার উদ্দীপনাই ছিল বেশী। তারপরে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই রকম একটা মেজাজ দেখিয়ে জাঁ তার কোটটা খুলে ফেলে এগিয়ে আসতেই যুবতীটি বলল—যাও; মশারির মধ্যে লুকিয়ে পড়। আমি আসছি।

মনে হল লুকোতে সে রাজি নয়; তারপরে একটু ধূর্তের মত চোখের কোণ দিয়ে হেসে সে বিছানার মধ্যে ঢুকে একমাত্র মাথাটা ছাড়া সমস্ত দেহটাই ঢাকা দিয়ে দিল। যুবতীটি হেসে জাঁর চোখ দুটো চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল; তারপরে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা অস্বস্তি বোধ না করে দু'জনেই তারা বিছানার ওপর ধস্তাধস্তি করতে লাগল। তারপরে ধস্তাধস্তিটা যখন চরমে উঠেছে, এবং জাঁ যখন মেয়েটিকে চুমু খাওয়ার জন্যে মরীয়া হ'য়ে উঠেছে এমন সময় হঠাৎ দূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ হ'ল।

সন্দেহাকুল হ'য়ে জাঁ বিছানা থেকে উঠে পড়ল; তারপরে সে জানালার কাছে দৌড়ে গিয়ে দুরু-দুরু বুকে শার্সিগুলি খুলে দিল। পরিপূর্ণ চাঁদের আলো এসে পড়েছে উঠোনের ওপরে; আপেলের গাছগুলি কালো-কালো ছায়ার সৃষ্টি ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে; দূরে মাঠের বুকে পাকা ফসল নেচে-নেচে উঠছে। ব্যাপারটা কী, শব্দটা কোনদিক থেকে আসছে বোঝার জন্যে ঝুঁকে পড়েছে এমন সময় তার স্ত্রী দুটি নগ্ন হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফিস-

ফিস করে বলল—ওসব এখন থাক; তোমার সঙ্গে ও-শব্দের কোন সম্বন্ধ নেই। শোবে এস।

জঁ। ফিরে দাঁড়াল; জড়িয়ে ধরল তার বৌকে; সেই নগ্ন দেহটাকে বুকের ওপরে জড়িয়ে ধরে তার দেহের উষ্ণতা উপভোগ করল; তারপরে দু'হাতে তাকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আবার সেই বন্দুকের আওয়াজ! দু'জনেই কান পেতে শুনল। এবার আওয়াজটা যেন খুব কাছেই হ'ল। রাগে ফেটে পড়ল জঁা। চীৎকার ক'রে সে ব'লে উঠল—হায় ভগবান, তুমি কি মনে কর তোমার কাছে থাকার জন্যে ব্যাপারটা কী তা আমি দেখব না? একটু অপেক্ষা কর। আমি এখনই আসছি।

এই বলেই সে জুতো জোড়াটা পরল; দেওয়ালের গায়ে সব সময়েই তার একটা বন্দুক ঝোলানো থাকতো; সেই বন্দুকটা সে টেনে নিল এবং তার স্ত্রীর কোন বাধাই গ্রাহ্য না ক'রে জানালা টপকে সে উঠোনের ওপরে লাফিয়ে পড়ল।

রোসেল অপেক্ষা করতে লাগল—এক ঘন্টা, দু' ঘন্টা। শেষ পর্যন্ত সকাল হয়ে গেল; তবু তার স্বামী ফিরল না। ফিরল না দেখে তার মাথা খারাপ হ'য়ে গেল; সে চীৎকার ক'রে সবাইকে জাগাল; গত রাত্রিতে জঁা ক্ষেপে গিয়ে যে পোকাদের পেছনে ধাওয়া করেছে সে-কথাও সবাইকে জানাল। এই সংবাদ শুনেই চাকরবাকররা ছুটলো তাদের মনিবের খোঁজে। ফার্ম থেকে দু' লীগ দূরে তারা মনিবকে খুঁজে পেল। তার হাত-পা বাঁধা; বেচারা রাগের দাপটে অর্দ্ধমৃত প্রায়; তার বন্দুকটা ভেঙে গিয়েছে; ট্রাউজার ওল্টানো; তিনটে মরা শশক তার গলায় ঝোলানো রয়েছে। সেই সঙ্গে বুকের ওপরে একটা প্ল্যাকার্ড লাগানো; তাতে লেখা রয়েছে—যে অপরের পেছনে তাড়া ক'রে সে তার নিজের জায়গা হারায়।

এবং পরে সে যখন তার বিয়ের রাত্রির ঘটনা বলত সে সাধারণত এই কথাটা যোগ করে দিত—ঠাট্টা হিসাবে এটা ভালই। হতচ্ছাড়াগুলো খরগোসের মত আমাকে ধরার জন্যে জাল পেতেছিল। তারা একটা ব্যাগের মধ্যে আমার মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। একবার যদি ব্যাটাদের ধরতে পারতাম তাহলে একবার মজাটা দেখিয়ে দিতাম।

বিয়ের দিনে নরম্যানডিতে লোকেরা এইরকম মজা করত।

আর্টিস্ট

[The artist]

বৃদ্ধ বাজিকর আমাকে বলল···ব্যাপারটা আর কিছু নয়, মঁসিয়ে, অনুশীলন আর অভ্যাস! অবশ্য কিছুটা প্রতিভা চাই। আঙুল নরম হ'লে চলবে না; তবে, তারচেয়েও বড় কথা হচ্ছে অভ্যাস, আর অনেক বছর ধ'রে প্রত্যহ অনুশীলন।

তার এই বিনয়নম্র বচন আমাকে অবাক ক'রে দিল; কারণ, যে সমস্ত দাম্ভিক বাজিকরদের খেলা আমি দেখেছি এই বাজিকরটি তাদের সকলের চেয়ে দক্ষ এবং চতুর। তার খেলা আমি প্রায়ই দেখেছি; আমার মত সবাই দেখেছে—সার্কাস বা অন্যান্য খেলায় সে খেলে। তার খেলাটা হচ্ছে একটা কাঠের গায়ে হেলান দিয়ে একটি পুরুষ অথবা মেয়েছেলে দু'হাত প্রসারিত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। আর সে দূর থেকে সেই মানুষটির আঙুলের ফাঁকের মধ্যে অথবা তার মাথার পাশে ছুরি ছুঁড়ে বিঁধে দেয়। যদিও ছুরিগুলি বেশ ধারালো, আর দেহ থেকে কিছুটা দূরে কাঠের ওপরে সেগুলি আটকে যায় তবুও কৌশল জানলে কোন খেলোয়াড়ের কাছেই এটা এমন একটা কিছু অসামান্য দক্ষতার ব্যাপার নয়। শুধু ছুঁড়ে দেওয়ার দ্রুততা, আর যে অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে ছুরিটা জীবন্ত মানুষের দিকে দৌড়ে যায়—এই দুটি জিনিসই যে-কোন প্রদর্শনীতে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। তবুও সার্কাসে এটা অতি সাধারণ পর্যায়ের খেলা।

কিন্তু এই খেলার মধ্যে কোনরকম কৌশল নেই, নেই কোন প্রতারণা, দর্শকের চোখে ধুলো দেওয়ারও প্রচেষ্টা নেই কোন। এসব কেবল খেলার জন্যে খেলা; এর মধ্যে ফাঁকি দেওয়ার কোন বাসনা নেই। এই বৃদ্ধ বাজিকরটি খুরের মত ধারালো ছুরিটাকে একেবারে দেহের গা ঘেঁষে কাঠের ওপরে বিঁধে দেয়, ঠিক দুটো আঙুলের ফাঁকে। এইভাবে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মানুষটির মাথার চারপাশে ছুরির পর ছুরি দিয়ে বৃত্ত সাজায়, গলার পাশে ছুরিগুলি গলবন্ধনীর মত এঁটে বসে। তখন করোটিড আর্টারী না কেটে কেউ তাকে বার ক'রে আনতে সক্ষম হবে না; আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাজিকরটি এই দুঃসাধ্য কাজ করে নিজের চোখ দুটো পুরু 'অয়েল ক্লথে' ঢেকে।

স্বাভাবিকভাবেই অন্য সব বড় কলাবিদদের মতই তাকেও কেউ স্বীকৃতি দেয় নি। সবাই বিশ্বাস করত ওটা নিছক কৌশল; ওই মুখোশটা ছিল তাদের কাছে আরও একটা ধাপ্পা···যে ধাপ্পাটা অতি সাধারণ।

তারা বলাবলি করত···লোকটা আমাদের বোকা মনে করে, তাই না?

না দেখে লোকটা কী ক'রে লক্ষ্যবস্তুর দিকে অমন অনায়াসে ছুরি ছোঁড়ে?—তারা ভাবত ওই অয়েল-ক্লথের ভেতরে খুব ছোট-ছোট ফুটো রয়েছে। খেলা সুরু হওয়ার আগে দর্শকদের অয়েল-ক্লথটা পরীক্ষা করতে দিয়েও কোন কাজ হোত না। কোন ফুটোই তাদের চোখে পড়ত না; আর পড়ত না ব'লেই তারা বিশ্বাস করত বাজিকর তাদের নিশ্চয় ঠকাচ্ছে। এই সব খেলায় দর্শকদের যে প্রতারিত হওয়া উচিৎ তা কি তারা জানত না?

সেই বৃদ্ধ বাজিকরটির মধ্যে যে কলাবিদটি লুকিয়েছিল আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম। তার মধ্যে যে বিন্দুমাত্র প্রতারণা ছিল সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিৎ ছিলাম। সেকথা তাকে আমি খুলেও বলেছিলাম। তার প্রতি আমি যে সুবিচার করছি এটা বুঝতে পেরে সে অভিভূত হয়েছিল। ফলে আমাদের দু'জনের মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্ব জন্মেছিল। জন্মেছিল ব'লেই তার দক্ষতার আসল উৎস কোথায় সে কথাটা সে আমাকে বলেছিল। তার পক্ষে যেকোন কৌশল করা একেবারে অসম্ভব—আমার এই অভিমত শুনে সে আমাকে বলল—নিশ্চয়; এতটা অসম্ভব যে আপনি কল্পনাও করতে পারেন না; কিন্তু কাদের একথা আমি বোঝাবো—কে বুঝবে?

তার মুখ কালো হয়ে গেল; চোখে ভরে এল জল। আর তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে আমি সাহস পেলাম না। আমার চোখ-মুখের চেহারা দেখে সে নিজেই বলল—অবশ্য সে কথাটা আপনাকেই বা আমি বলব না কেন? আপনি আমাকে বুঝবেন। তারপরে স্বরটাকে হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর বিকৃত ক'রে সে বলল—আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক—সে অন্তত বোঝে।

কে?

আমার হতচ্ছাড়া বৌ। হায় মঁসিয়ে, মেয়েটা যে কী ধরনের জঘন্য তা যদি আপনি জানতেন? হ্যাঁ; সে জানত। খুব ভালই জানত আমার কৌশলটা কোথায়! সেই জন্যেই আমি ঘেন্না করি। আমাকে প্রতারণা করার জন্যে যতটা, তার চেয়ে বেশী এই জন্যে। প্রতারণা করাটা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম; এবং ক্ষমার্হ। কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধটি সাংঘাতিক।

যে মেয়েটি হাত প্রসারিত ক'রে একটা কাঠের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, যার মাথার চারপাশে বাজিকর খুরের মত ধারালো অজস্র ছুরি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে বিঁধতো—সেই মেয়েটিই তার স্ত্রী। বয়স তার সম্ভবতঃ চারের কোঠায়; দেখতে ভালই মনে হয়; কিন্তু সেই সৌন্দর্য মানুষের মনে বিতৃষ্ণা জাগায়। তার মুখের আদল ঔদ্ধত্যে মাখা—মুখটা স্থূল জৈব-কামনায় উদ্দাম—এক-কথায় কুৎসিত। আমি অনেকদিন লক্ষ্য করেছি বাজিকর যখন তার মাথার চারপাশে ছুরির বৃত্ত এঁকে দিত তখন মেয়েটি হাসত; হাসিটা মৃদু; কিন্তু শুনলে মনে হবে এ হাসির পেছনে একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে; অনেকটা ব্যঙ্গের হাসির মত। এই হাসিটিকে আমি সবসময় পরিবেশের উপযুক্ত

হাসি ব'লে ধরে নিয়েছিলাম, সেই জন্তে বাজিকর যখন হাসির উদ্দেশ্ত আমাকে বুঝিয়ে বলল তখন আমি যথেষ্ট অবাকই হ'য়ে গেলাম—হাসিটা তার শুনলেন? সে আমাকে ঠাট্টা করছে—আমাকে অগ্রাহ্য ক'রে হাসছে। কারণ, সে জানে তার কোন ক্ষতি হবে না। তার আমি যাই করতে চাই না কেন, যত ক্ষতিই তার করা উচিৎ হোক না কেন—সে জানে শেষ পর্যন্ত তার কোন কিছু করাই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

কী তুমি করতে চাও?

যা বাবা! কিছুই আপনি বুঝতে পারছেন না? আমি তাকে খুন করতে চাই।

তাকে খুন করতে চাও—কারণ সে তোমার··· ?

কারণ সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে? না, না। মোটেই তা নয়। আমি আবার বলছি মোটেই তা নয়। সেজন্তে তাকে আমি অনেকদিন আগেই ক্ষমা করেছি। তাছাড়া, ওটা আমার অভ্যাসও হ'য়ে গিয়েছে। তাকে প্রথম ক্ষমা করার সময় একটা কথা তাকে বলে আমি অন্যায়ই করেছি। আমি তাকে বলেছি একদিন তাকে আমি খুন করব; এমনভাবে করব যে কেউ বুঝতে পারবে না যে আমি তাকে খুন করেছি—সবাই ভাববে নেহাৎ-ই ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।

তাই বুঝি?

অবশ্যই। সেইরকমই বাসনা ছিল আমার। তাকে যে খুন করার অধিকার আমার আছে সেকথা আপনিও স্বীকার করবেন। আর কাজটা কত সহজ, কত লোভনীয়। ভেবে দেখুন; একটু ইতরবিশেষ হলেই ব্যাস্? আধ ইঞ্চি এদিক-ওদিক—ছুরিটা গলা ফুটো ক'রে কণ্ঠনালীটা এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দেবে। তারপরেই সব সাফ। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে চারপাশে—তারপরেই সব শেষ। সে মারা যাবে; আমারও চরিতার্থ হবে প্রতিহিংসা।

নিশ্চয়, নিশ্চয়; খুব সত্যি কথা; ভয়ঙ্কর রকমের সত্যি কথা।

আর তার জন্তে আমাকে কোনরকম ঝুঁকি নিতে হবে না। একটা দুর্ঘটনা। দুর্ভাগ্য। আমাদের পেশায় এরকম দুর্ঘটনা দু' চারটে এমন হয়ই। আমাকে তারা দায়ী করবে কী ক'রে? আর করবেই বা কেন? ভুল ক'রে নরহত্যা ছাড়া অন্য কোন অভিযোগই আমার বিরুদ্ধে টিকবে না। আমাকে বরং তারা করুণা দেখাবে। আমার বৌ, আমার বৌ ব'লে আমি চীৎকার করব; বলব, ও আমার এত উপকারী বন্ধু ছিল। রুজি রোজগারের অর্দ্ধেকটাই নির্ভর করত ওর ওপরে। আমার খেলার সাথী। কী বলেন?

নিশ্চয়ই। এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তাছাড়া এই রকম প্রতিহিংসা যে সুন্দর প্রতিহিংসা সেকথাও আপনি স্বীকার করবেন। আর এমন একটা প্রতিহিংসা যা আমি নিরাপদ হয়েই

চরিতার্থ করতে পারি।

আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।

হচ্ছে তো! অথচ আমার এই মনের বাসনাটা যখন আমার বৌকে বেশ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম তখন সে কী বলল জানেন?

বলল, তুমি একটি সৎ বালক; এমন ভয়ানক কাজ মোটেই তুমি করবে না···

থামুন থামুন। আপনি যা ভাবছেন আমি মোটেই তা নই; যদিও বিস্তারিতভাবে আপনাকে ব'লে কোন লাভ নেই, তবু জেনে রাখুন রক্ত দেখে ভয় পাওয়ার বান্দা আমি নই; তার কাছেও প্রমাণ দেখানোর প্রয়োজনীয়তা আমার ছিল না কারণ সে ভালই জানত আমাকে· বিশেষ ক'রে একটি বিষয়ে আমার দক্ষতা যে অসাধারণ সেটা জানতে তার বাকি ছিল না।

এবং সে ভয় পায় নি?

উহুঁ। সে কেবল বলল আমি যা করব বলে শাসাচ্ছি তা আমি করতে পারব না। বিবেচনা করুন কথাটা। আমি করতে পারব না।

কেন পারবে না?

বুঝতে পারছেন না? কেন পারছেন না? আমি কি আপনাকে বলি নি কী দীর্ঘ, কষ্টসাধ্য কঠোর অনুশীলন করে চোখ বুজিয়ে ছুরিগুলিকে আমি লক্ষ্যস্থলে বেঁধার অভ্যাস আয়ত্ত করেছি?

বলেছিলে। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

কী হয়েছে? আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে কঠোর সাধনার ফলে চোখ বেঁধে ছুরি ছোঁড়ার কৌশলটা আমি আয়ত্ব করেছি সেই সাধনা-ই যে ভুল করার ইচ্ছে সত্বেও আমাকে ভুল করতে দেবে না সে-কথাটা সে বুঝতে পারে নি?

এও কি সম্ভব?

আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি এর চেয়ে বেশী সত্য আর কিছু নেই। ওই দুর্বিনীতা অবাধ্য মেয়েমানুষটার গলা কাটার জন্যে একটু ভুল করার জন্যে অনেক চেষ্টা আমি করেছি; কিন্তু পারি নি। ফলে, ওই বেশ্যাটা সব সময় আমাকে উপহাস ক'রে হেসেছে।

কথা বলতে-বলতে তার চোখ দুটো জলে ভরে এল। সে রাগে গরগর করতে-করতে দাঁতে-দাঁত চিপে বলল—আপনি আমাকে যতটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি নিজে আমাকে যতটা জানি, ওই মেয়েটা তার চেয়েও অনেক বেশী আমাকে চেনে। ও জানে আমি আর মানুষ নই, নিখুঁৎ একটা যন্ত্র। এ যন্ত্র কোনদিন বিগড়ে যাবে না। সে জানে ভুল করতে আমি পারব না, পারব না।

কনসারভেটরী

[The conservatory]

মঁসিয়ে লারবোর আর মাদামের বয়সের মধ্যে বিশেষ একটা হেরফের ছিল না, দু'জনের মধ্যে মঁসিয়ের চেহারাটা একটু কৃশই ছিল; বাইরে থেকে তাঁকে কিঞ্চিৎ ছোট-ই দেখাত। ছাপানো তুলো বিক্রী ক'রে বেশ বড়লোক হয়েছিলেন মঁসিয়ে; মাঁতিসের গ্রাম্য অঞ্চলে বেশ সুন্দর একটি বাড়ি তৈরী ক'রে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে সেখানে বসবাস করতেন। বাড়িটির চারপাশ ঘিরে ছিল একটি সুন্দর বাগান; উঠোনে একটি মুরগীর খোঁয়াড়, একটি চাইনীজ প্যাভিলিয়ন; আর বাগানের শেষ প্রান্তে ছিল গাছ-পালা প্রতিপালন করার জন্যে একটি সবুজ ঘর—যাকে সাধারণত কনসারভেটরী বলা হয়।

ছোটখাট, বেঁটে মানুষ মঁসিয়ে—খুবই স্ফূর্তিবাজ, নিজের সম্বন্ধে বেশ উৎসাহী। ঠিক বিপরীত ছিলেন মাদাম—রোগা, একগুঁয়ে, খিটখিটে মেজাজের। স্বামীর হাসিখুশি ভাবটা মোটেই তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। চুলে তিনি কলপ মাখাতেন; পড়তেন সস্তা ধরনের প্রেমের উপন্যাস; তাতেই অনেক সময় বিভোর হ'য়ে থাকতেন। বাইরে থেকে তাঁকে বেশ কল্পনা এবং ভাবপ্রবণা মহিলা বলে মনে হোত; যদিও কোনদিনই ভাব ব'লে কোন বস্তুই তাঁর মধ্যে ছিল না এতটুকু। কিন্তু স্ত্রীর কথা বলতে মঁসিয়ে একেবারে গদগদ হ'য়ে যেতেন।

বছর কয়েক ধরে ভদ্রমহিলা স্বামীর ওপরে বড়ই দুর্ব্যবহার করে চলেছেন। মনে হচ্ছে তাঁর মনের গভীরে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে তাকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে তুলেছে। ফলটা দাঁড়াল দু'জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি। দু'জনের মধ্যে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেল। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর তিক্ত বাক্যবাণে সুযোগ পেলেই ভদ্রমহিলা স্বামীকে একেবারে জর্জরিত করতে লাগলেন।

ঝড় সুরু হলেই মঁসিয়ে চুপচাপ মাথাটি নীচু ক'রে দাঁড়াতেন; বিরক্ত হ'তেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু বাদানুবাদের দিকে যেতেন না; নিজের রসিকতা দিয়ে সবকিছু অত্যাচারকে লঘু করে নিতেন। কিন্তু স্ত্রীর এই ধরনের অস্বাভাবিক আচরণের কারণটা কী সেইটা খুঁজে বার করতে না পেরে তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন; কারণ এই অপ্রকৃতিস্থতার পেছনে সত্যিকার যে একটা কারণ রয়েছে সেবিষয়ে তাঁর কোনরকম সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আসল রোগটা তিনি কিছুতেই খুঁজে পেলেন না।

তিনি প্রায়ই স্ত্রীকে বলতেন—ব্যাপারটা কী বলত? আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগটা কী? তুমি যেন কিছু লুকোচ্ছ বলে মনে হচ্ছে।

মাদাম সবসময়ে বলতেন—হবে কী! কিছুই হয় নি আমার। তাছাড়া, যদি কিছু হয়েই থাকে তাহলে কী হয়েছে সেটা তোমারই অনুমান করা উচিৎ। যেসব পুরুষ ম্যাদামারা, যারা কিছুই বুঝতে পারে না তাদের আমি পছন্দ করিনে।

তিনি বেশ অস্বস্তির সঙ্গে বলতেন—বুঝতে পারছি তুমি আমাকে কিছুই বলতে চাও না।

এই বলে নারীহৃদয়ের রহস্য সন্ধান করতে-করতে তিনি বেরিয়ে যেতেন।

বিশেষ ক'রে রাত্রির জীবনটাই তাঁর কাছে দুর্বিসহ হয়ে উঠত। কারণ কথাবার্তা বন্ধ হলেও রাত্রিতে বিছানায় শোওয়াটা তাঁদের বন্ধ হয় নি। এই সমযেই মাদাম তাঁর স্বামীকে তিতিবিরক্ত করে মারতেন। এই সময়েই যত চোখা-চোখা স্বর মাদামের হাতে থাকত তাই দিয়ে স্বামীকে তিনি বেপরোয়া বিঁধে যেতেন। মাদামের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল একটি।—সেটি হচ্ছে স্বামী তাঁর দিন-দিন মোটা হচ্ছেন; ফলে বিছানার প্রায় সবটাই তিনি জুড়ে থাকতেন। স্বামীর গায়ের ঘাম তাঁকে ক্লেদাক্ত ক'রে তুলত। এতে কি তাঁর গা ঘিন-ঘিন করে না?

অতি ছোট-ছোট কারণে মাদাম তাঁকে রাত্রিতে ঠেলে তুলে দেবেন। বলবেন—'নীচের ঘরে খবরের কাগজটা ভুলে ফেলে এসেছি; যাও নিয়ে এস।' অথবা অরেঞ্জ কোয়াসের বোতলটা লুকিয়ে রেখে সেটা খুঁজে আনার নির্দেশ। বেচারা খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে ফিরে এলে মাদাম মুখ ঝাঁকানি দিয়ে বলবেন—'বুদ্ধু কোথাকার! কোথায় রয়েছে তা তোমার জানা উচিৎ।' তারপর সেই নিস্তব্ধ ঘুমন্ত বাড়ির প্রতিটি জায়গায় ঘণ্টাখানেক ধরে ঘুরে-ঘুরে শূন্য হাতে মঁসিয়ে ফিরে এলে মাদাম ধন্যবাদের বাণীতে বলবেন—ঠিক আছে। শুয়ে পড়, তুমি দিন-দিন যেরকম মোটা হচ্ছ—এই ঘোরাঘুরিতে দেহের চর্বি তোমার কিছুটা কমবে।

মাদাম প্রায়ই রাত্রে অভিযোগ করবেন—তাঁর ভীষণ পেট কামড়াচ্ছে। সেই রোগের উপশমের জন্যে ফ্যানেল কাপড়ে ও-ডি-কোলন মিশিয়ে স্বামীকে দিয়ে তাঁর তলপেটটি মালিশ করাবেন। তাঁকে একটু সুস্থ করার জন্যে ভদ্রলোক আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে পরিচারিকা সিলেস্তিকে ডাকার আয়োজন করলেই মাদাম দাঁত খিঁচিয়ে বলতেন—মূর্খ কোথাকার! যন্ত্রণাটা কমেছে। এখন তুমি ঘুমোতে পার; অপদার্থ কোথাকার!

মঁসিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—ভাল লাগছে তো?

মাদাম ধমক দিয়ে বলতেন—নিশ্চয়। এখন দয়া করে ঘুমোতে দাও, কানের কাছে বকবক করো না। অপদার্থ কোথাকার! মহিলাদের তলপেটে একটু মালিশ ক'রে দেবে সে-সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত তোমার নেই।

কিন্তু…

থাক, থাক ; আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। এখন থাম।

এই ব'লে দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে মাদাম শুয়ে পড়েন।

একদিন রাত্রিতে মাদাম অকস্মাৎ এমন জোরে তাঁকে ঝাঁকানি দিলেন যে মঁসিয়ে ধড়ফড় ক'রে বিছানার ওপরে উঠে বসলেন। কাঁচা ঘুম তখনও একেবারে ভাঙে নি তাঁর। জড়িয়ে-জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী···কী··· ব্যাপার ?

তাঁর একটা হাত জাপটে ধরে আর একটা হাত দিয়ে তাঁকে মাদাম এইসা জোরে চিমটি কাটতে লাগলেন যে বেচারা মঁসিয়ে যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠলেন। মাদাম ফিস-ফিস ক'রে বললেন—শব্দ হচ্ছে !

মাদামকে তিনি ভালই চিনতেন ; তাই তাঁর কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মঁসিয়ে বেশ মিষ্টি গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—কী রকম শব্দ বলত ?

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে মাদাম দাঁত খিঁচোলেন—কী রকম শব্দ ! ঘরের মধ্যে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাই নাকি ? আরে না, না ! কে বলে মনে হচ্ছে তোমার ?

ভয়ে হিম হয়ে গেলেন মাদাম—চোর, আবার কে ?

মঁসিয়ে নির্বিবাদে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললেন—কেউ না, কেউ না। তুমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছ।

ভদ্রমহিলা কম্বল ছুঁড়ে ফেলে খাট থেকে লাফিয়ে মেঝেতে নেমে বললেন —শুধু বুদ্ধুই নও—একেবারে কাপুরুষ। তোমার সাহস নেই বলে কেউ আমাকে খুন করে যাবে তা আমি সহ্য করব না।

এই বলে চুল্লীর পাশ থেকে কয়লা-তোলা একটা চিমটি তুলে নিয়ে বন্ধ দরজার সামনে মাদাম শত্রুর আশায় বীরদর্পে এসে দাঁড়ালেন।

স্ত্রীর এবম্বিধ আচরণে কিঞ্চিৎ লজ্জা পেয়ে মঁসিয়ে গজ-গজ করতে-করতে কয়লা তোলা কোদাল নিয়ে তাঁর মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন।

স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে এইভাবে কুড়িটি মিনিট কেটে গেল। আর কোন শব্দ শোনা গেল না। তারপরে মাদাম রাগে গর-গর করতে-করতে বিছানায় শুয়ে বললেন—নিশ্চয় ঘরে কেউ ঢুকেছিল।

পরের রাত্রিতেও সেই একই ব্যাপার ঘটলো। সেদিন ঝগড়ার ভয়ে ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে স্ত্রীর মুখোমুখী যুদ্ধং দেহী ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। কিন্তু তার পরের রাত্রিতেই ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করল। মাদাম মাঝরাতে হাঁপাতে-হাঁপাতে তাঁর স্বামীকে জোরে-জোরে ধাক্কা দিয়ে বললেন —এই, এই। কেউ এইমাত্র আমাদের পেছনের দরজাটা খুলল। নিশ্চয়, হ্যাঁ।

মাদামের কথা শুনে ভদ্রলোক ভাবলেন নিশ্চয় মাদাম ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন। সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন থেকে তাঁকে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই তিনিও হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন—একটা মৃদু শব্দ যেন তাঁর কানেও লাগছে

মনে হচ্ছে।

মনে হ'তেই তিনি লাফ দিয়ে উঠে জানালার দিকে দৌড়ে গেলেন; উঁকি দিয়ে দেখলেন—একটি সাদা পোশাক পরা মূর্তি যেন তাঁদের পাশের রাস্তা দিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে গেল। তিনি বিড়বিড় ক'রে বললেন—হ্যাঁ, একটা লোকই বটে।

তারপরেই তিনি সজাগ হ'য়ে উঠলেন। সাহস ফিরে এল তাঁর। রাগে গর-গর করতে লাগলেন—তিনি বেশ বুঝতে পারলেন বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। তিনি বিড়-বিড় ক'রে বললেন—দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজাটা। এই ব'লে ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বার ক'রে দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

মাদাম ভয়ে তাঁর পেছনে কিছুটা চেঁচাতে লাগলেন—গুসতেভ, গুসতেভ, আমাকে একলা ফেলে যেয়ো না।

কে কার কথা শোনে? তিনি তখন তরতর ক'রে নেমে খিড়কীর দরজা খুলছেন।

মাদাম উপরে উঠে এসে অগত্যা ঘরে খিল এঁটে দিলেন।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনের মিনিট। চুপচাপ বসে রইলেন মাদাম। একটা আতংক এসে আক্রমণ করল তাঁকে। তারা নিশ্চয় গুসতেভকে খুন ক'রে ফেলেছে। রিভলবারের আওয়াজ পেলেও তিনি বুঝতে পারতেন যে গুসতেভ দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করছেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সেই পরিপূর্ণ নিঃস্তব্ধতায় মাদামের সমস্ত শরীর ভয়ে জমাট বেঁধে গেল।

সিলেস্তিকে ডাকার জন্তে তিনি বেল টিপলেন। সিলেস্তির কোন সাড়া-শব্দ নেই। মেয়েটা বেঁচে রয়েছে কিনা তা-ও বোঝা গেল না। এবারে তিনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়বেন। সমস্ত বাড়িটাই থমথম করছে যেন। জানালার উপরে কপালটা চেপে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না। সাড়ে বারটা বাজলো। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মত হল তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছেন। আর তাঁকে তিনি দেখতে পাবেন না। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে তিনি হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন।

দরজার ওপরে মৃদু দুটি টোকা পড়তেই মাদাম লাফিয়ে উঠলেন। বাইরে থেকে মঁসিয়ের গলা শোনা গেল—দরজা খোল। আমি এসেছি।

মাদাম দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন; তারপরে ছলছল চোখে কোমরে দুটো হাত দিয়ে চীৎকার ক'রে বললেন—জানোয়ার কোথাকার! ভয়ে আমি মরে যাচ্ছি। আমাকে একলা ফেলে কোন্ চুলোয় গিয়েছিলে শুনি?

দরজা বন্ধ ক'রে মঁসিয়ে হাসতে-হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি! তারপরে হাসির উচ্ছ্বাস সামলাতে না পেরে দুটো হাত দিয়ে তিনি পেট টিপে ধরলেন।

মাদাম অবাক; একেবারে নির্বাক হতভম্ব হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

মঁসিয়ের মুখ থেকে পুরো কথা বেরোল না; তিনি আমতা-আমতা ক'রে বললেন—কনসারভেটরীতে সিলেস্তি···সঙ্গে একটা ছোকরা। আমি কী দেখলাম তা যদি তুমি জানতে···

ঘৃণায় বিবর্ণ হ'য়ে গেলেন মাদাম।

কী বললে! সিলেস্তি·? আমার বাড়িতে···? আমার···আমার কনসারভেটরীতে? আর ছোকরাটাকে খুন না করে তুমি ফিরে এলে? তোমার হাতে রিভলবার ছিল না?

ভাবাবেগে মুহ্যমানা হ'য়ে মাদাম বসে পড়লেন।

সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মঁসিয়ে ঘুরে-ঘুরে নাচতে সুরু করলেন, জিব দিয়ে ক্লিক-ক্লিক শব্দ ক'রে হাসতে-হাসতে বললেন—তুমি যদি জানতে···তুমি যদি জানতে···

হঠাৎ মঁসিয়ে মাদামকে চুমু খেয়ে ফেললেন।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রাগে কাঁই হ'য়ে মাদাম বললেন—এতবড় আস্পর্দা! আমার বাড়িতে। কালই তাকে দূর করে দেব।

মাদামের কোমর জড়িয়ে সেই আগেকার দিনগুলির মত মঁসিয়ে অজস্র শব্দ ক'রে মাদামকে চুমু খেতে লাগলেন। মঁসিয়ের কাণ্ড দেখে চুপ ক'রে গেলেন মাদাম। মুখ থেকে বাক্যস্ফূর্তি হল না তাঁর, মাদামকে জড়িয়ে ধরে বিছানার দিকে এগোতে লাগলেন মঁসিয়ে।

পরের দিন সকাল সাড়ে ন'টা পর্যন্ত মনিবদের কোন সাড়া না পেয়ে সিলেস্তি আস্তে-আস্তে দরজায় টোকা দিল।

পাশাপাশি শুয়ে মাদাম আর মঁসিয়ে বেশ খুশ মেজাজেই গল্প করছিলেন। অবাক হ'য়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে সিলেস্তি বলল—কফি খাওয়ার সময় হয়েছে মাদাম।

মাদাম মিষ্টি সুরে বললেন—এখানেই নিয়ে এস। কাল রাত্রিতে আমাদের মোটেই ঘুম হয় নি!

সিলেস্তি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মঁসিয়ে মাদামকে কাতু-কুতু দিতে-দিতে আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন—তুমি যদি কেবল জানতে, কেবল জানতে···

মাদাম আলতোভাবে মঁসিয়ের চোখে চুমু খেয়ে বললেন—চুপ ক'রে শোও। অত হাসলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

আজকাল মাদামকে আর খিটখিট করতে শোনা যায় না।

সিলেস্তির মাইনে তাঁরা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মঁসিয়ের মেদ কিছুটা কমেছে।

একটি বৃদ্ধ

[An old man]

সমস্ত খবরের কাগজে নিম্নলিখিত একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হল :

বন্দোলীর নতুন অঞ্চলটি অনেক দিন থাকা অথবা স্থায়ীভাবে বাস করার উপযুক্ত হয়েছে। এর জলের গুণ উৎকৃষ্ট ; রক্ত পরিশ্রুত করার মত এত ভাল জল পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। তাছাড়া পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে এখানে যাঁরা স্থায়ীভাবে বাস করেন তাঁরা সাধারণত দীর্ঘজীবি হন। এই আশ্চর্য ঘটনার একমাত্র কারণ বোধ হয় পার্বত্য অঞ্চলের ফার গাছের অরণ্যের মধ্যে এই ছোট শহরটির অবস্থান। ঘটনাটি সত্য যে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে স্থানটি দীর্ঘ জীবনের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এরপর সাধারণ মানুষে ছুটতে সুরু করল সেইদিকে।

একদিন সকালে নবাগত মঁসিয়ে দারেঁার বাড়িতে ডাক্তারের ডাক পড়ল। দিনকয়েক হল ভদ্রলোক এই অঞ্চলে এসে বনের কিনারে একটি সুন্দর বাড়ি ভাড়া করেছেন। বেঁটেখাট মানুষটি ; বয়স অষ্টআশী। বেশ ফূর্তিবাজ, স্বাস্থ্যবান, এবং কর্মঠ। বয়সটা লুকিয়ে রাখার জন্যে ভদ্রলোক কী মেহনত-ই না করেন।

ডাক্তারকে বসতে দিয়ে তিনি তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করতে সুরু করলেন।

ডাক্তার, আমার স্বাস্থ্য ভালই। সংযত জীবন-যাপন করার জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। যদিও আমি এখনও বৃদ্ধের পর্যায়ে পড়ি নি ; তবু বয়স আমার কম হয় নি। তথাপি রোগমুক্ত বলতে আপনারা যা বোঝেন আমি সেই রকমই। লোকে বলে স্বাস্থ্যের পক্ষে এখানকার জলবায়ু উত্তম। আমিও তা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। কিন্তু এখানে স্থায়ীভাবে বাস করার আগে জায়গাটা যে সত্যিই স্বাস্থ্যকর তার কিছু প্রমাণ আমার চাই। আমি সেই জন্যে চাই সপ্তাহে একবার ক'রে আপনি এখানে এসে আমাকে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি দিয়ে যাবেন।

আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই শহর এবং আশপাশে আশীর ওপরে কত জন লোক বাস করেন। সেই সমস্ত মানুষদের কিছু শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাও আমার জানা দরকার। তাঁদের পেশা কী, নেশা কী, তাঁদের জীবনযাত্রার ধরণ এবং অভ্যাসের সম্বন্ধেও কিছু জানতে চাই আমি। তাঁদের মধ্যে কেউ মারা গেলেই ঠিক কেন মারা গেলেন সে-বিষয়েও আশা করি আপনি আমার কাছে পূর্ণ বিবরণ দাখিল করবেন।

তারপরে তিনি বেশ মিষ্টি করেই বললেন—আমি আশা করি ডাক্তার, আমরা পরস্পরের বন্ধু হ'তে পারব। এই বলেই তিনি তাঁর কোঁকড়ানো ছোট হাতটি বাড়িয়ে দিলেন।

মঁসিয়ে দাঁরো সবসময়ে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকতেন। বিপজ্জনক মনে করেই জীবনের সবকিছু আমোদ-প্রমোদই তিনি বর্জন করেছিলেন। তিনি মদ খান না—যে মদ জীবনদায়ী—এই কথা শুনে লোকে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলে তিনি বলতেন—'জীবনের দাম আমার কাছে মদের চেয়ে বেশী।' আমার শব্দটির ওপরে তিনি এমন একটা জোর দিতেন যে মনে হোত তাঁর জীবনের যেন বিশেষ একটি অর্থ রয়েছে। তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে অন্য মানুষের জীবনের যে একটা পার্থক্য রয়েছে সেই ইঙ্গিতটা তাঁর কথার মধ্যে এমনভাবে প্রকাশ পেত যে অন্য সবাই তাঁকে অন্য কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেত না।

তিনি অন্য সবাইকেই অপদার্থ বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তারা সবাই শূন্য পৃথিবীটাকে ভরিয়ে রাখার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছে। এই মনুষ্য সমাজকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করেছেন : কোন-কোন মানুষদের তিনি অভ্যর্থনা জানাতেন কারণ কোন বিশেষ কারণে হয়ত তারা তাঁর সামনে এসে পড়েছে ; আর কিছু মানুষকে তিনি কোন অভ্যর্থনা জানাতেনই না। কিন্তু এই দুই জাতীয় মানুষই তাঁর কাছে সমানভাবে অবান্তর ছিল।

প্রথম দিন ডাক্তার শহরের সতেরটি বাসিন্দার তালিকা নিয়ে এলেন। এঁদের সকলেরই বয়স আশীর ওপরে। এই তালিকাটি পেয়ে দাঁরোর মন নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে সেই বৃদ্ধদের জন্যে তাঁর মনে একটা কীরকম যেন উদ্বেগও জন্মালো। হয়ত এঁরা একজনের পর আর একজন জীবনপথের ধারে ঝরে যাবেন ; আর তাই হয়ত তিনি দেখবেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। প্রতিটি বৃহস্পতিবার ডাক্তার তাঁর বাড়িতে ডিনার খেতে আসতেন। সেই সময় ডাক্তারকে তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা ডাক্তার, যোশেফ পেনকোটে আজ কেমন আছেন ? গত সপ্তাহে শুনেছিলাম তাঁর শরীরটা ভাল ছিল না। ডাক্তার পেনকোটের স্বাস্থ্যের বুলেটিন দাখিল করলে তিনি স্বাস্থ্য ভাল রাখার কয়েকটি প্রক্রিয়ার কথা তাঁকে বলতেন এই উদ্দেশ্যে যে, যদি সেই প্রক্রিয়াতে পেনকোটের উন্নতি হয় তাহলে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে নিজেও তিনি সেগুলি পালন করতে পারবেন। এই সতেরটি বৃদ্ধের ওপর দিয়েই তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন ; এবং এদেরই মাধ্যমে তিনি কিছু শিক্ষাও লাভ করেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার এসে বললেন—রোজালী মারা গিয়েছেন।

মঁসিয়ে দাঁরো চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কিসে মারা গেলেন ?

ঠাণ্ডায়।

বৃদ্ধটি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপরে বললেন—ভদ্রমহিলা বড় মোটা ছিলেন ; ওজনটাও তাঁর বেশ বেড়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া, নিশ্চয় তিনি বেশী খেয়েছিলেন। তাঁর মত বয়স হলে আমার ওজন যাতে না বাড়ে সেদিকে আমি সাবধান হব। [রোজালীর চেয়ে তিনি ছিলেন দু'বছরের বড় ; কিন্তু বাইরে বলে বেড়াতেন তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি।]

মাস কয়েক পরে ডাক এল হেনরী ব্রিসোত-এর। সংবাদটা পেয়ে খুব ঘাবড়িয়ে গেলেন দাঁরো। এবারে দেহ রাখলেন একজন পুরুষ ; চেহারাটা তাঁর রোগাই ছিল। বয়সের দিক থেকেও তাঁরা তিন মাসের কাছাকাছি ; তাছাড়া, নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও তিনি বেশ সচেতন ছিলেন। সংবাদটা পেয়ে দাঁরো কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না ; ডাক্তার কী বলেন তাই শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

তারপরে তিনিই বললেন—তা'হলে, হঠাৎই মারা গেলেন ? কিন্তু গত সপ্তাহেও তো তাঁর শরীরটা ভালই ছিল। আমার ধারণা ডাক্তার, নিশ্চয় সে কোন বোকার মত কাজ করেছিল।

বেশ আমোদ পেলেন ডাক্তার ; বললেন—আমার তা মনে হয় না। তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে শুনলাম স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন।

কথাটা শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না দাঁরো ; ভয়ে তাঁর বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু, কিন্তু মানুষটা শেষ পর্যন্ত মারা গেল কিসে ?

প্লুরিশীতে।

আনন্দে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাততালি দিয়ে উঠলেন—আমি আপনাকে আগেই বলেছি ডাক্তার, নিশ্চয় তিনি একটা কিছু বোকার মত কাজ করেছিলেন। ডিনারের পরে নিশ্চয় তিনি একটু হাওয়া খেতে বাইরে বেরিয়েছিলেন। তারই ফলে ঠাণ্ডা লেগেছে। ওটা কোন রোগ নয়, দুর্ঘটনা। প্লুরিশীতে কারা মারা যায় ? মূর্খেরা !

তারপরে বেশ ফূর্তির সঙ্গেই তিনি ডিনার খেলেন ; যাঁরা বেঁচে রয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

এখন রইলেন পনেরজন। তাঁরা সবাই সুস্থ রয়েছেন, তাই না ডাক্তার ? জীবনটাই তো এইরকম। সবচেয়ে দুর্বলরাই প্রথমে মারা যায়। যারা তিরিশের ওপরে বাঁচে, তাদের ষাট পর্যন্ত বাঁচার সম্ভাবনা থাকে। যারা ষাট ছাড়িয়ে যায়, তারা বাঁচে আশী বছর পর্যন্ত। আর যারা আশীর গাঁট পেরোয়, তারা শতায়ু হওয়ার শক্তি রাখে। তারাই বেঁচে থাকার সবচেয়ে যোগ্য মানুষ।

বছরের মধ্যে আরও দুজন মারা গেলেন ; একজন ডিসেন্টি তে, আর

একজন দম বন্ধ হয়ে।

তিনি মন্তব্য করলেন—ডিসেপ্টি হয় তাদের যারা খাওয়ার বিষয়ে সতক নয়। চুলোয় যাক ডাক্তার। এই খাওয়ার ব্যাপারে আপনার সতর্ক হওয়া উচিৎ ছিল।

আর যে মানুষটি দম বন্ধ হয়ে মারা গেলেন? তাঁর মৃত্যুর জন্যে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতাই দায়ী; তবে সেই বিকলতার কারণটা কী সেটা কেউ লক্ষ্য করেনি।

কিন্তু একটি সন্ধ্যায়, পল তিমোনেত-এর মৃত্যু ঘোষণা করলেন ডাক্তার। সবাই আশা করেছিল ভদ্রলোক শতায়ু হবেন।

কিসে মারা গেলেন ভদ্রলোক?

তা জানিনে।—মাথা নাড়লেন ডাক্তার।

জানেন না মানে? ডাক্তারে জানে না এ হতেই পারে না। স্নায়বিক কোন গোলযোগ?

না; তা নয়।

লিভার কিংবা কিডনী সংক্রান্ত কিছু?

উঁহু।

তাঁর পাকস্থলীটা ঠিক কাজ করছিল কিনা তা কি আপনি দেখেছিলেন? অনেক সময় বদহজমের জন্তে স্ট্রোক হয়।

মঁসিয়ে দাঁরো বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন; বেশ উত্তেজনার সঙ্গেই বললেন—তিনি নিশ্চয় কোন-না-কোন একটা অসুখে মারা গিয়েছেন। সেটা কী বলে আপনার মনে হয়?

ডাক্তার তাঁর হাত দুটি প্রসারিত করে বললেন—কিছুই বুঝতে পারছিনে। তিনি মারা গেলেন বলেই মারা গেলেন। এছাড়া অন্ত কোন কারণ আমার চোখে পড়ছে না।

ভাবের আতিশয্যে মুহ্যমান হয়ে দাঁরো জিজ্ঞাসা করলেন—বয়স কত হয়েছিল বলুন তো?

উননব্বুই।

সেই ক্ষুদে চেহারার বৃদ্ধটি অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইলেন; তারপরে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন—উননব্বই। সুতরাং মৃত্যুটা যে কারণেই হোক, সেটা নিশ্চয় বার্দ্ধক্য নয়।

প্রবঞ্চনা

[A ruse]

বৃদ্ধ ডাক্তার এবং তাঁর যুবতী রোগিনী আগুনের ধারে বসে গল্প করছিলেন। ভদ্রমহিলার সত্যিকার কোন অসুখ ছিল না। সুন্দরী মহিলাদের মাঝে-মাঝে যে সব স্ত্রীরোগ জন্মায় তিনিও সেরকম একটা রোগে ভুগ্‌ছিলেন; কিছুটা স্নায়বিক দুর্বলতা, একটু রক্তাল্পতা, অথবা, সামান্য ক্লান্তি। প্রেমে পড়ে বিয়ে করার পরে প্রথম মাসের শেষে নববিবাহিত দম্পতিরা সাধারণতঃ এইরকম ক্লান্তিতে ভোগে।

সোফার ওপরে শুয়ে ভদ্রমহিলা বলছিলেন—না ডাক্তার, যেসব নারীরা স্বামীদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে আমি তাদের বুঝতে পারিনে। সে তার স্বামীকে ভালবাসতে না পারে, বিয়ের সময় যেসব প্রতিজ্ঞা সে করেছিল সেগুলি সে পালন করতে না পারে, কিন্তু তাই বলে সে কেমন ক'রে অন্য পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে? অন্য লোকের চোখেই বা সে ধুলো দেয় কী করে? মিথ্যাচার আর বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে সে ভালই বা বাসে কেমন করে?

ডাক্তার হেসে বললেন—কোন রমণী যখন সরল ও সংকীর্ণ পথ পরিত্যাগ ক'রে বিপথে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তখন ছোটখাট দ্বন্দ্ব বা আচার ব্যবহার নিয়ে সে আদৌ মাথা ঘামায় না। আমার বিশ্বাস, বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা আর হতাশার আগুনে না পুড়লে কোন নারীই প্রকৃত ভালবাসার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু এই বিবাহিত জীবনটা কী? কোন একটি বিখ্যাত মানুষের মতে বিবাহিত জীবনটা হচ্ছে দিনের বেলায় নারী-পুরুষের মধ্যে সোচ্চার কলহ, আর রাত্রিতে দুর্গন্ধের ছড়াছড়ি। কথাটা সত্যি; বিয়ের আগে কোন মহিলা কাউকে গভীরভাবে ভালবাসতে পারে না। যদি তাকে একটি বাড়ির সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে আমি বলতে বাধ্য যে যতক্ষণ না পর্যন্ত স্বামী-নামক পদার্থটি সেই বাড়ির গালিশ-পলেস্তরা চটিয়ে দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই নারী কামযোগ্যা হয় না।

আর ছলা-কলার কথা যদি বলেন তাহলে এই সব ক্ষেত্রে মহিলাদের কোন ছলা-কলারই অভাব হয় না। যে-সব মহিলাদের অত্যন্ত সাদাসিদে ব'লে আমরা মনে করি তারাই বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়কর মিথ্যাবাদিনী; আর সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে থেকে নিজেদের তারা এমন সুন্দরভাবে বার ক'রে আনে যে মনে হবে তাদের মত প্রতিভাময়ী রমণী জগতে খুব কমই রয়েছে।

যুবতীটি বিশ্বাস করতে পারলেন না তাঁর কথা; বললেন—না ডাক্তার;

আমার বিশ্বাস, বিপজ্জনক পরিস্থিতিটি সম্পূর্ণ আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ার আগে পুরুষের কী করা উচিত ছিল সেকথা কেউ বুঝতে পারে না ; আর মেয়েদের কথা যদি বলেন তাহলে তারা এইরকম পরিস্থিতিতে অতি সহজেই মাথা হারিয়ে ফেলে।

ডাক্তার বললেন—'আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ার আগে,' তাই বললেন না। কথাটা সত্যি যে ঘটনাটা শেষ হওয়ার পরেই পুরুষেরা তাদের কাজ করার শক্তি ফিরে পায় ; কিন্তু মহিলারা ! · শুনুন তাহলে আমার আর একটি যুবতী রোগীর কাহিনী আপনাকে বলছি। আমি সব সময়েই তাঁকে নিষ্পাপ কুসুম বলে মনে করতাম।

'ঘটনাটা ঘটেছিল কোন একটি দেহাতি শহরে। একদিন রাত্রিতে আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম। সেই সময় আমার মনে হ'ল শহরের সব ঘণ্টাগুলি একসঙ্গে প্রচণ্ডভাবে বাজতে সুরু করেছে। ভেবেছিলাম, আমি স্বপ্ন দেখছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। বুঝতে পারলাম আমার ঘরের কলিঙ বেলটাই উন্মত্তের মত বেজে চলেছে। আমার চাকরের কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে আমি নিজেই বিছানার সঙ্গে লাগানো বোতাম টিপে কলিঙ বেলটা বন্ধ করে দিলাম। তারপরেই সুরু হল দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা। তারপরে চাকর জাঁ হাতে একটা চিরকুট নিয়ে হাজির হল। চিরকুটটা পড়ে বুঝলাম···মাদাম লেলিইভার তাঁর বাড়িতে এখনই একবার যাওয়ার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন।

'একটু চিন্তা ক'রে নিজেকেই নিজে বললাম—'স্নায়বিক বিকার, হিস্টিরিয়া অথবা, ওই জাতীয় কিছু হবে।' এই অনুমান করে আমি জবাব পাঠালাম—আমি অসুস্থ ; তিনি বরং আমার সহকর্মী মঁসিয়ে বোনেতের সঙ্গে দেখা করুন।

'চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে আবার আমি শুয়ে পড়লাম। আধ ঘণ্টা পরে আবার বেল বেজে উঠল। জাঁ এসে বলল—নীচে একজন অপেক্ষা করছেন। এমনভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে আগন্তুক পুরুষ কি মহিলা দেখা দায়। তিমি সরাসরি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চান। তিনি বলছেন দুটি মানুষের জীবন মরণ আপনার ওপরে নির্ভর করছে।

'উঠে বসে দর্শনপ্রার্থীকে উপরে ডেকে পাঠালাম।

'কালো পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে অশরীরির মত একটি মূর্তি জাঁর সঙ্গে আমার ঘরে এসে উপস্থিত হল। জাঁ বেরিয়ে গেলে, সে পোশাকটা একটু সরাতেই বুঝতে পারলাম আগন্তুকটি হচ্ছেন মাদাম বার্থা লেলিইভার। ওই অঞ্চলে সবচেয়ে সুন্দরী বলে তাঁর নাম রয়েছে। ভদ্রমহিলা বছর তিনেক হল বিয়ে করেছেন। তাঁর স্বামী শহরের বেশ একটি ধনী দোকানদার।

'অসম্ভব রকমের বিবর্ণ দেখাচ্ছিল তাঁকে। ভয়ে কাঁপছিলেন তিনি। দু'বার

তিনি কথা বলার চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। অবশেষে কোনরকমে তিনি বলে ফেললেন—তাড়াতাড়ি···তাড়াতাড়ি ডাক্তার···কিছুক্ষণ আগে আমার প্রেমিকটি আমার শোওয়ার ঘরে মারা গিয়েছেন।···কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার স্বামী ক্লাব থেকে ফিরে আসবেন। বলতে-বলতে ভাবাবেগে স্বর রুদ্ধ হ'য়ে গেল তাঁর।

'বিছানা থেকে লাফিয়ে নীচে নামলাম আমি। তাড়াতাড়ি পোশাক প'রে জিজ্ঞাসা করলাম—একটু আগে কি আপনিই এসেছিলেন?

'আতংকে স্থবিরের মত হয়ে তিনি বললেন—না। আমার পরিচারিকাকে পাঠিয়েছিলাম। সে সব জানে। আমি···আমি তার কাছেই বসেছিলাম।··· চলুন, চলুন।

'মাদামের গাড়িতে চেপেই রওনা হলাম দু'জনে। অন্ধকার গাড়ির ভেতরে হঠাৎ আমার দুটি হাত তাঁর সুন্দর আঙুলগুলি দিয়ে চেপে তিনি হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন···আমার কী হচ্ছে তা যদি আপনি জানতেন, ডাক্তার। আমি এই ছ'টি মাস ধরে তাকে পাগলের মত ভালবেসেছি।

বাড়িতে আর কেউ রয়েছে?

না, রোজ ছাড়া আর কেউ নেই। সে সব জানে।

'সামনের দরজায় হাজির হলাম আমরা। মনে হল চারপাশের সবাই ঘুমোচ্ছে। 'ল্যাচ কী' দিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে পা টিপে-টিপে আমরা উপরে উঠে গেলাম। দেখলাম একটি বাতি হাতে নিয়ে রোজ সিঁড়ির উপরে চুপচাপ বসে রয়েছে। মৃত লোকটির সামনে থাকতে সাহস হয় নি তার।

'শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেলাম আমরা। বিছানা একেবারে লণ্ড-ভণ্ড হয়ে রয়েছে। মনে হল, কিছুক্ষণ আগেই ওর উপরে একটা যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। চাদর পড়েছে ঝুলে; ভিজে তোয়ালে মেঝের ওপরে বেসিনের কাছে পড়ে রয়েছে। সম্ভবত সেই তোয়ালে ভিজিয়েই যুবকটির কপালে কিছুক্ষণ আগে প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল।

'মৃতদেহটি মেঝের উপরে লম্বালম্বি পড়ে রয়েছে চিৎ হ'য়ে। মৃতদেহটিকে নানাভাবে পরীক্ষা করে আমি দুটি মহিলাকে বললাম—আপনারা ধরুন। আমি একে বিছানায় শুইয়ে দিই।

'মহিলা দুটি এতক্ষণ আমার পাশে পাথরের মূর্তির মত চুপচাপ বসেছিল। মৃতদেহটিকে তাদের সাহায্যে আলতোভাবে বিছানার উপরে শুইয়ে আমি তার বুকের উপরে কানটা রেখে শুনলাম; তার জিবের সামনে একটা আরশী ধরলাম; তারপরে বললাম—না; মারাই গিয়েছে। আসুন, তাড়াতাড়ি একে পোশাক পরিয়ে দিই।

'মৃতদেহকে পোশাক পরানো কী কষ্টকরই না কাজ! সেই বিরাট 'ডল' পুতুলটির একটি-একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জামা পরাতে লাগলাম। আমি তাকে

মোজা পরালাম, আনডার প্যান্ট পরালাম, ট্রাউজার পরালাম; তারপরে পরালাম ওয়েস্ট কোট। দুজনেই এইদিকে অনেক সাহায্য করেছিলেন আমাকে। শেষকালে অনেক কষ্টে কোট পরালাম তাকে।

'পোশাক পরানোর ভয়ঙ্কর কাজ শেষ হওয়ার পরে আমি মৃতদেহটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। বললাম—এবার ওর চুলটা আঁচড়িয়ে দিতে হবে।

'চুল আঁচড়ানো হল। ইতিমধ্যে মাদাম পরিচারিকার হাত থেকে চিরুনীটা ছিনিয়ে নিয়ে গভীর স্নেহে মৃতদেহটির চুল আঁচড়াতে লাগল। মনে হল, তিনি যেন তাকে আদর করছেন। এইভাবেই প্রেমিকটিকে তিনি হয়ত আদর করতেন।

'অকস্মাৎ চুল ছেড়ে দিয়ে তিনি মৃতদেহটির মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যে মুখ তাঁর দিকে চেয়ে আর কোনদিন হাসবে না তার দিকে তাকিয়ে তিনি ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলেন। তারপরে তার বুকের উপর লুটিয়ে উন্মাদের মত তাকে চুমু খেতে লাগলেন। তারপরে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন—বিদায় প্রিয়তম, বিদায়।

'ঠিক এই সময় বারটা বাজার শব্দ হল। চমকে উঠলাম আমি। হায় ভগবান! এই সময়ই তো ক্লাবগুলি বন্ধ হয়। মাদাম, আসুন; নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই।

'মাদাম দাঁড়িয়ে উঠতেই আমি বললাম—চলুন, একে আমরা নীচে ড্রয়িঙ রুমে নামিয়ে নিয়ে যাই।

'ড্রয়িঙ রুমে তুলে এনে আমি তাকে সোফার ওপরে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলাম।

'এমন সময় সামনের দরজাটা খুলে বন্ধ হয়ে গেল। স্বামীটি এসে পড়েছেন। বারান্দার ওপর দিয়ে ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন বেশ বুঝতে পারলাম। কাছাকাছি আসতেই আমি চেঁচিয়ে বললাম—বন্ধু, এদিকে আসুন। এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

'মুখে সিগার নিয়ে মঁসিয়ে লেলিইভার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন; অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী ব্যাপার? এসবের অর্থ কী?

'তাঁর কাছে গিয়ে আমি বললাম—বন্ধু, আমরা সত্যিই বড় বিপদে পড়েছি। আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে এখানে এসে অনেকক্ষণ আমরা গল্প করছিলাম। হঠাৎ ইনি অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। গত দুটি ঘণ্টার আপ্রাণ চেষ্টাতেও এর জ্ঞান ফিরে আসে নি। অপরিচিত কাউকে আমি ডাকতে চাইনি, একে নীচে নিয়ে যেতে যদি আপনি আমাকে একটু সাহায্য করেন তাহলে এর নিজের বাড়িতেই এর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা যাবে।

'মঁসিয়ে অবাক হলেও ব্যাপারটা মোটেই সন্দেহ করতে পারেনি। তিনি টুপীটা খুলে আমাকে সাহায্য করার জন্তে এগিয়ে এলেন। মৃতদেহটিকে চ্যাংদোলা ক'রে আমরা নীচে নেমে এলাম। মাদাম বাতি ধরে আমাদের আলো দেখাতে লাগলেন।

'বাইরে বেরিয়ে আমরা গাড়ির কাছে দাঁড়ালাম, তারপরে কোচোয়ানের মনে যাতে কোন সন্দেহ না জাগে সেই উদ্দেশ্যে মৃতদেহটিকে আমি সাহস দিয়ে বললাম—এস, এস, কিছুই হয় নি তোমার। নিশ্চয় এখন তোমার ভাল মনে হচ্ছে। একটু চেষ্টা কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।

'মৃতদেহটা পিছলে পড়ছিল দেখে গাড়ির মুখে এনে জোরে একটা ধাক্কা দিলাম। মৃতদেহটা গাড়ির ভেতরে ছিটকে পড়ল। তারপরে গাড়ির ভেতরে ঢুকলাম আমি।

'মঁসিয়ে লেলিইভার উদ্বিগ্নভাবে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন —সিরিয়াস কিছু বলে মনে হচ্ছে কি?

'একটু হেসে তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললাম—'না'। মাদাম তাঁর আইনসঙ্গত স্বামীর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে রেখে গাড়িটির অন্ধকার গুহার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁদের সঙ্গে করমর্দন ক'রে কোচম্যানকে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিলাম। তাঁর বাড়িতে পৌছে, তাঁর বাড়ির লোকজনদের ডেকে বললাম—'রাস্তায় আসতে-আসতে ইনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।' এই কথা বলে তাদের সাহায্যে তাঁকে আমরা ওপরে তুলে নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি সার্টিফিকেট দিলাম যে ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে; কেবল তাই নয়; বিভ্রান্ত এবং শোকবিমূঢ় তাঁর পরিবারবর্গের সুবিধার্থে আমি আবার নতুন একটা নাটকের অভিনয় করলাম। সব শেষ ক'রে বাড়ি ফিরে বিছানায় এলিয়ে দিলাম নিজেকে; এলিয়ে দেওয়ার আগে বিশ্বের তাবৎ প্রেমিক-প্রেমিকাদের মুণ্ডপাত করতে ভুললাম না।

কাহিনীটি শেষ করে ডাক্তার হাসতে লাগলেন। যুবতীটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করলেন—এই ভয়ঙ্কর কাহিনীটা আমাকে শোনালেন কেন?

ডাক্তার মাথাটি নুইয়ে উত্তর দিলেন—ভবিষ্যতে আপনি যদি কোনদিন ওইরকম কোন পরিস্থিতিতে পড়েন তাহলে আমি আপনার কাজে লাগতে পারি—এই আশায়।

মরচে

Rust]

সারা জীবন ধরেই একটি অদম্য আকাঙ্খা তাঁকে গ্রাস ক'রে রেখেছিল—সেটি হচ্ছে শিকার। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা তিনি শিকার ক'রে বেড়াতেন; শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—কোন ঋতুতেই শিকারে ছেদ পড়ত না তঁ'র। শিকারের কথা ছাড়া কোন কথাই তিনি বলতেন না, শিকারের স্বপ্ন ছাড়া অন্ত কোন স্বপ্ন তিনি দেখতেন না; এবং তিনি সব সময়েই বলতেন—যে শিকার করতে ভালবাসে না সে করুণার পাত্র।

বয়স তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি; এখনও তিনি স্বাস্থ্যবান, শক্তিমান, মাথার ওপরে টাক পড়েছে সত্যি কথা; কিন্তু চেহারার দিক থেকে বেশ সমর্থ। শিকার করার সময় শিঙা ফুঁকতে যাতে অসুবিধে না হয় সেইজন্তে গোঁফ জোড়াটি তিনি ছোট ক'রে ছাঁটতেন।

এই অঞ্চলের সকলেই তাঁকে ডাকত মঁসিয়ে হেকটর নামে; কিন্তু তাঁর আসল নামটা হচ্ছে ব্যারণ—হেকটর গঁত্রা দি কুতিলিয়র। বনের একেবারে গভীর অংশে একটি জমিদার বাড়িতে তিনি থাকতেন। উত্তরাধিকারসূত্রে এই বাড়িটি তিনি পেয়েছিলেন। এ-অঞ্চলে যদিও অনেক অধিবাসীদের সঙ্গেই তাঁর আলাপ ছিল, তবু একটি বিশেষ বাড়ির সঙ্গেই তাঁর হৃদ্যতা ছিল; সেই বাড়িতেই তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এই সংসারটি হচ্ছে কুরভিলাস। এঁদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় প্রায় একশ বছরের কাছাকাছি। মঁসিয়ে হেকটর প্রায়ই বলতেন—'শিকার যদি আমার এত প্রিয় না হোত তাহলে সবসময়েই আমি এইখানে পড়ে থাকতাম।' মঁসিয়ে দি কুরভিল তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু এবং সঙ্গী। তিনি ছিলেন ভদ্র চাষী; স্ত্রী, কন্তা, এবং জামাতাকে নিয়ে ভদ্রলোক শান্তিতে তাঁর বাড়িতে বাস করতেন। তাঁর জামাতা ঐতিহাসিক গবেষণা করতেন। আসলে কিছুই করতেন না তিনি।

শিকারে তাঁর বীরত্বকাহিনীর বর্ণনা করার জন্তেই মঁসিয়ে হেকটর প্রায়ই তাঁর এই বন্ধুটির বাড়িতে ডিনার খেতে যেতেন। সেখানে গিয়ে তাঁর শিকারী কুকুর আর ফেরেটদের নিয়ে এত দীর্ঘ-দীর্ঘ কাহিনীর অবতারণা করতেন যে মনে হোত তারাও যেন মানুষ। তাদের চিন্তাধারা আর ক্রিয়াকলাপ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বলতেন—মিডর [তাঁর কুকুর] দেখল ক্রনক্রেক পাখিটা তার কিছু আগে-আগে এগিয়ে চলেছে। এই দেখে সে বলে,—'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি তোমাকে।' এই ব'লে সে আমার দিকে একবার তেরচাভাবে তাকিয়ে যেন ইশারা ক'রে বলে—'আপনি ওই গাছগুলির

দিকে এগিয়ে যান।' তারপরেই সে চীৎকার করতে-করতে সেই গাছগুলির দিকে ছুটে যায়। মিডরের পরিকল্পনা মত পাখিটাও সেইদিকে এগোতে থাকে। তারপরে পাখিটা হঠাৎ বুঝতে পারে সে মাঠের শেষে ফাঁকা জায়গাটায় এসে পড়েছে: বুঝতে পারে এবারে সে ধরা পড়েছে। বুঝতে পেরেই সে নীচু হ'য়ে বসে পড়ে। মিডর আমার দিকে তাকিয়ে পাখিটা কোথায় রয়েছে দেখিয়ে দেয়। তারপরে আমার ইঙ্গিতে সে পাখিটার দিকে ছুটে যায়। পাখিটা আকাশে উড়ে পড়ে, সেই সুযোগে গুলি করি আমি। মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়ে পাখিটা। মিডর পাখিটাকে কুড়িয়ে এনে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে আমাকে যেন বলে—সব পরিকল্পনা মত ঘটেছে। তাই না, মঁসিয়ে হেকটর? এই কাহিনী তিনি বেশ দরদ দিয়েই বলতেন। তাঁর কাহিনী শুনে তাঁর বন্ধু এবং দুটি মহিলা হেসে গড়িয়ে পড়তেন। অন্য কিছু আলোচনা হলেই হেকটর অন্য পাশে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাঁর শিকারের গান সুরু করে দিতেন।

সারাটা জীবনই তিনি এই শিকার নিয়ে কাটিয়েছিলেন; শিকার ছাড়া অন্য কোন জিনিসই তাঁর হৃদয়ে স্থান পায় নি। এইভাবে কখন যে তিনি বৃদ্ধ হ'য়ে গেলেন তা তিনি মোটেই বুঝতে পারেন নি। হঠাৎ একবার বাতে ধরল তাঁকে। ফলে, দুটি মাস তাঁকে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়ে থাকতে হ'ল। শুধু শুয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন কাজই তখন তাঁর ছিল না। ফলে একঘেয়েমী আর বিরক্তিতে তিনি তিতিবিরক্ত হ'য়ে উঠলেন। গৃহকর্ত্রী হিসাবে কেউ তাঁর ছিল না; ছিল কেবল একটি চাকর। সেই রান্নাবান্না করত। বাতের বেদনায় গরম পুলটিশ তৈরী করার কোন লোক ছিল না তাঁর। তাছাড়া, অসুস্থ মানুষেরা যেরকম সেবা চায়, যেটুকু যত্ন-আত্তি চায় সেটুকু করার মতও কেউ ছিল না। যে চাকরটি তাঁকে দেখাশোনা করত সেও তার মনিবের মতই নীরস। একটা আর্মচেয়ারে বসে দিনরাত্রি সে ঘুমোত; আর ব্যারণ বিছানার ওপরে এপাশ-ওপাশ ক'রে যন্ত্রণায় কাতরাতেন।

মাঝে-মাঝে তাঁকে দেখতে আসতেন কেবল তাঁর বন্ধু কুরভিল মহিলারা। কিছুক্ষণ থাকতেন তাঁরা। চা ক'রে দিতেন; কিছু-কিছু সুখাদ্য-ও তৈরি ক'রে তাঁর মু খর সামনে ধরে দিতেন। ওইটুকু সময়ই যা তাঁর আনন্দে কাটতো। তাঁদের চলে যাওয়ার সময় হ'লে তিনি বলতেন—আরে এখনই! তোমাদের তো এখানে সবসময় থাকা উচিৎ। এই কথা শুনে মহিলারা হো-হো ক'রে হেসে উঠতেন।

বেদনাটা একটু কমলে আবার তিনি শিকারে বেরোতেন; প্রতি সন্ধ্যায় আবার তাঁর বন্ধুর বাড়িতে ডিনার খেতে আসতেন। সবই করতেন; কিন্তু সেই আগের মত উচ্ছ্বাস আর তাঁর ছিল না। একটিমাত্র দুশ্চিন্তাই তাঁকে সব সময় অস্থির করে তুলতো। তাঁর কেমন যেন ভয় হোত যে আগামী শিকারের

ঋতু সুরু হওয়ার আগেই আবার তাঁকে বাতে আক্রমণ করবে। প্রতিদিন রাত্রিতে বন্ধুর বাড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বন্ধুর স্ত্রী এবং মেয়ে যখন তাঁর গায়ে ভাল ক'রে শাল জড়িয়ে দিলেন তখন তিনি খুশিই হলেন। জীবনে সেই প্রথম তিনি নারীর সেবা বেশ আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁদের অস্বস্তির সঙ্গেই বলতেন—এবার বাতে ধরলেই আমি খতম।

ব্যারণ চলে গেলে মাদাম দার্ণেতোত তাঁর মাকে বললেন—ব্যারণের জন্যে আমাদের একটি স্ত্রী সংগ্রহ ক'রে দেওয়া উচিৎ।

সবাই একবাক্যে তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এই কথাটা তাঁদের আগে মনে হয় নি কেন? সারা সন্ধ্যাটা তাঁরা কোথায় কোন্ পরিচিত বিধবা রয়েছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলেন। অনেক আলোচনার পরে মাদাম বার্থা ভাইলারসকে তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করলেন। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশ; এখনও তাঁকে সুন্দরী বলা যায়; মোটামুটি অর্থশালিনী, সুমেজাজিনী, এবং চমৎকার স্বাস্থ্যবতী।

তাঁকে মাসখানেক কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হ'ল। ভদ্রমহিলার বাড়িতে দিন কাটছিল না। সেইজন্যে তিনিও সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ভদ্রমহিলা ফূর্তিবাজ এবং জীবন্ত। মঁসিয়ে হেকটরের চট করে চোখে পড়ে গেলেন তিনি। ভদ্রমহিলাও তাঁকে নিয়ে বেশ আমোদ করতেন; মঁসিয়েকে জীবন্ত খেলনার মত মনে করতেন; আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে খরগোসের অনুভূতি আর শেয়ালের ধূর্তামি নিয়ে আলোচনা করতেন; আর তিনিও বেশ ধৈর্য সহকারে বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে বেশ গম্ভীরভাবে আলোচনা করতেন।

ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে যেটুকু নজর দিতেন তাতেই ব্যারণ বেশ আনন্দ পেতেন। একদিন ভদ্রমহিলার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যেই তিনি তাঁকে শিকারে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। এরকম প্রস্তাব তিনি অন্য কোন মহিলাকে আর কোনদিন দেন নি। এই আমন্ত্রণটি ভদ্রমহিলার কাছে এমনই কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হ'ল যে তিনি তা গ্রহণ করলেন। তাঁকে শিকারের বেশ পরানোটিই বেশ কৌতুককর হ'য়ে উঠেছিল। এই প্রচেষ্টায় সকলেই যোগ দিয়েছিলেন। সাজানো শেষ হ'লে তাঁকে দেখতে ঠিক আমাজনের মত মনে হল। তারপরে ব্যারণ তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। শিকারে গিয়ে তিনি তাঁকে শিকারের নানা জটিল প্রক্রিয়ার কথা বোঝাতে লাগলেন।

মিডর তার শিকার খুঁজে বার করল, ধীরে-ধীরে তার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। ব্যারণ ভদ্রমহিলার পিছনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় বেতস লতার মত কাঁপতে-কাঁপতে বললেন—সাবধান, সাবধান! এগুলো হচ্ছে তিতির।

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ভীষণ একটা বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ

হ'ল; আর সেইসঙ্গে এক ঝাঁক পাখি পতপত ক'রে আকাশে উড়তে সুরু করল। বন্দুকের শব্দে বিভ্রান্ত হ'য়ে ভদ্রমহিলা চোখ দুটো বুজিয়ে ফেললেন; তারপরে কাঁপতে-কাঁপতে বন্দুকের দুটো ঘোড়াই টিপে দিয়ে তাল সামলানোর জন্যে পেছনে ঝুঁকে পড়লেন। ধাতস্থ হওয়ার পরে তিনি দেখলেন ব্যারণ উন্মত্তের মত নাচছেন; আর মিডর দুটো তিতির পাখিকে মুখে ক'রে নিয়ে আসছে।

সেইদিনই ব্যারণ বার্থার প্রেমে পড়ে গেলেন।

তাঁর মুখে ভদ্রমহিলার প্রশস্তি শুনে একদিন তাঁর বন্ধু বললেন—তুমি ওঁকে বিয়ে করছ না কেন?

কথাটা শুনে ব্যারণ হঠাৎ হকচকিয়ে গিয়ে বললেন—আমাকে বলছ··· মানে···বিয়ে···?

এবং তিনি চুপ করে গেলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধুর করমর্দন ক'রে তিনি বিড়-বিড় করে বললেন: শুভ রাত্রি, বন্ধু। এই কথা বলে তিনি অন্ধকারে বেরিয়ে গেলেন।

পরের তিনদিন তাঁকে আর দেখা গেল না। তারপরে যেদিন তিনি এলেন সেদিন তাঁকে বেশ বিবর্ণ দেখা গেল। অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী চিন্তাগ্রস্ত দেখা গেল তাঁকে। বন্ধুকে আড়ালে ডেকে তিনি বললেন—তোমার কথাটা চমৎকার। দেখ, উনি রাজি আছেন কিনা। সত্যি কথা বলতে কি ওইজাতীয় মহিলাদেরই আমার ভাল লাগে। সারা বছর ধরেই আমরা শিকার করে বেড়াব।

ভদ্রমহিলার কোন আপত্তি হবে না এবিষয়ে নিশ্চিত হয়েই বন্ধুটি বললেন —তুমি নিজেই তাঁকে প্রস্তাবটা দাও না কেন! তুমি কি চাও তোমার হ'য়ে সেই কাজটা আমি করে দেব?

হঠাৎ আমতা-আমতা করতে লাগলেন ব্যারণ—না, না। আমাকে— আমাকে সামান্য ক'টা দিনের জন্যে একবার প্যারিসে যেতে হবে। ফিরে এসেই আমি তোমাকে খাঁটি উত্তর দেব।

এছাড়া অন্য কোন কথা তাঁর কাছ থেকে আদায় করা গেল না। পরের দিনই তিনি প্যারিসের পথে রওনা হলেন।

ক'টা দিনের জায়গায় প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেল। ব্যারণ আর ফিরলেন না। কুরভিলরা ভদ্রমহিলাকে ব্যারণের ইচ্ছাটা আগেই জানিয়েছিলেন। এমত অবস্থায় তাঁরা কী করবেন তা আদৌ বুঝতে পারলেন না। একদিন অন্তর-অন্তর ব্যারণের বাড়িতে তাঁরা লোক পাঠালেন; কিন্তু তাঁর বাড়িতেও কোন সংবাদ পৌছে নি। তারপরে একদিন সন্ধ্যায় ব্যারণ মুসাফিরের পোশাক পরে তাঁর বন্ধুর বাড়িতে হাজির হলেন। দেখে মনে হল বয়সটা তাঁর যেন হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র তিনি হঠাৎ তাঁর হাত

জুটো ধরে ক্লান্ত স্বরে বললেন—আমি এইমাত্র ফিরছি, বন্ধু ; আর ফিরেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি বড় ক্লান্ত।

তারপরে বেশকিছুটা ইতস্তত: করে তিনি বললেন—সেই কথাটা মানে সেই কথাটা···তোমাকে সোজাসুজিই বলে দেওয়া ভাল। সেটা নিয়ে আর তোমরা এগিয়ো না।

তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বন্ধুটি বললেন—'এগিয়ো না' মানে ? কিন্তু কেন ?

না, না। আমাকে কোন প্রশ্ন করো না। কারণটা খুলে বলতে বেশ কষ্ট হবে আমার। কিন্তু নিশ্চিন্ত থেকো আমি ভদ্রভাবেই বলছি। আমি পারব না···আমার কোন অধিকার নেই···বুঝতে পারছ—ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করার কোন অধিকার আমার নেই। তিনি চলে না যাওয়া পর্যন্ত তাই আমি আসি নি। তাঁর সঙ্গে আর দেখা হওয়াটা আমি সহ্য করতে পারব না। বিদায়, এই কথা বলেই তিনি পালিয়ে গেলেন।

কারণটা কী খুঁজে বার করার জন্যে সবাই মিলে আলোচনা করতে বসলেন। কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে তাঁরা ভাবলেন নিশ্চয় ব্যারণের কোন সন্তান রয়েছে, অথবা কোন মহিলার সঙ্গে পুরনো কোন সম্পর্ক রয়েছে। কারণটা যাই হোক, এই বিয়ের ব্যাপারে নিশ্চয় কোন সত্যিকার প্রতি-বন্ধকতা রয়েছে। মাদাম ভাইলারসকে ব্যাপারটা বোঝাতে তাঁদের বিশেষ অসুবিধেয় পড়তে হ'ল না। মাদাম আগে যেমন বিধবা ছিলেন সেইভাবেই স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

মাস তিনেক পরের কথা। একদিন সন্ধ্যায় পেট ভ'রে ডিনার খেয়ে পাইপ ধরিয়ে ব্যারণ তাঁর বন্ধুকে বললেন—আমি তোমার বন্ধুটির সম্বন্ধে কত চিন্তা করি তা জানলে আমার জন্যে নিশ্চয় তোমার দুঃখ হবে।

কথাটা বলেই ব্যারণ পাইপ টানা বন্ধ ক'রে কেমন যে মনমরা হয়ে গেলেন ; বললেন—কী যে ঘটে গেল তা আমি ভাবতেই পারি নি।

বন্ধুটি অস্থিরভাবে বললেন—প্রতিটি মানুষেরই সবকিছু ভেবে দেখা উচিৎ।

কাছাকাছি কেউ কোথাও রয়েছে কি না দেখার জন্যে ব্যারণ অন্ধকারে চোখ চিরে-চিরে দেখলেন, তারপরে ফিস-ফিস ক'রে বললেন—বুঝতে পারছি তুমি আহত হয়েছ। তুমি যাতে আমাকে ক্ষমা করতে পার সেইজন্যে আমি তোমাকে সব খুলে বলছি। দীর্ঘ কুড়িটি বছর আমি কেবল শিকারের জন্যেই বেঁচে রয়েছি। শিকারই আমার একমাত্র ধ্যান ধারণা। শিকার ছাড়া অন্য কোন জিনিসই আমি ভাবতে পারি নি। সেইজন্যেই যখন আমি একটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে এসেছিলাম তখন বিবেক আমাকে দংশন করল। নারীর প্রেম বলতে লোকে কী বোঝে আমি

তা জানি নে। সুতরাং বিয়ে করার পর ···মানে···আমি কী বলতে চাই তুমি তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। বিবেচনা ক'রে দেখ, আজ থেকে যোল বছর আগে···সেই শেষ···বুঝতে পারছ। তাছাড়া, আরও অনেককিছু করার ছিল আমার। একদিনের ভাল শিকার আমার কাছে অনেক বেশী উপাদেয়। হঠাৎ মনে হ'ল মেয়র অথবা পুরোহিতের কাছে বিয়ের বিষয়ে মন্ত্র আওড়াব কী করে? যদি শেষ পর্যন্ত না পারি? কোন ভদ্রলোকেরই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিৎ নয়। সেইজন্যে নিজেকে ভাল করে বুঝতে আমি প্যারিসে গিয়েছিলাম। প্যারিসে এক সপ্তাহ কাটিয়েও আমার মানসিক অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নি। চেষ্টা যে করি নি, তা নয়। কিন্তু লাভ হয় নি কিছু। সেইজন্যে আরও দু'তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করলাম। খাওয়া, শোওয়া, আমোদ, প্রমোদ—কিছুই বাদ দিই নি আমি; কিন্তু ফল কিছু হয় নি; তুমি বুঝতেই পারছ এইরকম একটি পরিস্থিতিতে বিয়ে না করাটাই আমার পক্ষে একমাত্র সম্ভ্রান্ত কাজ।

বন্ধুটি তাঁর অবস্থাটা বুঝতে পেরে তাঁর করমর্দন করে বললেন—তোমার জন্যে আমি দুঃখিত।

এই বলে ব্যারণকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে এলেন তিনি।

বাড়িতে ফিরে এলে স্ত্রীকে একা পেয়ে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ব্যারণের কথাগুলি বললেন, বলতে-বলতে হাসির চোটে তাঁর পেটে খিল ধরার উপক্রম করল। কিন্তু মাদাম হাসলেন না। সব কথাই তিনি মন দিয়ে শুনলেন। স্বামীর কাহিনী শেষ হলে তিনি বেশ গম্ভীরভাবেই বললেন—ব্যারণ একটি মূর্খ। আসলে উনি ভয় পেয়েছেন। বার্থাকে আমি এখনই লিখে দিচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে যেন চলে আসে।

স্বামী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি বললেন—বোকা কোথাকার! স্ত্রীকে ভালবাসলে সব স্বামীরই ওইরকম ভয় হয়।

ভদ্রলোকের মনে অস্বস্তি জেগে উঠল। তিনি কোন মন্তব্য করলেন না।

দুই বন্ধু

[Two friends]

অবরুদ্ধ প্যারিস শহর; অভুক্ত; একেবারে শেষ অবস্থা তার। চড়াই পাখিরা বাড়ির ছাদ থেকে পালিয়ে গিয়েছে; যা পাচ্ছে তাই মানুষ পেটে পুরছে। জানুয়ারী মাসের একটি সুন্দর প্রভাতে ম'সিয়ে মরিসত শূন্য উদরে

বুলেভার্ডের পাশ দিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিরস বদনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার পেশা ঘড়ি তৈরি করা। বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ মিলিটারী পোশাক-পরা একটি পুরনো বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। বন্ধুটির নাম মঁসিয়ে সভেজ। নদীর ধারে আলাপ হয়েছিল দু'জনের। যুদ্ধ সুরু হওয়ার আগে প্রতি রবিবার মরিসত হাতে একটা বাঁশের লাঠি আর পিঠে একটা টিনের বাক্স নিয়ে খুব ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। আর্জেন্টিউলের ট্রেনে চেপে নামতো কোলেম্বে। সেখান থেকে হেঁটে যেত মারেটি দ্বীপ পর্যন্ত। সেখানে পৌঁছেই সে মাছ ধরতে বসে যেত; মাছ ধরত সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত।

সেইখানেই প্রতিটি রবিবার আর একজন মেছোড়ের সঙ্গে প্রায় দেখা হোত। এরই নাম সভেজ। নত্তার-দাম-দি-লোরেত্তিতে লোকটির ফিতের ছোট একটা ব্যবসা ছিল। দিনের অর্দ্ধেকটা সময়ই তারা জলের ওপরে পা ঝুলিয়ে পাশাপাশি বসে মাছ ধরত।

কোন-কোন দিন একটাও কথা বলত না তারা। আবার কোন-কোন দিন গল্প করত। কিন্তু পরস্পরকে তারা চিনত। একই গোত্রের লোক ছিল তারা। কোন-কোন দিন বসন্তের সকালে প্রায় দশটার কাছাকাছি নদীর বুক থেকে মৃদু কুয়াশার আস্তরণ শূন্যে মিলিয়ে গেলে এই দুটি উৎসাহী মৎস্য-শিকারী তাদের পিঠে বসন্তের মৃদু আমেজ উপভোগ কত। তখন মরিসত বলত—'এই ত জীবন', এই ক'টা কথার মধ্যে দিয়েই তাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত। আর কিছুই বলতে হোত না তাদের। শরতের সূর্যাস্তে নদীর জল লাল হয়ে উঠলে দুটি বন্ধুর মাঝখানে যখন অরণ্যের দীর্ঘায়ত ছায়াগুলি নেমে আসত তখন সভেজ বলত—কী সুন্দর!

সেদিন দু'জনের দেখা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দু'জনকে চিনতে পারল; করমর্দন হল দু'জনের; মঁসিয়ে সভেজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—দিনকাল কী জঘন্যই না হ'ল।

মরিসত দুঃখের সঙ্গে বলল—আহা, আবহাওয়াটাকেও বলিহারি। সারা বছরে আজকের দিনটাই যা সুন্দর।

ভারাক্রান্ত মনে ভাবতে-ভাবতে দু'জনেই হাঁটতে লাগল তারা।

মরিসত বলল—মাছধরার কথা মনে রয়েছে? আহা, কী দিনই না ছিল!

সভেজ বলল—ভাবছি, আবার কবে মাছ ধরতে যাব!

তারপরে তারা ছোট একটা কাফেতে ঢুকে অ্যাবিসিনথ খেল।

অ্যাবিসিনথ খেয়ে তারা আবার বেরলো হাঁটতে।

হঠাৎ মরিসত থেমে গিয়ে বলল—আর একপাত্র খেলে কেমন হয়?

আমার কোন আপত্তি নেই।

দু'জনেই আবার একটা কাফেতে ঢুকে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে

আসার পর তাদের মাথা টলতে লাগল। খালি পেটে অ্যালকোহল খেলে মাথার অবস্থা ওইরকমই হয়।

মঁসিয়ে সভেজের বেশ নেশা ধরেছে, সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—চল।

কোথায়?

আবার কোথায়? মাছ ধরতে।

কিন্তু কোথায় যাবে?

কেন? আমরা যেখানে যেতাম। কোলেম্ব থেকে ফরাসীদের সৈন্য-শিবির বেশী দূরে নয়; কর্নেল ডুমোলিঁকে আমি চিনি। নির্বিবাদে তারা আমাদের সেখানে যেতে দেবে।

উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে মরিসত বলল—বহুৎ আচ্ছা।

মাছ ধরার সরঞ্জাম আনার জন্যে তারা যে যার বাড়ির দিকে রওনা হল।

ঘণ্টাখানেক পরে প্রধান সড়কের ওপর দিয়ে দু'জনকে পাশাপাশি হাঁটতে দেখা গেল। হাঁটতে-হাঁটতে তারা কর্ণেলের হেডকোয়ার্টারে হাজির হল। তাদের কিম্ভূতকিমাকার আর্জি শুনে তিনি একটু হেসে গন্তব্যস্থানে যাওয়ার জন্যে তাদের অনুমতি দিলেন।

জনহীন নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে গেল তারা। নানতারী পর্যন্ত বিরাট সমতল ক্ষেত্রটি একেবারে জনশূন্য; কেবল পত্রহীন চেরি গাছগুলি সেই বিরাট শূন্যতার মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একটা উঁচু জায়গার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মঁসিয়ে সভেজ বলল—ওই-খানে প্রাশিয়ানরা রয়েছে।

সেই পরিত্যক্ত বনভূমির দিকে তাকিয়ে ভয়ে দু'জনের বুকই কেঁপে-উঠল।

প্রাশিয়ান। একজন প্রাশিয়ানও তারা দেখে নি; কিন্তু তাদের অকথ্য অত্যাচারের অজস্র কাহিনী তারা অনেক শুনেছে। সেই বিজয়ী সেনা-বাহিনীর ওপরে বিদ্বেষমিশ্রিত একটা কুসংস্কার-ভরা ভীতি তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছিল।

মরিসত আমতা-আমতা ক'রে বলল—ধর, ওদের কারও সঙ্গে যদি আমাদের দেখা হয়ে যায়। আমরা কী করব বলত?

এত বিপদ সত্বেও প্যারিসবাসীদের মুখে যে বিদ্রূপটি প্রচলিত ছিল সেই বিদ্রূপের ভাষায় সভেজ উত্তর দিল—ভেজে খাওয়ার জন্যে আমরা তাকে কিছু মাছ দেব।

কিন্তু সেই অশুভ নির্জনতার ভেতর দিয়ে আর এগিয়ে যাবে কিনা সেই কথাই ভাবছিল তারা। তারপরে সভেজ হঠাৎ মনস্থির ক'রে বলে ফেলল—চল; এগিয়ে যাই। কিন্তু চোখ দুটোকে চেকে রেখ।

চারপাশে সন্ত্রস্তভাবে তাকাতে-তাকাতে দ্রাক্ষাকুঞ্জের ভেতরে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল তারা। নদীর ধারে পৌঁছতে গেলে এখনও তাদের কিছুটা ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে এগোতে হবে। তারা দৌড়ে ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে নদীর ধারে হাজির হল; তারপরে নদীর ধারে ঘাসের বনে তারা লুকিয়ে ফেলল নিজেদের। তারপরে মাটির ওপরে কান পেতে রইল। না; কোথাও কোন শব্দ নেই। কাছাকাছি কোথাও কারও পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তারা একা, একেবারে একা। নিশ্চিন্ত হয়ে তারা মাছ ধরতে সুরু করল। প্রথম মাছ ধরল সভেজ; দ্বিতীয়টি গাঁথা পড়ল মরিসতের ছিপে। এইভাবে তারা একটার পর একটা মাছ ধরে ডাঙায় ফেলছিল। সাদা-সাদা মাছগুলি জলের ওপরে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল চিকচিক ক'রে। অনেকদিন আগেকার আনন্দ আর উত্তেজনা ফিরে পেয়ে তারা একেবারে তন্ময় হয়ে গেল; জলের মধ্যে ঝোলানো ঝোলার ভেতরে তারা সেই মাছগুলি পুরে দিয়ে আবার নতুন উদ্যমে ফতনা ভাসিয়ে দিল জলের ওপরে।

দয়ালু সূর্য তাদের পিঠের ওপর গরম রোদ ছড়িয়ে দিয়েছিল। কোন শব্দই তাদের কানে ঢোকে নি; কিছুই তারা চিন্তা করে নি। পৃথিবীর কথা ভুলে গিয়ে তারা মাছ ধরায় মশগুল হয়ে রইল।

কিন্তু হঠাৎ কামানের গর্জন সুরু হল। বড়-বড় কামান থেকে গোলা বেরিয়ে আসছে চারদিকে। মরিসত ঘুরে চেয়ে দেখল, দূরে আকাশের গায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী জট পাকিয়ে ভাসছে। তারপরে দুর্গের চূড়ায়—তারপরেই পরপর অনেকগুলি কামানের গর্জন শোনা গেল। শান্ত আকাশ গর্জনের শব্দে অশান্ত হয়ে উঠল।

কাঁধে একটা স্রাগ ক'রে মঁসিয়ে সভেজ বলল—আবার সুরু করেছে ওরা।

মরিসত এতক্ষণ তার ফতনার দিকে তাকিয়েছিল। শান্তিপ্রিয় মানুষটির মন এইসব উন্মত্ত জানোয়ারদের পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় হঠাৎ রাগ আর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল; সে গর্জে উঠে বলল—লোকগুলি বোকা না হলে এভাবে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে?

সভেজ বলল—বোকা নয়; বন্য জানোয়ারদের চেয়েও ভয়ানক।

একটা মাছ ছিপে গেঁথে মরিসত বলল—যতদিন দেশে সরকার ব'লে কোন বস্তু থাকবে ততদিন এইরকমই চলবে।

সভেজ তাকে সংশোধন করে দিয়ে বলল—রিপাবলিক হলে ·· যুদ্ধ বাঁধতো না······

মরিসত বলল—রাজা থাকলে বিদেশের মাটিতে যুদ্ধ বাঁধে, রিপাবলিক হলে নিজেদের মাটিতে।

এরপরেই সুরু হল দু'জনের তর্ক। তারপরে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত

হল যে মানুষের কোনদিন মুক্তি নেই। ইতিমধ্যে ওপাশ থেকে প্রাশিয়ানদের কামান একটানা গর্জন করে চলেছে। তাদের লক্ষ্য ফরাসীদের ঘর-বাড়ি। শেল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে তারা ফরাসীদের বাড়ি-ঘর চূর্ণ ক'রে দিচ্ছে—হতাহত করছে অসংখ্য মানুষকে,—তাদের সুখ, স্বপ্ন, আর আশা বিচূর্ণ ক'রে তাণ্ডবনাদে গর্জন করছে। মঁসিয়ে সভেজ বলল—এইত জীবন।

মঁসিয়ে মরিসত হেসে বললেন—অথবা, মৃত্যু।

কাছাকাছি কার যেন পায়ের শব্দ পেতেই তারা দু'জনে চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখল ঠিক তাদের পেছনে চারটি সশস্ত্র সৈন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে···চারটি বিরাট চেহারার সৈন্য, মিলিটারী পোশাক তাদের গায়ে; গালে দাড়ি; তাদের হাতে রাইফেল।

তাদের হাত থেকে ছিপ দুটো ফসকে জলে প'ড়ে স্রোতের টানে ভেসে গেল।

কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই তাদের বেঁধে ধরে নিয়ে গেল সৈন্যেরা; তারপরে ফেরী নৌকোতে চড়িয়ে দ্বীপের মধ্যে চালান করিয়ে দেওয়া হল! তারা ভেবেছিল ওইখানে নিয়ে গিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে; কিন্তু একটা বাড়ির কাছে গিয়ে তারা দেখল এককুড়ি জার্মাণ সৈন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একটি বিরাট চেহারার লোমওয়ালা মানুষ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পোরসিলিন-এর পাইপ টানতে-টানতে চোস্ত ফরাসীতে জিজ্ঞাসা করল··· ভদ্রমহোদয়গণ, সারাদিন মাছ তাহলে ভালই ধরেছেন।

ঠিক এইসময় একটি সৈন্য তার পায়ের কাছে পুরো মাছের থলিটা রেখে দিল। থলিটা আসার সময় সে নিয়ে আসতে ভোলে নি।

প্রাশিয়ান অফিসারটি হেসে বলল···বাঃ। অনেক মাছ ধরেছেন তো! যাই হোক; ও নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই নি। ভয় পাবেন না; আমি যা বলছি শুনুন।

আমার বিশ্বাস আপনারা দু'জন গুপ্তচর। আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে আপনারা এখানে এসেছেন। আমি আপনাদের ধরে এনেছি গুলি ক'রে মেরে ফেলার জন্যে। মাছ ধরাটা আপনাদের এখানে আসল কাজ নয়। আপনারা আমার হাতে পড়েছেন। কপাল আপনাদের খারাপ। কিন্তু যুদ্ধ, যুদ্ধ। আপনারা কোন সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে নিশ্চয় আপনাদের এলাকা থেকে বেরিয়েছেন। সেই শব্দটা কী আমাকে বলুন। আমি আপনাদের মুক্তি দেব।

বিবর্ণ মুখে বন্ধু দুটি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল। তাদের হাত কাঁপতে লাগল, কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না।

অফিসারটি আবার বলল···কেউ আপনাদের কথা জানবে না। আপনারা নিরাপদেই ফিরে যাবেন। কিন্তু না বললে এখনই আপনাদের মৃত্যু হবে।

এখন কী করবেন বলুন।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তারা। কেউ কোন কথা বলল না।

জলের দিকে ইঙ্গিৎ করে প্রাশিয়ান অফিসারটি শান্তভাবেই বলল···এখন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনারা ওই নদীর তলায় চলে যাবেন। পাঁচ মিনিট। নিশ্চয় আপনাদের আত্মীয়-স্বজন আপনাদের পথ চেয়ে বসে রয়েছেন।

ওদিকে তখনও কামান ফাটছে।

দুটি বন্ধু তবুও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। অফিসারটি নিজের ভাষায় সৈন্যদের কী যেন একটা নির্দেশ দিয়ে চেয়ারটাকে বন্দীদের কাছ থেকে সরিয়ে নিল। কুড়ি পা দূরে বারজন সৈন্য রাইফেলগুলি উঁচিয়ে ধরল।

অফিসারটি বলল—এক মিনিট। এক সেকেণ্ড-ও বেশী নয়।

কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল তারা।

তারপরে মরিসতের চোখ দুটো মাছে ভর্তি সেই "নেটের" থলিটার ওপরে গিয়ে পড়ল। প্রচুর মাছ। তখনও তারা লাফালাফি করছে। সূর্যের আলোতে চিকচিক করছে তাদের দেহ। মুহূর্তের জন্যে তার মনে একটা দুর্বলতা এল কিন্তু তাকে সে প্রশ্রয় দিল না। চোখ দুটো কেবল তার জলে ভরে উঠল।

সে আমতা-আমতা ক'রে বলল···বিদায়, মঁসিয়ে সভেজ।

বিদায় মঁসিয়ে মরিসত।

কাঁপতে-কাঁপতে পরস্পরের করমর্দন করল তারা।

গুলি কর !—নির্দেশ এল অফিসারের।

একসঙ্গে বারটা রাইফেল গর্জন করে উঠল। মঁসিয়ে সভেজ লম্বা হয়ে মাটির ওপরে পড়ে গেল। দীর্ঘাঙ্গী মরিসত ঘুরপাক খেয়ে তার বন্ধুর দেহের ওপরে লুটিয়ে পড়ল। আকাশের দিকে মুখ ক'রে প'ড়ে রইল সে; রক্তে তার পোশাক লাল হয়ে গেল।

জার্মাণ অফিসারটি আবার একটি নির্দেশ দিল।

তার লোকেরা কয়েক-গাছা দড়ি আর পাথর নিয়ে এল। সেই পাথরগুলি মৃত লোকগুলির পায়ে বেশ শক্ত করে বাঁধল। তারপর তারা তাদের টানতে টানতে নদীর ধারে নিয়ে গেল। একজন মরিসতের মাথা ধরল; আর একজন তার পা। তারপরে তারা জোরে দেহটাকে ছুঁড়ে দিল নদীর ওপরে। মৃতদেহটা অর্দ্ধবৃত্ত রচনা করে জলের ওপরে গিয়ে পড়ল; তারপরে দ্বিতীয় দেহটাকেও ওই একইভাবে ছুঁড়ে দেওয়া হল। পাথরের ভারে মৃতদেহ দুটির পাগুলি আগে ডুবে গেল; তারপরে মাথা। জলের মধ্যে তলিয়ে গেল তারা। নদীর জলে আলোড়ন জাগল কয়েকটা। তারপরে আবার সব মিলিয়ে গেল। ছোট-ছোট কয়েকটা তরঙ্গ কেবল তীর পর্যন্ত

এগিয়ে এল। শুধু একটু রক্ত কেবল জলের ওপরে ভাসতে লাগল।

অফিসারটির মনে কোন তরঙ্গ উঠল না। পাকা দার্শনিকের মত সে বলল—এবারে মাছগুলোই ওদের বাকিটুকু শেষ ক'রে দেবে।

তারপরে ব্যাগের মাছগুলির দিকে তার লক্ষ্য পড়ল। মাটি থেকে মাছের থলিটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে সে হাসল; তারপরে চীৎকার ক'রে উঠল—উইলহেম।

সাদা পোশাক পরা একটি সোনানী দৌড়ে এল। তার হাতে মৃত ছুটি মানুষের শিকার করা মাছগুলি তুলে দিয়ে অফিসারটি বলল—মাছগুলিকে জীবন্ত অবস্থাতেই ভেজে আমাকে দেবে। ওগুলি খেতে বড় চমৎকার।

এই বলেই সে তার পাইপ ধরালো।

কবরাখানার বান্ধবী

[The graveyard sisterhood]

পাঁচটি বন্ধুতে ডিনার প্রায় শেষ ক'রে এনেছিলেন। এঁরা সবাই ধনী; মাঝ-বয়সী; দু'জন অবিবাহিত; তিনজন বিবাহিত। যৌবনের স্মৃতিচারণা করার জন্তে এঁরা মাসে একদিন একসঙ্গে ব'সে গল্প-গুজব, খানাপিনা করতেন। প্যারিস শহরের মানুষেরা যে-সব বিষয় নিয়ে গল্প করতে ভালবাসে তাদের কোনটাই এঁরা বাদ দিতেন না।

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে গ'ল্পে আর জীবন্ত ছিলেন জোশেফ দি বার্তো। ভদ্রলোক বিয়ে করেন নি। বয়স তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি। চরিত্রটাকে একেবারে জলাঞ্জলি না দিয়ে সমস্ত রকম উচ্ছ্বাসেই তিনি গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। উৎকৃষ্ট সাংসারিক মানুষ বলতে যা বোঝা যায় তিনি ছিলেন সেই-জাতীয়। তাঁর বুদ্ধি ছিল কিন্তু গভীরতা ছিল না; জ্ঞান ছিল অনেক; কিন্তু পাণ্ডিত্য ছিল না। নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর ফলে অসংখ্য কাহিনী তাঁর জানা ছিল। সেই কাহিনীগুলি তিনি বেশ সুন্দর ক'রে বলতে পারতেন। সেইজন্তে বন্ধুদের কাছে তিনি যথেষ্ট সুনাম পেতেন। ডিনার শেষ হওয়ার পরে আসার জমিয়ে রাখতেন তিনিই। সেদিনও যথারীতি তিনি গল্প বলতে সুরু করলেন।

সিগারের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে তিনি বললেন—কয়েকদিন আগে আমার জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।

সবাই একবাক্যে বলে উঠলেন—বল, বল।

তিনি বললেন—খুব আনন্দের সঙ্গেই। তোমরা সবাই জান প্যারিসের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে; অনুসন্ধিৎসা নিয়ে আমি লোকজন, জিনিসপত্র সব দেখে বেড়াই।

'সেবার সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন বিকালের দিকে পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে আমি বেরিয়ে পড়লাম। এইসব দিনে লোকে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যায়, আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে আলাপ করতে যায়; তারপরে নানারকম হিসাব নিকাশ ক'রে যেটা যার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব'লে মনে হয় সে সেইদিকে চলে যায়। আমিও সেইরকম হালকা মনে সিগার ধরিয়ে বুলেভার্ডের দিকে বেরিয়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ মনে হল—যাই একবার মন্তমর্তি সিমেট্রির দিকে ঘুরে আসি। তোমরা জান, কবরখানায় যেতে আমার বেশ ভাল লাগে। তারা আমাকে বিষণ্ণ ক'রে তোলে—শান্ত ক'রে দেয় আমার উত্তেজিত স্নায়ুগুলিকে। তাছাড়া, ওখানে আমার অনেকগুলি প্রিয় বন্ধুরাও ঘুমোচ্ছে। তাদের দেখতে আর কেউ যায় না। তাই আমি মাঝে-মাঝে ওসব জায়গায় ঘুরে বেড়াই।

'ওই কবরখানাতেই আমার একটি প্রিয়তমা রক্ষিতাকে কবর দিয়ে এসেছি। তাকে আমি খুব ভালবাসতাম, তার মৃত্যুতে আমি কেবল দুঃখই পাই নি, অনুতপ্ত-ও হয়েছি। তার কবরের কাছে গিয়ে তাই আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি।

'কবরখানাগুলিকে আমার ভালবাসার আরও কারণ রয়েছে। স্থানটি বিপুলভাবে জনাকীর্ণ। ভেবে দেখে কতযুগ ধরে প্যারিসের কত অসংখ্য মানুষ ওখানে ছোট-ছোট কুঠরীতে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে জীবন কাটাচ্ছে। মাথার ওপরে তাদের কেবল একটা পাথরের টুকরো আর ক্রশ চিহ্ন। আর তাদের তুলনায় মূর্খ জীবন্ত মানুষেরা কতখানি জায়গা নিয়েই না বাস করে, আর সেই বেঁচে থাকার জন্যে কত হট্টগোলই না তারা করে। তাছাড়া, এই কবরখানাটিতে যেসব সমাধিমন্দির রয়েছে তাদের ভাস্কর্যও কত সুন্দর! সেই নিস্তব্ধ সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে নিছক ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ অথবা বিষাদ তাই আমাকে চিরকালই আকর্ষণ ক'রে এসেছে।

'ধীরে-ধীরে সেই মৃতের রাজত্বে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এখানে এরা কেউ প্রতিবেশীর বাড়িতে বেড়াতে যায় না, একসঙ্গে কেউ ঘুমায় না, খবরের কাগজ পড়ে না কেউ। ঘুরতে-ঘুরতে সমাধিমন্দিরের ওপরে লেখাগুলি পড়তে লাগলাম। এগুলি পড়তে বেশ আমোদ লাগে; অথবা, এখানকার গল্পরচনা প'ড়ে আমার ভীষণ হাসি পায়। মৃতদের সঙ্গে স্বর্গে মিলিত হওয়ার কী আকুল আগ্রহই না মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা ওইসব বাণীর মধ্যে লিখে রাখে? মানুষ যে কতখানি কপট তা বোধ হয় তোমরা বুঝতে পারছ। কিন্তু কবরখানার যে অংশটায় সবচেয়ে আমার বেড়াতে ভাল লাগে সেটা হল

পরিত্যক্ত অংশ। ওখানে বড়-বড় ইউ গাছ জন্মেছে। ওদিকটায় আর নতুন কবর খোলা হয় না। ওখানে যারা শুয়ে রয়েছে তারা অনেক-অনেক বছর আগে মারা গিয়েছে। আবার একদিন এখানকার বিরাট-বিরাট গাছগুলিকে কেটে ফেলা হবে—নতুন কবরখানার জন্যে খুলে দেওয়া হবে জায়গাটি।

'এইভাবে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর পরে মনে হল চিন্তার দিক থেকে আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। ভাবলাম, এখন আমার প্রিয়তমার কবরখানায় যাওয়া উচিৎ। মেয়েটিকে আমি কী ভালই না বাসতাম! বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আমি তার কবরখানার কাছে হাজির হলাম। কী সুন্দরীই না সে ছিল? কিন্তু এখন যদি তার কবরটা খুলে ফেলা হয়! ভাবতে-ও গাটা শিউরে উঠল আমার। .

'সেই কবরখানার কাছে কয়েকটা মিষ্টি কথা বললাম; সেইসব তার কানে আদৌ ঢুকল না। তারপরে সেখান থেকে চলে আসার জন্যে মুখ ঘোরালাম, এমন সময় দেখি ঠিক উলটো দিকে আর একটি কবরের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে একটি মহিলা মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছেন। মাথার ওপর থেকে ঘোমটাটি খুলে পড়ায় তাঁর মুখটি আমি দেখতে পেয়েছিলাম; সে-মুখ বড় সুন্দর। তাঁর সেই শোকজর্জরিত সুন্দর মূর্তিটি দেখে আমি চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

'মনে হল ভদ্রমহিলা একেবারে পাথর হ'য়ে গিয়েছেন; শোকে মুহ্যমান হ'য়ে, চোখ বন্ধ ক'রে একমনে মন্ত্রপাঠ করার ভঙ্গীতে তিনি বিড়বিড় ক'রে স্মৃতিচারণা করছেন। সেই অপরূপ দৃশ্য আমি দেখতে লাগলাম। তারপরে মনে হ'ল তিনি ফোঁপাচ্ছেন; প্রথমে ধীরে-ধীরে; তারপরে মনের আবেগ বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কাঁপতে লাগল; অশ্রু বড়-বড় ফোঁটার আকারে গাল বেয়ে গড়াতে লাগল। অশ্রুবিন্দু তো নয়—একেবারে মুক্তাবিন্দু। তারপরেই তিনি ব্যাকুল হ'য়ে চারপাশে তাকাতে লাগলেন। মনে হ'ল, একটা দুঃস্বপ্ন থেকে তিনি যেন হঠাৎ জেগে উঠেছেন। আমাকে তাঁর দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি একটু লজ্জা পেয়ে দু'হাতে মুখটা ঢেকে দিলেন। ভীষণ উত্তেজনায় শরীরটা তাঁর কাঁপতে লাগল, তারপরেই একটা করুণ আর্তনাদ আমার কানে এসে ঢুকল; এবং ঠিক পরমুহূর্তে তিনি কবরের পাথরের গায়ে মূর্চ্ছাহত হয়ে ঢলে পড়লেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললাম। দেখলাম কবরের ওপরে লেখা রয়েছে—

এখানে লুই-থিয়োডোর ক্যারেল শুয়ে রয়েছেন,
মেরিন লাইট ইনফ্যানট্রির ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি,
টনকিনে শত্রুদের হাতে তিনি নিহত হন।
তাঁর আত্মার শান্তি হোক।

কয়েকমাস আগেই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে। ভদ্রমহিলার অবস্থা দেখে

আমার খুব কষ্ট হ'ল। তাঁকে সুস্থ করার জন্তে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি সুস্থ হলেন। প্রথম দর্শনেই মনে হল ভদ্রমহিলাটি বেশ শান্ত এবং কৃতজ্ঞ! তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টাটা আমার একেবারে ব্যর্থ হয় নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁদতে-কাঁদতে তিনি সেই মৃত অফিসারটির কথা আমাকে বললেন। শুনলাম, মাত্র বছর খানেক হ'ল তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। পূর্ব জীবনে একমাত্র বিয়ের যৌতুক ছাড়া তাঁর আর কোন সম্বল ছিল না। এখন তিনি অনাথা।

সান্ত্বনা দিয়ে আমি তাঁকে তুললাম। বললাম—তাই বলে এখানে আপনি থাকতে পারেন না। আমার সঙ্গে আসুন।

কিন্তু আমি যে হাঁটতে পারছিনে।

আমাকে ধরে-ধরে আসুন।

ধন্যবাদ। কার জন্যে শোক করতে আপনি এখানে এসেছিলেন? স্ত্রী?

আমি বললাম—না; রক্ষিতা।

তিনি বললেন—রক্ষিতাকেও মানুষ স্ত্রীর মতই ভালবাসতে পারে। প্রেমের রাজত্বে অস্পৃশ্যতা নেই।

যা বলেছেন, মাদাম।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই তিনি বললেন—মনে হচ্ছে, আমি আবার পড়ে যাব।

কিছু খাবেন?

মন্দ হয় না।

পাশে একটা রেঁস্তোরা ছিল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শেষে মানুষে সাধারণতঃ এইখানে যায় কিছু খাওয়ার জন্যে। সেইখানে এক কাপ বেশ গরম চা খেয়ে তিনি ধাতস্ত হলেন; তারপরে মৃদু হেসে তিনি তাঁর জীবনের কাহিনী বলতে লাগলেন। বুঝতে পারলাম স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি নিঃসঙ্গ হ'য়ে গিয়েছেন। এতবড় বিশ্বে তাঁর আর কেউ নেই। তাঁর সেই করুণ কাহিনী শুনে আমার খুব কষ্ট হল। আর হবে নাই বা কেন; ভদ্রমহিলা যুবতী—বয়স কুড়ির বেশী নয়। আর আমার সাহায্য তিনি বেশ খুশি মনেই গ্রহণ করলেন। তারপরে সন্ধ্যে হয়ে আসছে দেখে একখানা গাড়ি ডেকে তাঁকে আমি বাড়ি পৌছে-দিলাম।

গাড়ী থেকে নামার পর তিনি বললেন—চারতলায় ওঠার মত আমার ক্ষমতা নেই। আপনি অনেক করেছেন। আমাকে যদি ওপরে উঠতে একটু সাহায্য করেন তাহলে সত্যিই বাধিত হব।

আমি তো আনন্দে গদগদ। তাঁকে ধরে-ধরে ওপরে নিয়ে গেলাম। দরজার কাছে এসে তিনি বললেন—একটু ভেতরে আসুন। আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর কিঞ্চিৎ সুযোগ দিন আমাকে।

তথাস্তু। ভেতরে ঢুকে গেলাম আমি। দেখলাম ঘরটি আড়ম্বরবর্জিত; দারিদ্র্যের ছাপ রয়েছে বটে কিন্তু বেশ সুন্দর ক'রে সাজানো।

ছোট একটি সোফার ওপরে পাশাপাশি আমরা বসলাম। আমাকে একটু ড্রিঙ্ক দেওয়ার জন্যে তিনি কলিঙ বেল টিপলেন; কিন্তু কোন পরিচারিকাই সেই ডাকে সাড়া দিল না। সম্ভবতঃ, কেউ তখন সেখানে ছিল না। আমি খুশিই হলাম। তারপর তিনি আমার পাশে বসে কিছুক্ষণ পর তাঁর নিজের জীবনের কাহিনী সুরু করলেন। কাহিনী বলতে-বলতে তিনি তাঁর টুপীটা খুলে ফেললেন। চমকে উঠলাম আমি। এমন সুন্দর মুখ আমি খুব কমই দেখেছি। তিনিও একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি আর লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলাম। তিনি চোখ দুটো নামিয়ে আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টায় বলতে লাগলেন—না-না···একি··· ।

মেয়েদের এই "না-না" শব্দের অর্থ আমি জানি। তাই তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে আরও জোরে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম; তারপরে অজস্র চুম্বনে তাঁর চোখ, চোখ থেকে মুখ, তারপরে বুক ভরিয়ে দিলাম। তিনি খুব একটা বাধা দিলেন না। তারপরে টনকিনে নিহত মৃত স্বামীর স্মৃতির প্রতি অপমানকারী আমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন।

তারপরে তাঁকে আমার সঙ্গে কাছাকাছি একটা রেঁস্তোরায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। মৃদু আপত্তি জানালেন তিনি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। তারপরে শোকের পোশাক ছেড়ে তিনি ডিনারের পোশাক পরলেন। ডিনারটা জমলো ভালই। শ্যাম্পেন খেয়ে তিনি শোকের ধাক্কাটা ভালভাবেই কাটিয়ে উঠলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমি তাঁর ফ্ল্যাটে ফিরে গেলাম।

কবরখানার বন্ধুত্ব আমাদের তিনটি সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু একটানা সব জিনিসেই মানুষের ক্লান্তি আসে—বিশেষ ক'রে মেয়েদের। বিশেষ জরুরী কাজে বাইরে যাওয়ার ছল ক'রে আমি তাঁকে ছেড়ে চলে গেলাম, চলে যাওয়ার সময় আমি অবশ্য মোটা একটা টাকা তাঁকে দিয়ে এসেছিলাম; এবং তিনিও তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে প্যারিসে ফিরে আসার পরেই আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি যে আমাকে একটু ভালবেসে ফেলেছেন সেকথাও মুখ ফুটে বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি।

অনতিবিলম্বেই নতুন খেলায় মেতে গেলাম আমি। প্রায় এক মাস কেটে গেল; এর ভেতরে কবরখানার বান্ধবীর সঙ্গে পূর্ব সম্পর্কটা ঝালাই ক'রে নেওয়ার প্রলোভনটা আর আমার মনে দেখা দেয় নি। তারপরে কী জানি কেন হঠাৎ একদিন আমার মনে হল হয়ত তাঁকে মন্তমার্তি সিমেট্রিতে আমি দেখতে পাব। একদিন আমি সেখানেই গেলাম।

ঘুরছি, আর দেখে-দেখে বেড়াচ্ছি। টনকিনের যুদ্ধে নিহত সেই ক্যাপ্টেনটির কবরের কাছে শোকবিদ্ধা কোন রমণীর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল না। শেষ পর্যন্ত দেখা হ'ল, তবে সেটা কবরখানার আর একটি অঞ্চলে। কবরখানার সঙ্কীর্ণ একটি পথ বেয়ে দুটি শোকসন্তপ্ত মূর্তি ধীরে-ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এল। হ্যাঁ,·· এইত সেই মহিলা।

আমাকে দেখে ভদ্রমহিলা একটু লজ্জা পেলেন; চমকেও উঠলেন। আমি অপরিচিতের ভঙ্গীতে তাঁর গা ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমার দিকে একবার চট করে তাকিয়ে দেখলেন; মনে হ'ল তিনি যেন বলছেন—আমাকে এখন চিনতে চেষ্টা করো না। তুমি আমার সঙ্গে পরে দেখা করো।

তাঁর সঙ্গীটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; বেশ পদস্থ মিলিটারী অফিসার। তাঁর কাঁধে মাথা রেখে শোকবিধুরা ভদ্রমহিলা। টনকিনের যুদ্ধে নিহত ক্যাপ্টেনের বিধবা ধীরে-ধীরে হেঁটে বাইরের দিকে যাচ্ছেন। আমি তো অবাক, একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। মেয়েটি কি সত্যিকার একটি বেশ্যা? কবরখানায় শোকসন্তপ্ত শিকার পাকড়ানোর জন্যেও কি এইভাবে ঘুরে বেড়ায়? এরকম কি আরও অনেক রয়েছে? এটা কি ওর পেশা? রাস্তায় ঘাটে প্রেমিকের হাত ধরে যেসব বান্ধবীরা ঘুরে বেড়ায় সেইরকমই কি ও কবরখানার মধ্যে প্রেমিকের সন্ধান করে? তার এই পরিকল্পনার নতুনত্বকে প্রশংসা না ক'রে আমি পারলাম না।

সেদিন সে কার বিধবা সেজেছিল জানতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম।

আমার কাকা জুলে

[My uncle Jules]

সাদা দাড়িওয়ালা একটি দরিদ্র বৃদ্ধ আমাদের কাছে ভিক্ষা চাইলে আমার বন্ধু দভ্রাঙ্কে তাকে পাঁচটি ফাঁ দিলেন। তাঁর এহেন বদান্যতা দেখে আমি অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন—বৃদ্ধটিকে দেখে আমার একটা গল্প মনে প'ড়ে গেল। সেটা আমি এখনও ভুলতে পারি নি। গল্পটা শোন:

"আমাদের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। কোনরকমে সংসারটা চলত—এই যা। সেইটুকু চালাতেই বাবা একেবারে হিমসিম খেয়ে যেতেন। আমার বোন ছিল দুটি। সাংসারিক এই দুরবস্থার জন্যে মায়ের ভীষণ কষ্ট হোত; আর সেই নিয়ে বাবাকে তিনি যা-তা বলতে ছাড়তেন না। নিজের

অপদার্থতায় বাবাও কম কষ্ট পেতেন না। মায়ের তিরস্কার শুনে কপালে হাত দিয়ে এমন করুণভাবে চুপচাপ বসে থাকতেন যে তাঁকে দেখলে আমার খুব কষ্ট হোত। খাওয়া-দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদ সবদিক থেকেই আমরা সংযত ছিলাম। আমার বোনেরাও তাদের নিজেদের পোশাক নিজেরাই ক'রে নিত। খাওয়াটাও ছিল আমাদের অত্যন্ত সাধারণ; কোনরকম বিলাসিতা করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না।

তবে প্রতিটি রবিবার আমরা বেশ ভাল পোশাক প'রে জাহাজ ঘাটের দিকে বেড়াতে যেতাম। ফ্রক কোট, টপ হ্যাট, আর দস্তানা পরে বাবা-মায়ের হাত ধরতাম। সেজেগুজে আমার বোনেরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করত। কিন্তু সবসময়েই শেষ মুহূর্তে বাবার কোটের ওপরে একটা দাগ সকলের চোখে পড়ে যেত। তখন সেই দাগ তুলে ফেলার জন্যে একটা হইচই বেঁধে যেত।

তারপরে বেশ গম্ভীরচালে আমরা বেরিয়ে পড়তাম। আমার বোনেরা হাতধরাধরি করে সামনে যেত। তাদের বিয়ের বয়স হয়েছিল। শহরের মধ্যে ভাল সাজে তাদের ঘুরে বেড়ানো উচিৎ। আমি মায়ের হাত ধরে বাবার পাশে-পাশে চলতাম। এই রবিবারের দিনগুলিতে আমার বাবা-মা বেশ ভারিক্কীচালে হাঁটতেন।

প্রতিটি রবিবারে জাহাজ ঘাটে বিদেশ থেকে বড় কোন জাহাজ এসে লাগলে বাবা বলতেন—হঠাৎ জুলে যদি এই জাহাজে এসে পড়ে তাহলে আমরা সবাই অবাক হয়ে যাব—তাই না?

কাকা জুলে প্রথম জীবনে সংসারের অভিশাপ ছিলেন। তখন বলতে গেলে তাঁরই আশায় আমরা দিন গুণছিলাম। সেই ছেলেবেলা থেকেই তাঁর নাম আমি এত শুনেছিলাম যে আমার মনে হোত দেখা হ'লে তাঁকে চিনে নিতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। অ্যামেরিকা যাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর জীবনের খুঁটি-নাটি আমি জানতাম। বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর সেই জীবনযাত্রায় আমার বাবা-মা কেউ খুশি ছিলেন না। অন্য কথায়, তিনি সংসারের কিছু অর্থ নষ্ট করেছিলেন। আমাদের মত দুঃস্থ সংসারে এটি অমার্জনীয় অপরাধ; যে-সংসারে পাই-পয়সাটি পর্যন্ত হিসাব ক'রে খরচ করতে হয় সেখানে টাকা, তা সে যত কমই হোক, ওড়ানো একটা অমার্জনীয় অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়।

যাই হোক, বাবা যে অর্থটি নেওয়ার জন্যে চুপ ক'রে বসেছিলেন তার কিছুটা কাকা অনর্থক খরচ ক'রে অন্যায় করেছিলেন। সে যুগে এদেশে একটা রীতি প্রচলিত ছিল। সেটা হল, দেশে কেউ কিছু রোজগার করতে না পারলে তাকে অ্যামেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হোত। সে দেশে নাকি পথে প্রান্তরে গাদ-গাদা সোনারকুচি ছড়িয়ে রয়েছে। কেবল কুড়িয়ে নেওয়ার

অপেক্ষা; কাকাকেও সেইরকম একটা মালবাহী জাহাজে চাপিয়ে নিউ-ইয়র্কের দিকে চালান ক'রে দেওয়া হল।

অ্যামেরিকায় পৌঁছিয়ে কাকা কী যেন একটা ব্যবসা সুরু করেছিলেন। তারপরেই তিনি একটা চিঠি দিলেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখলেন—তাঁর কিছু রোজগারপাতি হচ্ছে; এবং তিনি আশা করেন আর কিছুদিনের মধ্যেই বাবার যে অর্থ তিনি নষ্ট করেছেন সেটা পুষিয়ে দিতে পারবেন। চিঠি পেয়ে বাবা-মার আনন্দ আর ধরে না। এতদিন যাঁর নাম তাঁরা ভুলেও উচ্চারণ করতেন না এখন সেই মানুষটাই তাঁদের কাছে বংশের সুযোগ্য সন্তান বলে মনে হল। তাঁর প্রশংসায় তাঁরা একেবারে পঞ্চমুখ। একদিন একটি জাহাজের ক্যাপটেনের কাছে শোনা গেল কাকা সেখানে বেশ বড় একটা দোকান ভাড়া নিয়ে ভালই ব্যবসা করছেন।

বছরদুই পরে কাকার দ্বিতীয় চিঠি এল। তিনি লিখলেন—প্রিয় ফিলিপ, আমার স্বাস্থ্যের জন্তে চিন্তা করো না। স্বাস্থ্য আমার ভালই রয়েছে। ব্যবসাও ভাল। আমি আগামীকালই অনেক দিনের জন্যে দক্ষিণ অ্যামেরিকায় যাচ্ছি। সেখানে আমাকে কয়েক বছর থাকতে হ'তে পারে। এর ভেতরে যদি কোন চিঠি নাও পাও তাহলেও ভেব না। অনেক টাকা নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে আমি বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছি; তারপরে আমরা বেশ আরামেই থাকতে পারব···

এই চিঠিটাই আমাদের কাছে মহাপুরুষদের বাণী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এই চিঠিটা সবাইকে আমরা দেখিয়ে বেড়াতাম। পরের দশটি বছর কাকার কাছ থেকে কোন সংবাদই আর এল না। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই বাবার আশা বাড়তে লাগল। আর আমার মত প্রায় বলতে সুরু করলেন—জুলে বাড়ি ফিরে এলে আমাদের আর দেখে কে? এই মানুষটাই জানে জীবনে কী ক'রে উন্নতি করতে হয়।

সেই কাকার চিঠির ওপরে নির্ভর ক'রে কত পরিকল্পনাই আমরা করলাম। ইগোভিলার কাছাকাছি একটা জমি কেনার ব্যবস্থাও হল। মনে হল, একটা জমি কেনার জন্তে বাবা কথাবার্তাও সুরু করেছিলেন কিছুটা।

বোনেদের বয়স আঠাশ আর ছাব্বিশে গিয়ে দাঁড়াল। তখনও পর্যন্ত তাদের বিয়ে হয় নি। এরই জন্তে আমরা কিছু অস্বস্তি ভোগ করছিলাম। শেষ পর্যন্ত ছোট বোনের একটি পাত্র জুটলো। পাত্র একটি কেরাণী, তবে দেখতে ভালই। আমার সন্দেহ হচ্ছে কাকার সেই চিঠিটাই বার-বার পড়ে সে-ও তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত এই বিয়েতে মত দিয়েছিল। ঠিক হল, বিয়ের পরে সবাই আমরা একসঙ্গে জারসিতে বেড়াতে যাব। জায়গাটা বেশী দূরে নয়—দরিদ্রদের আমোদ-প্রমোদের উপযুক্ত। যদিও সামান্য, তবু তো কিছুটা সমুদ্রযাত্রা হবে। তাছাড়া বন্দরটা ব্রিটিশদের হওয়ার ফলে,

বিদেশ বটে—যদিও সমুদ্র-পথে জায়গাটি আমাদের দেশ থেকে মাত্র দু ঘণ্টার পথ।

তারপরে একদিন আমরা সত্যি-সত্যি জাহাজে চড়লাম; এবং যথাসময়ে জাহাজ ছাড়লো। জেটি ছেড়ে সমুদ্রের বুকে ভাসতে লাগল জাহাজটা। পরিচ্ছন্ন ফ্রক কোট পরে বাবা ডেকের ওপরে পায়চারি করতে লাগলেন। ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন দুটি কেতা-দুরস্ত মহিলাকে দুটি ভদ্রলোক মহাসমাদরে অয়েস্টার খাওয়াচ্ছেন। আর একটি ময়লা ছেঁড়া পোশাক পরা নাবিক ছুরি দিয়ে ওয়েস্টারের খোলাটা ছাড়িয়ে ভদ্রলোকদের এগিয়ে দিচ্ছে। ভদ্রমহিলারা অত্যন্ত সাবধানে রসটি শুষে নিয়ে খোলাগুলি সমুদ্রে ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

সেই দেখে হঠাৎ আমার বাবার ইচ্ছে হল সমুদ্রের ওপরে আমাদেরও তিনি অয়েস্টার খাওয়াবেন। ব্যাপারটাকে তিনি বেশ রুচিশীল ব'লে মনে করলেন।

প্রস্তাবটা শুনেই খরচের ভয়ে মা আমতা-আমতা করতে লাগলেন, কিন্তু আমার বোন দুটি রাজি হওয়ার ফলে তিনি একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—ও জিনিস বাপু আমার পেটে সইবে না। তুমি বরং ওদের জন্যে কিছু কিনে দাও। বেশী নয়—বেশী খেলে ওদের পেট খারাপ হবে। আর জোশেক [অর্থাৎ আমি], তুমি ওসব খেয়ো না, ওসব খেলে ছেলেরা ব'য়ে যায়।

সুতরাং আমার আর যাওয়া হ'ল না। মুখটা চুণ ক'রে আমি মায়ের কাছে রয়ে গেলাম। দেখলাম—দুই কন্যা আর জামাতাকে নিয়ে বাবা বুক ফুলিয়ে গট গট ক'রে সেই বুড়ো নাবিকটির কাছে হাজির হ'য়ে জামা কাপড় নষ্ট ক'রে কি করে—ওয়েস্টার খেতে হয় তাই সবাইকে বোঝাতে লাগলেন; এবং সেই পদ্ধতিটা বোঝাতে গিয়ে ওয়েস্টারের রস নিজের জামার ওপরে ঢেলে দিলেন।

কিন্তু তারপরেই বাবার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দু'পা পিছিয়ে এসে তিনি সেই নাবিকটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন; তারপরে আমাদের কাছে এসে বললেন—অবাক কাণ্ড! লোকটাকে দেখতে অবিকল আমাদের জুলের মত।

বলতে-বলতে তাঁর মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠল।

হতভম্ব হ'য়ে মা বললেন—কোন্ জুলে?

কে আবার? আমার ভাই···আমি যদি না জানতাম সে অ্যামেরিকাতে ভালই রোজগার করছে তাহলে আমি নিশ্চয় বলতে পারতাম ও-ই সেই জুলে।

তুমি একটি বদ্ধ পাগল। তুমি নিশ্চয় জান এ সে নয়, তবু পাগলের মত বকছো।

বেশ তো। তুমি নিজেই একবার দেখে এস।

মা তাঁর মেয়েদের কাছে উঠে গেলেন। আমিও সেই নাবিকটিকে ভাল ক'রে দেখলাম। একটা বুড়ো মানুষ, ময়লা পোশাক তার গায়ে, বার্দ্ধক্যের ছাপ তার সারা অঙ্গে। সে একমনে তার কাজ করে যাচ্ছে। খদ্দেরদের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না।

মা ফিরে এলেন। তাঁর হাত-পা তখন কাঁপছে; বললেন—ঠিকই বলেছ, জুলেই বটে। তবু ক্যাপ্টেনকে একবার জিজ্ঞাসা করে এস। সাবধান, আবোল-তাবোল বলো না। ওই হতভাগাটাকে আর আমরা ঘরে ডেকে নেব না।

বাবা ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা করলেন; একথা সেকথার পরে জিজ্ঞাসা করলেন নাবিকটির কথা। ক্যাপ্টেন বিরক্ত হ'য়ে বললেন—ও একটা ফরাসী বাউণ্ডুলে। গত বছর ওকে আমি অ্যামেরিকায় দেখতে পেয়ে এদেশে নিয়ে এসেছি। শুনলাম লি হাভারে [আমাদের বাড়ি যেখানে] ওর আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। কিন্তু ও বাড়ি ফিরে যেতে চায় না; কারণ ও তাদের কাছে টাকা ধার করেছে। ওর নামটা যেন ··কী···জুলে দারমঁচি ওইরকমই কী একটা হবে। একদিন ওর অবস্থা ভালই ছিল···কিন্তু বর্তমানে ওর অবস্থাটা কী হয়েছে তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন।···

বিবর্ণমুখে কাঁপতে-কাঁপতে বিড়বিড় করতে-করতে ফিরে এলেন বাবা; তারপরে বেঞ্চের ওপরে ধপাস ক'রে বসে পড়ে বললেন—এ সেই···সে-ই। আর কেউ নয়।

তারপরে করুণভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কী করি বলত? হায়, হায়···

মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন—বাচ্চাদের সরিয়ে আনতে হবে ওখান থেকে। জোশেফই ওদের ডেকে আসুক। সাবধান, এ-বিষয়ে জামাই যেন কিছু সন্দেহ করতে না পারে।

বাবা কাতরে উঠলেন—কী বিপদ, কী বিপদ···

মা বলে উঠলেন—আমি চিরদিনই জানতাম চোরটা কোনদিনই কোন কাজে আসবে না। হাজার হোক, ওতো তোমার বংশেরই ছেলে। ওর কাছ থেকে আর আশা কী। জোশেফ ওয়েস্টারের দাম মিটিয়ে দিয়ে আসুক। চল, আমরা সবাই জাহাজের অন্য দিকে চলে যাই। লোকটা যেন আমাদের কাছে ঘেঁষতে না পারে।

দাম মেটানোর জন্যে আমার হাতে পাঁচটা ফ্রাঁ দিয়ে মা সরে গেলেন।

আমি সেই বৃদ্ধের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কত দাম হয়েছে, মঁসিয়ে?

তাঁকে আমার কাকা বলেই ডাকতে ইচ্ছে হয়েছিল।

বৃদ্ধটি বললেন—আড়াই ফ্রাঁ!

আমি পাঁচটি ফ্রাঁ তাঁর হাতে দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। শোকে দুঃখে হতাশায় বৃদ্ধের মুখটা করুণ হ'য়ে উঠেছে। বার বার আমার মনে হল—এই আমার কাকা, আমার বাবার ভাই।

বৃদ্ধ দামটা কেটে নিয়ে বাকিটা আমাকে ফেরৎ দিলেন। বকশিস হিসাবে আমি দশটি সো তাঁর হাতে দিতেই তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু এর জন্যে মা আর বোনেদের কাছে আমাকে যথেষ্ট কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল।

পাছে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হ'য়ে যায়—এই ভয়ে আমরা অন্য জাহাজে ক'রে ফিরলাম।

তারপর থেকে বাবার সেই ভাই-এর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি।

তাই মাঝে-মাঝে কোন বুড়ো ভিখারীকে দেখলেই আমি পাঁচটা ফ্রা-ই দেই।

আঁদ্রের কী হ'ল

[The matter with Andre]

পার্কের দিকে মুখ ক'রে নোটারির বাড়িটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির পেছনে বেশ সুন্দর বাগান—অনেকটা জায়গা জুড়ে এর পরিধি। বাগানের শেষে একটা দেওয়াল; তারপরেই পরিত্যক্ত নির্জন একটা রাস্তা। বাগানের এই নির্জন অংশেই ম্যাত্রি মরুর স্ত্রী সর্বপ্রথম ক্যাপটেন সোমারিভকে প্রেম নিবেদন করলেন। ক্যাপটেন বেশ কিছুদিন ধরেই ভদ্রমহিলার করুণা ভিক্ষা করছিলেন।

ভদ্রমহিলার স্বামী এক সপ্তাহের জন্যে প্যারিসে গিয়েছিলেন। সুতরাং এক সপ্তাহের জন্যে তিনি মুক্ত। ভদ্রমহিলা নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে করতেন। স্বামীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁর ব্যবসা। সেই কাজেই তিনি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। ফলে, স্ত্রীর ওপরে খুব বেশী একটা নজর দিতে পারতেন না। ক্যাপটেনও তাঁকে মিষ্টি কথা ব'লে, আর অনুনয় ক'রে ক'রে তাঁকে একেবারে মুগ্ধ ক'রে ফেলেছিলেন। ফলে তিনিও ক্যাপটেনের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে ফেলেছিলেন। ভবিষ্যতে আরও কিছু দেবেন কিনা সে-বিষয়ে কোন কিছু চিন্তা করার-ও অবসর পান নি।

বেশ কিছুদিন ধরে কাব্যিক প্রেম, হস্তমর্দন, দরজার পেছন থেকে চুরি-করা কিছু চুম্বনের পরে ক্যাপটেন ঘোষণা করলেন যে স্বামীর অনুপস্থিতির সময়

ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গে সত্যি-সত্যিই বাগানের অন্ধকারে যদি একদিন নিবিড়-ভাবে না মেশেন তাহলে তিনি অনতিবিলম্বে বদলি হওয়ার জন্যে দরখাস্ত করবেন।

কী আর করেন ভদ্রমহিলা! প্রেমিককে 'না' বলে ফিরিয়ে দেওয়া কি সোজা কথা। তাই একদিন তিনি প্রেমিকের সঙ্গে বাগানে গাছের তলায় মিলিত হ'তে রাজি হলেন।

সেদিন তিনি বাগানের দেওয়ালের ধারে সন্ধ্যের অন্ধকারে প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। খুটখাট শব্দ হ'লেই তাঁর বুকটা ধড়ফড় ক'রে ওঠে। ভয়ে তিনি মাঝে-মাঝে বেশ কুঁকড়ে উঠছিলেন, এমন সময় মনে হ'ল কে যেন পাচীলের ওপরে উঠে ধপাস করে নীচে লাফিয়ে পড়ল। চমকে উঠলেন তিনি। যদি ক্যাপটেন না হ'য়ে চোর-টোর কেউ হয়? এমন সময় ক্যাপটেনের স্বর শুনতে পেলেন তিনি—'মিথিলডি?' ও তুমি! আমি ভেবেছিলাম···

তারপরেই তারা দীর্ঘ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে ঠোঁটের ওপরে ঠোঁট টিপে রইলেন দু'জনে। এমন সময় হঠাৎ ঝিরঝিরে বৃষ্টি সুরু হ'ল; তারপরেই বড়-বড় ফোঁটা।

ক্যাপটেন বললেন—মিথিলডি, প্রিয়তমে—চল, এবারে আমরা ঘরে যাই। এখন অনেক রাত হয়েছে, ভয়ের কোন কারণ নেই আমাদের।

না, না। যদি কেউ দেখে ফেলে!

জোর ক'রে জড়িয়ে ধরে ক্যাপটেন বললেন—তোমার চাকররা থাকে তেতলায়। তুমি থাক দোতলায়। কেউ জানতে পারবে না। তাছাড়া, তোমাকে আমি সর্বশরীর দিয়ে ভালবাসি—মানে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

এই বলে ক্যাপটেন তাঁকে চুমোতে-চুমোতে ভরিয়ে দিলেন। তারপরে তাঁকে চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে দোতলায় হাজির হলেন। ঘরে ঢোকামাত্র, মিথিলডি দরজায় খিল এঁটে দিলেন; তারপরে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় তিনি আর্মচেয়ারে ঢলে পড়লেন। ক্যাপটেন তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁকে বিবস্ত্র করতে সুরু করলেন।

মিথিলডি বাধা দিয়ে বললেন—না, না। আমার সতীত্ব নষ্ট করো না। এরপরে তোমাকে হয়ত আমি ঘৃণা করব। তাছাড়া, কাজটা বড় কুৎসিত। দেহ নষ্ট না ক'রে কি আমরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারিনে?

কিন্তু ক্যাপটেনকে বোঝানো গেল না। তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে প্রেমিকাকে বিবস্ত্রা করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে দাঁড়িয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে মিথিলডি বুঝতে পারলেন তিনি একেবারে বিবস্ত্রা হয়ে পড়েছেন, লজ্জায় দৌড়ে তিনি বিছানার মধ্যে আত্মগোপন করলেন। ক্যাপটেনও বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন;

কিন্তু তার আগেই নেহাৎ অনবধানতাবশতঃই তাঁর খাপের তলোয়ারটা মেঝের ওপরে বেশ জোরে শব্দ করে ঠুকে গেল।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে একটা তীক্ষ্ণ কচি শিশুর চীৎকার শুরু হ'ল।

মিথিলডি বললেন—আঁদ্রে জেগে উঠেছে। ও আর কিছুতেই ঘুমোবে না।

আঁদ্রের বয়স পনের মাস। তাঁর ঘরের লাগোয়া একটি ঘরেই সে ঘুমোত।

কামাসক্ত এবং উন্মত্ত ক্যাপটেন বললেন—তাতে কী যায় আসে। আমি তোমাকে ভালবাসি, মিথিলডি—তুমি আমার।

আতংকে মিথিলডি বললেন—উঁহু। তার কান্নার শব্দে এখনই নার্স জেগে উঠবে। তখন একটা কেলেঙ্কারী বেধে যাবে। তাকে থামানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে এ ঘরে নিয়ে এসে ঘুম পাড়ানো। দাঁড়াও, সেই চেষ্টাই করি।

ছেলেটার গলা একখানা বটে। বিপুল অস্বস্তি নিয়ে ক্যাপটেন উঠে বসলেন। মিথিলডি দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন। চুপ ক'রে গেল ছেলেটা।

মিথিলডি খুব সাবধানে পাশের ঘরে তার বিছানায় শুইয়ে দিযে ফিরে এলেন। ক্যাপটেন তাঁর আসার অপেক্ষায় বসেছিলেন। মিথিলডি ঘরে ঢোকামাত্র দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বিছানার ওপরে শুইয়ে দিলেন। প্রেমাভিনয় যখন চরমে উঠেছে এবং দুজনেরই ভাষা যখন রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে ঠিক সেই চরম মুহূর্তে হতচ্ছাড়া বাচ্চাটা আবার চীৎকার করে উঠল।

ক্যাপটেন তো রেগে কাঁই। হতচ্ছাড়াটা কি থামবে না।

মিথিলডির মনে হ'ল দোতলায় কে যেন হাঁটছে। আয়া আসছে ভেবে তিনি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বাচ্চাটাকে নিয়ে এলেন; তারপরে তাকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দেওয়ামাত্র সে চুপ করে গেল। পর-পর তিনবার সে একই কাণ্ড করল; বেচারা ক্যাপটেন ভোর হওয়ার একঘণ্টা আগে অভি-সম্পাৎ দিতে-দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাঁকে শান্ত করার জন্যে মিথিলডি সেদিন রাত্রিতে তাঁকে আবার আসার জন্যে অনুরোধ জানালেন। অর্থাৎ এলে সুদশুদ্ধ পুষিয়ে দেবেন তিনি।

পরের রাত্রিতেও ক্যাপটেন সাহেব যথারীতি এলেন। সেদিন তিনি একটা হেস্তনেস্ত করতে বদ্ধপরিকর। তলোয়ারটাকে তিনি অত্যন্ত সাবধানে খুলে রাখলেন; চোরের মত-সন্তর্পণে খুলে রাখলেন জুতো জোড়া; মিথিলডির সঙ্গে কথা বললেন ফিসফিস ক'রে। তারপরে প্রণয়িনীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করতে যাবেন ঠিক এমনি সময়ে পাশের ঘরে বাচ্চাটা চীৎকার করে উঠল। আঁদ্রে জেগে উঠেছে; শেয়ালের মত হুক্কাহুয়া জুড়ে দিল বাচ্চাটা। ক্যাপটেনকে জোর ক'রে সরিয়ে দিয়ে মিথিলডি

পাশের ঘরে দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে এঘরে নিয়ে শুইয়ে দিলেন। রাগে গরগর করতে-করতে ক্যাপটেন শুয়েই রইলেন ; উঠলেন না। ধীরে-ধীরে চুপিসারে তিনি বাচ্চাটার গায়ে জোরে চিমটি কাটলেন। বাচ্চাটা চীৎকার করে উঠল। তাতেও থামলেন না ক্যাপটেন। আবার জোরে চিমটি কাটলেন। যন্ত্রণায় আর চীৎকারে বাচ্চাটা ছটফট করতে লাগল। ক্যাপটেন বারকতক এইভাবে রাম চিমটি কেটে বললেন—এবারে ওকে নিয়ে শুইয়ে দিয়ে এস। ও হয়ত এবার ঘুমিয়ে পড়বে।

তাই হ'ল। বাচ্চাটাকে অন্য ঘরে শুইয়ে দেওয়ামাত্র মাঝে-মাঝে একটু-একটু ফুঁপিয়ে সে চুপ ক'রে গেল। রাত্রির বাকি অংশটা ক্যাপটেনের বেশ আরামেই কাটলো। মিথিলডির কাছ থেকে তিনি যা চেয়েছিলেন তাই নিয়ে বিদায় হলেন। পর-পর ক'টা দিনই সেই একই ব্যাপার ঘটলো। যতবারই বাচ্চাটা চেঁচালো ততবারই ক্যাপটেন বাচ্চাটাকে চিমটির পর চিমটি কেটে গেলেন। বাচ্চাকে ফিরিয়ে নিয়ে তার বিছানায় শুইযে দিলেই কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ত। দিনচারেক পরে তার মায়ের ঘরে আসার জন্ত আর বাচ্চাটা কাঁদতো না। ক্যাপটেন বিনা বাধায় প্রিয়-তমার দেহ-সুধা পান করতে লাগলেন।

শনিবার রাত্রিতে নোটারী তাঁর গার্হস্থ্যধর্মে ফিরে এলেন ; তারপরে রাত্রিতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য সম্পাদনের পরে তিনি বললেন—অবাক কাণ্ড! আজ তো আঁদ্রে কাঁদছে না। ওকে নিয়ে এস, মিথিলডি। আমাদের মাঝখানে ওকে শুইয়ে দাও।

মিথিলডি বাচ্চাটাকে সেই ঘরে এনে বিছানার ওপরে শুইয়ে দেওয়ামাত্র বাচ্চা ভয়ে হিম হ'য়ে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল। নোটারী বাচ্চাটির এবম্বিধ ব্যবহারে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপারটা কী বলত?

মিথিলডি বললেন—কী জানি। তুমি যে ক'দিন ছিলে না সে ক'দিন আমি কিছুতেই এই বিছানাতে ওকে শোওয়াতে পারি নি।

পরের দিন সকালে নোটারী বাচ্চাটার ঘরে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন। বাচ্চাটা খিল খিল ক'রে হাসতে লাগল। নোটারী খুশি হয়ে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। হঠাৎ বিছানার দিকে এগোতেই বাচ্চাটা তীব্রস্বরে চীৎকার করে উঠল ; বাবার কোলের ওপরে সে ছটফট করতে লাগল। মনে হ'ল, কেউ যেন তাকে মেরেছে।

নোটারী বললেন—নিশ্চয় ওর কিছু হয়েছে।

এই বলেই তিনি বাচ্চাটার জামাটা টানলেন ; টেনেই অবাক হ'য়ে দেখলেন বাচ্চাটার দাবনা, কোমর, পিঠের সর্বত্র চাকা-চাকা নীল দাগে বোঝাই হ'য়ে গিয়েছে।

—মিথিলডি, দেখ-দেখ—কী ভয়ঙ্কর।

ভয় পেয়ে মিখিলভি দৌড়ে এলেন। তাইত, বড় বড় চাকা-চাকা দাগে বাচ্চাটার নিম্নাংশ একেবারে ছেয়ে গিয়েছে। তিনি ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অবাক হ'য়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে কোনকিছু চিন্তা না করেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন—আচ্ছা জানোয়ার বটে।

স্বামী অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী বললে? কে জানোয়ার?

হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলেন মিখিলভি; আমতা-আমতা ক'রে বললেন —না, মানে বলছিলাম—ও কিছু নয়। বলছিলাম ওর কান্না থামানোর জন্যে নিশ্চয় আয়াই ওকে চিমটি কেটেছে। আহা, বেচারাকে একেবারে জখম করে দিয়েছে।

আয়াকে পাকড়ে এনে নোটারী তো এই মারেন, এই মারেন। তবু তার ঔদ্ধত্যটা একবার দেখুন। নিজের দোষ সে কিছুতেই স্বীকার করল না। টাউন কাউনসিলে নোটারী তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে এলেন; ফলে, বেচারীর চাকরি পাওয়া একেবারে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল।

অজ্ঞাত রমণী

[The unknown woman]

আমরা বসে-বসে নানারকম গল্প করছিলাম। জীবনে কে কী লাভ করেছিল সেই সম্পর্কে ঠিক হ'ল সবাই এক-একটা কাহিনী বলবে। রজার দে অ্যানেটি বললেন, প্রেম করতে গেলে সমুদ্রতীরই সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গা।

এতক্ষণ গোঁট্রাঁ কোন কথা বলে নি। সে বলল—প্যারিসই এখনও পর্যন্ত নারী-শিকারের সবচেযে সুখের জায়গা। যেখানে কিছুই আমরা আশা করতে পারি নি সেখানে বই-এর মত নারীদের মূল্যও আমরা বেশ বুঝতে পারি; কিন্তু সবচেয়ে সুন্দরী রমণী প্যারিসেই পাওয়া যায়।

একটু চুপ ক'রে থেকে সে বলল—হায় ভগবান, সত্যিই কী সুন্দরী এরা! যে-কোন বসন্তের সকালে রাস্তায় বেরিয়ে যাও। টাটকা ফুলের মত বাড়ির আশপাশে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফুটপাত থেকে থোকা-থোকা তাজা ভায়লেট ফুলের গন্ধ আমাদের নাকে ভেসে আসে; বসন্তের সকালে সারা শহর রমরমিয়ে ওঠে। হালকা, পাতলা ফ্রকের ভেতর থেকে যুবতীদের দেহসৌষ্ঠব কী সুন্দরভাবেই না বেরিয়ে আসে! ঘুরতে-ঘুরতে ছোঁক-ছোঁক করতে-করতে এগিয়ে যাও। ঝাঁক বেঁধে সুন্দরী যুবতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই রকম সকাল-গুলিই সত্যিকার স্বর্গীয়।

দূর থেকে দেখতে পেলে সে আসছে। একশ পা দূর থেকে তার সুন্দর চেহারাটা তোমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার টুপীর ওপরে একটা ফুল, তার মাথা সঞ্চালনের প্রক্রিয়া, তাঁর বিশেষ অঙ্গভঙ্গী দেখেই তুমি তাকে ঠিক চিনে নিলে। তুমি মনে-মনে বলে উঠলে—খাড়া রহ। সামনে চোখ ফেরাও। তারপরে চোখ দিয়ে তাকে গিলতে-গিলতে তার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাও।

তন্বীটি কি কোন জিনিস কিনতে দোকানে যাচ্ছে? অথবা, যুবতীটি কি গির্জা থেকে ফিরে আসছে, বা যাচ্ছে তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে? যেখানে খুশি যাক, স্বচ্ছ কাঁচুলির ভেতর দিয়ে তার উঁচু কুচ দুটি দেখা যাচ্ছে পরিচ্ছন্নভাবে। কেবল একটা আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়ার অথবা, ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরার অপেক্ষা মাত্র, সে কি ভীরু অথবা সাহসিনী; তার মুখটা কি কালো, না, সুন্দর? চুলোয় যাক সে সব কথা। তোমার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তোমার সারা শরীরে একটা শিহরণ জেগে ওঠে; আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি—এই রকম অন্তত এককুড়ি যুবতীর সান্নিধ্যে আমি এসেছি, আর, তাদের কারও একজনের সঙ্গেই কিছুটা ঘনিষ্ঠতা জন্মালে আমি তার সঙ্গে প্রেমে পড়ে যেতাম।

কিন্তু মজাটা ওইখানেই। যাদের আমরা পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে যাই, তাদের আমরা চিনিনে। তা কি তোমরা লক্ষ্য করেছ? ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত, তাই না? কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় চকিতের মত। রাস্তায় তাদের দেখে আমি তো তাই রাগে গরগর ক'রে উঠি। তারা কে? কোথায় থাকে? কোথায় তাদের সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে? প্রবাদই রয়েছে, আমরা যেন সব সময় সুখের সামনা সামনি দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি আমি এমন সব অপরূপ নারীদের সান্নিধ্যে এসেছি যাদের যে-কোন একজনই তার দেহের সুবাস দিয়ে আমাকে চিরকাল লিনেট পাখির মত আটকে রাখতে পারত।"

এতক্ষণ রজার হাসতে-হাসতে তার কথা শুনছিল; এবারে সে বলল—তুমি যা বলবে সব আমি জানি। আমার জীবনে একবার কী ঘটেছিল শোন, বছর পাঁচেক আগের কথা। সেই প্রথম জীবনে আমি এমন একটি দীর্ঘাঙ্গিনী স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে দেখলাম যে আমাকে বেশ মুগ্ধ ক'রে ফেলেছিল। ঠিক মুগ্ধ না ব'লে 'অভিভূত' বলতে পার। তার ঠোঁটের ওপরে গোঁফের আভাস দেখে আমার মন স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে উঠতো। টেবিলের ওপরে একগোছা ফুল দেখলে মানুষ যেমন তার প্রিয় অরণ্যের স্বপ্নে মসগুল হ'য়ে ওঠে এ-ও যেন সেই রকম। নিখুঁৎ গড়ন মেয়েটির; শক্ত গোল দুটি কুচ; তারা যেন বুক ফুলিয়ে বাজি রেখে মানুষকে প্রলুব্ধ করছে। মেয়েটির দুটি চোখ যেন ঠিক চোখ নয়; মনে হচ্ছে, মাথার পাশে ছায়াচ্ছন্ন দুটি গভীর খাদ। তার ভেতরে মানুষ যেন সোজা তলিয়ে যেতে পারে।

দেখে মনে হয়েছিল সে জু-রমণী; আমি তার পিছু নিলাম; আমার মত আরও অনেকে ঘুরেফিরে তাকে দেখল। তার চলার ধরণে বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠল। কিছুটা গিয়ে সে একটা গাড়ী নিল। আমি সেইখানেই স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

পরের তিনটি সপ্তাহ তাকে আমি মনে রেখেছিলাম। তারপরে ভুলে গেলাম তাকে।

মাস ছয়েক পরে রাস্তায় আবার একদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হল। তাকে দেখেই মনের ভেতরে আবার আমার তোলপাড় করে উঠল। মনে হল, আমার এমন একটি প্রণয়িনীর সঙ্গে দেখা হয়েছে যাকে আমি উন্মত্তের মত ভালবাসতাম। তার জন্যে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার গা ঘেঁষেই সে পেরিয়ে গেল। মনে হল আমি গনগনে একটা আগুনের চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সে চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আমার মুখে চাবুক কসিয়ে দিয়ে গেল। আমি তার অনুসরণ করলাম না। ভয় হল, অনুসরণ করলে হয়ত আমি কোন অন্যায় করে ফেলব।

বারবার তাকে আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। এইরকম ভীমরতিগুলি যে কী বস্তু তা নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছ।

প্রায় একবছর পরে আবার একদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। আলাপ করার জন্যে তার পিছু নিলাম আমি। তার জন্যে আমি কতটা উন্মত্ত হয়েছি সেই কথাটাই আমি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। সে আমার দিকে চেয়ে দেখল; দেখলাম'সে একটি বাড়িতে ঢুকে গেল। দরজার কাছে দুটি ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। সে বেরিয়ে এল না। শেষকালে আমি দারোয়ানকে তার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে আমার কথা বুঝতে পারল না। তারপরে বলল—সম্ভবত, বাইরে থেকে কেউ কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

আট মাস পরে আবার তার সঙ্গে দেখা। তারপরে একদিন জানুয়ারী মাসে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমি প্রায় দৌড়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম এমন সময় একটা মোড়ের মাথায় একটি মহিলাকে আমি এতজোরে ধাক্কা দিলাম যে তার হাত থেকে একটা পার্শেল ছিটকে পড়ে গেল। ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়েই দেখি—ও হরি, এ যে সেই মেয়েটি!

একমুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হতভম্বভাবটা কাটিয়ে উঠে পার্শেলটা তাকে ফিরিয়ে দিয়েই হঠাৎ বলে উঠলাম—আপনার গায়ের ওপরে এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আমি যেমন দুঃখিত হয়েছি তেমনি আনন্দও পেয়েছি, মাদাম। আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে দুটি বছর ধরে আপনাকে আমি লক্ষ্য করেছি, আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে আমি পাগল হ'য়ে উঠেছি? কোথায় যে আপনি থাকেন তা আজও আমি আবিষ্কার করে-

উঠতে পারি নি। ক্ষমা করবেন ; আপনার সঙ্গে আলাপ করার আমার যে এত ইচ্ছে হয়েছে তার একমাত্র কারণ আপনার সঙ্গে কথা বলার অধিকার যাদের রয়েছে আমি তাদের দলভুক্ত হ'তে চাই। এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আপনি আমাকে জানেন না। আমি হচ্ছি—ব্যারণ রজার দে অ্যানেটি। আমার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিলে আপনি জানতে পারবেন আমার মত মানুষকে আপনি স্বচ্ছন্দে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করতে পারেন। তা যদি না করেন তাহলে আমি খুব দুঃখ পাব।

তিনি আমার কথা ভাল ক'রে শুনলেন ; তারপরে সেই অদ্ভুত জ্যোতি-হীন দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—ঠিকানা দিন। আমি একদিন আপনার বাড়ি যাব।

অবাক হ'য়ে আমি তাঁকে আমার কার্ডটা দিলাম। তারপরে সাহস সংগ্রহ ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—কবে দেখা হ'তে পারে ?

একটু ইতস্তত করলেন তিনি। মনে হ'ল, দুরূহ হিসাব-নিকাশ করতে ব্যস্ত আছেন তিনি। তারপরে বললেন—রবিবার সকালে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো ?

নিশ্চয় না, নিশ্চয় না।

সারা সপ্তাহ আমি কেবলই ভাবতে লাগলাম—মেয়েটি কে, কোথায় থাকে। তাকে কি আমার টাকা দেওয়া উচিত। উচিৎ হ'লে কত ? তার-পরে আমি একটা হীরের গয়না কিনে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলাম। সারারাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়ে রবিবার সকালে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দশটার সময় তিনি এলেন। শান্তভাব ; মনের মধ্যে কোথাও কোন উত্তেজনা নেই। মনে হ'ল, আমরা যেন দুটি পুরনো বন্ধু। আমি তাঁকে বসতে দিলাম ; তাঁর টুপীটা খুলে দিলাম। তারপরে কিছুটা সঙ্কোচ ক'রে আমি তাঁকে টিপতে লাগলাম। কারণ নষ্ট করার মত সময় তখন আমার ছিল না।

তিনি-ও এর বেশী আর কিছু চান নি। কুড়িটা কথাও আমাদের মধ্যে হয় নি, আমি তাঁর পোশাক খুলতে সুরু করলাম। তিনি নিজেই সে কাজে আমাকে সাহায্য করলেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া আমি কিছুতেই তাঁকে উলঙ্গ করতে পারতাম না।

বন্ধুগণ, উলঙ্গ হওয়ার সময় নারীরা যেরকম নম্রতা আর লজ্জার সঙ্গে একটির পর একটি পরিধেয় উন্মোচন ক'রে ঝরা পাতার মত খসখস করে মেঝের ওপরে ফেলে দেয় তখন কি দূর থেকে তাদের তোমরা লক্ষ্য করেছ ? তারচেয়ে চমকপ্রদ মুহূর্ত কি মানুষের জীবনে আসে ? নারীর সেই নগ্ন দেহের মধ্যে যে মাদকতা লুকিয়ে রয়েছে তাকে কি তোমরা কেউ মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছ ?

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম তাঁর কাঁধের খাঁচে একটা কালো দাগ রয়েছে। দাগটা কিসের সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ঠোঁটের ওপরে গোঁফের রেখা দেখেই আমার তা বোঝা উচিৎ ছিল। মনে হ'ল আমি সেই সহস্র এবং এক রজনীর আরব্যোপন্যাসের মায়াবিনীর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এ যেন সেই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতিনী যাদুকরী যারা মানুষকে ধ্বংসের অতলান্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করে। রাজা সলোমনের কথা মনে পড়ে গেল আমার। সেবার রাণীর পায়ে খুর আছে কিনা দেখার জন্যে এই সলোমনই একদিন তাঁকে আয়নার ওপর দিয়ে হাঁটিয়েছিলেন।

এবং···তারপরে যখন প্রেমের কথা বলার সময় হ'ল, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোচ্ছে না। অথবা, যে স্বরটা বেরোচ্ছে সেটা আমার নয়, একটা খোজার। আমার স্বর শুনে তিনি খুব বিরক্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে বললেন—এর জন্যে আমাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া উচিৎ হয় নি আপনার।

আমি আংটিটা নেওয়ার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান ক'রে দৃঢ়ভাবে বললেন—আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?

এই বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

আমার দুঃসাহসিক কাহিনীর এখানেই শেষ।

কিন্তু আমার শয়নে-স্বপনে-জাগরণে কোনদিনই তাঁকে আমি ভুলতে পারি নি। কে ওই মেয়েটি?, এখনও পর্যন্ত আমি তা জানিনে। তারপরেও তাঁর সঙ্গে আমার বারদুই দেখা হয়েছে। আমি অভিবাদন জানিয়েছি। তিনি তা গ্রহণ করেন নি। আমাকে যে তিনি চেনেন সেটাও তাঁর হাবভাবে প্রকাশ পায় নি। ওই মেয়েটি কে? সম্ভবতঃ, এসিয়াবাসী কেউ। খুব সম্ভবতঃ প্রাচ্যদেশীয় কোন ভ্রু-রমণী। হ্যাঁ তাই। সেদিক থেকে আমি নিশ্চিৎ। কিন্তু কেন? কেন বলত? তা আমি জানিনে।

একটি ঠাকুমার উপদেশ

[A grandmother's advice]

বনের মধ্যে উঁচু জায়গায় পুরনো একটা বাংলো। চারপাশে বড়-বড় গাছ। সামনের বড় পার্কটি অরণ্যের কিনার পর্যন্ত প্রসারিত। সেই প্রাসাদের সামনে একটু দূরে বিরাট একটি পাথরের জলাধার। তার ভেতরে মার্বেল পাথরের পরীরা স্নান করছে। অনেকগুলি ছোট-ছোট জলাধার পর-

পর একেবারে পাহাড়ের নীচে পর্যন্ত নেমে গিয়েছে ; আর ঝরণার জল জলাধারগুলির ওপর দিয়ে উপচে পড়ছে। বাংলো আর তার চারপাশের সমস্ত অঞ্চলটিতে প্রাচীনত্বের সব চিহ্ন বর্তমান। প্রাচীন রীতি-নীতি, বিবর্ণ ঐতিহ্য আর প্রায়-মুছে-যাওয়া বীরত্বের কাহিনীগুলি ছড়ানো রয়েছে চারপাশে।

ষষ্ঠ লুই-এর আমলের ছোট একটি ড্রয়িংরুম। দেওয়ালগুলির ওপরে মেষপালিকাদের কাছে প্রেম-নিবেদনকারী মেষপালকের ছবি আঁকা রয়েছে ; আর রয়েছে পেটিকোট-পরা সুন্দরী নারী আর পরচুলা-পরা বীর ভদ্রলোকদের। সেই ঘরে একটি বড় আরাম কেদারায় মৃতপ্রায় একটি বৃদ্ধা মহিলা শুয়ে রয়েছেন। মমীর মত হাতগুলি তাঁর চেয়ারের দুপাশে ঝুলে পড়েছে। তাঁর চোখ দুটি ক্লান্তভাবে দূরের চক্রবালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে, তিনি যেন তাঁর যৌবনের চত্বরে রোমান্টিক দিনগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। মাঝে-মাঝে খোলা জানালার ভেতর দিয়ে সুগন্ধ বাতাস বয়ে আসছে ; সেই বাতাসে তাঁর সাদা চুলগুলি উড়ছে, আর সেই সঙ্গে তাঁর চিন্তার জগতে পুরনো স্মৃতিগুলি একটার পর একটা জেগে উঠছে।

তাঁরই পাশে ঝালর-দেওয়া একটা টুলের ওপরে একটি যুবতী বসে রয়েছে ; তার সুন্দর চুলের গোছা ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার চোখ আর মুখের চেহারাটা কেমন যেন বিষণ্ণ। বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার আঙুলগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছে, মনের মধ্যে অজস্র চিন্তা গিজ গিজ ক'রে উঠছে।

কিন্তু হঠাৎ বৃদ্ধা মহিলাটি তার দিকে মাথাটা ঘোরালেন।

বার্থা, খবরের কাগজটা একটু পড় তো। সম্প্রতি পৃথিবীতে কী ঘটছে একটু জানি।

খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে যুবতীটি দ্রুতগতিতে খবরের কাগজের ওপরে চোখ বুলোতে লাগল। বলল—রাজনীতির কচকচিতে কাগজটা একেবারে বোঝাই। ওগুলো বাদ দিয়ে পড়ব, ঠাকুমা ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ ; ভাই। প্রেমের কাহিনী কিছু নেই ? আজকাল নারী-ধর্ষণ বা দুর্ধর্ষ নারীঘটিত ব্যাপার বলতে কিছু শোনা যায় না কেন ? তাহলে কি ফ্রান্স থেকে বর্তমান যুগে বীরত্ব জিনিসটা উঠে গিয়েছে ?

যুবতীটি অনেকক্ষণ ধরে খবরের কাগজটা পড়তে লাগল ; তারপরে বলল —হ্যাঁ, হ্যাঁ, রয়েছে ! একটা প্রেমের নাটক।

থুরথুরে বৃদ্ধা মহিলাটি একটু হাসলেন ; বললেন—পড়।

পড়তে শুরু করল বার্থা। কাহিনীটি হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড ছোঁড়ার। স্বামীর রক্ষিতার ওপরে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে একটি স্ত্রী অ্যাসিড ছুঁড়ে প্রতিনায়িকার চোখ আর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে। অ্যাসাইজ আদালত থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হ'য়ে তিনি ছাড়া পেয়েছেন। জনসাধারণ

তাঁকে হাততালি দিয়ে খুব তারিফ করেছে।

বৃদ্ধা মহিলা এই শুনে উত্তেজিতভাবে নড়াচড়া ক'রে অস্থিরতার সঙ্গে বললেন—ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর—একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার। দেখ তো, আর কিছু খবর রয়েছে কিনা।

আবার খুঁজতে লাগল বার্থা; তারপরে পুলিশ কোর্ট রিপোর্টের অংশটা পড়তে-পড়তে একটা জায়গায় এসে সে থামলো; তারপরে পড়তে লাগল—কী ভয়ঙ্কর ট্র্যাজিডি। একটি বৃদ্ধা কুমারী একটি যুবকের আলিঙ্গনে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রেমিকটি ছিল অস্থিরমতি; তার কাছ থেকে যথেষ্ট মাসোহারাও তিনি পেতেন। এরই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সেই বৃদ্ধাটি খুব কাছ থেকে সেই প্রেমিক যুবকের দেহে রিভলভার দিয়ে পর-পর চারটি গুলি করেন। দুটি বুলেট প্রেমিকের বুকে ঢুকে যায়, একটি কাঁধে, আর একটি তার দাবনায়। হতভাগ্য যুবকটি চিরকালের জন্যে বিকৃতাঙ্গ হ'য়ে যাবে। জনসাধারণের মুখর প্রশংসার ভেতর দিয়ে সেই বৃদ্ধা মুক্তি পেয়েছেন। এই সমস্ত মূর্খ কুমারীদের বিপথে টেনে প্রলুব্ধ করার জন্যে সংবাদপত্র যুবকটির প্রচুর নিন্দা করেছে।

এই কাহিনী শুনে ভদ্রমহিলা যথেষ্ট মর্মাহত হ'য়েছেন বলে মনে হল। কাঁপতে-কাঁপতে তিনি বললেন—বলছ কী? আজকাল তোমরা সবাই পাগল হ'য়ে গিয়েছ। তোমরা সব উন্মাদ। ভগবান তোমাদের ভালবাসা দিয়েছেন। জীবনে আকর্ষণ বলতে ওই একটি জিনিসই রয়েছে। পুরুষরা তার সঙ্গে যোগ করেছে তাদের বীরত্ব। আমাদের বৈচিত্র্যহীন অবসরগুলিতে ওইটিই একমাত্র উত্তেজনার সৃষ্টি করে। আর তার সঙ্গে তুমি সালফিউরিক অ্যাসিড আর রিভলভার মিশিয়ে দিচ্ছ। স্প্যানিশ মদের পাত্রে কাদা ছিটিয়ে দিলে যেমন হয় এ-ও অনেকটা সেইরকম ব্যাপার দাঁড়াল নাকি?

ঠাকুমার কথার বিন্দু-বিসর্গ বার্থার মগজে ঢুকলো বলে মনে হ'ল না। সে বলল—কিন্তু দিদা, এই ভদ্রমহিলাটি প্রতিহিংসা নিয়েছেন। ভেবে দেখ, তাঁর বিবাহিত স্বামী তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

শিউরে উঠলেন ঠাকুমা; বললেন—তোমাদের মত আজকালকার মেয়েদের মাথায় কী সব আবোল-তাবোল চিন্তা ঢুকোচ্ছে ওরা?

বার্থা বলল—কিন্তু বিয়েটা পবিত্র জিনিস, দিদা।

ঠাকুমা বললেন—প্রেমই পবিত্র, বৎসে, আমি তিন যুগের মানুষ দেখেছি; নর-নারীদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অনেক। আমার কথা শোন। বিবাহ আর প্রেম—এদের মধ্যে মিল এতটুকু নেই। সংসার গড়ার জন্যেই আমরা বিয়ে করি। সংসার থেকেই সমাজ গড়ে ওঠে। সেই সংসার গড়ার জন্যে একই রকমের ধাতুর দরকার আমাদের হয়। বিয়ে করার সময় প্রচলিত রীতিই আমাদের মানতে হয়; সম্পদকে একসঙ্গে মেশাতে হয়। একই জাতীয়

বর্ণ আর শ্রেণীকে সংযুক্ত করতে হয়। এই বিয়ের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে অর্থ আর সন্তান। আমরা বিয়ে করি জীবনে একবারই; সংসার তাই চায়! কিন্তু জীবনে আমরা বিশবার ভালবাসতে পারি; কারণ প্রকৃতি চায় তা-ই। বিয়েটা হচ্ছে আইন; ভালবাসা হচ্ছে প্রবৃত্তি। এই ভালবাসার জন্যে কখনও আমরা সোজা পথে যাই, কখনও যাই বাঁকা পথে। সেই প্রবৃত্তিকে সংযত করার জন্যে সংসার অনেক আইন তৈরী করেছে; কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি সেই আইনের চেয়েও শক্তিশালী। ভগবানই সেগুলি আমাদের দিয়েছেন; তাই তাদের বেশী সংযত করার চেষ্টা আমাদের না করাই উচিৎ। কারণ আইন তৈরী করেছে মানুষ। শিশুদের ওষুধের সঙ্গে যেমন চিনি মেশাতে হয়; তেমনি জীবনের সঙ্গে প্রেম না মেশালে জীবনকে কেউ গ্রহণ করতে পারবে না।

অবাক হ'য়ে চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে তাকাল বার্থা—কী বলছ দিদা! ভাল আমরা একবারই বাসতে পারি।

ঠাকুমা আকাশের দিকে তাঁর কম্পিত হাত দুটি তুললেন; মনে হ'ল, শৌর্য-বীর্যের মৃত দেবতার আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার জন্যে তিনি প্রার্থনা করছেন। ঘৃণার সঙ্গে তিনি চীৎকার ক'রে বললেন—তোমরা সব দাসত্ব স্বীকার করেছ; তোমরা সবাই পরিণত হয়েছ অতি সাধারণ মানুষে। বিপ্লবের পর থেকে সমাজকে আর চেনাই যায় না। প্রতিটি কাজকেই তোমরা বড়-বড় বিশেষণে রাঙিয়ে তুলেছ—বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তের কাঁধে তোমরা বিরক্তিকর কর্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ। তোমরা সাম্যবাদে বিশ্বাসী; বিশ্বাস কর অনন্ত কামনায়। প্রেমের জন্যে মানুষ মৃত্যু বরণ করেছে এই নিয়ে প্রেমের কবিতা লেখ তোমরা। আমাদের সময়ে কবিতা লেখা হোত অন্য শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। সেই শিক্ষাটা হ'ল, হে পুরুষ, তোমরা প্রতিটি নারীকে ভালবেস। আর আমরা কী করতাম জান? আমরা যদি কোন ভদ্রলোককে পছন্দ করতাম তাহলে তাঁর কাছে চাকর পাঠাতাম। তারপর যখন মাথায় আমাদের নতুন খেয়াল চাপত তখন দুটিকে একসঙ্গে রাখা সম্ভব না হ'লে প্রথমটিকে আমরা বর্জন করতে সময় নিতাম না।

কেমন যেন বিবর্ণ হ'য়ে গেল বার্থার মুখ।—তাহলে সে যুগে নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না?

বৃদ্ধা মহিলাটি রেগে কাঁই হ'য়ে গেলেন—মর্যাদা ছিল না? যেহেতু আমরা ভালবাসতাম—আর সেই কথাটা প্রকাশ করতাম, আর তাই নিয়ে গর্ব করতাম—এই জন্যে? কিন্তু বৎসে, সেযুগে যদি আমাদের মত ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কোন রমণীর কোন প্রেমিক না থাকত তাহলে সারা ফরাসী উচ্চ সমাজ তাকে বিদ্রূপ করত। আর তুমি বোধ হয় ভাবছ, তোমাদের স্বামীরাই তাদের সারা জীবনে কেবলমাত্র তোমাদেরই ভালবাসবে? যেন, এইরকমই

সম্ভব। আমি তোমাকে বলছি—সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বিয়ের প্রয়োজন; কিন্তু মানুষ প্রকৃতিগতভাবে এর বিরোধী। বুঝেছ? জীবনে একটিমাত্র ভাল জিনিস রয়েছে। সেইটি হ'ল ভালবাসা। আজকাল তোমাদের শেখানো হচ্ছে—মাত্র একজনকেই ভালবাসবে। সারা জীবন ধরে কেবল টার্কিই খেতে হবে এই বাধ্যবাধকতার সঙ্গে ওই নীতির কোন পার্থক্য নেই। বছরে যতগুলি মাস রয়েছে প্রতিটি পুরুষের কম করে ততগুলি রক্ষিতা থাকা উচিৎ।

ফুল যেমন প্রজাপতিদের আকর্ষণ করে, প্রতিটি পুরুষের প্রবৃত্তিরই উচিৎ তাকে নারীদের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। যেসব হতভাগ্য রমণীরা প্রবৃত্তির কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছে আমাদের কি উচিৎ রাস্তায় বেরিয়ে তাদের গায়ে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেওয়া। সেই পুরুষের জন্যে নিজের ওপরে প্রতিহিংসা না নিয়ে ভালবাসার আর ভালবাসা পাওয়ার জন্যেই ভগবান যাদের সৃষ্টি করেছেন প্রতিহিংসা নেব তাদের ওপরে? আর সেই জন্যে তোমাদের বর্তমান সমাজ, তোমাদের বিদূষকদের সমাজ, তোমাদের বুর্জোয়া সমাজ, তোমাদের ঘোড়ার পিঠে চড়া ভিক্ষুকদের সমাজ আমাদের যুক্তি দিয়ে প্রশংসা করবে? তোমাদের সবচেয়ে অগৌরবের বিষয় হচ্ছে ভালবাসা কী তা তোমরা বোঝ না। এইটাই কি তোমাদের বিজ্ঞতা? তোমাদের নীতি? মেয়েরা পুরুষদের গুলি ক'রে চেঁচাবে যে পুরুষরা আজকাল কাপুরুষ হয়ে গিয়েছে?

বার্থা বৃদ্ধার উত্তেজিত হাত দুটি ধরে বলল—তুমি থাম, দিদা, থাম।

সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বীরভোগ্যা নারীটি বললেন—খুব সাবধান! এই রকম মূর্খ অর্থহীন কোন চিন্তা যদি মাথার মধ্যে ঢোকাও তাহলে কোনদিনই তুমি সুখী হ'তে পারবে না।

মরা হাত

[The dead hand]

প্রায় মাস আটেক আগে একদিন সন্ধ্যায় আমার একটি বন্ধু লুই আর কয়েকটি কলেজের বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমরা খানা-পিনা করলাম, ধূমপান করলাম, সাহিত্য আর কলা নিয়ে আলোচনা করলাম, আর পাঁচজনে একসঙ্গে মিশলে যেসব আজগুবী গল্প ক'রে সেই ধরনের গল্প করলাম। এমন সময় দরজা খুলে গেল। বলা নেই কওয়া নেই, আমার একটি সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ঝড়ের মত বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। এসেই প্রশ্ন করল—'কোথা

থেকে আসছি বলত ?' একজন বলল—নিশ্চয় ম্যাবিল থেকে। আর একজন বলল—উঁহু! তোমাকে খুব স্ফূর্তিবাজ দেখাচ্ছে। নিশ্চয় এইমাত্র কারও কাছ থেকে তুমি টাকা ধার করেছ, অথবা, কোন কাকাকে কবর দিয়ে এসেছ; অথবা তোমার হাত-ঘড়িটা বন্ধক দিয়েছ।

বন্ধুটি বলল—কোনটাই ঠিক নয়। আমি আসছি নরম্যানডি থেকে। সেখানেই আমি সপ্তাহখানেক ছিলাম। আসার সময় আমার সম্মানিত একটি ক্রিমিন্যাল বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। অনুমতি হলে, সেটিকে এখনই তোমাদের আমি দেখাতে পারি।

এই বলেই পকেটের ভেতর থেকে সে একটা হাতের কঙ্কাল বার ক'রে আনল। উঃ—কী বীভৎস তার চেহারা! কালো, শুকনো, চিমসে, আর লম্বাটে। অদ্ভুত ক্ষমতাশালী মাংসপেশী হাতের পেছন আর তালুর মধ্যে একটা চামড়া দিয়ে আটকানো রয়েছে। বেগুনে রঙের সঙ্কীর্ণ নখগুলি আঙুলের ডগায় আটকে রয়েছে। অনেক দূর থেকে দেখলেও বোঝা যায় এ হাত নিঃসংশয়ে কোন ক্রিমিন্যালের।

আমার বন্ধুটি বললেন—দেখছ? এই সেদিন বৃদ্ধ একটি যাদুকরের সব সম্পত্তি বিক্রী হয়ে গেল। লোকটি গ্রামাঞ্চলে বেশ পরিচিত ছিল। প্রতি শনিবার রাত্রিতে লোকটি ঝাঁটার ওপরে চেপে স্যাবাথে যেত। নানারকম যাদু দেখাত সে। যাইহোক, এই হাতটার ওপরে বুড়োটার খুব মায়া ছিল। সেই বলত হাতটা হচ্ছে একটি বিখ্যাত আর সম্মানিত ক্রিমিন্যালের। ১৭৩৬ সালে সেই লোক তার আইনসঙ্গত স্ত্রীর মাথা কেটে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল; তারপরে, যে পাদরী তাদের বিয়ে দিয়েছিল তাকে জবাই করে গির্জার চূড়ায় গেঁথে রেখেছিল। এই দুটি বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়ে সে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়ে গেল। তার সেই স্বল্প আর ব্যস্ত কর্মজীবনে বারটি ভ্রমণকারীর অর্থ চুরি করল, একটি মঠে গিয়ে কুড়িটি পাদরীকে ধোঁয়া করে দিল, আর মঠটিকে তার হারেমে পরিণত করল।

আমরা চীৎকার করে উঠলাম—তা তো করল। কিন্তু ওটিকে নিয়ে তুমি কী করবে?

কেন? পাওনাদারদের তাড়ানোর জন্যে আমি এটিকে আমার কলিং বেলের সঙ্গে বেঁধে রাখব।

আর একটি বন্ধু বলল—আমার ধারণা এটি একটি ভারতীয় মাংসের টুকরো। একটি প্রক্রিয়ায় এটিকে রাখা হয়েছে। তুমি বরং এটিকে স্যুপ তৈরী ক'রে খেয়ে ফেল।

আমাদের একটি বন্ধু ছিল ডাক্তার। সে বেশ গম্ভীরভাবেই বলল—ভদ্রমহোদয়গণ, ঠাট্টা করবেন না। পেয়ারী, আমার উপদেশ যদি নাও তাহলে খৃশ্চানদের রীতি মত এটির একটি পরিচ্ছন্ন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা কর।

অন্যথায়, এর সত্যিকার অধিকারী হয়ত তোমার কাছ থেকে এটি দাবি করার জন্যে ফিরে আসবে। তাছাড়া, সম্ভবত, এই হাতটিরও কিছু কুঅভ্যাস জন্মেছে। 'একবার যে চোর হয় সে সবসময়েই চোর'—এই প্রবাদ বাক্যটির কথা হয়ত তুমি জান।

তারপরে সবাই আমরা মদ খেতে সুরু করলাম। এক পেয়ালা মদ উঁচুতে ধরে পেয়ারী সেই হাতটিকে অভিবাদন ক'রে বলল—তোমার প্রভুর পরবর্তী আগমনের উদ্দেশ্যে আমি মদ খাচ্ছি।

তারপরে আসর ভেঙে গেল। যে যার বাড়ি চলে গেলাম আমরা।

পরের দিন বেলা প্রায় দুটোর সময় আমি তার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাই ভেতরে ঢুকে গেলাম; পেয়ারী তখন ধূমপান করতে-করতে বই পড়ছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছ হে?

ভালই।

তোমার সেই হাতটির খবর কী?

আমার হাত? ও! আমার কলিঙ বেলের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে দেখ নি? কাল রাত্রিতেই বেঁধে রেখেছি। ভাল কথা মনে পড়েছে। কাল রাত্রিতে, নিশ্চয় আমাকে বিরক্ত করার জন্যে, কে যেন বেল বাজাচ্ছিল। কে বেল বাজাচ্ছে জিজ্ঞাসা করলাম; কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঠিক সেই সময়ে কলিঙ বেলটা বেজে উঠল! বাড়িওয়ালা বেল বাজাচ্ছিল। লোকটা অসভ্য আর উদ্ধত। আমাদের কোনরকম সম্ভাষণ না করেই সে ঘরের ভেতরে ঢুকে এল। তারপরে আমার বন্ধুকে বলল—ওই চিমসে হাতটাকে এখনই সরিয়ে ফেলার জন্যে আপনাকে আমি অনুরোধ করছি। অন্যথায় এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করতে আমি বাধ্য হব।

পেয়ারী বেশ গম্ভীরভাবেই বলল—স্যার, আপনি হাতটার অপমান করছেন। আরও ভদ্র ব্যবহার পাওয়ার যোগ্যতা ওর রয়েছে। জেনে রাখুন, ওটি একটি সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের হাত।

আর কিছু না বলেই বাড়িওয়ালা যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল। পেয়ারী তার পিছু পিছু বাইরে গিয়ে হাতটা খুলে এনে তার ঘরের ভেতরে যে বেল ছিল তার সঙ্গে বেঁধে রাখলো।

সেদিন রাত্রিতে আমার ভাল ঘুম হয় নি। কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছিল আমার। ঘুমোতে ঘুমোতে আমি থেকে-থেকে চমকে উঠছিলাম। মনে হচ্ছিল একটা লোক যেন আমার ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে। তারপরে ভোর ছ'টা নাগাদ তন্দ্রাটি আসার সঙ্গে-সঙ্গে দরজায় ভীষণ ধাক্কা হ'তে

লাগল। লোকটি আর কেউ নয়, আমারই বন্ধুর চাকর। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায়, বিবর্ণমুখে কাঁপতে কাঁপতে এসে সে বলল—'আমার মনিবকে কারা যেন মেরে ফেলেছে।' কথাটা শুনে কোনরকমে পোশাক জড়িয়ে আমি পেয়ারীর বাড়ির দিকে ছুটলাম।

বাড়ির চারপাশে লোক গিজ-গিজ করছে। নানারকম আলোচনাও করছে তারা। অনেক কষ্টে আমি ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। চারজন পুলিশ অফিসার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফিস-ফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। একটা খাতা খুলে কী যেন সব লিখছিলেনও। যে বিছানায় পেয়ারী অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে দুজন ডাক্তার আলাপ করছিলেন। না; পেয়ারী মারা যায় নি। তবে তার চেহারাটা ভয়ানক রকমের বীভৎস হয়ে উঠেছিল। সে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়েছিল, চোখের তারাগুলি হয়ে উঠেছিল বিস্ফারিত। একটা অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর বস্তুর দিকে সে যেন অবর্ণনীয় আতংকে তাকিয়েছিল। তার গলায় পাঁচটি আঙুলের বীভৎস দাগ রয়েছে। কেউ যেন শক্ত আঙুল দিয়ে এত জোরে গলা টিপে ধরেছিল যে তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। ঠিক সেই সময় একটা দিকে আমার লক্ষ্য পড়ল। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। সেই চিমসে হাতটাকে দেখতে পেলাম না। জনসাধারণের মনে বিশ্রী একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এই ভয়েই ডাক্তারেরা নিশ্চয় ওটাকে সরিয়ে ফেলেছেন। ওটার কী হল সেকথা কাউকে আমি জিজ্ঞাসা করি নি।

পরের দিন খবরের কাগজে পুলিশের তরফ থেকে এবিষয়ে তদন্তের যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল তার কিছুটা অংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করছি—

"গত রাত্রিতে মঁসিয়ে পেয়ারী বি—নামে একটি যুবক আইনের ছাত্রের ওপরে ভীষণ ধরনের অত্যাচার হয়েছে। ভদ্রলোক নরম্যানডির একটি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। ভদ্রলোক রাত্রি দশটার সময় বাড়িতে ফিরে আসেন। বিশেষ ক্লান্ত ছিলেন ব'লে তিনি ভৃত্য ববিনকে শুতে ব'লে নিজেও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। মধ্য রাত্রির কাছাকাছি কোনএক সময়ে এই ভৃত্যের ঘুম ভেঙে যায়। তখন ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড জোরে কলিঙ বেল বেজে যাচ্ছিল। ভয় পেয়ে আলো জেলে সে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপরে মিনিটখানেক বন্ধ থাকার পর আবার এমন জোরে বেল বাজতে সুরু করে যে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দারোয়ানকে ডাকতে ছুটে যায়। দারোয়ান পুলিশকে সংবাদ দেয়। মিনিট পনের পরে পুলিশ হাজির হয়।

"একটি বীভৎস দৃশ্য তাদের চোখে পড়ে। আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড। মনে হল আততায়ীর সঙ্গে তাঁর ভীষণ একটা ধস্তাধস্তি হয়েছে। ঘরের মেঝেতে পেয়ারী ওপর দিকে মুখ করে নিঃসাড়ে পড়ে রয়েছেন। ভয়ে তাঁর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে। বীভৎস রকম বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে চোখ দুটি। তাঁর গলার

চারপাশে পাঁচটি আঙুলের দাগ বেশ গভীরভাবে বসে রয়েছে। অনতিবিলম্বেই ডাক্তারকে ডাকা হয়। তিনি বলেন আততায়ী অমিত বলশালী; আর তার আঙুলগুলি অদ্ভুত রকমের সরু আর পেশীবহুল; কারণ, সেগুলি গলার উপর গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে সেগুলি বুলেটের ক্ষত। এই অত্যাচারের কারণ অথবা অত্যাচারীর পরিচয় কী তা এখনও খুঁজে বার করা যায় নি।"

পরের দিন একই কাগজে আর একটি খবর বেরোল—

"গতকাল যে যুবকটির কথা আমরা বলেছি সেই পেয়ারী বি—ডাক্তারের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে—দু ঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরে পান। তিনি এখন বিপন্মুক্ত; তবে পুনরায় তিনি প্রকৃতিস্থ হ'তে পারবেন কিনা সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অপরাধীর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি।"

কথাটা সত্যি। আমার হতভাগ্য বন্ধুটি উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। সাত মাস ধরে প্রতিটি দিন আমি হাসপাতালে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। জ্ঞান ফিরে আসার বিন্দুমাত্র চিহ্ন আমার চোখে পড়ে নি। উন্মাদের মত বিকারের ঘোরে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কেউ যেন তার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এইরকম একটা ভয় তার মনে কায়েমী হ'য়ে বসেছে। একদিন আমাকে তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠানো হ'ল। পেয়ারীর অবস্থা নাকি খারাপের দিকে। আমি যখন হাজির হলাম তখন সে প্রায় মরণোন্মুখ। ঘণ্টা দুই সে চুপচাপ পড়ে রইল; তারপরে আমার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে সে বিছানার ওপরে উঠে বসে হাত নেড়ে দূরের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে বলল—'নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। ও আমার গলা টিপে ধরেছে। সাহায্য কর, আমাকে সাহায্য কর।' এই বলেই ঘরের মধ্যে চীৎকার করতে-করতে বারদুই ছোটাছুটি করল; তারপরে মুখ থুবড়ে প'ড়ে মারা গেল।

তার মৃতদেহ নিয়ে আমি নরম্যানডিতে গেলাম। তার বাবা-মাকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল, তাঁদেরই পাশে তাকেও কবরস্থ করা হবে। এই গ্রাম থেকেই সে সেই চিমসে হাতটা নিয়ে সেদিন আমাদের ক্লাবে গিয়েছিল। যে বৃদ্ধ পাদরীটি তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন তারই সঙ্গে কফিনের মধ্যে তার দেহটি পুরে গভীর দুঃখে চারদিন পরে আমরা কবরখানায় হাজির হলাম। কবর খোলা হল। আবহাওয়াটি বেশ সুন্দর ছিল। ঝোপের ভেতর থেকে পাখী গান করছিল। এখানে ব্ল্যাকবেরী খেতে ছেলেরা আসে। আমরাও এমনি ক'রে একদিন এখানে ব্ল্যাকবেরী খেয়ে ঠোঁট কালো ক'রে ফিরে আসতাম। খনকদের কবরখানা কাটার শব্দ কানে আসছিল।

হঠাৎ তারা আমাদের ডাক দিল। পাদরী তাঁর প্রার্থনার বইটি বন্ধ করে দেন। তাদের ডাকে এগিয়ে গেলাম আমরা। তারা একটা কফিন পেয়েছে। শাবলের ঠোক্কর দিয়ে অনায়াসেই তারা কফিনটাকে খুলে ফেলল। দেখা

গেল তার ভেতরে অস্বাভাবিক দীর্ঘ একটি কঙ্কাল রয়েছে। পিঠটা নিচে রেখে শূন্য চোখে সে অগ্রাহ্যভরে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

একজন হঠাৎ বলে উঠল—দেখুন, দেখুন দুষ্ট লোকটার একটা হাত কাটা। এই দেখুন।

এই ব'লে কঙ্কালের পাশে প'ড়ে থাকা একটা কাটা হাত তুলে সে আমাদের দেখাল।

আর একটি লোক হেসে বলল—দেখ, দেখ। কঙ্কালটা তোমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে ও যেন বলছে—আমার হাতটা ফিরিয়ে দাও। না হলে, তোমার গলা টিপে ধরব।

পাদরী বললেন—চলে এস। মৃত কঙ্কালটিকে শান্তিতে থাকতে দাও। বন্ধ করে দাও কফিন। মঁসিয়ে পেয়ারীর জন্যে অন্য একটা ঠিক করিগে চল।

পরের দিনই সব মিটে গেল। প্যারিসের দিকে যাত্রা করলাম আমি। যাত্রা করার আগে বৃদ্ধ পাদরীকে পঞ্চাশটি ফ্রাঁ দিয়ে এলাম। বলে এলাম যার কবরটাকে আমরা বিরক্ত করেছি তার আত্মার তৃপ্তির জন্যে যেন ঐ টাকা দিয়ে একটা প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়।

গির্জার দরজায়

[At the Church door]

গ্রামে ঢুকতে যে বড় রাস্তাটা পড়ে তারই কাছাকাছি ছোট একটা বাড়িতে সে বাস করত। ওই অঞ্চলেরই একটি চাষীর মেয়েকে সে বিয়ে করে। স্বামী-স্ত্রীতে প্রচুর পরিশ্রম ক'রে কিছু অর্থ-ও রোজগার করেছিল তারা। কিন্তু একটা দুঃখ তাদের ছিল। সেটা হচ্ছে তাদের কোন সন্তান ছিল না। অবশেষে তাদের একটি ছেলে হ'ল। ছেলেটির নাম রাখল তারা জাঁ। চুমু খেয়ে-খেয়ে তারা অস্থির ক'রে ফেলল ছেলেকে। তারা ছেলেটিকে এত ভালবাসত যে একঘণ্টাও তাকে না দেখে থাকতে পারত না।

ছেলেটির বয়স যখন পাঁচ বছর এমন সময় তাদের গ্রামে একদিন একটা সার্কাস দল এল। টাউন হলের সামনে তাঁবু ফেলল তারা। জাঁ সার্কাস দেখল; তারপরে একদিন একলা সে ঘর থেকে লুকিয়ে পালিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার বাবা সার্কাসের শিক্ষিত ছাগল আর কুকুরদের মধ্যে তাকে বসে থাকতে দেখল। একটা বুড়ো ভাঁড়ের কোলে বসে সে খুব হাসছে।

একদিন খেতে বসার সময় তারা লক্ষ্য করল যে ছেলে ঘরে নেই। তাঁরা ঘর খুঁজলো, বাগান খুঁজলো, রাস্তা খুঁজলো—জাঁ, জাঁ করে প্রাণপণে চেঁচালো। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। রাত্রি নেমে এল, কুয়াশায় ভরে গেল চারপাশ। সব জিনিসই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। কাছের তিনটে বড়-বড় ফার গাছ মনে হল কাঁদছে। তাদের ডাকে কেউ সাড়া দিল না। শুধু তাদের চীৎকার আর্ত গোঙানির রূপ পরিগ্রহ ক'রে দিক থেকে দিগন্তরে প্রতিধ্বনিত হ'ল।

রাত্রি শেষ হলে এগিয়ে এল প্রভাত। তখনও হন্তে হয়ে তারা চীৎকার করলে, শিকারী পশুর মত গলি ঘুঁজিতে ছেলেকে খুঁজে বেড়ালে। দুঃখে বাপের হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে গেল। মনে হ'ল, সে উন্মাদ হ'য়ে যাবে। তার স্ত্রী দরজার সামনে বসে কাঁদলে। তাদের ছেলেটিকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

তারপর থেকে শোকে দুঃখে খুব তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেল তারা। কিছুতেই আর শান্তি পেল না তারা। শেষ পর্যন্ত বাড়িটা বেচে দিয়ে দুজনে ছেলেকে খুঁজে বার করতে পথে বেরিয়ে পড়ল। তারা পাহাড়ের মেষপালকদের জিজ্ঞাসা করল, ব্যবসাদারদের কাছে খোঁজ নিল, গ্রামের চাষীদের কাছে অনুসন্ধান করল, সরকারকে জানাল। কিন্তু ছেলে হারানোর পরে অনেকদিন কেটে গিয়েছে। কেউ তাকে স্মরণ করতে পারল না; সম্ভবতঃ, লোকটি নিজেও তার নাম আর জন্মস্থানের কথা ভুলে গিয়েছিল। তারা কাঁদতে লাগল। আর তাদের কোন আশা নেই। তাদের টাকা শেষ হ'য়ে গেল। তখন তারা দিনমজুরী করতে লাগল। তারপরে তারা সুরু করল ভিক্ষাবৃত্তি। সরাইখানার বাইরে তারা ঠাণ্ডায় রাত কাটাতে লাগল। তারপর তারা বৃদ্ধ হ'য়ে গেল। কাজ করার শক্তি আর তাদের রইল না। তখন তারা ভিক্ষে করতে লাগল। দুপুরে গাছের ছায়ায় বসে চাষীরা যখন খেত তখন তারা করুণ কণ্ঠে তাদের কাছে রুটি ভিক্ষে করত। খালের ধারে বসে নিঃশব্দে তারা রুটি চিবোত। একটা হোটেল-ওয়ালার সঙ্গে তাদের আলাপ হয়েছিল। সে একদিন তাদের বলল—আমি একজনকে জানি। সে তার মেয়েকে হারিয়েছে। প্যারিসে তারা তার মেয়েকে খুঁজে পায়।

এই কথা শুনেই তারা প্যারিসের দিকে ছুটলো।

শহর দেখেই তারা ঘাবড়িয়ে গেল। কী বিরাট শহর। লোকে একেবারে গিজগিজ করছে চারপাশে। কিন্তু এটা তারা বুঝতে পারল যে তাদের ছেলে এই বিরাট জনতার মধ্যেই মিশে রয়েছে; কিন্তু এই বিরাট জনসমুদ্র থেকে তাকে খুঁজে বার করবে কেমন ক'রে সেইটাই বুঝতে পারল না তারা। পনের বছর ধরে তাকে তারা দেখে নি। তাদের ভয় হ'ল; দেখলেই কি তারা তাকে চিনতে পারবে? তারা প্রতিটি রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো, পার্কে ঘুরলো; যেখানেই ভিড় দেখলো সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। যদি কপালজোরে ছেলের

সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। প্রতি রবিবারে তারা গির্জার কাছে বসে থাকত। সেখানে যারা আনাগোনা করত তাদের মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। অনেক বারই তারা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল। তারপরে ভুল বুঝতে পেরে পিছিয়ে এসেছিল।

একটি গির্জার সামনে প্রায়ই তারা ঘুরে-ফিরে আসত। সেখানে একটি বৃদ্ধ থাকত। গির্জায় যারা আসত তাদের মাথায় সে পবিত্র জল নিক্ষেপ করত। এই বৃদ্ধটির সঙ্গে তাদের বেশ আলাপ হয়েছিল। পরে তারা অনেক দূরে খোলা মাঠের ধারে একটা বিরাট বাড়ির চিলে-কোঠায় থাকত। মাঝে-মাঝে এই লোকটি গির্জার পাশে বসে সেই বৃদ্ধের কাজ করত। একদিন প্রচণ্ড শীতে বৃদ্ধটি মারা গেল; গির্জার পাদরী তখন তাকেই বৃদ্ধের কাজটি দিলেন।

সেই থেকে সে রোজ সকালে গির্জায় আসত, একই জায়গায় একই চেয়ারে বসে থাকত। যে-ই গির্জায় ঢুকতো তারই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকত; বিশেষ ক'রে রবিবার দিন সে অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করত; কারণ, ওই দিনটিতেই গির্জা সাধারণ লোকে ভর্তি হ'য়ে যায়।

সে ক্রমশ বৃদ্ধ হ'তে লাগল। ভিজে খিলানের পাশে বসে-বসে দিন-দিন দুর্বল হ'তে লাগল। এখন যারা নিয়মিত গির্জায় আসত তাদের সবাইকেই সে চিনে ফেলেছে। কে আসছে, কখন আসছে, এমন কি টালির ওপরে তাদের পায়ের শব্দ শুনেই সে বলে দিতে পারত কে বা কারা আসছে। একদিন দুটি মহিলা এলেন; একজন বৃদ্ধা, আর একজন যুবতী। সে ভাবলো সম্ভবত এঁরা মা আর মেয়ে। তাঁদের পেছনে এল একটি যুবক। তাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে এসে তাঁদের অভিবাদন করল।

সারাটা দিনই সে ভাবতে লাগল ওই যুবকটিকে সে যেন কোথায় দেখেছে। কিন্তু যার কথা সে ভাবছে সে নিশ্চয় এখন বৃদ্ধ হয়েছে। কারণ সে যখন যুবক ছিল তখনই তো সে দেখেছিল—সে যে অনেক দিন।

সেই ছেলেটি প্রায়ই ওই দুটি মহিলার সঙ্গে আসত। ছেলেটিকে দেখে কেমন যেন তার সন্দেহ হোত; কিন্তু কিছুতেই সে পরিষ্কার ক'রে ভাবতে পারত না, তাই একদিন সে তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এল।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে সেই আগন্তুকরা এলেন। তাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার সময় স্বামীটি বলল—চিনতে পারছ ছেলেটিকে?

তার স্ত্রীও প্রথমে ঠিক করতে পারে নি। তারপরে হঠাৎ সে ফিসফিস ক'রে বললে—হ্যাঁ—হ্যাঁ।···কিন্তু এ তো বেশী কালো, লম্বা; ভদ্রলোকের পোশাক এর গায়ে। তবু মুখটা অবিকল তোমার মত—অর্থাৎ, তুমি যখন যুবক ছিলে।

বৃদ্ধ লোকটি চমকে উঠল। হ্যাঁ; তাইত। ভাবাবেগে তারা এতই মুহ্যমান হয়ে পড়ল যে তাদের মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। তারপরে

তারা তিনজন গির্জা থেকে নেমে এলেন। বৃদ্ধটি যথারীতি পবিত্র জল ছিটিয়ে দিল তাদের মাথায়। ভাবাবেগে কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধটি চীৎকার করে উঠল—জাঁ!

যুবকটি দাঁড়িয়ে গেল, ফিরে তাকাল তার দিকে।

জাঁ?

দুটি ভদ্রমহিলা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

জাঁ?

যুবকটি প্রশ্নকারীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল; তারপরে শৈশবের কথা তার মনে পড়ে গেল। সে বলে উঠল—বাবা পেয়ারী আর মা জেনি?

সে আর সব কথাই ভুলে গিয়েছে—তার বাবার নাম, তার জন্মস্থান—সব; কিন্তু তার মনে ছিল শুধু দুটি কথা; এই দুটি কথা সে প্রায়ই উচ্চারণ করত—বাবা পেয়ারী আর মা জেনি।

সে বৃদ্ধের পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদতে লাগল। তারপরে একবার সে তার বাবা, আর একবার সে তার মাকে চুমু খেল। তার বাবা মার স্বর আনন্দের আতিশয্যে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। মহিলা দুটিও কাঁদতে লাগলেন; কারণ তাঁরা বুঝতে পারলেন একটি চরম সুখের দিন এসেছে। সবাই যুবকটির সঙ্গে ঘরে ফিরে গেল। সেইখানেই সে তার গল্প বলল।

সার্কাসের লোকেরা তাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তিন বছর ধরে সে তাদের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরেছে। তারপরে দলটা ভেঙে গেল। একদিন একটি বৃদ্ধা মহিলা টাকা দিয়ে তাকে কিনে নিলেন। তাকে তিনি পালিত-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। বুদ্ধিমান ছিল বলে তাকে তিনি লেখাপড়া শেখালেন। বৃদ্ধা মহিলার কোন সন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পরে ছেলেটি অনেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'ল। ছেলেটি তার বাবা মায়ের অনেক সন্ধান করেছিল; কিন্তু দুটি নাম ছাড়া আর কিছুই তার মনে ছিল না। এখন তার বিয়ে হবে। সে তার ভাবী স্ত্রীকে বাবা মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মেয়েটিও যেমন সুন্দরী তেমনি সৎ-স্বভাবের।

ওই দুটি বৃদ্ধও তাদের জীবনের দুঃখময় দিনগুলির কথা বলল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তারা জেগে রইল। ভয় হ'ল ঘুমিয়ে পড়লে যদি তাদের সুখের দিন নষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্যের দিন শেষ হয়েছে। শেষ দিন পর্যন্ত তারা বেশ সুখেই কাটালো।

লেফটন্যাণ্ট লারের বিয়ে

[Leiutenant Lare's marriage]

যুদ্ধের সুরুতেই লেফটন্যাণ্ট লারে প্রাশিয়ানদের কাছ থেকে দুটো কামান ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। জেনারেল সংক্ষিপ্ত অথচ জোরাল ভাষায় তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে "লিজন অফ অনার"-এর সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। বিজ্ঞ, সাহসী, দক্ষ এবং তীক্ষ্ণধী হওয়ায় জেনারেল লারের অধীনে একশ সৈন্য রেখেছিলেন। সেই সৈন্য নিয়ে লারে শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন; পশ্চাৎ অপসরণের সময় অনেকবার তাঁর এই কর্মদক্ষতা নিশ্চিৎ বিপর্যয়ের হাত থেকে ফরাসী বাহিনীকে রক্ষা করেছিল।

আক্রমণকারীরা প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের মত সমস্ত সীমান্ত প্রদেশগুলিকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। পেছনে রেখে গিয়েছিল ধ্বংস আর বিভীষিকা। মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিল জেনারেল ক্যারেল-এর বাহিনী; ফলে, তাকে বার বার হটে যেতে হচ্ছিল। প্রতিদিনই একটা না একটা সংঘর্ষ লেগেই ছিল; তবু একমাত্র লারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যেই ক্যারেল-এর বাহিনী প্রায় অক্ষতই ছিল। লারের ক্ষিপ্রতা, সাহস, আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সব সময়েই শত্রুপক্ষকে বিপথে পরিচালিত করেছিল, বিভ্রান্ত করেছিল তাদের সমস্ত পরিকল্পনাকে।

একদিন প্রভাতে জেনারেল তাঁকে ডেকে বললেন—লেফটন্যাণ্ট, জেনারেল দি ল্যাসারে এই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন দেখ। কাল সকালের মধ্যে সাহায্য না পেলে তিনি বিপদে পড়বেন। আজ সন্ধ্যের সময় তিনশ সৈন্য নিয়ে তোমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। সারা পথে তাদের তুমি ছড়িয়ে রাখবে। ঘণ্টা দুই পরে আমিও যাচ্ছি। রাস্তাটিকে বেশ ভাল করে বিপন্মুক্ত ক'রে রাখবে; শত্রুপক্ষের বাহিনীর মুখোমুখী আমি পড়তে চাইনে।

এক সপ্তাহ ধরে কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। বেলা দুটো নাগাদ বরফ পড়তে সুরু করল। সন্ধ্যে নাগাদ পথঘাট বরফের কুচোতে বোঝাই হ'য়ে গেল, অন্ধকার হ'য়ে এল চারপাশ, এত অন্ধকার যে কাছের জিনিসও দেখা গেল না। ছ'টার সময় বাহিনীটি বেরিয়ে গেল। পথপ্রদর্শক হিসাবে দুজন আগে-আগে চলতে লাগল। তারপরে লেফটন্যাণ্ট-এর পরিচালনায় চলল দশজন। বাকি সৈন্যেরা দুটি দলে বিভক্ত হ'য়ে এগোতে লাগল। ডান আর বাঁ দিকে একশ গজ দূরে-দূরে কিছু সৈন্য জোড়ায় জোড়ায় এগোতে লাগল। বরফের গুঁড়োয় তাদের কালো-কালো ছায়ার মত মনে হ'ল; আসন্ন সন্ধ্যায় চারপাশের সাধারণ দৃশ্য থেকে পৃথক ক'রে তাদের চেনা গেল না বিশেষ।

মাঝে-মাঝে তারা থামল ; কিন্তু অবিশ্রাম বরফ পড়ার মিহি শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই তাদের কানে ঢুকলো না। এইরকম অস্পষ্ট ধ্বনি বিপজ্জনক ; কানের ভেতর দিয়ে এই শব্দ ঢোকে না, কিন্তু মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, ফিস ফিস ক'রে নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যাত্রা সুরু হয়। পেছনে প'ড়ে থাকে কয়েকটি চিহ্ন। মূল বাহিনীকে ঠিকপথে পরিচালনা করার জন্যে এইগুলিই জীবন্ত সঙ্কেত।

অগ্রগামী স্কাউটরা থেমে গেল। তাদের সামনে কী যেন একটা নড়াচড়া করছে।

লেফটন্যাণ্ট বললেন—ডান দিকে ঘুরে যাও। ওইখানেই সোনফি অরণ্য। বাংলোটা আরও বাঁদিক ঘেঁষে।

থেমে যাওয়ার নির্দেশ আসার সঙ্গে-সঙ্গেই বাহিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। লেফটন্যাণ্ট দশজনকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। গাছের নিচ দিয়ে গুঁড়িমেরে এগিয়ে গেলেন তিনি। তারপরেই হঠাৎ ভয় পেয়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। একটা ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা তাঁর ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ডান দিকে মিষ্টি পরিচ্ছন্ন সুরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে কে যেন বলল—এই বরফে আমরা পথ হারিয়ে ফেলব কাদার। ব্রেনভিলে কিছুতেই আমরা পৌঁছতে পারব না।

একটা গম্ভীর স্বরে উত্তর এল—ভয় পেয়ো না বাছা। এই অঞ্চলের নাড়ী-নক্ষত্র আমার জানা।

কোন কথা বললেন না লেফটন্যাণ্ট। চারজন সৈন্য ছায়ার মত চুপিসারে এগিয়ে গেল।

সেই রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ একটি নারী-কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ ভেসে উঠল। তারপরেই দুজনকে বন্দী ক'রে তাঁর সামনে হাজির করা হল—একটি বৃদ্ধ, আর একটি মেয়ে। ফিস ফিস ক'রে লেফটন্যাণ্ট তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

তোমার নাম ?

পিয়ারী বার্নার্ড।

পেশা ?

কোঁৎ দি র‍ঁফির বাটলার আমি।

এ তোমার মেয়ে ?

হ্যাঁ, স্যার।

মেয়েটি কী করে ?

বাংলো-বাড়িতে সেলাই-এর কাজ করে।

যাচ্ছ কোথায় ?

পালিয়ে।

কেন ?

সন্ধ্যের সময় বারটা উলান সৈন্য বাংলোর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিন জনকে তারা গুলি ক'রে মারে। মালিককে ফাঁসি দেয়। এই মেয়েটির জন্যে আমি খুব ভয় পেয়ে যাই।

যাচ্ছ কোথায় ?

ব্লেনভিল।

কেন ?

শুনেছি সেখানে ফরাসীবাহিনী রয়েছে।

রাস্তা জান ?

ভাল করেই জানি।

বেশ কথা। আমাদের সঙ্গে এস।

আবার যাত্রা সুরু হ'ল। লেফটন্যান্ট-এর পাশে বৃদ্ধ। তার পাশে মেয়েটি। হঠাৎ মেয়েটি দাঁড়িয়ে প'ড়ে বলল—বাবা, আর আমি হাঁটতে পারছিনে।

এই বলেই সে বসে পড়ল। মনে হ'ল এবারে সে মারা যাবে। তার বাবা তাকে তোলার চেষ্টা করল ; কিন্তু সে-ও বৃদ্ধ।

কাঁদতে-কাঁদতে বৃদ্ধটি বলল—লেফটন্যান্ট, আমরা আপনার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করব। এই পথে প্রথমে পড়বে ফ্রান্স। আপনি আমাদের এইখানেই ছেড়ে চলে যান।

অফিসার নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি সৈন্য গিয়ে কয়েকটা গাছের ডাল কেটে আনল। একমুহূর্তেই সেই ডাল দিয়ে তারা একটা স্ট্রেচার তৈরী করে ফেলল। ইতিমধ্যে পুরো বাহিনীটাই পৌঁছে গিয়েছে।

লেফটন্যান্ট বললেন—এই মহিলাটি ঠাণ্ডায় মারা যাচ্ছেন। এঁকে চাপা দেওয়ার জন্যে কারা তাদের কোট খুলে দেবে ?

দু'জন লোক একসঙ্গে তাদের কোট খুলে দিল।

এঁকে বইবে কে ?

সবাই একাজ করার জন্যে প্রায় একসঙ্গে হাত বাড়ালো। মেয়েটির গায়ে মিলিটারী শাল জড়িয়ে স্ট্রেচারের ওপরে তাকে আস্তে বসিয়ে দেওয়া হল। তারপরে প্রাচ্য দেশীয় রাণীরা যেমন তাঁদের দাসেদের পিঠে চড়ে যান, সেই মেয়েটিও সৈন্যদের কাঁধে চড়ে এগোতে লাগল। প্রাচীনকালে ফ্রান্স যে এত উন্নতি করেছিল তার একমাত্র কারণ বোধহয় নারীর উষ্ণ রক্তের সাহচর্য।

একঘণ্টা চলার পরে আবার তারা থামলো। সবাই বরফের ওপরে শুয়ে পড়ল। দূরে ফাঁকা চত্বরের ওপর দিয়ে বিরাট একটা কালো ছায়া দৌড়ে আসছিল। দেখে মনে হচ্ছিল একটা অদ্ভুত রকমের দৈত্য সাপের মত দেহটাকে লম্বা করে দিয়েছে। তারপরে হঠাৎ কুণ্ডলী পাকিয়ে ছায়াটা

গড়াতে শুরু করল—উন্মত্তের মত লাফিয়ে-লাফিয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগল, থামল, আবার চলতে শুরু করল। ফিসফিস করে নির্দেশ ছড়িয়ে পড়ল; মাঝে-মাঝে ধাতুর ক্ষীণ শব্দ হতে লাগল। সেই ভ্রাম্যমান ছায়াটি হঠাৎ তাদের দিকে এগিয়ে এল। দেখা গেল বারজন উলাম সেনানী ঘোড়া ছুটিয়ে পংপর এগিয়ে আসছে। রাত্রিতে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে। ভীষণ একটা আলোর ঝলকানিতে দেখা গেল দু'শ লোক মাটির ওপরে শুয়ে রয়েছে। বন্দুকের সেই ক্ষণস্থায়ী শব্দ বরফের নিস্তব্ধতার মধ্যে মিলিয়ে গেল। ঘোড়াশুদ্ধ বারজন উলাম সৈন্য প্রাণহীন অবস্থায় লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর আবার যাত্রা শুরু হল। বৃদ্ধটি আবার পথ-প্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করল। অবশেষে দূর থেকে একটি স্বর ভেসে এল—কে যায়? কাছাকাছি আর একটি স্বর সঙ্কেতের ভাষায় উত্তর দিল। আবার অপেক্ষা, আবার আলোচনা। বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আকাশের বুকে অসংখ্য নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে। ধীরে ধীরে তারা বিবর্ণ হয়ে গেল। পূবের আকাশে জেগে উঠল ফিকে উষার আলো।

স্টাফ অফিসার বাহিনীটিকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। স্ট্রেচারে কে রয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। এই কথা শুনে দুটি ছোট ছোট হাত ভারি-ভারি কোট সরিয়ে দিল আর সঙ্গে-সঙ্গে একটি সুন্দর মুখ বেরিয়ে পড়ল। মেয়েটি বলল—আমি স্মার।

সেনানীরা মহাস্ফূর্তিতে স্ট্রেচারটিকে নিয়ে একেবারে ক্যাম্পের মাঝখানে এনে পৌঁছিয়ে দিল। তারই কিছু পরে জেনারেল ক্যারেল হাজির হলেন। নটার সময় প্রাশিয়ানরা আক্রমণ করল। দুপুরের দিকে তারা পালিয়ে গেল।

সন্ধ্যের সময় সারাদিন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে লেফটন্যাণ্ট লারে একগাদা খড়ের ওপরে শুয়ে চোখ বুজতে যাবেন এমন সময় জেনারেল তাঁকে ডেকে পাঠালেন। লারে দেখলেন জেনারেল তাঁর তাঁবুতে বসে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলছেন। এই বৃদ্ধটিকেই গত রাত্রিতে লারে বরফের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাঁবুতে ঢোকামাত্র জেনারেল তাঁর হাত ধরে সেই বৃদ্ধটির দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রিয় কোঁৎ, এই যুবকটির সম্বন্ধেই কিছুক্ষণ আগে তোমার সঙ্গে কথা বলছিলাম। আমার উৎকৃষ্ট অফিসারদের মধ্যে ও একজন।

একটু হেসে নিচু গলায় আবার তিনি বললেন—মানে, সর্বোৎকৃষ্ট।

তারপর অবাক লেফটন্যাণ্ট-এর সঙ্গে বৃদ্ধটির পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি—কোঁৎ দি র্যাঁফি কি দিসাত্।

বৃদ্ধটি তার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললেন—প্রিয় লেফটন্যাণ্ট, তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। একটিমাত্র উপায়েই আমি তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারি······কয়েক মাসের মধ্যেই তুমি ছাড়া পাবে······তুমি আমাকে বল···তাকে তুমি পছন্দ কর কি না।

ঠিক একবছর পরে সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস গির্জার ক্যাপটেন লারেম সঙ্গে মাদময়জেল লাউসী হর্টেনসী জিনিভিভ দি র্‌ঁফির বিয়ে হয়ে গেল। যৌতুক হিসাবে মহিলাটি পেয়েছিলেন ছ'লাখ ফ্রাঁ। লোকে বলে সেই বছরের শ্রেষ্ঠ পাত্রী ছিলেন তিনি!

॥ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত ॥